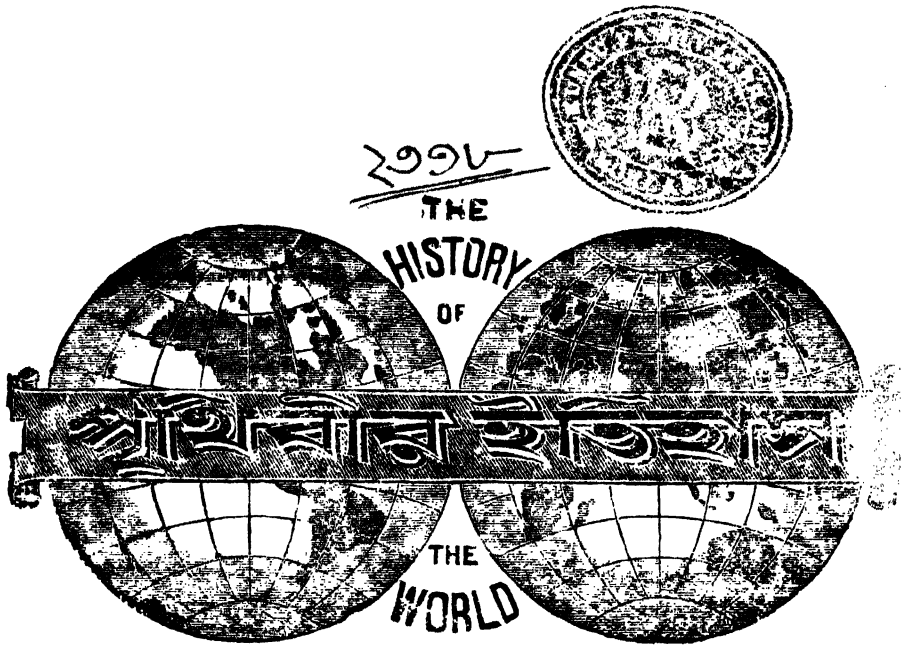




*

ষষ্ঠ খণ্ড ।

ভারতবর্ষ ।

(প্রাচীন ভারতবর্ষ ।)

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত ।

প্রকাশক,

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ।

"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্যালয়, হাওড়া (কলিকাতা) ।

“পৃথিবীর ইতিহাস শ্রিটিং ওয়ার্কস্”, ২নং অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
লেন, হাওড়া, চহিতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



Raja Jogendra KISSORE Roy Choudhuri Rai Bahadur

রামগোপালপুরাধিপতি রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী রায় বাহাদুর ।

উৎসর্গ।

আমার অকৃত্রিম স্নেহে অশেষগুণসম্পন্ন,

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী রায় বাহাদুর

সমীপে।

সহোদয়,

আপনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং আমার অকৃত্রিম স্নেহে। আমার “পৃথিবীর ইতিহাস” প্রকাশের সঙ্কল্প অবগত হইয়া আপনি আমাকে উৎসাহিত করেন এবং উহার এক খণ্ড প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু সাহায্য করিতেও সম্মত হন। আমার প্রতি আপনার অনুরাগ এবং এই গ্রন্থ প্রকাশ-বিষয়ে আপনার সহৃদয়তার বিষয় স্মরণ করিয়া এই খণ্ড “পৃথিবীর ইতিহাস” আপনার নামে উৎসর্গ করা হইল। আপনি সুখস্বাস্থ্য সহ দীর্ঘজীবী হইয়া আমার এই আরক্ত ব্রত সম্পাদনে সহায় হউন। ইতি—

‘পৃথিবীর ইতিহাস’ কার্যালয়,

হাওড়া।

২৭এ ফাল্গুন, ১৩২৪ সাল।

বিনীত,

শ্রীচুর্গাদাস লাহিড়ী।

সূচনা ।

— • —

বড় জটিল রহস্যময়—প্রাচীন ভারতের সেই অনন্ত অতীতের ইতিহাস! সে রহস্য যতই উদ্ঘাটিত হইবে, ইতিহাসের ধারা ততই পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। বর্তমান

ইতিহাস ইউরোপীয় মহাসমরে পৃথিবীর মানচিত্র যেমন নূতন রঙে রঞ্জিত হইবে, নূতন মূর্তি নিঃসন্দেহ; সেইরূপ অমুসন্ধানের পর অমুসন্ধানের ফলে, ভারতবর্ষের পরিগ্রহ করিবে। ইতিবৃত্ত,—শুধু ভারতবর্ষেরই বা বলি কেন, পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব,—এক

নূতন অবয়ব পরিগ্রহ করিবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-বাণিজ্যে, শৌর্য্য-বীৰ্য্যে, শিক্ষা-সৌকর্য্যে,—যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি না কেন,—ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত সর্ববিষয়েই পৃথিবীর ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। জ্ঞান-বারিধির অভ্যন্তরে যিনি যতই অতঃ-তলে অবগাহন করিতে সমর্থ হইবেন, অতীত গৌরবের অনন্ত রত্নরাজি ততই তাঁহার নয়ন-পথে উদ্ভাসিত হইবে,—আর তাঁহার সেই জ্ঞান-গবেষণার ফলে, কত কত অভিনব তত্ত্ব আবিস্কৃত হইয়া, ইতিহাস নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করিবে।

কি ভ্রান্ত বিশ্বাসই বহুমূল হইতে বসিয়াছিল! অসত্য বর্ব্বর ছিলাম—প্রাচীন ভারতের অধিবাসিবর্গ আমরা;—মধ্য-এসিয়ার এক অজানিত সভ্যজাতি আসিয়া উদ্ধার-সাধন করিয়া

ভ্রান্তবিশ্বাস গেল—আমাদিগের;—আর, সেই আগন্তুক জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব অমুভব করিতে শিক্ষা পাইলাম—আমরা! এ কলুষিত শিক্ষা—কি অধঃপতনের পথেই আমাদিগকে আবৃষ্ট করিয়া

লইয়া চলিয়াছিল! শুভক্ষণে জ্ঞানের নবীন আলোক-রশ্মি হৃদয়ে প্রবেশ করিল;—শুভক্ষণে শুভ-সাধনার ফলে সে আলোকে সত্য-তত্ত্ব প্রতিভাত হইল! দূরদর্শী বিজ্ঞজন এখন আর তাই আপনাদিগের অতীত-গৌরবে সন্দিহান নহেন। এই “পৃথিবীর ইতিহাস” প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, অনেকেই এখন অমুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, কোন্ জাতির সন্তান আমরা কি ছিলাম—আর কি হইতে চলিয়াছি! ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিহার কর; এ অমু-ভাবনা নিশ্চয়ই শুভফলপ্রসূ হইবে।

এক শ্রেণীর কর্ম্মী পুরুষগণ কতকটা বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁহার কহেন,—‘কোন্ কালে কি ছিলাম, সে গৌরবে আশ্চর্য্যজনক বৃথা প্রয়াস মাত্র! এখন কিসে গরীয়ান্

গৌরব-স্মৃতিই প্রতিষ্ঠাবান্ হইতে পারি, অতীত-কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল সেই চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃসাধক।’ এ উপদেশ, পাশ্চাত্যের পক্ষে—অতীত অন্ধকারময় নব-অভ্যুদিত জাতির প্রতি—প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু এ উপদেশ

প্রাচ্যের উপযোগী;—যাহাদের অতীত-স্মৃতি চির-দীপ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের উপযোগী কখনই নহে। যাহাদের অতীত-গৌরব আদৌ নাই, অতীতের স্মৃতি বিস্মৃতির গর্ভে বিগীন পরিবার

চেটে পাওয়াই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ বটে ; কেন-না, তাহাতে সহজেই তাহাদের হৃদয়ে আত্ম-প্রাধার সঞ্চার হইবে, এবং ঐহিক উন্নতিকেই চরম উন্নতি মনে করিয়া তাহারা আত্ম-সন্তোষ লাভ করিবে। কিন্তু যাহাদের অতীত-পরিচয় উজ্জল হইয়া আছে, তাহাদের চক্ষের সমক্ষে পুনঃপুনঃ সেই দৃশ্য প্রতিভাত হইলে, অমৃত্যুতাপের অন্তর্দাহে সে দৃশ্য তাহাদের হৃদয়ে উদ্দীপনার অভিনব অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিবে ; আর, তাহাতে তাহারা উন্নতির পর উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবেন। তখন, কিবা ইহ-লৌকিক, কিবা পারলৌকিক,—সর্ববিধ সুখই তাহাদের অধিগত হইয়া আসিবে ; সংসার দেখিবে—গৌরব-স্মৃতিই সুপ্রতিষ্ঠার মূল।

কর্ম—অমৃত্যুবানার অমৃতসারী। অগ্রে মনন—আদর্শের অমৃত্যুধান ; পরে অমৃত্যুধান—কর্ম-সম্পাদন-প্রয়াস। যাহার আদর্শ যত মহান, তিনি প্রায় তদনুরূপ মহত্বেরই অধিকারী হইয়া থাকেন। “আমার পিতৃপিতামহ পুণাপুত আদর্শ-চরিত ছিলেন ; আমি কেন ভ্রষ্টাচারী হই ?”—এ অমৃত্যুশোচনা যাহারই মনে উপস্থিত হইবে, সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন না হউক, তিনি নিশ্চয়ই কিয়ৎ-পরিমাণেও সে গুণ-গৌরবের অধিকারী হইতে পারিবেন। সেই চিন্তা—সেই ভাবনা মামুষের মনে কিরূপে উদয় হইতে পারে, ইতিহাসের পুরাবৃত্তের তাহা এক লক্ষ্যস্থল হওয়া আবশ্যক। এই “পৃথিবীর ইতিহাসে” প্রাচীন ভারতের সেই গৌরব-কথা কীর্তনে, এই জাতীয়-জীবনের উৎকর্ষ-সাধনের যে মহতী স্পৃহা, ভগবান করুন, তাহা পূর্ণ হউক। সূচনার সেই আকাঙ্ক্ষার অমৃত্যুপ্রাণিত হইয়াই এই “পৃথিবীর ইতিহাস” প্রণয়নে প্রবুদ্ধ হইয়াছি। “যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী”,—এ দৈববাণী কি কখনও নিফল হয় ?

এই গ্রন্থ প্রণয়নে কোনরূপ যাহাদের সাহায্য পাইয়াছি, উপসংহারে তাহাদের প্রতি অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমার প্রধান সাহায্য-কারী—শ্রীমান্ প্রেমথনাথ সাত্তাল। এ বিষয়ে শ্রীমান্ আমার দক্ষিণহস্ত-স্থানীয় বলিলেও অভ্যক্তি হয় না। অধ্যয়নে তিনি আমার সহকারী, বিষয়-নির্বাচনে তিনি আমার সহকারী, অমৃত্যুদ্বানে তিনি আমার সহকারী ; অধিক বলিব কি, এই খণ্ডের কয়েকটি পরিচ্ছেদ তিনিই লিখিয়া দিয়াছেন। তাহার স্মার কৃতী সহকারী লাভ করিয়াছি বলিয়া আশা হয়, আমার অভীষিত এই গ্রন্থ অচিরে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব। ভগবান ! আশা পূর্ণ করুন।

‘পৃথিবীর ইতিহাস’ কার্যালয়,
হাওড়া।

২৭এ ফাল্গুন, ১৩২৪ সাল।

নিবেদক—

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

ভারতবর্ষ ।

—০০—

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র ।

সংক্ষেপ ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

১য় । নবধর্মের নবজীবন

...

...

...

৯

বৌদ্ধপ্রাধায়ে নুতন শক্তি ৯ ; জৈনধর্ম ভারতের প্রতিষ্ঠা-রক্ষার সহায়, জৈন-ধর্ম পরম হিতসাধক ১০ ; বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম হিন্দুধর্মেরই অঙ্গীভূত ১০ ; হিন্দু-বৌদ্ধ জৈন তিন ধর্মের সম্বন্ধ ১১ ; ত্রিবিধ কারণে এ তত্ত্ব নির্দ্ধারিত ১২—২২ ; ধর্মের লক্ষণালোচনায় হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের ঐক্য ১২ ; প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রভৃতির লক্ষণাদির বিষয়,—বুদ্ধদেব নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী ১৩ ; বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষু, সন্ন্যাস, নির্বাণ ও মুক্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গ ১৫ ; হিন্দুধর্মের আচার-অমুষ্ঠানের সহিত বৌদ্ধধর্মের আচার-অমুষ্ঠানের ঐক্য ১৬ ; বৌদ্ধধর্মে দোষখ্যাপনে পাপক্ষালনের প্রসঙ্গ, মমুর উক্তির সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন ১৭ ; ঋষ্টধর্মও সেই ভাব ১৭ ; এক মনাতন ধর্ম হইতে সকল ধর্মের উৎপত্তি-প্রসঙ্গ ১৭—১৯ ; হিন্দুধর্মের নীতির ও উপদেশের সহিত বৌদ্ধধর্মের নীতির ও উপদেশের সাদৃশ্য ২০—২২ ; ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধে ও বিবিধ বিষয়ে সে ঐক্য ২১ ; উপসংহারে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে ভ্রান্ত-মতের নিরসন ২২—২৬ ; অগ্রান্ত বিষয়ে ভ্রান্তি সম্বন্ধে বক্তব্য ২৪—২৭ ; বিবিধ সাদৃশ্য-তত্ত্ব ২৭ ; জৈন-ভিক্ষুগণ কর্তৃক হিন্দু-সন্ন্যাসীর বিধিবিধান প্রতিপালন ২৮ ; জৈন-ধর্ম সম্বন্ধেও সেই উক্তি ২৭—৩১ ; বিবিধ সাদৃশ্য-তত্ত্ব ২৭ ; অগ্রান্ত সাদৃশ্য ৩০ ; জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্তী ৩২ ; অনৈক্যও ঐক্য ৩৪ ।

২য় । জৈন ধর্মশাস্ত্র

...

...

...

৩২

আদি-ধর্মের অনুসন্ধানে ধর্মশাস্ত্রের প্রভাবের বিষয় ৩৭ ; জৈনশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হওয়ার কাল ৩৮ ; তৎসম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক ৩৮—৩৯ ; পূর্বশাস্ত্রের প্রসঙ্গ ৪০ ; জৈন সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র ৪১ ; আগম ও কল্প-শাস্ত্র ৪১ ; তাহাদের বিভাগ ও উপবিভাগ সমূহ ৪১—৪২ ; প্রধান প্রধান জৈন ধর্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪৫—৫২ ; আচার-শাস্ত্র ৪৩ ; হৃৎকৃত্তান্ত ৪৫ ; উত্তরাধায়ন ৪৬ ; কল্প-শাস্ত্র ৪৭ ; অগ্রান্ত অঙ্গ-গ্রন্থ—হানাদ শাস্ত্র, জাতককথাদ শাস্ত্র, উপাসকরশাস্ত্র শাস্ত্র, অনুত্তরোপপাতিক শাস্ত্র, অন্তর্কর্দশশাস্ত্র, প্রশ্নব্যাকরণশাস্ত্র, বিপাকশাস্ত্র প্রভৃতি ৪৮ ; জৈনচর্চা ও জৈন-গ্রন্থকারগণ ৪৮—৫০ ; অগ্রান্ত জৈন ধর্মগ্রন্থ ৫০—৫২ ; জৈন-গ্রন্থকার ৫০—৫২ ।

৩য় । জৈনধর্মের আদি-স্তর ...

৫৩

আদি-ধর্মের অতুসন্ধানে ৫৩; জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাকালে বিভিন্ন দার্শনিক মত ৫৪—৫৭; জৈনধর্মশাস্ত্রে তৎকাল-প্রচলিত চতুর্বিধ দার্শনিক মতের উল্লেখ—জড়বাদ, ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, দৈববাদ, অজ্ঞানবাদ, বৈনায়িকবাদ ৫৪—৫৭; বিরুদ্ধমতে স্বাধাদ ৫৭; স্যাধাদ ৫৮—৬০; তাহার মূলতত্ত্ব ৫৯; লেখা-বিভাগ প্রভৃতি ৬০; জৈনধর্মের আদি স্তর ৬০—৬৩; হিন্দু ও পাশ্চাত্য মতের তুলনায় ৬১; ক্রিয়াবাদ ও অক্রিয়াবাদ প্রসঙ্গে ভারতীয় দর্শনের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপণ ৬১—৬২; জৈনশাস্ত্র-সাহিত্যের উদ্ধার-সাধন ৬৩; সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বিবিধ প্রয়াস—জ্যাকবি, লাসেন, ওয়েবার, ম্যাক্সমুলার, ক্র্যাট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের চেষ্টার পরিচয় ৬৩—৬৫; জ্যাকবির মন্তব্য ৬৪; অধ্যাপক ভাণ্ডারকার, অফ্রেই, বুলার, ভিকেন্ট স্মিথ, ডক্টর এ গাবিণ প্রভৃতির গবেষণা ৬৫।

৪র্থ । জৈন-দর্শন ...

৬৬

জীবের মূল লক্ষ্য ৬৬; মুক্তির পথ-চতুষ্টয় ৬৬; প্রথম পথ—জ্ঞান, পঞ্চবিধ জ্ঞানের পরিচয় ৬৭; দ্বিতীয় পথ—বিশ্বাস বা ভক্তি ৬৮; দশবিধ ভক্তির প্রসঙ্গ ৬৮; তৃতীয় পথ—আচার,—আচার পঞ্চবিধ ৬৯; চতুর্থ—দর্শনপালনে কৃচ্ছ্রতা ৬৯; তাহার দ্বিবিধ বিভাগের পরিচয় এবং পঞ্চচতুষ্টয়ের স্থূল মর্ম ৬৯; মুক্তির পথে বিনয়-বিপত্তি—দ্বাবিংশ পরীসহ ৭০—৭১; সম্যকত্ব লাভের অন্তরায় ৭১; সম্যকত্ব লাভের উপায় ৭১; সম্যকত্ব-লাভে ত্রিসপ্ততি অধাবসায় ও তৎসমুদায়ের প্রকৃতি-পরিচয় ৭১—৭৫; কর্মের স্বরূপ, কর্ম অষ্টবিধ ৭৫; বেদনীয়, মোহনীয় প্রভৃতি কর্ম ৭৬; কর্মভাগে জ্ঞানীর বিবিধ কর্তব্য ৭৫—৭৬; জৈনদর্শনের অত্যাশ্রয় শিক্ষা ৭৭; জৈনদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৭৭—৭৯; বিনয়-প্রসঙ্গ ৮০; বিনয়-পথে বাধা-বিপত্তি ৮১; সমিতি ও গুপ্তি ৮২; পঞ্চবিধ সমিতি এবং ত্রিবিধ গুপ্তির প্রসঙ্গ ৮২—৮৩; জীব ও অজীব ৮৪; দ্বিবিধ জীব—সিদ্ধজীব ৮৪, সংসারী জীব ৮৫; গতিবিশিষ্ট জীব ৮৭; পঞ্চোক্ত-বিশিষ্ট জীব ৮৭; মহুত্ব-পর্যায় ৮৮; দেবপর্যায় ৮৯; জৈনধর্মে পূজা-সম্বন্ধ ৯০; ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সহিত তত্ত্বদ্বিময়ে জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্মের সাদৃশ্যসাদৃশ্য ৯১; কর্মপথ-রোধে আশ্রয় ও সংবরণ ৯২; 'কার্মণ' শরীর ৯২।

৫ম । মহাবীর স্বামী ...

৯৩

তীর্থঙ্করের মর্ত্যে অবतरণ ৯২; মহাবীরের অলৌকিক জন্ম-কাহিনী ৯২; মহাবীরের ক্রম-অবস্থা ৯৬; মহাবীরের জন্ম-গ্রহণ ৯৮; জন্মোৎসব ৯৯; জাতকর্ম নামকরণাদি ১০০; পিতামাতা আত্মীয় প্রভৃতি ১০০; তাঁহার বংশলতা ১০১; মহাবীরের সংসার-বাস ১০১; মহাবীরের গুণগ্রাম ১০৩; মহাবীরের সন্ন্যাস-গ্রহণ ১০৩; মহাবীরের কঠোর সংযম-সাধনা ১০৫; প্রতিবন্ধক দূর ১০৬; মহাবীরের

পরিচ্ছেদ ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠা ।

দেহত্যাগ ১০৮ ; জৈন-বৌদ্ধ অগ্রজ-অমুজ ১০৯ ; মহাবীর সম্বন্ধে অজ্ঞাত কথা ১১০—১১৩ ; কুন্দগ্রাম ও সিদ্ধার্থ বিষয়ে ১১০ ; কুন্দগ্রামের অবস্থিতি নির্দেশে নানা কথা ১১১ ; রাজা চোটকের প্রসঙ্গ ১১২ ; মহাবীরের ত্যাগ ১১৩ ।

৬ষ্ঠ । জিনগণ ... ১১৪

অজ্ঞাত জিন ও তীর্থঙ্করগণ ১১৪—১২২ ; পার্শ্বনাথ ১১৪ ; অরিষ্টনেমি ১১৫ ; ঋষভদেব ১১৬ ; শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেব ১১৭ ; শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত ভগবান ঋষভদেবের সহিত আদি-তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের সাদৃশ্য-তত্ত্ব ১১৯ ; জৈনশাস্ত্রের ও ভাগবতের উপদেশ ১১৭—১১৯ ; মহাবীরের পরবর্তী সময় হইতে কল্প-সূত্র সকলনের সময় পর্য্যন্ত কালের স্থবিরগণের নাম-পরিচয় ১১৫ ; জৈনশাস্ত্রের তুলনায় ১২১ ।

৭ম । স্থবিরগণ ... ১২৩

গণ ও গণধরগণ ১২৩—১২৪ ; কুল, শাখা, গচ্ছ প্রভৃতি ১২৩—১২৪ ; চতুর্দশ গণধর স্থবির—তীহাদের শাখা-প্রশাখা ও শিষ্য-পরম্পরা ১২৪—১২৫ ; আৰ্য্যাহুত্বত্বিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি, তীহার শিষ্য-প্রশিষ্যের ও শাখা-প্রশাখার পরিচয় ১২৫ ; পরবর্তী স্থবিরগণ ১২৬ ; পঞ্চদশ হইতে উনচত্বারিংশ গণধরের বিবরণ ১২৭ ; শেবোক্ত কয়েক জন আচার্য্যের বন্দনা-গীতির উল্লেখে স্থবিরগণের নাম-পরিচয় ১২৮ ।

৮ম । বিবিধ বিদ্যা ... ১২৯

জৈনধর্ম্মের অভ্যাসে আধ্যাত্মিক উন্নতি ১২৯ ; আধুনিক সভ্য-সমাজের দ্বারা তাত্‌কালিক সমাজের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির নিদর্শন ১২৯—১৩২ ; রাজ-সভার বিবরণ এবং রাজার দৈনন্দিন কার্য্যাবলী ১৩০—১৩১ ; উদ্ভিদের ও মনুষ্যের সাদৃশ্য-তত্ত্ব ১৩২ ; জ্ঞানোন্নতির নিদর্শন—বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র-লভ ১৩২—১৩৪ ; দ্বিসপ্ততি বিজ্ঞান ও চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার বিবরণ ১৩৩ ; ঋষভপুত্রগণ ১৩৪ ; দূর অতীতে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালী জাতির প্রতিষ্ঠা-পরিচয় ১৩৪ ।

৯ম । জৈনধর্ম্মনীতি ... ১৩১

জৈনশাস্ত্র সন্নীতির ভাণ্ডার ১৩৫ ; প্রকৃত মুনি কাহাকে বলে ১৩৫ ; বন্ধনই বা কি, তাহার বিবরণ ১৩৫ ; সন্ন্যাসী ও মুনি কে—প্রকৃত ত্যাগ কাহাকে বলে ১৩৬ ; প্রকৃত জ্ঞানী ও বীর ১৩৭ ; তীহাদের কর্ম্মলক্ষণ ১৩৮ ; রমণী-সংসর্গ পরি-ত্যাগ বিষয়ে জৈনশাস্ত্রের কঠোর আদেশ ১৩৯ ; সমাক্ষ-লাভের উপায়-পরম্পরা—চিত্তস্থৈর্য্য ১৪০ ; মননে বা কর্ম্মে অনিষ্ট-কল্পনা ১৪১ ; মোক্ষলাভ সম্বন্ধে কঠোর বিধি-বিধান ১৪০—১৪৮ ; বিমুক্ত কোন্ জন—বিমুক্ত ও জ্ঞানী ১৪২ ; আচার্য্য-সূত্রে বিমুক্ত জনের স্বরূপ তত্ত্ব ১৪২ ; পঞ্চমহাব্রত ১৪৪—১৪৮ ; ভাবনা-পঞ্চক ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭ ; বিবিধ নীতিকথা ১৪৯—১৫১ ; যোগসিদ্ধ জ্ঞান ১৫০ ; মহাব্রত ১৫১ ।

১০ম । জৈনশাস্ত্রের শিক্ষা ... ১৫৪

শিক্ষার মূল—সংযম-সাধনা ১৫২ ; শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের এবং গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ১৫২—১৫৩ ; পরীক্ষা ১৫৩ ; পরম-তত্ত্ব-চতুর্দশ ১৫৪ ; পবিত্রতা ও অপবিত্রতা ১৫৫ ; ইচ্ছা-মুক্তার প্রসঙ্গ—সকাম ও অসকাম মরণ ১৫৬ ; ভগ্নতপস্বীর ও তৃষ্ণাত্যাগীর দৃষ্টান্ত—ভগ্নের মুক্তি-প্রসঙ্গ ১৫৭ ; ঐহিক অনন্ত সুখ ১৫৭ ; পরিজ্ঞানের উপায় ১৫৯ ; তৃষ্ণাত্যাগের আদর্শ ১৬০ ; রাজা নমীর সহিত ইজের এতৎসংক্রান্ত কথো-পকথন ১৬০—১৬১ ; জীবনের ক্ষণভঙ্গুর ১৬২ ; তৎসম্বন্ধে গৌতমের আঁতি মহাবীর

শ্রীমদ্ভগবৎ।

বিষয়।

পৃষ্ঠা।

স্বামীর উপদেশ ১৬৩; জ্ঞানী ও অজ্ঞানী—প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ ১৬৪—১৬৬; ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষুর জীবনের দৃষ্টান্ত—হরিকেশ প্রসঙ্গ ১৬৬; আসক্ত ও অনাসক্ত—চিত্র ও সঙ্কল্পের প্রসঙ্গে উদাহরণ ১৬৭; তৃষ্ণাত্যাগের দৃষ্টান্ত ১৬৮; প্রকৃত ভিক্ষু কে ১৭১; নিগ্রহের আচার লক্ষণ ১৭২; ১ নিগ্রহের কর্তব্য বিষয়ক দৃষ্টান্ত, ত্যাগী ও শমাচারী, তদ্বিষয়ক বিবিধ দৃষ্টান্ত ১৭৩—১৯৪; সঞ্জয়ের উপাখ্যান ১৭৩; বলশ্রীর উপাখ্যান ১৭৪; শ্রেণিকের উপাখ্যান ১৭৯; কেশী-গৌতম প্রসঙ্গ ১৮১—১৮৫; ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ১৮৬; অনন্ত হুঃখনাশ ১৮৭; রসে বীতস্পৃহা, স্রব-তৃষ্ণা হুঃখজনক ১৮৯; রূপে বীতস্পৃহা ১৯০; শব্দে বীতস্পৃহা, রূপদর্শন ধ্বংসের মূল ১৯০; গন্ধে বীতস্পৃহা ১৯১; রসে বীতস্পৃহা ১৯১; স্পর্শে বীতস্পৃহা ১৯১; মূল-তত্ত্ব—অহিংসার বিরতি ১৯২; কামজয়ে মুক্তি ১৯৩; সর্বত্র ত্যাগ-শিক্ষা ১৯৪

১৯শ। বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বাদবিতণ্ডা

...

১৯৫

লক্ষ্য ও পথ—লক্ষ্য অভিন্ন, বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি প্রসঙ্গ ১৯৫; সাম্প্রদায়িক বাদ-বিতণ্ডা ১৯৫; বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যে সকল মতের আলোচনা ও নিরাস প্রসঙ্গ ১৯৬—২৪২; সাংখ্য-মতের নিরাস ১৯৬; তাহার প্রতিপাত্ত বিষয় ও তাহাতে অসামঞ্জস্য প্রদর্শন ১৯৭—১৯৮; সাংখ্যমতে দোষ-দর্শন ১৯৮; সাংখ্যমত খণ্ডনে ২০১; সাংখ্যের প্রতিবাদের উপসংহার ২০৪; পরমাণুবাদ নিরাস ২০৫; পরমাণুবাদে অপরাপর আপত্তি ২০৭; আরম্ভবাদে অসামঞ্জস্যের অপরাপর হেতু ২০৯; বৌদ্ধমত-খণ্ডন ২১০; আবিষ্কারের পারম্পরিক হেতুতে দোষ-দর্শন ২১২; বৌদ্ধমতে অসং হইতে মতের উৎপত্তি—সে মত-খণ্ডন ২১৩; কণিকবাদে দোষ-প্রদর্শন ২১৫; সৌত্রান্তিকগণের মত খণ্ডন ২১৬; বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের মত খণ্ডনে উপসংহার ২১৭—২১৮; বৌদ্ধমতে বাসনা-বৈচিত্র্যে জ্ঞান-বৈচিত্র্য মতের খণ্ডন ২২০—২২২; জৈনমতের প্রতিবাদ ২২৩; জৈনধর্মের মূলতত্ত্ববিচার ও তাহাতে দোষ দর্শন ২২৩—২২৮; জীব ও অজীর প্রসঙ্গ ২২৪; সপ্তভঙ্গিয়ার ২২৪—২২৫; বেদান্তমতে বিরুদ্ধধর্মীর সমাবেশ অসম্ভব ২২৭; জীবের অনন্তঅবয়ব স্বীকারে বিরোধ পরিহার বিসম্মত জৈনমত খণ্ডন ২২৭; জৈনোভিমত মুক্তির বিষয়ে দোষ-প্রদর্শন ২২৮; শাক্তবাদাদির আলোচনার অসামঞ্জস্য প্রদর্শন—পাণ্ডিত মতের নিরাস ২২৯; শক্তিবাদ-নিরাস ২৩২; পরম্পরের বিতর্ক-বিতণ্ডা ২৩৪; অস্তিনাত্তির সমাবেশ অসম্ভব নয় ২৩৫; উপসংহারে সর্বদর্শনসার প্রসঙ্গ ২৩৯; সেই একে সকলই সম্ভব ২৪১; আবিষ্কার উন্মূলনে অতীত ফল মুক্তিলাভ ২৪২।

১২শ। প্রাগ্ভারতেতিহাসে প্রথম সত্ৰাট

...

...

২৪৩

ধর্মশক্তিই রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করে ২৪৩; ধর্মশক্তির সাহায্যেই চন্দ্রগুপ্ত রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ২৪৩; চন্দ্রগুপ্ত কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ২৪৫; তাহাকে জৈন-ধর্মাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিপরিমাণ ২৪৬—২৫০; খেতাবর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ২৪৬; চন্দ্রগুপ্তের অমরত্বে চাণক্যের প্রভাব ২৫০; কালিদাস যেমন বিক্রমাদিত্যকে অমর করিয়া গিয়াছেন, চাণক্যও সেইরূপ চন্দ্র-গুপ্তকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন ২৫১; চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় কাল, তাহার আবির্ভাব ও রাজ্যকাল সবকিছু নানা মতের আলোচনা; জৈন মতে তাহার রাজ্যকাল ২৪৬—২৫০; অসাধারণ মাহুয় চাণক্য ২৫২; চাণক্যের বংশাদির বিবরণ এবং তাহার সহিত চন্দ্রগুপ্তের মিলন-বৃত্তান্ত ২৫২—২৬৩; চাণক্যের বংশাদির বিবরণ

২৫৩; বিভিন্ন গ্রন্থে চাণক্য নামের উল্লেখ ২৫৪—২৫৬; অর্থশাস্ত্রের প্রকৃত প্রণেতা কে ২৫৬; অর্থশাস্ত্র রচনার চাণক্যের কৃতিত্ব ২৫৭; চাণক্য বাঙ্গালী ২৫৮; চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের মিলন ২৬০; আদর্শ শাসন-প্রণালী ২৬৩; চন্দ্রগুপ্তের বংশ পরিচয় ২৬৪; চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে বিবিধ কাহিনী ২৬৫; চন্দ্রগুপ্ত বাঙ্গালী ২৭০।

১৩। প্রাগ্ভারতেতিহাসে এক আদর্শ রাজ্য ... ২৭৩

আদর্শ রাজ্যের আদর্শ,—ইংরেজ রাজত্বে সে আদর্শের প্রকৃষ্ট নিদর্শন ২৭৩—২৭৪; জনসংখ্যা-নির্ধারণে আদর্শ ২৭৪—২৮৩; ভারতে লোক-গণনা ২৭৪; আধুনিক পদ্ধতি ২৭৪; ভারতের জনসংখ্যা ২৭৫; জনসংখ্যা-নির্ধারণের আবশ্যিকতা ২৭৬; প্রাচীন গণনা-পদ্ধতি ২৭৭; অর্থশাস্ত্রে লোক-সংখ্যা নির্ধারণ ২৭৭—২৮০; অর্থশাস্ত্র-মতে সহরাদির লোকগণনা পদ্ধতি ২৭৯; জরিপাদির বিষয় ২৮০; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণনা-পদ্ধতি ২৮১; বিভিন্ন দেশের জন-সংখ্যা ২৮৩; ব্যবহার-বিধানে আদর্শ ২৮৩—৩০৫; ব্যবহার-বিধানে ধর্মই মূল ২৮৩; শাস্ত্রোক্ত বিধান-পরম্পরা ২৮৪; শাস্ত্রগ্রন্থে পরিচয় ২৮৪; অর্থশাস্ত্রে ব্যবহার-বিধি ২৮৫; ব্যবহার প্রকার ২৮৬, শিবাদ বিভাগ—অষ্টাদশ-শিবাদ ২৮৬; বিচারালয় সংগঠন; দ্বিবিধ বিচারালয়—ধর্মস্থীর ও কণ্টকশোধন ২৮৮; ব্যবহার-প্রণালী ২৮৯; পরোক্ত ২৯১; সাক্ষি-ব্যবস্থা ২৯৫, সংহিতামতে সাক্ষি-প্রকরণ ২৯৬; সাক্ষীর সত্যপাঠ ২৯৯; ব্যবহার ক্রম ৩০০; সিদ্ধি ৩০৬; বিচারকের দণ্ড ৩০৮; আপিলের ব্যবস্থা ৩০৯; চুক্তি ও তৎপ্রকার-ভেদ ৩১০; অসিদ্ধ চুক্তি ও বিশেষ বিধি ৩১১; সংহিতা-মতে ৩১৩; অসিদ্ধ চুক্তির বিষয় ৩১৬; তিরোহিত চুক্তি ৩১৮; বর্গ, লক্ষ্য, বেতন প্রভৃতি ৩২০; সাক্ষীর প্রকার ৩২২; প্রতিভূ প্রসঙ্গ ৩২৫; কোটিল্যমতে আধি ৩২৯; কোটিল্য মতে নিক্ষেপ ও উপনিধি ৩৩২; সংহিতা-গ্রন্থে তৎসংক্রান্ত বিধি-নিয়মাদি ৩৩৪।

১৪শ। ঋণাদান-বিধানে আদর্শ ... ৫৩৬

ঋণাদান প্রসঙ্গ ৩৩৬; ঋণ সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা ৩৩৬; ঋণ সম্বন্ধে কোটিল্যের বিধান—মুদের হার প্রভৃতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা ৩৩৭—৩৩৮; ঋণসংক্রান্ত দায়, পুত্র ও উত্তরাধিকারী ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য ৩৩৯; সংহিতোক্ত ঋণাদান বিধি ৩৪০; সংহিতা মতে ঋণ-আদায় বিধি ৩৪১; পাশ্চাত্যে কুসীদ প্রসঙ্গ ৩৪৪; বাইবেলে মোজেস প্রবর্তিত নীতিতে তাহার পরিচয় ৩৪৪; প্রাচীন রোমে, গ্রীসে ও মিশরে কুসীদের ব্যবস্থা ৩৪৫; বিভিন্ন দেশে মুদের বিধান—ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়ারলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে তৎসংক্রান্ত বিধান ৩৪৬—৩৪৮; প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিবরণ ৩৪৯; ঋণাদানে দায়োল্লেখ ৩৫০; তামাদি ও ভোগ প্রসঙ্গ,—তামাদি সংক্রান্ত বিধানের উল্লেখ প্রাচীন ভারতের বিধানের প্রেষ্ঠ-ব্যাপন; আধুনিকে প্রাচীনের অনুসরণ ৩৫১—৩৫৪; প্রতীচ্যে ঋণ-প্রসঙ্গ ৩৫৫; রাজকীয় ঋণ প্রভৃতির পরিচয় ৩৫৯।

১৫শ। ক্রয়বিক্রয়াদিকার বিধানে আদর্শ ... ৩৬৪

শাস্ত্রে পূর্নক্রয়াদিকার প্রসঙ্গ ৩৬২; মহুসংহিতার তাহার আভাস ৩৬২; মিতাক্ষরা ও মহানির্ধারণতন্ত্রে তাহার উল্লেখ ৩৬৩; অর্থশাস্ত্রের বিধান ৩৬৩; কোটিল্যের মতে অস্থাবর-বিক্রয়-বিধি ৩৬৬; পণ্যাদির দোষ প্রসঙ্গ ৩৬৭; অস্থাবরবিক্রয় ৩৬৮; সংহিতার অস্থাবরবিক্রয়—কোটিল্যের বিধান তাহার অনুগামী ৩৬৯—৩৭২; ভেজাল বিক্রয় ৩৭৩; পূর্নক্রয়াদিকার ৩৭৬; কদম্বক

প্রভৃতি বিধান ৩৭৬; দাসকর, সমুদ্র-সমুখান প্রভৃতির প্রসঙ্গ ৩৭৬—৩৭৯; সংহিতার মতে ব্যবস্থা ৩৭৯; বিবিধ বিধানের উল্লেখ ৩৮০—৩৮২; আদেশ ও অঙ্গাদি ৩৮৩; জনহিতকর বিবিধ বিধান প্রসঙ্গ ৩৮৫।

৬শ। রাজপথাদির ব্যবস্থায় আদর্শ ... ৩৮০

রাজপথাদি নির্ণয়ে আদর্শ,—পথাদির উপযোগিতা ৩৮০; অর্থশাস্ত্রে পথ-নির্দেশ ৩৮০; কোটিল্যের মতে উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণ শ্রেষ্ঠ ৩৮১; পথের বিবরণ, বিভিন্ন নামধের বিভিন্ন পথ ৩৮৮—৩৯০; পথাবরোধে দণ্ড ৩৯১; যানবাহনাদি ৩৯১; রথ, শকট প্রভৃতি যানের পরিচয় ৩৯২—৩৯৩; পথিকগণের সুবিধা ৩৯৪; জলপথ ও জলযানাদি ৩৯৫—৪০০; জলপথ ৩৯৫; জলযানাদির ব্যবস্থা ৩৯৬; বিবিধ জলযান ৩৯৭; নাব্যাক্ষের কর্তব্য ৩৯৮; শুক-নির্দ্ধারণ ৩৯৯।

৭শ। জনহিতকর বিবিধ বিধানে আদর্শ ... ৪০১

প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা-বিজ্ঞা ৪০১; স্বাস্থ্যরক্ষার আদর্শ,—তদ্বিধানে চিকিৎসার ব্যবস্থা,—ভেষজাগার, সূতিকা-চিকিৎসা, গর্ভব্যাদিসংস্থা প্রভৃতি ৪০১—৪০৯; হিন্দুশাস্ত্রে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ৪০২; অর্থশাস্ত্রে চিকিৎসা-ব্যবস্থা ৪০৩; রোগ-প্রতিকারে বিবিধ বিধান ৪০৬; চিকিৎসকের দণ্ড-ব্যবস্থা ৪০৮; মৃত-পরীক্ষা ৪০৯; হৃৎক-নিবারণে অশেষ আয়াসের পরিচয় ৪১০—৪১১; অগ্নিতর-নিবারণের ব্যবস্থা ৪১২; জনহিতকর বিবিধ বিধান—মিতাচার, জামগীর দান প্রভৃতির ব্যবস্থা,—বায়ুবিজ্ঞান (Meteoriology) ৪১৪; বারিপাত পরীক্ষার যন্ত্র ৪১৫; খনিজ-বিজ্ঞান উৎকর্ষ ৪১৬; স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতির পরীক্ষা-পদ্ধতি ৪১৭—৪১৮; ধাতুবিশোধনের উপায়—রাসায়নিক প্রক্রিয়া ৪১৯; জলসেচনে জলসরবরাহের ব্যবস্থা ৪২০; জলসরবরাহের বিবিধ উপায় ৪২০; বাত প্রবৃত্তি, কুল্যাব, সেতু—প্রভৃতির উল্লেখ আধুনিক পদ্ধতির আভাষ ৪২১।

৮শ। পশুপালন ব্যবস্থায় আদর্শ ... ৪২২

ভারতে পশুপালন ৪২১; পশুপালন বিষয়ে ব্যবস্থা-বিধান, পশুবিভাগের বিভিন্ন কর্মচারীর পরিচয় ৪২৩; বেতনানুসারে গোপালকের শ্রেণিবিভাগ ৪২৩—৪২৪; পশুগণের শ্রেণিবিভাগ ও সংখ্যা-নিরূপণ ৪২৪—৪২৫; পশুগণের খাদ্য ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ৪২৫; পশুগণের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা ৪২৬; পশুচারণ জন্ত চারণ-ভূমির ব্যবস্থা ৪২৭; অশ্ব-ব্যবস্থা ৪২৮; অশ্বগণের খাদ্য ব্যবস্থা ৪২৯; অশ্বের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-প্রণালী ৪৩০; অশ্বের গতি প্রভৃতি ৪৩১ হস্তিপালন ব্যবস্থা ৪৩২; হস্তিপালনে বিভিন্ন কর্মচারী ৪৩২; কর্মচারীর কর্তব্য,—হস্তী ধৃত করিবার পদ্ধতি ৪৩৩; হস্তীর শিক্ষা-বিধান ৪৩৪; হস্তীর পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যাদির বিধান ৪৩৪; হস্তীর স্নানকাল ও গৃহাদির ব্যবস্থা ৪৩৫; নদীজ ও পার্বত্যীয় হস্তী ৪৩৬; পক্ষি-সংরক্ষণ ৪৩৬; রাজকীয় শিকারোত্তান ৪৩৭; শিক্ষার আদর্শ ধর্ম ৪৩৭; কোটিল্যের বিধান ৪৩৭; শিক্ষার উদ্দেশ্য ৪৩৮; সর্ববিষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন ৪৩৯।

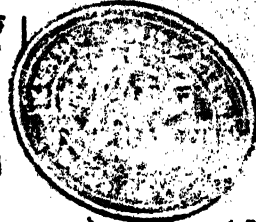
৯শ। জৈন-স্থাপত্য ... ৪৪১

অর্থশাস্ত্রে চাণক্যের অধিতীর কীর্তি ৪৪১; চন্দ্রগুপ্তের শাসন-বর্ণনা অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ৪৪১; জৈন-স্থাপত্য ৪৪২; জৈন-স্থাপত্যের নিদর্শন ৪৪৪।

ভারতবর্ষ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

নবধর্মের নবজীবন ।



[বৌদ্ধ-প্রাধিক্তে নূতন শক্তি ;—জৈনধর্ম ভারতের প্রতিষ্ঠা-রক্ষায় সহায় ;—বৌদ্ধ-ধর্ম ও জৈন-ধর্ম হিন্দুধর্মেরই অঙ্গীভূত ;—হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন তিন ধর্মের সম্বন্ধ ;—ত্রিবিধ কারণে এ তত্ত্ব নির্ধারিত ;—ধর্মের লক্ষণালোচনার হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের ঐক্য,—প্রযুক্তি-নিবৃত্তি প্রভৃতি লক্ষণাদির বিষয় ;—বুদ্ধদেব নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী ;—বৌদ্ধধর্মের তিহাস, সম্মান, নিক্রাণ ও মুক্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গ ;—হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের সহিত বৌদ্ধধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের ঐক্য,—বৌদ্ধধর্মে দোষখাপনে পাপক্ষালনের প্রসঙ্গ, সমুদ্র উত্তির সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন,—খৃষ্টধর্মের সঙ্গে ভাব ;—এক সনাতন ধর্ম হইতে সকল ধর্মের উৎপত্তি-প্রসঙ্গ ;—হিন্দুধর্মের নীতির ও উপদেশের সহিত বৌদ্ধধর্মের নীতির ও উপদেশের সাদৃশ্য,—ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধে ও বিবিধ বিষয়ে সে ঐক্য ;—উপসংহারে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে জ্ঞান-বিশ্বাসের নিরসন,—জৈনধর্ম সম্বন্ধেও সেই উক্তি ।]

উষা-সমাগমে অরুণোদয়ে নৈশ অন্ধকার অপমৃত হইল। নবীন আলোকে দিবাগমে স্তম্ভোখিত প্রাণিজগৎ নবজীবন লাভ করিল। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবে অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত

উষার
আলোক।

হইল ; সঙ্গে সঙ্গে নবজাগরণের নবীন উদ্দীপনা প্রকাশ পাইল। এক-দিকে মাহুঘের চিত্ত ধর্মচিন্তায় উবুদ্ধ হইল ; অত্রদিকে সেই ধর্ম-প্রাণতার প্রভাবে বলবীৰ্য্য কেন্দ্রীভূত হইয়া আসিল। যে ধর্মের প্রতিষ্ঠাকালে, যে শক্তির স্মৃতি-বিধান, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন ; প্রকারান্তরে সেই ধর্মই প্রতিষ্ঠিত, সেই শক্তিই স্মৃতি প্রাপ্ত হইল। সাক্ষিগণসহস্রাধিক বর্ষব্যাপী পরিবর্তনের অভিঘাতে সন্দর্ভ বিকৃত এবং কেন্দ্রশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছিল। এক্ষণে, নবধর্মের নবীন উদ্ভাসনা নূতন পথে নূতন শক্তি সঞ্চিত করিয়া দিল। ভারতের ইতিহাস যে ধর্মের ইতিহাস, আর নব নব ধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ইতিহাসের খারা যে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে ; বৌদ্ধধর্মের নবীন উদ্দীপনার বৌদ্ধ-প্রাধিক্তের উজ্জ্বল আলোকে, আবার তাহা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হইল।

যেমন বৌদ্ধধর্ম, তেমনই জৈনধর্ম—সে বিপ্লব-বিভীষিকার দিনে ভারতের প্রতিষ্ঠা-রক্ষার পক্ষে সমভাবে সহায়তা করিয়াছিল। শুভক্ষেণে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী আবিস্কৃত

হন; শুভক্ষেণে জৈনধর্মের তত্ত্বকথাসমূহ প্রচারিত হয়। জৈনধর্ম
জৈন-ধর্মও
পরম হিতসাধক। ও বৌদ্ধধর্ম অগ্রজ-অনুজ-রূপে একযোগে মানবের হিতসাধনে প্রবৃত্ত

হইয়াছিল। ঐ দুই ধর্মের সাদৃশ্য এত অধিক ছিল যে, অনেক সময়ে উহাদের পরস্পরের প্রভাব অভিন্ন-রূপে পরিকীর্ণিত দেখি। বৌদ্ধধর্মের পুরা-বৃত্তান্তসম্বন্ধে বৌদ্ধধর্মকে যেমন বহুকালের প্রাচীন ধর্ম বলিয়া বুঝিতে পারি, জৈনধর্মের ইতিহাসেও সেই নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি। গৌতম-বুদ্ধের পূর্বে যেমন বহু বুদ্ধের আবিস্কারের সম্ভাব্য প্রাপ্ত হই, মহাবীর স্বামীর পূর্ববর্তী সেইরূপ তীর্থঙ্করগণের প্রভাব জৈনধর্মের ইতিহাসে দেখিতে পাই। এমন কি, পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের ও তীর্থঙ্করগণের সংখ্যার ঐক্য দেখি; তাঁহাদের বিশেষণে ও নাম-সংজ্ঞায়ও ঐক্য দেখি। * উভয় সম্প্রদায়ের কীর্তি-স্মৃতির মধ্যেও অপরিদৃশ্য ঐক্য রহিয়া গিয়াছে। তদনুসারে, কাহারও কাহারও মতে, বুদ্ধদেবকে মহাবীর স্বামীর শিষ্য বলিয়া অভিহিত হইতে দেখি; অপিচ, বুদ্ধদেব যে জৈনতীর্থঙ্করগণের প্রদর্শিত পথে ‘অহিংসা পরম-ধর্মের’ বীজমন্ড্রে দীক্ষিত হইয়া-ছিলেন; সে প্রসঙ্গও বহু ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয়। কে গুরু, কে শিষ্য—তদ্বিশয়ক বিচার-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া এ প্রসঙ্গের অঙ্গীভূত নহে। তবে বুদ্ধদেব যখন নির্বাণ-পথ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, মহাবীর স্বামী তখন জৈন-ধর্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া দিয়াছিলেন; সারনাথে যুগদাবো বুদ্ধদেব যখন প্রথম বৌদ্ধসমাজ সংগঠন করেন, কাশীধামে মহাবীর স্বামী তখন জৈন-ধর্মের মহান সত্য প্রচার করিতেছিলেন। ফলতঃ, প্রায় একই সময়ে, একদিকে মহাবীর স্বামী, অন্যদিকে বুদ্ধদেব—দুই দিকে দুই শক্তি মোহপঙ্কনিপতিত মানবসমাজের উদ্ধার-সাধনে সহায়তা করিয়াছিল।

কি জৈন-ধর্ম, কি বৌদ্ধ-ধর্ম—উভয়েই সনাতন হিন্দু-ধর্মের অঙ্গীভূত। কি তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী, কি শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব—উভয়েই যে সঙ্কর্মের, প্রকারান্তরে অভিন্ন ধর্মের,

প্রচার করিয়া গিয়াছেন; তাহাও স্বতঃপ্রতিপন্ন হয়। সত্য এক—
হিন্দুধর্মে
বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম। জ্ঞান অভিন্ন হইলেও, মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতির; সুতরাং বিভিন্ন পথে

মানুষ সত্যের—জ্ঞানের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে। শ্রীভগবান তাই সময় ও সমাজের গতি-প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া, বিভিন্ন মূর্তির মধ্য দিয়া, সত্যতত্ত্ব জ্ঞান-তত্ত্ব প্রকাশ করেন। একটা দৃষ্টান্তে বিষয়টা বোধগম্য হইতে পারে।

* কোনও মতে বুদ্ধের সংখ্যা ২৪ জন। কোনও মতে ২২ জন। তীর্থঙ্করগণের সংখ্যাও কোনও মতে ২৪ জন, কোনও মতে ২২ জন। ২৪ জন তীর্থঙ্করের সংক্ষিপ্ত বিবরণ “পৃথিবীর ইতিহাস” ২য় খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষণের বিষয় অধিক কি বলিব? বুদ্ধদেব যে যে বিশেষণে বিশেষিত হন, তীর্থঙ্কর-গণও সেই সেই বিশেষণে পরিচিত। তীর্থঙ্করগণ জিন, অর্হৎ, মুগত, বুদ্ধ, সমুদ্ধ, তথাগত, সর্বজ্ঞ প্রভৃতি নামে পরিচিত। বুদ্ধদেবও যে ঐ সকল নামে অভিহিত হন, তাহা পূর্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে। বৌদ্ধ ভূপ, বৌদ্ধমন্দির এবং বৌদ্ধ মূর্তি প্রভৃতিও জৈনদিগের মন্দিরাদির সহিত সাদৃশ্যমণ্ডল। আর, সেই কারণেই অনেক সময়, জৈনদিগের মন্দির প্রভৃতি বৌদ্ধকীর্তির মধ্যে ভ্রান্তবশে পরিকীর্ণিত হইয়া থাকে।

সাগরগামিনী স্রোতস্বিনী সকলেই সাগর-উদ্দেশে প্রধাবিতা। পথ রিতির হইলেও লক্ষ্য অভিন্ন। ভারতের এই সকল ধর্ম-সম্প্রদায়-সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিয়া থাকে। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি জৈন—মূল লক্ষ্য কাহারও বিভিন্ন নয়। দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কর্ম-পদ্ধতি বিভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু উদ্দেশ্য যে এক, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কিবা বৌদ্ধধর্ম, কিবা জৈনধর্ম, উভয়ই সমভাবে ভারতের বিপত্তি-দূরীকরণে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উৎকর্ষ বিধানে, সহায়তা করিয়াছে। সে পক্ষে, যেমন বৌদ্ধধর্মের, তেমনই জৈনধর্মের কার্যকারিতা স্বীকার করিতে হয়। সেই সনাতন ধর্ম, সেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম, এই জৈনধর্মের ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যেও আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া কেমনভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক উন্নতি লাভন করিয়া গিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময়-বিমুক্ত হইতে হয়। ব্রাহ্মবংশে অনেকে জৈনধর্মকে ও বৌদ্ধধর্মকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিরোধী বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের এক দুর্দিনে, সমাজবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম কেমনভাবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিল, পরবর্তী সহস্রাব্দিক বর্ষের ইতিহাসে তাহা প্রত্যক্ষীভূত হয়। বাহাদেয় যুদ্ধদৃষ্টি ইতিহাসের সেই স্তরে নিপতিত, তাঁহাদের সকল ভ্রম নিশ্চয়ই দূরীভূত। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়েই যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অঙ্গীভূত, যুদ্ধদর্শিগণ স্বতঃই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইয়াছিল, যে জৈনধর্ম বিচ্ছিন্ন-ভাবে স্থানবিশেষে আশ্রয়-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল; সেই দুই ধর্ম যে সনাতন হিন্দুধর্মের—ভারতীয় হিন্দু, বৌদ্ধ-জৈন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অঙ্গীভূত, কিছুকাল পূর্বে অনেকে এ কথা বিশ্বাস করিতে সক্ষম হইতেন। বিশেষতঃ, মূলধর্মে অনেক সময়ে বিরুদ্ধি সম্বন্ধ। সম্ভবতঃ হওয়ায়, সহজদৃষ্টির সম্মুখে ঐ সকল ধর্ম পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। অথচ, উহার একই মহান্ মহীকহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাণ-স্থানীয়। বিষয়টা বোধগম্য হইলে, বহু বিরোধ-বিতণ্ডা বিদূরিত হয়। সুতরাং এতৎপ্রসঙ্গে প্রথমে আমরা সনাতন হিন্দুধর্মের সহিত জৈন-ধর্মের ও বৌদ্ধধর্মের সম্বন্ধ-তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি। পরে ঐ দুই ধর্ম কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আর তদ্বারা ভারতের প্রতিষ্ঠা কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা আলোচনা করা যাইবে। ভারতীয় ধর্মমত-সমূহের সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিষয় পূর্বে পূর্বে খণ্ড “পৃথিবীর ইতিহাসে” কিছু কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে। * এক্ষণে তৎসংক্রান্ত কয়েকটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যাইতেছে। ত্রিবিধ কারণে একের সহিত অন্তের সাদৃশ্যের—এক হইতে অন্তের উদ্ভবের বিষয় বোধগম্য হয়। প্রথম,—লক্ষণ (মৌলিক তত্ত্ব)। ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই বা লক্ষণ কি, আর জৈন-বৌদ্ধাদি ধর্মেরই বা লক্ষণ কি, তাহা অনুধাবন করিলে, পরস্পরের সম্বন্ধ-তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। দ্বিতীয়,—বিশেষ বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান। এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের আচার-ব্যবহার-পদ্ধতির সহিত অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের

† “পৃথিবীর ইতিহাস” তৃতীয় খণ্ডের প্রথম ও তৃতীয় প্রকৃতি পরিচ্ছেদে এবং পঞ্চম খণ্ডে এতদ্বিধার সম্বন্ধ আলোচনা করা হইয়াছে।

আচার-ব্যবহার পদ্ধতি-প্রভৃতির কিরূপ সাদৃশ্য আছে, তাহা বুঝিতে পারিলেও পরস্পরের সম্বন্ধ বোধগম্য হইয়া থাকে। তৃতীয়,—নীতি ও উপদেশ-পরস্পরা। নীতি ও উপদেশের একা দেখিয়াও পরস্পরের সম্বন্ধ খাপন করা যায়। এ ভিন্ন, আরও যে সকল কারণে বিভিন্ন ধর্মের সম্বন্ধ স্থচিত হয়, তাহার মধ্যে দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতির বিবিধ প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইতে পারে। যাহা হউক, সেই সকল কারণের কি কি কারণে আমরা ঐ তিন ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান দেখি, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তাহার একটু আলোচনা করিব।

বিভিন্ন পণ্ডিতগণ ধর্মের বিভিন্ন-রূপ বিভাগ বা লক্ষণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের—সনাতন হিন্দুধর্মের—প্রধানতঃ দুইটা লক্ষণ বা বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। (১) প্রবৃত্তি-লক্ষণ; (২) নিবৃত্তি-লক্ষণ। প্রবৃত্তি-ধর্মের লক্ষণ আলোচনায় মার্গ ও নিবৃত্তি-মার্গ অভিধায়েও উহা অভিহিত হয়। কেহ কেহ একা।

আবার ঐ লক্ষণ বা বিভাগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয় ভাবমূলক তৃতীয় লক্ষণের নির্দেশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক ধর্মের অর্থ উপলব্ধি করিলেই বিভাগাদির সার্থকতা বুঝা যায়। মহর্ষি মনু প্রবৃত্তি-মূলক ও নিবৃত্তি-মূলক ধর্মের (ধর্মের) এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

‘স্বখাত্মাদয়িকশ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ। প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কৰ্ম্ম বৈদিকম্॥

ইহ চামৃত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কৰ্ম্ম কীর্ত্তাতে। নিষ্কামং জ্ঞানপূৰ্ব্বকং নিবৃত্তমুপদিশতে॥

প্রবৃত্তং কৰ্ম্মসংসেবা দেবানামেতি সামাত্মা। নিবৃত্তং সেবমানস্ত ভূতাত্তেতি পঞ্চবৈ॥”

অর্থাৎ,—‘বৈদিক কৰ্ম্ম যতিষ্টোমাদি যজ্ঞ দুই প্রকার—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কৰ্ম্মফলে সুখ ও অভ্যাদয়াদি লাভ হয় এবং নিবৃত্ত কৰ্ম্মফলে মুক্তিলাভ হয়। ইহলোক সম্বন্ধে অথবা পরলোক-সম্বন্ধে কোনও কামনা করিয়া যে কৰ্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রবৃত্ত কৰ্ম্ম বলে; কিন্তু জ্ঞানপূৰ্ব্বক নিষ্কাম যে কৰ্ম্ম, তাহাকে নিবৃত্ত কৰ্ম্ম বলে। প্রবৃত্ত কৰ্ম্মের সমাক্ষ অমুষ্ঠানে দেবতাদিগেরও সমান হওয়া যায়। আর নিবৃত্ত-কৰ্ম্মাভ্যাসে পঞ্চ-ভূতকে অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়।’ বৈদিক কৰ্ম্মানুষ্ঠান-প্রসঙ্গে মহর্ষি মনু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মূলক কৰ্ম্ম-সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেন, তদ্বারা ঐ দুইয়ের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। কাম্যকৰ্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক আর নিষ্কাম কৰ্ম্ম নিবৃত্তি-মূলক,—মনুর উক্তিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারি। তদনুসারে প্রবৃত্তি-মূলক ধর্মই বা কি, আর নিবৃত্তি-মূলক ধর্মই বা কি, তাহাও নির্দিষ্ট হয়। এ মতে, এই দুই বিভাগের বহির্ভূত কৰ্ম্ম—ধর্ম-মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু যাহারা তিন ভাগে ধর্ম-লক্ষণ নির্ধারণ করেন, তাঁহাদের মতে, লক্ষণত্রয়—(১) প্রবৃত্তিমূলক, (২) প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মূলক, (৩) নিবৃত্তি-মূলক। প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম—একমাত্র কামনার ভূমিসাধন উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ,—যাহারা লোকালোক স্বীকার করেন না, ইহলোকের সুখকে একমাত্র সুখ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা প্রবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত ধর্মের অনুসরণকারী। এ মতে অন্তঃক্ষেপের চার্মাকাদি এবং পাশ্চাত্যের এপিকিউরাস্ প্রভৃতি প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বী; নামাস্তরে নাস্তিক্যবাদী। ইহাদের মত এই যে,—‘দেহ ভস্মীভূত হইলে আর কিরিয়া আসিবে না ;

সুতরাং; যত দিন বাঁচ, সুখ করিয়া লও ; ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করা । * ইহারা আরও বলেন,—‘সুখের অমুসরণে যদি কষ্ট পাইতেও হয়, তাহাও স্বীকার ; কিন্তু সুখের চেষ্টা করিতেই হইবে ।’ দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহারা বলেন,—‘বিষয়সম্ভ্রমজাত সুখ দুঃখমিশ্রিত বলিয়া কদাচ পরিভ্রান্ত্য নহে ; সুখেরাই সে কথা বলিয়া থাকে । ভূষকণাচ্ছাদিত ধাতু সিন্ধোত্তম উৎকৃষ্ট তত্ত্বপূর্ণ থাকে । কিন্তু ভূষাচ্ছাদিত বলিয়া কেহ কি তাহাকে পরিত্যাগ করে ?’ কথা,—

“তাজাং সুখং বিষয়সম্ভ্রমজন্ম পুংসাং দুঃখোপস্থষ্টমিতি মুখবিচারনৈষা ।

ব্রীহিন্ জিহাসতি সিন্ধোত্তমতণ্ডুলাঢ্যান্ কো নাম ভোক্তব্যকণোপহিতান্ হিতার্থী ?” এই প্রকার বহু উৎকট উক্তি এই সম্ভ্রমায়ের প্রবচন-রূপে পরিব্যক্ত হইয়া থাকে । কাঁটা দেখিয়া মৎস্তভক্ষণে বিরত হওয়া বাতুলের কার্য্য । ইহাও ইহাদের উপদেশ । নিবৃত্তমূলক ধর্ম্মের পরিচয় নিকাম কর্ম্মের আলোচনার গীতোক্ত ধর্ম্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি । যোগী মহাপুরুষগণই নিবৃত্তিমার্গের আদর্শস্থানীয় । ত্রীকুণ্ডে নিবৃত্তি-ধর্ম্মের—নিকাম কর্ম্মের—পূর্ণক্ষুতি দেখিতে পাই । মহাযোগী মহেশ্বর নিবৃত্তিধর্ম্ম পালনের এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । তাহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মূলক তৃতীয় লক্ষণের নির্দেশ করেন, তাঁহার নিবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত পুরুষকে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন । তাঁহাদের মতে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মধ্যপথাবলম্বী জনগণ বৈদিক ধর্ম্মের অনুসরণকারী, অর্থাৎ স্বর্গাদিলাভের জন্ত যে যাগযজ্ঞানুষ্ঠান, তাহা ঐ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয় লক্ষণাক্রান্ত । এ মতে, সংসারবন্ধনছিন্নকারী পুরুষগণই নিবৃত্তি-পন্থী । মহর্ষি মহু বৈদিক কল্পানুষ্ঠানকে যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, সেই দুই ভাগের এক ভাগকে এ ক্ষেত্রে ‘প্রবৃত্তি-মূলক কর্ম্ম’ না বলিয়া প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমূলক কর্ম্ম’ বলা হইয়াছে । ফলতঃ, মহু বাহাকে ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য করেন নাই, তাহা প্রবৃত্তি-পর্যায়ভুক্ত এবং তৎকথিত প্রবৃত্তি ধর্ম্ম এস্থলে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মধ্যধর্ম্মরূপে নির্দিষ্ট ।

পূর্বে যে দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ ধর্ম্ম-লক্ষণ বিবৃত হইল, বুদ্ধদেব উহার কোন্ লক্ষণের অনুসরণ করিয়াছিলেন ? তাঁহার জীবনবৃত্ত আলোচনার নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায় যে,

তিনি কখনই চার্ব্বাকদিগের জ্ঞায় ঐহিক সুখের অভিলাষী ছিলেন না ।
বুদ্ধদেব
নিবৃত্তিনির্গাবলম্বী । ‘ঋণ করিয়া ঘৃত পান’ নীতির অনুসরণ তো দূরের কথা ; তিনি অতুল

রাষ্ট্রৈশ্বর্য্য অবহেলার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন । সুতরাং তাঁহাকে কখনই প্রথমোক্ত পর্য্যায় গণ্য করা যায় না । দ্বিতীয় পন্থাবলম্বী বলিয়াও তিনি অভিহিত হইতে পারেন না । কেন-না, যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠানে তাঁহাকে কখনই নিরত দেখিতে পাই নাই । তিনি সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণকারী ছিলেন । হিন্দুশাস্ত্র যে মার্গের উপযোগিতার বিষয় উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন ; আমীদের শাস্ত্রগ্রন্থে যে মার্গের প্রকৃষ্টতা তারত্বের বিবোধিত হইয়াছে, একটু অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়, বুদ্ধদেব সেই পন্থেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন । ভারতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নিবৃত্তি-মার্গের—নিকাম কর্ম্মের প্রাধান্ত্য কোথায় না পরিকীৰ্ত্তিত ? বেদে, উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, তন্ত্রে,

ইতিহাসে, উপাখ্যানে সর্বত্র নিবৃত্তি-ধর্মের প্রশংসা কীর্তিত হইয়াছে। কামনা-নাশে, তুষ্কার মূলোচ্ছেদ-সাধনে, জ্ঞানদ্বেষণে বুদ্ধদেব জীবন-বাণন করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এ কি আর অভিনব দৃষ্টান্ত? সন্ন্যাস-মূলক ধর্ম হইলেও তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই অঙ্গীভূত; জ্ঞানমূলক ধর্ম হইলেও তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ব্রাহ্মণ্য-ধর্মেরই অঙ্গীভূত। ললিতবিস্তরে দেখি, তিনি গুণিতেছেন—সংসারের আর্তনাদ; তিনি দেখিতেছেন,—সংসারের জালা-মালা, সংসারীর অনিত্যতা, চতুর্দিকের প্রলোভন এবং জন্ম-জরা-মরণের বিভীষিকা। তাঁহার কর্মে তৎসমুদায়ের প্রতিকার চেষ্টাই প্রতীক্ষীভূত হয়। তিনি যে ভাবে যে দৃশ্য দর্শন করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, শাস্ত্র-গ্রন্থে সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। (ললিতবিস্তরে প্রকাশ) তিনি দেখিতেছেন,—

“জলিতং ত্রিভবং জরব্যাধিহুঃখৈর্মরণাগ্নিপ্রদীপ্তমনাথমিদং ।

ন চ নিঃসরণে সদমৃত জগদ্ব্রমতি ভ্রমরো যথ কুণ্ডগতো ॥

অত্রবং ত্রিভবং শরদভ্রনিভং নটরঙ্গসমা জগি জন্ম চ্যুতি ।

গিরিনিঃসৃত স্রুতগতি নদীর জায় অথবা আকাশে বিছাড়া জগজ্জনের

আরু ক্ষয় পাইতেছে। কি পৃথিবীতে, কি দেবপুরে, কি ত্রিবিধ ধ্বংসের পথে, ভবতৃষ্ণা

অবিভার বশে কুন্ডকারের চক্রের জায় ভ্রাম্যমাণ মানুষ, পঞ্চবিধ অগতি প্রাপ্ত হইয়া, ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে। প্রিয়রূপবরে মনোহর শব্দে স্নগন্ধরসস্পর্শস্বথে পরিবৃত্ত হইয়া জগৎ কলিপাশে

আবদ্ধ হইতেছে। প্রলুদ্ধক মৃগ যেমন ব্যাধের জালে আবদ্ধ হয়, জগজ্জনের সেই অবস্থা।

মরণভীতিপ্রদ ও পরম বৈর কামনা বহু শোকের উপদ্রবের হেতুভূত; উহা অসিধারা

সমা ও বিষবস্ত্রনিভা পরিত্যাজ্য। হিতাকাঙ্ক্ষী আর্ঘ্যগণ বেক্রপ অপবিজ্ঞ বটকে দূরে নিক্ষেপ

করেন, কামনাও সেইরূপ পরিত্যাজ্য। উহার স্মৃতি শোকজনক। উহা মহাপকারী,

ভীতি-উৎপাদক, এবং সঙ্গ হুঃখের মূল। উহাতে ভবতৃষ্ণার বৃদ্ধি করে, উহাতে

যথ অগ্নিধন্য জলিতাঃ সত্যাঃ তথ কাম ইমে বিদিতাৰ্য্যাজনৈঃ ।

মহাপঙ্গমা অসিসিঙ্কুসমা মধুদিগ্ধ ইব ক্ষুরধার যথা ॥”

অর্থাৎ,—‘জরা-ব্যাধি-হুঃখের মরণাগ্নিতে প্রদীপ্ত এই অনাথ ত্রিভুবন জলিতেছে। কুন্ডগত ভ্রমরের জায় নিঃসরণে অসমর্থ মৃত জগৎ ভ্রাম্যমাণ। ত্রিভুবন শরদভ্রনিভ অত্রব; জগতের জন্মমৃত্যু নটরঙ্গসম। গিরিনিঃসৃত স্রুতগতি নদীর জায় অথবা আকাশে বিছাড়া জগজ্জনের আরু ক্ষয় পাইতেছে। কি পৃথিবীতে, কি দেবপুরে, কি ত্রিবিধ ধ্বংসের পথে, ভবতৃষ্ণা অবিভার বশে কুন্ডকারের চক্রের জায় ভ্রাম্যমাণ মানুষ, পঞ্চবিধ অগতি প্রাপ্ত হইয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রিয়রূপবরে মনোহর শব্দে স্নগন্ধরসস্পর্শস্বথে পরিবৃত্ত হইয়া জগৎ কলিপাশে আবদ্ধ হইতেছে। প্রলুদ্ধক মৃগ যেমন ব্যাধের জালে আবদ্ধ হয়, জগজ্জনের সেই অবস্থা। মরণভীতিপ্রদ ও পরম বৈর কামনা বহু শোকের উপদ্রবের হেতুভূত; উহা অসিধারা সমা ও বিষবস্ত্রনিভা পরিত্যাজ্য। হিতাকাঙ্ক্ষী আর্ঘ্যগণ বেক্রপ অপবিজ্ঞ বটকে দূরে নিক্ষেপ করেন, কামনাও সেইরূপ পরিত্যাজ্য। উহার স্মৃতি শোকজনক। উহা মহাপকারী, ভীতি-উৎপাদক, এবং সঙ্গ হুঃখের মূল। উহাতে ভবতৃষ্ণার বৃদ্ধি করে, উহাতে

পর্যাপ্তজন নিরন্তর ভীতিবিহ্বল থাকে। উহাকে প্রজ্জলিত অগ্নি-কুণ্ডলং ভরাবহ জানিয়া আর্ঘ্যগণ সর্বদা সজ্ঞ থাকেন। কামনা—মহাপুরুষমা, অসিদ্ধিসম্পদা এবং মধুদীপ্ত ক্ষুরধারতুল্যা। এই যে দৈববাণী শুনিয়া বুদ্ধদেব নির্ঝাণ-পথের অমূল্যস্থানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এ বাণী কি হিন্দু-শাস্ত্রের সনাতন বাণী নহে? স্মৃতি অনিত্য, স্মৃতি-পদার্থ শরৎকালীন মেঘ-সদৃশ ক্ষণস্থায়ী, জীবন নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চ,—এ তত্ত্বজ্ঞান গৌতম-বুদ্ধের জন্মগ্রহণের বহু পূর্বেও প্রচারিত ছিল না কি? কামনা যে মুক্তি-পথের অন্তরায়; তুম্বাই যে সর্বনাশের মূল,—এ উপদেশই বা হিন্দু-শাস্ত্রের কোথায় না পরিদৃষ্ট হয়! ত্রিতাপের জ্বালা নিবারণের জন্তই তো, জন্ম-জরা-মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে পরিজ্ঞাপ করিবার জন্তই তো, বেদ, উপনিষৎ, দর্শন প্রভৃতির প্রবর্তনা! ত্রিতাপের জ্বালা নিবারণের জন্তই তো, সাম্য নিঃশ্রেয়স পথ অমূল্যস্থান করিয়াছেন; নৈমায়িকগণ জন্ম-নিবারণের উপায় অন্বেষণ করিতেছেন! পতঞ্জলির যোগ-দর্শন অথবা মীমাংসকগণের মীমাংসা-প্রক্রিয়া ঐ একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত নহে কি? মায়াময় সংসারের ময়া-প্রহেলিকা ছিন্ন করিয়া বেদান্ত যে আত্মজ্ঞানের স্বরূপ-তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাই বা কি? সেই হৃৎ, সেই হৃৎপথের কারণ, সেই হৃৎ-নিবৃত্তি, সেই হৃৎ-নিবৃত্তির উপায়,—এই যে চারি আর্ঘ্য-সত্য বুদ্ধদেব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; তাহার কোনটাই নূতন নহে। ত্রিতাপের যে জ্বালা নিবারণের জন্ত বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন; যে জলন নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে দিকে দিকে আবশ্যকানুরূপ জলনিষেক ব্যবস্থিত হইয়াছে; তাহা ভিন্ন বুদ্ধদেব নূতন কোনও শাস্ত্রের নিবন্ধ উন্মুক্ত করেন নাই। যাহা ছিল, অথচ দৃষ্টিপথের অন্তরালে অন্ধকারে অচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; তাহাই তিনি আবিষ্কার করেন। যে নিবৃত্তি-মার্গের নিকাম কর্মের উপযোগিতা পুনঃ পুনঃ কীর্তিত হইয়া আসিয়াছে; বুদ্ধদেব যখন আবির্ভূত হন, তখন সে নিবৃত্তি-পথ একরূপ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল; অধিকন্তু প্রবৃত্তি-মার্গের প্রশস্ততা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। নাস্তিক্য-বাদ সংসারকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছিল। সুতরাং সে সময়ে নিবৃত্তিমার্গের সংস্কারসাধনোদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের মর্ত্যে অবतरণ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-সাধন উদ্দেশ্যে মাত্র লক্ষ্য করিয়া মানুষ তখন যে সকল ক্রিয়া-কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছিল; তদ্বারা সমাজ-মধ্যে বিষম বিপ্লব-ব্যভিচার সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ফলে, যে জ্বালা নিবৃত্তির জন্ত কর্ম্মস্থলান আরম্ভ হইয়াছিল, সেই জ্বালাই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সুতরাং সে অবস্থায় আবার একবার নিবৃত্তি-ধর্মের প্রবর্তনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, শ্রীভগবান সেই আবশ্যকতা পূরণ বা অভাব দূর করেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম যে সনাতন হিন্দুধর্মেরই অঙ্গীভূত, তাহা বলাই বাহুল্য। বুদ্ধদেব সনাতন হিন্দুধর্মের অমূল্যস্বরণকারী ছিলেন। সন্ন্যাস-প্রথা চিরদিনই উন্মুক্ত ছিল। সুতরাং সন্ন্যাস-পথ অবলম্বন করিয়া তিনি সেই চিরন্তন প্রথারই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রবর্তিত ভিক্ষুর ধর্মও যাহা, নিকামকর্ম্মী সন্ন্যাসীর ধর্মও তাহাই। সন্ন্যাসী ও ভিক্ষু শব্দদ্বয় একই অর্থবাচক। হিন্দুর যে চতুষ্রায়—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস,—

ভাহারই সন্ন্যাস বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষু। * নান-সংস্কার ইতর-বিশেষে কি আসে যায়, বস্ত্র-পক্ষে যখন একই সামগ্রী ব্যবহার থাকে। নিবৃত্তিবার্গাবলম্বী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে বহু সম্প্রদায় বহুভাবে মুক্তিপথ অনুসন্ধান করিয়া ক্রিান্তেছেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদেরই মধ্যে এক প্রকৃষ্ট পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন। ফলতঃ, লক্ষণ বিবরণ বিচার করিতে গেলে, পরস্পরের মধ্যে কোনই বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। তাঁর পর সকল জাতি নিবৃত্তিরূপেই নির্বাণ অবস্থা, তাহাও অভিনব নহে। নির্বাণও বাহ্য, মুক্তিও তাহা; নিঃশ্রেয়স্, কৈবল্য প্রভৃতি সকলই অভিন্ন। † সুতরাং সর্বত্রই সনাতন পুরাতনেরই প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

লক্ষণ-বিচারে যেমন পরস্পরের মধ্যে অভিন্ন ভাব দৃষ্ট হয়, বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধান এবং আচার-অনুষ্ঠানেও সে ঐক্য দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থে যে আদি অনুষ্ঠান—ত্রিশরণ গ্রহণের পর যে দশশীল বা দশবিধ সঙ্কল্প, তাহা মজ্জ-আচার-অনুষ্ঠানে ঐক্য। কথিত দশধর্ম বা দশ-পাপের অনুসৃতি ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। ‡

মহর্ষি মজ্জ দশবিধ ধর্মের বিষয় বাহ্য বলিয়াছেন এবং দশবিধ পাপের বিষয় বাহ্য খ্যাপন করিয়াছেন, বৌদ্ধধর্মাস্তর্গত দশশীল তাহারই প্রকারান্তর মাত্র। § ষষ্ঠধর্ম-গ্রন্থোক্ত দশবিধ আত্মাও মজ্জর মতের সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। ** সাধারণভাবে যেমন বিধি-বিধানের ঐক্য দেখি, বিশেষ বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানেও সেই ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধগণের মধ্যে একটা প্রথা আছে যে, তাঁহারা আপনাদের কৃত পাপের বিষয় প্রতি অবসান্ধার ও পূর্ণিমার ভিক্ষুসম্মেলনের সমক্ষে ব্যক্ত করেন। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস, তাহাতে পাপের ক্ষালন হয়। পক্ষান্তে সম্বৎসরী ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া আপনাপন পাপ-পুণ্য বিবৃত করিতে বলেন। সেই এক পক্ষের মধ্যে যদি কোনও ভিক্ষু পাপকর্ম করিয়া থাকেন,

কোথাও 'সন্ন্যাস', কোথাও 'যতি', কোথাও ভিক্ষু শব্দ শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। যথা, মঙ্গলসংহিতা,—

“ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বাণপ্রস্থো যতিত্তথা। এতে গৃহস্থবাস্তব্ধারঃ পৃথগাজ্ঞনঃ ॥”

অন্তত্র,—“ব্রহ্মচর্য্য গাহ'হ্যনু বাণপ্রস্থম্ সন্ন্যাসঃ।”

অন্যত্র,—“ব্রহ্মচারী গৃহী বাণপ্রস্থ ভিক্ষু।”

অতএব সন্ন্যাস, যতি ও ভিক্ষু যে একই ভাবাপন্ন মনুষ্যকে বুঝাইতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

† ‘পৃথিবীর ইতিহাস’ পঞ্চম খণ্ডে নির্বাণ প্রসঙ্গে নির্বাণ অবস্থার সহিত সূত্র অবস্থা প্রভৃতির সাদৃশ্য বিষয়ক আলোচনা প্রদেয়া।

‡ ‘পৃথিবীর ইতিহাস’, তৃতীয় খণ্ডে ১১০ পৃষ্ঠায় এ সকল বিষয়ের আলোচনা দেখুন। ‘পৃথিবীর ইতিহাস’, পঞ্চম খণ্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠায় ত্রিশরণ গ্রহণের ও দশ সঙ্কল্পের বিষয় কথিত হইয়াছে।

§ বিনয়-পটিকে দশশীল সম্বন্ধে বাহ্য লিখিত আছে, মহাবান সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদিতে (প্রজ্ঞা-পারমিতা অষ্টসাংস্রিকা, মহাবজ্র অবলম্বন প্রভৃতিতে) তাহার একটু রূপান্তর দেখা যায়। তদনুসারে (১) প্রাণাতিপাত, (২) অদভাদান, (৩) কামেনু মিথ্যাচার, (৪) হন্যমৈয়ের মদ্যপান, (৫) ক্রুরবাদ, (৬) পিণ্ডন বাক, (৭) সত্ত্বের প্রলাপ, (৮) অতিথ্যা, (৯) দ্ব্যাপাদ, (১০) মিথ্যাদৃষ্টি,—এই দশ কাণ্ডো বিরচিত দশশীল। ফলতঃ, পার্থক্য নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে।

** মঙ্গলসংহিতার বঠ অধ্যায় ১১-১৪ স্তোক এবং দ্বাদশ অধ্যায় ৫৫-৫৭ স্তোক প্রভৃতির সহিত বাইবেলের অন্তর্গত এক্সোডাস (Exodus, Ch XX. 3—17) বিংশ অধ্যায় প্রভৃতির বর্ণনার সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হয়।

তিনি তাহা প্রকাশ করেন। কচিং কোনরূপ পাপ করিয়া সজ্জনের সমক্ষে প্রকাশ করিলে, সে পাপ যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়,—বৌদ্ধগণের ইহাই প্রধান বিশ্বাস। যিনি নিম্পাপ বলিয়া আপনাকে মনে করিতে পারেন, তিনি নীরব থাকেন। অনেকে মনে করেন, এবম্বিধ পাপ-ক্ষালন প্রথা বৌদ্ধগণের নিজস্ব। পাত্তি-মোক্খ (প্রাতিমোক্খ) পাঠের বিধি এই উদ্দেশ্যেই বিহিত দেখি। কিন্তু খ্যাপনে যে পাপের ক্ষয় হয়, মহর্ষি মনু বহু পূর্বে তাহা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে মনুর উক্তি ; যথা,—

“খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যায়নেন চ। পাপক্লম্ব্যুচ্যতে পাপং তথা দানেন চাপদি ॥

যথা যথা নরোহধর্মং স্বয়ং কৃত্বানুভাষতে। তথা তথা স্বচেবাহিস্তেনাধর্মেন মুচ্যতে ॥

যথা যথা মনস্তত্ত্বং হৃদ্যতং কর্ম্যং গর্হত। তথা তথা শরীরং তৎ তেনাধর্মেন মুচ্যতে ॥

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাং প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্যাৎ পুনরিত্তি নিবৃত্ত্যা পুণ্যতে তু সঃ ॥”

অর্থাৎ,—“লোকসমাজে নিজের পাপজ্ঞাপন, পাপের জন্ত অমৃত্তাপ, তপস্তা এবং অধ্যয়ন দ্বারা পাপকারী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, এবং আপৎপক্ষে দানের দ্বারাও পাপের নিষ্কৃতি হয়। পাপ করিয়া পাপী স্বয়ং যে পরিমাণে লোক সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়, সর্প যেমন নির্দোষকমুক্ত হয়, তেমনি সেও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ; এবং যে পরিমাণে সেই পাপকারীর মন হৃদ্যত কর্ম্মকে নিন্দা করিতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহার জীবাত্মাও হৃদ্যত হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। পাপ করিয়া যদি সন্তাপ উপস্থিত হয়, তবে সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পরন্তু পুনর্বার আর একরূপ করিব না—এ বলিয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে—তবে সে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়।” সুতরাং বুঝিতে পারি, পাপ-খ্যাপন বিষয়েও বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অনুসারী। কেবল বৌদ্ধধর্মই বা বলি কেন? খৃষ্টধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও পাপ-খ্যাপনে, পাপক্ষালনের বিষয় উক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম-বাজকের নিকট কৃত পাপের বিষয় গোপনে জ্ঞাপন করিলে, পাপ ক্ষয় হয়,—রোমানক্যাথলিক সম্প্রদায়-ভুক্ত খৃষ্টানগণের এইরূপ বিশ্বাস আছে। মনু পাপ-খ্যাপনে কোনরূপ গভী নির্দেশ করেন নাই। বৌদ্ধগণের পিটক গ্রন্থ সজ্জভুক্ত ভিক্ষুগণের মধ্যে মাত্র সে কথা প্রকাশ করিতে উপদেশ দিলেন। খৃষ্টধর্ম গ্রন্থ বাইবেলে সে পাপ খ্যাপন প্রথা অধিকতর সীমাবদ্ধ হইয়া আসিল ; বাইবেল কেবলমাত্র প্রধান ধর্মবাজকের নিকট সে কথা প্রকাশ করিতে উপদেশ দিলেন। এতদ্বারা এক আদি-ধর্ম হইতে—সনাতন হিন্দুধর্ম হইতে—যে অস্ত্রাস্ত্র ধর্মের উপাদান-সমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা স্বতঃই অমুমিত হইয়া থাকে।

সত্য সর্বকালে সর্ব অবস্থায় সকল দেশেই অভিন্ন। অগ্নির দাহিকাশক্তি, জলের শৈত্যভাব অথবা লৌহ-প্রস্তরাদির কাঠিন্য, কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া যিনি ধারণা করেন, তিনিই ভ্রান্ত বা

সনাতন
এক হইতে।

বিকারগ্রস্ত বলিয়া অভিহিত হন। ধর্মমতের পরস্পর সাদৃশ্য দেখিয়া

সুতরাং যাহা আদিভূত তাহারই প্রাধান্য মাত্র করিতে হয়। অতএব

কিবা বৌদ্ধধর্ম, কিবা খৃষ্টধর্ম, কিবা অস্ত্রাস্ত্র ধর্ম যে সকল সদ্ভাব, সন্নীতি বা সত্য-তত্ত্ব

প্রচারিত হইতে দেখি, তাহার সহিত তৎপূর্ববর্তী পুরাতন সনাতন হিন্দুধর্মের ত্রৈক্য দেখিতে পাইলে, প্রথমোক্ত মত-সমূহকে শেখোক্তের সম্ভতিস্থানীয় বলিয়াই বিশ্বাস করি। বেদাভ্যুগত সনাতন হিন্দুধর্মের ক্রোড়ে যখন বৌদ্ধধর্ম উৎপন্ন পরিপুষ্ট হইল; অপিচ, যখন তাহার উদ্দেশ্য-লক্ষণ ও আচার-ব্যবহার প্রথমোক্তের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন প্রভীত হইল; তখন একের সহিত অস্ত্রের সম্বন্ধ-বন্ধনের বিষয় কখনই অস্বীকার করা যায় না! এই জগৎ শ্রীকৃষ্ণের-প্রোতিঃ যীশুখৃষ্টে প্রভাবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি; আর এই জগৎই পৌরাণোধ্য-জ্ঞানহীন অন্ধবিশ্বাসী কেহ কেহ যীশুখৃষ্টের প্রভাব শ্রীকৃষ্ণে দেখিতে পান। * কাহারও কাহারও মত আবার মধ্যপথাবলম্বী। তাঁহারা বলেন, প্রাকৃতিক সাম্যভাব হেতু অভিন্ন ভাব-প্রবাহ বিভিন্ন বিভাগে স্বতঃপ্রবাহিত হয়; অর্থাৎ,—একের

* বিভিন্ন ধর্মের সাদৃশ্য-তাই আলোচনার এক হইতে অস্ত্রের উৎপত্তি অসঙ্গ উৎথাপিত হয়; এবং তাহার বাদ-প্রতিবাদ চলিয়া থাকে ত্রৈক্য (Trinity), ত্রিমূর্তি, ত্রিতত্ত্ব, ত্রিশরণ প্রভৃতি যে একই পথায়-ভুক্ত, অনেকে তাহা স্বীকার করেন এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেনও না। অবতার বিষয়ে এবং পাগের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধেও এইরূপ মতান্তর আছে। একের সহিত অস্ত্রের সাদৃশ্য সম্বন্ধে, সে সাদৃশ্য কি ভাবে উপেক্ষিত হয়, খৃষ্টানদিগের এক-খানি গ্রন্থ হইতে তদ্ব্যয়ক করেণী মুক্তি এতলে উল্লেখ করিতেছি। সেই গ্রন্থে প্রকাশ—‘খৃষ্টানগণের যে ত্রৈক্য (Trinity), তাহা অতুলনীয়। অন্ত্যস্ত ধর্ম এই ত্রৈক্যে তিন ঈশ্বরের পরিকল্পনা; তদ্বারা বহু ঈশ্বরবাদ আসিয়া পড়ে। কিন্তু খৃষ্টধর্মে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অসম্ভাব। খৃষ্টধর্মে একেই ঈশ্বর—একেই তিনের সমাবেশ।’ এইরূপ অবতার সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেন,—কৃষ্ণের ও খৃষ্টের জীবনে ঘটনার অনেক সাদৃশ্য দেখিয়া, কেহ কেহ যে খৃষ্টে কৃষ্ণের অনুসরণ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাও ভ্রমসঙ্কুল। দুই কারণে সে ভ্রান্তি উপলব্ধি হয়। প্রথম খৃষ্টের জীবন-বৃত্ত লইয়া কৃষ্ণচরিত্র পরিকল্পিত; অর্থাৎ,—বাইবেলের বর্ণনা বিকৃত হইয়া কৃষ্ণচরিত্রে সমাবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যদি কেহ কৃষ্ণকে খৃষ্টের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলেও, কৃষ্ণের প্রভাব খৃষ্টের উপর পতিত হওয়া অসম্ভব। কেন-না, কৃষ্ণের জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে খৃষ্টের জন্মভূমি পালেস্টাইন বহু দূর জোশ দূরে অবস্থিত। অত দূরে কৃষ্ণের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। তার পর কৃষ্ণের যে সকল অলৌকিক-কার্য ও উচ্চ উপদেশ, তৎসমুদায় কুনীতি-সংসর্গ-দোষযুক্ত। কিন্তু বাইবেলে সে কলঙ্ক আর্দ্র নাই। লুক গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যীশু-খৃষ্ট একটা বিকৃতাকী নারীকে রূপসম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃজ্যাকে রূপসীতে পরিণত করেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার সচরিত্রতা প্রকাশ পায় নাই। এইরূপ অন্ত্যস্ত ঘটনাতেও, কৃষ্ণের ও খৃষ্টের জীবনের সাদৃশ্য থাকিলেও, কৃষ্ণ অপেক্ষা খৃষ্টের নৈতিক উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। মানবের হিতসাধনে ঈশ্বরের অযত্নের বিষয় সকল দেশে সকলেই কোনও-না-কোনরূপে অনুভব করেন। অলৌকিক ভাবে বাধিমুক্তি, আশাভীত হৃৎসম্পত্তি-প্রাপ্তি প্রভৃতি ঈশ্বরের কল্পিত অবতারের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অন্ত্যস্ত তৎসমুদয় সন্নীতির অন্তরায়ভূত; কিন্তু যীশুখৃষ্টে সর্বপ্রকার কলুষতাশূন্য। এ মতে, একমাত্র যীশুখৃষ্টই অবতার (Incarnation) মধ্যে পরিগণিত। তার পর পাগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে যীশুখৃষ্টের সহিত সাদৃশ্য গ্রন্থকার অস্তু কোথাও দেখিতে পান নাই। তিনি বলেন,—মধ্যযুগে পাগতার গ্রহণের দৃষ্টান্ত এক যীশুখৃষ্টেই আছে। প্রাচীনের মধ্যে তজ্জপ প্রসঙ্গ বাবিলনের ইতিহাসে এবং মিশরের ইতিহাসে যদিও দৃষ্ট হয়; কিন্তু তাহা খৃষ্টের জোতিঃের নিকট সম্পূর্ণ পরিমল। বাবিলোনীয়ায় ইয়া (Ea) নামক পরমেশ্বর এবং তাঁহার পুত্র মোরোডাক্ (Morodach) প্রসিদ্ধ। মনুস্বায় এবং ঈশ্বরের মধ্যবর্তী-রূপে ঈশ্বরপুত্র সেই মোরোডাক্ (Morodach), মনুস্বায় প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন। অর্থাৎ,—মনুস্বায়গণ তাঁহার নিকট যে প্রার্থনা করিতেন, পিতা পরমেশ্বরকে তাহা জানাইতেন। এক হিসাবে, যীশুখৃষ্ট বৈরাগ্য ঈশ্বরের এবং মনুস্বায়ের মধ্যবর্তী ছিলেন, মোরোডাক্ও সেইরূপ। প্রাচীন মিশরের হোরাস্ (Horus) দেবতার পৌরাণিক কাহিনী যীশুখৃষ্টের জীবন-বৃত্তের সহিত আরও যেন অধিক সাদৃশ্য-

ভাবস্করণে অস্ত্রের ভাবস্কৃতির অপেক্ষা রাখে না। এ সিদ্ধান্ত অনেক পরিমাণে যুক্তিসূক্ত বলিয়া প্রতীত হইলেও, সকলেই যখন এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করেন; আর সকলেই যখন তাঁহাকে সংস্বরূপ সনাতন বলিয়া নির্দেশ করিয়া আসিতেছেন; তখন যেখানে যে কিছু সত্য-তত্ত্ব নিষ্কাশিত হইতেছে, সকলেরই মূল যে তিনি—সেই এক, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যদেব; সকল জ্যোতিঃ তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে; স্মৃতরাং সকল জ্যোতিঃই তাঁহার অঙ্গীভূত। অথবা সে যেন পূতগন্ধোদক,—কেহ মৃৎপাত্রে রাখিয়াছে; কেহ তাম্রপাত্রে পূরিয়াছে; কেহ কাংস্তহিরণ্ময় পাত্রে ঢালিয়াছে। সেই একই সনাতন সত্যধর্ম,—দেশবিশেষে, সমাজবিশেষে, জাতিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকট রহিয়াছে। অথচ, ভ্রান্তিপথে মানুষ্য মনে করে, আমার ধর্মমতের অস্ত্রে অনুসরণ করিয়াছে। গোঁড়া খৃষ্টানগণ এবং তাঁহাদের অনুসরণকারিগণ তাই মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণে খৃষ্টের অনুসরণ; তাই কেহ বা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে বুদ্ধদেবকে ও বৌদ্ধধর্মকে ইরাণের ও জোরওয়ারাঠার

সম্পন্ন। প্রাচীন মিশরের পরমেশ্বরের নাম ওসিরিস্ (Osiris)। হোরাস্ (Horus) তাঁহার একমাত্র পুত্র। মানুষ্যগণের পৃথিবীতে আসিবার অনেক পূর্বে, তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অনায়েয় উপর স্ত্রায়ের আধাশ্রম বিস্তারে, অসত্যের আধারে সত্যের আলোক বিকীরণে এবং বাহ্য কিছু উচ্চ সম্ভাব-সম্পন্ন, তৎকার্যের অনুষ্ঠানে তিনি ধরাধামে আসিয়াছিলেন। মানবজাতির সম্বন্ধে তিনি মুক্তিদাতা ও স্ত্রায়-পথ-প্রদর্শক বলিয়া কথিত হন। মৃত্যুর পর আত্মা বিষম পরীক্ষা-ক্ষেত্রে পতিত হন। হোরাসের সাহায্যে সেই বিপদ-পারাবার হইতে আত্মা উত্তীর্ণ পায়। অবশেষে ওসিরিসের সম্মুখে আত্মা বিচারার্থ আনীত হইলে সদাশ্রয় মুক্তির ক্ষমতা হোরাস্ মধ্যস্থতা করেন। এ বিষয়ে যেমন যীশুখৃষ্টের কার্যের সহিত তাঁহার কার্যের সাদৃশ্য দেখি, তাঁহার উপাধি সম্বন্ধে সে সাদৃশ্য আরও অধিক বলিয়া বুঝিতে পারি। তিনি ঈশ্বরের একমাত্র জাত পুত্র (Only begotten son of God), তিনি 'অনন্ত-স্বরূপ পিতার পুত্র' (The son of the Eternal father), তিনি ঈশ্বরের বাক্য (The word of God), তিনি 'কুমারীর পুত্র' (The son of a Virgin)। তাঁহার পিতা পরমেশ্বর—ওসিরিস; তাঁহার মাতা কুমারী—আইসিস্ (Isis)। ফলতঃ, যীশুখৃষ্ট যেমন ঈশ্বরের পুত্র এবং কুমারী মেরীর সন্তান; হোরাসেও পিতা-মাতা সেইরূপ।" বিস্ত্র এবমিধ সাদৃশ্য দেখিয়া গোঁড়া খৃষ্টানগণ বলেন,—'হোরাস চরিত্র মিশরীয়দিগের কল্পনা মাত্র। প্রাচীন মিশরীয়গণ ঈশ্বরের স্ত্রায়পরতার বিষয় সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছিল; মনুষ্যের অমরত্ব, তাঁহার দায়িত্ব এবং তাহার গাপ-প্রবণতা প্রভৃতি বিষয়ও তাহাদের অনুভূতিতে আসিয়াছিল। স্মৃতরাং তাঁহার আপনাদের পাপমুক্তি সম্বন্ধে ঋণাত্মক অনুসন্ধান করিয়াছিল। সেই অনুসন্ধানের ফলই তাহাদের মনে হোরাস দেবতার পবিত্র কল্পনা।' জল-বায়ু এবং জাতি-প্রকৃতির প্রভাব বশতঃ ধর্মের সমতা বা বিভিন্নতা সৃষ্টিতে পারে,—যাঁহারাই এই মতের পোষকতা করেন, তাহাদের উক্তির প্রতিবাদে ঐ শ্রেণীর খৃষ্টানগণ বলিয়া থাকেন,—'বাহ্য সত্য, তাহা সকল স্থলেই সত্য। আরবেই ইউক, আর তিব্বতেই ইউক, খৃষ্টধর্ম সর্বত্রই সমান। অভিজ্ঞ-জনের নিকট সত্য কখনই বিকৃত হয় না। যিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে প্রকৃত অভিজ্ঞ, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, পৃথিবী যে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহাই বলিবেন; সূর্য্য যে পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করিয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে, ইহা কখনই বলিবেন না।' যুক্তি সকল পক্ষেই আছে। তবে সত্য এক, জ্ঞান এক; স্মৃতরাং যেখানে যে ভাবেই তাহা বিকাশপ্রাপ্ত ইউক না কেন, এক হইতেই সকলের উদ্ভব, তাহা মানিতেই হইবে।

প্রবর্তিত ধর্মের অনুসরণকারী বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন না। অথচ, সামান্য একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, কোন্টী পূর্বের ও কোন্টী পরের, কোন্টী মূল ও কোন্টী শাখা, তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না।

নীতি ও উপদেশের সাদৃশ্য পৃথিবীর প্রায়ই সকল ধর্মের মধ্যেই দেখিতে পাই। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সে সাদৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত নাই। অনেকের বিশ্বাস, বুদ্ধদেব ঈশ্বর মানিতেন না। বুদ্ধদেব বেদ মানিতেন না, বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণগণের প্রতি বিদ্বেষা ছিলেন ;

নীতি ও
উপদেশে
সাদৃশ্য।

কিন্তু সে সকলই ভ্রান্ত বিশ্বাস। বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থ-সমূহ আলোড়ন করিলে,

ঐ সকল সংশয়ের অনায়াসেই মীমাংসা হয়। বুদ্ধদেবের উক্তি

সমূহকে এবং বৌদ্ধধর্মের নীতি-সমূহকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিলে এ বিষয়ের ভ্রম দূর হইতে পারে। প্রথম, ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের যে উক্তি দেখিতে পাই, তাহাতে অভিনব কিছুই নাই। মহাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধদেবে তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তাহাতে তাহার ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ আদৌ প্রতিপন্ন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, তাহার ঈশ্বর-স্বীকার ও বেদমাত্র করার প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, তিনি যে সকল নীতি-ভষ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রায় সকলই হিন্দু শাস্ত্রোক্ত নীতিকথার অনুসারী। একে একে এই ত্রিবিধ বিষয়ের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছি। ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উক্তি পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। মহর্ষি মনু ব্রাহ্মণের লক্ষণাদির বিষয়ে কি অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই দুই মত মিলাইয়া পাঠ করিলে, একের সহিত অন্তের যে পার্থক্য নাই, তাহা বেশ উপলব্ধি হইবে। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মহর্ষি মনুর উক্তি (মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়) ; যথা,—

“ন হ্যন্যনৈন পান্নিতৈন বিন্তেন ন বদ্ধতিঃ। ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্যং যোহনুচানঃ স নো মহান্ ॥
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যেষ্ঠং ক্ষত্রিয়ানস্ত বীৰ্য্যতঃ। বৈশ্যানাং ধান্তধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥
ন তেন বুদ্ধো ভবতি যেনাস্ত পলিতং শিরঃ। যো বৈ যুবাণ্যধীমানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদ্বঃ ॥
যথা কাস্তময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ। যশ্চ বিপ্রোহনধীমানস্তরস্তে নাম বিভ্রতি ॥
যথা যশোহফলঃ জীষু যথা গোর্গরি চাফলা। যথা চাজেহফলং দানং তথাবিপ্রোহনুচোহফলঃ ॥
অহিংসরৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রোয়োহনুশাসনম্। বাক্ চৈব মধুরা ব্রহ্মা প্রযোজ্য ধর্ম্মমিচ্ছতা ॥
যশ্চ বায়ননী শুদ্ধে সমাগ্গুপ্তে চ সর্ব্বদা। স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্ ॥
নাক্রুদ্ধদঃ স্তাদাভৌহপি ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ। যশাস্তোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ ॥
সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজতে বিবাদিব। অমৃতস্তেব চাকাজ্জৈবমানস্ত সর্ব্বদা ॥

অর্থঃ হবমত শেতে অথঞ্চ প্রতিবুদ্ধ্যতে। অর্থঃ চরতি লোকেহস্মিন্নবমস্তা বিনশ্চতি ॥

অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাস্মা দ্বিজঃ শটেনঃ। গুরো বসনসন্ধিমুদাদ্ ব্রহ্মাধিগমিকং তপঃ ॥”

অর্থঃ,—‘বয়সে, গুরু কেশে, ধনে কিম্বা সম্বন্ধে অথবা এতৎসমুদয় একত্র থাকিলেও বড় হওয়া যায় না। ঋষিরা এই ধর্ম্ম-নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন যে, যিনি সাদ্বেদবিত্ত, আমাদের মধ্যে তিনিই মহৎ পদবাচ্য। জ্ঞানের উপর ব্রাহ্মণদিগের জ্যেষ্ঠত্ব নির্ভর করে ; অধিক বীৰ্য্যশালী হইলে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হয় ; যিনি ধন-ধাজ্জে বড়, বৈশ্যদিগের

মধ্যে তিনি জ্যোষ্ঠ; আর অগ্রগণ্যতা জন্মবিবেচনার যে জ্যোষ্ঠ, সে কেবল শূদ্রদিগের মধ্যে। মন্তকের কেশ পাকিলেই যে বৃদ্ধ হয়, এমন নহে; কিন্তু যিনি যুবা হইয়াও বিজ্ঞান, দেবতারা তাঁহাকেই বৃদ্ধ বলেন। কাঠনির্মিত হস্তী যেমন, চন্দ্রনির্মিত মৃগ যেমন,—বেদহীন ব্রাহ্মণও তজ্জপ। ইহারা তিন জনেই কেবল নামমাত্র ধারণ করে। ক্রীষের জী-সহবাস যেমন নিফল; গাভীতে গাভীতে সঙ্গম যেমন কোনও ফলদায়ক নহে; পাগলকে দান যেমন কোনও কার্যেরই নয়; তজ্জপ বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণও কোনও কর্মেরই নহে। অতি তাড়না সহকারে শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিবে না। ধর্ম-কামনায় যিনি শিক্ষা দান করেন, শিষ্যের প্রতি তিনি মধুর এবং নম্র বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কারণ, পুরুষ অথবা মিথ্যাকথনাদি হইতে যাহার বাক্য এবং রাগ-দ্বেষাদি হইতে যাহার মন বিমুক্ত হইয়াছে; যিনি বাক্য এবং মনকে অসদৃশ কর্ম হইতে সর্বদা সমাক্রমণে রক্ষা করেন, তিনি বেদান্তোপগত সমুদায় ফলই লাভ করেন। একান্ত পীড়িত হইলেও অস্ত্রের মর্ধ-পীড়ন করা উচিত নয়। যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, এমন কোনও কর্ম বা চিন্তা করিতে নাই এবং যে কথা বলিলে লোকের উদ্বেগ জন্মে, পরলোক-বিরোধী এমন বাক্য উচ্চারণ করিতে নাই। ব্রাহ্মণ ঐহিক সম্মানকে যাবজ্জীবন বিধের ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং অবমাননাকে সর্বদা অমৃতের ন্যায় আকাজ্জক করিবেন। কারণ, অবমাননা সহ করিতে অভ্যস্ত হইলে অপমান-জনিত ক্ষোভ আর উদয় হয় না; স্তবরাং স্তবে নিদ্রা যাওয়া যায়, স্তবে আগরিত হওয়া যায়, স্বচ্ছন্দে সংসারে কর্তব্য-কর্ম বিচরণ করা যায়; পরন্তু অপমানকারীরই আত্মগানি উপস্থিত হইয়া থাকে। পাপবশতঃ তাহার ইহ-পর উভয় গোকই নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ ক্রম-কথিত উপায় দ্বারা সংস্কৃতাত্মা অর্থাৎ উপনীত বিজ্ঞ গুরুকুলে বাসকালীন ক্রমে ক্রমে বেদ-প্রাপ্তির যোগ্য তপস্তা সঞ্চয় করিবেন।’ অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থেও ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে যে উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহারও একটু আভাস দিতেছি। যথা,—

“ন ক্রোধেন প্রহঃষাচ্চ মানিতেঃহমানিতঃ চ যঃ । সর্বভূতেষুভয়দস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিহুঃ ॥

যেন কেন চিদাচ্ছন্নো ষ্ণে কেন চিদাশিতঃ । যত্র কচ্চন শাস্ত্রী চ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিহুঃ ॥

বিমুক্তং সর্বসঙ্গেভ্যো মুনিমাকালবৎ স্থিতম্ । অশ্বমেচচরং শাস্ত্রং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিহুঃ ॥

জীবিতং বস্ত্র ধর্মার্থং ধর্মোঁরত্যাগমেব চ । অহোঁরাত্রাশ্চ পুণ্যার্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিহুঃ ॥

নিরাশিষমনারম্ভং নিরবস্কারমস্তমিতং । অক্ষীণং ক্ষীণকর্মানং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিহুঃ ॥

কর্ম্মীনা ব্রাহ্মণা জাতঃ করেতি ব্রহ্মভাবনাম্ । স্বধর্ম নিরতং শুদ্ধহৃদাদ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥”

অর্থাৎ,—“সম্মানিত বা অপমানিত হইলে কোনও অবস্থাতেই যিনি ক্রুদ্ধ বা প্রহৃষ্ট হন না, যিনি সর্বভূতে অস্ত্র প্রদান করেন, দেবগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। অশম বসন শয়নে যাহার কোনও প্রলোভন নাই; অর্থাৎ যিনি যাহা পান তাহাই পরিধান করেন, যাহা পান তাহাই ভোজন করেন, এবং যেখানে সেখানে শয়ন করেন; দেবতাগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি সর্বসঙ্গবিমুক্ত অর্থাৎ নিলিপ্ত অথচ আকাশের স্থায় সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; যিনি মুনি, যিনি বিমুক্ত, যিনি নিরঞ্জনবাসী, যিনি শাস্ত্র, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। যিনি অশীর্ষদের অগ্রীত, যিনি আরম্ভ; বহির্ভূত, যিনি

কাহারও স্তুতি-পরায়ণ নহেন, যিনি অক্ষীণ অথচ যাহার কর্মভোগ ক্ষীণপ্রাপ্ত, দেবতারাই তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। যিনি ব্রহ্মভাব-পরায়ণ, স্বধর্মনিরত, শুদ্ধ স্বভ, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।” বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণের যে সকল লক্ষণ নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, সে সকল কি, এ সকল লক্ষণ হইতে বিভিন্ন ? কখনই নহে। ভাবার বিভিন্নতা থাকিতে পারে; কিন্তু ভাবের ঐক্য সর্বত্র। * তার পর, বুদ্ধদেব যে স্রষ্টার সৃষ্টি-কর্তৃত্বে বিশ্বাসবান ছিলেন না বলিয়া—তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই বলিয়া—যে একটা কিংবদন্তী আছে, তাহাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বুদ্ধ লাভ করিয়া, তিনি যে প্রথম বাণী উচ্চারণ করেন, তিনি যে উদান গান করিয়া আত্ম-তৃপ্তি খাপন করেন, তাহাতে সৃষ্টি-কর্তার অস্তিত্ব স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন দেখিতে পাই। তিনি যখন বলিলেন,—“গহকারক! দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।” অর্থাৎ,—‘হে গৃহনিম্মাত্ত (হে সৃষ্টিকর্তা)! আজ আমি তোমাকে দেখিয়াছি; আর তুমি এ গৃহ-নিম্মাণে আমায় বন্ধনে সমর্থ হইবে না’; তখনই বুঝা যায়, তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়াছিলেন। হইতে পারে, প্রথমে তিনি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি-নৈপুণ্যে সন্দেহান ছিলেন; হইতে পারে, প্রথমে নিরীশ্বরবাদ তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু সাধনার পর তিনি যে স্রষ্টাকে সম্যক উপলব্ধি করিয়া শুদ্ধাচার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; তাহার ঐ উক্তি তাহা সপ্রমাণ হয়। এইরূপ সর্বভূতে সমদর্শন-জ্ঞান প্রভৃতির দ্বারাও তিনি যে জগৎ পাতা জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরের বিধ্বংস দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব যে বেদ কখনও অমান্য করেন নাই, পরন্তু তিনি যে বেদের জ্ঞান মার্গের অনুসরণ করিয়াছিলেন, এ বিষয় আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। স্মরণার্থে সর্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয়,—বৌদ্ধধর্ম সনাতন হিন্দুধর্মের অঙ্গস্থানীয়।

যে বৌদ্ধধর্ম ও জৈন-ধর্ম ভারতের মৃতকল্প অসার দেহে এক সময়ে নব-জীবন সঞ্চার করিয়া গিয়াছে, সেই দুই ধর্ম ও ধর্ম-সম্প্রদায় সম্বন্ধে কি ভ্রম ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস বাকমূল হইয়াই রহিয়াছে! ঐ দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের পৌরোপৌর্য্য লইয়া ব্রাহ্ম-বিশ্বাস। কতই বাদ-বিতণ্ডা ও মতান্তর চলিয়াছে। কেহ বলিতেছেন,—“জৈন ধর্মই আদি, তাহা হইতেই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি; “কেহ বলিতেছেন,—বৌদ্ধধর্মই আদি, তাহা হইতেই জৈন-ধর্মের উৎপত্তি।” প্রধানতঃ উভয় ধর্মের সাদৃশ্য-তত্ত্ব অনুধাবন করিয়াই, এই বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। অথচ এ বিতণ্ডা নিরসনের যে এক প্রকৃষ্ট উপায় আছে, তৎপ্রতি অতি অল্প জনেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার উভয়েই যে মূল-বৃক্ষের কাণ্ডস্থানীয়—প্রধান শাখার অন্তর্ভূত, জানি-না—তৎপ্রতি কয়জনই দৃষ্টি-নিপতিত হইয়াছে! এ বিষয়ে আমরা একজন নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গবেষণা আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি। জগতে যখন যে ধর্ম-সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তৃত হয়, তখন সেই ধর্ম-সম্প্রদায়ের বা তৎপ্রবর্তিত মত-পরম্পরার আদিমত্ব প্রচারের একটা চেষ্টা

* পৃথিবীর ইতিহাস পক্ষন যন্তে ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার সহিত শ্যামোক্তর সাদৃশ্য সহজেই উপলব্ধি হইবে।

দেখিতে পাই। এই কারণে জৈন-ধর্ম যখন রাজকীয় ধর্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, তখন উহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে অনেকের আভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। এইরূপ বৌদ্ধধর্ম যখন রাজকীয় ধর্ম মধ্যে পরিগণিত হয়, প্রাধাত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উহার মৌলিকত্ব অনেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, প্রথমে একজন জৈন নৃপতি এবং পরিশেষে কয়েকজন বৌদ্ধ নৃপতি ভারতবর্ষে একছত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। আমরা যথাক্রমে রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্তকে এবং রাজচক্রবর্তী অশোকবর্দ্ধনকে জৈন ও বৌদ্ধনৃপতি-প্রধান বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। সুতরাং ঐ দুই নৃপতির রাজত্বকালে যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্মের প্রাধাত্য পরিকীর্তিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করি। পরবর্তী ঘটনার আবরণে অনেক সময় পূর্ববর্তী ঘটনা আবৃত হইয়া থাকে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিবৃত্ত অল্পসঙ্কানে এ বিষয়টা আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের মনে হয়, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত জৈন-ধর্মকে বৌদ্ধধর্মের সত্বিস্থানীয় বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অল্পসঙ্কান্ন প্রফেসর লাসেন্ প্রভৃতিও ঐ মতের অমুবর্তী ছিলেন। কিন্তু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে হারম্যান জ্যাকবি এ ক্ষেত্রে এক নবীন আলোক সঞ্চার করেন। আমরা যে সভা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়া আসিতেছি, সেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গবেষণায় তাহারই প্রতিধ্বনি ফুটয়া উঠে। কি যুক্তি বলে জৈন ধর্মকে বৌদ্ধধর্মের সত্ত্বিত্ব মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছিল, আর কি কারণে সে যুক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এতৎপ্রসঙ্গে সঙ্ক্ষেপে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। * তাহা হইতে মূল-তত্ত্ব স্বতঃই অধিগত হইতে পারিবে। বৌদ্ধধর্ম হইতে যে জৈন-ধর্মের উৎপত্তি, তাহার চারিটা কারণ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম কারণ—বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তকদ্বয়ের উপাধি বা নাম-সংজ্ঞা প্রায়ই অভিন্ন; যথা,—জিন, অর্হং, মহাবীর, সর্বজ্ঞ, সুগত, তথাগত, সিদ্ধ, বুদ্ধ, সম্বুদ্ধ, পরিনিবৃত্ত, মুক্ত ইত্যাদি। উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদির মধ্যে প্রায় সর্বদাই এই সকল নাম-বিশেষণ প্রযুক্ত দেখি। সুতরাং এক হইতে অপরের উৎপত্তি বিষয়ে সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। তবে এইটুকু বিশেষত্ব লক্ষ্য হয় যে, ‘জিন’ এবং সম্ভবতঃ ‘শ্রমণ’ ভিন্ন অন্য উপাধিগুলির কয়েকটির প্রাধাত্য বৌদ্ধগণের মধ্যে এবং অপর কয়েকটির প্রাধাত্য জৈনগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। বুদ্ধ, তথাগত, সুগত এবং সম্বুদ্ধ সংজ্ঞা-চতুষ্টয় সাধারণতঃ শাক্য-মুনি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল উপাধি জৈন-তীর্থঙ্কর মহাবীর সম্বন্ধে সময়ে সময়ে ব্যবহার হইতে দেখা যায় বটে; কিন্তু প্রধানতঃ শাক্য-বুদ্ধ সম্বন্ধেই উহাদের প্রয়োগ। এইরূপ বীর, মহাবীর প্রভৃতি শব্দদ্বয় জৈনতীর্থঙ্কর ‘বর্দ্ধমান’ সম্বন্ধেই প্রধানতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তবে একটি শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে কিন্তু বিশেষ অর্থানৈক্য দেখিতে পাই। সে শব্দটি—তীর্থঙ্কর (তীর্থকর)। জৈনগণ ঐ শব্দে আপনাদের ধর্ম-প্রবর্তক মহাত্মাকে নির্দেশ করেন; কিন্তু বৌদ্ধগণের নিকট ঐ শব্দ “নাগস্ক্য-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক” অর্থ স্মৃতিত করে। এই একটি মাত্র শব্দের আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়, জৈন-ধর্ম কখনই বৌদ্ধধর্মের সত্ত্বিত্ব নহে। যে শব্দ বৌদ্ধগণের নিকট স্থগ্য বা যাহার

অর্থ নিম্নলীল, সেই শব্দ কি কেহ কখনও আপনার দেবতার উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে পারে ? কখনই না । তবে কি প্রকারে একই শব্দের এতাদৃশ অর্থ-বিপর্যয় সংঘটিত হইল ? প্রতিপন্ন হয়, তীর্থঙ্কর শব্দ বহু পূর্ব হইতে ভাষায় প্রচলিত ছিল এবং ঐ শব্দের দ্বারা “ধর্ম-প্রবর্তক”, “ঈশ্বর” প্রভৃতি অর্থ উপলব্ধি হইত । সেই অর্থের অমুসরণেই জৈনগণ ঐ শব্দটিকে আপনাদের দেবতার সম্বন্ধে পরিগ্রহণ করেন । পরিশেষে বৌদ্ধগণের সহিত যখন জৈনগণের শত্রুতা আরম্ভ হয়, তখন জৈনধর্ম-প্রবর্তকের প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখাইবার জন্য বৌদ্ধগণ ঐ শব্দের কদর্থ প্রচারে ত্রুটি হন । এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি অপর ধর্ম-সম্প্রদায়ের ঈর্ষাভেদের পরিচয়—কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর সকল দেশে সকল সময়ে পরিদৃষ্ট হয় । বৌদ্ধগণ যেমন জৈন-ধর্ম-প্রবর্তকের নাম বিশেষণে কদর্থের আরোপ করিয়াছিলেন, জৈনগণও সে পক্ষে ক্রটি করেন নাই । যিনি বুদ্ধ, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে তিনি ‘মুক্ত’ নামে অভিহিত হন । তদমুসারে বুদ্ধদেব অনেক সময়ে ‘মুক্ত’ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন । কিন্তু ঐ ‘মুক্ত’ বিশেষণ জৈনদিগের নিকট শব্দার্থমূলক ‘তাক্ত’ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ষাঁহার জ্ঞান-মার্গের উচ্চতরে অধিষ্ঠিত, তাঁহার জৈনই হউন আর বৌদ্ধই হউন, কখনও কাহারও উপাস্ত দেবতার প্রতি বিজ্ঞপোক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন না । সুতরাং বিশেষণ-বিশেষ্যের যে ঐরূপ অর্থান্তর ঘটিয়া থাকে, তাহার কারণ অত্র প্রকার মনে করা যাইতে পারে । যাহা হউক, একটু স্মৃষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাই, এই যে সকল নাম-বিশেষণ, ইহাদের মূল অত্র কিছু আছে । সে মূল—সনাতন হিন্দু-ধর্ম । সনাতন হিন্দু-ধর্মের উপাস্ত দেবতার যে সকল নাম-বিশেষণ প্রচলিত ছিল, জৈনগণ ও বৌদ্ধগণ তাহারই অমুসরণ করিয়াছিলেন । পরিশেষে তাঁহাদের বিরোধের ফলে, ঐ সকল শব্দের অর্থ-বিপর্যয় ঘটিয়া আসিয়াছে । একই মহান্ মহীকৃৎসর শাখা-প্রশাখা যখন বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের সম্বন্ধের মধ্যে স্বতঃই এক ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয় । ধর্ম ও ধর্ম-সম্প্রদায় বিশেষের ব্যবধান সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে আসিতে পারে ।

বৌদ্ধধর্ম হইতে জৈন-ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ে যে দ্বিতীয় যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা প্রতিমূর্তি-প্রতিষ্ঠা ও মন্দির-নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ক । বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার শিষ্যগণের প্রতিমূর্তি নির্মাণে তাঁহাদের উদ্দেশে মন্দিরাদি উৎসর্গ করিয়া থাকেন । জৈনগণের মধ্যেও এই প্রথা পরিদৃষ্ট হয় । তাই অনেকের বিশ্বাস, জৈন-ধর্ম বৌদ্ধধর্মের অমুসরণ । কিন্তু এ তত্ত্ব বিশ্লেষণেও সেই একই সত্য আবিষ্কৃত হয় । কি বুদ্ধদেব, কি মহাবীর, কেহই আপনাদের প্রতিমূর্তি নির্মাণ রিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই । তাঁহাদের বাক্যে বা চিন্তায় কখনও তেমন ভাব পাওয়া যায় না । তবে কোথা হইতে কি প্রকারে এ প্রবর্তনা হইল ? ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম—কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির মিলন-ক্ষেত্র । মিলন ভিন্ন যে যুক্তি নাই, সনাতন হিন্দুধর্মের তাহাই প্রধান শিক্ষা । সে শিক্ষার প্রমাণ সাধিত হয় না,—যদি ভক্তিকে বর্জন করিয়া মামুষ শুধুই জ্ঞানের অমুসরণ করিতে চায় ! ভক্তি ভারতের অস্থিমজ্জায় শোণিত-প্রবাহরূপে প্রবহমান । কি জৈন-ধর্ম, কি বৌদ্ধ-

অত্যাশ্চর্য বিষয়ে
প্রাস্তি-সম্বন্ধে ।

ধর্ম উভয়েই এ ক্ষেত্রে সনাতন হিন্দুধর্মেরই অনুসরণ করিয়াছে বলিতে পারি। আপন ধর্ম-প্রবর্তকের বা ইষ্টদেবতার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও তদ্বন্দ্বেষ্টে মন্দির উৎসর্গীকরণ প্রভৃতি প্রথা নিশ্চয়ই সনাতন হিন্দুধর্ম হইতে অত্যাশ্চর্য্য ধর্ম-সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ, দ্বিতীয় যুক্তির মূলেও হিন্দুধর্মেরই প্রাধান্য পরিকল্পিত হয়। বৌদ্ধধর্মের ও জৈন-ধর্মের মধ্যে তৃতীয় সাদৃশ্য—পৃথিবীর সৃষ্টিকাল সম্বন্ধে। বৌদ্ধগণের গ্রন্থে যেমন কোটি কোটি বৎসর পূর্বে বহু বহু বুদ্ধের অবতারণা গ্রহণের উল্লেখ আছে, জৈনদিগের গ্রন্থেও সেইরূপ কোটি কোটি বৎসর পূর্বে বহু বহু জৈন-তীর্থঙ্করের আবির্ভাবের বিষয় বিবোধিত হয়।* ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে যুগ-বিবর্তনের, কাল-পরিমাণের ও অবতারণার আবির্ভাবের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখি, বৌদ্ধ ও জৈন-গ্রন্থাদির কাল-বিবরণ তাহার অনুসরণ ভিন্ন অন্য কোনরূপ মনে হয় না। জৈনগণের মধ্যে উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী কাল বিভাগ এবং তদন্তর্গত বড়বিধ ‘আড়া’ বা উপবিভাগ আছে। বৌদ্ধগণের মধ্যেও সেইরূপ চারিটি প্রধান এবং আশীটি অপ্রধান ক্ষুদ্র কল্পবিভাগ দৃষ্ট হয়। পর্যায়ক্রমে বিশ্বের উৎপত্তি ও লয়, নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগের ত্রায়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্তিত আছে বুলিতে পারি। কিন্তু কাল-বিভাগের এ সাদৃশ্যে কি জৈন, কি বৌদ্ধ কোনও সম্প্রদায়েরই মৌলিকত্ব সূচিত হয় নাই। কেন-না, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের যুগ ও কল্প বহু পূর্ক হইতেই আদর্শ-ক্ষেত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া সিঃ জ্যাকোবি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—‘ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের যুগ-বিভাগ প্রভৃতির আদর্শে বৌদ্ধগণের কাল-বিভাগ এবং ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রির আদর্শে জৈনগণের উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী কালের পরিকল্পনা।’† বৌদ্ধ-ধর্ম হইতে জৈন-ধর্মের উৎপত্তি-সংক্রান্ত চতুর্থ যুক্তি অহিংসা-মূলক। বৌদ্ধগণ ‘অহিংসা পরম-ধর্ম’ নীতি সর্বতোভাবে মান্য করিয়া থাকেন। জৈনগণ অহিংসা-ধর্মকে বৌদ্ধগণের অপেক্ষাও যত্নের সহিত পালন করিয়া চলেন। অহিংসা-ধর্ম-পালনে বৌদ্ধগণ অপেক্ষাও জৈনগণের দৃঢ়তা দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হইলেও জৈনগণ যে বৌদ্ধগণের নিকট হইতে অহিংসা ধর্ম-নীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কখনই বলিতে পারা যায় না। কেন-না, আমরা পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি, সনাতন হিন্দু-ধর্মে এ শিক্ষা আবাহমানকাল প্রচলিত আছে। “মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ”—যজুর্বেদের এই উক্তি এবং বোধায়ন সূত্রের নীতি যে জৈনধর্মের ও বৌদ্ধধর্মের মূল, তাহা নানারূপেই প্রতিপন্ন হয়। যাহা হউক, বৌদ্ধগণের মধ্যে এবং জৈন-গণের মধ্যে অহিংসা-ধর্ম কি ভাবে প্রচলিত আছে এবং সনাতন হিন্দু-ধর্মের সহিত উহা কিরূপ সম্বন্ধ-সম্পন্ন, তাহা একটু আলোচনা করিলেই বিষয়টা বোধগম্য হইবে। বৌদ্ধ-গণের দশাশীল, অষ্টাঙ্গশীল বা পঞ্চশীল প্রভৃতির মধ্যে যে সকল উক্তি দৃষ্ট হয়, জৈনগণের ‘মহাব্রত’ প্রতিজ্ঞা-পঞ্চকের সহিত

* পৃথিবীর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড উনত্রিংশ পরিচ্ছেদে জৈন-তীর্থঙ্করগণের ও তাঁহাদের আবির্ভাব-কালের এবং পঞ্চম খণ্ডে ৩৩৬ পৃষ্ঠায় বুদ্ধগণের ও তাঁহাদের আবির্ভাবের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

† Hermann Jacobi writes in his translation of *Gaina Sutras*,—“I am of opinion that the Buddhists have improved on the Brahmanic system of the Yugas, while the Gainas invented their Utsarpini and Avasarpini eras after the model of the day and night of Brahma.”

তাহা সম্পূর্ণ সাদৃশ্য-সম্পন্ন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রতিজ্ঞা করেন,—‘(১) প্রাণিহত্যা করিব না, (২) চুরি করিব না, (৩) অপবিত্রতা পরিহার করিব, (৪) মিথ্যা কহিব না, (৫) ধর্মোন্নতির হানিকর মাদকদ্রব্য ভক্ষণ করিব না, (৬) অনির্দিষ্ট সময়ে আহার করিব না, (৭) নৃত্য-গীত-বাণ্য বা অন্তিময়ে বিরত থাকিব, (৮) মালা গন্ধদ্রব্য অলঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহার করিব না, (৯) উচ্চ কিংবা প্রশস্ত শয্যা শয়ন করিব না, (১০) কাহারও নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য গ্রহণ করিব না।’ অষ্টাঙ্গশীল এই দশশীলেরই অনুরূপ; অপিচ, উহার প্রথম পাঁচটা পঞ্চশীল অভিধায়ে অভিহিত হয় এবং ঐ নিয়ম প্রত্যেক বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীর প্রতিপাল্য। অষ্টাঙ্গশীলের শেষোক্ত তিনটা বিধি কেবল ধার্মিক বৌদ্ধগণের প্রতি প্রযুক্ত হয়। অষ্টাঙ্গশীল এই;—‘(১) কেহ প্রাণিহত্যা করিবে না, (২) কেহ অদত্ত গ্রহণ করিবে না, (৩) কেহ মিথ্যা কথা কহিবে না, (৪) কেহ মাদকদ্রব্য পান করিবে না, (৫) কেহ অগম্য গমন করিবে না, (৬) কেহ স্নানাদিতে অসিদ্ধ ঋণ ভক্ষণ করিবে না, (৭) কেহ মালা ধারণ বা গন্ধ ব্যবহার করিবে না, (৮) সকলকে মৃত্তিকার মাত্র পাতিয়া শয়ন করিতে হইবে।’ বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণকে যে পাঁচটা প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইতে হয়, জৈন নিগ্রহগণেরও সেইরূপ প্রতিজ্ঞার বিধি দৃষ্ট হয়। জৈন-গণের পঞ্চ প্রতিজ্ঞা;—‘(১) অহিংসা অর্থাৎ প্রাণিহত্যা না করা, (২) অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা কথা না বলা, (৩) অস্তোর অর্থাৎ অদত্ত গ্রহণ না করা, (৪) ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম, (৫) অপরিগ্রহ অর্থাৎ সাংসারিক সকল পদার্থে নিস্পৃহ।’ পুনঃপুনঃ নানা আকারে নানা ভাবে এই একই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। যাহা হউক, বৌদ্ধগণের ও জৈন-গণের এবিধ প্রতিজ্ঞা-বিষয়ে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা-পঞ্চকের অন্তর্গত পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটি সানাত্ত পার্থক্য-বিশিষ্ট হইলেও, প্রথম চারিটা প্রতিজ্ঞার সহিত উভয় ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। প্রতিজ্ঞা কয়টির পর্যায়-সম্বন্ধে মতান্তর থাকিলেও, মূলতঃ কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। বৌদ্ধগণের প্রথম হইতে চতুর্থ প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে ভাব পরিব্যক্ত, জৈনগণের প্রথম প্রতিজ্ঞা-চতুর্থে সেই ভাবই অভিব্যক্ত; পার্থক্যের মধ্যে প্রথমটা দ্বিতীয় স্থান অথবা দ্বিতীয়টা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটি জৈন-শাস্ত্রে একটু অধিক ভাবমূলক; পার্থক্য এইটুকু মাত্র। নচেৎ, সাদৃশ্য প্রায় পোনের আনা। এই সাদৃশ্য দেখিয়াই এক ধর্মমত অন্য ধর্মমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। তবে কোন সম্প্রদায় যে কাহার নিকট খণী, তাহাই বিশেষভাবে বিবেচনার বিষয়। একটু অনুসন্ধান করিলেই এ সম্বন্ধে নূতন আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গবেষণার আলোচনা করিয়া দেখিতে পারি। * তাহাতে বেশ উপলব্ধি হয়,—কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কোনও

* জৈন-সূত্রের ইংরাজী অনুবাদক হারমান্ জ্যাকোবি ঠিক এই কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। যথা,—“It can be shown, however, that neither the Buddhists nor the Jainas have in this regard any claim to originality, but that both have only adopted the five vows of the Brahmanic ascetics. (Sannyasin)”—Introduction to *Gaina Sutras* by Hermann Jacobi.

সম্প্রদায়ই এই বিষয়ে মৌলিকত্বের দাবী করিতে পারেন না; পরন্তু তাঁহাদের পঞ্চশীল পঞ্চ-প্রতিজ্ঞা বা পঞ্চ-মহাব্রত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাঙ্গসারী সন্ন্যাসিগণেরই প্রতাপাল্য বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত। বোধায়ন-সূত্রে (বোধায়ন মুহু-সূত্র) সন্ন্যাসিগণের সম্বন্ধে অমুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। তদনুসারে সন্ন্যাসিগণকে দশটি প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইতে হয়। তাহার মধ্যে পাঁচটি প্রতিজ্ঞা প্রধান, আর পাঁচটি অপ্রধান বলিয়া পরিকল্পিত। প্রথম প্রতিজ্ঞা পঞ্চক,—‘(১) জীবিত প্রাণী মাত্রকে কষ্টদানে বিরতি, (২) সত্য-বাক্, (৩) অস্ত্রের সম্পত্তি গ্রহণে বিরতি, (৪) মানক-দ্রব্য গ্রহণে বিরতি, (৫) দান।’ অপ্রধান পাঁচটি প্রতিজ্ঞা,—‘(৬) ক্রোধ পরিহার, (৭) শূকর আচ্ছাদ্যবৃত্তি, (৮) উদ্ভত্য পরিহার, (৯) পরিচ্ছন্নতা, (১০) পবিত্র আহার।’ হিন্দু-সন্ন্যাসিগণের প্রতিজ্ঞার প্রথম চারিটি প্রতিজ্ঞার সহিত জৈন-নিগ্রহগণের প্রথম প্রতিজ্ঞা-চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হয়। বোধায়ন গৃহ-সূত্রে যে পর্যায়ে প্রতিজ্ঞা-চতুষ্টয় সম্বন্ধিত, জৈন-শাস্ত্রেও উহার সেই পর্যায়ে সেইভাবে অবস্থিত। ইহাতে মনে হয়, জৈন ভিক্ষুগণের প্রতিজ্ঞা, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সন্ন্যাসিগণের প্রতিজ্ঞার অমুরূপ ভিন্ন অনুরূপ নহে। এ প্রসঙ্গে আরও মনে হয়, বৌদ্ধগণই আদি ধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে পর্যায়ে পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। এইখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটি—(মহাব্রত) হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ত্রিবিধ ধর্ম্মে কেন ত্রিবিধ মুক্তি পরিগ্রহ করিল? ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পঞ্চম মহাব্রত,—দান। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাঙ্গসারী জন-সাধারণের সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণকালে দাতব্য দানশক্তি প্রদর্শনের অবসর উপস্থিত হইত। ব্রাহ্মণ্যাদি বর্ণ যখন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহাদের দানের অবসর আসিত। কিন্তু বৌদ্ধ বা জৈন ভিক্ষুগণের জীবন-গতি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে পরিচালিত। সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রমে বহির্গত হইলে তাঁহারা কচিং দানশীলতা প্রকাশের অবসর পাইতেন। সুতরাং বোধায়ন-কথিত পঞ্চম মহাব্রত তাঁহাদের মধ্যে প্রবর্তিত হয় নাই। জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী প্রথমে চতুর্ধিক মহাব্রত প্রতিপালনের ব্যবস্থাই বিহিত করিয়াছিলেন। পঞ্চম মহাব্রত শেষকালে রূপান্তরে প্রবর্তিত হয়। তাঁহার মতে পঞ্চম মহাব্রত অপরিগ্রহ অর্থাৎ দ্রব্য-ক্ষেত্র-কাল-ভাব-রূপ সকল বিষয়ের মোহ পরিত্যাগ। এ ভাবের মধ্যে অনেক মহান উপদেশ গ্রথিত আছে। জ্ঞানবান্ হইয়া যখন শরীরের প্রতি পর্যাপ্ত মমত্ব পরিহার করিতে সামর্থ্য জন্মে, তখনই অপরিগ্রহ সার্থক হয়। বাহ্য হউক, ঐ অবস্থার মধ্যে অনেকগুলি ভাবকে আশ্রয়দান করিয়া জৈনগণ বোধায়ন-কথিত পঞ্চম-মহাব্রতের পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণের মধ্যেও সেই ভাবই দেখিতে পাই।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাঙ্গসারী—সন্ন্যাসিগণের আদর্শে জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের জীবন-গতি নির্ণীত হইয়াছিল,—এ সিদ্ধান্ত কেবল আমাদের নহে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যিনিই নিরপেক্ষ-ভাবে

বিবিধ এ সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই এই মত যুক্তকণ্ঠে ঘোষণা
সম্বৃত্ত-তথ্য। করিয়া গিয়াছেন। বোধায়ন-সূত্রে ও গৌতম-সূত্রে সন্ন্যাসিগণের সম্বন্ধে সে
সকল বিধি-বিধান নিহিত আছে দেখিতে পাই, তাহা প্রায় বর্ণে বর্ণে
জৈনগণের প্রতাপাল্য বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রচিয়াছে। জ্যাকোবি—পঞ্চবিংশতি

প্রতিপাল্য বিধি-বিধানের অবতারণার বিষয়টী বিশদভাবে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন । পূৰ্ব্বোক্ত প্রধান ও অপ্রধান প্রতিজ্ঞা-দশকের পর সন্ন্যাসিগণের প্রতিপাল্য কতকগুলি বিধি-বিধান কি ভাবে জৈন-ভিক্ষুক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, তাহার কয়েকটা উদাহরণ নিয়ে প্রকটন করা যাইতেছে,—

(১) ‘সন্ন্যাসীর কোনরূপ সঞ্চিত ভাণ্ডার থাকিবে না ।’ গৌতমসূত্রে এবং বোধায়ন সূত্রে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে । অথচ, জৈন ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পক্ষে এই নিয়ম সৰ্ব্বথা প্রতিপাল্য । ঐ উভয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণকেই পরদ্রব্য গ্রহণে ও সঞ্চয়ে বিরত থাকিতে হইবে । জৈনগণের পক্ষম্ মহাব্রত ‘অপরিগ্রহের’ অভ্যন্তরে এই ভাবই নিহিত রহিয়াছে । জৈন ভিক্ষুগণ যে আপনাদের পরিধেয় বস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র এবং যষ্টি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া পরিভ্রমণ করেন ; জৈন-শাস্ত্রমতে, তৎসমুদায় তাঁহাদের নিজস্ব নহে ; পরন্তু সে সকল তাঁহাদের ‘ধর্মোপকরণ’ মধ্যে পরিগণিত ।

(২) ‘সন্ন্যাসীর ত্র্যক্ষর্য্য আবশ্যক ।’ বোধায়নের এবং জৈন-শাস্ত্রের মতে সন্ন্যাসিগণের পক্ষে ইহা চতুর্থ ব্রত বা প্রতিজ্ঞা হওয়া আবশ্যক । বৌদ্ধগণ ইহাকে ভিক্ষুগণের পক্ষম্ প্রতিজ্ঞার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন ।

(৩) ‘সন্ন্যাসিগণ কখনও বর্ষাকালে আশ্রম পরিবর্তন করিবেন না ।’ বোধায়ন সূত্রে সন্ন্যাসিগণ সৰ্ব্বদা এইরূপ বিধি আছে । বৌদ্ধগণের এবং জৈনদিগের মধ্যে বর্ষা-বাস প্রথা ইহারই অমুসরণ বলিয়া নির্দিষ্ট হয় ।

(৪) ‘ভিক্ষা ভিন্ন অন্য কারণে সন্ন্যাসিগণ কখনও গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন না ।’ জৈনশাস্ত্র এ পক্ষে বিশেষ প্রতিবাদী নহে । তদনুসারে, ভিক্ষুগণ একরাত্রি কোনও গ্রামে বা নগরে বসবাস করিতে পারেন । তবে কোথাও অধিক দিন কাহারও অবস্থিতির বিধি নাই । মহাবীর স্বামী—গ্রামে এক রাত্রি এবং নগরে পাঁচ রাত্রির অধিক কখনও অবস্থিতি করেন নাই ।

(৫) ‘অপরাক্ষে (স্বর্থাৎ লেকের আহারাদি সম্পন্ন হইলে) সন্ন্যাসীকে ভিক্ষার্থ বাহির হইতে হইবে ; দুই বার ভিক্ষার বাহির হওয়া নিষেধ ।’ জৈনভিক্ষুগণ প্রাতে বা মধ্যাহ্নে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন । সম্ভবতঃ প্রতিযোগী ভিক্ষুকগণের সঙ্গ পরিহার করাই তাঁহাদের লক্ষ্য । সাধারণতঃ তাঁহারা একবার মাত্র ভিক্ষা করেন । উপবাসের পর কচিং দুই বার ভিক্ষার বিধি দৃষ্ট হয় ।

(৬) ‘সর্বপ্রকার (সুখাদ্যের) আকাজ্জা পরিহার ।’ জৈনগণের পক্ষম্ মহাব্রতের চতুর্থ অংশে ঐ একই ভাব পরিব্যক্ত । ভিক্ষা-গ্রহণ ও পরিবর্জন বিষয়ে যে সকল বিধি-বিধান আছে, তাহাতেও আহার্য্যের লোভ পরিহারের বিষয় অবগত হওয়া যায় ।

(৭) ‘সন্ন্যাসীর বাক্য, দৃষ্টি ও কার্য্য সংযত হওয়া আবশ্যক ।’ জৈনগণের মধ্যে ত্রিবিধ গুণের বিষয় প্রবর্তিত আছে । মন, বাক্য ও দেহ সংযত করাই সেই ত্রিগুণি ।

(৮) ‘সন্ন্যাসী লজ্জা নিবারণের জন্ত বস্ত্র পরিধান করিবেন ।’ পরিচ্ছদ ব্যবহার সৰ্ব্বদা জৈনগণের বিধি এতাদৃশ স্মরণ নহে । কেন-না, জৈন ভিক্ষুগণ উল্লঙ্ঘ্য অবস্থায় বিচরণ

করিতে অথবা একাধিক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারেন। তবে যুবক ও দৃঢ়কার জৈন ভিক্ষুর পক্ষে এক বস্ত্র ব্যবহার করাই বিধি। মহাবীর স্বামী প্রায়ই উল্লঙ্গ অবস্থায় পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। জিনকল্লিকগণ অর্থাৎ বাহারা মহাবীর স্বামীর অনুসরণকারী ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই যথাসম্ভব মহাবীর স্বামীর অনুকরণ কাঃয়াছিলেন। সে যাহা হউক, তাঁহাদের সকলেরই পক্ষে উল্লঙ্গদেহ আবৃত করা বিধি ছিল।

(৯) ‘কোনও কোনও মতে, পুরাতন বস্ত্র ধোত করিয়া পরিধানের বিধি আছে।’ বোধায়ন বলেন,—সন্ন্যাসিগণ হরিতাভ রক্তবস্ত্র (গৈরিক বসন) পরিধান করিবেন। এ বিষয়ে জৈনগণের অপেক্ষা বৌদ্ধগণের বস্ত্র-ব্যবহারে অধিক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। জৈনগণ বস্ত্র ধোত বা রঞ্জিত করার বিরোধী। যে অবস্থায় বস্ত্র প্রাপ্ত হন, জৈন ভিক্ষুগণ সেই অবস্থায়ই তাহা পরিধান করেন। ইহাতে মনে হয়, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিধি-বিধানের উপরেও তাঁহারা কঠোরতা রক্ষার চেষ্টা পাইয়াছেন। সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ জাঁকজমক-পরিশূভ হইবে; ইহারই চরম চিত্র দেখাইতে গিয়া তাঁহারা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ব্যবহারের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধগণের কঠোরতা এ সম্বন্ধে কিছু শিথিল দেখিতে পাই।

(১০) ‘যাহা अपना-আপনি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তন্নিম্ন বৃক্ষ-লতাদি ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসিগণ তাহার কোনও অংশ ব্যবহার করিতে পারিবেন না।’ জৈনগণের সম্বন্ধেও এইরূপ বিধি বলবৎ দেখি; পরন্তু, যে সকল শাক্-সবজীতে বা ফল প্রভৃতিতে জীবনী-শক্তির কোনও চিহ্ন নাই, কেবল সেই সকল ফল ও শাক্-সবজী প্রভৃতি জৈনগণ আহার করিতে অধিকারী।

(১১) ‘কাল অতীত হইলে সন্ন্যাসিগণ কোনও গ্রামে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিতে পারিবেন না।’ মহাবীর স্বামী এবং প্রায় সকল জৈন-ভিক্ষুগণই এই নিয়মের অনুবর্তী ছিলেন।

(১২) ‘সন্ন্যাসিগণ মস্তক-মুণ্ডন করিতে বা মস্তকে জটা রক্ষা করিতে পারিবেন।’ জৈনগণ এ নিয়মের উৎকর্ষ-সাধনে ভিক্ষুমাত্রকেই মস্তক মুণ্ডনে বাধ্য করিয়াছিলেন। বোধায়ন সূত্র মতে, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণকালে ব্রাহ্মণমাত্রেরই মস্তকের কেশ, শ্মশ্রু, গুণ্ড এবং হস্ত পদের নখাদি কর্তন করা আবশ্যিক। ভিক্ষু গ্রহণ কালে জৈনগণের মধ্যেও ঐ প্রথা দেখিতে পাই। জৈনগণের মধ্যে একটা প্রবাদ-বাক্য আছে,—মস্তক-মুণ্ডন, গৃহত্যাগ, নিরাশ্রয়ে বাস, জৈন-ভিক্ষুর লক্ষণ।

(১৩) ‘যাহাতে কোনও বীজ ধ্বংস হয়, সন্ন্যাসিগণ কখনও এরূপ কার্য্য করিবেন না।’ এ পক্ষে জৈন ভিক্ষুগণের বিশেষ সতর্কতা দৃষ্ট হয়। ডিম্ব অথবা কোনও প্রাণী অথবা বীজ বা অঙ্কুর প্রভৃতি কোনরূপে নষ্ট না হয়, আচার্য্য সূত্রের দ্বিতীয় খণ্ডে তৎসম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ আছে। হিন্দু সন্ন্যাসিগণের প্রতিপাল্য বীজরক্ষাবিষয়ক বিধির প্রবর্তনায় বুঝা যায়, জৈনগণ সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রতি এবং উদ্ভিদ-রাজ্যের প্রতি বিশেষরূপে কারুণ্য-দৃষ্টি সম্পন্ন হন।

(১৪) ‘অপকারী বা উপকারী সর্বপ্রকার প্রাণীর প্রতিই সন্ন্যাসিগণ নির্দিষ্টভাৱে প্রকাশ করিবেন।’

(১৫) ‘আপনার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য সন্ন্যাসিগণ কোনও কার্য করিবেন না ।’ হিন্দু সন্ন্যাসিগণের প্রতিপাল্য শেযোক্ত দুই বিধি জৈনধর্মের প্রাণস্থানীয় । জৈনধর্মশাস্ত্রে এ বিষয়ে বিশেষ উপদেশ পরিদৃষ্ট হয় । মহাবীর স্বামী ঐ দুই বিধি সর্বতোভাবে প্রতিপালন করিয়াছিলেন । তাঁহার জীবনযুতালোচনায় দেখিতে পাই, এক সময়ে চারি মাসের অধিক কাল তাঁহার গাত্রে নানা-জাতীয় প্রাণী পুঞ্জীকৃত হইয়া ছিল, কীট সকল তাঁহার দেহের উপর গতিবিধি করিয়াছিল এবং তজ্জন্তু তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল । আর এক সময়ে তৃণ, শৈত্য, অগ্নি প্রভৃতিতে এবং মাছি মশা প্রভৃতির দংশন-জনিত যন্ত্রণায় তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছিল । আর এক সময়ে দৈবশক্তির অধীন হইয়া মনুষ্যের এবং প্রাণীর নিকট তাঁহাকে নানাপ্রকার সুখকর ও দুঃখকর ঘটনার আবর্তে নিপতিত হইতে হইয়াছিল । মহাবীর স্বামী সর্বদা আরও কথিত আছে, তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ সময়ে তিনি কি জীবন কি মৃত্যু কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন নাই । সুতরাং হিন্দু-সন্ন্যাসিগণের প্রতিপাল্য বিধি-বিধান জৈন-ভিক্ষুগণের নিকট যে বিশেষভাবে আদরণীয় হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য ।

ব্রাহ্মণ-ধর্মের ও জৈন-ধর্মের বিধি-বিধানের মধ্যে আরও বিবিধ বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় । সন্ন্যাসিগণের পক্ষে বোধায়ন সূত্রের বিধি এই যে, বাক্য, চিন্তা এবং কার্য—এই ত্রিবিধ দণ্ড প্রয়োগে তাঁহারা কখনও কোনও সৃষ্ট প্রাণীকে কষ্ট প্রদান করিবেন না । বৌদ্ধগণের ও জৈনগণের যে প্রথম প্রতিজ্ঞা (শীল বা ব্রত), এ বিধি তাহা হইতে স্বতন্ত্র কি ? দণ্ডপ্রদানের যে উপায়-পরম্পরা, জৈনশাস্ত্র তৎসমুদায়কে ‘শত্রু’ বলিয়া নির্দেশ করেন । বোধায়নসূত্রে বিধি আছে, সন্ন্যাসিগণ স্থান পরিষ্কারের জন্ত অজ্র-বস্ত্রে জল লইয়া যাইবেন । পুষ্করিণী বা কূপ হইতে কাপড় ভিজাইয়া জল লইয়া তাহা নিঙড়াইয়া স্থান পরিষ্কার করা তাঁহাদের নিয়মের অন্তর্ভূত । জৈন ভিক্ষুগণ সম্পূর্ণরূপে এই নিয়মের অমুসৃত । তাঁহারাও সিন্ধু বস্ত্র নিঙড়াইয়া স্থান পবিত্র করেন । জৈনশাস্ত্রের টীকাকার গোবিন্দ ‘পবিত্র’ শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, সিন্ধু-বস্ত্রের জলসেচনে ও কুশতৃণের সন্মার্জনে ব্যবহারে জৈন-ভিক্ষুগণ পথের কীট-পতঙ্গাদি অপসারণ করেন । এইভাবে গতাগতির পথ ও আশ্রয় স্থান পরিষ্কারের পদ্ধতি হিন্দু-সন্ন্যাসিগণের মধ্যে পূর্বাগর প্রচলিত আছে । সুতরাং এ বিষয়ে জৈন ভিক্ষুগণকে হিন্দুসন্ন্যাসিগণের অনুসরণ-কারী বলা যাইতে পারে । হিন্দুসন্ন্যাসিগণের সঙ্গে যে কয়েকটি দ্রব্য সর্বদা রক্ষিত হয়, জৈন-ভিক্ষুগণের মধ্যেও সেই কয়েকটি দ্রব্য সচরাচর দেখিতে পাই । বথা,—ঘটি, রজ্জু, জল-সংগ্রহের বস্ত্র, জলপাত্র, ভিক্ষাপাত্র । জৈন-ভিক্ষুগণের জায় ঘটিগ্রহণের বিধি যদিও বৌদ্ধগণের পিটক-গ্রহে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহারে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় । অধিকন্তু জল ছাঁকিবার জন্ত ‘সুখ-বজ্রিকা’ বস্ত্র ব্যবহারের প্রথা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে । ফলতঃ, সন্ন্যাসিগণের ও ভিক্ষুগণের ব্যবহার্য দ্রব্য অভিন্ন । আহার্য-গ্রহণ সর্বদা বোধায়ন-সূত্রের বিধি এই যে,—সন্ন্যাসিগণ অবাচিতভাবে প্রাপ্ত খাদ্য-মাত্র গ্রহণ করিবেন । তাঁহাদের আহার্যের বিষয় পূর্বে কোনরূপ স্থির থাকিবে না ;

যাহা ঘটনাচক্রে প্রাপ্ত হইবেন, মাত্র জীবনধারণের উপযোগী ভিক্ষণ খাদ্য তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন। জৈন ভিক্ষুগণের ভিক্ষা গ্রহণ বিষয়ে যে সকল বিধি আছে, তাহা ঐ বোধায়ন সূত্রেরই অনুসারী নহে কি? বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আহার গ্রহণ সম্বন্ধে এতাদৃশ কঠোর নিয়মের অধীন নহেন। তাঁহাদের ভিক্ষা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিলেই তাঁহারা সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। যাহা হউক, সর্ব-প্রকার বিধি-বিধানের ও আচার-ব্যবহারের সাদৃশ্য-তত্ত্ব আলোচনার বেশ উপলব্ধি হয়,— কি জৈন, কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মূল-সনাতন হিন্দু ধর্ম। তবে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন,—জৈনগণের নিগ্রহ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কোন্ ভাবে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মানুসারী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত? কেহ কেহ এইরূপও সিদ্ধান্ত করেন যে, সন্ন্যাসি-গণ হইতে বৌদ্ধভিক্ষুগণের এবং বৌদ্ধভিক্ষুগণ হইতে নিগ্রহগণের আচার-ব্যবহার পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত কদাচ যুক্তিযুক্তক নহে। জৈন-সম্প্রদায় ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় সর্বজনবিদিত। ঐতিহ্যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। তার পর, বৌদ্ধভিক্ষু বা জৈন নিগ্রহের আদর্শ যে হিন্দুসন্ন্যাসিগণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কখনও শঙ্ক্যবাহী নহে। প্রধানতঃ ত্রিবিধ কারণে এ মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়। প্রথমতঃ, সন্ন্যাস ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের চতুরাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। আশ্রম-ব্যবস্থা যদিও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের আদিভূত বলিয়া কেহ কেহ স্বাকার করিতে না পারেন; কিন্তু ঐ প্রথা বৌদ্ধধর্ম্মের ও জৈন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার যে বহু পূর্ববর্তী, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু-সন্ন্যাসিগণ বহু পূর্বে হইতেই ভারতবর্ষের চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অথচ, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্তী কয় শতাব্দী কাল, অন্ততঃ দুই শতাব্দীর কম নহে, বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ ভারত-বর্ষে তাদৃশ বিস্তৃতিলাভ করিতে পারেন নাই; মাত্র প্রদেশ-বিশেষে তাঁহাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং দেশব্যাপী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের সৃষ্টি কদাচ তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হয় নাই। তৃতীয়তঃ, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্তনার বহু পূর্বে হিন্দু-শাস্ত্রকার গৌতমের আবির্ভাব-কাল নির্দিষ্ট হয়। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অভিমত উল্লেখ করিলেও সংশয় দূরীভূত হইতে পারে। অধ্যাপক বুলার সিদ্ধান্ত করেন যে, অতি আধুনিক বলিয়া মনে করিলেও খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে আপস্তম্ব-সূত্র রচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। বোধায়ন—আপস্তম্বেরও পূর্ববর্তী। বুলারের গণনার আপস্তম্বের কয় শতাব্দী পূর্বে গৌতম-সূত্রের প্রবর্তনা প্রতিপন্ন হয়। তার পর, গৌতম আবার বোধায়নেরও পূর্ববর্তী। অতএব গৌতম এবং খুব সম্ভব বোধায়ন, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ববর্তী কালে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসিগণের প্রতিপাল্য বিধিবিধান যখন গৌতম-সূত্রে দৃষ্ট হয়, তখন সন্ন্যাসিগণকে কদাচ ভিক্ষুগণের অনুসরণকারী বলিয়া মনে করা যায় না। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মগ্রন্থে বহু স্থানে বৌদ্ধভিক্ষুগণের অপঘণ পরিকীর্ণিত আছে। যাহারা নিম্নলিখিত হয়, কেহ কি কখনও তাহাদের অনুসরণ করে? অন্তর্গত আবার বৌদ্ধগণ ও জৈনগণ উভয় সম্প্রদায়কেই ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিতে দেখি। এমন কি, ব্রাহ্মণ শব্দটা পর্য্যন্ত উহাদের মধ্যে গৌরববাচক শব্দ মধ্যে পরিগণিত আছে। ব্রাহ্মণ না হইলেও উহারা

আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞানী ও গুণী জনকে ‘ব্রাহ্মণ’ আখ্যায় অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। যাহাকে সং বলিয়া মনে করে, মানুষ তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং এ যুক্তি-মূল্যেও জৈনগণ ও বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণগণেরই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারি। *

বৌদ্ধ-ধর্ম হইতে যে জৈনধর্ম উৎপন্ন হয় নাই, তৎসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। শেষ জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী ‘ঐগতপুত্র’ নামে অভিহিত হন, এবং

জৈনধর্ম জৈনসম্মাসিগণ নিগ্রহস্থ নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বৌদ্ধদিগের বৌদ্ধধর্মের পূর্বে। প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থে ঐগতপুত্রের এবং নিগ্রহস্থ সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বুদ্ধদেবের সমসময়ে নিগ্রহস্থগণের বিদ্যমানতার এবং ঐগতপুত্র কর্তৃক জৈনসম্প্রদায়ের সংস্কার-সাধনের উল্লেখ আছে। ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের অবর্ত্তিত ধর্মসম্প্রদায় তৎকর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াও প্রচারিত দেখি। সুতরাং জৈনধর্ম যে বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্ত্তী, তাহা বেশ বুঝা যায়। মহাবীর বা বর্দ্ধমান স্বামীর নাম যে ঐগতপুত্র (জাতপুত্র) এবং তিনি যে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন, আর নিগ্রহস্থগণ (নিগ্রহস্থগণ) জৈন বা অর্হং নামে পরিচিত হইয়া বৌদ্ধসম্প্রদায় গঠনের সমসময়ে যে প্রতিষ্ঠাযিত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্বিধে এবং জৈনগণের আদি মত কি ছিল, সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ সকলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মতের কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে ও জৈনশাস্ত্রে কি বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। অজুত্তরনিকায় (তৃতীয়, ৭৪) বৈশালীর লিচ্ছবী-বংশীয় যুবরাজ সুবিদ্বান অভয়ের প্রশঙ্গ আছে। তিনি নিগ্রহস্থগণের নীতি-সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন;—‘নিগ্রহস্থ ঐগতপুত্র সকলই জানেন এবং সকলই দেখিতে পান। তাহার পূর্ণজ্ঞান এবং ধর্মবিশ্বাস আছে বলিয়া তিনি দাবী করেন। তাহার উক্তিযে প্রকাশ—কিবা ভ্রমণে, কিবা দণ্ডায়মানে, কিবা নিদ্রায়, কিবা জাগরণে সকল সময়েই তিনি পূর্ণজ্ঞানের এবং পূর্ণ-বিশ্বাসের অধিকারী। তিনি আরও শিক্ষা দেন যে, কঠোর সাধনায় পুরাতন কর্ম লোপ পাইতে পারে এবং নূতন কর্ম নৈকর্ম মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কর্মের নিবৃত্তি হইলে হৃৎথের নিবৃত্তি হয়; হৃৎথের নিবৃত্তি হইলে অন্তঃকর্ত্তির নিবৃত্তি ঘটে; অন্তঃকর্ত্তির নিবৃত্তি ঘটিলে সকল প্রকার হৃৎথের অবসান হইয়া আসে। এইরূপে মানুষ সর্বপাপ মুক্ত (নির্জর) অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরিত্রাণ লাভ করে।’ জৈন-শাস্ত্র উত্তরাধ্যায়ন (ত্রিংশ অধ্যায়ন) অনুরূপ বাণী ঘোষণা করেন;—‘কৃচ্ছ্র সাধনায় মানুষ কর্ম-বন্ধন ছিন্ন করে’ (২৭ সূত্র); ‘কর্ম পরিত্যাগ দ্বারা মানুষ নৈকর্ম-অবস্থা প্রাপ্ত হয়; নৈকর্ম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর কোনও নূতন কর্ম সজাত হয় না, অধিকন্তু পূর্ব-উপার্জিত কর্মও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।’ (৩৭ সূত্র এবং ৭১—৭২ সূত্র)

* প্রফেসর ম্যাক্সমুলার (Professor Maxmuller in his Hibbert-Lectures), প্রফেসর বুলার (Professor Buhler in his Translation of the Boudhayana Sutra) এবং প্রফেসর কার্ন (Professor Kern in his History of Buddhism in India) এবং পরিশেষে হারমান্ জ্যাকোবি (Hermann Jacobi in his Translation of Gajina Sutras) এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

এই অবস্থার পরিণতির বিষয় বিবৃত আছে। পুনরায় অত্র (ষাণ্মাসিক অধ্যয়নে, সপ্তম সূত্রে) দেখি,—‘কস্মই জন্ম ও মৃত্যুর মূল; জন্ম ও মৃত্যুই দুঃখ!’ এই একই ভাবের উক্তি ঐ অধ্যয়নের বহু সূত্রে (৩৪শ, ৪৭শ, ৬০শ, ৭৩শ, ৮৬ম, ৯৯ম প্রভৃতিতে) দৃষ্ট হয়। তৎসমুদায়ের মূল মর্ম্ম এই যে,—‘ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থ-সমূহ হইতে এবং মানসিক সর্ব্বপ্রকার (সুখ-দুঃখের) অমুভূতি হইতে যিনি উদ্ধাসীন থাকিতে পারেন; * তিনি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে বিমুক্ত। যদিও তিনি সংসারে অবস্থিতি করেন, তথাপি সংসারের দুঃখ প্রবাহ কখনও তাঁহাকে অভিঘাত করিতে পারে না; জলমধ্যগত হইলেও পদ্মপত্র যেমন আর্দ্রতা পরিশূন্য, তাঁহারও অবস্থা তদ্রূপ।’ জৈন-শাস্ত্রের উক্তি,—‘ঐশ্বর্যপুত্র’ পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন। এ বিষয়ের অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক; কেন-না, জৈনধর্ম্মের উচ্চাই মেরুদণ্ড। নিগ্রহগণের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে, ‘মহাবগ্গ’ (ষষ্ঠ, ৩১শ) হইতে আর একটু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাবগ্গে লিখিত আছে,—‘লিচ্ছবীদিগের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার নাম—সিহ। সিহ ঐশ্বর্যপুত্রের শিষ্য, অথচ বিষয়ী বলিয়া পরিচিত। সিহ এক সময়ে বুদ্ধদেবকে দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ঐশ্বর্যপুত্র তাহাতে বাধা দেন। তাঁহার বাধা দেওয়ার কারণ এই যে, নিগ্রহগণ ক্রিয়াবাদ ও বৌদ্ধগণ অক্রিয়াবাদ মান্য করেন। যাহা হউক, সিহ কিছু গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বুদ্ধদেব সমীপে গমন করেন; আর, তাহার ফলে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন।’ মহাবগ্গের এই আখ্যানিকায় আমরা যে ক্রিয়াবাদের উল্লেখ দেখি, সতাই উহা নিগ্রহগণের আদরণীয়। সূত্রকৃতাজ্ঞে (প্রথম শ্রুতস্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়, ২১শ সূত্রে) স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে,—যিনি পূর্ণ সন্ন্যাসী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিগ্রহ, তিনিই ক্রিয়াবাদ বাখ্যার অধিকারী। আচারাজ্ঞ সূত্রে (প্রথম শ্রুতস্কন্ধ, ১ম অধ্যায়, চতুর্থ সূত্র) ক্রিয়াবাদের মত বাখ্যাত আছে; যথা,—‘তিনি আত্মায় বিশ্বাসবান, পুরস্কারে বিশ্বাসবান, কর্ম্মে বিশ্বাসবান; আত্মকৃত কর্ম্মের ফল বিশ্বাস করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন,—‘আমি ইহা করিয়াছি’; ‘আমি ইহা অপরকে করাইয়াছি’; ‘আমি ইহা করিতে প্রসন্ন দিব।’ ফলতঃ, নিগ্রহগণের যে ক্রিয়াবাদের উল্লেখ মহাবগ্গে দৃষ্ট হয়, তাহা যে জৈনশাস্ত্রের মত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ‘মজ্জিম্নিকায়’ (৫৬ম) গ্রন্থে উক্তরূপ আর এক ঘটনা দৃষ্ট হয়। উপালী নামে মহাবীরের আর এক শিষ্য (তিনিও বিষয়ী ছিলেন) বুদ্ধদেব কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। উপালীর প্রাণে একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। সে আন্দোলন—কোন্ পাপের গুরুত্ব অধিক? বুদ্ধদেব শিক্ষা দিয়াছেন,—মানসিক পাপেরই গুরুত্ব অধিক; আবার নিগ্রহ ঐশ্বর্যপুত্রের মতে,—দৈহিক পাপেরই গুরুত্ব অধিক। ‘কস্ম’ (কর্ম্ম) শব্দের পরিবর্তে তাঁহার ‘গুরু’ ‘দণ্ড’ শব্দ ব্যবহার করিতেন,—উপালীর উক্তিতে প্রকাশ আছে। সর্ব্বত্র না হইলেও, জৈনসূত্রে ‘কস্ম’ শব্দ দণ্ড অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দৃষ্ট হয়। সূত্রকৃতাজ্ঞ (দ্বিতীয় শ্রুতস্কন্ধ, ২য় অধ্যায়, ৪র্থ সূত্র) ত্রয়োদশবিধ পাপ-কর্ম্মের পরিচয় দিয়াছেন; তাহার প্রথম পাঁচটির উল্লেখ ‘দণ্ড সমাধানে’ এবং শেষ কয়টির উল্লেখ ‘কিরিয়াধানে’

* বৌদ্ধধর্ম্মের ‘বেদনা’ (অমুভূতি) এই অবস্থার সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন।

(ক্রিয়াস্থান) শব্দ দৃষ্ট হয়। তৃতীয় সূত্রে প্রাণিগণের 'দণ্ড সমাধান' অর্থাৎ 'পাপোপাদান' কি, তাহারই বিষয় বলা হইতেছে, এইরূপ আভাষ আছে। সুতরাং বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত (মজ্জিম-নিকায়) উপালীর উপাখ্যানে যে 'দণ্ড' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ জৈনশাস্ত্রের অমুসারী। কারিক, বাচিক, মানসিক—ত্রিবিধ দণ্ডের বিষয় নিগ্রহ উপালী উল্লেখ করিয়াছেন। জৈনধর্মশাস্ত্র, স্থানাসূত্রে (৩য় উদ্দেশ্যে) অমুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।* তার পর, উপালী যে বলিয়াছিলেন—নিগ্রহগণ মানসিক পাপ অপেক্ষা কারিক পাপকে গুরুতর বলিয়া মনে করেন, এতদুক্তিও জৈনশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অমুগত। সূত্রকৃতাজ্ঞ (২য় শ্রুতস্বয়ং, ৪র্থ অধ্যায়ন) বিশেষভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। অজ্ঞানতঃ যে কর্ম কৃত হয়, তাহা পাপজনক কি না,—এই প্রশ্নের মীমাংসায়, জৈনশাস্ত্র দৃঢ়তার সহিত ঐ কর্মকে পাপজনক বলিয়া উত্তর দিয়াছেন (সূত্রকৃতাজ্ঞের ২য় শ্রুতস্বয়ং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ন দ্রষ্টব্য)। বৌদ্ধগণ এ বিষয়ে জৈনগণকে উপহাস করিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই 'যে, উদ্দেশ্য লইয়াই পাপের আরোপ হওয়া সম্ভব। ফলতঃ, বৌদ্ধগ্রন্থে যে জৈন-শাস্ত্রোক্ত মতের আলোচনা আছে, এতদ্বারা তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম-সম্প্রদায় গঠনের পূর্বে জৈনধর্মের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

যদিও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম হইতে জৈন-ধর্মের ও বৌদ্ধ-ধর্মের উৎপত্তি প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম হইতে ঐ দুই ধর্মের একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, ঐ দুই ধর্ম-সম্প্রদায় মূলতঃ যেন
 ঐক্য।
 ক্ষত্রিয়ের জন্ত প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া বঝিতে পারা যায়। বুদ্ধদেব যখন আপন ধর্মমত প্রকাশ করেন, যখন উহা ধনী ও সম্ভ্রান্ত জনগণকে, সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়গণকে সন্ধান করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হয়।† বারাগসীতে বুদ্ধদেব যখন ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, তাঁহার প্রথম উপদেশে শ্রেষ্ঠপুত্র 'যস' এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েক জন ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ধনী ক্ষত্রিয় প্রথম বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে বুদ্ধদেবের সহায় হন। প্রথমে পঞ্চব্রাহ্মণ-শিষ্য (কোণ্ডঞ-প্রভৃতি) প্রাধাত্য লাভ করিলেও ধনী ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে তাঁহার মত বিশেষভাবে প্রবর্তিত হয়। তাহাতে ক্ষত্রিয়ের জন্তই বৌদ্ধ-ধর্মের অভ্যুদয় মনে আসে। জৈন-ধর্মও এই ক্ষত্রিয়ের প্রাধাত্য দেখিতে পাই। জৈন-শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে জ্রুণ অবস্থায় মহাবীর ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশণার গর্ভে সঞ্চালিত হন;‡ কেন-না, ব্রাহ্মণীর বা কোনও নীচজাতীয় স্ত্রীর গর্ভে তীর্থঙ্করের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। এবম্বিধ কিম্বদন্তীতে জৈন-ধর্ম যে ক্ষত্রিয়ের

* Indian Antiquary, IX, page 139.

† প্রফেসর ওল্ডেনবার্গ (Professor Oldenberg in his Buddha, P. 157, Seq.) এই বিষয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

‡ দিগম্বরগণ এই উপাখ্যানকে অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন; কিন্তু শ্বেতাঘরগণ ইহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন। আচার্য্যে ও কল্পসূত্রে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে; সুতরাং এই কিম্বদন্তী অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে, স্বীকার করিতে হয়। জ্যাকোবি এ সম্বন্ধে এক অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি

প্রাধান্য বিস্তার পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল, তাহা বেশ মনে হইতে পারে। অল্পপক্ষে আবার দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মামুসারী সন্ন্যাসিগণ অল্প ধর্ম-মতাবলম্বী সন্ন্যাসিগণকে সমান সম্মানের চক্ষে দেখিতেন না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অল্প বর্ণের পক্ষে চতুরাশ্রম গ্রহণের নিষেধ প্রভৃতি বিধি-বিধান দৃষ্টেও এ কথা মনে করা যাইতে পারে। শাস্ত্রগ্রন্থ অনুসন্ধান উপলক্ষি হয়, পরবর্ত্তিকালে ব্রাহ্মণের চতুরাশ্রম, ক্ষত্রিয়ের ত্রিবিধ আশ্রম, বৈশ্যের দ্বিবিধ এবং শূদ্রের একবিধ আশ্রম নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই সকল ব্যবস্থার বেশ বুঝা যায়, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসিগণের সহিত অল্প বর্ণের সন্ন্যাসিগণের একটা পার্থক্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণের বর্ণের সন্ন্যাস-গ্রহণের ফলে, স্বতঃই স্তর-বিভাগ সঙ্ঘটিত হয়। তদনুসারে ক্রমেই অবরোহণের ভাব প্রকাশ পায়। সন্ন্যাসী নামে তত্ত্ব-সন্ন্যাসিদলের সৃষ্টি হয়। বশিষ্ঠ সেই বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তখন সন্ন্যাসোচিত ক্রিয়াকর্ম আচার-ব্যবহার লোপ প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং বেদোচ্চারণে পর্য্যন্ত তাহার বিরত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ বলেন,—‘সন্ন্যাসী যাগ-যজ্ঞ পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু বেদোচ্চারণে বিরত হইতে পারেন না। বেদ পরিত্যাগে শূদ্র হইতে হয়; স্তুরাং বেদ পরিত্যাগ কখনই কর্তব্য নহে।’ বশিষ্ঠের এবস্থি উক্তিতে বুঝা যায়, পূর্ব্ব হইতেই সন্ন্যাসিগণের মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। সন্ন্যাস-আশ্রমে বেদোচ্চারণ পরিত্যাগ প্রভৃতি হেতু ঐ সময়ে যে এক বিপরীত শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বেশ মনে হয়। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের অনুসারী নহে—এবস্থি সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় জৈন-বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসিগণের বীজস্থানীয় বলা যাইতে পারে। অতএব জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সহসা উদ্ভূত হইয়াছিল মনে না করিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রতিক্রিয়ার ফলে উহার উৎপন্ন হইয়াছে সিদ্ধান্ত হয়। এইরূপে স্বতঃ-উৎপন্ন হওয়া ভিন্ন জৈন ও বৌদ্ধধর্মের একটা যে অপরটি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা মনে করা যায় না। কেন-না, ঐ দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রধান শিক্ষা যাহা, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবগ্ৰোতক। বুদ্ধদেব যে নির্কারণ অবস্থার বিষয় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, জৈনমত তাহার সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন নহে। বুদ্ধের নির্কারণ অস্তি-নাস্তি ভাবমূলক। উহা সম্পূর্ণ অবিজ্ঞমানতা অথবা ধ্যান-ধারণাক্রম অতীত বিজ্ঞমানতা। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের আত্মবাদতত্ত্ব, নির্কারণের ঐরূপ ব্যাখ্যায় উপেক্ষিত হয়। আত্মা—অক্ষর অনন্ত অবিমিশ্র; কি অদ্বৈতবাদে, কি বৈশেষিক মতে, আত্মার এই স্বরূপ নির্দ্বারিত হয়। বুদ্ধ-কথিত নির্কারণে কিন্তু আত্মার স্বরূপ-তত্ত্ব এ ভাবে ব্যক্ত নহে। অথচ, জৈনগণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের এই আত্মবাদ-তত্ত্বে সম্পূর্ণরূপে একমতাবলম্বী। তবে, জৈনগণের

বলেন,—সিদ্ধার্থের (মহাবীরের পিতা) দুই পত্নী ছিল; ব্রাহ্মণী দেবানন্দা এবং ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলা। দেবানন্দাই প্রকৃতপক্ষে মহাবীরের জননী; ত্রিশলা বিমাতা। ক্ষত্রিয়ানীর প্রাধান্য রক্ষার জন্য মহাবীরকে ত্রিশলার গর্ভ-সন্তান বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ঐক্য সম্বন্ধেও ঐরূপ এক পৌরাণিক আখ্যান আছে। দেবকীর অঙ্গ রোহিণীর গর্ভে সঞ্চারিত হইয়াছিল, এইরূপ এবাদ। জৈন-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনার প্রথম শতাব্দীতে উহাদের মধ্যে ঐক্যের উপাসনা প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। দ্বাবিশতি জৈন-তীর্থঙ্কর ও অরিস্তনেমির জীবনবৃত্ত ঐক্যের আদর্শে পরিকল্পিত সম্রমাণ হয়।

মতের সহিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সাক্ষ্য, ত্রায়, বৈশেষিক মতের যে একটু সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা এই;—শেষোক্ত মতে আত্মা বিশ্বের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে বিচ্ছিন্ন; কিন্তু জৈনমতে আত্মা সীমাবদ্ধ। অত্ৰ পক্ষে আবার বৌদ্ধদিগের শাস্ত্রে যে পঞ্চস্কন্ধ ও তাহার উপবিভাগসমূহ দৃষ্ট হয়, জৈন-মনোবিজ্ঞানে তাহার প্রতিক্রম নাই। জৈনদিগের একটি প্রধান মত—যে মত তাঁহাদের দর্শন-শাস্ত্রে ও নীতি-শাস্ত্রে বিশেষরূপে বিধোষিত—বিশ্ব জীবময়; কেবল জীব-জন্তুতে ও উদ্ভিদে বলিয়া নহে, ভূত-সমূহের অতিক্রম্য পরমাণুতে—মৃত্তিকায়, অনলে, অনিলে, সলিলে—জীবন সর্বত্র। এই জীব-বাদ বৌদ্ধ-দর্শনের কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। ভারতীয় দার্শনিকগণের গবেষণা সর্বজ্ঞতায় পর্যাবসিত হইয়াছে। যে সম্প্রদায় যে ভাবেই শ্রেয়ঃপ্রার্থী হউন না কেন, জ্ঞানাবেষণেই সকলের চিন্তা প্রধাণমান। জৈন-দর্শনও জ্ঞানকেই সার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন বটে; তবে হিন্দু-দর্শনের ও বৌদ্ধ-দর্শনের অবলম্বিত পন্থা হইতে তাঁহাদের অবলম্বিত পন্থার একটু স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের পরিভাষাই আর একরূপ। জৈন দর্শন মতে—সত্যজ্ঞান পঞ্চবিধ; (১) মতি অর্থাৎ সত্য অমুভব, (২) শ্রুত অর্থাৎ নির্মল-জ্ঞান—যে জ্ঞান মতির ভিত্তির উপর সঞ্জাত, (৩) অবধি অর্থাৎ একপ্রকার লোকাভীত জ্ঞান, (৪) মনঃপর্যায় অর্থাৎ অপরের চিন্তা সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান, (৫) কেবল অর্থাৎ সর্বোচ্চ জ্ঞান—সর্বজ্ঞতা যাহার অন্তর্ভুক্ত। জৈন মনোবিজ্ঞানের ইহাই প্রধান অঙ্গ। ইহার সাদৃশ্য বৌদ্ধ-দর্শনে মিলিবে না। এইরূপ পার্থক্য আরও বিবিধ বিষয়ে পরিদৃষ্ট হয়। আবার, সাদৃশ্যও অনেক বিষয়ে দেখিতে পাই। আত্মার দেহান্তর-গ্রহণ, কর্মবাদ অর্থাৎ কর্মগুণে সুখ-দুঃখ ভোগ প্রভৃতি বিষয়ে জৈনগণ ও বৌদ্ধগণ উভয়েই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মতাবলম্বী। কাল-বিষয়ে, অবতার-সংখ্যা বিষয়ে এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে সাদৃশ্যের আভাস পূর্বেই আমরা প্রকাশ করিয়াছি। সংসারে নূতন যে কিছু উদ্ভূত হইতেছে, তাহা প্রতিপন্ন হয় না। যাহা সত্য, তাহা চিরদিনই সমভাবে বিদ্যমান আছে। শশধর মেঘাচ্ছন্ন হইলে বায়ুপ্রবাহ উথিত হইয়া যেমন মেঘাপসরণ করে; নানারূপে ভ্রাস্তমতের আবরণে সত্য ধর্ম আচ্ছন্ন হইলে, সেইরূপ অবতারগণ আবির্ভূত হইয়া সে আবরণ উন্মোচন করিয়া দেন; তখন মেঘমুক্ত শশধরের ত্রায় সত্য-ধর্মের দিব্য-জ্যোতিঃ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়। আমরা কোনও ধর্মেরই বিরুদ্ধবাদী নহি; শুভ-সঙ্কল্প-প্রণোদিত সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ই জনহিতসাধক। সুতরাং, কিবা জৈন-ধর্ম কিবা বৌদ্ধ-ধর্ম উভয় ধর্মেরই উপযোগিতা আমরা স্বীকার করি। কি জৈনধর্ম, কি বৌদ্ধধর্ম উভয়েই স্বতঃ-প্রসূত; পরন্তু ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের অঙ্কে উহাদের উদ্ভূতি। উহাদের দর্শন, নীতি, সৃষ্টি, বিজ্ঞান—সকলেরই ভিত্তি—ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম। যাহা হউক, এক ধর্ম হইতে অপর ধর্মের উৎপত্তিই হউক অথবা সকল ধর্মই স্বতঃপ্রসূত হউক, ধর্মভাবের প্রভাব অসাধারণ। যখন যে ধর্ম নবীন জীবন সঞ্চারিত হয়, তখন সে ধর্মের প্রভাবে দেশ জাতি সম্প্রদায় নূতন শক্তি লাভ করে। জৈনধর্মের ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় তাহারই পরিচয় প্রদান করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

—::—

জৈন-ধর্ম-শাস্ত্র ।

[আদি-ধর্মের অনুসন্ধান. ধর্মশাস্ত্রে প্রভাবের বিষয় ;—জৈনশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হওয়ার কাল.—তৎসম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক ;—‘পূর্ব’-শাস্ত্রের প্রসঙ্গ,—জৈন সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র—আগম ও কল্পশাস্ত্র—বিভাগ ও উপবিভাগ প্রভৃতি ;—প্রধান প্রধান জৈন ধর্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ;—জৈনগ্রন্থকারগণ ।]

বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্তানুসন্ধানে আমরা দেখিয়াছি, ঐ ধর্মের উপদেশ-পরম্পরা প্রথমে লিপিবদ্ধ ছিল না ; তখন উহার বিধি-বিধান সমস্তই ভিক্ষুগণের কণ্ঠে কণ্ঠে বিদ্যমান থাকিত ।

ধর্মশাস্ত্রে
প্রভাবের
বিষয়।
বুদ্ধদেবের নির্বাণ-লাভের বহু বর্ষ পরে তৎপ্রবর্তিত বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ হয় । জৈনধর্মের ইতিহাসও সেই কথাই ঘোষণা করে । মহাবীর স্বামীর অভ্যুদয়ের পর বহু কাল পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ের বিধি-বিধান

উপদেশ-পরম্পরা কণ্ঠস্থ রাখিবারই বিধি ছিল । পরিশেষে তৎসমুদায় লিপিবদ্ধ হয় । সনাতন হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত ঋতি-স্মৃতি প্রভৃতির প্রকটনে আদর্শরূপে ঐ পদ্ধতি পরিদৃশ্যমান । ঋতি নামেই ব্রাহ্মণা-ধর্ম্মানুসারীর কণ্ঠে কণ্ঠে অবস্থিত অর্থ উপলব্ধি করি । আজিও সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সাধুগণ বেদমন্ত্র লিপিবদ্ধ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন । ফলতঃ, প্রথম কিছুকাল কণ্ঠে কণ্ঠে অবস্থিত থাকিয়া পরিশেষে লিপির আকারে ঋতি স্মৃতি যেমন লিখিত হইয়াছিল ; জৈনগণের এবং বৌদ্ধগণের শাস্ত্রগ্রন্থ-নিচয় সেইভাবেই বর্ত্তমান লিপির আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল । বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থ সমূহের ঐ ভাবে উৎপত্তির পরিচয় পূর্বেই আমরা প্রদান করিয়াছি । এক্ষণে এতৎপ্রসঙ্গে জৈনধর্ম্ম-গ্রন্থ-সমূহের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিবার প্রয়াস পাইতেছি । পূর্বে বলিয়াছি, এক এক ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ইতিহাস নূতন নূতন মুর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে । হিন্দুর গৌরব-রবি অস্তানত হইলে, সনাতন-ধর্ম্মের তেজোগর্ভ পরিম্লান হইয়া আসিলে, বৈদেশিক আক্রমণের করাল কবল হইতে ভারতবর্ষ যে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল ; তাহার কারণ—জৈন-ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নবীন উদ্দীপনা । ঐ দুই ধর্ম্মের নবীন আলোক ভারতবর্ষকে নব-জীবন দান করিয়াছিল । স্মৃতাং কি ধর্ম্ম-নৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি রাজনৈতিক, ভারতবর্ষের সর্ববিধ পরিবর্ত্তনের মধ্যে ঐ দুই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রভাব লক্ষ্য করিবার বিষয় । বৌদ্ধ-সাহিত্যে বৌদ্ধ-প্রভাবের বিষয় এবং জৈন-সাহিত্যে জৈন-প্রভাবের বিষয় পরিকীর্ণিত আছে । ঐ দুই সাহিত্যের মূল—উহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্র । বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিষয় পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি । এক্ষণে জৈন-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের একটু পরিচয় দিবার চেষ্টা পাইতেছি ।

জৈন-ধর্ম-শাস্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞা—‘সিদ্ধান্ত’ বা ‘আগম’। এই সিদ্ধান্ত বা আগম কোন সময়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা মতবিরোধ আছে। কোনও মতে মহাবীর স্বামীর

জীবিতকালে, কোনও মতে তাঁহার জন্মগ্রহণের পূর্ববর্তী সময়ে, আবার
 জৈনশাস্ত্র লিপিবদ্ধ। কোনও মতে তাঁহার নির্বাণলাভের সহস্র বৎসর পরে, সিদ্ধান্ত বা আগম

গ্রন্থ-সমূহ সঙ্কলিত হইয়াছিল। জৈনশাস্ত্র কল্পস্থত্রে মহাবীর স্বামীর যে জীবন-চরিত আছে, তাহার উপসংহারে ঐ সম্বন্ধে একটু আভাস পাই। কল্পস্থত্রে (পঞ্চম বাচনে, ১৪৮ম সূত্রে) ঐ অংশে উল্লেখ আছে,—‘মহাবীর স্বামীর নির্বাণলাভের পর নয় শতাব্দী অতীত হইয়া যায়। দশম শতাব্দীর অন্তীতি বর্ষে অথবা ত্রিানবতি বর্ষে জৈন-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।’ কল্পস্থত্রে এই উক্তির অনুসরণে সাধারণতঃ ৪৫৪ বা ৪৬৭ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সে মতে, দেবর্দ্ধি জ্ঞানী জৈনধর্মশাস্ত্র-সমূহ লিপিবদ্ধ করান। কাহারও কাহারও মতে উহাই প্রথম লিখন-চেষ্টা। কল্পস্থত্রে ঐ উল্লেখ ভিন্ন এ পক্ষে অল্প প্রমাণ বিশেষ কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরন্তু দেবর্দ্ধি কর্তৃক সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বেও উহা যে লিপিবদ্ধ অবস্থার বিদ্যমান ছিল, নানাপ্রকারে তাহা প্রতিপন্ন হয়। অপিচ, একটু অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারি যে, নানাস্থানে প্রাপ্ত পুঁথি-পত্র হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া দেবর্দ্ধি সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের বহুল-প্রচার পক্ষে প্রযত্নপর হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। ফলতঃ, দেবর্দ্ধির সময়ে জৈন-ধর্মশাস্ত্র যে প্রথম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা না বলিয়া ঐ সময়েই সর্ব-প্রথম জৈন-শাস্ত্র-সমূহ বিশেষভাবে প্রচারিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল বলা বাইতে পারে। সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে এরূপ সিদ্ধান্তের কয়েকটি কারণ নিয়ে উল্লেখ করিতেছি। তাহাতে বিষয়টি বোধগম্য হইতে পারে। প্রথমতঃ,—সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের ভাষা। যে প্রাকৃত ভাষায় উহা লিপিবদ্ধ, তাহা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ভাষা নহে। একদিকে জৈন-প্রাকৃত ও প্রাচীনতম পালিভাষা রাখিয়া তুলনায় আলোচনা করিলে এবং আর একদিকে জৈন-প্রাকৃত ও হাল সেতুবন্ধ প্রভৃতির প্রাকৃত-ভাষা রাখিয়া তুলনায় আলোচনা করিলে, প্রাচীনতম পালিভাষার সহিতই সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের প্রাকৃত-ভাষার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে। সুতরাং যে সময়ে দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধ-গণের ধর্ম-শাস্ত্র-সমূহ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহারই সমসময়ে সিদ্ধান্তগ্রন্থ-সমূহ সঙ্কলিত হওয়ার বিষয় মনে আসিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ,—জৈন-ধর্মশাস্ত্রে, আচার্য্যসূত্রে এবং সূত্রকৃতাজ্ঞ সূত্রে, মধ্যে মধ্যে যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাই, তাহা অতি প্রাচীনকালের ছন্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সূত্রকৃতাজ্ঞ সূত্রে সকল অধ্যয়নই (পাঠ) বৈতালীয় ছন্দে অধিত। ধর্মপদে এবং দক্ষিণ-দেশীয় বৌদ্ধগণের ধর্ম-গ্রন্থে প্রায়ই ঐ প্রাচীন ছন্দের প্রাধান্ত দেখি। ‘ললিত-বিস্তরে’ প্রাচীন গাথার মধ্যে যে বৈতালীয় ছন্দ দৃষ্ট হয়, সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের শ্লোকগুলি তদপেক্ষা পূর্ববর্তী কালের রচনা বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ নির্দেশ করেন। আরও, ধর্মপদে প্রভৃতি প্রাচীন পালি-গ্রন্থে আখ্যাছন্দের শ্লোক দৃষ্ট হয় না; কিন্তু আচার্য্যসূত্রে ও সূত্রকৃতাজ্ঞ-সূত্রে সেই প্রাচীন আখ্যাছন্দ দৃষ্ট হয়। এমন কি, ঐ দুই গ্রন্থের আখ্যাছন্দকে

প্রচলিত সাধারণ আখ্যাছন্দের জনস্রিতা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রচলিত সাধারণ আখ্যাছন্দ, সিদ্ধান্তশাস্ত্রের কোনও কোনও পরবর্তী অংশে, প্রাকৃত-ভাষার ও সংস্কৃত-ভাষার শাস্ত্রাদিতে একে উত্তর-দেশীয় বৌদ্ধদিগের ধর্ম-গ্রন্থে (ললিতবিস্তর প্রভৃতিতে) দৃষ্ট হয়। অল্প পক্ষে, ললিত-বিস্তরে যে সকল আধুনিক ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, জৈন-সিদ্ধান্তে তৎসমুদায়ের প্রবর্তনার অভাব। এই সকল কারণে ললিতবিস্তর প্রভৃতি লিখিত হইবার পূর্বে যে জৈন-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা মনে করা যাইতে পারে। এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারি, প্রাচীন পালির এবং ললিত-বিস্তর প্রভৃতির রচনার মধ্যবর্তীকালে জৈন-শাস্ত্র-সমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন,—রাজা বত্তগামিনীর সময়ে পালি পিটক-গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ হয়। বত্তগামিনী ৮৮ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য,—ঐ সময়ে লিপিবদ্ধ হইলেও পালি পিটক-গ্রন্থ-সমূহের বিত্তমানতা উহার কয়েক শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ঐ সময়ে বহু আলোচনার পর ম্যাক্সমুলার সিদ্ধান্ত করেন যে, ৩৭৭ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বৌদ্ধসভ্যে বৌদ্ধধর্ম-শাস্ত্রসমূহ সঙ্কলিত হয়। পরবর্তীকালে উহার মধ্যে অনেক পরিবর্তন পরিবর্তন সাধিত হইলেও খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীই বৌদ্ধ-পিটক-সাহিত্য লিপিবদ্ধ হওয়ার কাল বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই হিসাবে জৈন-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রও খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীরই গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ললিত-বিস্তর ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনা-ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। জৈনসিদ্ধান্তশাস্ত্র যে ললিতবিস্তরের পূর্ববর্তী কালের রচনা, তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সে কত পূর্বের রচনা, তাহাও একটু অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। খেতাষর জৈনগণের মধ্যে একটা কিছদস্ত্রী আছে,—এক সময়ে দ্বাদশবর্ষব্যাপী হুর্ভিক উপস্থিত হয়। ভদ্রবাহু তখন প্রথম ধর্মগ্রন্থের ‘পট্টচর’ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময়ে পাটলিপুত্রে একটা সজ্ব আহুত হয়, এবং সেই সজ্ব অঙ্গ-শাস্ত্রসকল সংগৃহীত হইয়াছিল। ভদ্রবাহুর লোকান্তর সম্বন্ধে খেতাষরগণ ১৭০ বহ্লবী অব্দ এবং দিগম্বরগণ ১৬২ বহ্লবী অব্দ নির্দেশ করেন। এই হিসাবে, খেতাষরগণের নির্দেশক্রমে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভদ্রবাহুর বিত্তমানতা প্রতিপন্ন হয়। চন্দ্রগুপ্ত ১৫৫ বহ্লবী অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ৩১৫—২৯১ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল নির্দেশ করেন। ওয়েষ্টারগার্ড এবং কার্ণ প্রভৃতির মতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রাপ্তির অব্দ ৩২০ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দ নির্দিষ্ট হয়। যাহা হউক, এ গণনার পার্থক্য অতি সামান্য; অপিচ, এ গণনামতে জৈন-ধর্ম-শাস্ত্র (অঙ্গ) খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করা আবশ্যক। পাটলিপুত্র-নগরে প্রোক্ত সজ্ব ভদ্রবাহুর সহায়তা ব্যতীত একাদশ অঙ্গ সঙ্কলিত হওয়ার বিষয় প্রচারিত আছে। দিগম্বরগণ ভদ্রবাহুকে আপনাদের নেতৃস্থানীয় বলিয়া মনে করেন বটে; কিন্তু খেতাষরগণ ভদ্রবাহুর সহচর হুবির ‘সমুত’ হইতে ‘হুবির’-পদের গণনা করিয়া থাকেন। তদনুসারে পাটলিপুত্রের সজ্ব যে অঙ্গনিচর সংগৃহীত হয়, তাহা কেবলমাত্র খেতাষরগণের ধর্মশাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল; অর্থাৎ—

সমগ্র জৈন-সম্প্রদায় সে অঙ্গ সমুদায় একবাক্যে মান্য করেন নাই। পরিশেষে ত্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে স্থলভ্রমের অধিনায়কত্বে ধর্মশাস্ত্র সংকলিত হওয়ার অপর পক্ষের অভাব বিদূরিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অতএব জৈন-শাস্ত্র-সাহিত্য ৩০০ পূর্ব-ত্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ জৈন-ধর্ম প্রতিষ্ঠার ২০০ বৎসর পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তার পর, উহারও পূর্বে জৈনদিগের যে কোনও শাস্ত্র লিপিবদ্ধ ছিল না, তাহাও মনে করা যায় না। শ্বেতাশ্বর এবং দ্বিগম্বর উভয় জৈন-সম্প্রদায় মধ্যেই প্রবাদ আছে যে, অঙ্গ-শাস্ত্র ভিন্ন তাঁহাদের আরও এক প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ ছিল। তাহার নাম,—‘পূর্ব’। সেই ‘পূর্ব’ শাস্ত্রের সংখ্যা চতুর্দশ বলিয়া উক্ত হয়। সেই পূর্ব-শাস্ত্রের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বরগণ কিন্তু বলেন,—

পূর্ব-শাস্ত্র। চতুর্দশ পূর্বশাস্ত্র এখন দ্বাদশ ‘অঙ্গের’ মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। আর সেই দ্বাদশ অঙ্গের অঙ্গীভূত ‘দৃষ্টিবাদ’ এখন লোপপ্রাপ্ত। ১০০০ বহুবী অঙ্গ হইতে দৃষ্টিবাদ অদৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তবে দৃষ্টিবাদের স্মৃতরাং ‘পূর্বশাস্ত্রের’ আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সমবায়ঙ্গ নামক চতুর্থ অঙ্গে এবং নন্দী-সূত্রে কিছু কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ‘পূর্বশাস্ত্র’ সমুদায়, দৃষ্টিবাদ সহ, একই গ্রন্থ ছিল বা উহাতে বহু গ্রন্থের সার-সংকলন ছিল, তাহা এখন নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। তবে সে সম্বন্ধে নানা মতাস্তর আছে। যাহা হউক, পূর্বশাস্ত্রের বিদ্যমানতার বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। আপন ধর্ম-শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব খাপন বাপদেশে উহার পরিকল্পনা বলিয়া মনে করা যায় না। কেন-না, যাবৎ সৃষ্টি, তাবৎ অঙ্গ-শাস্ত্রের বিদ্যমানতা,—এই বানীই যখন তারশ্বরে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, তখন পূর্বশাস্ত্রের ঐরূপ পরিকল্পনা নিরর্থক। তবে ‘পূর্ব’ এই নামে, সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ববক্তিকালের কোনও শাস্ত্র-গ্রন্থকে বুঝাইতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ। পাটলিপুত্রের সজ্বে অঙ্গশাস্ত্র সংকলিত হওয়ার সময় ‘পূর্ব’-শাস্ত্রের স্মৃতি মলিন হইয়া আসিতেছিল। ভদ্রবাহুর পরে, চতুর্দশ ‘পূর্বের’ পরিবর্তে দশটি মাত্র ‘পূর্বের’ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার পর ক্রমেই তাহার লোপ পাইল বা অপর্যায় অঙ্গ মিশাইল। পূর্বশাস্ত্রের একপভাবে বিলোপ-প্রাপ্তির কারণ অবশ্যই আছে। উহার একটা প্রধান কারণ এই মনে হয় যে, উহার আবশ্যকতা লোপ পাইয়াছিল। দৃষ্টিবাদ নামের বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারি, উহাতে জৈনগণের এবং অপর ধর্ম-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত আলোচিত হইয়াছিল। ‘পূর্ব’ শব্দের সহিত ‘প্রবাদ’-শব্দের সংযোগ ঘটয়াছিল বলিয়া যখন জানিতে পারি, তখন আরও মনে হয়, উহাতে মহাবীর স্বামীসহিত তাঁহার বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বিগণের বিচার-বিতণ্ডা বিবৃত ছিল। মহাবীর স্বামী কোনও নব-ধর্মের প্রবর্তনা করেন নাই। তিনি পুরাতনের—সনাতনেরই—এক অঙ্গের সেবার ব্যাপৃত ছিলেন। স্মৃতরাং, বিরুদ্ধবাদিগণের প্রতিবাদে তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা পুরাতন বা পুরাতনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। তিনি ‘পূর্ব’ শাস্ত্রে যদি নূতন কিছু প্রচার করিতেন, তাহা হইলে তাহার আর এক প্রকারের মূল্য থাকিত। কিন্তু যখন তাহা বাদ-প্রতিবাদ মূলক, তখন বাদ-প্রতিবাদের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আবশ্যকতার অবসান

ঘটিল। মহাবীরের বিরুদ্ধবাদীরা যখন বিলুপ্ত হইল, তাঁহার বিরুদ্ধ সম্প্রদায় যখন লোপ পাইল, তখন আর বিতর্কমূলক সে দার্শনিক গ্রন্থের কি আবশ্যকতা রহিল? ঐতিহাসিকের নিকট, সমালোচকের নিকট, প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট তাহার মূল্য থাকিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মাভিগত জনের তাহাতে কি প্রয়োজন? খুব সম্ভব, সেই অপ্রয়োজনীয়তা নিবন্ধনই ‘পূর্ব’-শাস্ত্র গ্রন্থ-নিচয় লোপ পাইয়াছে। ফলতঃ, আর কোনও কারণই নয়; জৈনধর্ম্ম-প্রবর্তক মহাবীর স্বামীর নির্দোষ-লাভের পরবর্তী দুই শতাব্দীর মধ্যে জৈনধর্ম্ম-সম্প্রদায় এতই ত্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিল যে, তখন আর যথা বিতণ্ডার বিষয়ে মনোনিবেশ করা তাঁহারা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। যখন ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহ নূতন আকারে সুসমৃদ্ধ হইয়া আসিল, তখন আর পূর্ব-শাস্ত্রের আবশ্যকতাই রহিল না। এইরূপে বুঝা যায়, পূর্বের বাহা ছিল, তাহা কালের গর্ভে বিলুপ্ত হইলেও, এখনও যে সকল জৈন-শাস্ত্র প্রবর্তিত আছে, খুব অল্প দিনের হইলেও, তাহার মধ্যে অনেকগুলি খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষেরা তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সিদ্ধান্তই তাহার আদি।

সিদ্ধান্ত বা আগম-শাস্ত্র কল্পসূত্র নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। উহার সংখ্যা সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। কোনও মতে সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রের সংখ্যা—পঁয়তাল্লিশ খানি; কোনও মতে

আগম বা কল্পসূত্র নামে উহার সংখ্যা—পঞ্চাশ খানি। * কিন্তু অমুসন্ধান
জৈন সিদ্ধান্ত-
শাস্ত্র। সংখ্যার নুনাধিক্য এবং নামের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, সিদ্ধান্ত

বা আগম-শাস্ত্র-সমূহকে সাধারণতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে; যথা,—(১) অঙ্গ, (২) উপাঙ্গ, (৩) পয়ঙ্গ অর্থাৎ প্রশ্ন, (৪) ছেদসূত্র, (৫) মূলসূত্র, (৬) সূত্র। ইহাদের মধ্যে অঙ্গের সংখ্যা দ্বাদশ বলিয়া উক্ত হয়। যথা,—আচার্য্যঙ্গ, সূত্র-কৃত্যঙ্গ, স্থান্যঙ্গ, সমবায়ঙ্গ, ভগবত্যাঙ্গ, জ্ঞাতৃধর্ম্মকথাঙ্গ, উপাসক-দশাঙ্গ, অন্তরুদ্দেশ্যঙ্গ, অমুত্তরোপপাতিক্যাঙ্গ, প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গ, দীপক্যাঙ্গ, দৃষ্টিবাদাঙ্গ। ইহার মধ্যে শেষোক্ত অঙ্গ অর্থাৎ দৃষ্টিবাদ লোপ পাইয়াছে; এবং আচার্য্যঙ্গ ও সূত্রকৃত্যঙ্গ বিশেষভাবে প্রচারিত আছে। উপাঙ্গের সংখ্যাও দ্বাদশ; যথা,—উপপাতিক, কল্পাবতংসিকা, চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি, জম্বুদীপ-প্রজ্ঞপ্তি, জীবভিগম, নিরয়াবলী, পুষ্পচুলিকা, পুষ্পিকা, প্রজ্ঞাপনা, সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি, রাজপ্রশ্নীয়, বৃক্ষদশা, কল্পিকা (কল্পিয়া)। এইরূপ পয়ঙ্গের সংখ্যা দশ খানি; যথা,—আতুর, গণিবীজ, চতুঃশরণ, চন্দ্রাবীজ, দেবেন্দ্র-স্তব, প্রত্যাখ্যান, ভক্তপরিজ্ঞা, মহাপ্রত্যাক্ষ্যান, বীরস্তব। ছেদসূত্রের সংখ্যা ছয় খানি; যথা,—দশশ্রুতস্কন্ধ, নিশীথ, মহানিশীথ, বাবহার, বৃহৎকল্প, পঞ্চকল্প। মূলসূত্রের সংখ্যা চারিখানি; যথা,—উত্তরাধায়ন, আবশ্যক, দশটৈবকালিক, পিণ্ডনিষ্যক্তি। কোনও কোনও মতে সূত্রগ্রন্থের সংখ্যা আরও অনেক অধিক। কল্প, দশটৈবকালিক, ক্ষেত্রসমাস, চতুঃবিংশতি, নবতত্ত্ব, প্রতিক্রমণ, সংগ্রহণী, স্মরণ, পক্ষী প্রভৃতি গ্রন্থ সে মতে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধান্তধর্ম্মসার মতে—মূলসূত্র, কল্পসূত্র ও পয়ঙ্গের সংখ্যা ও সংজ্ঞা অন্তরূপ লিখিত আছে। সে মতে, দশখানি পয়ঙ্গের নামের একটু পরিবর্তন দেখি। গণিবীজের পরিবর্তে

সিদ্ধান্ত-ধর্ম্মসারে ৫০ খানি আগম বা কল্পসূত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু রত্নসাগরের মতে আগমের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত মতই এখন জৈনগণ মান্ত করেন।

গণবিভক্তা, চন্দ্রাবীজের পরিবর্তে চন্দ্রাবিজয়; সংস্কার পরিবর্তে সংস্কার নাম দৃষ্ট হয়; এবং আত্মর নামের পরিবর্তে মরণসমাধি নাম দেখিতে পাই। মূলসূত্রের মধ্যে উত্তরাধ্যায়ন স্থলে বিশেষাবশ্যক এবং গিণ্ডিনিয়ুক্তি স্থলে পাক্ষিক নাম প্রযুক্ত আছে। সিদ্ধান্ত-ধর্মসার মতে—কল্পসূত্র পাঁচখানি, মূলসূত্র চারিখানি এবং সাধারণ সূত্র ছয়খানি। সে মতে, উত্তরাধ্যায়ন, নিশীথ, কল্প, ব্যবহার ও জিতকল্প এই পাঁচখানি কল্পসূত্র; এবং মহানিশীথ-বৃহৎচাচনা, মহানিশীথ-লঘুবাচনা, মধ্যমবাচনা, গিণ্ডিনিয়ুক্তি, ওষনিয়ুক্তি, পর্যায়ণাকল্প—সাধারণ সূত্রের অন্তর্ভুক্ত। সিদ্ধান্ত, আগম বা কল্পসূত্র ভিন্ন জৈনগণের মধ্যে আরও তিন শ্রেণীর প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ,—জ্ঞান-কাণ্ডের অন্তর্গত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে; আত্মাত্মশাসন, আরাধনাপ্রকার, উপদেশমালা, উপাধানবিধি, একবিংশতিস্থান, প্রমোত্তররত্নমালা প্রভৃতি; দ্বিতীয়তঃ,—স্ববগ্রন্থ, স্ববভস্বব, কল্যাণমন্দিরস্বব, পার্শ্বনাথস্বব, বৃহৎশাস্ত্রস্বব, শাস্ত্রিজিনস্বব প্রভৃতি; তৃতীয়তঃ,—পুরাণপরম্পরা; হিন্দুপুরাণের আদর্শে রচিত; পদ্মপুরাণ, মহাবীর-চরিত, নেমিরাজর্ষিচরিত, চিত্রসেনচরিত প্রভৃতি। জৈনদিগের মধ্যে এইরূপ প্রচার আছে যে, তাঁহাদের আগমসমূহ মহাবীর স্বামী তাঁহার প্রধান দুই জন শিষ্যের নিকট প্রথম বাক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দুই শিষ্যের এক জনের নাম গৌতম বা ইন্দ্রভূতি, অপর জনের নাম সূর্যস্বামী। মহাবীরের বিদ্যমান কালেই ইন্দ্রভূতি নির্বাণপ্রাপ্ত হন। সুতরাং মহাবীরের পর সূর্যস্বামীই ধর্মোপদেষ্টার আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সূর্যস্বামীর নিকট জম্বুস্বামী আগমশাস্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হন। তৎপরে পর্যায়ক্রমে প্রভব, শযাস্তব, যশোভদ্র, সম্ভূতি, বিজয় এবং পরিশেষে ভদ্রবাহু আগমশাস্ত্র লাভ করেন। ইহার পর স্থলভদ্র আগমশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্থলভদ্রের পূর্ববর্তী আগমশাস্ত্রবিৎ মহাশ্রগণ ‘ঋতকেবলী’ সংজ্ঞার অভিহিত হন এবং স্থলভদ্র হইতে তৎপরবর্তী জৈনাচার্যগণ ‘পটুধর’ (প্রধানাচার্য) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। জৈনশাস্ত্র মতে, যিনি কেবলী, কেবলজ্ঞানী, তিনি শুদ্ধজ্ঞানী, তিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন। ‘কেবল’ অবস্থাই মুক্ত অবস্থা। সাধারণে যে নিঃশ্রেয়স মুক্তি, পতঞ্জলির যে কৈবল্যালাভ, কেবলীর সেই নির্বাণ-মুক্তির অবস্থা। কথিত হয়, মহাবীর স্বামীর প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্দ্রভূতি সম্পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন। সুতরাং কেবলী হইয়াছিলেন; অতএব তাঁহাকে আর আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইতে হয় নাই। সুতরাং সূর্যস্বামী হইতেই পটুধর সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয়। সেই পটুধরগণের মধ্যে ভদ্রবাহু পর্যন্ত ঋতকেবলী অর্থাৎ তাঁহাদের সমস্ত পর্যন্ত জৈন আগমশাস্ত্র স্রুতিক্রমে বিত্তমান ছিল, মনে করা যাইতে পারে। পরবর্তিকালে পটুধরগণ নানারূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহ আগমশাস্ত্র সকলন করিতে আরম্ভ করেন। জম্বুস্বামীর সময়ে কোনও কোনও বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। শযাস্তবস্বামীর সময়ে দশটৈবকালিক সূত্র প্রণয়নে বিরোধ নিবারণের চেষ্টা হয়। এইরূপে বিভিন্ন পটুধরের সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ সকলিত হওয়ার জৈনসাহিত্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। পূর্বে যে সিদ্ধান্ত বা আগমশাস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথমে উহা জৈনসাধারণের মাজ ছিল বটে; কিন্তু পরিশেষে জৈনসম্প্রদায় খেতাবর ও দিগম্বর দুই শাখার বিভক্ত হইলে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুসরণ সম্বন্ধেও মতবৈধ বটে।

দিগম্বর জৈনগণ আপনাদের জন্ম কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়া লন। * তাহার। আপনাদের মাত্র শাস্ত্রগ্রন্থকে (ঐতজ্ঞানকে) তিন ভাগে বিভক্ত করেন। সেই তিন ভাগ,—অঙ্গ, পূর্ব, অঙ্গবাহ। ইহাদের মধ্যেও অঙ্গের সংখ্যা দ্বাদশ নির্দিষ্ট। তবে, নামের কিছু পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। পঞ্চম অঙ্গে সিদ্ধান্তশাস্ত্রের ভগবত্যাঙ্গ নাম আছে; কিন্তু দিগম্বরদিগের ঐতজ্ঞানে ঐ পঞ্চম অঙ্গের নাম—ব্যাখ্যাগ্রন্থশাস্ত্র। অন্য অঙ্গের নাম সম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না; মাত্র ‘উপাসক-দশাঙ্গ’ নাম ‘উপাসকাদ্যায়নঙ্গ’ নামে এবং ‘বিপাক্যাঙ্গ’ ‘বিপাকসূত্রাঙ্গ’ নামে অভিহিত হইয়াছে দেখি। অপিচ, দৃষ্টিবাদ সম্বন্ধে উহারি অঙ্গরূপ পাঁচ খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পরিচিত হয়; যথা,—পরিকর্ম, পরিকর্ম-পঞ্চক, সূত্র, প্রথমমুখ্যোংগ, চতুর্দশ সংখ্যক পূর্বগত, চুগিকা-পঞ্চক। ঐ মতে অঙ্গ-বাহ্যের সংখ্যা চতুর্দশ। এই হিসাবে মোট গ্রন্থসংখ্যা চল্লিশ।

অধুনা জৈনশাস্ত্রগ্রন্থের সংখ্যা বতই হউক না কেন, সিদ্ধান্ত বা আগমশাস্ত্রের অন্তর্গত ‘আচার্যাঙ্গ ও সূত্রকৃত্যাঙ্গ যে প্রাচীন গ্রন্থ, তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আচার্য্য
সূত্র।

কি খেতাবর, কি দিগম্বর, উভয় জৈন-সম্প্রদায়ই ঐ দুই গ্রন্থকে এক-

বাক্যে মাত্র করেন। আচার্য্য জৈনধর্মের প্রাণভূত। আচার্য্য-সূত্র

যেমন অঙ্গশাস্ত্রের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে, তেমনি উহা

জৈন-ধর্ম-সৌধের মূলস্তম্ভরূপ ষতি-সন্ন্যাসিগণের কর্তব্য নির্ধারণে ভিত্তিস্থানের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া গিয়াছে। ঐ গ্রন্থের আর এক নাম—সামাজিক। আচার্য্য বা চরিত্রের বিষয়, চারি অঙ্গযোগে বা শিরোনামার উহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই চারি অঙ্গযোগের নাম,—ধর্মকথা, গণিত, দ্রব্য, চরণ-করণ। আচার্য্য-সূত্র দুই খণ্ডে বা ঐতজ্ঞানে বিভক্ত। ঐ দুই খণ্ডের রচনা-পদ্ধতি এবং বিবৃতি-পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দ্বিতীয় খণ্ডে উপবিভাগ-সমূহ চুলা অর্থাৎ পরিশিষ্টরূপে সংগ্রহিত। তাহাতে, প্রথম খণ্ডের তুলনার শেষ খণ্ডের আধুনিকত্ব অপ্রতীত হয়। আচার্য্য-সূত্রের যে সকল টীকা অধুনা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শীলাঙ্গ-বিরচিত টীকাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আচার্য্য-সূত্রের দ্বিতীয় খণ্ড যে পরবর্তী কালের রচনা, শীলাঙ্গ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক মত এই যে, গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ—গ্রন্থের প্রারম্ভে, মধ্যস্থলে এবং উপসংসারে সন্নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু শীলাঙ্গ দেখাইয়াছেন যে, প্রথম ঐতজ্ঞানের অন্তর্গত প্রথম অধ্যায়নের প্রথম উদ্দেশ্যকের প্রথম পংক্তিতে, পঞ্চম অধ্যায়নের পঞ্চম উদ্দেশ্যকের প্রথম পংক্তিতে এবং অষ্টম অধ্যায়নের চতুর্থ উদ্দেশ্যকের ষোড়শ কবিতার শেষার্ধ্বে মঙ্গলাচরণ দৃষ্ট হয়। এতদ্বারা বেশ উপলব্ধি হয় যে, অষ্টম অধ্যায়নই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। তাহার পর যে দ্বিতীয় খণ্ড, তাহা প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টরূপে পরবর্তী সময়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, নানা কারণে তাহা সিদ্ধান্ত হয়। কেননা, প্রথম খণ্ডকেই সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ধর্মবিশ্বাসী জন কেবল করিয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হয় এবং পরিশেষে চরম পরিণতি নির্দোষ লাভ করে, এই

* মহাবীর স্বামী নরসিং-লাভের পরবর্তী ৬০১ম বর্ষে [শতাব্দী] কর্তৃক দিগম্বর মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিবহুতি বৃকস্মারক শিবা। বিশেষভাবে কথিত দিগম্বর মতের বিবরণ আছে।

অংশে প্রহেলিকাপূর্ণ ভাবার তাহা বিবৃত আছে। প্রথম ঋতস্কন্ধের শেষ অধ্যায়নটী একরূপ সাধারণ গাথার আকারে লিখিত; ঐ অংশে জৈনধর্ম-প্রবর্তক মহাবীর স্বামীর গৌরবময় জীবনের ভীষণ পরীক্ষার বিষয় বিবৃত আছে। কেহ কেহ ঐ অংশকে পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া মনে করিলেও, ঐ অংশে প্রকৃত সন্ন্যাস-জীবনের যে উচ্চ আদর্শ অঙ্কিত রহিয়াছে, জৈন-জীবন-গঠনের পক্ষে তাহা অশেষ সহায়তা করে। প্রথম খণ্ডের অধিকাংশ গল্পে লিখিত—বিশৃঙ্খলভাবে বিবৃত। অনেকত্র বাক্যের অংশমাত্র আছে এবং কোথাও কোনও বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ করাই দুঃসাধ্য। এই অংশ দেখিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূত্রগ্রন্থের বিষয় মনে পড়ে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, সূত্রগ্রন্থের সূত্রসমূহের কোথাও ক্রমভঙ্গ হয় নাই; তথায় সর্বথা চিন্তার গতি জ্ঞানায়ুগত শ্রেণিবদ্ধভাবে চলিয়াছে। কিন্তু আচার্য্য-সূত্রে সে ক্রম-রক্ষার—চিন্তার পৌরীপৌর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব। এই গ্রন্থের কোথাও কবিতাংশ, কোথাও বা সম্পূর্ণ একটী কবিতা পর্য্যন্ত গল্পের মধ্যে মিশিয়া আছে। সেই সকল কবিতার বা পদের অধরূপ কবিতা বা পদ, সূত্রকৃতান্তে, উত্তরাধায়নে এবং দশতৈকালিক সূত্রে পরিদৃষ্ট হয়। এতদৃষ্টে সিদ্ধান্ত হয় যে, ঐ সকল পদ পূর্ববর্তী কোনও প্রাচীনতম গ্রন্থের আদর্শ পদ, ঐ ভাবে পূর্বাপর প্রসূত হইয়া আসিয়াছে। কেবল পদ বা কবিতা সম্বন্ধে নহে; অসম্পূর্ণ বাক্যাংশ-বিশিষ্ট কতকগুলি গল্পও ঐরূপ বিক্ষিপ্তভাবে আছে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, টীকাকারগণ ঐ সকল অসম্বন্ধ পদ ভাঙিয়া চুরিয়া উহার একরূপ অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন; আর, তদনুসারে এখন উহার ভাষান্তর হইতেছে। ভাষান্তরে অনেক স্থলে পুনরাঙ্কিত দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ, টীকাকারগণকে সূত্র-গ্রন্থের অনেক অসম্পূর্ণ অংশ পূরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। কথিত হয়, আচার্য্য-সূত্রের প্রথম ঋতস্কন্ধে পূর্বে নয়টী অধ্যায়ন ছিল; তদন্তর্গত মহাপরিম্না অধ্যায়নটী এখন লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, সেই নবম অধ্যায়নটী এখন সমবায়াজ, নন্দী, আবজ্ঞক, নিরুক্তি, বিদ্ধি ও প্রভা প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু অত্নাত্ন মতে, উহা অষ্টম অধ্যায়নেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ আবার এইরূপ মনে করেন যে, মহাপরিম্নার অধ্যয়নে বর্ণিত বিষয় দ্বিতীয় ঋতস্কন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত আছে; সূত্ররাজ প্রথম ঋতস্কন্ধ হইতে ঐ অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আচার্য্য-সূত্রের দ্বিতীয় খণ্ড চারি অংশে (চুলায়) বিভক্ত। প্রথমে উহাতে পাঁচটী ‘চুলা’ ছিল বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু পঞ্চম চুলাটী এক্ষণে ‘নিসীহিয়াজ্ঞান’ নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আচার্য্য সূত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম দুই অংশে আচার-সংক্রান্ত নিয়মাবলী লিখিত আছে। প্রথম খণ্ডের ভাষা হইতে এই দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উহা সূত্রাকারে লিখিত নহে; পরন্তু বড়ই জটিল ভাষায় নিবদ্ধ। ঐ অংশে এমন কতকগুলি শব্দ আছে, যাহার অর্থবোধ সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্যের পক্ষে দুর্ব্বল; কেন-না, সন্ন্যাসীদের বিশেষ ক্রিয়াপদ্ধতির পরিচয়ে ঐ সকল শব্দ ব্যবহৃত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে (চুলায়) যে সকল বিষয় লিখিত আছে, সীমন্ধর-নামধেয় পূর্ববিদেহ-নিবাসী জনৈক জিন কর্তৃক স্থূলভদ্রের কোষ্ঠা ভগ্নীর নিকট উহা বিবৃত হইয়াছিল। আচার্য্য-সূত্রের শেষাংশের রচনা সম্বন্ধে বৈরূপ উক্তি দেখিতে পাই, বলসূত্রের কিয়দংশ সম্বন্ধেও তজ্জন

উক্তির প্রচার আছে। বর্ণিতব্য বিষয়ও উভয়ত্র প্রায় অভিন্ন। আচার্য-স্বত্বের দ্বিতীয় অংশের তৃতীয় অংশে (চুণায়) মহাবীর স্বামীীর জীবন-চরিতের উপাদান আছে। ঐ উপাদান হইতে কল্প-সূত্র লিখিত হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। আচার্য-স্বত্বের অনেক গণ্ডাংশ নামমাত্র পরিবর্তিত আকারে কল্প-সূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাই। কল্প-সূত্রে বর্ণনার বাহ্যনাত দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঐতিহাসিক উপাদান উহাতে বড়ই অল্প। আচার্য-স্বত্বের যে সকল অংশ কল্প-সূত্রে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তদতিরিক্ত আচার্য-স্বত্বের গাথা বা কবিতাগুলি কল্প-সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। অপিচ, আচার্য-স্বত্বের প্রথম ঐশ্বর্য্যক্কে, অষ্টম অধ্যায়ের আখ্যাছন্দের যে সকল গাথা আছে, তাহার সঠিত ঐশ্বর্য্যক্কের অন্তর্গত আখ্যাছন্দে লিখিত গাথা-সমূহের তুলনায় আলোচনা করিলে, উভয়ের মধ্যবর্তী কাণ-বাববান বহুবিবৃতি বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তৃতীয় চুণায় শেষাংশে জৈনগণের পঞ্চ মহাব্রত এবং তাহাদের পঞ্চাবংশিত উপাবভাগ আছে। চতুর্থ চুণায় দ্বাদশ শ্লোকে আচার্য মুক্ত-প্রসঙ্গ উত্থাপিত। ঐ অংশের রচনা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আচার্য-স্বত্বের যে সকল টীকা ও ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে শীলাঙ্ক-কৃত টীকাই প্রাচীন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ৭৯৮ শকে (৮৭৬ খৃষ্টাব্দে) ঐ টীকা রচনা শেষ হইয়াছিল। টীকার নাম—তত্ত্ব বখা; বাহরি সাধু ঐ টীকা-রচনার শীলাঙ্ককে সাহায্য করিয়াছিলেন। আচার্য-স্বত্বের দ্বিতীয় টীকার নাম—‘দীপিকা’। ঐ টীকার রচয়িতার নাম ‘জিনহংস সুরি’। ‘বৃহৎ খরতরগচ্ছ’ নামধের জৈন-সম্প্রদায়ের তিনি গুরু ছিলেন। শীলাঙ্কের টীকা এই ‘দীপিকায়’ যেন বর্ণে-বর্ণে উদ্ধৃত হইয়াছে। দীপিকায় সংক্ষেপে টীকার সারভাগ লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু সে সংক্ষিপ্তীকরণ নামে আজ; কেন-না, প্রতি অধ্যায় ও উদ্দেশক আরম্ভের সূচনায় নিরুক্তি গাথার উপর শীলাঙ্ক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, দীপিকায় মাত্র তদ্বিধাই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আচার্য-স্বত্বের তৃতীয় টীকা—পার্শ্ব-চন্দ্রের লিখিত ‘বালাবোধ’। উহা গুজরাটী ভাষায় লিখিত নির্ঘণ্ট-বিশেষ। দ্বিতীয় অধ্যায়নের কোনও কোনও অংশ পূর্ববর্তী টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়া যান নাই। এই নির্ঘণ্ট সেই সকল অংশের ব্যাখ্যায় বিশেষ সহায়তা করে। ইহা প্রাচীন টীকা-সমূহের, বিশেষতঃ ‘দীপিকার’ অনুসরণকারী।

আচার্য-স্বত্বের পরই স্বত্র-কৃতান্তের স্থান নির্দিষ্ট হয়। উহা অঙ্গ-গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। স্বত্র-কৃতান্তের প্রধান লক্ষ্য এই যে, বিভিন্ন বিরুদ্ধ ধর্ম-সম্প্রদায়ের গুরুগণের কবল হইতে যুগক যতিগণের আত্মরক্ষায় সাহায্যদান। তাহারা যাহাতে

স্বত্র-কৃতান্ত। সভ্য-ধর্মে আস্থাবান হন এবং চির-শাস্ত্রের পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তৎ-

পক্ষে সহায়তা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। চতুর্থ অঙ্গ-গ্রন্থে যে সার-সঙ্কলন পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতে স্বত্র-গ্রন্থের ঐরূপ পরিচয়ই দেখিতে পাই। মূলতঃ, ঐরূপ লক্ষ্য থাকিলেও স্বত্র-কৃতান্তের আলোচ্য বিষয়-সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে, উহাতে অস্তিত্ব নানা জাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে দেখিতে পাই। স্বত্র-কৃতান্তে প্রথমে বিভিন্ন বিরুদ্ধ ধর্ম-মতের প্রতিবাদ দৃষ্ট হয়। তৎপরে সাধারণভাবে পবিত্র জীবন-বাণনের এসকল উত্থাপিত।

সন্ন্যাসী জীবনে কিরূপ বিধম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়, সন্ন্যাসের পথে কিরূপ প্রবল প্রোভোজন পরম্পরা বিদ্যমান আছে, অপবিত্র জীবন-বাগনের জন্ত কি কঠোর শাস্তি পুরোভাগে অপেক্ষা করিতেছে, আর ধর্ম-প্রাণতার আদর্শ-স্থানীয় মহাবীর স্বামীর গুণানু-কীর্তন কিরূপভাবে করিতে হয়, প্রথম শ্রতস্কন্ধে এবস্ত্রাকার উপদেশ-সমূহ বিস্তৃত আছে। দ্বিতীয় শ্রতস্কন্ধে প্রাপ্যমতঃ গদ্য প্রবন্ধে প্রথম শ্রতস্কন্ধে বর্ণিত বিষয়ই কতকটা অবিচ্ছিন্ন-ভাবে লিপিবদ্ধ দেণ। তজ্জন্ত এই দ্বিতীয় শ্রতস্কন্ধকে কেহ কেহ প্রথম শ্রতস্কন্ধের পারিশিষ্টরূপে পরবর্তী কাণের সংযোজিত অংশ বলিয়া মনে করেন। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পরবর্তী চতুর্থ বর্ষে সূত্র-কৃত্যঙ্গ পাঠের কিম্বদন্তী প্রচারিত থাকিলেও সূত্র-কৃত্যঙ্গের শেষাংশ যুবক যতিগণের জন্ত নির্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। ঐ অংশে নানা প্রকার ছন্দ এবং নানা বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া উহা যতিগণের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিহিত হইয়াছিল বলিয়াও মনে হইতে পারে। তদনুসারে প্রথমাংশের রচয়িতা স্বতন্ত্র ও একাধিক বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। সূত্র কৃত্যঙ্গের যে সকল টীকা ও ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে ভদ্রবাহুর নিরুক্তি-সংযুক্ত শীলাঙ্ক-কৃত টীকা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। শীলাঙ্কের পূর্বেও যে প্রাচীন টীকা প্রচলিত ছিল, শীলাঙ্ক তাহা উল্লিখ করিয়া গিয়াছেন। শীলাঙ্ক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে বিদ্যমান ছিলেন, আচারার্য-সূত্রের টীকা-পরিসমাপ্তি-গ্রন্থে তাহার আভাস পাই। 'দীপিকা' নামে সূত্র কৃত্যঙ্গের আর এক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হর্ষকুল কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। ১৫৮৩ সম্বতে (১৫১৭ খৃষ্টাব্দে) ঐ টীকা লিখিত হয়। ঐ টীকা ব্যতীত পার্শ্বচন্দ্রের লিখিত 'বালাববোধ' নামক গুজরাটী ভাষার নির্ঘণ্ট সূত্রকৃত্যঙ্গের আর এক টীকা-মধ্যে পরিগণিত।

উত্তরাধ্যায়ন—সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের শেষ পর্যায়ভুক্ত। সূত্রকৃত্যঙ্গে যে সকল বিষয় যে উদ্দেশ্যে বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরাধ্যায়ন তাহার সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। সূত্রকৃত্যঙ্গে যাচা সংক্ষেপে আলোচিত, উত্তরাধ্যায়নে তাহা একটু বিশদভাবে ও নৈপুণ্য-উত্তরাধ্যায়ন। সহকারে বিস্তৃত। যুবা যতিগণকে তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য পালনে

উপদেশ দান—উত্তরাধ্যায়নের প্রধান লক্ষ্য। সন্ন্যাস-জীবনের উপযোগিতার উপদেশ-প্রদান ও দৃষ্টান্ত-পরম্পরা-প্রদর্শন, আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশের পথে যে বিঘ্ন-বিপত্তি তাহা হইতে সতর্কী-করণ, যুক্তি-যুক্ত জ্ঞান-বিস্তরণ প্রভৃতি উত্তরাধ্যায়নের আলোচ্য বিষয়। এই গ্রন্থে কখনও কখনও বিধর্মী সম্প্রদায়ের ধর্ম-নীতির বিষয় উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদ নাই। ইহাতে মনে হয় যে, ঐ সময়ে বিরুদ্ধবাদী ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কিছু কমিয়া আসিয়াছিল, এবং তৈন সম্প্রদায়ের ভিত্তি একটু দৃঢ় হইয়াছিল। উত্তরাধ্যায়নের আর একটা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়, চৈতন ও অচৈতন পদার্থ বিষয়ে যুবা যতিগণকে যথার্থ-জ্ঞান দান। গ্রন্থের শেষভাগে ঐ বিষয়ে বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকটিত আছে। উত্তরাধ্যায়নের বিষয়-বিজ্ঞান-পদ্ধতি অনেকটা শৃঙ্খলা-সম্পন্ন হইলেও ঐ অংশ একই সময়ে একই ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হইয়াছিল কিনা, তাহিসে সন্দেহ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, যে সকল ভাব-পরম্পরা লিখিত বা

কথিত আকারে জৈনগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল, উত্তরাধারনে তাহা একটু প্রেশিবদ্ধ রূপে সঙ্কলিত হইয়াছে। উত্তরাধারন কোন সময়ে লিখিত বা বর্তমান আকারে সঙ্কলিত হয়, তাহা নিগম করা দুঃসাধ্য। জ্যাকোব নির্ধারণ করেন যে, খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উহার সঙ্কলন হওয়া সম্ভবপর। দেবর্ষি জ্ঞানী ৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জৈনধর্ম-গ্রন্থের সংস্করণ-সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে পরিবর্তন-পরিবর্তন বাহা ঘটনার ঘটিয়াছিল। কিন্তু সেই হইতে আর পরিবর্তনের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। উত্তরাধারনের টীকা-ব্যাখ্যা প্রভৃতির মধ্যে দেবেঞ্জ কৃত টীকাই প্রসিদ্ধ। ১১৭৯ সম্বতে (১১২০ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ টীকা লিখিত হইয়াছিল বাণয়া প্রচার। শাস্ত্যাচাৰ্য্য-কৃত বৃত্তান্ত-সার-সঙ্কলনে ঐ টীকা লিখিত হয়। উত্তরাধারনে শুজরাটী নিষট্টু এবং লক্ষ্মী-বল্লভ-কৃত সূত্রাদিপিকা বিশেষ প্রচলিত। ‘ধরতরগচ্ছ’ সম্প্রদায়ভুক্ত লক্ষ্মীকীর্তি জ্ঞানীর শিষ্য বলিয়া লক্ষ্মীবল্লভ পরিচিত। ‘অবচুরি’ নামে আর এক টীকা উত্তরাধারনের তাৎপর্য্য-গ্রহণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তরাধারন আর সূত্রকৃত এই দুই গ্রন্থ জৈন-দর্শনের দুই প্রধান সম্পদ মধ্যে পরিগণিত।

কল্পসূত্র—জৈন-শাস্ত্রের এক হতিহাস-মধ্যে গণ্য-বলা যাইতে পারে। কল্পসূত্রে জৈনগণের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিত আছে; মহাবীর স্বামীর জীবনচরিত তাহাতে পরিবর্ণিত হইয়াছে। পার্শ্ব-

দেবের, আরষ্টনেমীর ও ঋষভদেবের জীবন-গাথা উহাতে লিপিবদ্ধ দেখি।

কল্পসূত্র। তীর্থঙ্করগণের কাল-ব্যবধান বিষয়ে, স্থাবরগণের নামপর্যায় সম্বন্ধে,

যতিগণের প্রতিপাল্য বিধি-বিধান বিষয়ে, নানা জ্ঞাতব্য-ভাষ্যে কল্পসূত্রে

পরিপূর্ণ। ছন্দ-সূত্রের অন্তর্গত চতুর্থ গ্রন্থ ‘দশশ্রুতসংক্ষেপ’ অষ্টম অংশে, কল্পসূত্রখানি যেন প্রকারান্তরে অঙ্গভূত রহিয়াছে। প্রফেসার ওয়েবারের মত এই যে, কল্পসূত্র—দশশ্রুতসংক্ষেপের অনুসারী। তিনি আরও বলেন,—কল্পসূত্রে যতিগণের সম্বন্ধে যে বিধিবিধান দৃষ্ট হয়, তাহা ভজ্রবাহু কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল। স্থাবরদিগের ভালকা বিষয়ে যে কয়েকটি প্রশ্ন আছে, তাহা এবং জৈনগণের জীবনী প্রভৃতি সম্পাদক দেবর্ষি কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। জৈনদিগের জীবন-চরিতের ভাষা এবং যতিদিগের প্রাপ্য নিয়মাবলীর ভাষা তুলনার আলোচনা করিলে, প্রথমোক্ত হইতে শেষোক্তের আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। আচার্য্য-সূত্রের প্রথম দুইটি ‘চুণার’ ভাষার সহিত তৃতীয় ‘চুণার’ ভাষার যে পার্থক্য, এ ক্ষেত্রেও তজ্জপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনদিগের জীবন-বৃত্তান্ত কল্পসূত্রে অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত বলিয়া কেহ কেহ কল্পসূত্রের আধুনিকত্ব খাপন করেন। কিন্তু তাহা যুক্তি-বৃত্ত বলিয়া মনে হয় না। কেন-না, ঐ অংশ জীবন-চরিত বর্ণন উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়া নাই; পরন্তু উপাসনার সময় তীর্থঙ্করগণকে সম্বোধন করাই ঐ অংশের লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। শুভ মুহূর্ত্তে ‘কল্যাণক’ আবৃত্তির প্রথা আছে। জৈন জীবন চরিত আবৃত্তি সেই কল্যাণকের অন্তর্গত। ‘চতুর্বিংশতি-তীর্থঙ্কর-নাম-পুজা’ নামক গ্রন্থে জৈনগণের পূজাপদ্ধতি এবং স্তোত্র প্রভৃতি-নিবন্ধ আছে। তাহা অগ্নয় করিলে, পূজোক্তি সংক্ষিপ্ত

জীবনবৃত্তের উপযোগিতা উপলব্ধি হয়। কল্পসূত্র জৈনদিগের বড়ই আদরের গ্রন্থ। জৈনদিগের মধ্যে একটি প্রথা আছে যে, প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে আট দিবস কাল জৈনসভা ক্ষেত্রে জৈনাচার্য্যগণকে প্রসিদ্ধ জৈনগ্রন্থ সকল পাঠ করিতে হয়। সেই আট দিনের মধ্যে পাঁচ দিবস কাল কল্পসূত্র পাঠ বিধেয়। কল্পসূত্র-পাঠের যে ফলশ্রুতি লিখিত আছে—তাঁহার মর্ম্ম এই যে, কল্পসূত্রের অধ্যয়নই মুক্তিপ্রদ। সে ফলশ্রুতিতে আরও প্রকাশ, জগতের গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে কল্পসূত্রই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কল্পসূত্র তারম্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, সংসারে অর্হন্তের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই, মুক্তির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ নাই, আর কল্পসূত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নাই। কল্পসূত্রের চারিখানি টীকা বিশেষ প্রচলিত। যশোবিজয়-কৃত সংস্কৃত টীকা এবং দেবীচন্দ্রকৃত গুজরাটী অনুবাদ কল্পসূত্র পাঠের প্রধান সহায়। ‘জ্ঞান-বিমল’ ও ‘সমগ্র-সুন্দর’ নামে কল্পসূত্রের অপর দুইটি টীকা গুজরাটী অঞ্চলে প্রচলিত আছে। প্রধানতঃ সেই দুই টীকার উপর নির্ভর করিয়াই দেবীচন্দ্রের গুজরাটী অনুবাদ লিখিত হইয়াছিল।

অতীত অঙ্গ-গ্রন্থের মধ্যে স্থানাজ, জ্ঞাত্বাধর্ম্মকথাঙ্গ, অন্তর্কৃদশাঙ্গ, প্রপ্নব্যাকরণাঙ্গ, বিপাকসূত্রাঙ্গ, উপাসকদশাঙ্গ (উপাসক-অধ্যয়নাঙ্গ) প্রভৃতি গ্রন্থ খেতাবর ও দিগম্বর

উভয় সম্প্রদায়েরই আদরনীয়। এই সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
অতীত
অঙ্গ গ্রন্থ। এইরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে ;—(১) স্থানাজ-সূত্রে দ্রব্য ও বস্তুর বিচার-পদ্ধতি, (২) জ্ঞাত্বাধর্ম্মকথাঙ্গ-সূত্রে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তীর্থঙ্করগণের ও গণধর্ম্ম-গণের আলোচনা, (৩) উপাসকদশাঙ্গ-সূত্রে দিগম্বরগণের ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ, (৪) অন্তর্কৃদশাঙ্গে চতুর্বিংশ তীর্থঙ্করের অনুসরণে কেবলীদশকের ইতিবৃত্ত, (৫) অমৃতরোপপাতিক দশাঙ্গে যোগিদশকের ইতিবৃত্ত, (৬) প্রপ্নব্যাকরণাঙ্গে দ্বিবিধ প্রপ্নোক্তর, (৭) বিপাক-সূত্রাঙ্গে সদস্য কর্ম্মফল-বিবৃতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে। আর আর যে সকল জৈনধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রচলিত, তৎসমুদয়ে বিবিধ বিস্তার বিবরণ বিবৃত দেখি। আত্মার বিষয়, কর্ম্মের বিষয়, মুক্তির বিষয়, গ্রহনক্ষত্রাদির বিষয়, ছন্দ অলঙ্কার কাব্যাদির বিষয় এবং তত্ত্বমন্ত্র ইজ্ঞালা ওষধাদির বিষয় পূর্নাদি বিভাগ-সমূহে বিবৃত রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে ঋতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদির মধ্যে যেমন সকল জ্ঞাতব্য বিষয়েরই আলোচনা দৃষ্ট হয়, জৈন-শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যেও তদ্রূপ আবশ্যিক বিষয়ের আলোচনা আছে।

জৈনধর্ম্ম-সংক্রান্ত আর আর যে সকল গ্রন্থ আছে, তৎসমুদায় পট্টাচার্য্যগণের এবং পট্টধর্ম্ম স্মরিগণের লিখিত। পট্টাচার্য্যগণ ও স্মরিগণ জৈনধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অচার্য্য মধ্যে পরিগণিত। ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইলে, বিভিন্ন শাখার জৈনাচার্য্য ও পট্টাচার্য্য, পট্টধর্ম্ম বা স্মরি পদে বিভিন্ন মহাপুরুষ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। মহাবীরের পরবর্ত্তী ভদ্রবাহু পর্য্যন্ত ছয় জন জৈনাচার্য্য ‘ঋতকেবলী’ সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন। ঋতকেবলী নামের সার্থকতার এই বুঝা যায় যে, তাঁহারা কেবল-জ্ঞান (পূর্ণজ্ঞান) লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের নিকট ঋত ঋক্যই ঋতি বা শাস্ত্র মধ্য গণ্য হইয়াছিল। যাঁহারা কেবলী, তাঁহারা পূর্ণতাসম্পন্ন ;

তঁাহাদের বাক্যই ঐতিহ্য; তঁাহারা অপরের নিকট হইতে যে কোনও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলেন না। তঁাহাদের বাক্য জ্ঞানাদার। ঐতকেবলিগণ পূর্ববর্তী জিনগণের নিকট ঐত জ্ঞান প্রকাশ করেন না; তঁাহাদের বাক্য আপ্তবাক্য। মহাবীর স্বামীর পাটে বাহারা উপবেশন করিয়াছিলেন, তঁাহারা সাধারণতঃ পট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হন। সেই পট্টাচার্য্যগণের প্রথম ছয় জন ঐতকেবলী। * তঁাহাদের পূর্ববর্তী মহাবীরের প্রথম শিষ্য ইন্দ্রভূতি বা গোভম 'কেবলী' হইয়াছিলেন। মহাবীর-প্রমুখ তীর্থঙ্করগণ কেবলীর আদর্শ। 'হরি' সংজ্ঞা-লাভের ইতিবৃত্ত এই যে, পট্টধরগণের মধ্যে সুহৃদী, সুহিত ও সুপ্রতিবন্ধ কোটি 'হরি' মন্ত্র জপ করিয়া পট্টধর পদ প্রাপ্ত হন। তদবধি পট্টধরগণের মধ্যে হরি সংজ্ঞা প্রবর্তিত হইয়াছিল। পট্টাচার্য্যগণ ও হরিগণ বহু শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তঁাহাদের কৃত টীকা ও ব্যাখ্যা প্রভৃতির দ্বারাও জৈনশাস্ত্রসম্পৎ বহুগুণে পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সকল গ্রন্থ এখন অহুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। যাহা প্রচলিত আছে, তাহারও অনেকগুলি হুস্ত্রাপ্য। সুতরাং এতৎপ্রসঙ্গে কয়েক জন গ্রন্থকারের নাম এবং তঁাহাদের রচিত গ্রন্থের উল্লেখ মাত্র করিয়াই আমাদেরগকে তৃপ্ত হইতে হইবে। শব্যস্বব স্বামী, পঞ্চম পট্টাচার্য্য বলিয়া পরিচিত। "দশবৈকালিক-সূত্র" তঁাহারই রচিত। ভদ্রবাহু ষষ্ঠ পট্টাচার্য্য ও শেষ ঐতকেবলী ছিলেন। প্রচার আছে, কল্পসূত্র তঁাহারই রচিত। ব্যবহার-সূত্র ও দশঐতস্কন্ধ, ধর্মশাস্ত্রদ্বয় তৎকর্তৃক প্রবর্তিত হয়। আচারাদ্ধ, সূত্রকৃতাদ্ধ, আবশ্যকসূত্র, দশবৈকালিক সূত্র, উত্তরাধ্যয়ন-সূত্র, সূর্য্যপ্রজ্ঞাপ্তি উপাদ্ধ, ব্যবহার চ্ছেদসূত্র প্রভৃতির নির্যুক্তি প্রণয়ন করিয়া তিনি জৈন-সাধারণের পূজ্য হন। তঁাহার রচিত বৃহজ্জ্যোতিষ, উপসর্গহর-স্তোত্র, ভদ্রবাহু-সংহিতা প্রভৃতিও সুপ্রসিদ্ধ। তঁাহার পর, স্থূলভদ্রের নাম উল্লেখ হয়। তিনি সপ্তম পট্টধর। উত্তরাধ্যয়ন-সূত্রের এবং আবশ্যক চ্ছেদশাস্ত্রের বৃত্তি প্রণয়ন করিয়া তিনি অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। জৈনগণের সম-সাময়িক ইতিহাস তাহার পরিশিষ্ট-পর্বে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অষ্টম এবং নবম পট্টাচার্য্যদ্বয় (উমাস্বামী ও শ্রামাচার্য্য) যথাক্রমে তত্ত্বার্থাদি সূত্র ও পল্লবণাসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। শ্রামাচার্য্য প্রথম কালিকাচার্য্য নামে প্রখ্যাত ছিলেন। কালিকাচার্য্যের পর কিছুকাল পট্টাচার্য্য-পদ লইয়া বিরোধ-বিতণ্ডা চলিয়াছিল। পরিশেষে চাণক্য-চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় হয়। তখন জৈনশাস্ত্র-সাহিত্য আর এক অভিনব পথ পরিগ্রহ করে। একাল পর্য্যন্ত জৈনশাস্ত্রসমূহ সাধারণতঃ অর্দ্ধ-মাগধী বা প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়া আসিতেছিল। ইহার পর সংস্কৃত ভাষায় জৈনশাস্ত্র রচনার প্রতি অনেকের আগ্রহ জন্মিয়াছিল। জৈন-দিগের মধ্যে একটা কিষদন্তী আছে যে, সাধু সিদ্ধসেন সংস্কৃত ভাষায় জৈনশাস্ত্র সঙ্কলন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে সে কার্য্য দোষাবহ বোধে, তঁাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এই সিদ্ধসেন, এক শক-রাজ্যের উচ্ছেদকারী বিক্রমাদিত্যের গুরু ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কিষদন্তীর মূলে যাহাই থাকুক, জৈনগণের পূজ্য-মন্ত্রাদিতে যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার আছে, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাই। অগিচ, বৌদ্ধধর্ম

* কোনও মতে,—স্বর্গ ও তঁাহার শিষ্য জম্বুবাসী পর্য্যন্ত-আচার্য্যগণ 'কেবলী' ছিলেন। তারপর, প্রতব স্বামী, শ্যামভদ্র হরি, বনোভদ্র হরি, সত্বতিথিভদ্র হরি, ভদ্রবাহু হরি, স্থূলভদ্র হরি—এই ছয় জন ঐতকেবলী।

যেমন পালি-ভাষার মধ্য দিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, জৈন-ধর্ম সেইরূপ প্রাকৃত-ভাষার সহায়তায় জন-সাধারণের মধ্যে প্রসার-লাভ করিয়াছিল। সেই প্রাকৃত-ভাষা অর্দ্ধ-মাগধী ভাষা নামেও অভিহিত হয়। একই ভাষা বিভিন্ন মূর্তিতে প্রচলিত দেখিতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভাষা যে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করে, তাহা স্বতঃ-প্রত্যাকীভূত। পরন্তু, একই সময়ে দেশ-ভেদে এবং উচ্চ-নীচ বর্ণভেদে ভাষার রূপান্তর দৃষ্ট হয়। সেই কারণে পালি-ভাষারও বিভিন্ন মূর্তি, এবং প্রাকৃত-ভাষারও বিভিন্ন মূর্তি দেখিতে পাই। কালিদাসের শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে যে প্রাকৃত-ভাষা ব্যবহৃত, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকের প্রাকৃত-ভাষা তাহা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। সেই হিসাবে জৈন-শাস্ত্রের প্রাকৃত আরও অধিক পার্থক্য-সম্পন্ন। এক সময়ে পালি ও প্রাকৃত দুইটি প্রাদেশিক ভাষা ছিল। প্রাদেশিক ভাষা যেমন সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়, ঐ দুই ভাষার বিভিন্নরূপ আকৃতি-গঠন দেখিয়া সেইরূপ বিভিন্ন স্তরে প্রচলিত ভাষা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। জৈন-ধর্মের কোনও কোনও গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষার বিরচিত হইলেও প্রাকৃত ভাষাই জৈনধর্ম-গ্রন্থের সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত। বৌদ্ধধর্ম যেমন পালি-ভাষাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছে, জৈন-ধর্ম সেইরূপ প্রাকৃত-ভাষাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। অতীতসাক্ষী কাল কত দেশের, কত জাতির, কত ভাষার অভ্যুত্থান ও তিরোধান প্রত্যক্ষ করিল; কিন্তু ধর্মের সহিত যে সকল ভাষা অঙ্গীভূত হইতে পারিল, তাহারাই রহিয়া গেল। অপর যে সব জলবৃন্দ, কাল-সাগরে বিলীন হইল।

জৈন সাহিত্যের যে সকল গ্রন্থ এখন আদর প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর সে সকল গ্রন্থ প্রায়ই জৈনাচার্য্যগণ লিখিয়া গিয়াছেন।

অতি প্রাচীন তত্ত্বপ কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

অষ্টম জৈন-
ধর্ম-গ্রন্থ।

উপসংহারে সংক্ষেপে জৈন-গ্রন্থকারগণের একটি ধারাবাহিক বিবরণ

প্রদান করিবার চেষ্টা পাইতেছি। মহাবীর স্বামী কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন

করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই। গোতম, সুধর্ম, জম্বু, প্রভব প্রভৃতি কর্তৃক যে কোনও গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহারও উল্লেখ দেখি না। গ্রন্থ-রচনা সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ দেখি—শয্যাস্তব স্বামীর নাম; (১) শয্যাস্তব স্বামী দশবৈকালিক সূত্র রচনা করেন। রাজ-গৃহে বাৎসর্য গোত্রের তাঁহার জন্ম। মহাবীর স্বামীর মোক্ষলাভের পরবর্তী ৯৮ম বর্ষে তাঁহার মোক্ষলাভ হয়। তাঁহার আয়ুমান বায়ট্রি বৎসর। তন্মধ্যে ২৮ বৎসর গৃহবাস, ১১ বৎসর ব্রতস্থ এবং ২৩ বৎসর ‘কেবলী’ বা ‘মুগপ্রধান’ বা ‘আচার্য্য’ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহাবীর হইতে ইনি পঞ্চম এবং সুধর্ম হইতে চতুর্থ পর্যায়ে অবস্থিত। (২) ভদ্রবাহু বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তৎসমুদায়ের উল্লেখ পূর্বেই করিয়াছি। কল্পসূত্র তাঁহারই রচনা বলিয়া প্রকাশ। ইহার আয়ুমান ৭৬ বৎসর; তন্মধ্যে ইনি ৪৫ বৎসর গৃহবাসী, ১৭ বৎসর ব্রতস্থ এবং ১৪ বৎসর আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহাবীর স্বামীর মোক্ষলাভের ১৭০ম বর্ষে ইহার মোক্ষলাভ হয়। ইনি প্রাচীন গোত্রক বলিয়া বৃহৎ খরতরগচ্ছের * পট্টাবলীতে

* পূর্বেই বলিয়াছি, জৈনগণের মধ্যে বিভিন্ন গচ্ছ বা শাখা আছে। আদিভূত বরেক জন আচার্য্যের

প্রকাশ আছে। (৩—৪) উদ্যোতী এবং জ্ঞানচাৰ্য্যের তথ্যাদিসূত্র ও পরমব্যাখ্য গ্রন্থের নাম পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। (৫) আধ্যাত্মিক সূত্র—জৈনশাস্ত্র-সমূহের চারি অল্পযোগ নির্ধারণ করেন। সেই চারি অল্পযোগ বা বিভাগের নাম—কালিকশ্রুত, ঋষি-ভাষিত, সূর্য্য-প্রজ্ঞাপ্ত ও দৃষ্টিপদ। (৬) মানদেব ‘শান্তিস্তব’ প্রণয়ন করেন। ইনি একবিংশ পট্ঠধর পর্যায়ে অবস্থিত, এবং মালবান্ধিপতি বরর সিংহের অমাত্য বলিয়া অভিহিত। (৭) মানভুঙ্গ সূত্র ‘ভক্তামরস্তোত্র’ প্রণয়ন করেন। (৮) কালিকাচাৰ্য্য বা জ্ঞান; ইনি ‘প্রজ্ঞাপনা’ রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। (৯) জিনেন্দ্র—চল্লিশ পর্যায়ভুক্ত পট্ঠধর, ‘সংবেগ-রত্নশালা’ গ্রন্থের রচয়িতা। (১০) অভয়দেব—তৃতীয় হইতে একাদশ অঙ্গের টীকাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। (১১) জিনবল্লভ—৪২ পট্ঠধর পর্যায়ের অবস্থিত; ইনি গিণ্ড বিত্ত্বি-প্রকরণ, বর্দ্ধমানস্তব, কণ্ঠগ্রন্থ, কণ্ঠাদি-বিচারসার, মড়লীতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি ছয় মাস সূত্র পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (১২) জিনদত্ত—ইনি ৪৩শ পর্যায়ের সূত্র পদে অধিষ্ঠিত হন। বিবেক-বিশ্বাস, সন্দেহ-দোহাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনায় ইনি প্রসিদ্ধিসম্পন্ন। (১৩) জিনপ্রবোধ—৪৭ সূত্র পর্যায়ভুক্ত। পঞ্জিক-দুর্গপদ-প্রবোধ টীকা রচনায় ইনি ‘কাতন্ত্র্যবৃত্তিববরণপঞ্জিকার’ ব্যাখ্যা করেন। (১৪) মুনিচন্দ্র সূত্র—মতান্তরে ইনি ৪২শ পট্ঠধর; ইহার প্রণীত উপদেশপদবৃত্তি, যোগবিন্দুবৃত্তি এবং অনেকান্ত-জয়পটাকা প্রভৃতির টীকা প্রসিদ্ধ। (১৫) হেমচন্দ্র সূত্র—ইনি শান্তিপাপচরিত্র রচয়িতা দেবেন্দ্র-সূত্রের শিষ্য। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার বিরচিত অভিধান-চিন্তামণি, প্রাকৃত ব্যাকরণ, ত্রিষষ্টি-শলাকা, পুরুষচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। হেমচন্দ্র কৃত রামায়ণ, লিঙ্গাত্মশাসন ও লীলগ্রন্থ প্রভৃতিও আদরলীল। হেমচন্দ্র কৃত অভিধান-চিন্তামণি—সংস্কৃত ভাষার লিখিত এবং উহাতে জৈন-ধর্মশাস্ত্রে ব্যবহৃত সমস্ত শব্দ সংগৃহীত। জৈনশাস্ত্র পাঠ করিতে হইলে ঐ অভিধান বিশেষ প্রয়োজনীয়। হেমচন্দ্র খেতাস্বর-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা জৈন-ধর্মের বহুল প্রচার হয়। ৮৪ বৎসর বয়সে তিনি নির্ঝণ লাভ করেন। পাটলিপুত্র তাঁহার জন্মস্থান এবং গুজরাট তাঁহার লীলাক্ষেত্র। গুজরাটের ইতিহাস ‘রাসমালায়’ হেমচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। তদনুসারে তাঁহার প্রকৃত নাম—চন্দ্রদেব; তাঁহার পিতার নাম চাচিক ও মাতার নাম পাহিনী দেবী। মাতৃদেবীর অভিপ্রায়ক্রমে হেমচন্দ্র জৈন-ধর্মে দীক্ষিত

প্রাপ্ত সকল শাখাই মাস্ত করেন। পরিশেষে, শাখা-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন গচ্ছের বিভিন্ন আচার্য্যের (পট্ঠধরের) প্রাধান্য পরিকীর্ণিত হয়। বৃহৎ খরতরগচ্ছ, তপাগচ্ছ, সরস্বতীগচ্ছ, সুবিহিতগচ্ছ, বনবাসী গচ্ছ, বৃহৎ-গচ্ছ প্রভৃতি বিভিন্ন গচ্ছের বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। ষোড়শ পট্ঠধর বাল্লভেন সূত্রের সময়ে, নগেন্দ্র, চন্দ্র, নিবৃত্ত ও বিভাণ্ডার—তাঁহার এই চারিটা শিষ্যের অধিনায়কত্বে চারিটা গচ্ছ সৃষ্ট হয়। চন্দ্রসূত্রের পদে সামন্তভক্ত অতিবিক্ত হইলে চন্দ্রগচ্ছের নাম ‘বনবাসী গচ্ছ’ পরিবর্তিত হয়। সামন্তভক্ত বনবাসে জীবনযাপন করিতেন; তদনুসারে ঐ নাম হইরাছিল। উত্তোতন যখন সূত্রপদে অধিষ্ঠিত, তখন আটটা প্রধান আচার্য্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্প্রদায় বনবাসী গচ্ছ ‘বৃহৎ গচ্ছ’ নামে পরিচিত হয়। পট্ঠধর অভিজদেবের সময়ে খরতর-গচ্ছের উৎপত্তি হইরাছিল। ১২০৪ সনতে এই গচ্ছের উৎপত্তি হয়। জয়চন্দ্র সূত্রের সময়ে, তাঁহার ষাটশ বর্দ্ধবাসী তপস্তার ফলে, বৃহৎগচ্ছ-সম্প্রদায় তপাগচ্ছ নামে পরিচিত হইরাছিল। এইরূপ তিন তিন সময়ে তিন তিন গচ্ছের উৎপত্তির বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

হন। জৈন-ধর্ম-গ্রহণে গৃহত্যাগী হওয়ার শিতা চন্দেব তাঁহার অহুসন্ধানের জন্ত রাজ-সরকারে আবেদন করেন। রাজা কুমারপাল অহুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, মন্ত্রী উদয়ন তাঁকে রাজসভাশ্রেণী উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীর গৃহে জৈন-শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া হেমচন্দ্র এতদূর অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বাক্যাবলী শ্রবণে রাজা বিমুগ্ধ হন; আর সেই সময় হেমচন্দ্র আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হন। যাহা হউক, জৈন-গ্রন্থকারগণের মধ্যে হেমচন্দ্র যে এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। ১২২৯ সংবতে হেমচন্দ্র নির্ঝাঁপ লাভ করেন। (১৬) দেবেন্দ্র সুরি—৪৫শ পটধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন; স্বযম্ভবর্কন প্রমুখ-স্তবন, স্তবদর্শনচরিত্র, বৃন্দার-বৃত্তি, ত্রিভাষ্য প্রভৃতি। (১৭) ধর্মদোষ সুরি—চব্বিশ তীর্থঙ্করের স্তব এবং কায়স্থিতি-স্তবস্থিতি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনায় ইনি প্রসিদ্ধ। (১৮) সোমপ্রভ সুরি—ইনি আরাধনাসূত্র, জিনকল্পসূত্র প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের রচয়িতা। (১৯) সোমতিলক সুরি—ইনি কতকগুলি স্তবের বৃত্তি রচনায় যশস্বী হন। আর আর সুরিগণের মধ্যে

(২০-২৬) চন্দ্রশেখর, জ্ঞানানন্দ, জ্ঞানসাগর, কুলমণ্ডন, সোমসুন্দর, মুনিমুন্দর, রত্নশেখর, প্রমুখ জৈনাচার্য্যগণ নানা ধর্মগ্রন্থ ও টীকা প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। জিনকীর্ত্তি, জিনকুশল, জিনচন্দ্র, জিনচন্দ্রগণি, জিনপতি, জিনপুত্র, জিনসেন সুরি প্রভৃতি আরও বহু জৈন-গ্রন্থকারগণের প্রতিষ্ঠা আছে। যাহা হউক, সকল জৈন-শাস্ত্রের সার—আগম, সিদ্ধান্ত বা কল্পশাস্ত্র; আবার তদন্তর্গত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষভাবে সম্পূজিত। উপসংহারে একখানি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। সেখানি খেতাস্বর জৈনগণের আরাধনার সামগ্রী—‘ভৃগবত্যাঙ্গ’। ব্রাহ্মণগণের বেদের ত্রায় উহা জৈনগণের পূজনীয়। * ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ-সাধনের পর বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থসমূহকে বিদেশে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। অধুনা ব্রিটিশ রাজত্বের সামান্যতির সহায়তা প্রভাবে, অপিচ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অহুসন্ধিৎসার ফলে, তৎসমুদায় পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। অঞ্চলের ধন হারানিধি ফিরিয়া পাইলে জননীর যেমন আনন্দের অবধি থাকে না, ভারতের বিলুপ্তপ্রায় রত্নের—বৌদ্ধ-ধর্ম-গ্রন্থসমূহের—পুনরাবির্ভাবকে ভারতের এখন সেই আনন্দ। জৈনশাস্ত্র-সাহিত্য সম্পর্কেও অনেকাংশে সেই আনন্দেরই অহুভূতি হয়। ধর্ম-বিপ্লবের পর ধর্ম-বিপ্লবের অভিঘাতে জৈনশাস্ত্র-সাহিত্য বহুকাল পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া ছিল। ভারতের বহির্ভাগে বিকিণ্ড না হইলেও বিভিন্ন ধর্মবিপ্লবের মধ্যে জৈনধর্মকে যে অতি মগ্নিভাবে দিন-বাগন করিতে হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বলিয়াছি তো, ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অহুসন্ধানের ফলে, ধনি-গর্ভস্থ মণির জ্ঞান প্রকাশ পাইয়া, উহা আবার জ্যোতিঃ-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

—:§:—

জৈনধর্মের আদি-স্তর ।

[আদি-ধর্মের অমুসন্ধানে;—জৈন-ধর্মের প্রতিষ্ঠাকালে বিভিন্ন দার্শনিক মত—জৈন-ধর্মশাস্ত্রে তৎকাল-প্রচলিত চতুর্বিধ দার্শনিক মতের উল্লেখ;—বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য-সাধনে স্ত্রাবাদের প্রতিষ্ঠা;—ভাষাদ,—তাহার ২৩ তত্ত্ব;—জৈন-ধর্মের আদি-স্তর;—ক্রিয়াবাদ ও অক্রিয়াবাদ এসঙ্গে ভারতীয় দর্শনের সম্বন্ধ-তত্ত্ব নিরূপণ।]

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ে সনাতন হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হইলেও প্রকৃত কোন্ সময়ে ঐ দুই ধর্মের বীজাকুর উদ্গত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কাল অনন্ত,

আদি-ধর্মের অমুসন্ধানে।
মাহুঘের ধারণাশক্তি সীমাবদ্ধ। অনন্ত কালসাগরে যে অনন্ত প্রবাহ বহিয়াছে, কে তাহার পরিমাণ করিতে সমর্থ? সান্ত হৃদয়ে অনন্তের ধারণা হয় না বলিয়াই মাহুঘ পূর্বাগর পর্য্যায় অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। এ ক্ষেত্রে

প্রায়ই নিকটের একটা রেখা বা স্তর অবলম্বন করিয়া মাহুঘ অতীতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে। জৈনধর্মের ও বৌদ্ধধর্মের আদি অমুসন্ধান করিতে গিয়া গবেষণা পর্য্যাপ্ত হওয়ার, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকগণ মহাবীর স্বামী হইতে জৈনধর্মের এবং শাকাসিংহ বুদ্ধদেব হইতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি নির্দেশ করিয়া থাকেন। অথচ, ঐ দুই ধর্মের বীজাকুর অতীতের বহু দূরে স্বতঃ-স্ফূর্তিত দেখিতে পাই। আর, সেই জন্তই, কোন্টী পূর্ববর্তী ও কোন্টী পরবর্তী, কোন্টী মূল ও কোন্টী কাণ্ড, তাহা নির্ধারণ পক্ষে সর্বদা বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। সে বিতণ্ডা সর্বথা নিরসন হইবার নহে। সুতরাং, স্থূলভাবে সে এসঙ্গ উপাধান করিয়া, সর্বপ্রকার দৃষ্টির অন্তরালভূত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত বৃথা প্রয়াস না পাইয়া, অধুন যাহা সাধারণের জ্ঞান-গম্য হইতে পারে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। কলতঃ, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম, উভয়েই অতি প্রাচীন-কালের ধর্ম হইলেও উহাদের শেষ অভ্যুদয়-কাল হইতে ক্রমবিকাশ ও বিকৃতির বিষয় যাত্র আলোচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দৃষ্টি-সীমার অন্তর্ভূত, ধ্যান-ধারণার বিষয়ীভূত উভয় ধর্মের সেই শেষ অভ্যুদয়-কালের ইতিবৃত্ত যদি তুলনায় সমালোচনা করি, তাহা হইলে একটা বিষয় বিশদ বোধগম্য হয়। জৈন-ধর্ম আদি, কি বৌদ্ধ-ধর্ম আদি, তাহাতে সে সংশয় দূরীভূত হইয়া যায়; অপিচ, বৌদ্ধ-ধর্ম হইতে বাহ্যার জৈন-ধর্মের উৎপত্তির বিষয় নির্দেশ করেন, তাহাদের জন-সংশয় অপনীত হয়; এবং পরিশেষে সেই সনাতন হিন্দু ধর্ম-কই সকলের মূলীভূত লিখা বুঝিতে পারা যায়।

মূলে সমান্তর হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তারিত থাকিলেও জৈনধর্মের ও বৌদ্ধধর্মের ক্রম-বিকাশ-তত্ত্ব গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণার জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠা-পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কি প্রকারে, কি অবস্থায়, জৈনধর্ম কালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাশ্রিত হয়, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইলে তাত্‌কালিক সমাজ-দার্শনিক মত। ধর্মের অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যিক। জৈনশাস্ত্র গ্রন্থ আলোড়ন করিয়াই অনুসন্ধিৎসুগণ তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়াস পাইয়াছেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালে ভারতবর্ষে তাহার বিরুদ্ধবাদী যে কত ধর্ম-সম্প্রদায় ছিল, বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। জৈনধর্ম-শাস্ত্রেও তৎকাল-প্রচলিত বিরুদ্ধ দার্শনিক মতের আভাস পাই; যে সকল বিরুদ্ধ দার্শনিক মত খণ্ডন করিয়া জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, সূত্রকৃতান্তে তৎসমুদায়কে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটিকে জড়বাদ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। সেই দুই শ্রেণীর একের মত এই যে, দেহ এবং আত্মা অভিন্ন এবং একই বস্তু। অপর শ্রেণীর মত এই যে, পঞ্চভূত অনন্ত এবং তাহাতেই সমস্ত সংগঠিত। এই দুই মতের অনুবর্তী জনের বিশ্বাস,—প্রাণিহত্যার কোনও পাপ নাই। ‘সামঞ্জঃফল-সূত্র’ গ্রন্থে প্রকাশ,—পূরণকণ্ঠপ এবং অজিত-কেশকবলি যথাক্রমে ঐ দুই মতের প্রচারক ছিলেন। পূরণকণ্ঠপ পাপ-পুণ্য অস্বীকার করিতেন। অজিতকেশকবলি বলিতেন যে, উৎকর্ষ লাভ সম্বন্ধে দেশ-প্রচলিত মত ভিত্তিহীন, অর্থাৎ তিনি অদৃষ্ট বা জন্মান্তর উড়াইয় দিতেন। অধিকন্তু তিনি ঘোষণা করিতেন,—‘মহুঘোর উপাদান—ভূতচতুষ্টয়; যখন মৃত্যু হয়, মৃত্তিকার অংশ মৃত্তিকার, জলীয় অংশ জলে, অগ্নির অংশ অগ্নিতে, বায়ুর অংশ বায়ুতে এবং ইঞ্জিয়-গ্রাম বোম্বে (আকাশে) বিলীন হয়। মৃত্যুর পর, বাহক-চতুষ্টয়ে শবধারে রক্ষিত মৃত দেহ সংকারার্থ লইয়া যায়; কত বিলাপ করে; পরিশেষে, সকলই ভস্ম হইয়া যায়।’ সূত্রকৃতান্তে বিভিন্ন জড়বাদী সম্প্রদায়ের পরিচয়-প্রসঙ্গে অমুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।* এক সম্প্রদায়ের জড়বাদিগণ, আত্মাকে পঞ্চভূতের অতীত এক অক্ষয় বস্তু বলিয়া নির্দেশ

* দেহ-নাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সকলই শেষ হয়, এই মতের পরিচয় উপলব্ধ সূত্রকৃতান্তে বাহা লিখিত আছে, তাহার ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ দৃষ্ট হয়,—“Upwards from the soles of the feet, downwards from the tips of the hair on the head, within the skin's surface is (what is called) Soul, or what is the same, the Atman, The whole soul lives; when this (body) is dead, it does not live. It lasts as long as the body lasts, it does not outlast the destruction (of the body). With it (*vis*, the body) ends life. Other men carry it (the corpse) away to burn it. When it has been consumed by fire, only dove-coloured bones remain, and the four bearers return with the hearse to their village. Therefore there is and exists no (soul different from the body). Those who believe that there is and exists no such (soul), speak the truth. Those who maintain that the Soul is something different from the body, cannot tell whether the Soul (as separated from the body) is long or small, whether globular or circular or triangular or square or sexagonal or

করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে,—উহা এক আদি দার্শনিক মতের পরিণতি। বাহ্য এখন বৈশেষিক মত বলিয়া পরিচিত, ঐ মত তাহারই অন্তর্গত। কিন্তু ঐ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পাকুধ কচ্চায়ন বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রতিষ্ঠাযিত। তিনি বলেন, সংসারে সপ্তবিধ অনন্ত অপরিবর্তনীয় স্বাধীন পদার্থ আছে। সেই সপ্ত-পদার্থ—চারি ভূত, সূর্য, চন্দ্র এবং আত্মা। উহারা পরস্পর কেহ কাহারও উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের একের দ্বারা অস্ত্রের ক্ষতি হওয়া অসম্ভব। অনন্ত সূর্য-চন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে, আত্মার উপর তাহাদের প্রভাব স্বীকার করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এ পক্ষে বৌদ্ধগণ আদি-মতের রূপান্তর ঘটাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পাকুধ কচ্চায়ন যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, তাহা জৈন-শাস্ত্রোক্ত অক্রিয়বাদ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। ঐ মতের সহিত প্রকৃত বৈশেষিক মতের প্রভেদ আছে; বৈশেষিক মত এই হিসাবে ক্রিয়া-বাদের অন্তর্গত। ক্রিয়বাদ এবং অক্রিয়বাদ সংজ্ঞায় বৌদ্ধশাস্ত্রে ও জৈনশাস্ত্রে সর্বদা ব্যবহৃত হইতে দেখি। ক্রিয়বাদ বলিতে এই মত ব্যক্ত করে যে, আত্মাই কর্ম্মশীল অথবা কর্ম্ম দ্বারাই আত্মা বিচালিত। জৈনধর্ম এই ক্রিয়বাদ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণ্য-দর্শন, বৈশেষিক এবং শ্রায়, এই ক্রিয়বাদই ব্যক্ত করে। সংসারে আরও বহু ধর্ম-সম্প্রদায় ক্রিয়বাদ মতের অনুবর্তী। বৌদ্ধগণের এবং জৈনগণের শাস্ত্রগ্রন্থে যদিও বৈশেষিক দর্শনের ও শ্রায় দর্শনের সংজ্ঞাদি যথার্থ উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু ক্রিয়াবাদের ভিত্তি উভয়ই প্রকোক্ত হিন্দু-দর্শনদ্বয়ের উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অক্রিয়বাদ মত, বলা বাহুল্য, ক্রিয়বাদ মতের বিপরীত। ঐ মতের শিক্ষা এই যে, হয়—আত্মার অস্তিত্ব নাই, নয়—আত্মা কর্ম্মশীল নয়, অথবা আত্মা কর্ম্ম দ্বারা অভিহত হয় না। এই উপবিভাগের মধ্যে জড়বাদ-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার সমাবেশ দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্ধারণ করেন (আমাদের মত স্বতন্ত্র) * বেদান্ত, শাস্ত্রা, যোগ—এই তিন হিন্দুদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন সমূহ এই পর্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কণিকবাদ ও শূন্যবাদ মতাবলম্বীদের উল্লেখ সূত্রকৃতান্ত্রে দৃষ্ট হয়। জৈন সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রে প্রায়ই বেদান্ত-মতের উল্লেখ দেখিতে পাই। সূত্রকৃতান্ত্রে বেদান্তবাদীগণকে তৃতীয় শ্রেণীর বিরুদ্ধে ধর্ম্মা-বলম্বী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের

octagonal or long, whether black or blue or red or yellow or white, whether hard or soft or heavy or light or cold or hot or smooth or rough. Those, therefore, who believe that there is and exists no soul, speak the truth. Those who maintain that the soul is something different from the body, do not see the following (objection):—“As a man draws a sword from the scabbard and shows it (you, saying)—“Friend, this is the sword, and that is the scabbard,” so nobody can draw (the soul from the body) and show it (you, saying):—“Friend, this is the soul, and that is the body.”

* পৃথিবীর ইতিহাস প্রথম খণ্ডে বড়দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে এই মত প্রসিদ্ধান্ত দেখুন।

বেদান্ত মত বাধ্যত আছে। তবে, জৈনগণের মধ্যে কোনও বৈদান্তিক প্রাভুত্ব হইয়া ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি নাই। বেদান্ত ব্রাহ্মণগণেরই আলোচ্য বিষয় ছিল। স্তুরাং বেদান্তবাদীরা জৈনধর্মের বিরুদ্ধ পক্ষ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। জৈনধর্মের বিরুদ্ধবাদী চতুর্থ শ্রেণীর ধর্ম-সম্প্রদায় দৈববাদ (Fatalism) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বত্বকৃত্যে প্রথম শ্রুতধর্ম প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐ সম্প্রদায়ের পরিচয় আছে। সামঞ্জস্য-কল-সূত্রে এই সম্প্রদায়ের মত-পরম্পরা মকলি গোসাল কর্তৃক বিবৃত হইয়াছে। গোসালের উক্তিতে এই মতের আভাষ পাওয়া যায়। গোসাল কহিয়াছেন যে, ‘প্রাণিগণের উৎপত্তির বা স্ব-দুঃখের কোনই কারণ নাই। সকলই স্বভাব হইতে উৎপন্ন। স্ব-দুঃখ জীবন-মরণ সকলই স্বভাব-নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে সাধিত হইতেছে।’* স্বত্বকৃত্যের প্রথম অধ্যায়ের দৈববাদী সম্প্রদায়ের মত সজ্জেকপে বিবৃত আছে। সে মত,—নিয়তি দ্বারা সকলই উৎপন্ন (নিয়তি ভাবন আগরা)।† যদিও ঐ মত বিবৃতি প্রসঙ্গে গোসালের নাম উল্লিখিত হয় নাই; কিন্তু তৎকথিত মত যে উহাতে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা স্বতঃই মনে হয়। জৈনগণ চতুর্বিধ দার্শনিক মতের উল্লেখ করেন;—(১) ক্রিয়াবাদ, (২) অক্রিয়াবাদ, (৩) অজ্ঞানবাদ, (৪) বৈদান্তিকবাদ। ক্রিয়াবাদিগণ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসবান; অক্রিয়াবাদিগণ প্রোক্ত মতের বিপরীত মত পোষণ করেন; বৈদান্তিকগণ, ভক্তির দ্বারা মুক্তিকল প্রাপ্তির কামনা করিয়া থাকেন; অজ্ঞানবাদিগণ মুক্তির জ্ঞান জ্ঞানের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। পাশ্চাত্য-দর্শনে যে অ্যাগ্নস্টিক্ (Agnostics) সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখি, অন্বদেশের অজ্ঞানবাদ তাহারই নামান্তর বা রূপান্তর। সঞ্জয় বেদান্তপুস্তকে যে মত প্রকাশ করেন, সামঞ্জস্য-সূত্রে তাহার একটু পরিচয় দৃষ্ট হয়। অজ্ঞানবাদ সেই সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সঞ্জয় বলেন,—যদি তুমি আমার ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রশ্ন কর, আমি কি উত্তর দিব? ভবিষ্যৎ অবস্থা বিষয়ে যদি আমার অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহা হইলে আমি সে অবস্থা বুঝাইতে পারি। যদি কেহ আমার জিজ্ঞাসা কর,—‘ভবিষ্যৎ কি এই প্রকার?’ তাহা হইলে আমি উত্তর দিব,—‘তাহার সহিত আমার কোনই সংশ্রব নাই!’ তথাপি যদি কেহ জিজ্ঞাসা কর—‘সে কি এই প্রকার?’ আমি তখনও সেই একই উত্তর প্রদান করিব। তার পর যদি জিজ্ঞাসা কর—‘সে কি ইহা হইতে পৃথক?’ তাহাতেও আমার একই উত্তর। যদি জিজ্ঞাসা কর,—‘উহা আছে কি না?’ তাহাতেও সেই উত্তর। তথাপি যদি জিজ্ঞাসা কর—‘তবে কি ভবিষ্যৎ নাই?’ তখনও আমি সেই একই উত্তর দিব—‘তাহার সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ ঘটে নাই।’ বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখি,—‘মৃত্যুর পর তথাগত বিজ্ঞান আছেন কিনা’—এবমিধ

* গোসালের উক্তির ইংরাজী অনুবাদ,—‘Every sentient being, every insect, every living thing, whether animal or vegetable, is destitute of intrinsic force, power, or energy, but, being held by the necessity of its nature, experiences happiness, or misery in the six forms of existence, etc.’

† দৈববাদীদের মত স্বত্বকৃত্যে এই ভাবে ব্যক্ত,—

‘All things are eternal by their very nature.’

প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল । কিন্তু তিনি আছেন কিনা, তাহার প্রকৃত উত্তর মিলে নাই । অজ্ঞানবাদের ইহাই ভিত্তি । যাহা অদৃষ্ট, যাহা অলৌকিক, অজ্ঞানবাদীরা তৎসবকে অজ্ঞাতাবমূলক উত্তর প্রদান করেন । জৈনশাস্ত্রে প্রকাশ,—এই প্রকার বিভিন্ন দার্শনিক মতের মধ্যে জৈনধর্ম বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল ।

মহাবীর এবং বুদ্ধদেব যে সময়ে আপন আপন ধর্ম প্রচার করেন, তখন যে সকল দার্শনিক মত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মগ্রন্থে তাহার অল্পমাত্র পরিচয় প্রাপ্ত

হইলেও শুদ্ধারা মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণীত হইতে পারে
বিরুদ্ধ মতে
শ্রাবাদ । তাহাতে বুঝিতে পারি, বিরুদ্ধ ভিত্তির উপর বিরুদ্ধ উপাদান সাহায্যে

ধর্মপ্রবর্তক মহাশ্রুগণ বিরাট ধর্ম-সৌধ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন ।

বিরুদ্ধবাদী বিভিন্ন ধর্মমতের সহিত জৈনমতের বা বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য অনুধাবন করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মহাবীর এবং বুদ্ধদেব উভয়েই আপনাপন ধর্মমত সংগঠনে, প্রত্যক্ষভাবেই হউক বা পরোক্ষভাবেই হউক, বিরুদ্ধমতাবলম্বী দার্শনিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কিছু-না-কিছু সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । প্রতিপক্ষদলের সহিত বিচার-বিতর্কে তাঁহাদের ধর্মমত কতকটা পরিস্ফুট হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । কেহ কেহ তাই মনে করেন, সম্ময়-প্রবর্তিত অজ্ঞানবাদের প্রতিবাদে মহাবীর কর্তৃক শ্রাবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । * যেহেতু, অজ্ঞানবাদ ঘোষণা করে যে, আমাদের বহুদর্শিতার বহির্ভূত কোনও নিশ্চয়মানতা বা অবিজ্ঞমানতা অথবা বিজ্ঞমানতা ও অবিজ্ঞমানতা উভয়ই আমরা কখনও অঙ্গীকার বা অস্বীকার করিতে পারি না । অথচ, উহারই বিপরীত ফল প্রদর্শন-হলে শ্রাবাদ ঘোষণা করেন যে, একদিক দিয়া দেখিলে তুমি পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে পার (শ্রাদ্ অস্তি) ; আবার অপরদিক হইতে দেখিলে অস্বীকার করিতে পার (শ্রাদ্ নাস্তি) ; অপিচ, সময়ান্তরে আবার বিজ্ঞমানতা ও অবিজ্ঞমানতা উভয়ই অঙ্গীকৃত হইতে পারে । একই সময়ে, একই দৃষ্টপথে, যদি তুমি বিজ্ঞমানতা ও অবিজ্ঞমানতা উভয়ই যুগপৎ অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সে অবস্থা ব্যক্ত করা যায় না (শ্রাদ্ অবজ্ঞব্য) । এইরূপ অবস্থা বিশেষে, কি বিজ্ঞমানতা কি অবিজ্ঞমানতা, কি উভয় অবস্থা, সকলই অবজ্ঞব্য বলিয়া বিবেচিত হয় ; তখন, ‘শ্রাদ্ অস্তি অবজ্ঞব্য’, ‘শ্রাদ্ নাস্তি অবজ্ঞব্য’, ‘শ্রাদ্ অস্তিনাস্তি অবজ্ঞব্য’ । এই শ্রাবাদ জৈনগণের ‘সমুভদীনম্’ বলিয়া প্রসিদ্ধ । এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য উচ্চারণ করিতে না পারিলে কোনও দার্শনিক, বিযম বিরুদ্ধবাদীদিগকে কদাচ নিরস্তর করিতে সমর্থ হইতেন না । অজ্ঞানবাদীদিগের সেই সূক্ষ্ম বিতর্কে অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছিল ; অনেক সহযোগী সম্প্রদায় বিপথগামী হইয়াছিলেন । পরিশেষে শ্রাবাদের প্রচারে অজ্ঞানবাদের ব্যুৎপত্তি হইতে অনেকে উদ্ধারের পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন । ফলতঃ, যে অস্ত্র দ্বারা অজ্ঞানবাদিগণ আপনাদের আততায়ীকে

* জ্যাকোবির এই সিদ্ধান্ত,—‘I think, that in opposition to the Agnosticism of Sangaya, Mahabira has established the Syadvada.’

আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই অঙ্গই পরিশেষে তাঁহাদের আপনাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল। ‘সপ্তভঙ্গীনয়’ সত্যে পরাভূত হইয়া অজ্ঞানবাদের অমুখ্য কত জন যে মহাবীর স্বামীর শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হইবে ? *

অজ্ঞানবাদ আবাদের অন্তর্ভূত হওয়ার মহাবীর স্বামীর প্রবর্তিত ধর্মমতের মধ্যে সঞ্জয়-প্রচারিত ধর্মমতের ছায়াপাত ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুভব হইতে পারে। এইরূপ দৈববাদের প্রভাবও মহাবীর স্বামীর ধর্ম-মতের উপর নিপতিত হইয়া-
তাবাদ। ছিল, সপ্রমাণ হয়। মকলির পুত্র গোসাল ছয় বৎসর কাল মহাবীর স্বামীর শিষ্যরূপে সন্ন্যাস-ক্রিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি গুরু দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বয়ং এক ধর্ম-সম্প্রদায় সংগঠন করেন। সেই সম্প্রদায় ‘অজীবক’ নামে পরিচিত হয়। গোসাল অজীবিক সম্প্রদায়ের নেতৃত্বেরূপে আপনাকে ‘জিন’ বলিয়া ঘোষণা করেন। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে এই গোসালকে কিন্তু নন্দবচ্ছের ও কিসা সংকিচ্ছার উত্তরাধিকারী এবং বহুদিনের প্রবর্তিত ‘অচেলক পরিবাজক’ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থে পূর্বোক্ত মত ব্যক্ত থাকিলেও, মহাবীর ও গোসাল যে কিছুকাল একত্রে কঠোর সন্ন্যাস-ধর্ম অভ্যাস করিয়াছিলেন— জৈন-শাস্ত্রের এবিধ উক্তিতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। তবে, এ সম্বন্ধে জৈনগণের যে ধারণা, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মহাবীর এবং গোসাল যে একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য অতীব ছিল। তাঁহাদের দুই জনের দুইটি সম্প্রদায়কে একত্রে গ্রথিত করাই সে মিলনের লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ দুই ধর্ম-প্রচারকের ধর্মমতের মধ্যে বহু সাদৃশ্য বিদ্যমান ছিল বলিয়া উহার বহুকাল একত্র অবস্থান করিয়াছিলেন। ‘সবের সত্তা সবে পাণা সবে ভূত সবে জীব’—এই উক্তি গোসালের এবং জৈনগণের মধ্যে অভিন্নভাবে প্রচারিত। ঐ উক্তির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে টীকাকারগণ প্রাণি-পর্যায়কে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ;

* বুদ্ধদেবের নির্বাণ সম্বন্ধে যে মত পালিগ্রন্থে লিখিত আছে, তন্মধ্যে অজ্ঞানবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নির্বাণের পর ‘তথাগত’ বিদ্যমান আছেন, কি বিদ্যমান নাই—এই প্রশ্নে বুদ্ধদেব যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞানবাদের অমুখ্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। যাজ্ঞা প্রসেনজিৎ (প্রসেনদি) এবং ভিক্ষুণী ক্লেমা (খেম্বা) প্রমোত্তর-স্থলে তথাগতের বিদ্যমানতা অবিদ্যমানতা বিষয়ে যে ভাব ব্যক্ত করেন, তাহাতে অজ্ঞানবাদের আশ্রয় পাওয়া যায়। সামঞ্জস্য ফল-সূত্র সঞ্জয় যে পদ্ধতিতে প্রশ্নোত্তরের অবতারণা করিয়াছিলেন, সম্মুখনিকারে ক্লেমা-প্রসেনজিৎ-প্রমোত্তরে তাহারই অনুসরণ দেখি। মহাবগ্গে (প্রথম, ২০২৪) যে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে, তদ্বারাও বুদ্ধদেবের সমসাময়িক অজ্ঞানবাদীদিগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লায়ন নামক বুদ্ধদেবের দুই জন প্রসিদ্ধ শিষ্য, বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণের পূর্বে, অজ্ঞানবাদী সঞ্জয়ের অনুগত ছিলেন। পূর্বোক্ত সঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে সঞ্জয়ের আর ২৫০ জন শিষ্য নবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিমূলে অকস্থানের প্রথম অবস্থান, নূতন ধর্ম-সম্প্রদায় সংগঠনের প্রারম্ভে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। ঐ সকল লোককে বৌদ্ধ-ধর্মে দীক্ষিত করিবার সময় বুদ্ধদেব বেশ-প্রচলিত মতের অনাদর করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। ওল্ডেনবার্গ এবং জ্যাকোবি এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া বৌদ্ধধর্মে অজ্ঞানবাদের প্রভাব কীৰ্ত্তন করিয়াছেন।

সেই ভাগ সমূহের নাম—একেশ্বর, দ্বীশ্বর ইত্যাদি । কিবা জৈন-গ্রন্থে, কিবা গোসালের উক্তিতে উভয়টাই প্রাণি-পর্যায়ের ঐক্য বিভাগ পরিদৃষ্ট হয় । গোসাল মানব-জাতিকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন । জৈনগণের ‘লেশ্যা’ বিভাগ তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্য-সম্পন্ন । * কেহ কেহ মনে করেন, অজীবক-সম্প্রদায়ের ভাব জৈনগণ গ্রহণ করিয়া এ ক্ষেত্রে আবশ্যিকরূপে পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন । গোসালের সম্প্রদায়ে যে সকল কঠোর বিধি-বিধান প্রবর্তিত ছিল, মহাবীর তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও কাহারও কাহারও সিদ্ধান্ত । অ্যাকোবি এ সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি বলেন, উত্তরাধার্যন (৩৩-১৩) গ্রন্থে পার্শ্বদেবের বিধি-বিধানে দৃষ্ট হয় যে, তিনি নিগ্রহগণকে অন্তর্ভুক্ত উভয়বিধ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে সম্মতি দিয়াছিলেন । কিন্তু বর্দ্ধমানের বিধি-বিধান সম্পূর্ণ বিপরীত ; উহাতে একেবারে বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ । উলঙ্গ সন্ন্যাসীদিগের উল্লেখ জৈন-গ্রন্থে সর্বদা একটা শব্দ দৃষ্ট হয় । সেই শব্দ ‘অচেলক’ অর্থাৎ বিবস্ত্র । বৌদ্ধ-গ্রন্থে অচেলকগণের এবং নিগ্রহগণের পার্থক্যের বিষয় উল্লেখ আছে । ‘ধম্মপদের’ টীকায় বুদ্ধঘোষ লিখিয়া গিয়াছেন,—এক সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ অচেলকগণ অপেক্ষা নিগ্রহগণের প্রাধান্য কীর্তন করেন । ‘অচেলক’গণ সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ (সবসো অপতিচ্ছমা) ; কিন্তু শীলতা রক্ষার জন্ত নিগ্রহগণ পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন । অবগত হওয়া যায়, জিনকল্পিক নামে উলঙ্গ জৈন-সন্ন্যাসীর অস্তিত্ব পূর্বে ছিল । তাঁহারা জিনগণের আদর্শ অনুসরণ করিতেন বলিয়া ঐ সংজ্ঞা লাভ করেন । খেতাচরণ বলেন,—জিনকল্পগণের স্থান পরবর্তী কালে হবিরকল্পগণ অধিকার করিয়াছেন । তাঁহারা বস্ত্র-ব্যবহারের অনুজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন । যাহা হউক, বৌদ্ধগণের বর্ণনাক্রমে মফলি গোসালের অনুবর্তিগণই অচেলক আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা পূর্ববর্তী গুরুগণের আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া চলিতেন । নিগ্রহপুত্র সচক ‘কায়ভাবনা’ অর্থে শারীরিক পবিত্রতা নির্দেশ করিয়া অচেলকগণের আচার বিষয়ে লক্ষ্য করিয়াছেন । সচকের বিবরণ হইতে জৈনগণের ও অচেলকগণের সাদৃশ্য উপলব্ধি হয় । জৈন সন্ন্যাসিগণের জায়ই অচেলকগণ নিমজ্জন-গ্রহণে পরাশ্রুত ছিলেন । ‘অভিহত বা উদ্ভিস্কত’ শব্দ তাঁহাদের পরিবর্জনীর খাতি সম্বন্ধে ব্যবহৃত দেখি । ঐ শব্দবয়ের অরূপ ‘অধ্যাকৃত’ এবং ‘ঔদ্দেশিক’ শব্দস্বরূপ জৈনশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় । ঐ দুই শব্দের অর্থ,—বিষয়ী ব্যক্তির প্রস্তুত খাতি গ্রহণে বা দূর

* টীকাকারগণ ‘লেশ্যা’ শব্দের অর্থ ‘অধাবসায়-বিশেষ’ নির্দেশ করিয়াছেন । বিভিন্ন কর্মের দ্বারা আত্মার উপর যে প্রভাব বিবৃত হয়, তাহাই লেশ্যা নামে জৈন-শাস্ত্রে অভিহিত । লেশ্যা আত্মার স্বভাবানুবর্তী নহে ; পরন্তু, আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কর্মে প্রতিবিম্বরূপে অবস্থিত । অবচুরি গ্রন্থের দুই পঙ্কতি কবিতায় লেশ্যার স্বরূপ এইরূপে বিবৃত হয় ;—‘কৃকাদিত্তবাসাচিবাং পরিণামো য আত্মনঃ । স্পতিকান্তব তত্তায়াম লেশ্যশব্দঃ প্রবর্ততে ।’ অর্থাৎ,—‘কটিকে পতিত কৃক বস্তুর প্রতিবিম্ব যেমন তাহার বর্ণ-পরিবর্তন সাধিত করে, লেশ্যা শব্দে কর্মের দ্বারা আত্মার সেই পরিবর্তনের অবস্থা বুঝাইয়া থাকে । লেশ্যা অথবা যাহা লেশ্যার উৎপাদক, তাহা আত্মার সহচররূপে অবস্থিত সূক্ষ্ম-বস্ত-বিশেষ । শব্দতাত্ত্বিকগণ ক্রেশ হইতে লেশা এবং তাহা হইতে লেশ্যা শব্দের উৎপত্তি নির্ধারণ করেন । এক হিসাবে ঐ অর্থ যুক্তিযুক্ত ; কেন-না, লেশ্যা আত্মার ক্রেশদায়ক পদার্থ । উঁহা মিশ্র শব্দ ; বর্ণ অর্থেও (সূত্রকৃত্যে) উহার ব্যবহার দেখা যায় ।

হইতে কোনও খাণ্ডদ্রব্য আহরণে জৈন ভিক্ষুগণ বিরত থাকিবেন ; কোনরূপ মাংস আহরণ বা মদ্যপানে তাঁহাদের অধিকার থাকিবে না । ভিক্ষা গ্রহণ এবং আহার সম্বন্ধে জৈনগণের ও অচেলকগণের পদ্ধতি প্রায়ই অভিন্ন । কল্পসূত্রে যতিগণের প্রতিপাল্য বিধি বাহ্য নিখিত আছে, অচেলকগণের প্রতিপাল্য বিধিবিধানের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় । সচক স্বয়ং নিগৃহের পুত্র ছিলেন ; অথচ, তিনি দৈহিক পবিত্রতার দৃষ্টান্তে অচেলকগণের প্রসঙ্গই উত্থাপন করিয়া গিয়াছেন । এবিধ বিবিধ সাদৃশ্য-তত্ত্ব আলোচনার উপলব্ধি হয় যে, অচেলক বা অজীবক সম্প্রদায় হইতে মহাবীর স্বামী আপন সম্প্রদায়-গঠনের বহু উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । জৈনগণের বিবরণ হইতেই বুঝিতে পারি, গোসালের সংসর্গে আসিয়া মহাবীরের দল পরিপুষ্ট হইয়াছিল ; কিন্তু গোসাল আপনীর প্রাধাত্য হারাইয়াছিলেন । গোসালের শোচনীয় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় । অচেলক অথবা অজীবক সম্প্রদায় ভিন্ন তাৎকালিক অপরাপর সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের প্রভাবও জৈনসম্প্রদায়ে নিপতিত হইয়াছিল, মনে হয় ; কেন-না, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ন্যাসিদল ঐ সময়ে জৈনসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল ।

যে প্রভাবে যে ভাবে জৈনধর্ম সৃষ্টি-পরিপুষ্ট হউক না কেন, ঐ ধর্মের আদি স্তর যে মহাবীরের অথবা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে সজ্জাত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কি নিদর্শন প্রাপ্ত হই, একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাই । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের জৈন-ধর্মের আদি-স্তর। সিদ্ধান্ত এই যে,—সমাজের আদি অবস্থায়, অসভ্য সমাজে মনুষ্যকে

জীববাদে বিশ্বাসবান দেখি । তখন তাহারা বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক

পদার্থেই আত্মা আছে । কেবল উদ্ভিদের মধ্যেই যে আত্মা বা প্রাণ বিद्यমান, তাহা নহে ; পরন্তু যুক্তিকার, জলে, অনলে এবং বায়ু মধ্যেও আত্মা ক্রিয়াশীল । আধুনিক জাত্যুৎপত্তি-বিজ্ঞান জীববাদকে অসভ্যজাতির দর্শন বলিয়া ঘোষণা করেন ; সেই জীববাদ, সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ অবতারবাদে পরিণত হয় । জৈন-ধর্মমত অনেকাংশে আদিম জীববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত । ভারতের যে সমাজে জীববাদের প্রাধাত্য ছিল, জৈনধর্ম সেই সমাজে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । সে অবস্থা অতি দূর অতীতের কথা ; তখন উচ্চতর ধর্মবিশ্বাস এবং উচ্চতর-ভাবাপন্ন ধর্মসম্প্রদায় ভারতবাসীদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল না । যে সকল যুক্তি দ্বারা জৈনধর্মকে মহাবীর স্বামীর এবং বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী ধর্ম বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঘোষণা করেন, তৎসম্বন্ধে ইহাই একটা প্রধান যুক্তি । তবে, হৃৎধের বিষয়, এই যুক্তির প্রয়োগক্ষেপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একটা বড়ই গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । অল্প দেশে অসভ্য জাতির মধ্যে জীববাদ (Animism) সংজ্ঞায় যে ধর্মমত প্রচলিত, ভারতবর্ষের সমাজে উহা সে ভাবে প্রচলিত ছিল না । সর্বপ্রথম জগৎ—ভারতীয় সমাজ যখন এই ভাবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করিত, তখন ভারতের পূর্ণ সভ্যতার দিন । অল্প দেশ দিন দিন সভ্য সমুন্নত হইয়া জ্ঞান-মার্গে যে সোপানে আরোহণ করিবার চক্র আগ্রহান্বিত হইয়াছে, অগজপে ব্রহ্মের বিद्यমানতা কেই উন্নত মাধ্যম পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি । অল্প সমাজের ক্রমবিকাশের দ্বারা অনুসরণ

করিয়া, ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের অভ্যাস পরিচালনা করিতে যাইলে বিষম বিভ্রম-আবর্তে নিপতিত হইতে হয়। ফলতঃ, আধুনিক 'ম্যানিফিজম' বা জীববাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া সংজ্ঞাস্তরে সেই অবস্থার তুলনা করিলেই সমীচীন হয়। যে প্রাচীন দার্শনিক সত্য হইতে 'সবের সত্তা সবে পাণা সবে ভূত সবে জীব' প্রভৃতি বাণী বিবোধিত হইয়াছে, তাহা সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাণভূত। প্রমাণ হয় বটে, সনাতনের অমূল্যত্ব; কিন্তু প্রমাণ হয় না কখনই—অসভ্য বর্ষের জাতির অমূল্যত্ব। জৈন-ধর্মের প্রাচীনত্বের আর এক নিদর্শন, উল্লেখ হয়, বেদান্ত ও সাঙ্খ্য এই দুই প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ্য-দর্শনের বিষয়-বিশেষের সহিত উহার সাদৃশ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে, প্রাচীনকালে মনোবিজ্ঞান ভাদ্রশ-বিকাশ-প্রাপ্ত হয় নাই—পদার্থ-বর্ণ হইতে তখন গুণ-বর্ণ মাত্র বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু উহা তখনও পরিষ্কাররূপে অমুভূতি-গম্য হয় নাই; অধুনা যাহা গুণবর্ণ বলিয়া আমরা ধারণা করিতে সমর্থ, তখন তৎসমুদায় ক্রান্তভাবে পদার্থ-বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এইরূপে দেখিতে পাই,—বেদান্তে যিনি পরম ব্রহ্ম, সত্তা জ্ঞান ও আনন্দ তাঁহাতে তদীয় প্রকৃতির গুণ-মধ্যে গণ্য নহে; পরম ব্রহ্ম স্বয়ং সংস্করণ এবং আনন্দস্বরূপ। সাঙ্খ্যও সেই ভাব; তদন্তর্গত পুরুষ বা আত্মা, জ্ঞান বা জ্যোতিঃ রূপে পরিকীর্তিত। যদিও তাঁহাকে ত্রিগুণসম্পন্ন দেখি; যদিও তিনি সংস্করণ শক্তিস্বরূপ এবং মায়াস্বরূপ অর্থাৎ যদিও তাঁহাতে জ্যোতিঃ বর্ণ বিভিন্ন ভিনেরই সমাবেশ দেখি; তথাপি ঐ ত্রিগুণ গুণ-বর্ণ মধ্যে গণ্য নহে; উহা 'আদি পদার্থ' বলিয়া পরিগণিত। প্রাচীন জৈন শাস্ত্রেও দার্শনিক চিন্তার গতি ঐ ভাবে সংগত দেখি। তাঁহার প্রধানতঃ 'দ্রব্য' অর্থাৎ পদার্থ-বিষয়ে এবং তাহাদের বিকাশ বা পরিবর্তনের পর্যায়-বিষয়ে মতের আলোড়ন করিয়া গিয়াছেন। গুণ-দ্রব্য বিষয়ে আলোচনা জৈন-সূত্রে কচিং দৃষ্ট হয়। যাহাও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরবর্তিকালে ত্রায়-বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের পরিভাষা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ স্বরূপভাবে হিন্দুগণের বিজ্ঞান-রাজ্য অধিকার করিয়াছে, এক্ষেত্রেও তাহারই প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্য করি। জৈন-দর্শনের 'পর্যায়' শব্দে বিকাশ বা পরিবর্তন বুঝায় বটে; কিন্তু তাহা হইতে স্বাধীনভাবে গুণ-বর্ণের কোনই প্রতিষ্ঠা নাই। 'পর্যায়' শব্দে দ্রব্যের একটি অবস্থামাত্রকে বুঝায়; সকল মুহূর্ত্তে 'দ্রব্য' সেই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। 'গুণ' বলিয়া জৈনগণ কোনও পদার্থ স্বীকার করেন না। যাহা গুণবর্ণের অন্তর্গত, জৈনগণ তাহাকে 'দ্রব্য' মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ক্ষমতা ও অক্ষমতা, ধর্ম ও অধর্ম প্রভৃতির সহিত আত্মার সম্বন্ধ বটে; কিন্তু তৎসমুদায় গুণ না হইয়া দ্রব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। যদি গুণ এবং পদার্থের সংজ্ঞা যথাযথ নির্ধারিত হইত, তাহা হইলে একরূপ সমস্তা উপস্থিত হইবার আশঙ্কা ছিল না। যাহা হউক, এ বিষয়ে নানা বিতর্ক-বিতণ্ডা দেখিতে পাই। কেহ বিশ্বাস করেন, জৈনদর্শনে বৈশেষিক দর্শনের অমূল্যত্ব আছে; কেহ মনে করেন, একদিকে সাঙ্খ্য ও বেদান্ত মত এবং অত্রদিকে বৈশেষিক মত, এই উভয়ের মধ্যবর্তিক্রমে জৈনদর্শন প্রবর্তিত হইয়াছিল। • কিন্তু

অগাধোবি ঐ দুই মতের কোনও মতেরই সমর্থন করেন না। তিনি বলেন,—এ সবকে করেকটা প্রশ্ন উঠিতে পারে; (১) জৈনমত ও বৈশেষিক মত উভয়েই ক্রিয়াবাদের অন্তর্ভূত, অর্থাৎ আত্মা যে কর্ম ও কামনা প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইয়া উভয় মতেই ভাষা অসীকৃত; (২) উভয় মতই সদস্য কার্য ও নীতি মান্ত করেন, অর্থাৎ মূল কারণ হইতে কার্যের ফল যে স্বতন্ত্র, তাহা উভয়ই স্বীকৃত হয়। কিন্তু বেদান্ত ও সাংখ্য সকলেই অভিন্ন (সং) বলিয়া ঘোষণা করে। (৩) জৈন মত এবং বৈশেষিক মত উভয়েই জ্ঞান হইতে গুণের পার্থক্য অনুধাবন করেন। বাহ্য হউক, এ সকল সাদৃশ্য দেখিয়া এক হইতে অন্তের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করা যায় না। কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য সর্বকালে সকলেরই মনে উদয় হইতে পারে। কার্য ও কারণের সম্বন্ধ, বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, ভূয়ো-দর্শন প্রভাবের সকল মানুষই পরিজ্ঞাত হয়। সুতরাং ঐরূপ জ্ঞানকে দর্শন-বিশেষের উদ্ভাবিত জ্ঞান বলিয়া মনে করা যায় না। তবে যদি একের উদ্ভাবিত কোনও অভিনব মত অন্তের মধ্যে বিবৃত দেখি, তাহা হইলে, শেষোক্ত প্রথমোক্তের অনুসরণ বলিতে পারি। বৈশেষিক-দর্শনের একটি অভিনব সিদ্ধান্ত—দিক ও আকাশ দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ; কিন্তু বলা বাহুল্য, জৈন-দর্শনে সে মত দেখিতে পাই না; অথচ, বেদান্ত ও সাংখ্য, প্রাচীনতর দুই দার্শনিক সম্প্রদায়, দিক ও আকাশকে অভিন্ন পদার্থ নির্দেশে একই আকাশ সংজ্ঞার অভিহিত করিয়া গিয়াছেন; এবং জৈন-দর্শনে সেই মতই পরিব্যক্ত দেখি। সুতরাং, জৈন-দর্শন যে বৈশেষিক-দর্শনের অনুসরণ নহে, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তার পর, যে বিষয়টিতে উভাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য, অর্থাৎ বৈশেষিক যে চতুর্বিধ ‘রূপ’ স্বীকার করেন এবং জৈনগণের মধ্যে যে তাহার সাদৃশ্য দেখি; তাহার কারণ অন্তরূপ। সর্বভূতে প্রাণ—এই মত জীববাদ হইতে জৈন-ধর্মে ও বৈশেষিক-দর্শনে প্রবেশ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, উভয়ই সাদৃশ্যের সম্ভাবনা মনে হয় না। তবে, একটা কথা এই যে, বেদান্তের ও সাংখ্যের সহিত জৈন-মতের যেরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, বৈশেষিকের সহিত উহার সেরূপ বিরোধ নাই; পরন্তু উভয়ে যেন একই পথে পাশাপাশি প্রধাবিত। অধিক কি, জৈন-বৈশেষিক দার্শনিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক জৈন-গ্রন্থকারের নাম পরিদৃষ্ট হয় এবং বৈশেষিক-দর্শন তাহাদেরই একজন বিরুদ্ধবাদী গুরু কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা ঘোষণা করেন। সে মতে, কৌশিক-গোত্রজ চালুর রোহগুপ্ত বৈশেষিক-দর্শনের প্রবর্তক। জৈন-ধর্মের বিরুদ্ধবাদী যে সকল মত-প্রবর্তকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে রোহগুপ্ত বর্ষ পর্যায়ভুক্ত। তাহার মত ‘তৈর্যাসিক মতম্’ বলিয়া উল্লিখিত। তিনি ৫৪৫ বঙ্গাব্দী অব্দে (১৮ খৃষ্টাব্দে) বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। * তাহার মত-পরম্পরা ‘আবশ্যক’-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। ঐ গ্রন্থকে কণাদের বৈশেষিক-দর্শনের প্রতিলিপি বলিলেও বলা যাইতে পারে। ঐ গ্রন্থে ছয় পদার্থের (সাত নহে) উল্লেখ আছে এবং সপ্তদশ গুণের (চব্বিশ নহে) উল্লেখ আছে; আর ঐ সকল গুণ ও পদার্থ বৈশেষিক-দর্শনের সহিত সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যমণ্ডিত। বাহ্য হউক, এবিধ দার্শনিক তত্ত্বের

গবেষণার জৈনগণ যে অশেষ সম্মানের দাবী করেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে, কতিপয় গোত্রজ কণাদ এবং কৌশিক-গোত্রজ রোহণ্ডথ যে অভিন্ন-ব্যক্তি, তাহা কখনই মনে করা যায় না। এক ব্যক্তি ভিন্ন নামে পরিচিত থাকিতে পারেন; কিন্তু তাহা হইলেও গোত্র কখনও ভিন্ন হয় না। কণাদের এক নাম উলুক; তদনুসারে বৈশেষিক-দর্শন উলুক-দর্শন নামে অভিহিত হয়। রোহণ্ডথের (রোহণ্ডতের) ঐরূপ আর একটি নাম 'চুল্ল'। ঐ নাম বড়-উলুক শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। বৈশেষিকের ছয় পদার্থ গ্রহণ সম্বন্ধে ঐ নাম প্রযুক্ত হইয়াছিল মনে হইতে পারে। কলতঃ; বৈশেষিক-দর্শনের অনুসরণে যে রোহণ্ডতের দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। বাহ্য হটক, এ সকল বিষয় স্বীকার করিলেও জৈন-ধর্মের প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিতরূপে সূত্রমাণ হয়। ঐ ধর্ম যে বুদ্ধদেব কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রচার হইবার পূর্বে, এমন কি—মহাবীর স্বামীও আবির্ভাবের পূর্বে, বিস্তারিত ছিল, তাহা সর্বথা স্বদয়স্বয়ং হইতে পারে।

ভারতে ব্রিটিশ-রাজত্বের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের বিনুগুপ্রায় ভাষা-সমূহের উদ্ধার-সাধন আরম্ভ হয়। কি সংস্কৃত, কি পালি, কি প্রাকৃত, কি বাঙ্গালা, কি মহারাষ্ট্র, কি দ্রাবিড়ী, কি গুজরাটী—প্রায় সকল ভাষারই লুপ্ত-রত্নসমূহ পাশ্চাত্য জৈনশাস্ত্র-সাহিত্যের উদ্ধার-সাধন।

পণ্ডিতগণের অমূল্যস্বাক্ষরের ফলে, আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা হয়। জৈনশাস্ত্র-সাহিত্য অধুনা যে শিক্ষিত জন-সাধারণের দৃষ্টি-সীমার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাও সেই অমূল্যস্বাক্ষরই ফল বলিতে পারি। কোন্ কোন্ মনীষীর প্রযত্নে, কি ভাবে জৈনশাস্ত্র-সাহিত্য দেশে বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার পৌরুষপর্য্য নির্ধারণ করা আমাদের লক্ষ্য নহে। তবে, বাহ্য সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে বুঝিতে পারি, ঊনবিংশ-শতাব্দীর প্রারম্ভে জৈনশাস্ত্রসমূহ একে একে ইউরোপে প্রতিষ্ঠা দিস্তার করিতেছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লিপ্‌জিগ্‌ সহরে তত্ত্বাবহার 'কলসূত্র' প্রকাশিত হইয়াছিল। * ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনসহরে খেতাবর জৈনদিগের আদর্শীয় আচার্য্য-সূত্র প্রকাশ পায়। † ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, হারম্যান জ্যাকোবি কর্তৃক আচার্য্য-সূত্র ও কলসূত্র ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। জ্যাকোবির ঐ গ্রন্থ প্রণয়নে, তিনি যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালে ইউরোপে জৈন-শাস্ত্র-সাহিত্যের আলোচনা সম্বন্ধে বহু তত্ত্বই অবগত হওয়া যায়। ‡ প্রক্সার লাসেন, ওরবার, ম্যাক্সমুগার, ক্র্যাট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঐ সময়ে জৈনধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গবেষণার পরিচয় দিতেছিলেন। § ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে, জ্যাকোবি উত্তরাধার্য্য ও সূত্রকৃতাদের ইংরাজী অঙ্কবাদ সম্পন্ন করেন। ঐ

* The Kalpasutra of Bhadrabahu, Leipzig, 1819.

† The Ayaranga Sutta of the Cvetambara Jainas, London, 1882.

‡ Gaina Sutras translated from Prakrit by Hermann Jacobi in the Sacred Books of the East, Vols XXII & XLV.

§ Vide, Professor Lassen, Indische Alterthumkunde, iv., P. 763 &c.; Professor Weber's Indische Studien, XVI, P. 241, 251; Professor Max Muller's Hibbert Lectures, P. 351; Dr. Klatt, Indian Antiquary, XI.

সময়ের মধ্যে ইউরোপে ও ভারতে নানা আকারে জৈনশাস্ত্র-সাহিত্যের আলোচনা চলিয়াছিল। এই বিষয়ে তাঁহারই উক্তির মর্ম্মানুবাদ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—‘দশ বৎসর অতীত হইল, জৈনসূত্রের অনুবাদ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই দশ বৎসরের মধ্যে কয়েক জন বিজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় জৈনধর্ম্ম ও তাঁহার ইতিবৃত্ত বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ আসিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার এবং গুজরাটী ভাষার লিখিত উৎকৃষ্ট টীকার সহিত জৈনশাস্ত্র-গ্রন্থের মূল্যংশের এক সুন্দর সংস্করণ এক্ষণে ভারতের কয়েক জন পণ্ডিত কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই মূলগ্রন্থের দুইখানির সমালোচনা-মূলক সংস্করণ এক্ষণে প্রফেসার লিউম্যান * ও প্রফেসার হোর্নল † কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। খেদোক্ত পণ্ডিতের সংস্করণে সতর্কতার সহিত অনুবাদের ও প্রচুর উদাহরণের সমাবেশ আছে। বালিন-পাতুলিপির তালিকা-গ্রন্থে এবং জৈনশাস্ত্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে, প্রফেসার ওয়েবার সাধারণভাবে সমগ্র জৈনসাহিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ‡ এই সময়েই প্রফেসার লিউম্যান জৈনগণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ-পদ্ধতি অধ্যয়ন করেন; আর এই সময়েই তৎকর্তৃক কতকগুলি জৈন-উপাখ্যানের সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ-তত্ত্ব অনুসন্ধান সমর্থ হন। § খেতাধর-সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিবৃত্তে অভিজ্ঞতা-জনক এক আবৃত্তক প্রমাণ এই সময়ে জ্যাকোবি কর্তৃক সঙ্কলিত হয়। § ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের তালিকা মধ্য হইতে এই সময় হোর্নল ও ক্র্যাট ‘গচ্ছ’ গঠনের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করেন। এই সময়ের মধ্যে ডক্টর ক্র্যাট কর্তৃক জৈন-লেখকগণের এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনীমূলক এক অভিধান প্রস্তুত হয়; আর সেই বৃহৎ অভিধানের আদর্শে হোফ্রাট বুলার কোষকার হেমচন্দ্রের বিস্তৃত জীবনবৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন। ** কতকগুলি প্রাচীন খোদিত-লিপির পাঠোদ্ধারে এই সময়ে পুন্ডোক্ত বুলারের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়; অপিচ, তিনি ডক্টর ফারার কর্তৃক ভগ্ন হইতে উদ্ধোলিত মথুরায়-প্রাপ্ত প্রস্তরমূর্ত্তি সমূহের বিষয় আলোচনা

* Prof. Leumann :—Das Aupapatik Sutra, in the *Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes*, vol VIII, and Dasa Vaikalika Sutra and Nirukti in the *Journal of the German Oriental Society*, XLVI.

† Prof. Hoernle :—The Uvasaga Dasao : (in the *Bibliotheca*), vol. I. Text and Commentary, Calcutta, 1890 ; Vol ii, Translation 1898.

‡ Prof. Weber in his Catalogue of the Berlin Manuscripts (Berlin 1888 and 1892) and in the *Indische Studien*, Vol XVI, p 211ff. and XVII. p 1ff ; translated in the *Indian Antiquary* and edited separately, Bombay, 1893.

§ The *Parisistaparven* by Humakandro : *Bibliotheca Indica*.

¶ In the *Actes du VI Congres International des Orientalistes*, section Arienne, p 469 ff., in the 5th and 6th vols. of the *Wiener Zeischrift für die Kunde des Morgenlandes*, and in the 48th. vol. of the *Journal of the German Oriental Society*.

** Hofrat Buhler :—*Denkschriften der philos-histor. Classe der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften*, vol XXXVII, p 171 ff.

করেন । * এই সময়েই 'প্রাচীন বেলগোলার' প্রাপ্ত অতি প্রয়োজনীয় খোদিত-লিপির সম্পাদন কার্যে মিটার লিউইস্ রাইন্ সমর্থ হন ; † এই সময়েই এম্ এ বার্থ কর্তৃক জৈনধর্ম সংক্রান্ত আমাদের জ্ঞানের বিষয় সমালোচনা হয় ‡ ; আর বুলারও তৎসম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকটন করেন । § পরিশেষে ভাণ্ডারকার সমগ্র জৈনধর্মের এক মূল্যবান লার সকলন করিয়াছেন । ** এ সকল ভিন্ন ধিরোভেদে অফ্রেক্ট কর্তৃক ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লিপজিগ সহর হইতে 'ক্যাটালগস ক্যাটালোগোরম' নামক যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যেও জৈন গ্রন্থকারগণের জৈন-সাহিত্যের বহুল বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় । সেই গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের পরিচয় বর্ণাঙ্কুরে সজ্জিত আছে । তাহারই মধ্যে জৈন-সাহিত্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই । †† এই সকলের উপর, সর্ববিধ আলোচনার সহায়তা লাভ করিয়া মিটার জ্যাকোবি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের লিখিত জৈনধর্ম-সংক্রান্ত মতের মধ্যে তাহাই এখন সর্বত্র আদরণীয় । ভিন্সেন্ট স্মিথের প্রণীত 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস' গ্রন্থে জৈনধর্ম বিষয়ে কতকগুলি নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় । §§ করানী-রাজ্য হইতে উত্তর এ গারিনো জৈনধর্ম সম্বন্ধে এক অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । ঐ গ্রন্থ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এবং উহার উপসংহারভাগ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় । উহাতে জৈনধর্মসংক্রান্ত সকল গ্রন্থের পরিচয় আছে । *** ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বম্বে সহর হইতে জৈনধর্মের ইতিহাস ও সাহিত্য সম্বন্ধে এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড সহর হইতে বর্তমান জৈনধর্ম সম্বন্ধে আর এক গ্রন্থ প্রকাশ পায় । ††† ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর হোর্ণল বঙ্গীর এলিগাটিক সোসাইটির সভাপতি-রূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, জৈনধর্মের ইতিহাস সকলনে তাহাও এক প্রধান সহায় । §§§ তার পর অধুনা জৈনধর্ম সংক্রান্ত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তদ্বারাও অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যাইতেছে ।

* Dr. Fuhrer : Winer Zistchrift fur die Kunde des Morganlandes, vols. ii and iii ; Epigraphia India. vols i and ii.

† Mr. Lewis Rice, in his Bangalore, 1889.

‡ M. A. Barth : The Religions of India. Bulletin des Religions I Indie, 1889-94.

§ Buhler : Uber die Indische Secteder Jaina, Wien, 1887.

** Bhandarkar's Report for 1883-84.

†† Aufrecht (Theodor), Catalogus Catalogorum, an Alphabetical Register of Sanscrit Works and Authors, Leipzig, 1891.

§§ Dr. A. Guerinot ;—*Essai de Bibliographie Jaina, repertoire analytique et methodique des travaux relatifs au Jainisme* (Paris, Leroux, 1906), and the supplement entitled '*Notes de Bibliographie Jaina*' (J. A. S., Juillet-Aout, 1909).

*** Barodia :—*History and Literature of Jainism*, Bombay, 1909 ; Mrs. Sinclair Stevenson :—*Notes on Modern Jainism*, Oxford, 1910.

††† Dr. Hoernle's Address to the Asiatic Society of Bengal (*Proc. A. S. B.*, 1898)

§§§ *Vide*, V. A. Smith's *Early History of India*.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

জৈন-দর্শন ।

[জীবের মূল লক্ষ্য ;—মুক্তির পথ-চতুষ্টিয় ;—প্রথম পথ—জ্ঞান,—তাহা পঞ্চবিধ ;—দ্বিতীয় পথ—বিবাস ও ভক্তি,—তাহা দশবিধ ; তৃতীয় পথ—আচার,—তাহা পঞ্চবিধ ;—চতুর্থ পথ—ধর্মপালনে কৃষ্ণতা,—তাহার দুই ভাগ ;—পথ চতুষ্টিয়ের মূল মর্ম ;—মুক্তির পথে বিদ্র-বিপত্তি,—বাণেশ পরিসহ ;—সমার্কিত লাভে ত্রিসংতি অধ্যবসায়,—তৎসমুদায়ের প্রকৃতি পরিচয় ;—কর্মের স্বরূপ—কর্ম অষ্টবিধ ; কর্মভাগে জীবের বিবিধ কর্তব্য ;—জৈন-দর্শন-শাস্ত্রের অস্তিত্ব শিক্ষা ।]

জীব অনন্ত দুঃখ-সমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন । সে চিরজীবন ভাবিতেছে—তাহার উদ্ধারের উপায় কি ? অনন্তকাল হইতে মানুষ আপন উদ্ধারের উপায় অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে । মানুষের যত কিছু কাম্যাহুষ্ঠান, মানুষের যত কিছু জ্ঞান-মূল লক্ষ্য । গবেষণা, সকলেরই মূল লক্ষ্য—আপন উদ্ধারের উপায় অব্যয় । কি করিয়া দুঃখ-পারাবার হইতে উত্তীর্ণ হইবে, কি করিয়া পরম সুখময় অনন্ত-শান্তিনিগম প্রাপ্ত হইবে, সর্বকালে ও সর্ব-প্রকারে মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষা—সেই আকিঞ্চন—সেই অধ্যবসায় । কিবা ইহলৌকিক, কিবা পারলৌকিক, সকল কর্মের মধ্যেই সেই এক অভিন্ন আশার অনুসরণ দেখিতে পাই । নবীন বিজ্ঞান যে অভিনব আলোকে বিশ্ব পুলকিত করিয়াছে, তাহারই বা লক্ষ্যস্থল কোথায় ? আবার ঐ যে জ্ঞান-রাজ্যে জীবমুক্ত পুরুষগণের পূণ্যচিত্র প্রতিভাত হইতেছে, তাহার মধ্যেই বা কি শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে ! এইরূপে একদিকে ইহলৌকিক সুখের ও অন্যদিকে পারলৌকিক সুখের অনুসন্ধান চলিয়াছে ; আর সেই অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে হইতে কতিং কেহ অনন্ত সুখের সন্ধান পাইতেছেন । জগতে যত ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায় আছে, স্থল-সুস্থভাবে সকলেরই লক্ষ্য—সেই পরম পথ প্রদর্শন ।

দর্শন-শাস্ত্রের বিচার-বিত্তার সেই পথ প্রদর্শিত । সকল ধর্মসম্প্রদায়ই আপন আপন দর্শনশাস্ত্র সাহায্যে, সেই পথ প্রদর্শনের প্রয়াস পাইয়াছেন । আমাদের সাম্রাজ্য, বৈশেষিক, পাতঞ্জল, স্তার, বেদান্ত, মীমাংসা—বহুদর্শন সেই পথই প্রদর্শন পথ-চতুষ্টিয় । করিয়াছেন । অস্তিত্ব ধর্মসম্প্রদায়ের দর্শন-শাস্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য ।

সেই দুঃখনাশ-প্রয়াস, সেই অনন্ত সুখ-সন্ধান,—ইহা ব্যতীত ধর্ম-সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতের অস্ত্র কি আর লক্ষ্য থাকিতে পারে ? কিসে অনন্তসুখময় অবস্থার উপনীত হওয়া যায়, অথবা শকার্জের ভাবোন্মেষে কি উপায়ে নিবৃত্তি নিশ্চয়

নিরবলম্ব্য নির্বাণ-মুক্তি লাভ হয়, সর্বত্রই সেই অনুধান। হিন্দু-দর্শনে কি ভাবে হিত্যার গতি প্রবাহিত, তাহার আভাস পূর্বেই আমরা প্রদান করিয়াছি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে, জৈনদর্শনের কৃত্তকগুলি সার শিকার উল্লেখ করিতেছি। সেই যে পরম মুক্তির অবস্থা, সেই যে নির্বেদ নিষ্কির অব্যক্ত অবস্থা, জৈনশাস্ত্র মতে সে অবস্থার নাম—‘কেবল’ অবস্থা। যিনি সেই অবস্থা লাভ করিয়া জীবন্ত হইয়াছেন, তিনি ‘জিন’ অথবা ‘কেবলী’ সংজ্ঞার অভিহিত হন। কিন্তু সে অবস্থা কিরূপে পাওয়া যায়? যিনি সংসারকে ভয় করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ‘জিন’ (সংসারঃ ভয়তীতি জিনঃ) ; যিনি রাগ-দেবাদি দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, অথবা যিনি কর্মরূপ শত্রুকে সম্পূর্ণরূপ ভয় করিতে পারিয়াছেন, তিনিই জিন (রাগদেবাদিদোষান্ বা কর্মশত্রুন্ ভয়তীতি জিনঃ)। কিন্তু সে জিন পদ, সে মুক্ত অবস্থা কিরূপে অধিগত হয়? জৈনশাস্ত্র বলিতেছেন,—সং-জ্ঞান, সংবিশ্বাস, সদাচার এবং ধর্মবিধি প্রতিপালন—সেই পদপ্রাপ্তির পথস্বরূপ। উক্ত চতুর্বিধ পথে অগ্রসর হইতে পারিলেই জিন-পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই মুক্ত পুরুষ জিন-গণের উপদেশ।

সেই যে মুক্তির প্রথম পথ—জ্ঞান, জৈনদর্শন মতে, তাহা পঞ্চবিধ ;—(১) ‘ঋত’ অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ-সমূহ হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান ; (২) ‘অভিনিবোধিকা’ অর্থাৎ অনুভূতি, স্থিতি, বা চিন্তা ; (৩) ‘অবধি’ অর্থাৎ অলৌকিক জ্ঞান ; (৪) ‘মনঃপর্যায়’ (মননম্) অর্থাৎ অপরের চিন্তা-বিষয়ে জ্ঞান ; (৫) ‘কেবল’ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অনন্ত জ্ঞান। এই যে পঞ্চবিধ জ্ঞান, জৈনশাস্ত্র ইহার স্বরূপ-তত্ত্ব নিম্নলিখিত রূপে বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। মুক্ত-পুরুষগণ যথাক্রমে দ্রব্য, গুণ ও পর্যায় সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে, দ্রব্যমাত্রই গুণের আধার, গুণসমূহ দ্রব্যে অবস্থিত। কিন্তু পর্যায় বা বিকাশের প্রকৃতি এই যে, উহা দ্রব্যসমূহে বা গুণসমূহে স্বভাবতঃ বিস্তারিত। ধর্ম অধর্ম দিক কাল পদার্থ ও আত্মা—দ্রব্য এই বড়বিধ। এতদ্বারাই পৃথিবী বিগঠিত। পরম জ্ঞানী জিনগণ এই জ্ঞান শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। ধর্ম অধর্ম এবং দিক—ইহারা প্রত্যেকে এক একটা দ্রব্য মাত্র ; কিন্তু কাল পদার্থ এবং আত্মা—অগণিত সংখ্যক দ্রব্য বলিয়া উক্ত হয়। ধর্মের প্রকৃতি—গতি ; অধর্মের প্রকৃতি—অচলত্ব। দিক আকাশ বা নভঃ অত্র সকল দ্রব্যই ধারণ করে, এবং সকল দ্রব্যেরই স্থান সঙ্কলন করে। কালের প্রকৃতি—বর্তন অর্থাৎ স্থিতি। আত্মার প্রকৃতি—জ্ঞান বিশ্বাস স্মৃতি ও হৃৎ প্রভৃতির উপযোগ অর্থাৎ অনুভূতি। পদার্থের প্রকৃতি—শব্দ, আদ্যকার, হ্রাস (মণি প্রভৃতির), আলো, ছায়া, সূর্য্যকিরণ ; বর্ণ, আত্মদান আত্মাণ, স্পন্দন। পর্যায়ের প্রকৃতি—একত্ব (এক বস্তুর দ্বারা অনুভব), পৃথকত্ব (বিভিন্ন বস্তুর দ্বারা অনুভব), সংখ্যা, অবয়ব, সংযোগ এবং বিরোগ। (১) জীব অর্থাৎ আত্মা ; (২) অজীব অর্থাৎ অচেতন পদার্থ ; (৩) বদ্ধ অর্থাৎ কর্ম দ্বারা আত্মার বন্ধন ; (৪) পুণ্য অর্থাৎ যোগ্যতা ; (৫) পাপ অর্থাৎ অযোগ্যতা ; (৬) আশ্রয় অর্থাৎ বাহ্যতে পার্শ্ব কর্তৃক আত্মা অভিহৃত হয় ; (৭) সন্নিবৃত্ত অর্থাৎ সতর্কতা দ্বারা

আশ্রয়ের নিবারণ ; (৮) কৰ্মনাশ ; (৯) পরমমুক্তি ;—এই নয়টী সত্য অর্থাৎ সমান বর্গ । যিনি সম্পূর্ণরূপে পূর্বোক্ত নয়বিধ মূল সত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ ধর্মজ্ঞান-সম্পন্ন ।

মুক্তির দ্বিতীয় পথ—ভক্তি বা বিশ্বাস । জৈন দর্শনশাস্ত্র মতে উহা দশবিধ উপায়ে উৎপন্ন হয় ;—(১) নিসর্গ বা প্রকৃতি ; (২) উপদেশ অর্থাৎ শিক্ষালাভ ; (৩) আজ্ঞা অর্থাৎ আদেশাদি পালন ; (৪) হৃদ্র অর্থাৎ হৃদ্র-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ; (৫) দ্বিতীয় পথ
বীজ অর্থাৎ সঙ্কেত ; (৬) অভিগম অর্থাৎ শাস্ত্রার্থের অনুধাবন ;
বিশ্বাস বা ভক্তি ।

(৭) বিস্তার অর্থাৎ ক্ষুদ্রশীলনের সম্পূর্ণ পাঠ, (৮) ক্রিয়া অর্থাৎ ধর্ম কর্ম্মানুষ্ঠান ; (৯) সজ্জপ অর্থাৎ স্থূলভাবে ব্যাখ্যা ; (১০) ধর্ম অর্থাৎ বিধি । উপরোক্ত যে দশবিধ উপায়ে বিশ্বাস বা ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা আরও একটু বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে ; যথা :—নিসর্গের বা প্রকৃতির কার্য্য তাঁহাতেই যথার্থ হইয়াছে, যাহার অন্তরের স্বয়ং-সমুদিত চেষ্টার ফলে আত্মা সম্বন্ধে, অচেতন পদার্থ বিষয়ে, পুণাপাপ সংক্রান্ত সত্য ধারণা জন্মিয়াছে এবং যিনি আশ্রব-সম্বন্ধে অবস্থা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ যে কারণে পাপ উৎপন্ন হইয়া আত্মাকে অভিহত করে, সতর্কতার দ্বারা সে কারণ রোধ করিয়াছেন ; এইরূপ ব্যক্তির উপরই নিসর্গের প্রকৃত ক্রিয়া হইয়াছে । আত্মা, অচেতন পদার্থ, পাপ ও পুণ্য বিষয়ে জিনগণ যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, সেই শিক্ষায় যিনি বিশ্বাসবান, পরন্তু অল্প ভ্রম-শিক্ষা যাহার মনে কদাচ স্থান পায় না, তাঁহারই উপর ‘নিসর্গের’ ক্রিয়া হইয়াছে । এই উপদেশ দ্বারা বোধগম্য হয় যে, যিনি কোনও জিনের নিকট অথবা ‘ছদমস্থের’ (যিনি ‘কেবল’ বা পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন নাই, পরন্তু কতক দূর অগ্রসর হইয়াছেন) নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছেন ও তাহাতেই বিশ্বাসবান আছেন, কখনও সত্যভ্রষ্ট নহেন, তাঁহারই উপর ‘উপদেশ’ প্রকৃত কার্য্যকরী হইয়াছে । ‘আজ্ঞার’ কার্য্যকারিতা তাঁহারই উপর সাধিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে, যিনি স্নেহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অজ্ঞতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন এবং সে বিষয়ে যাহা আদেশ পাইয়াছেন, তদনুসারে বিশ্বাসবান আছেন । সেইরূপ ব্যক্তিরই উপর ‘আজ্ঞার’ সার্থকতা । এইরূপ, ‘হৃদ্র’ তাঁহারই উপর প্রকৃত কার্য্যকরী হইয়াছে, যিনি হৃদ্র ‘অঙ্গ বা অস্ত্র’ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই রূপ, ‘বীজ’ সম্বন্ধে উক্ত দেখি,—যিনি একটি সত্য যথার্থরূপে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়া অধিকের ধারণার অগ্রসর হন, জলোপরি ভাসমান তৈলবিন্দু-বিস্তারবৎ তাঁহার জ্ঞানবীজ প্রসারিত মুকুলিত ও বিস্তৃত হয় । এইরূপ, ‘অভিগম’ তাঁহাতেই সার্থক, যিনি প্রকৃতরূপে ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অর্থাৎ একাদশ অঙ্গ প্রকীরণমুহ এবং দৃষ্টিবান অবগত আছেন । এইরূপ, ‘বিস্তার’ বা সকল ধর্মগ্রন্থ পাঠ তাঁহারই হইয়াছে, যিনি প্রকৃতরূপে প্রমাণ ও ত্যার প্রভৃতির সাহায্যে সকল পদার্থের প্রকৃত প্রকৃতি অবগত হইয়াছেন । এইরূপ, ‘ক্রিয়া’ বা ধর্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান তাঁহারই সার্থক, যিনি প্রকৃত জ্ঞান বিশ্বাস এবং আচার দ্বারা, সন্ন্যাস ও বিনয় দ্বারা এবং সর্কপ্রকার সমিতি ও গুপ্তি দ্বারা একাগ্রচিত্তে সুকল ধর্মকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন । এইরূপ, ‘সজ্জপ’ তাঁহারই উপর সার্থকতা লাভ করিয়াছে, যিনি পবিত্র

প্রবচন বা নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত না হইলেও, ভ্রান্ত মত পরিগ্রহ করেন নাই বা অন্য প্রথা অবগত নহেন। এইরূপ, ধর্ম বা বিধি তাঁহারই উপর কার্য্যকরী হইয়াছে, যিনি দ্রব্য গুণ প্রভৃতি ধর্মের স্বরূপ-তত্ত্ব, সূত্রসমূহ-এবং আচার, বিষয়ে, জিনগণের নিকট উপদেশ পাইয়া তাহাতে বিশ্বাসবান আছেন। কলতঃ, যে দশবিধ উপায়ে বিশ্বাস বা ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই দশটি বিষয়ের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যান অনেক ভাব মনে আসে।

মুক্তির তৃতীয় পথ—আচার। এতদ্বারা কর্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে আচার কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? জৈনশাস্ত্র বলেন,—পঞ্চবিধ উপায়ে সে অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়;

(১) সামায়িক অর্থাৎ যে কোনও কার্য্যে পাপ উৎপন্ন হয়, সে সকল তৃতীয় পথ কর্ম পরিত্যাগ; (২) ছেদোপস্থাপন অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে দীক্ষা দান; আচার।

(৩) পরিহার-বিশুদ্ধিকা * অর্থাৎ বিশেষ প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য ধর্মবিধি-পালনে পবিত্রতা লাভ; (৪) সূক্ষ্মসম্পরায় অর্থাৎ কামনার হ্রাসকরণ; (৫) অকবার-বখাখ্যাত অর্থাৎ অহিংস্রের অথবা কোনও ছদমস্বের বা জিনের উপদেশ অনুসারে পাপ অবস্থার ধ্বংস-সাধন। অতএব, সদাচারলাভ কি কঠোর আয়াসসাধ্য, তাহা তৎপ্রাপ্তি পক্ষে উল্লিখিত উপায়-পঞ্চকের আলোচনার দ্বারাই বোধগম্য হইতে পারে।

মুক্তির যে চতুর্থ পথ, তাহা ধর্মপালনে কৃচ্ছ্রব্রত-গ্রহণ। জৈন-দর্শন সেই কৃচ্ছ্রতাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—(১) বাহ; (২) অভ্যন্তর। সেই বাহ ও

চতুর্থ পথ অভ্যন্তর কৃচ্ছ্রতা আবার ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সে সকল ও অনেক বিচার-বিতর্কের বিষয়। এ ক্ষেত্রে তাহার আলোচনা স্থল ধর্ম। নিম্নপ্রয়োজন মনে করি। তবে, মুক্তির যে চতুর্বিধ পথ নির্দিষ্ট

হইয়াছে, তাহা হইতে স্থূলতঃ এই বুঝিতে পারা যায় যে, জ্ঞান দ্বারা বস্তুকে জানিতে পারা যায়, বিশ্বাস দ্বারা তাহার স্বরূপে আস্থা জন্মিতে পারে, আচার দ্বারা কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, ধর্মকর্মে কৃচ্ছ্রব্রতসাধনে পবিত্রতা আসে। আত্ম-সংযম এবং কৃচ্ছ্রব্রতসাধন দ্বারা কর্ম-বীজ ধ্বংস করিয়া মুক্ত জ্ঞানিগণ পূর্ণতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। সেই পূর্ণতা লাভ করিবার পথে, কি বিঘ্ন-বিপত্তি বিঘ্নমান, মুক্তি অভিলাষী মানবের প্রথমে তাহা সন্ধান করা প্রয়োজন। আর সন্ধান করা প্রয়োজন, সম্বন্ধে কিরূপে উৎপন্ন হয়, কর্মের লক্ষণ কি, আর কি করিয়াই বা কর্মকে ক্ষয় করিতে পারা যায়। মুক্তিকামী

* পরিহার-বিশুদ্ধিকা অবস্থার একটি উদাহরণ টীকাকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ,—নয় জন সন্ন্যাসী এক সময়ে আঠার মাস কাল একত্রে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে একজনকে 'কল্পস্থিত' বা সর্বপ্রধান নির্ধারণ করিয়া চারি জন পরিহারিক এবং অপর চারি জন তাঁহাদের সেবাপরায়ণ অনুপরিহারিক মধ্যে গণ্য হন। ছয় মাস পরে পরিহারিক ও অনুপরিহারিকগণ পরস্পর আপনাদের আজে ও কর্তব্য পরিবর্তন করিয়া লন। আর ছয় মাস পরে 'কল্পস্থিত' সন্ন্যাসী কঠোর প্রায়শ্চিত্তে আবৃত্ত হন। তখন, পরিহারিক ও অনুপরিহারিক উভয় দলই সেবাপরায়ণ অনুপরিহারিক মধ্যে পরিগণিত হন ধর্ম-পালনের কৃচ্ছ্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সেই কৃচ্ছ্রতার প্রত্যয়ে যে পবিত্রতা সঞ্চিত হয়, তাহাই পরিহার-বিশুদ্ধিকা।

মনের সন্তোষ-চ্যাপটি পথ নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই পথের পরিচয় সজ্ঞেপে প্রদান করা হইল। এখন পথে যে সকল বিষয়-বিপত্তি সন্তোষের আছে, সজ্ঞেপে তাহাদের বিষয়েও অতিক্রম হইবার চেষ্টা করা যাউক।

যুক্তির পথে অগ্রসর হইবার সময়, মুমুকু সন্ন্যাসীকে বহু বিষয়-বিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়। দৈনন্দিন্যে সে বিষয়-বিপত্তি ‘পরিসহ’ নামে অভিহিত। সন্ন্যাসীকে জানিল মনে

নির্বিচারভাবে যে সকল ক্লেশ সহ্য করিয়া যুক্তির পথে অগ্রসর হইতে
 দ্বাৰিংশ
 পরিসহ।

জানী উপদেশ দিয়াছেন,—সন্ন্যাসী যাহাকেই দ্বাৰিংশ পরিসহ বিষয়ে অতিক্রম হইতে হইবে; তৎসমুদায়কে জয় করিতে পারিলেই সন্ন্যাসী-জীবনের সার্থকতা। সন্ন্যাসী যাহার ক্লেশতরা সেই দ্বাৰিংশ পরিসহ, যথা;—(১) ‘দিগ্‌জ্ঞা’ বা জুগুপ্সা পরিসহ অর্থাৎ ক্ষুধা; ক্ষুধার শরীর অবসন্ন হউক, তথাপি জ্ঞান-সংযমশীল সন্ন্যাসী কদাচ কোনও ভয়-আহংসার্থে ছেদন করিবেন না অথবা কাহাকেও ছেদন করিয়া দিতে বলিবেন না, কোনও বস্তুরক্ষন করিবেন না অথবা কাহাকেও রক্ষন করিয়া দিতে বলিবেন না। ধর্ম-পালন সম্বন্ধে এরিষি আত্মসংযম, এরিষি প্রায়শ্চিত্ত-পালন দিগ্‌জ্ঞা পরিসহ বলিয়া উক্ত হয়। (২) ‘পিপাসা’ অর্থাৎ পিপাসা পরিসহ। যদিও দেহ ক্ষুৎ-পিপাসায় কাকের চরণাঙ্ঘ্রির ভায় বিলীর্ণ হইয়া আসে, শরীরের শিরা-সমূহ জালের ভায় প্রত্যক্ষীভূত হয়, তথাপি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট খাদ্য ও পানীয় ভিন্ন সন্ন্যাসী অন্য কিছুই গ্রহণ করিবেন না। (৩) ‘দ্রিষ’ অর্থাৎ শীত পরিসহ; শীতে অস্থি-কঙ্কাল অবশেষ হইলেও সন্ন্যাসী কখনও কর্তব্য-পালনের লীলা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। (৪) ‘উসিন’ অর্থাৎ উষ্মা পরিসহ; যদি উত্তমায় প্রবৃত্তি হয়, আপন ধর্মপালনে, সন্ন্যাসীকে তৎপ্রতি উপেক্ষা করিতে হইবে। (৫) ‘মংশসমুদ’ বা মংশ-মশক পরিসহ; মশক ও মক্ষিকা প্রভৃতির দংশন অবাধে সহ করিতে হইবে। সহানুগী কখনও কীট-পতঙ্গের দংশনে বিচলিত হইবেন না। মতহতী যুদ্ধকালে, শত্রুকে যে ভাবে বিনষ্ট করে, আপন শিশু-শত্রুকে যাহুব সেই ভাবে নির্মূল করিবে বটে; কিন্তু কীট-পতঙ্গে যেমনঃসংরক্ত মোক্ষণ করিতেছে বলিয়া কদাচ বিচলিত হইবে না। প্রাণী হইতে কষ্ট পাইতেছে মনে করিয়া প্রাণিবধ পরম অধর্ম। (৬) ‘অচেল পরিসহ’ অর্থাৎ দিগ্‌ঘরভাব; পরিধের বস্ত্র ছিন্ন হইতেছে, জুতায় নুতন বস্ত্র সংগ্রহ করিব,—এ ভাব-কখনও সন্ন্যাসীর মনে আসিবে না। পরিধের মিলে, মিলিবে; না মিলে, নাই মিলিবে;—এই যে সহিষ্ণুতা, ইহারই নাম—অচেল-পরিসহ। (৭) ‘অরতি পরিসহ’; কোনও বিষয়েই রতি বা আকাঙ্ক্ষা নাই,—ইহাই অরতি-পরিসহ। (৮) ‘ইথি-পরিসহ’ অর্থাৎ জীৱ বা রমণীয় প্রতি লাগসা-পরিশূন্যতা। (৯) ‘চরিত্রা’ অর্থাৎ চর্যা পরিসহ; যথা-প্রাপ্ত খাদ্যে জীবনধারণ পূরক দেশে বিদেশে পরিভ্রমণ ও স্থানে কবরস্থানে প্রান্তরে অবস্থিতরূপে কষ্টজনিত সহিষ্ণুতা। (১০) ‘নিসীহিবা’ অর্থাৎ নৈবেদিকী-পরিসহ; পুণ্ড্রিক্য হানে অরতিপূরক কাহাকেও উত্থাপন না করিয়া জ্ঞানোৎকর্ষসাধন এই পরিসহের প্রতিপাল্য। (১১) ‘সেজ্জা’ অর্থাৎ শয্যা-পরিসহ; শয্যা যেমনই হউক, বাস-

হানি যেমনই হউক, তৎপ্রতি জরুপ নাই। (১২) ‘অকৌশ’ অর্থাৎ আকৌশ-পরিসহ; কেহ গাণি-বর্ষণ করিলেও জেপ নাই, সরল বাণকের দ্বারা জড়ি-নিকার উপেক্ষার ভাব। (১৩) ‘বহ’ অর্থাৎ বহ-পরিসহ; কেহ প্রহার করিলেও রাগ নাই অথবা প্রহারকালিক অমঙ্গল চিন্তার উদয় হয় না। সহিষ্ণুতাই শ্রেষ্ঠগুণ মনে করিয়া বর্ষণ-চিন্তার প্রবৃত্তি হওয়া, এবং কেহ পুনঃ পুনঃ প্রহার করিলেও ‘আমি তো মরিয়া যাই নাই’ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত ভাব। (১৪) ‘জায়াগা’ অর্থাৎ বাচ-ঞা-পরিসহ; ভিক্ষা কেহ প্রদান করুন বা নাই করুন, তৎপ্রতি অগুমাত্র জরুপ নাই; পরন্তু তজ্জাত গৃহস্থপ্রমত্ত অল্পরাগ নাই। (১৫) ‘অলাভ-পরিসহ’ মধ্যাহ্নে গৃহস্থায়ীর নিকট ক্ষুধার অন্ত প্রাধনা করিয়াও না পাইলে কোপ নাই; অপিচ, ‘আজ না পাই, আর এক দিন পাইব’ মনে করিয়া তৃপ্তিলাভ। (১৬) ‘রেগি-পরিসহ’; পীড়ার কষ্ট-সহিষ্ণুতা, ঔষধের জন্ত ব্যাকুলতা নাই; আত্মার শান্তিলাভই চরম লক্ষ্য। (১৭) ‘তন-কাস’ অর্থাৎ তৃপ্পর্শ-পরিসহ; বসনের ও আসনের অভাব; হুচী-মুখ ভূণের উপর শয়ন ও উপবেশন; সূর্য্যতাপে বিপদ-দেহ; তথাপি সাধমার চাক্ষুশ্য আসে না। (১৮) ‘জল-পরিসহ’; দেহে ধূলি-বৃষ্টি, কর্দম-বৃষ্টি, হিমশিলা পতন ইহাতে, কিন্তু তৎপ্রতি জরুপ নাই; পরন্তু কিসে কর্দমবন্ধন ছিন্ন হয়, সর্বদা সেই প্রয়াস। (১৯) ‘সকার-পুরকার’ অর্থাৎ সংকার-পুরকার-পরিসহ; কেহ সত্তর ব্যবহার করিলেও নিরুদ্বেগ; কেহ নির্দর ব্যবহার করিলেও উদ্বেগ নাই। (২০) ‘পন্না’ অর্থাৎ প্রজ্ঞা পরিসহ; পূর্ব-কর্মের ফলে কষ্টপ্রাপ্তি বিধে অভিজ্ঞতা, এবং বর্তমান কর্মবন্ধন ছিন্ন করিবার পক্ষে জ্ঞান-সঞ্চয়। (২১) ‘অজ্ঞান’ অর্থাৎ অজ্ঞান-পরিসহ; অজ্ঞানতা আসিয়া নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করে, সেই প্রলোভন হইতে সাবধানতা অবলম্বন। (২২) ‘সম্মত্ত’ অর্থাৎ সম্যকত্ব; সম্ব-ভাবে বিকাশ। সন্ন্যাসী কখনও মনে করিবেন না যে, পরজন্ম নাই অথবা প্রাপ্তিপ্রভাব শ্রেষ্ঠ মুক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারে না; জিনগণ বিত্তমান ছিলেন, বিত্তমান আছেন এবং বিত্তমান থাকিবেন। এ সত্য বাহ্যিক অস্বীকার করেন, সন্ন্যাসিগণ কখনও তাঁহাদের কথার প্রত্যয় করিবেন না। এতদ্বিষয়ক বিতর্ক হইতে যিনি বিমুক্ত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারই সম্যকত্ব-পরিসহ সিদ্ধ হইয়াছে। মুক্তির পথে এই যে বাবিশ্য বিঘ্ন বা পরিসহ বিত্তমান রহিয়াছে, সন্ন্যাসীর প্রধান কর্তব্য, তাহা হইতে উদ্ধারলাভের চেষ্টা করা।

সম্যকত্ব বা সম্বগুণের বিকাশ অবস্থা কিরূপে প্রাপ্তি হওয়া যায়, এক্ষণে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। কি চেষ্টা করিলে, কি প্রকার প্রয়াস পাইলে, সেই পরিপূর্ণ জীবনবন্ধন মুক্তির স্বরূপ মুক্তির পরম সুন্দর, সর্বদুঃখের শেষকর অবস্থা প্রাপ্তি হওয়ার যায়, মহাবীর স্বামী তৎসম্বন্ধে, উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সেই উপদেশের মর্ম নিয়ে প্রকটন করা যাইতেছে। যে অধ্যায়সার বা যে উপায়ের দ্বারা সন্ন্যাসী সম্যকত্ব বা সম্ব-স্বরূপ লাভে সমর্থ হইবেন, তৎসম্বন্ধে ত্রিসংখ্যি বিভাগে বিভক্ত। যথা;—(১) ‘সন্তোষ’ অর্থাৎ মুক্তির অস্ত্র ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার কালে, আত্মা ধর্মতত্ত্ব অবগত হইবার জন্ত ব্যাকুল হয়। ধর্ম-বিষয়ক ব্যাকুলতা হইতে মুক্তির

সম্যকত্ব লাভের
উপায়।

আকাজ্জা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। তাহার ফলে, ক্রোধ অহঙ্কার কপটতা লোভ বা তৃষ্ণা বিধ্বংস হয়। ক্রোধ অহঙ্কার প্রভৃতির ফলে অনন্তকাল হইতে জন্মজন্মান্তরের জালা ভোগ করিতে হইতেছে। বাহাদের মুক্তির জন্য প্রবল আকাজ্জা জন্মে, তিনি কুকর্ম-জনিত বন্ধনে আর নূতন আবদ্ধ হন না; অহঙ্কারাদি জনিত প্রান্ত বিশ্বাস হইতেও তিনি মুক্তিলাভ করেন। ক্রমশঃ তাহাতে সন্ধিধাংস সঞ্জাত হয়। সেই সন্ধিধাংসের ফলে, একজন্মের পরেই তিনি পূর্ণত্বলাভে সমর্থ হন। বাহার বিশ্বাস পবিত্র হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি সন্ধিধাংসের অধিকারী হইয়াছেন, তিন জন্মের মধ্যেই তাহার পূর্ণত্বলাভ অবশ্যবাহী। সুতরাং বাহাদের সন্তোষ বা মুক্তির আকাজ্জা জন্মিয়াছে, তাহাদের পূর্ণত্ব-লাভের পথ ক্রমেই সরল হইয়া আসিতেছে। (২) “নির্বৈদ” অর্থাৎ পার্থিব পদার্থে অশ্রদ্ধা; জন্মচক্রে ঘূণার উদ্রেক হইলে, পার্থিব পদার্থে অরতি জন্মিলে, দেবগণ মনুষ্যগণ বা প্রাণিগণ, সংসারে যে সুখ আবাদন করেন, তৎপ্রতি ঘূণা বা বিরক্তির ভাব আসে; সকল পদার্থের প্রতি নির্বৈদ উপস্থিত হয়। এইরূপে যখন সকলেরই সহিত মনুষ্যের অভাব ঘটে, সংসার-পথ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ তখন পূর্ণত্বের পথে প্রবেশ করে। (৩) “ধর্মশ্রদ্ধা” অর্থাৎ ধর্মের প্রতি ঐকান্তিকতা। ধর্মের প্রতি ঐকান্তিকতার ফলে, সংসারের সকল প্রকার সুখের ও আনন্দের প্রতি নিস্পৃহভাব আসে। তখন মানুষ গৃহধর্ম পরিত্যাগ করে এবং গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া শারীরিক ও মানসিক সর্ববিধ ক্লেশের অবসান করে। কর্তনে, বিদ্ধকরণে বা সংযোগ-সাধনে যে কষ্ট উৎপন্ন হয়, এ অবস্থায় তাহা দূরে ষায়, অবাধ-সুখের অধিকারী হয়। (৪) “গুরুসাধনিকগুণবর্ণ” অর্থাৎ সমদর্শীদিগের এবং গুরুর আচ্ছাদ্যবর্তিতা। এতদ্বারা আত্মা ‘বিনয়’ * অর্থাৎ সংশিক্ষা লাভ করে। বিনয় প্রভাব এবং অনাচার পরিত্যাগে পুনর্জন্মের পথ রুদ্ধ হয়। অক্ষতম নরকে, পশুপক্ষিরূপে, নীচ মনুষ্য মধ্যে অথবা অপদেবতা পর্যায়ে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। পরন্তু, গুরুর প্রতি আনুরক্তি প্রদর্শনে তাহার প্রশংসা-কীর্তনে তাহার সম্মাননার ফলে, সং-মনুষ্যরূপে অথবা দেবতারূপে জন্মপরিগ্রহ হয়। এইরূপে বিনয়-নির্দিষ্ট প্রশংসনীয় কর্ম-পরম্পরা সম্পন্ন করিতে করিতে পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। (৫) “আলোচনা” অর্থাৎ গুরু-সমক্ষে কৃতপাপ স্বীকার। এতদ্বারা প্রতারণা, ভ্রমবিশ্বাস, বৃথা শারীরিক ক্লেশ-স্বীকার প্রভৃতিরূপ কণ্টক-বেধ হইতে আত্মা মুক্তিলাভ করেন। পূর্ণমুক্তির পথে বিষমরূপ ঐ কণ্টকসমূহ আত্মাকে অসংখ্য জন্মের পথে বিঘূর্ণিত করে। গুরুর নিকট আপন কৃত-পাপস্বীকারে যে সরলতা সঞ্জাত হয়, তাহাতে আত্মা কপটতা-সংশ্রব-শূন্য হওয়ায় আর নূতন কর্ম উৎপাদন করে না; পরন্তু পূর্বাঙ্কিত কর্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। (৬) “নিন্দা” অর্থাৎ কৃতপাপ বিষয়ে অন্তঃপ্রাচীনা। তদ্বারা পাপকর্মে অননুরাগ হেতু আত্মকর্ম ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। (৭) ‘গর্হা’ অর্থাৎ পাপ-সম্বন্ধে গুরুর নিকট অন্তঃপ্রাচীনা-প্রকাশ। ইহাতে বিনয়ের বা অনন্যমিকাভাবের উদয় হয়। তজ্জন্তু পুনরায় দোষাবহ কার্যে প্রবৃত্তি আসে না; পরন্তু,

* ‘বিনয়’ শব্দ বহুবচন্যাত্মক। বিনয়—নির্বাপের মূলভূত। বিনয় শিক্ষার অধিকারী যে-কোনও ব্যক্তি হইতে পারে না। বিনয়-কাহাকে বলে, আর কোন জন বিনয় শিক্ষার অধিকারী, উত্তরাধারন-স্বত্রে প্রথম অধ্যানে তাহার আলোচনা আছে। আমরা স্থানান্তরে তাহার আভাব প্রদান করিলাম।

প্রশংসনীর কার্যে নিয়োজিত হইয়া গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী জন্মহেতুভূত কর্মে বিরত হন। (৮) 'সামান্নিক' অর্থাৎ আত্মার নৈতিক ও মানসিক পবিত্রতা। এতদ্বারা আত্মা পাপ-জনক কার্যে বিরত হন। (৯) 'চতুর্কিংশতি স্তব' অর্থাৎ চতুর্কিংশতি-জিনের উপাসনার আত্মার সদ্বিশ্বাসসম্পন্নতা। (১০) বন্দনা অর্থাৎ গুরুর প্রতি ভক্তি ও সম্মান-প্রকাশ। এতদ্বারা নীচবংশে জন্মগ্রহণ-মূলক কর্ম ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় এবং উচ্চবংশে জন্মগ্রহণের মূলীভূত কর্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিকে সকলেই শ্রদ্ধা করেন ও সম্মানের চক্ষে দেখেন; অপিচ, তাহার প্রতি সকলেরই সদিচ্ছা-সন্ধ্যাব প্রকাশ পায়। (১১) 'প্রতিকর্ষণ' অর্থাৎ পাপ কার্য হইতে বিরতি বা পাপকার্যের প্রতি বিতৃষ্ণা। এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাতঙ্গের আশঙ্কা থাকে না, আশ্রব ধ্বংস হয়, সচ্চরিত্রতা রক্ষা পায়, অষ্ট-মারা (মাতা বা মাত্রা) * অমুশীলন হয়, আত্মসংযমে অবহেলা আসে না, পরন্তু দৃঢ়তা জন্মে। (১২) 'কায়োৎসর্গ'; ইহাকে এক প্রকার যৌগিক-ক্রিয়া বলিলেও বলা যাইতে পারে। এতদ্বারা অতীত ও বর্তমান প্রায়শ্চিত্ত হইতে মুক্তিলাভ হয়। ভারবাহীর মস্তকের গুরু-ভার অপমৃত্ত হইলে, সে যেমন স্নহতা বোধ করে, কায়োৎসর্গ দ্বারা মাহুয়ের অন্তর সেইরূপ প্রশান্তভাবে প্রাপ্ত হয়; তখন, একমাত্র সচ্চিন্তার মন নিবিষ্ট হওয়ার যৌগী পুরুষ আনন্দ অনুভব করে। (১৩) 'প্রত্যাখ্যান' অর্থাৎ আত্ম-সংযম। এতদ্বারা আশ্রবের পথ রুদ্ধ হয়, কামনা লোপ পায়; আর তাহার ফলে, সকল পদার্থের প্রতি অরতি ও প্রশান্ত ভাব জন্মে। (১৪) 'স্তবস্তুতি মঙ্গল' অর্থাৎ প্রার্থনা ও উপাসনা। এতদ্বারা উন্নত অবস্থার উপনীত হওয়ার পার্থিব বিত্তমানতা লোপ পায়; কল্মে এবং বিমানে (স্বর্গ বিশেষে) স্থান হয়। (১৫) 'কালস্ত্র প্রত্যুপেক্ষণা' অর্থাৎ, সময়ের সদাবহার। এতদ্বারা সংজ্ঞানের বাধা প্রদানকারী কর্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (১৬) প্রায়শ্চিত্তকরণ; এতদ্বারা পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়; কোনও অজ্ঞায় আচরণে প্রবৃত্তি আসে না। যিনি যথাযথ প্রায়শ্চিত্ত করেন, তিনি প্রকৃত পথ ও পথের পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পথ বলিতে, সংজ্ঞান লাভের উপায়, পুরস্কার বলিতে সংজ্ঞান; সংজ্ঞানই মুক্তি। (১৭) 'ক্ষমাগণ' অর্থাৎ ক্ষমা-প্রার্থনা। ইহাতে মনের আনন্দ জন্মে। সর্বপ্রকার প্রাণীর + প্রতি করুণার ভাব আসে; আর তাহাতে চরিত্রের পবিত্রতা ও ভয় হইতে মুক্তি লাভ হয়। (১৮) 'ব্রাধ্যায়' অর্থাৎ শাস্ত্রামুশীলন; সংজ্ঞান-অবরোধকারী কর্ম ইহাতে লোপ পায়।

* এই 'মারা' শব্দ সংস্কৃতে 'মাতা' বা 'মাত্রা' রূপে পরিব্যক্ত হয়। জৈনদর্শন-মতে পঞ্চবিধা 'সমিতি' ও ত্রিবিধা 'গুপ্তি' এই অষ্টবিধা 'মারা'। সমিতির ও গুপ্তির বিষয় আলোচনা করিতে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ একটনের প্রয়োজন। প্রথম সমিতি 'ঈর্ষ্যা'-সমিতি। ঈর্ষ্যা-সমিতির অর্থ—সমুদা, পণ্ড বা রথাদি যে পথে গমন করে, সেই পথে গমন করিতে হইবে; অথচ, তৎপথে গমন-জনিত কোনও প্রাণী নিহত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এইরূপ এক এক সমিতির এক এক ক্রিয়া। গুপ্তি ও সমিতির মূল তথ্য অন্তঃ আলোচিত হইল।

+ মূলে আছে, 'সকপাণভূরজীবসব'। জৈন মতে, বাহারা হুই হইতে পাঁচ ইঞ্জিরের অধিকারী, তাহারাই প্রাণ-সম্পন্ন। জীবগণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিকারী। উদ্ভিদগণ তৃত নামে অভিহিত। অজ্ঞাত প্রাণী শব্দা পর্যায়ভুক্ত।

(১৯) 'বাচনা' অর্থাৎ পবিত্র পাঠ উচ্চারণ; শাস্ত্রোক্তি-সমূহ আবৃত্তির কালে কর্তৃ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, ধর্মশাস্ত্র সংরক্ষিত হয়, পার্থিব অস্তিত্বের অবসান হইয়া আইসে। (২০) 'পরিপূচ্ছনা' অর্থাৎ গুরুর নিকট প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা; ইহাতে স্নেহের ধারণা ও সমর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সন্দেহ ও ভ্রমজনিত যে কর্ম, তাহা এতদ্বারা লোপ পায়। (২১) 'পর্যবর্তনা' অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উচ্চারণ; শাস্ত্রবাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারণে শব্দ জ্ঞান হয় এবং তাহার স্মৃতিমধ্যে সঞ্চিত থাকে। (২২) 'অম্লগ্ৰেহা' অর্থাৎ শিক্তি বিবরণ পুনঃপুনঃ চিন্তা করা। সপ্তবিধ কর্মের যে বন্ধন, এতদ্বারা তাহা শ্লথ হইয়া আসে। ইহাতে আয়ুষ্ক (অর্থাৎ যে কর্ম দ্বারা মানুষ নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট কাল জীবিত থাকিবার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা ভিন্ন।) আয়ুষ্ক কর্ম উৎপন্ন হউক বা না হউক, কিন্তু ক্লেশপ্রদ কর্ম-মাত্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। (২৩) 'ধর্মকথা' অর্থাৎ ধর্মবিষয়ক আলোচনা। (২৪) 'শ্রুতস্তারাদনা'—ধর্মগ্রন্থ সংক্রান্ত পবিত্র জ্ঞান লাভ। (২৫) 'একাগ্রমনঃসন্নিবেশনা'—সচ্চিন্তা কেন্দ্রীভূতীকরণ। (২৬) 'সংযম'—সংযম দ্বারা পাপ হইতে মুক্তি লাভ ঘটে। (২৭) 'তপস্'; তপস্তার প্রভাবে কর্ম ছিন্ন হয়। (২৮) 'ব্যবধান'—এতদ্বারা কর্ম ছিন্ন হয়। (২৯) 'স্বখা-পাত'—স্বপ্নের আশা পরিত্যাগ—কর্ম-ধ্বংসের এক প্রধান উপাদান। (৩০) 'অপ্রতি-বধতা'—মানসিক স্বাধীনতা; পার্থিব পদার্থের প্রতি আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম-চিন্তার মনোনিবেশ। (৩১) 'বিচিত্রশরনাসনসেবনা'—জনসমাগমশূন্য স্থানে বাস ও শরন। ইহাতে ধ্যানের ও আচারের সংযম থাকে; অষ্টবিধ কর্ম হইতে মুক্তি ঘটে। (৩২) 'বিনিবর্তনা'—পৃথিবীর সহিত সঞ্চ-ত্যাগকল্পে সর্বপ্রকার কুর্মে বিরতি, পূর্বাঙ্কিত কর্মের ধ্বংস-সাধন। (৩৩) 'সন্তোষ-প্রত্যাখ্যান'—একস্থানে বা এক প্রদেশে ভিক্ষা-গ্রহণে বিরতি। একস্থানে অবস্থিতি হেতু নানারূপ লোভ মোহ স্বেচ্ছা সঞ্চিত হয়। সেই জন্য একস্থানে অধিক দিন অবস্থিতি-পূর্বক ভিক্ষা গ্রহণও নিবেদন। (৩৪) 'উপাধি-প্রত্যাখ্যান'—ব্যবহার্য্য দ্রব্য পরিত্যাগ। ব্যবহারের উপযোগী কোনও দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে তজ্জনিত অভাব বোধ হয় না। তাহাই সূখ। এইরূপ (৩৫—৪১) প্রত্যাখ্যান—আহার, কথার, যোগ, শরীর, সাহায্য, ভক্ত, সন্তান সবন্ধে আবদ্ধক। আহারের জন্য আকাঙ্ক্ষা নাই, রিপূষণবিমর্দিত, নৈকর্ম্যভাব, দেহে মমতাশূন্যতা, সহচরে আকাঙ্ক্ষাভাব, সর্ববিধ ঋণ-গ্রহণে বিরতি, সর্বভাবে বিবর্জন—সম্যক-লাভের পথে পরম সহায়। (৪২) 'প্রতিরূপতা'—স্ববিরগণ ও সাধুগণ যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই পথের অনুসরণ। (৪৩) 'বৈরাগ্যতা'—তীর্থকরের নাম ও গোত্র লাভ জন্য কর্ম্মমুগ্ধতা। (৪৪) 'সর্বগুণ-সম্পূর্ণতা'; পূর্ণরূপে সকল গুণের অধিকারী হইলে পুনর্জন্ম হয় না; শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ নাশ হয়। (৪৫) 'বীতরাগতা'—কর্ম্মদ্বারা আকর্ষণ হইতে মুক্তি; শব্দ, স্পর্শ, বর্ণ, গন্ধ—প্রীতিপ্রদ হউক বা অপ্ৰীতিপ্রদ হউক, তৎপ্রতি বীতরাগ। (৪৬) 'কান্তি'—সর্ববিপদে সহিষ্ণুতা। (৪৭) 'মুক্তি'; তৃষ্ণা হইতে পরিজ্ঞান লাভ। (৪৮) 'আজব'—সরলতা। (৪৯) 'মর্দব'—অহঙ্কার পরিত্যাগ, নম্রতা। (৫০—৫২) 'ত্রিবিধ সত্য'—ভাব, করণ, যোগ। এই ত্রিবিধ সত্যের সাধনায় মনের সরলতা, বাক্যের সরলতা

এবং কর্মের সত্যতা আসে। (৫৩—৫৫) ত্রিবিধ গুণ্ডতা—মন, বাক্য, কার্য; এতদ্বারা মন বাক্য কার্য সর্বকর্মে সত্যকর্তা অবলম্বনে সমর্থ হয়। (৫৬—৫৮) ত্রিবিধ সমাধারণা—মনঃ, বাক্য, কার্য; এতদ্বারা মন বাক্য ও দেহ বিনয়-সম্পন্ন নিয়মানুগত হয়। (৫৯—৬১) ত্রিবিধ সম্পন্নতা—জ্ঞান, দর্শন, চরিত্র; এতদ্বারা আচার, বিশ্বাস ও জ্ঞান অধিকৃত হয়। (৬২—৬৬) পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহ—শ্রোত্র, চক্ষু, ভ্রাণ, জিহবা, স্পর্শ; এতদ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের লালসা দমিত হয়। (৬৭—৭১) বজর-পঞ্চক—ক্রোধ, মান, মার, লোভ, প্রেমোদ্দেশ-মিথ্যাদর্শন; এই পঞ্চ অভিজয়ে রাগ অহঙ্কার, ভ্রান্তি, আকাজ্ঞা বিজিত হইবে; অপিত, প্রেম, ধৈর্য, মিথ্যা বিশ্বাস তিরোহিত হইবে। (৭২) শৈলেনী অর্থাৎ সর্ববিধ কর্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ‘কেবলী’ অবস্থার উপস্থিতি। এ অবস্থার সাধকের সকল কর্ম লোপ পাইয়াছে, তিনি পবিত্র চিন্তার নিমজ্জিত রহিয়াছেন; ক্রমে ক্রমে তাঁহার অবশিষ্ট কর্ম-চতুষ্টয় (বেদনীর, আয়ুষ্, নামন ও গোত্র) লোপ পাইতেছে। (৭৩) অকর্মতা—অর্থাৎ সর্বকর্ম-বিনিমুক্ত সত্তাব। এখন দেহরূপ তৈজস্ পরিত্যাগ করিয়া আত্মা ঋকু পথে বিমানে উপনীত হইয়া পরম মুক্তির অবস্থা লাভ করিয়াছে। সেই অবস্থাই সং অবস্থা। ত্রিসংস্কার অধ্যবসার প্রভাবে কি প্রকারে সেই অবস্থার উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা যে গভীর গবেষণার বিষয়, উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই তাহা বোধগম্য হয়।

যে কর্মের কবল হইতে মুক্তিরাজ্যের জ্ঞান শাস্ত্রগ্রন্থের শেষ উপদেশ, সে কর্মের প্রকৃতি-পরিচয় জৈন ধর্মগ্রন্থে কিরূপভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, অতঃপর তাহা অল্পসঙ্কলন করিয়া দেখিবার চেষ্টা পাইতেছি। যে কর্মে আবদ্ধ হইয়া আত্মা অষ্টবিধ কর্ম। অন্তর্গত পুনঃপুনঃ বিঘূর্ণিত হইতেছে, জৈন ধর্মশাস্ত্র মতে সে কর্ম অষ্টবিধ; যথা;—(১) জ্ঞানাবরণীর অর্থাৎ যে কর্ম দ্বারা সত্য-জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে। (২) দর্শনাবরণীর—অর্থাৎ, যে কর্ম দ্বারা সত্য-বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন রাখে। (৩) বেদনীর—অর্থাৎ, যে কর্ম দ্বারা চিত্ত দুঃখ বা সুখ অবস্থানে অস্থাবরিত হয়। (৪) মোহনীর—অর্থাৎ, যে কর্ম দ্বারা ভ্রান্তি উৎপাদন করে, ভ্রান্তি পথে লইয়া যায়। (৫) আয়ুঃকর্ম—অর্থাৎ যে কর্ম দ্বারা আয়ুঃকাল বৃদ্ধির পক্ষে চেষ্টা আসে। (৬) নামন অর্থাৎ যে কর্ম দ্বারা দেহস্থ আত্মাকে নাম-রূপে পরিচিত করিতে প্রয়াস হয়। (৭) গোত্র অর্থাৎ যে কর্ম দ্বারা গোত্র নির্ধারণে আগ্রহ আসে। (৮) অন্তরায় অর্থাৎ অনন্ত সুখের পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে যে কর্ম বিষমরূপ বিঘ্নমান থাকে। কর্ম সাধারণতঃ এই অষ্টবিধ; কিন্তু এই অষ্টবিধ কর্মের আবার নানা বিভাগ ও উপবিভাগ আছে। বাহা ‘জ্ঞানাবরণীর কর্ম’, তাহা পঞ্চবিধ; ‘ঐত’—ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন-জনিত জ্ঞান; ‘অভিনিবোধিকা’—অনুভূতিজনিত জ্ঞান; ‘অবধিজ্ঞান’—অমাত্রিক অতীন্দ্রিয় জ্ঞান; ‘মনঃপর্যায়’—অপর ব্যক্তির চিন্তা বিষয়ে জ্ঞান; ‘কেবল’—শ্রেষ্ঠ অনন্ত জ্ঞান। এইরূপ দর্শনাবরণীর কর্ম আবার নববিধ। সেই নববিধ কর্ম সহিষ্ণুসে বাধা প্রদান করে। সেগুলি এইরূপ;—যথা;—(১) নিদ্রা; নিদ্রার বাধা সাধারণ অর্থ, ‘দীপিকা’-কার তাহার এক হৃদয় অর্থ নির্দেশ করেন। তদনুসারে নিদ্রা শব্দে—আগরণের অনিন্দ্যময় অবস্থা। (২) প্রেচা—

কৰ্মশীলতা ; দীপিকার মতে, দণ্ডায়মান বা উপবেশন অবস্থার তজ্জাভাব। (৩) নিদ্রানিদ্রা—অতি প্রগাঢ় নিদ্রার অবস্থা। (৪) প্রচলাপ্রচলা—অতিরিক্ত মাত্রার কৰ্মশীলতা ; দীপিকার মতে—গতিশীল মনুষ্যের নিদ্রাভাব। (৫) গভীরভাবে অন্তর্নিহিত প্রবল তৃষ্ণা। (৬) চক্ষু। (৭) অচক্ষু। জ্ঞানাবরণীর কৰ্মের মধ্যে ‘অভিনিবোধিক’ ও ‘শ্রুত’ বিভাগদ্বয় যে অর্থে প্রযুক্ত, টীকাকারগণের মতে, চক্ষু ও অচক্ষু তদ্ভাবভোক্তক। (৮—৯) প্রথমোক্ত তিনটি বিষয়ে বিশ্বাস এবং তৎপরবর্তী দুইটি বিষয়ে জ্ঞান।

জ্ঞানাবরণীর ও দর্শনাবরণীর কৰ্ম যেমন যথাক্রমে পাঁচ ও নয় ভাগে বিভক্ত ; বেদনীর মোহনীর প্রভৃতি কৰ্মও সেইরূপ বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত দেখি। বেদনীর কৰ্ম দ্বিবিধ ; সুখ ও দুঃখ। সুখ ও দুঃখ যে আবার নানাভাগে বিভক্ত হইতে পারে, বেদনীর মোহনীর প্রভৃতি কৰ্ম। তাহা বলাই বাহুল্য। মোহনীর কৰ্ম ‘বিশ্বাস’ ও ‘আচার’ বিধায় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। বিশ্বাস-বিষয়ক মোহনীর কৰ্ম আবার ত্রিবিধ ; (১)

সত্য বিশ্বাস, (২) অসত্য বিশ্বাস, (৩) আংশিক সত্য বিশ্বাস ও আংশিক অসত্য বিশ্বাস। আচার-বিষয়ক মোহনীর কৰ্ম আবার দ্বিবিধ ;—(১) চারিটি প্রধান রিপু দ্বারা কৃত ; (২) তদতিরিক্ত অমুভাবনা দ্বারা সজ্জাত। রিপু কর্তৃক উৎপন্ন যে কৰ্ম, তাহা আবার ষোড়শবিধ ; অমুভাবনাজনিত কৰ্ম সপ্তবিধ বা নববিধ ;—ক্রোধ, অহঙ্কার, প্রেতারণা, আকাঙ্ক্ষা, বিরক্তি, জীসংসর্গের কামনা প্রভৃতি মোহনীর কৰ্মের অহতুর্কৃত। আয়ুষ্ক অর্থাৎ আয়ুঃবৃদ্ধির পক্ষে চেষ্টাজনিত কৰ্ম চতুর্বিধ ;—নরকের অধিবাসী, পশু জন্মগ্রহণ, মনুষ্য জন্মগ্রহণ, দেব জন্মগ্রহণ। নামন্ কৰ্ম দুই প্রকার ; সৎ ও অসৎ। উহার মধ্যে যে অনেক উপবিভাগ আছে, তাহা বলা বাহুল্য। গোত্র কৰ্ম দ্বিবিধ ; উচ্চ ও নীচ। তাহার আবার আট ভাগে বিভক্ত হয়। অন্তরার পাঁচ ভাগে বিভক্ত ; দান, লাভ, সাময়িক সুখভোগ, ধারাবাহিক সুখভোগ, শক্তি। এই যে অষ্টবিধ কৰ্ম, ইহার সকলেই পরমাণু, স্থান, কাল ও শ্রুতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এই কৰ্ম পরমাণু-সম্বন্ধে আত্মার উপর আধিপত্য বিস্তার করে, এই কৰ্ম স্থান-সম্বন্ধে আত্মাকে আবদ্ধ করে, এই কৰ্ম কালবিষয়ে আত্মাকে জড়িত করে, এই কৰ্ম শ্রুতি-সম্বন্ধে আত্মাকে অভিভূত করে। প্রত্যেক কৰ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পরমাণু অসংখ্য—অনন্ত। বদ্ধ আত্মার পক্ষে কৰ্মগ্রহি-রূপ পরমাণু অনেক অধিক ; কিন্তু মুক্ত আত্মার তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎ। কৰ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকিলে, সেই কৰ্ম আত্মাকে বেঁধে করিয়া বসে ; কিন্তু যিনি কৰ্মের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কৰ্ম কিছুই করিতে পারে না। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে তাহার সংশ্লিষ্ট পদার্থ ভস্মীভূত হয় ; কিন্তু তৎসংশ্রবশূন্য পদার্থের উপর তাহার প্রভাব প্রকাশ পায় না। সেইরূপ, যে আত্মা কৰ্মসংশ্রব ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার উপর পরমাণু বা স্থান কাল শ্রুতি কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অপিচ, বিভিন্ন কৰ্মের স্থায়িত্ব-কাল অবস্থান ও শ্রুতি বিভিন্নরূপ নির্দিষ্ট হয়। কোনও কৰ্ম দ্রুতগামীত কাল স্থায়ী, কোনও কৰ্ম মুহূর্তকাল ; কোনও কৰ্ম অধিক স্থানব্যাপী, কোনও কৰ্ম অল্পস্থানে কার্যকরী ; কোনও কৰ্ম সমধিক শ্রুতিপ্রাপ্ত, কোনও কৰ্ম কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত। জ্ঞানিগণ কৰ্মের বিভিন্ন-বিভাগ-সমূহ অবগত হইয়া কৰ্মবন্ধন

হইতে মুক্তি লাভের জন্য যথাসক্তি যত্নবান হইবেন। জ্ঞানাবরণীর দর্শনাবরণীর প্রভৃতি কর্মসমূহের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইয়া, সন্ন্যাসী যখন সেই সকল কর্মভ্যাগে সমর্থ হইবেন, তখনই তাঁহার সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইবে। সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে, সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক পরিসহ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলে, জীবনের মূল লক্ষ্য পরম সুখময় মুক্তির পথে তিনি অগ্রসর হইতে পারিবেন। ইহাই জৈনদর্শনশাস্ত্রের মূল শিক্ষা।

জৈনদর্শনের অন্যান্য শিক্ষা।

[জৈনদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়,—জিনদত্ত হ্রির অতিমত ;—‘বিনয়’,—জৈন যতিগণের প্রথম প্রতিপাল্য ;—মুক্তির পথে বাধা-বিপত্তি—প্রারম্ভিক ;—সামতি ও গুণি,—তাঁহার মূখ্য লক্ষ্য ;—জীবতত্ত্ব,—একেশ্বর বীজীয় প্রভৃতি ;—পূজা, মন্ত্র,—উপসংহার।]

জৈনদর্শন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় আরও অনেক আছে। তাঁহাদের তর্ক-পদ্ধতি, প্রমাণ-পরম্পরা, পাপপুণ্য, বন্ধন-মুক্তি, পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিলে, জৈন-দর্শনের হিন্দু দর্শনের সহিত জৈনদর্শন কিরূপ সাদৃশ্যসম্পন্ন, তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। তাহাতে হিন্দু-দর্শনের ও বৌদ্ধ-দর্শনের অন্তর্গত একটা বিরোধ-পরিচয়। ভজনের প্রয়াস দেখিতে পাই। শ্রাদ্ধ—সেই চেষ্টার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। জৈনদর্শনের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় জিনদত্ত হ্রি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, প্রসঙ্গতঃ নিম্নে তাহা একটু উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে স্থূলভাবে জৈনদর্শনতত্ত্ব উপলব্ধ হয়। যথা ;—

“জিনদত্তহ্রিণা জৈনং মতমিখমুক্তম্—

বলভোগোপভোগানামুভয়োদ্বিনলাভয়োঃ।

অন্তরায়স্তথা নিদ্রা ধী-রজ্ঞানং জুগুপ্সতম্,

হিংসারত্যাগী রাগদ্বৈর্যো রতিরতিঃ স্রবঃ॥

শোকো মিথ্যাভ্রমেতেহষ্টাদশ দোষা ন যন্ত সঃ।

জিনো দেবো গুরুঃ সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশকঃ।

জ্ঞানদর্শনচারিজ্ঞাপ্যবগন্ত বজ্রনি ॥

শ্রাদ্ধদস্ত প্রমাণে হে প্রত্যক্ষমমুমাপি চ।

নিত্যানিত্যাঙ্কং সর্বং নব তত্বানি সপ্ত বা।

জীবাঙ্গীর্বো পুণ্যপাপে চাশ্রবঃ সংবরোহপিচ

বন্ধো নিজরগং মুক্তির্বেদাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে।

চেতনালক্ষণো জীবঃ শ্রাদ্ধজীবন্তদত্তকঃ।

সংকর্ম্মপুণ্যলঃ পুণ্যং পাপং তন্ত বিপর্যায়ঃ

আশ্রবঃ কর্ম্মণাং বন্ধো নিজরত্ত্বিহোজনম্

অষ্টকর্ম্মক্সান্মোক্ষোহখাত্তর্ভাবশ্চ কৈশচন।

পুণ্যস্ত সংশ্রবে পাপস্তাশ্রবে ক্রিয়তে পুনঃ

লকানন্তচতুষ্কল লোকা গুহ্য চাশ্রবঃ

কীৰ্ত্তকৰ্মণো মুক্তিৰ্ণিৰ্ব্যাবৃতিৰ্জিনোদিতা ॥
 স্বৰাজোহরণা ভৈক্ষ্যভূজো লুক্কিতমূৰ্ছজাঃ ।
 খেতাধরাঃ কমাশীলা নিঃসঙ্গা জৈনসাধবঃ ॥
 লুক্কিতাঃ পিচ্ছিকাহতাঃ পাণিপাত্ৰা দিগম্বরাঃ ।
 উৰ্দ্ধাশিনো গৃহে দাতুৰ্ব্বিতীরাঃ স্ম্যজিনধৰাঃ ॥
 ভুঙক্তে ন কেবলং ন জীং মোক্ষমেতি দিগম্বরাঃ ।
 প্রোহরেণাময়ং ভেদো মহান্ খেতাধরৈঃ সহ ॥” ইতি ।

অর্থাৎ,—‘জিনদত্তহরি এই মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহার বল, ভোগ, উপভোগ, দান, লাভ সম্বন্ধে অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই; নিদ্রা, ভীতি, অজ্ঞানতা, জুগুপ্সা, হিংসা, রতি, অরতি, রাগ, ঘেব, রমণ, কাম, শোক, মিথ্যা প্রভৃতি অষ্টাদশ দোষ যাহার নাই; তিনিই জিন, দেব, গুরু, সম্যক্‌তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা। জ্ঞান, দর্শন, চরিত্র—অপর্যগের অর্থাৎ মোক্ষের পথস্বরূপ। স্যাধাদ তাঁহাদের তর্কপদ্ধতি; প্রত্যক্ষ ও অনুমান দুই প্রমাণ। সর্ব্ব অর্থাৎ বিশ্ব নিত্যানিত্যাত্মক; তত্ত্ব সপ্তবিধ বা নববিধ। জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আশ্রব, সংবর, বন্ধ, নির্জর, মুক্তি,—এই নব-তত্ত্বের ব্যাখ্যা অধুনা কথিত হইতেছে। ‘জীব’ চেতনালক্ষণাক্রান্ত; ‘অজীব’ তাহার বিপরীত-ভাবাত্মক; সংকর্ম্ম-সমূহই ‘পুণ্য’; তাহার বিপর্যায় ‘পাপ’; ‘আশ্রব’ কর্ম্মের বন্ধন; ‘নির্জর’—সে বন্ধের ছেদন; অষ্ট কর্ম্মের ক্ষয় ‘মোক্ষ’; ইহাই নবতত্ত্বের নিগূঢ় অর্থ। (মতান্তরে) ‘পুণ্য’ সংশ্রবের ও ‘পাপ’ আশ্রবের অন্তর্ভুক্ত হয়। অষ্টকর্ম্ম কীর্ণ হইলে, নির্বাণ-মুক্তি জিনদত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। (খেতাধর ও দিগম্বর দুই সম্প্রদায়ের পরিচয় অতঃপর প্রদত্ত হইয়াছে।) খেতাধর-জৈনসাধুগণ কমাশীল নিঃসঙ্গ বেশ-আশ্রমধারী ও ভিক্ষাজীবী। দিগম্বরেরা পাণিপাত্র ও পিচ্ছিকাধারী (চামর বিশেষ) এবং উলঙ্গ। খেতাধরেরা জী-সংসর্গে বিরত, দিগম্বরেরা জী-সংসর্গে বিরত নহেন।’ জিনদত্তহরি সংক্ষেপে যে ভাবে জৈন-ধর্ম্মের পরিচয় দিয়াছেন, অধুনা তৎসম্বন্ধে সামান্ত মতান্তর দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু স্থূলতঃ ঐ কয়েকটা বিষয়ই জৈনদর্শনের মেরুদণ্ড-স্থানীয়। সেই কর্ম্মের কথা, সেই কর্ম্মক্ষয়ের বিষয়, সেই পাপ-পুণ্য, সেই তত্ত্বজ্ঞান,—সকল প্রসঙ্গই ইহাতে সংক্ষেপে বিবৃত আছে। উহাদের এক একটা বিষয় বিশেষভাবে বুঝিতে গেলে অশেষ আয়াস আবশ্যক করে। পূর্বে আমরা স্যাধাদ বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। স্যাধাদ—তর্করীতি—জৈনন্যায়। উহা অনেকান্তবাদ নামেও অভিহিত হয়। সকল মতের বিবাদ-বিতণ্ডা স্যাধাদে সমাহিত হইয়াছে; জৈনদার্শনিকগণ ইহাই ঘোষণা করেন। ‘সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ’কার স্যাধাদ সম্বন্ধে ‘অনন্তবীৰ্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে স্থূলভাবে স্যাধাদের পরিচয় পাওয়া যায়। অনন্তবীৰ্য্যের সে মত;—

‘তদ্বিধানবিবক্ষারং স্যান্তীতিগতিভির্ভবেৎ । স্যান্তীতি প্রয়োগঃ স্যান্তনিবেদে বিবক্ষিতে ॥

ক্রমেণোত্তরবাহারং প্রয়োগঃ সমুদ্রায়তাক্ । মুখপত্তদ্বিবক্ষারং স্যাধ্বাচ্যামশিক্ততঃ ।

আত্মাবাচ্যবিবক্ষারং পক্ষমো জ্ঞান ইত্যুক্তে । অন্ত্যাবাচ্যবিবক্ষারং বর্ষভঙ্গসমুদবঃ

সমুদয়েন কৃত্যন্ত সমুদয়ো জ্ঞান উচ্যতে ॥’

অর্থাৎ,—‘বস্তুবিশেষের বিধান বা বিদ্যমানতা বুঝাইবার ইচ্ছা করিলে, ‘সাদৃশ্য’ বলিতে হইবে। তাহার নিবেদন বা অভাব বুঝাইতে ‘সাদৃশ্য’ প্রয়োগ আবশ্যক। পর্যায়ক্রমে যদি উভয়ের অর্থাৎ বিদ্যমানতার ও অভাবের আকাঙ্ক্ষার শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে, ‘সাদৃশ্য’ চ নাস্তি চ’ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু যুগপৎ উভয় ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, ‘সাদৃশ্য’ বলিতে হইবে। এইরূপ আদি অস্তিত্ব ভাব অব্যাক্ত বুঝাইতে হইলে ‘সাদৃশ্য’ অব্যাক্ত; নাস্তিত্ব বুঝাইতে হইলে ‘সাদৃশ্য’ চ অব্যাক্ত; এবং অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-ভাব বুঝাইতে হইলে, ‘সাদৃশ্য’ চ নাস্তিচ অব্যাক্ত বলিতে হইবে। ইহাই ‘সপ্তভঙ্গী’। স্তায়দর্শনের বাহ্য ‘প্রতিজ্ঞা,’ জৈনদর্শনের ‘নয়’ তাহাই। স্তায়দর্শনের ‘উদাহরণ’ মধ্যে দুই ভাব আছে; (১) অস্থায়ী, (২) ব্যতিরেকী অর্থাৎ বিদ্যমানতা ও অনিচ্ছমানতা। এক্ষেত্রে ‘অস্তি’-‘নাস্তি’ও অনেকটা তদ্ব্যবস্থাপক। ‘সাদৃশ্যটোহস্তি’ বলিলে ঘট আছে কিন্তু অস্তি কিছু নাই, ইহাই বুঝাইয়া থাকে। ‘আছে’ বলিলেই থাকা ও না থাকার ভাব আসে; ‘অস্তি’ বলিলে অস্তি ও নাস্তি উভয় ভাব জাগরুক হয়। অপিচ, অস্তি ও নাস্তি দুই বিরুদ্ধ ভাব যে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, সেই জন্যই ‘অস্তি নাস্তি চ অব্যাক্ত’ বলা যায়। এইরূপে সৎ ও অসৎ, বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা—অব্যক্ত্য হইয়া পড়ে। বেদান্তবাদের বিরুদ্ধ-বিতর্কে জৈনদর্শনের ‘সপ্তভঙ্গী নয়’ স্মৃষ্ট হইয়াছিল, মনে করা যাইতে পারে। বেদান্ত ‘সৎ’ ভিন্ন অস্তি কিছুই নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বেদান্ত মতে, সকল পদার্থের মধ্যেই সেই এক সত্তা বিদ্যমান। কিন্তু স্তায়দর্শন বুঝাইলেন,—অস্তি স্বীকার করিতে হইলেই নাস্তি স্বীকার করিতে হইবে। অস্তি-নাস্তি পরস্পরের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অপিচ, অস্তি-নাস্তি যুগপৎ উভয়ভাব অব্যাক্ত। বেদান্তের ‘সৎ’ এবং বৌদ্ধগণের ‘কণিকাবাদ’,—এই দুইয়ের সামঞ্জস্য-বিধানে স্তায়দর্শনের স্মৃচনা হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন। বেদান্ত বলেন,—‘নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সত্যসত্তা চৈতন্যই জগৎ সৎ; তত্ত্বিন্ন পরিদৃষ্টমান সকল বস্তুই—(নামরূপ) মারা বা মিথ্যা। যাহা সৎ, তাহা চিরদিনই সৎ; তাহা কখনই পরিবর্তনের অধীন নহে। যাহা পরিবর্তনশীল, তাহা অসৎ।’ কণিকাবাদী বৌদ্ধগণ বলেন,—‘সংসারের সকলই পরিবর্তনশীল। সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা পরিবর্তন-প্রবাহে নিপতিত নহে। যাহা আজ আছে, তাহা কাল নাই; যাহা কণপূর্বে ছিল, তাহা কণপরে বিধ্বংসপ্রাপ্ত। সুতরাং নিত্য বলিয়া কোনও পদার্থ স্বীকার করা যায় না।’ ‘স্তায়দর্শন’ এই দুই মতের (বেদান্তের সৎ এবং কণিকাবাদের অসৎ) সামঞ্জস্য-সাধন-প্রয়াসী। ‘সপ্তভঙ্গী নয়’ বুঝায়, অস্তি-নাস্তি উভয়েই কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বেদান্তের মূল লক্ষ্যে যাহাদের বিভ্রম ঘটে, অথবা কণিকাবাদের একদেশদেবী তর্কে যাহারা বিভ্রান্ত হন, স্তায়দর্শন ভাষান্তরে ভাষান্তরে তাহাদের সেই ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত্যর্থ খ্যাপন করে। স্মৃষ্ট-পদার্থ দেখিয়া স্মৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। জগৎ আছে বলিয়াই, জগৎকারণ জগদীশ্বরের অস্তিত্ব বলা যায়। জৈনগণ কিন্তু এ ভাবে জৈন অদীকার করেন না। সে মতে—যিনি রূপধর্মবিশুদ্ধ অর্থাৎ, তিনিই জৈনোক্ত-পুণ্ডিত সর্বজ্ঞ জৈন। সেই অর্হংগণের আরাধনা করিয়াই বিভিন্ন শক্তির পক্ষে অজ্ঞান হন।

যিনি মুক্তির অভিলাষী, তাঁহার প্রথম প্রতিপাল্য—বিনয়। ‘বিনয়’ কি, তাহা বুঝিতে হইলে, ‘উত্তরাধ্যয়ন’ প্রথম অধ্যয়ন অভিনিবেশ সহকারে অমুশীলন করিবার প্রয়োজন।

বিনয়ের মধ্যে যে মহান্ ভাব নিহিত আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে বিনয়। পারিলেই মুক্তি অধিগত হয়। বিনয় কি, তাহা বুঝাইবার পূর্বে বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি কে, উত্তরাধ্যয়ন-সূত্রে তাহার একটু পরিচয় আছে। উত্তরাধ্যয়নের প্রথম অধ্যয়নে প্রথম সূত্রে সেই বিষয় বলা হইয়াছে। বিনয় যে কি কঠোর অমুশীলন, তাহাতে তাহা বুঝা যায়। বখা;—

“সংজোগা বিপ্রমুক্তস্য অনগারস্য ভিখুণো।

বিনয়ং পাউকরিস্যামি আত্মপূৰ্ণং স্তুণেহমে॥”

সুজ্ঞানী প্রাকৃতভাষার লিখিত। সংস্কৃতভাষার এবং বঙ্গভাষার উহার যে অর্থ হয়, নিয়ে তাহা প্রকাশ করিতেছি। ‘সংজোগা’ শব্দ সংস্কৃতে ‘সংযোগাৎ’ অর্থাৎ ‘সংযোগ-হইতে’ অর্থ সূচিত করে। কিন্তু ‘সংজোগা’ বলিলেই কোনও কিছু সহিত সম্বন্ধ-সংশ্রবের বিষয় মনে আসে। সে কি প্রকার? টীকাকার বলিতেছেন,—“সংজোগা.....সংযোগাৎ; বাহু-সংযোগাঃ ধন-ধাত্ত-পুত্রকলত্রাদয়ঃ তথা আভ্যন্তর-সংযোগাঃ মিথ্যাস্ব-ক্রোধ-মান-মাদা-লোভাঃ তেতাঃ।’ অর্থাৎ,—বাহু-সংযোগাঃ আভ্যন্তর-সংযোগ দ্বিবিধ; ধন-ধাত্ত-পুত্র-কলত্র প্রভৃতির সহিত যে সংযোগ, তাহা বাহু-সংযোগ; আর মিথ্যাস্ব-ক্রোধ-মান-মাদা-লোভ প্রভৃতির সহিত যে সংযোগ, তাহা আভ্যন্তর সংযোগ। সুতরাং, ‘সংজোগা’ শব্দে ঐ উভয়বিধ ‘সংযোগ হইতে’ অর্থ নিম্পন্ন হয়। তার পর, সূত্রের দ্বিতীয় শব্দ—‘বিপ্রমুক্তস্য’; অর্থ—‘বিপ্রমুক্তস্য, বিশেষণ নিম্নমুক্তস্য’; অর্থাৎ বিশেষভাবে মুক্ত। সুতরাং ‘সংজোগা বিপ্রমুক্তস্য’ যে কি অবস্থা, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন। যাহার ধন-ধান্য-পুত্র-কলত্রাদির সহিত বাহু-সংযোগ এবং মিথ্যাস্ব-ক্রোধ-মান-মাদা-লোভ প্রভৃতির সহিত আভ্যন্তর-সংযোগ বিশেষভাবে লোপ পাইয়াছে, তাঁহারই বিষয় এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর তিনি কেমন? না—‘অগারস্য’; অর্থাৎ,—‘অগারস্ত, গৃহরহিতস্ত’। তিনি গৃহত্যাগী, সন্ন্যাস-ব্রতধারী। আর কেমন? না—‘ভিখুণো’ অর্থাৎ ‘ভিক্ষো; মধুকরবৃত্ত্যাহারাং গৃহীত্বা শরীরধারণকস্য’। তিনি মধুকরবৃত্তি অবলম্বনে বিভিন্ন স্থান হইতে কণা কণা আহাৰ ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করেন। এমন যে ব্যক্তি, তিনিই বিনয় শিক্ষার অধিকারী। মহাবীর স্বামী তেমনই ব্যক্তিকে বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিতে বলিয়াছিলেন। জম্বুস্বামীর নিকট জম্বুস্বামী সেই কথাই উক্ত সূত্রে ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—‘ঐক্লপ সাধুর নিকটেই ‘বিগমম্’ (বিনয়ম), ‘পাউকরিস্যামি’ (প্রকটী করিষ্যামি) অর্থাৎ বিনয় বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব; ‘আত্মপূৰ্ণং’ (আত্মপূৰ্ণা) ‘স্তুণেহমে’ (মম সকাশাৎ শৃণুত); আমার নিকট যথাক্রমে শ্রবণ করুন।’ এই উক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়, বিনয় শ্রবণের অধিকারী কোন জন! যিনি ধনধাত্তপুত্রকলত্রাদি বাহু-সংযোগ এবং মিথ্যা-ক্রোধ-মান-মাদা প্রভৃতি আভ্যন্তর সংযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন; যিনি বিশেষভাবে সংসার বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন; যিনি মধুকর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কণাকণা

আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিয়া জীবন-ধারণ করিতেছেন; সেই গৃহত্যাগী সন্ন্যাস-ব্রতধারী সাধুই বিনয়-শিক্ষার প্রকৃত অধিকারী। বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্রে ‘অথ’ শব্দের ব্যাখ্যায়, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য * প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পক্ষে যে অধিকার অনধিকারের প্রশংসা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এখানে তাহারই আভাষ দেখিতে পাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—“বিধিবদদীতবেদবেদান্তেনোপাততোধিগতাখিলবেদার্থঃ অগ্নিনু জন্মানি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ-বর্জ্জনপুংসর নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনামুষ্ঠানেন নিৰ্গতনিখিলকল্মষতয়া নিত্যান্তনির্ণলস্বাস্থ্যঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন প্রমাতা অধিকারী ।” এইরূপ, বিনয় সম্বন্ধে উপদেশ পাইবার অধিকারীর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য প্রয়োজন। প্রোক্ত সূত্রে তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রে অধিকন্তু বিনয়সম্পন্নের ও হৃদ্বিনীত জনের পরিচয় আছে। তাহাতে দেখি,—

“আগা-নির্দেশ-করে গুরুণমুববায়কারণএ। ইংগিয়াগারসংপন্ন সে বিনীএতি বুজ্জৈ ॥
জহা স্ত্রী পুটুকরী নিকসিজ্জই সব্বসো। এবং দুসসীল পড়িণীএ মুহরী নিকসিজ্জৈ ॥”
অর্থাৎ,—‘গুরুর আজ্ঞাই যাহার নিকট প্রমাণ, গুরুর ইঙ্গিতমাত্রই যাহার জ্ঞান, গুরুর দৃষ্টি-গোচরে যাহার অবস্থান, তিনিই প্রকৃত বিনয়-সম্পন্ন। যে দুঃশীল, গুরুদেবী, বাচাল, অমিতভাবী, তাহাকে পুতিকর্ণি কুকুরীর মত বিতাড়িত করা কর্তব্য।’
ফলতঃ, গুরুর আদেশানুবর্তী হইয়া যে জন কঠোর সংযম অবলম্বন করিতে সমর্থ হয়, বিনয় প্রতিপালনে তাহারই অধিকার।

মুক্তির পথ যে কি ঘোর সঙ্কট-সমাকুল, সে পথে যে কি ভীষণ বাধা-বিপত্তি বিদ্যমান, পথের পরিচয় ব্যপদেশে, অষ্টবিধ কৰ্ম্ম ও দ্বাবিংশ পরিসহ প্রসঙ্গে, তাহার আভাষ দিয়াছি।

পথে
বাধা-বিপত্তি।
বিনয় যাহার প্রারম্ভ, সে পথ কি কঠোর! মূল লক্ষ্য—কৰ্ম্মধ্বংস।
রতি ও বিরতির কলে কৰ্ম্মের উৎপত্তি হয়। অতি কঠোর সংযম-সাধনা ভিন্ন

কৰ্ম্ম ধ্বংস হয় না। নূতন কৰ্ম্ম যাহাতে উৎপন্ন না হয়, তৎপক্ষে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অপিচ, পুরাতন কৰ্ম্ম যাহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হইতে হইবে। জলাশয়ের জল-সঞ্চয়ের পথ রোধ হইলে, কিয়দংশ বাষ্পাকারে বিলীন হয়, আর কিয়দংশ মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতির ব্যবহারে নিঃশেষ হইয়া আসে। কৰ্ম্মক্ষয় বিষয়েও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। নূতন কৰ্ম্ম যাহাতে সঞ্চিত না হয়, পরন্তু সঞ্চিত কৰ্ম্ম যাহাতে লোপ পায়, সন্ন্যাসীর তাহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? কঠোর সংযম-সাধনা ভিন্ন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে। জৈনদর্শন সেই কঠোর সংযম-সাধনাকে প্রধানতঃ বাহ ও আভ্যন্তর ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সেই বিবিধ সংযম-সাধনা আবার প্রত্যেকে বহুবিধ উপবিভাগে বিভক্ত। বাহ-সংযম-সাধনা,—(১) অনশন, (২) অবমোদারিকা অর্থাৎ ক্রমোপবাসানুশীলন; সন্ন্যাসী প্রথমে যে আহাৰ গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাহাকে দ্বাত্রিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিদিন এক এক বিভাগ

* পৃথিবীর ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, বেদান্ত দর্শন,—অধিকার-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে ১২০ পৃষ্ঠায় এতদ্বিবক্ষ্য আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কমাইয়া আনিবেন ; (৩) ভিক্ষাচর্যা অর্থাৎ ভিক্ষাগ্রহণ, (৪) রস পরিত্যাগ, অর্থাৎ স্তূরপাথক পরিবর্জন, (৫) কায়ঃক্ৰেণ অর্থাৎ দৈহিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা, (৬) সংলীনতা অর্থাৎ নিঃসঙ্গ-বাস । এই যে ষড়বিধ বাহু সংযম-সাধনা, ইহার মধ্যে বিবিধ জাতব্য তত্ত্ব আছে । অনশন বিষয়ে বিধান দেখিতে পাই,—কেহ বা নির্দিষ্ট কাল অনশন-ব্রতধারী, কেহ বা অনশনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন । অবমোদারিকা কেবল খাদ্য সম্বন্ধে নহে ; ভিক্ষা গ্রহণে, বেশ-ভূষা-পরিগ্রহেও প্রতিপাল্য । ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য বিষয়ে অথবা দাতা সম্বন্ধে তাঁহার কোনও চাক্ষু্য আসিবে না, যথাপ্রাপ্ত খাদ্যে জীবন ধারণ করিয়া নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিনি জ্ঞানাবেষণে রত থাকিবেন, ইহাই বাহু-সংযম সাধনার উদ্দেশ্য । আভ্যন্তর সংযম সাধনা আরও কত কঠোর, তাহা বিচার করিয়া দেখুন । আভ্যন্তর সংযম সাধনা,—(১) প্রায়শ্চিত্ত ; উহা দশবিধ, প্রধানতঃ কৃতপাপ বিষয়ে গুরুতর নিকট অকপটে আত্মত্যাগন । (২) বিনয় ; ইহাও দশবিধ ; সম্যক শীলতাই ইহার প্রধান লক্ষ্য । (৩) বৈরাগ্য অর্থাৎ গুরুতর পরিচর্যা । (৪) স্বাধ্যায় ; উহা পঞ্চবিধ ; নির্দিষ্ট পাঠ শিক্ষা ও আবৃত্তি, তদ্বিষয়ে আচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ, পুনরাবৃত্তি, অভিনিবেশ, ধর্ম-প্রসঙ্গ । (৫) পাপকর ও কষ্টকর চিন্তা হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একাগ্রচিত্তে ধর্ম-বিষয়ে চিন্তাভিনিবেশ । (৬) ব্যুৎসর্গ অর্থাৎ শমনে, উপবেশনে অথবা দণ্ডায়মান হইয়া গুরুর শ্রায় নিশ্চল—প্রশান্তভাবে । যে মহাপুরুষ উক্তবিধ বাহু ও আভ্যন্তর সংযম-সাধনার সমর্থ হইয়াছেন, জন্মচক্রের আবর্তে তাঁহাকে আর কখনও বিঘূর্ণিত হইতে হইবে না ।

জৈন-ধর্মের কঠোরতা পালনে আর যে সকল বিধি-বিধান আছে, তন্মধ্যে ‘সমিতি’ ও ‘গুপ্তি’ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় । উহার ‘অষ্টমায়া’ নামে অভিহিত । পঞ্চসমিতি সমিতি যথা ;—(১) ঈর্ষ্যাসমিতি ; যে পথ দিয়া মহুশ্য পশু বা রথাদি গতি-ও বিধি করে, অতি সতর্কতার সহিত সেই পথে চলাচল করিতে হইবে ; গুপ্তি। যেন কোনও প্রাণিহত্যা না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এ বিষয়ে অনেক কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় ; পরিভ্রমণকাল, আলম্বন কাল, পথ, জাযণা (যত্র)—এই চারিটি বিষয়ে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । (২) ‘ভাষা-সমিতি’ ; মুহু অভিবাদন-মূলক মিষ্ট সত্য বাক্য কখন ; এ অবস্থায় রাগ, অহঙ্কার, প্রভারণা, আকাঙ্ক্ষা, হাঙ্গ, বাচালতা এবং গালি—এই অষ্টবিধ দোষ পরিহার করিতে হইবে । উপযুক্ত সময়ে নির্দোষ ও সার বাক্য উচ্চারণ এই নিয়মের অন্তর্গত । (৩) ঈষণা-সমিতি ; ভিক্ষা গ্রহণে যে দ্বিচছারিংশবিধ দোষ আছে, তাহা পরিহার করিয়া ভিক্ষাগ্রহণ ; সেই দোষ নানারূপে সঙ্গীত হয় । যিনি দাতা তৎকর্তৃক কৃতদোষ ‘উলগম’ নামে এবং যিনি গৃহীতা তৎকৃত দোষ ‘উৎপাদন’ নামে এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ব্যবহার বিষয়ক দোষ ‘পরিভোগৈষণা’ নামে অভিহিত হয় । * সেই সকল দোষ পরিহার পূর্বক ভিক্ষাগ্রহণ

* উলগমদোষ ষোড়শ বিধ । সে দোষ থাকিলে জৈন-ভিক্ষু খাদ্য দ্রব্য ভিক্ষা করিতে পারিবেন না । ষোড়শবিধ উলগম দোষ, যথা,—(১) ‘আধাকরজিক’ ; অপর কোনও ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষকের জন্ত গৃহস্থ যে খাদ্য প্রস্তুত করে, তাহা এই দোষ-বিশিষ্ট ; জৈন-ভিক্ষুগণ সেসকল খাদ্য গ্রহণ করিবেন না । ‘ওদৈশিক’ :

করিতে হইবে;—ইহাট ‘ঈষণ-সমিতির’ লক্ষ্য । (৪) ‘আদান-সমিতি’ ; ধর্ম-কর্ম্মাভ্যাসের জন্ত যে সকল দ্রব্য আবশ্যক, বিশেষ পরীক্ষার পর তৎসমুদায় পরিগ্রহণ ও সংরক্ষণ । (৫) ‘উচ্চার-সমিতি’ ; লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক জনশূন্য স্থানে মলত্যাগ । এই পঞ্চবিধ ‘সমিতি’ সম্বন্ধে প্রতিপাল্য কঠোর বিধি-বিধান আছে ; সন্ন্যাসীদের তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় । গুপ্তি ত্রিবিধ । স্থূলভাবে সেই ত্রিবিধ গুপ্তি সমিতিরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে । সেই গুপ্তি ত্রয়;—(১) মনোগুপ্তি ; অমুশীলন এবং অমুখ্যান প্রভৃতিতে চিন্তার গতি যেন ইন্দ্রিয়-স্বর্থ সাধনে পরিচালিত না হয়, তৎসম্বন্ধে মনকে দৃঢ়ীকরণ । সংসারে সত্য আছে, অসত্য আছে, সত্যের ও অসত্যের মিশ্রণ আছে, আবার যাহা সত্য নয় ও যাহা অসত্য নয়, তাহারও মিশ্রণ আছে । গুপ্তিই মনকে সেই সকল বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেয় । (২) ‘বাগ্-গুপ্তি’ ; জিহ্বা যেন কদাচ কুব্যাক্য উচ্চারণ না করে, বাগ্-গুপ্তিরূপ বাক্য-সংযম তাহাই শিক্ষা দেয় । সত্য, অসত্য, সত্যাসত্য, সত্য নয় ও অসত্য নয়—এই চতুর্বিধ অবস্থার সতর্কতা অবলম্বন বাগ্-গুপ্তির লক্ষ্য । (৩) ‘কায়গুপ্তি’ ; কায়োৎসর্গ অবস্থায় দেহ যেমন নিশ্চল নিষ্পন্দভাবে অধিষ্ঠিত থাকে, কায়গুপ্তি তাহাই উপদেশ দেয় । কিবা দণ্ডায়মান, কিবা উপবেশনে, কিবা উল্লঙ্ঘনে, কিবা গমনাগমনে, কিবা ইন্দ্রিয়-পরিচালনে সন্ন্যাসীর দেহ কখনও কুচিন্তার অমুসরণ করিবে না, কখনও কোনও প্রাণীর কঠোর বা বিনাশের কারণ হইবে না ; কায়গুপ্তির ইহাই নিগূঢ় লক্ষ্য । ধর্ম-জীবনের অমুশীলনে সমিতি-পঞ্চক এবং পাপ-কর্ম্মের বিনিবর্তনে গুপ্তি-ত্রিতয়ের উপযোগিতা । এই সমিতির ও গুপ্তির গূঢ়-তত্ত্ব যাহাদের অধিগত হইয়াছে, অপিচ যাহারা তাহা কর্ম্মে নিয়োজিত করাইতে পারিয়াছেন, সেই জ্ঞানিগণই জন্মচক্র হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, জিন-পদ লাভ করিবেন ।

কোনও বিশেষ ভিক্ষুর জন্ত যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা এই দোষ সংশ্লিষ্ট । জৈন-ভিক্ষুগণ এবিধ খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না । এইরূপ পুতিক, উয়িশ্র, হাপনা-কর্ষিক, প্রাত্তিক, প্রাত্নঃকরণ, ক্রীত, প্রামিতা, পরাভূতি, বধ্যাহত, উত্তির, মালাহত, আচ্ছিত্ত, অনিঃসৃত, অধ্যবপুর প্রভৃতি ভেদে ষোড়শ-দোষ উল্লগমদোষ পর্যায়ভুক্ত । এই সকলের অর্থে বৃষ্টিতে পারা যায়, জৈন-ভিক্ষু ক্রয় করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবেন না ; জোর করিয়াও কাহারও নিকট হইতে খাদ্য লইবেন না । পাঁচ জন অঙ্গীদারের মধ্যে একজন অঙ্গীদার কোনও খাদ্য প্রদান করিলেও তাহাও লইতে পারিবেন না । উৎপাদন দোষও বড়বিধ । যথা,—(১) ধাতু-কর্ম্ম, (২) দূতকর্ম্ম, (৩) নিমিত্ত, (৪) আজীবিকা, (৫) বপনীকা, (৬) চিকিৎসা, (৭) ক্রোধপিণ্ডা প্রভৃতি । এই সকল উপাদক-দোষের মূল লক্ষ্য এই যে, সন্ন্যাসী কাহারও সম্ভানাদি প্রতিপালন পূর্ব্বক অথবা কোনও সংবাদ আদান-প্রদান পূর্ব্বক অথবা কাহারও ব্যাধি-চিকিৎসাপূর্ব্বক, অথবা আত্ম-পরিচয় ব্যাপনপূর্ব্বক অথবা ক্রোধাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না । তাহা হইলে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য উৎপাদন-দোষ-দ্বষ্ট হইবে । অহৈষণা-দোষ দশবিধ ; শঙ্কিত, ত্র্যঙ্কিত, নিক্ষিপ্ত ইত্যাদি ; ভীত ব্যক্তির নিকট ভিক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি এই পর্যায়ের অন্তর্গত । ‘পরিভোগৈষণা’ চতুর্বিধ ; যথা,—সংযোজন, অগ্রমাণ, ইন্দ্রি, অকারণ স্বখাত্তের উপাদান সমূহ সংগ্রহ, নির্দিষ্ট খাদ্যের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ, স্বখাদ্য প্রাপ্তির জন্ত ধনীর প্রত্সোবাদ, মল খাদ্যের জন্ত দরিদ্রের নিন্দাবাদ, শাস্ত্র-কথিত খাদ্যের পরিবর্তে অন্য খাদ্য গ্রহণ । এইরূপে ভিক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে বিচক্ষারিণে দোষের বিষয় অমুখ্যান করিলে কি কঠোর সংযম-সাধনা জৈন ব্যক্তিগণের জন্ত বিহিত হইয়াছিল, তাহা বৃষ্টিতে পারা যায় ।

জৈন-দর্শনের আর এক জ্ঞাতব্য বিষয়—জীবতত্ত্ব। যে ভিক্স সম্যকরূপে জীবতত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছেন এবং জীব ও অজীব এতদ্বয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া যথাবিহিত পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন; তিনিই আত্ম-সংযমশীল, তাঁহারই জীব ও অজীব সংযম-সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। জীব ও অজীব লইয়াই ‘লোক’ (পৃথিবী); আর যেখানে কেবলমাত্র অজীব, তাহার নাম ‘অলোক’ (পৃথিবীর অন্তীত স্থান)। পদার্থ, স্থান, কাল ও স্ফুর্তি—ইহাদের সহিত জীব ও অজীব সম্বন্ধযুক্ত। অজীব সাধারণতঃ দুই প্রকার;—(১) আকৃতি বিশিষ্ট, (২) নিরবয়ব। নিরবয়ব জীব দশবিধ ও আকৃতি-বিশিষ্ট জীব চতুর্বিধ। দশবিধ নিরবয়ব অজীব যথা;—(ক) ধর্ম, (খ) উহার বিভাগ-সমূহ, (গ) উহার অদৃশ্য অংশ-সমূহ, (ঘ) অধর্ম, (ঙ) উহার বিভাগ-সমূহ, (চ) উহার অদৃশ্য অংশ-সমূহ, (ছ) আকাশ, (জ) উহার বিভাগ-সমূহ, (ঝ) অদৃশ্য অংশ-সমূহ, (ঞ) কাল (আত্ম সময়)। ধর্ম এবং অধর্ম এই লোক অর্থাৎ পৃথিবীর সহিত সমভাবে বিস্তৃত। আকাশ,—লোক ও অলোক ব্যাপিয়া আছে। কাল অনন্তকাল বিস্তারিত আছে। ধর্ম, অধর্ম এবং আকাশ—চিরদিন আদি-অন্তহীন। কালও তদ্রূপ;—বস্তুগত বা ব্যক্তিগত ভাবে ইহার আদি অন্ত উপলব্ধি হয়। অতঃপর অবয়ব-বিশিষ্ট অজীব পদার্থের বিষয় এইরূপ-ভাবে কথিত আছে; উহার চতুর্বিধ;—(ক) মিশ্র পদার্থসমূহ; (খ) তাহাদের বিভাগসমূহ; (গ) তাহাদের অদৃশ্য অংশ-সমূহ; (ঘ) পরমাণু-সমূহ। মিশ্রপদার্থ-সমূহ এবং তাহাদের পরমাণু-সমূহ লোকে বা লোকাংশে একাবয়বে অথবা পৃথকভাবে অবস্থিত। সূক্ষ্ম পদার্থ-সমূহ সমগ্র লোক ব্যাপিয়া আছে। স্থূল পদার্থ-সমূহ কেবলমাত্র পৃথিবীর পরিদৃশ্যমান অংশে বিস্তারিত রহিয়াছে। কাল বিষয়ে সেই অবয়ব-বিশিষ্ট পদার্থের অপ্রতিহত ধারা প্রবাহিত হইতেছে। উহার আশ্রয় নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত ও বস্তুগত বিষয়ে দেখিতে গেলে, উহার আদি এবং অন্ত উভয়ই আছে। উহাদের স্ফুর্তি পঞ্চবিধ; বর্ণ, গন্ধ, আত্মাদ, স্পর্শ ও আকৃতি দ্বারা অনুমেয়। স্বেত, কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, হরিৎ ভেদে বর্ণ পঞ্চবিধ। সূগন্ধ, দুর্গন্ধ ভেদে গন্ধ দ্বিবিধ। তিক্ত, অম্ল, মধুর, কষায়, কটু ভেদে আত্মাদ পঞ্চবিধ। কঠিন, কোমল, শুষ্ক, লঘু, শীতল, উত্তপ্ত, মল্ল, বজ্র ভেদে স্পর্শ অষ্টবিধ। বর্জুলাকার, গোলাকার, ত্রিকোণাকার, চতুর্ভুজাকার এবং দীর্ঘাকার ভেদে আকৃতি পঞ্চবিধ। বলা বাহুল্য, বর্ণ গন্ধ প্রভৃতির পূর্বোক্ত বিভাগ-সমূহের আবার উপবিভাগ আছে। সেই সকল আলোচনা করিয়া অজীব-তত্ত্ব নির্দ্ধারিত হয়।

‘জীব’ শব্দে জৈনদর্শনে অনেক গভীর ভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে। জীব প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত;—(১) সংসারী, (২) সিদ্ধ। যাহারা সিদ্ধ সম্যকত্ব প্রাপ্ত বা মুক্ত পুরুষ, দ্রব্য,

স্থান, কাল, স্ফুর্তি ভেদে তাঁহাদের নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জীব—দ্বিবিধ; মুক্ত বা সিদ্ধ আত্মা—জীলোকের হইতে পারে, পুরুষের হইতে পারে,

(১) সিদ্ধজীব।

নপুংসকের হইতে পারে, প্রচলিত ধর্ম্মতানুগত ব্যক্তির হইতে পারে, অথবা তদ্বিরুদ্ধবাদীরও হইতে পারে, গৃহীর হইতে পারে, গৃহত্যাগীর হইতে পারে;

বৃহত্তমের, ক্ষুদ্রতমের, নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহজ্জনেরও সে অবস্থা আসিতে পারে ; উচ্চস্থানে, সমতলক্ষেত্রে, সমুদ্রে, নদী প্রভৃতির জলে, সে অবস্থায় উপনীত হইবার পথে কোনই বিঘ্ন ঘটে না। তবে সংসারের সকলেই যে, সে মুক্ত অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, তাহা নহে। নির্দিষ্ট-সংখ্যক জী-পুরুষ, গৃহী বা সন্ন্যাসী, সে অবস্থা প্রাপ্ত হন মাত্র। সকল স্থানেই যে সমভাবে মুক্তি-লাভের ব্যবস্থা আছে, তাহা নহে। এই মুক্তিলাভ সম্বন্ধে জৈনদর্শনে একটা অনুপাতের উল্লেখ আছে। কুড়ি জন জীলোক, ১০৮ জন পুরুষ, ১০ জন নপুংসক, ৪ জন গৃহী, ১০ জন প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী এবং ১০৮ জন স্বধর্ম-পরায়ণ ভিক্ষু এক সময়ে মুক্তিলাভ করেন। বৃহত্তমাকৃতির দুই জন, ক্ষুদ্রতম আকৃতির ৪ জন এবং মধ্যাকৃতির ১০৮ জন এককালে মুক্তির অধিকারী হন। উচ্চ স্থানের ৪ জন, সমুদ্রের ২ জন, জলের ৩ জন, ভূগর্ভের ২০ জন এবং পৃথিবীর অধিবাসী ১০৮ জন এক সময়ে মুক্তিলাভ করেন। কত জনের মধ্যে :যে ঐ কয় জন উদ্ধার-লাভের অধিকারী, তাহার বিশেষ উল্লেখ নাই। সুতরাং জগতে ঐ অনুপাতে জীব মুক্তি-লাভ করিতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু মুক্ত আত্মা কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি করেন? কোন্ স্থান তাঁহার অধিগম্য নহে? :সম্যকত্ব-লাভের পর, আত্মাই বা কোথায় গমন করেন, দেহই বা কোথায় অবস্থিত থাকে? এ সম্বন্ধে জৈন-দর্শনের উক্তি এই যে, মুক্ত আত্মা অলোকে গমন করেন না। তিনি এই লোকেই উর্দ্ধদেশেই অবস্থিত থাকেন, দেহ এখানে পৃথিবীতে নিম্নে পড়িয়া থাকে ; আত্মা মুক্ত হইয়া উর্দ্ধদেশে গমন করেন। দ্বাদশ যোজন উর্দ্ধে ‘সক্কার্থ’ নামা বিমানে ‘ঈষৎ-প্রাগভাব’ নামক ছত্রাকৃতি স্থান নির্দিষ্ট হয়। মুক্ত আত্মা তথায় গমন করেন। সেই স্থানের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার উভয়ই ৪৫ সহস্র যোজন। তাহার পরিধি দৈর্ঘ্য-বিস্তারের ত্রিগুণ। সে স্থান কত ভাগে কি প্রকারে বিভক্ত এবং তাহার কোথায় কোন্ আত্মার স্থান নির্দিষ্ট, অতঃপর তাহার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের পরিদৃশ্যমান কোনও আকৃতি নাই। তাঁহারা প্রাণরূপে সর্বত্র ওতঃপ্রোতঃ অবস্থিত। জ্ঞানে ও সংবিধানে তাঁহাদের স্ফুর্তি। তাঁহারা অতুলনীয় অনন্ত সুখের অধিকারী। সংসারের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া, শ্রেষ্ঠ মুক্ত অবস্থায় উপনীত হইয়া, সদ্জ্ঞান ও সদ্বিধাসের স্ফুর্তি লাভ করিয়া, তাঁহারা এই লোকের এক অংশে নিত্য বিস্তমান রহিয়াছেন।

যাঁহারা মুক্ত-সিদ্ধ-পূর্ণতপ্রাপ্ত, তাঁহারা ভিন্ন অস্ত্র যে আর এক শ্রেণীর জীবের বিঘ্ন বলা হইয়াছে, অর্থাৎ বাহারা সংসারী, তাহারা আবার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ;—(১)

গতিবিশিষ্ট, (২) গতিহীন। গতিহীন জীব আবার ত্রিবিধ ; (ক)

সংসারী-জীব। পৃথিবী-জীব, (খ) জলজীব, (গ) উদ্ভিদ। গতিহীন জীব সাধারণতঃ

এই তিন ভাগে বিভক্ত হয় ; কিন্তু ইহাদের মধ্যে আবার নানা উপবিভাগ

আছে। প্রথম—পৃথিবী-জীব ; উহারা স্থূলস্থল ভেদে দ্বিবিধ। সেই দুই বিভাগ আবার স্ফুট অস্ফুট ভেদে বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত। স্থূল অথচ পূর্ণস্ফুটিপ্রাপ্ত পৃথিবী-জীব দ্বিবিধ ; মশ্ণ অথবা বজ্রুর। মশ্ণতা সপ্তবিধ ; কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, হরিৎ, খেত, পাংগুল, ধূসর।

বহুর অবস্থার উহা ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার। যুক্তিকা, কঙ্কর, বালুকা, প্রস্তর, পাঁহাড়, শৈলজ লবণ, লোহ, তাম্র, টীন, সীসক, রৌপ্য, স্বর্ণ, হীরক, হরিতাল, সিন্দূর, সাসক (ধাতু বিশেষ) রসায়ন, বিবমিশ্রিত লাল রং, প্রবাল, অত্র-পতল, অত্র-বালুকা; এইগুলি বিভিন্ন জাতীয় স্থূল পৃথিবী দেহের অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ভিন্ন নানা জাতীয় মূল্যবান প্রস্তর আছে; যেমন—ফটিক, লোহিতাক্ষ, মরকত, মশারগল্ল, সূর্য্যকাস্ত, চন্দ্রপ্রভা, হংসগর্ভ, চন্দন, জলকাস্ত, লালখড়ি ইত্যাদি। এইরূপ ষট্‌ত্রিংশবিধ স্থূল পৃথিবীর উল্লেখ হয়। স্থূল পৃথিবী একবিধ; উহার কোনও প্রকারান্তর নাই। এই স্থূলভাব সমগ্র লোকে পরিব্যাপ্ত। স্থূলভাব কেবল এই লোকেই পরিদৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, স্থান বিষয়ে এবং কাল বিষয়ে এই পৃথিবী-জীবের অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে। অবিচ্ছিন্ন কাল-প্রবাহের বিষয় স্মরণ করিতে হইলে, এই পৃথিবী-দেহের আদি অন্ত নাই। কিন্তু যদি বর্তমান কাল-বিষয়ক ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিচার করা হয়, তাহা হইলে উহার আদি ও অন্ত স্বীকার করিতে হয়। তদনুসারে পৃথিবী-জীবের অতি দীর্ঘ আয়ুঃকাল ষাট্‌ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ এবং ইহার অতি-স্থূল আয়ুঃকাল মুহূর্ত্তেরও অনধিক। যেমন কাল সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া পৃথিবী-জীবের আয়ুঃকাল নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ, অবয়ব, স্থান প্রভৃতি সম্বন্ধেও উহার সহস্র সহস্র পর্য্যায়ভেদ পরিকল্পিত হইতে পারে। পৃথিবী-জীব যেরূপ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয়, জলজীবও সেইরূপ স্থূল স্থূল দুই ভাগে বিভক্ত, এবং তাহার পূর্ণক্ষুট অক্ষুট দুই ভাবে অবস্থিত। স্থূল এবং পূর্ণক্ষুট জল-জীব পঞ্চবিধ; পরিশ্রুত জল, শিশির, ঘর্ষ, কুয়াসা, হিমশিলা। স্থূল জলজীব একবিধ; তাহার প্রকার-ভেদ নাই। স্থূলভাবে উহা সর্বলোকে বিস্তৃত; কিন্তু স্থূলভাবে উহা এই পৃথিবীর এক অংশে মাত্র অবস্থিত। কালাদি বিষয়ে পৃথিবী-জীবের যেমন প্রকার-ভেদ পরিলক্ষিত হয়, জলজীবেরও সেই অবস্থা বুঝিতে হইবে। তৃতীয়তঃ—উদ্ভিদজীব। উহারও পূর্ববৎ স্থূল-স্থূল দুই ভাগে এবং পূর্ণক্ষুট অক্ষুট দুই ভাবে অবস্থিত। স্থূল এবং পূর্ণপরিক্ষুট উদ্ভিদের আবার দুই বিভাগ আছে। প্রথম,—একজাতীয় আকৃতিবিশিষ্ট; দ্বিতীয়,—পরস্পর বিভিন্ন-আকৃতি-বিশিষ্ট। যাহাদের আকৃতির স্বাতন্ত্র্য আছে, সেই শ্রেণীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লিখিত হয়; যথা,—বৃক্ষ, গুল্ম, গুল্ম, লতা, বল্লী, তৃণ, বল্লম (তাল-জাতীয় বৃক্ষ), পরবগ (ইক্ষুজাতীয় বৃক্ষ), কুশ (সর্পছত্র ভেদেছত্র ইত্যাদি), ওষধি, হরিতকায় ইত্যাদি। এই সকল উদ্ভিদের স্বতন্ত্র দেহ আছে। সেইজন্মই ইহার স্বতন্ত্র-দেহবিশিষ্ট উদ্ভিদ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অন্ত্র সাধারণ-দেহবিশিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লিখিত হয়;—আলু, মূলা, আদা, কদলী, রসুন, পেঁয়াজ, হরিদ্রা ইত্যাদি। উদ্ভিদজীবের স্থূল অবস্থা উক্ত দুই ভাগে বিভক্ত। উহার স্থূল অবস্থা একই প্রকার; তাহার মধ্যে কোনও ভেদভাব পরিদৃষ্ট হয় না। এই উদ্ভিদ জীবের মধ্যে স্থান-কালাদির যে বিভাগ আছে, তাহা পৃথিবী-জীব প্রভৃতির সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদকে যে জীব মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, হিন্দুশাস্ত্রেও তদ্রূপ উক্তি দেখিতে পাই। আধুনিক বিজ্ঞান উদ্ভিদের জীবত্ব প্রমাণ পক্ষে যে গবেষণার পরিচয় প্রদান করিতেছে, সে প্রমাণ ভারতবর্ষে বহুকাল পূর্ব-হইতেই বিদ্যমান আছে।

গতিহীন জীব যেক্রপ ত্রিবিধ, গতিবিশিষ্ট জীবও সেইক্রপ ত্রিবিধ । যথা ;—(১) অগ্নি-জীব, (২) বায়ুজীব, (৩) প্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব । এই ত্রিবিধ গতিবিশিষ্ট জীবের মধ্যে

• আবার বিভিন্ন বিভাগ আছে । অগ্নিজীব-সমূহ প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ;—স্থূল ও স্থল্ম । ঐ দুই বিভাগই আবার পূর্ণক্ষুট ও অক্ষুট জীব ।

দুই ভাবে অবস্থিত । স্থূল এবং পূর্ণক্ষুট অগ্নিজীব নানাবিধ ; পাথুরে কয়লা, অগ্নি, অগ্নিশিখা, অগ্নিসংযুক্ত তুষ, বিদ্যুৎ, উষ্ণ প্রভৃতি এই বিভাগের অন্তর্গত । স্থল্ম অগ্নিজীবের কোনও প্রকার-ভেদ নাই ; উহা এক ও অভিন্ন । স্থান-কালাদি-ভেদে অগ্নিজীবের যে অবস্থান্তর হয়, তাহা পৃথিবীজীব প্রভৃতির সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন । বায়ুজীবও স্থূল-স্থল্মভেদে দ্বিবিধ । উহার স্থল্মভাব অগ্নিজীবেরই অমূরূপ । স্থূল ও পূর্ণপরিক্ষুট অবস্থায় উহা পঞ্চবিধ বিভাগে বিভক্ত হয় । যথা,—উৎকলিকা (বার্তা-প্রবাহ), মুণ্ডলিকা (ঘূর্ণিবায়ু), হিমশিলা-সংযুক্ত বায়ু-প্রবাহ, সঞ্চর্ভিকা (তূর্ণদ বায়ু প্রভৃতি) । প্রাণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট গতিশীল জীব সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে । যথা,—(১) দ্বীন্দ্রিয় অর্থাৎ যাহাদের দুইটা ইন্দ্রিয় আছে ; (২) ত্রীন্দ্রিয় অর্থাৎ যাহাদের তিনটা ইন্দ্রিয় আছে ; (৩) চতুরিন্দ্রিয় অর্থাৎ যাহাদের চারিটি ইন্দ্রিয় আছে ; (৪) পঞ্চেন্দ্রিয় অর্থাৎ যাহাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে । দ্বীন্দ্রিয় জীব স্থূল-স্থল্ম-ভেদে দ্বিবিধ ; আর তাহারা পূর্ণক্ষুট ও অক্ষুট দ্বিবিধ ভাবে অবস্থিত । কতকগুলি দ্বীন্দ্রিয় জীবের উপবিভাগ নিয়ে উল্লিখিত হইল ; যথা,—কীট, কড়ি, শব্দ, শব্দাক, শব্দক, শুক্তি, জলোকা ইত্যাদি । এই সকল এবং বহু দ্বীন্দ্রিয় জীব পৃথিবীর এক অংশে অবস্থিতি করে । সর্বত্র তাহাদের স্থান নাই । এই দ্বীন্দ্রিয় জীবগণের জীবনকাল অতি উর্দ্ধ সংখ্যায় দ্বাদশ বৎসর এবং অতি নূনকমে এক মুহূর্ত্তেরও অল্প সময় । তাহাদের দেহের বিস্তারিততা বিষয়ে ঐ একই রূপ কাল-পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় । ত্রীন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীবও স্থূল-স্থল্ম-ভেদে দ্বিবিধ । পূর্ণক্ষুট বা অক্ষুটভাবে তাহাদের অবস্থিতি । তাহাদের উপবিভাগ-সমূহ ; যথা,—কুছু অর্থাৎ কীটাপু, পিপীলিকা, ছারগোকা, উই, বৃশ্চিক প্রভৃতি । ত্রীন্দ্রিয় জীব পৃথিবীর স্থান-বিশেষে অবস্থিতি করে । ত্রীন্দ্রিয় জীব উর্দ্ধ সংখ্যায় ৪২ দিন জীবিত থাকে । চতুরিন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবও স্থূল-স্থল্মভেদে দুই ভাগে এবং পূর্ণক্ষুট অক্ষুট দুই ভাবে অবস্থিত । তাহাদের বিভাগ-সমূহ ; যথা,—মক্ষিকা, মশক, পতঙ্গ, বৃশ্চিক প্রভৃতি জাতীয় নানা জীব এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । ইহাদের আয়ুঃকাল মুহূর্ত্ত হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত ।

অতঃপর পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতেছে । পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব চারি ভাগে বিভক্ত । (১) নরকের অধিবাসিগণ, (২) তির্য্যাক্গণ, (৩) মহুয়গণ, (৪)

দেবগণ । নরকের অধিবাসিগণ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সপ্তবিধ পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব । নরকে অবস্থিতি করে । তাহাদের নাম—রক্তাত, শর্করাত, বালুকাত, পদ্মাত, ধূমাত, তমা, তমতমা । এই সাত শ্রেণীর নরকবাসী জীব পৃথিবীর

এক অংশে বসতি করে । ইহাদের জীবন-কাল নূনকমে দশ সহস্র বর্ষ হইতে বহু 'সাগরোপমা' বর্ষ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট যে তির্য্যাক্-জাতীয় জীব, তাহারাও

হুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উহাদের এক জাতীয় জীব ‘সম্মূচ্ছিন্ন’ নামে অভিহিত হয়। তাহারা পারিপার্শ্বিক পদার্থের সংযোগে সমুৎপন্ন ও সংবদ্ধিত হইয়া থাকে। পক্ষেজিয়-বিশিষ্ট অপর শ্রেণীর তির্ধ্যাক্ জীব উদরভ্যন্তরে জন্মগ্রহণ করে। এবিধ তির্ধ্যাক্ জীব তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; (১) জলচর, (২) ভূচর, (৩) খেচর। মৎস্ত, কচ্ছপ, কুড়ীর, মকর, শিশুক প্রভৃতি পঞ্চবিধ জলচর এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। চতুষ্পদ এবং সন্ন্যাস-ভেদে পক্ষেজিয়-বিশিষ্ট ভূচর তির্ধ্যাক্ জীব হুই শ্রেণীতে বিভক্ত। চতুষ্পদ চতুর্বিধ। (১) একক্ষুর বিশিষ্ট অখাদি, (২) দ্বিক্ষুরবিশিষ্ট গবাদি, (৩) বহুক্ষুরবিশিষ্ট গজাদি (৪) নখবিশিষ্ট জন্তু সিংহাদি। সন্ন্যাস দ্বিবিধ। যথা,—(১) যাহারা বাহ্যে ভর দিয়া গতিবিধি করে, যেমন টিক্‌টিক প্রভৃতি; (২) যাহারা বক্ষের উপর ভর দিয়া গতিবিধি করে, যেমন সর্পাদি; পক্ষেজিয়-বিশিষ্ট তির্ধ্যাক্ জাতীয় জীবের মধ্যে আর এক শ্রেণীর যে জীব আছে, তাহারা পক্ষ-বিশিষ্ট। এই পক্ষ বিশিষ্ট তির্ধ্যাক্ জীব আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এক শ্রেণীর পক্ষ পরস্পর সংলগ্ন, যেমন বাহুড় প্রভৃতি। আর এক শ্রেণীর পক্ষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন; যেমন সাধারণ পক্ষী জাতি। আর এক শ্রেণীর পক্ষ বাহ্যের আকৃতি-বিশিষ্ট। চতুর্থ শ্রেণীর পক্ষ-বিস্তার—সেই জীবের আসন মধ্যে পরিগণিত হয়। *

পক্ষেজিয়-বিশিষ্ট গতিশীল জীবের পর্যায়ে মনুষ্য উচ্চতর বলিয়া অভিহিত হয়। মনুষ্য প্রধানতঃ হুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী “সম্মূচ্ছিন্ন” এবং অল্প শ্রেণী জননী-জঠর-সম্মূত। “সম্মূচ্ছিন্ন” শব্দে স্বতঃ-উৎপন্ন ভাব প্রকাশ পায়।

মনুষ্য-পর্যায়। পদার্থবিশেষ হইতে মনুষ্যের উৎপত্তির বিবরণ পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাই। ক্রমবিকাশবাদিগণের এক সম্প্রদায়ের মত এই যে, পারিপার্শ্বিক পদার্থবিশেষের সঞ্চ-সংশ্লেষে মনুষ্যের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। জৈন-শাস্ত্রের “সম্মূচ্ছিন্ন” বিভাগ সেই আভাস প্রদান করে। কোনও কোনও টীকাকার শব্দার্থের আলোচনায় এই মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু অল্প শ্রেণীর টীকাকারগণ ঐ শব্দের অন্তরূপ অর্থও নির্দেশ করেন। তাহারা বলেন যে, যাহাদের মানসিক বৃত্তিসমূহ ক্ষুণ্ণ লাভ করে নাই, শাস্ত্র তাহাদিগকেই “সম্মূচ্ছিন্ন” পর্যায়-ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এ ব্যাখ্যা সমীচীন হইলেও অপরাপর জীবজন্তু বিষয়ে যখন ঐ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন ঐ অর্থের সার্থকতা উপলব্ধি হয় না। যাহা হউক, শেষোক্ত পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ জননী-জঠরোৎপন্ন মনুষ্য সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। উত্তরাধার্যন জৈনশাস্ত্র মতে সেই পর্যায়ের মনুষ্য ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত।

* শেষোক্ত দ্বিবিধ পক্ষবিশিষ্ট তির্ধ্যাক্ জীবের বিশেষ পরিচয় টীকাকারগণ প্রদান করিতে পারেন নাই। উত্তরাধার্যন লিখিত হইবার সময় চতুর্বিধ পক্ষবিশিষ্ট তির্ধ্যাক্ জীব একদেখে বিদ্যমান ছিল, সপ্রমাণ হইলেও টীকা-রচনার সময় তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যাহাদের পক্ষ বাহ্যের আকৃতি. তাহারা ‘সম্মূল’ নামে পরিচিত হইয়াছে। উহারা ‘মানসোত্তর’ দেশে অর্থাৎ মনুষ্যের আবাস-স্থানের বাহিরে অবস্থিতি করে।

প্রথম, বাঁহারা কর্ণভূমিতে বাস করেন। দ্বিতীয়, বাঁহারা অকর্ণ-ভূমিতে বাস করেন। তৃতীয়, বাঁহারা অমুরেখযোগ্য মহাদেশ-সমূহে বাস করেন। এখন, কর্ণভূমি কাঁহাকে বলে, বুঝিতে হইবে। জৈনশাস্ত্রকারগণ নির্দেশ করিয়াছেন—পৃথিবীর যে অংশের মনুষ্যগণ ধর্মকর্মের অগুষ্ঠানে নিরত ব্যাপ্ত থাকেন, সেই অংশের নাম—কর্ণভূমি। তদনুসারে অমুরেখযোগ্যের মধ্যে ভারত, ঐরাবত ও বিদেহ কর্ণভূমি মধ্যে পরিগণিত। আর যে অংশের মনুষ্যগণ ধর্মকর্মের অগুষ্ঠান-পরায়ণ নহেন, সেই অংশ অকর্ণভূমি মধ্যে পরিগণিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাদেশের মধ্যে হিমালয়ের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সপ্তদ্বীপপুঞ্জকে নির্দেশ করা হইয়াছে। সেই সকল স্থানে উপকথা-কথিত অদ্বুত প্রকৃতির জাতিরা বাস করে। যেমন জননীজঠরসমুদ্র মনুষ্য-জীবের, তেমনই “সমুচ্ছিন্ন” পর্যায়ভুক্ত মনুষ্যজীবেরও বিভাগ উপবিভাগ আছে। “সমুচ্ছিন্নগণ” পৃথিবীর কোনও এক অনির্দিষ্ট অংশে বাস করে।

পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট গতিশীল জীবের মধ্যে দেবগণ উচ্চতম পর্যায়ে অবস্থিত। তাঁহারা চারি বিভাগে বিভক্ত। যথা,—(১) ভৌমেরিক, (২) ব্যস্তর, (৩) জ্যোতিক, (৪)

বৈমানিক। ভৌমেরিক অর্থাৎ ভবনবাসী দেবতা—দশবিধ; ব্যস্তর দেব-পর্যায়। অর্থাৎ অরণ্যবাসী দেবতা—অষ্টবিধ; জ্যোতিক—পঞ্চবিধ; বৈমানিক—

ষিবিধ। দশবিধ ভবনবাসী; যথা,—অমর, নাগ, সুরবর্গ, বিদ্যাৎ, অগ্নি, বীপ, উদম্বি, বাত, বণিক এবং কুমার। টীকাকারগণ বলেন,—“কুমার” শব্দ অমর নাগ প্রভৃতি শব্দের সহিত যুক্ত হইবে; অর্থাৎ, ভবনবাসী-দশকের নাম যথাক্রমে অমর-কুমার নাগ-কুমার ইত্যাদি। অষ্টবিধ ‘ব্যস্তর’ দেবগণ; যথা,—পিশাচগণ, ভূতগণ, বকগণ, রাক্ষসগণ, কিরুরগণ, কম্পুকবগণ, মহোরগগণ, গন্ধর্ব্বগণ। জ্যোতিকদেবগণের অবস্থান পঞ্চবিধ; স্বর্বাণ্যলোকসমূহ, চন্দ্রলোকসমূহ, নক্ষত্রলোকসমূহ, অন্তাশ্রু গ্রহলোকসমূহ এবং অসংখ্য তারকালোকসমূহ। বৈমানিক দেবগণ ষিবিধ; (১) বাঁহারা স্বর্গীয় কল্পলোকে জন্মগ্রহণ করেন, (২) বাঁহারা তদুর্দ্ধলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ দুই লোক যথাক্রমে ‘কল্পোপগ’ ও ‘কল্পাতিত’ নামে পরিচিত। কল্পলোকের দ্বাদশ বিভাগে তন্ময়ধের দ্বাদশ দেবতার বসতি আছে। সেই কল্পলোকের দ্বাদশ বিভাগের নাম;—সৌধর্ম্ম, দীপান, সনৎকুমার, নাহেন্দ্র, ব্রহ্মলোক, লম্বক, মহান্তরু, সহস্রার, আনত, প্রাণত, আরণ্য, অচ্যুত। এই সকল কল্পের নামানুসারে উহাদের অধিবাসী দেবগণের নামকরণ হইয়াছে। কল্পাতিত-লোক দুই ভাগে বিভক্ত; গ্রৈবেয়ক ও অমুরতর। গ্রীবা হইতে গ্রৈবেয়ক শব্দের উৎপত্তি। বাঁহারা গ্রীবার উপর অর্থাৎ বিশ্বের উর্দ্ধভাগে বসতি করেন, তাঁহারা ‘গ্রৈবেয়ক’; এবং বাঁহারা নিম্নদেশে বাস করেন, তাঁহারা ‘অমুরতর’। গ্রৈবেয়ক এবং অমুরতর দেবগণ কি ভাবে কোথায় কতকাল অবস্থিতি করেন, প্রহেলিকার ছন্দে ‘উত্তরাধ্যয়ন-ত্ন’ তাহার পরিচয় দিয়াছেন। বাহুল্য-ভরে এখানে আর সে পরিচয় প্রদান করা হইল না। কর্ম্মফলে জীব এক এক স্থান প্রাপ্ত হয়। উত্তরাধ্যয়নে তাহারই আভাস আছে। কর্ম্মফলে যে জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয়, কর্ম্মফলই যে সুখদুঃখের নিরূপ্তা, ঐ অংশে সে কথাও স্পষ্টভাবে

পরিকীৰ্ত্তিত। যে আত্মা ধৰ্ম্মাহুয়গী, পাপ-প্রবৃত্তির বশীভূত নহে, মৃত্যুর পর সেই আত্মাই মুক্তিলাভ করে। আর যে আত্মা ধৰ্ম্মবিশ্বাসহীন, পাপাহুয়ত, তাহাকে জগৎকে পড়িয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

‘কেবল’ জ্ঞানলাভ চরম লক্ষ্য হইলেও সংকল্পের মধ্য দিয়া সে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে। জৈনধৰ্ম্মে তাই পূজা-মন্ত্র প্রভৃতির প্রবর্তনা দেখিতে পাই। জৈন-যতিগণের

জৈনধৰ্ম্মে
পূজা-মন্ত্র।

মধ্যে পঞ্চবিধ তপস্তা প্রচলিত আছে। তাঁহাদিগকে জৈনশাস্ত্রসম্মত

গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিতে হয়। জিনগণের এবং ঋষভদেবের পূজা,

তাঁহারা যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সম্পন্ন করেন। পূজাই জিনগণের

বিবিধ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; ঋগ্‌গায়ত্রী-মূর্তি ও পদ্মায়ত্রী মূর্তি। পদ্মায়ত্রী-মূর্তি উপবিষ্ট অবস্থায় এবং ঋগ্‌গায়ত্রী-মূর্তি দণ্ডায়মান অবস্থায় অবস্থিত থাকেন। হিন্দু-দেবদেবীর পূজার জ্ঞান ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি-দানে পূজা হইয়া থাকে। হোমের প্রথাও প্রচলিত আছে। তবে, নিবেদিত নৈবেদ্যাদি কেহ ভক্ষণ করেন না। তৎসমুদায় নির্দ্বিধা নামে অভিহিত হয়। নির্দ্বিধা গ্রহণে পাপ স্পর্শে—ইহাই জৈনগণের বিশ্বাস। জৈন-যতিগণের পঞ্চবিধ তপস্তা; যথা,—চৈত্যাগরিপাঠ অর্থাৎ দেবমন্দির-সংস্কার, সাধুবন্দনা, সাধুসঙ্গিক তীর্থ-পরিভ্রমণ, মিত্রভাবে অবস্থান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। উহাদের গায়ত্রী মন্ত্র; যথা,—“নমো অরি-হংতাং নমো সিদ্ধাং, নমো আরিয়্যাং, নমো উবজ্জাং, নমো লোএ সৰ্বসাহুং।” পাঁচ বার এই গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করিলে সকল পাপ নাশ হয়, এবং সকল মঙ্গল আনয়ন করে। “এসো পংচনমুকারো, সৰ্বপাবপ্পণাঙ্গো, মংগলাং চ সৰ্ববসিং পঢ়মং হবই মংগলং।” জিনগণের সাধারণ পূজা-পদ্ধতি এইরূপ;—“ও শ্রীবর্দ্ধমানায় নমঃ। ও শ্রীং ঋষভেয় স্বস্তি। ও হ্রীং হং। ও হ্রীং শ্রীহৃদধৰ্ম্মচাৰ্য্যাণ্যাদি গুরুভ্যাঃ নমঃ। ও হ্রীং শ্রীজীনেশ্বরেভ্যাঃ নমঃ।” ইত্যাদি। অঙ্গপূজা, অগ্রপূজা, ভাবপূজা—পূজা প্রধানতঃ তিন প্রকার। অঙ্গপূজা বলিতে—অঙ্গ প্রকালন, জিন প্রতিমাগঠন, চন্দনাদি বিলেপন, পুষ্পাদি আভরণ-ভূষণ প্রভৃতি দেবতা-প্রতিষ্ঠার ভাব বুঝায়। অঙ্গপূজা বলিতে—বাছ, গীত, নৃত্য, নৈবেদ্য, আরতি প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান বুঝায়। ভাবপূজা বলিতে—স্তব, বন্দনা, অর্চনা প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। স্তবের মধ্যে চৈত্যা-স্তব, সিদ্ধস্তব প্রভৃতি ভাবপূজার অন্তর্ভুক্ত। বিঘ্ননাশ, পুণ্যসঞ্চয় ও মুক্তি—পূৰ্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পূজার ত্রিবিধ ফল বলিয়া কথিত হয়। জিনগণের পূজার জল-ব্যবহার সম্বন্ধে একটু অভিনব দৃষ্ট হয়। স্নগন্ধ জল ও লবণ-জল তাঁহারা প্রধানতঃ ব্যবহার করেন। দেবতার স্নানের সময় স্নগন্ধজল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরতির সময় লবণ-জল ব্যবহার প্রসিদ্ধ। আরতির সময় পুষ্পে লবণ-জল প্রক্ষেপ-পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রসহ পুষ্প-প্রদান করা হয়।—

“উবণেউ মংগলং বো জিণাণমুহ লালি জাল সঙ্কলিয়া।

ত্রিচ্ছ পবত্তণ সমএ তিরসবি ব মুকা কুহুমবুট্টী ॥” ১।

* জৈনধৰ্ম্মের জীব ও অজীব তত্ত্ব আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ভারতবর্ষ ভূগিষ্ঠায়, গোণবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল! বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কারে বিজয়-দ্রুম্বুতি বালাইন্তেছেন, সে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার ভারতবর্ষে বহু পূৰ্ব্বে সাধিত হইয়াছিল; জৈনধৰ্ম্মের জীব-অজীব-প্রসঙ্গে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাই।

“উঅহ পড়িভগ্গাপসরং পরাহিনং যুণিবসী করে উণং ।

পড়ইস লোণত্তন লজ্জিঅং চ লোণং হ অবহংসি ॥” ২ ।

প্রথমোক্ত মন্ত্রে ধূপ-প্রক্ষেপ এবং শেষোক্ত মন্ত্রে পুষ্প লবণ-জল প্রক্ষেপ করিতে হয় । এইরূপ অলঙ্কার উন্মোচনের মন্ত্র, নির্মাণ্য-পরিষ্কারের মন্ত্র, স্নানের মন্ত্র, দীপদানের মন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্র আছে । বলা বাহুল্য, সে সকল মন্ত্রই প্রাকৃতভাষায় লিখিত । পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুধর্মের সহিত জৈনধর্মের এতই সাদৃশ্য যে, অনেক সময় জৈন-যতিগণকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মামুসারী সন্ন্যাসী বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে । আচার-অমুষ্ঠানে বা ক্রিয়া-কর্ম উভয়ের পরস্পরের পার্থক্য অনুধাবন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার । তাই, জৈন-যতিগণের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ সাধারণতঃ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । সকল বিষয়েই সাধারণ ভাবে সাদৃশ্য আছে; কেবল কয়েকটি অসাধারণ লক্ষণ,—

“যশসাধারণো যুথমণ্ডলীকরণাদিঃ কেশোল্লঙ্ঘনাদিশ্চ নাসৌ সর্করহুষ্ঠীয়তে ।”

ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের ও জৈনধর্মের সাদৃশ্যের বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়াছি । উপসংহারে আর একবার সে প্রশঙ্গ উত্থাপন করিতেছি । ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের

সাদৃশ্য
অসাদৃশ্য ।

মূল তথ্যামুসন্ধানে আমরা উপলব্ধি করিয়াছি—অহিংসাও ধর্ম, হিংসাও ধর্ম । কিন্তু জৈনগণ একমাত্র অহিংসাকেই ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন । তাঁহাদের অহিংসার গভী এত দূর-প্রসারী যে,

তাঁহারা দৃশ্যমান পদার্থ-মাত্রেরই অহিংসার আশঙ্কায় আশঙ্কিত । বৃক্ষের শাখা-প্রাশাখা-ছেদনে বা পত্র-পুষ্প ছিন্নকরণে তাঁহারা অহিংসার আশঙ্কা করেন । দীপশিখায় কীট-পতঙ্গ দক্ষীভূত হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা নিশাকালে অগ্নি-প্রজ্বালনে পরাজুথ হন । রাত্রিতে জৈন-যতিগণ আহার করেন না ; সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁহাদের আহার সম্পন্ন হয় । তাঁহাদের আশঙ্কা—দীপ-প্রজ্বালনে পাছে প্রাণিহত্যা ঘটে । মধুচক্র হইতে মধুসংগ্রহ জৈনাচার-বিরুদ্ধ ; কেন-না, মধু-সংগ্রহ-কালে মক্ষিকার ডিঙ নষ্ট হওয়া সম্ভবপর । জৈনদর্শনে যে জীবতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, জীবের পর্যায় কিরূপ ; সুতরাং অহিংসার গভী কতদূর ! এ পক্ষে বৌদ্ধগণের অহিংসার নীতি পরাভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করা বাইতে পারে । হিংসার যে সংজ্ঞা জৈনশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহাতে বুঝিতে পারি, যত কিছু অসংকর্ম আছে, সকলই হিংসার অন্তর্ভূত । যথা,—

“আত্মপরিণাম-হিংসন-হেতুত্যাং সর্কমেব হিংসৈতৎ ।

অনুত-বচনাদি কেবলমুদাহৃতং শিষ্যবোধায় ॥

কর্মণা মনসা বাচা সর্কভূতেষু সর্কদা ।

অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসেঘন যোগিভিঃ ॥”

অসত্য, চৌর্য্য প্রভৃতি যে কোনও কার্য্যে অশান্তির সম্ভাবনা আছে, তাহাই হিংসার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । এই সব দেখিয়াও, অনেকেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সহিত জৈনধর্মের সাদৃশ্য-ভাব উপলব্ধি করেন । কেন-না, এই অহিংসা প্রভৃতির অমুষ্ঠান-বিষয়েও জৈনধর্ম যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় না, তাহা বলিতে পারা যায় না । জৈনশাস্ত্রে পঞ্চাঙ্গভ্রাতের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় । সেই পঞ্চাঙ্গভ্রাত,—“অহিংসাসত্যাত্তের ব্রহ্মচর্যা-পরিগ্রহাঃ ।” পাতঞ্জল-

যোগসূত্রে যমনিয়মাদির যে সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়, এই পঞ্চাশতত তাহারই প্রতিধ্বনি নহে কি ? যথা, যোগসূত্রে,—“অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমগ্রহাঃ যমা।” কেবল উহাই নহে। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য অহিংসার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, জৈনগণের অহিংসার ধারণার নিকট তাহা কোনও অংশেই হীন নহে। যথা,—“কর্মণা মনসা বাচা সর্বভূতেষু সর্বদা। অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসত্বেন যোগিতিঃ।” ইহার উপর আর বক্তব্য থাকিতে পারে না। চরিত্রের ঔৎকর্ষ-সাধনে রাগ-দ্বেষ-মোহ বিদূরিত হইবে। তাহার ফলে, সমাগৃদর্শন লাভ হইবে। সমাগৃদর্শনের ফলে তদ্বার্থে শ্রদ্ধা জন্মিলে এবং সমাগৃজ্ঞানের উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, সংশয়-বিপর্যায় দূরে যাইবে; তদ্বার্থের যথার্থ-জ্ঞানোদয়ে মুক্তিলাভ হইবে। সমাগৃচারিত্র্য সমাগৃদর্শন ও সমাগৃজ্ঞান—জৈন “ত্রিরত্ন” নামে অভিহিত হয়। বৌদ্ধদর্শনের সহিত ইহার সাদৃশ্য—বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।* ফলতঃ, যে দিক দিয়া যে ভাবেই আলোচনা করা যাউক না কেন, কর্ম-বন্ধনই যে সকল অনর্থের মূল, আর সেই কর্মবন্ধন ছিন্ন করিবার জগুই যে শাস্ত্রের যত কিছু উপদেশ,—এই সার সত্যের সাম্যতাব ভারতীয় সকল ধর্মেই পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয় প্রভৃতি অষ্টবিধ কর্মের স্বরূপ-তত্ত্ব পূর্বেই আমরা বিবৃত করিয়াছি।† সেই অষ্টবিধ কর্মের দ্বারা ‘কার্মণ শরীর’ গঠিত হইয়া আত্মা জন্মচক্রে বিঘূর্ণিত হয়। সেই কার্মণ-শরীর ধ্বংস করিতে হইলে, কর্মের পথ রোধ করা আবশ্যক। সে পথ রোধ করার একমাত্র উপায়, জৈনশাস্ত্র মতে, “সংবর”। ‘আশ্রব’ দ্বারা বন্ধ ঘটে; ‘সংবর’ আশ্রবের গতি নিরুদ্ধ করে। আশ্রবের দ্বারা নূতন নূতন কর্মের সংযোগ বা আগম ঘটে। সংবর—সে আগমের গতি রোধ করে। কর্মসঞ্চয়ের প্রধান কারণ—কামনা; ‘সংবর’ কামনাকে সঞ্চরণ করে। রাগ দ্বেষ, অহঙ্কার, আসক্তি—কেবলই আত্মাকে বন্ধনের পর নূতন বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছে—তাহাই ‘আশ্রব’; ‘সংবর’—আসক্তির সঞ্চরণ দ্বারা সে বন্ধন শিথিল করার প্রয়াস পাইতেছে। আসক্তির শৈথিল্য-করণই অনাসক্ত বা নিকামতাব। সুতরাং, মূলে নিকাম কর্মের সেই একই সিদ্ধান্ত আসিয়া দাঁড়াইতেছে। নিকাম কর্মেই কর্ম-বন্ধন শিথিল করে, নিকাম কর্মেই মোক্ষের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ‘আশ্রব’ ও ‘সংবর’ শব্দদ্বয়ে জৈনদর্শন সেই নিকাম কর্মেরই প্রাধান্ত খ্যাপন করিতেছে। ফলতঃ, মূল লক্ষ্য সকলেরই অভিন্ন; কেবল গন্তব্য-পথ বিভিন্ন মাত্র। সেই বাণীই সত্য—সার সত্য,—

“যং শৈবাঃ সমুশাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো,

বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কৰ্ত্তেতি নৈয়ারিকাঃ।

অহিংসিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কৰ্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,

সোহং বো বিদধাতু বাঙ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ।”

* ‘পৃথিবীর ইতিহাস’ পঞ্চম খণ্ডে বৌদ্ধদর্শন প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য। জৈনদর্শন মতে—সত্তা, বন্ধ, উদয়—কর্মের এই ত্রিবিধ বিভাগ। অদৃষ্ট বা পূর্বজন্মার্জিত কর্ম ‘সত্তা’ নামে অভিহিত হয়। সেই কর্মের ফলভোগ—উদয়। নূতন কর্মের সংযোগই—বন্ধ। বেদান্ত-দর্শনে কর্মের যে ত্রিবিধ বিভাগ আছে, ইহা তাহারই অনুরূপ। বেদান্ত মতে কর্মের সেই বিভাগত্রয়—সাক্ত, ক্রিয়মাণ, আরম্ভ। বেদান্ত-মতে ও সাংখ্য-মতে যে সূক্ষ্মশরীর পরিলক্ষিত, জৈনদর্শনোক্ত ‘কার্মণ শরীর’ তাহারই নামান্তর মাত্র।

† এই খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় অষ্টবিধ কর্মের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

—: : :—

মহাবীর স্বামী ।

[তীর্থঙ্করগণের মর্ত্যে অবতরণ ;—মহাবীরের অলৌকিক জন্ম-কাহিনী ;—মহাবীরের জ্ঞান অবস্থা ;—মহাবীরের জন্মগ্রহণ ;—জন্মোৎসব ;—জাতকৰ্ম্ম-নামকরণাদি ;—পিতামাতা আত্মীয়-বন্ধন প্রভৃতি ;—মহাবীরের সংসারবাস ;—মহাবীরের গুণ-গ্রাম ;—ভাহার সম্মান-গ্রহণ ;—কঠোর সংযম-সাধনা ;—প্রতিবন্ধক হ্র ;—দেহ ত্যাগ ;—জৈন-বৌদ্ধ অগ্রজ-অনুজ ;—দুই ধর্মে নাদৃশ্য-অসাদৃশ্য]

জৈনধর্মের এবং তাহার প্রভাবের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, জৈনধর্ম-সৌখর্য্য ভিত্তিস্তম্ভ-সমূহের বিষয় অনুধাবন করার আবশ্যক হয়। সেই জিনগণ, সেই অর্হৎগণ,

তীর্থঙ্করের

মর্ত্যে

অবতরণ।

সেই স্ববিয়গণ, সেই বতিগণ—ভাহারাই জৈনধর্মের প্রাণস্থানীয়। জৈন-

ধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইলে, ভাহাদের মহীয়সী মহিমার বিষয়

সর্বপ্রায়ে স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয়। জৈনধর্মের প্রবর্তক জিনগণ কোন্

অনন্ত অতীতের ক্রোড়ে আবিস্কৃত হইয়া জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন,

কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে ? • চতুর্কিংশতি জিনের বিদ্যমান-কাল-বিবরণ ধারণার

মাহুষের গবেষণা পর্য্যাপ্ত হয়। সুতরাং ধ্যান-ধারণার অতীত সে অতি-দূরের প্রসঙ্গ

পরিহার করিয়া, প্রথমে আমরা শেষ তীর্থঙ্কর সঙ্কে অমরকিছু আলোচনা করিবার

প্রয়াস পাইতেছি মাত্র। শেষ তীর্থঙ্কর—চতুর্কিংশতিতম তীর্থঙ্কর বা জিন—মহাবীর।

তিনি বর্জমান, মহাবীর স্বামী, ঐশ্বর্য্যপুত্র, জাতপুত্র প্রভৃতি নামে অভিহিত হন।

যেমন অস্ত্রাভ্য তীর্থঙ্করগণের, তেমনই মহাবীর স্বামীর আবির্ভাব ও তিরোভাব সঙ্কে

নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত আছে। মহাবীর স্বামীর জীবনচরিত-সংক্রান্ত প্রধান

মহাবীরের

অলৌকিক

জন্মকাহিনী।

গ্রন্থ—কল্পসূত্র ও সূত্রকুতাঙ্গ। মহাবীর স্বামীর তিরোভাবের অব্যবহিত

পরবর্তিকালে ভজবাহু কল্পসূত্র সঙ্কলন করেন। সূত্রকুতাঙ্গের বহু সূত্র

মহাবীর স্বামীর মুখকমলনিঃসৃত বলিরাই প্রচারিত আছে। সুতরাং

মহাবীর স্বামীর জীবনচরিত-বিষয়ে ঐ দুই গ্রন্থকেই প্রাচীন ও প্রাধান্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার

* জৈনগণের আদি-তীর্থঙ্করের নাম—ঋষভদেব। ঈশমঙ্গাগবতে তিনি ভগবানের অবতার বলিয়া পরিচীতিত। আর্যভট্টের প্রপৌত্র নাতি। ঋষভ নামে ভাহার পুত্ররূপে ভগবান জন্মগ্রহণ করেন। ঈশমঙ্গাগবত, পঞ্চম স্কন্ধ, ৬৪ অধ্যায় প্রভৃতিতে এই ঋষভ দেবের বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। যজুর্বেদে ঋষভ দেবের পুত্রার বিষয় লিখিত আছে ; “ও নমঃ ঋহভো ঋষভঃ ।” বলতঃ হিন্দুর যিনি অবতার মধ্যে পরিগণিত, তিনিই জৈনধর্মের আদিভূত। কত কাল পূর্বে ভগবান যে ঋষভদেব-রূপে আবিস্কৃত হইরাছিলেন, তাহা কল্পনায়ও গণনা করা যায় না।

করিতে হয়। কল্পহুত্রে ও হুত্ৰকৃত্তালে তাঁহার জীবন-চরিত সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, উভয়ের ভাব-ভাব প্রায়ই অভিন্ন। সুতরাং ঐ বিষয়ে ঐ দুইএর যে কোনও একের অনুসরণেই অতীষ্ট সিদ্ধ হয়। আমরা কল্পহুত্ৰের অনুসরণেই মহাবীর স্বামীর জীবন-চরিত প্রকটন করিবার প্রয়াস পাইতেছি। কল্পহুত্ৰের প্রথম হুত্রে আভাষ পাই, মহাবীর স্বামীর জীবন-নাটক অঙ্ক-ঘটকে বিভক্ত। তাহার অঙ্ক-পঞ্চকে মর্ত্য-লীলা; আর বর্ষ অঙ্কে নির্ঝাঁপ-লাভ। হুত্ৰের বজ্র-বন্ধনে তদ্বিবরণ এইরূপ পরিদৃষ্ট হয়;—

“তেণং কালেনং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে পংচহথুত্তরে হুখা,
তংজহা, হথুত্তরাহিং চুএ—চইত্তা গত্তং বকংতে? হথুত্তরাহিং গত্তাও
গত্তং সাহরিএ হথুত্তরাহিং জাএ হথুত্তরাহিং মুংডে ভবিত্তা অগারাও অণগারিঅং
পকইএ পডিপুন্ন কেবলবরনাণদংশণে সমুপ্পন্নে সাইণা পরিণিকুএ ভয়বং।” *

মহাবীর স্বামীর জীবনের পাঁচটা প্রধান মুহূর্তের বিষয় ঐ হুত্রে পরিবর্ণিত। সেই পাঁচ প্রধান মুহূর্তের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার জীবনের পাঁচটা প্রধান অবস্থার সহিত গ্রহ-নক্ষত্রাদির এক অপূর্ণ অভিন্ন সমাবেশ ঘটিয়াছিল। সংসারের এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যখনই তিনি অগ্রসর হন, গ্রহ-নক্ষত্রের তখনই সেই অপূর্ণ সমাবেশ সজ্জাটিত হয়। চন্দ্রের সহিত উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ—তাঁহার জীবনাক-পরিবর্তনের এক এক বিশিষ্ট লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। তিনি মর্ত্যে অবতরণ করিলেন, মাতৃ-গর্ভে (দেবানন্দার গর্ভে) জন্মগ্রহণ করিলেন—সেই উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণকালে। তিনি গর্ভ (দেবানন্দার গর্ভ) হইতে গর্ভাস্তরে (ত্রিশলার গর্ভে) সঞ্চালিত হইলেন—সেই উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে; তাঁহার জন্ম হইল—সেই উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে; তিনি মুণ্ডিত-মস্তকে গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন—সেই উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে; তাঁহার সেই অনন্ত শ্রেষ্ঠ অবাধ পূর্ণ ‘কেবল’ জ্ঞান লাভ হইল—সেই উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে। কেবল, তাঁহার যে চরম মুক্তি, মর্ত্যধাম পরিত্যাগ—সে কেবল স্বাতী-নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে। এবাধ অবস্থা-ঘটকের মধ্য দিয়া মহাবীর স্বামীর মর্ত্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। অলৌকিক জীবনের আদি-অন্ত-মধ্য সকলই এইরূপ অলৌকিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ। তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন—ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভে; আর, জন্ম অবস্থার গর্ভ হইতে গর্ভাস্তরে—ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে কজিয়ারী ত্রিশলার গর্ভে—সঞ্চালিত হইলেন। এ ব্যাপার মনুষ্য-জীবনে ইহলোকে পরিদৃষ্ট হয় না। মহাবীর অলৌকিক অমাহুযিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন; সুতরাং তাঁহাতেই এ অলৌকিক ব্যাপার সম্ভবপর বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই, এই মানুষেরই একের কার্যকলাপ অন্তের নিকট অলৌকিক বলিয়া প্রতীপন্ন হয়; সুতরাং মানুষের অতীত বিনি, তাঁহাতে যে অলৌকিকত্ব দেখিব, তাহা

* ‘কল্পহুত্ৰের’ পাঁচটা ‘বাচনে’ (পাঠে) মহাবীর স্বামীর জীবন-চরিত বর্ণিত আছে। তাহার এই প্রথম হুত্ৰটাই প্রথম ‘বাচন’। ‘বজ্রাঙ্ক বাচনে’ হুত্ৰ-সংখ্যা বিভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়; যথা,—ষিতিয়ে ২১, তৃতীয়ে ১৬, চতুর্থে ২০, পঞ্চমে ৬২।

আর আশ্চর্য্য কি ? বাহা হটক, প্রথম স্ত্রে তাঁহার জীবনের যে আভাষ প্রদত্ত হইল, পরবর্তী স্ত্র-সমূহে তাহারই বিশ্লেষণ-বিস্তৃতি পরিদৃষ্ট হয় । তিনি কি অবস্থা হইতে কোন্ সময়ে কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করেন, দ্বিতীয় স্ত্রে তাহার উল্লেখ দেখি । সে স্ত্রজটী এই ;—

“তেণং কালেনং তেণং সমএণং সমণে ভগবং মহাবীরে জে সে গিম্হাণং চউথে মাসে অট্টমে গক্খে আসাঢ়সুজ্জে তস্পণং আসাঢ়সুজ্জস্স ছট্টিপক্খেনং মহাবিজয়-পুপ্পুত্তরপবরপুংডরীয়াও মহাবিমাণাও বীসংসাগরোবমট্টিইয়াও আউক্খএণং ভব-ক্খএণং টিইক্খএণং অণংতরং চরং চইত্তা ইহেব জংবুদ্ধীবে দীবে ভায়হে বাসে দাহিণ্ডচত্তরহে ইমীসে ওসঙ্গিণীএ সুসমস্সমাএ সমাএ বিইকংতাএ সুসমাএ সমাএ বিইকংতাএ সুসমহ্সমাএ সমাএ বিইকংতাএ হুসমস্সমাএ সমাএ বহবিইকংতাএ—সাগরোবমকোডা-কোডীয়ে বায়ালীসবাসসহস্সেহিং উণিআএ পংচহত্তরিবাসেহিং অক্কনবমেহি য় মাসেহিং সেসেহিং ইকবীসাএ তিখররেহিং ইক্খাগকুলসমুপ্পন্নহিং কাসবত্তেহিং, দোহি য় হরিবংসকুলসমুপ্পন্নহিং গোঅমসত্তেহিং, তেবীসাএ তিখররেহিং বিইকংতেহিং, সমণে ভগবং মহাবীরে চরমতিখররে পুব্বতিখররনিদিটে, মাহগকুংডগ্গামে নয়রে উসভদত্তস্স মাহগস্স কোডালসত্তস্স ভারিআএ দেবাণংদাএ মাহীএ জালংধরসত্তস্সএ পুব্বরভাবরত্তকালসময়ংসি ইথুত্তরাহিং নক্খত্তেণং জোগমুবাগএণং আহারবকংতীএ ভববকংতীএ সন্নীরবকংতীএ কুচ্ছিংসি গত্তত্তাএ বকংতে ।”

মৰ্ম্মার্থ,—‘ভগবান মহাবীর গ্রীষ্মের চতুর্থ মাসে অষ্টম পক্ষে অৰ্থাৎ আষাঢ় মাসের বর্ষ দিবসে গুরুপক্ষে সৰ্ব্ববিজয়ী সৰ্ব্ব-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পুষ্পোত্তর নামা মহাবিমান হইতে অবতরণ করেন । শ্রেষ্ঠ সামগ্রীর মধ্যে যেমন পদ্ম, স্বৰ্ণলোকের মধ্যে সেইরূপ পুষ্পোত্তর-বিমান । পুণ্ডরীকসদৃশ সেই দেবলোকে, নির্দিষ্ট বিংশ সাগরোপম কাল অবস্থিতি করিয়া, এই জম্বুবীণে ভারতক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হইলেন । তখন, বর্তমান অবসর্পিণী-কালের অন্তর্গত সুসমস্সমা, সুসমা এবং সুসমা-দুঃসমা কালত্রয় অতীত হইয়া দুঃসমা-সুসমা কালের অধিকাংশ অতীত হইয়াছিল । তখন, শেষোক্ত কালংশের মাত্র বাহান্ত বৎসর সাড়ে আট মাস অবশিষ্ট ছিল । তাঁহার পূর্বে ইক্ষাকু-বংশের কাশ্যপ-গোত্র-সম্ভূত একবিংশতি তীর্থঙ্কর এবং হরিবংশীয় গৌতম-গোত্রজ দুইজন তীর্থঙ্কর আবির্ভূত হইয়াছিলেন । সেই সময়ে শেষ তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর জালঙ্কার্য্য গোত্রজা দেবানন্দার গর্ভে জন্মের আকার পরিগ্রহ করেন । দেবানন্দা কোডাল-গোত্রজা ; তিনি ব্রাহ্মণ খব্ভিদত্তের সহধর্ম্মিণী ছিলেন । কুন্দগ্রাম নামক নগরে ব্রাহ্মণ-পল্লীতে তাঁহাদের বসতি ছিল । দেবলোকে অবস্থিতির নির্দিষ্ট কাল অতীত হইলে, চন্দ্রের সহিত উত্তরকল্কনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে মধ্য রাত্রিতে ভগবান মহাবীর দেবানন্দার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন ।’ দ্বিতীয় স্ত্রের এই মৰ্ম্মার্থের অনুসরণে মহাবীর স্বামীর জন্মকাল নির্দিষ্ট হয় । পুরণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যেরূপ যুগবিভাগ দেখিতে পাই, সুসম-সুসমা প্রভৃতি সেইরূপ এক একটা যুগবিশেষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । যুগ, চতুর্যুগ, কল্প প্রভৃতি যে কাল-বিভাগ হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাই, এই কালবিভাগে তাহারই অনুসরণের ভাব মনে আসে । চতুর্যুগ যেমন সত্য-ত্রৈতা-চাপর-কলি চারিভাগে বিভক্ত,

অবসর্গিণী-কাল সেইরূপ স্তমস্তমসমা, স্তমসমা, স্তমসহঃসমা, হঃসমস্তমসমা। এই চারিভাগে বিভক্ত। বৈবস্বত মন্বন্তরের সত্য যুগে তাপস অতীত হইয়া এখন যেমন কলির নির্দিষ্ট আয়ুঃকাল চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বর্ষের মধ্যে পাঁচ সহস্রাধিক বর্ষ অতীত হইয়াছে এবং কলি পূর্ণ হইতে অনধিক চারি লক্ষ আটশ হাজার বৎসর অবশিষ্ট আছে, এতদ্ব্যতীত সেইরূপ একটা ভাব ব্যক্ত হইতেছে। জৈনগণের একটা কাল-পরিমাণের সংজ্ঞা—‘সাগরোপম’; স্তমস্তমসমা কালে চারি ‘কোড়া কোড়ী’ সাগরোপম আছে। স্তমসমাকালে তিন ‘কোড়া কোড়ী’ সাগরোপম আছে। স্তমসহঃসমাকালে দুই ‘কোড়া কোড়ী’ সাগরোপম আছে। মহাবীরের জন্মগ্রহণে পূর্বোক্ত স্থানে বলা হইয়াছে যে, তখন হঃসমস্তমসমাকালের এক ‘কোড়া কোড়ী’ সাগরোপমের বিয়াল্লিশ হাজার বৎসর কম ছিল। এক কোড়া কোড়ীতে কোটি কোটি বৎসর (অর্থাৎ ১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ বৎসর) নির্দিষ্ট হয়। তাহারই ৪২ হাজার বৎসর কম হঃসমস্তমসমা কালাংশের পরিমাণ। কিন্তু যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন হঃসমস্তমসমা কালাংশ শেষ হইতে মাত্র ৭২ বৎসর সাড়ে আট মাস অবশিষ্ট ছিল। যাহা হউক, ঐরূপ কাল-পরিমাণ গণনা করিয়া পণ্ডিতগণ মহাবীর স্বামীর জন্মকাল সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অষ্ট হইতে ২৪৪৫ বর্ষ পূর্বে ভগবান মহাবীর মর্ত্যলোকে প্রকট হইয়াছিলেন, এবং বারান্তর বৎসর বয়সে তিনি মহানির্বাণ লাভ করেন। *

ভগবান মহাবীর যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহাতে ত্রিবিধ জ্ঞান বিদ্যমান ছিল। সেই তিন জ্ঞান—মতি, ঋতি, অবধি। তিনি জানিয়াছিলেন,—তাঁহাকে অবতরণ করিতে হইবে; তিনি জানিয়াছিলেন,—তিনি অবতরণ করিয়াছেন; তিনি জানিয়াছিলেন না,—কখন তিনি অবতরণ করিলেন। মহাযোগী মাতৃগর্ভে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। শত্রুদেবের আদেশে হরিণগমেধীর কোশলে তিনি এতই ক্ষিপ্ৰগতিতে গর্ভান্তরে সঞ্চালিত হন যে, সে সময় তিনি তাহা জানিতেই পারেন নাই।

মহাবীরের
জন্ম অবস্থা।

* মূল কল্পতরুর একখানি হিঙ্গি অনুবাদ শ্রীমান্ মণিক মুনিজী কর্তৃক সম্পন্ন হইয়া আজমীর সহর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থে হিঙ্গিভাষায় ঐ তরুর যে মর্দানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল। তাহা পাঠে বিষয়টা স্পষ্টতর হইবে;—“আজ যে ২৪৪২ বর্ষ পহলে মহাবীর প্রভু কা নির্বাণ হবা উনকে ৭২ বর্ষ পহিলে কে সময় সে শ্রীম (গম্বী) কতু কে চোখে মাস বা আটবে পক্ষ কে ছটে দিন অর্থাৎ আষাঢ় স্থি ৬ কে রোজ শ্রীম্ন বীর প্রভু কা জীব মহা বিজয় পুষ্পোত্তর পুণ্ডরিক নাম কে বড়ে বিমান সে বীমসাগরোপম কী স্থিত পুরী করকে অর্থাৎ দেবভব পুরী করকে সীথে দেবলোক সে ইস জম্বুদ্বীপ কে ভরতক্ষেত্র কে দক্ষিণ ভাগ মেঃ ইস বর্তমান অবসর্গিণী কাল কে (১ হুখন্ হুখন্ ২ হুখন্ ৩ হুখন্ হুখন্ ৪ হুখন্ হুখন্ ইস চার আরোঃ কে বীত জানে মেঃ কুছ শিচোত্তর বর্ষ সাড়ে আট মাস বাকী রহে ভব [চার আরোঃ কা সময় প্রমাণঃ ১ চার কোড়া কোড়ী সাগরোপম কা, ২ তিন কোড়া কোড়ী সাগরোপম কা, ৩ দো কোড়া কোড়ী সাগরোপম কা, ৪ এক-কোড়া কোড়ী সাগরোপম মেঃ বয়ালীস হাজার বর্ষ কম কা]) চোখে আরে কে অংত মেঃ মাতা কে উদর মেঃ আরে, উনকে পহলে ২১ তীর্থকরোনে ইক্ষবাকুল উর কাশ্চপ গোত্র মেঃ উর ২ তীর্থকরোনে হরিবংশ কুল উর গোতম গোত্র মেঃ জন্ম লিরা, ইন ২০ তীর্থকরোঃ নে কেবলজান বারা পহলে হী কথা ষা কি (৬৪) চৌবীসমেঃ তীর্থকর শ্রীমহাবীর প্রভু ব্রাহ্মণ কুন্ড নম্র মেঃ কোডাল গোত্র কে ব্রাহ্মণ ঋষভদত্ত কী জালংঘর গোত্র কী ব্রাহ্মণী দেবানন্দা নানী শ্রী কে কুখ মেঃ মথারাত কে সময় উত্তরা কান্তনী নকত্র মেঃ চন্দ্র যোগ মেঃ দেবতা কে শরীর কোঃ ছোড়কর মধুমা সম্বদী আহার উর ভব গ্রহণ কর (মাতা কে উদর মেঃ) আবেখে উদী মুজব মহাবীর স্বামী কা জীব মাতা কে উদর মেঃ আদা।” তিস বর্ষ পূর্বে ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। হুত্তরাঃ এখন ২৪৪৫ বর্ষ অতীত।

তাই তিনি তাঁহার অবতরণের ও অবস্থানের বিষয় মাত্র জ্ঞাত ছিলেন ; কিন্তু গর্ত্তান্তরে সঞ্চালিত হওয়ার সময়টা তাঁহার অপরজ্ঞাত ছিল । বাহাইউক, যে রাত্রিতে, যে সময়ে ভগবান মহাবীর জালন্ধরায়ণ পোক্ত্রা দেবানন্দার গর্ভে জন্মরূপে আবির্ভূত হইলেন, ব্রাহ্মণী দেবানন্দা তখন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া ছিলেন ; অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন । স্বপ্নে তিনি চতুর্দশবিধ মঙ্গল-লক্ষণ দেখিতে পান । সে স্বপ্ন—সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন, চাক্চিক্যময়, শুভসূচক, শান্তিপ্রদ, মঙ্গলিক সৌভাগ্যজ্ঞাপক । দেবানন্দা দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে গজ, ঘৃষত, সিংহ, অভিষেক (লক্ষ্মীদেবীর), মাণ্য, চক্র, স্বর্ঘা, ধ্বজা, কলস, পদ্মসরোবর, ক্ষীরসাগর, বিমানভবন, রত্নসম্ভার, মিধুম অগ্নিশিখা । * দেবানন্দা যখন স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না । বর্ষার বারিধারায় কদম্বপুষ্প যেমন প্রফুল্ল-ঐ ধারণ করে, দেবানন্দার হৃদয় সেইরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইল । তিনি পুলক-রোমাঞ্চ প্রাণে পালক হইতে গাত্রোথান করিলেন । নাতি-ক্রান্ত নাতি-কম্পিত ময়ালগমনে, ক্লিষ্টপ্রতিভাতে অথচ সন্তর্পণে, পতি সুব্রাহ্মণ ঋষভদত্ত-সমীপে উপনীত হইয়া তিনি আনন্দের বার্তা জ্ঞাপন করিলেন । প্রশান্ত স্থিরভাবে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া যুক্তকরে প্রণতিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক কহিলেন,—“হে স্বামিন্ ! হে দেবতা ! আজ আমি পালকে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার সময়, অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগ্রিত অবস্থায়, বড় শুভসূচক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি । স্বপ্নে গজ ঘৃষত সিংহ প্রভৃতি যে চতুর্দশ মঙ্গলিক চিহ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহাতে কি শুভফল লাভ হইবে, আমার তাহার স্বরূপ-তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়া নিশ্চিত করুন ।” সহধর্ম্মিণী দেবানন্দার স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঋষভদত্ত অমুরূপ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন । স্বপ্ন-বৃত্তান্তের বিষয় অনুধ্যান-পূর্ব্বক দেবানন্দাকে সোধোন করিয়া কহিলেন,—“প্রিয়তমে ! তুমি দেবগণেরও প্রিয় । তাই তুমি অতি উত্তম কল্যাণকর স্বপ্ন দেখিয়াছ । তুমি যে সৌন্দর্য্যময় আনন্দময় মঙ্গলময় সৌভাগ্যসূচক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছ, তাহার ফলে, স্বাস্থ্য, আনন্দ, দীর্ঘজীবন, শান্তি ও সৌভাগ্য আনয়ন করিবে । হে দেবপ্রিয়ে ! তোমার ঐ স্বপ্নের ফলে, আমরা সর্ব্বকার্য্যে সাফল্য-লাভ করিব,—সুখের এবং আনন্দের অধিকারী হইব । প্রিয়ে ! ঐ স্বপ্নের ফলে শীঘ্রই আমরা এক সর্ব্বসুন্দর-ক্রান্ত পুত্র-সন্তান লাভ করিব । নয় মাসের পর সপ্তার্দ্ধ দিবস অতীত হইলে, তোমার গর্ভে সেই সুকুমার সুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিবে । তাহার কোমল হস্তপদে, পূর্ণপঙ্কেত্র-বিশিষ্ট পূর্ণায়তন দেহে, সদাগুণের ও সৌভাগ্যের লক্ষণসমূহ বিজ্ঞমান থাকিবে । সে শিশুর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত এবং তাহার দৈর্ঘ্য-বিস্তার-পরিমাণ পূর্ণতাসম্পন্ন হইবে । সে শিশু শশধরের ত্রায় সুন্দর কাস্তি-বিশিষ্ট থাকিবে । আর, বালা অতিক্রম করিয়াই বৃদ্ধিবৃদ্ধির পরিপক্বতার সঙ্গে সঙ্গে সে শিশু চতুর্কোঁদে পারদর্শী হইবে । অনায়াসেই সে ইতিহাস অধিগত করিবে । অনায়াসেই অঙ্গ উপাঙ্গ ও রসার-সহ নিখটু তাহার আয়ত্ত হইবে ।

* প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের জননী প্রথম স্বপ্নে বৃষ দর্শন করিয়াছিলেন । অন্তিম তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর মাতা প্রথম স্বপ্নে সিংহ-দর্শন করেন । যে যে তীর্থঙ্কর স্বপ্ন হইতে অবতরণ করেন তাহাদের মাতৃদেবীগণ ষাদশ-স্বপ্নে বিমান দর্শন করিয়াছিলেন ; আর যে যে তীর্থঙ্করগণ নরক হইতে আগমন করেন, তাহাদের জননীগণ ভগ্ন দর্শন করেন ।

বড় অঙ্গে, বৃষ্টি প্রভিচ্ছায়—সাংখ্যাদি দর্শনে এবং গণিত-বিজ্ঞানে, শ্রম-বিজ্ঞানে, শব্দ-বিজ্ঞানে ব্যাকরণে, ছন্দে ও জ্যোতিষে, সর্ববিধ ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে, সহজেই সে পারদর্শিতা লাভ করিবে। প্রিয়ে! তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, তাহা বড়ই শুভফলপ্রদ।” পরীকে এইরূপে স্বপ্নফল-বৃত্তান্ত অবগত করাইলে, পতির মুখে ভাবী পুত্রের শুভ লক্ষণের বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে, সতী আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন; পতির চরণে পুনঃপুনঃ প্রণতি জানাইয়া কহিতে লাগিলেন,—“হে দেব! আপনার বাক্যই সফল হউক।”

ভাবী পুত্রের্ত্বের আশায় ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী যখন আনন্দ-বিহ্বল, সহসা শক্রদেবের আসন কম্পিত হইল। শক্র—দেবগণের অধিপতি, বজ্রধর, মহাস্রাক্ষ, দৈত্যাত্মসকারী।

সহাবীরের
জন্মগ্রহণ।

তাহার ঐশ্বর্য্য-বিক্রমের পরিসীমা নাই। তিনি যখন জানিতে পারি-
লেন,—ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর গৃহে তীর্থঙ্কর জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তখন আর

তাহার ক্রোধের অবধি রহিল না। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—“এরূপ ঘটনা কখনই ঘটতে দেওয়া হইবে না।” তাহার স্মৃতিপটে জাগরুক হইল—“অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ, কোনও কালে এ পর্য্যন্ত কখনও কোনও অর্হৎ, চক্রবর্তী, ষালদেব বা বাসুদেব কোনও নীচ বংশে, পতিত-বংশে, দরিদ্র-বংশে, ভিক্ষুকের বংশে, বা ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।” তাহার মনে পড়িল,—“পূর্ববর্তী ত্রয়োবিংশতি তীর্থঙ্কর ইক্ষ্বাকুবংশে ও হরিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ রীতানুসারে কোনও তীর্থঙ্কর কখনই ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন না।” অতএব, তিনি স্থিরসঙ্কল্প করিলেন,—‘ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে ভগবান্ মহাবীরকে গর্ভাস্তরে সঞ্চালিত করিতে হইবে।’ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির হইল—‘কাত্তপগোত্রজ ক্ষত্রিয় সিদ্ধার্থের পত্নী বাশিষ্ঠগোত্রজা ক্ষত্রিয়ানী ত্রিশলার গর্ভে জ্ঞপাবস্থায় তীর্থঙ্করকে সঞ্চালিত করিতে হইবে।’ অতঃপর কুন্দগ্রামের ব্রাহ্মণ-পল্লীস্থ জালন্ধরায়ণ-গোত্রজা ব্রাহ্মণী দেবানন্দার গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয়পল্লীস্থ বাশিষ্ঠগোত্রজা ত্রিশলার গর্ভে জ্ঞপ-সঞ্চালনের জন্য শক্রদেব বন্ধপরিষর হইলেন। শক্রদেবের আদেশে তাহার সেনাপতি (হরিণেগমেঘী) কর্ত্ত্বক সেই জ্ঞপ-সঞ্চালন-কার্য্য সম্পাদিত হইল। এইরূপে, আশ্বিন মাসে, কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে, চন্দ্রের সহিত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে, ত্রিশলার গর্ভে ভগবান্ মহাবীর জ্ঞপ-অবস্থায় সঞ্চালিত হইলেন। নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় দেবানন্দা যে সকল শুভচিহ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, ভগবান গর্ভে আসিয়া অবস্থিতি করিবা মাত্র, ত্রিশলাও সেইরূপ স্বপ্নপরাপ্পরা দেখিতে লাগিলেন। ত্রিশলা স্বপ্নে দেখিলেন,—এক সুন্দর সুবৃহৎ কুঞ্জর—সর্বমূলক্ষণ-সমব্রিত, বৃহৎ চতুর্দন্তবিশিষ্ট; তাহার খেতবর্ণ—যেন শূভ্র-মেঘের ছায়া, যেন মুক্তান্তপূর্ণের ছায়া, যেন দুগ্ধসমুদ্রের ছায়া, যেন চন্দ্ররশ্মির ছায়া, যেন নিব্বরের সলিলোল্লেখের ন্যায়, যেন রৌপ্যের পর্কণ্ডের ছায়া শুভ্র। ত্রিশলা দেখিলেন—সেই গজবরের মস্তক হইতে যে মদ নির্গত হইতেছে, তাহার সুগন্ধে মধুলোভী মক্ষিকাগণ আকৃষ্ট। তিনি দেখিলেন—ইন্দ্রের ঐরাবতের ছায়া সেই গজবরের বিশাল দেহ। শুনিলেন—মেঘমদ্রবৎ তাহার গম্ভীর স্বর। সুপ্নের দ্বিতীয় দৃশ্য ত্রিশলার নয়ন-পথে নিপতিত হইল—মূলক্ষণাক্রান্ত গৃহপালিত

ব্রত । কমলদলের ঞ্চাৰ তাহাৰ শুভ্র-বৰ্ণে—চতুৰ্দ্দিকে যেন শুভ্র আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত । ত্রিশলা স্বপ্নে যে চতুৰ্দ্দশ শুভলক্ষণ দৰ্শন কৰিলেন, সকলই সৌন্দৰ্য্যৰ আধাৰ । স্বপ্ন-দৰ্শনেৰ পৰ, ত্রিশলা পতিৰ নিকটে আসিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত জ্ঞাখন কৰিলেন । স্বপ্ন-সম্বন্ধে নানাকৰণ আলোচনা চলিল । দৈবজ্ঞগণ সকলেই একবাক্যে স্বপ্নেৰ শুভ-ফল প্রকাশ কৰিলেন । অবশেষে চৈত্ৰমাসেৰ চতুৰ্দ্দশ দিবসে মধ্যৰাত্ৰে, চন্দ্ৰেৰ সহিত উত্তৰ-কজ্জনী নক্ষত্ৰেৰ সংক্ৰ-মণ-কালে, ভগবান মহাবীর সংসাৰে আবিভূত হইলেন ।

নবকুমারেৰ জন্ম-উপলক্ষে নগরী আনন্দ-উৎসবে নিমগ্ন হইল । সিদ্ধাৰ্থেৰ প্ৰাসাদে সেদিন—স্বৰ্ণ, রৌপ্য, হীৰা, বজ্জ, অলঙ্কাৰ, পত্ৰ, পুষ্প, ফল, বীজ, মালা, সুগন্ধ, চন্দন ও ধনরত্ন বৃষ্টিৰ ঞ্চাৰ বৰ্ষিত হইতে লাগিল । তীৰ্থঙ্কৰেৰ জন্মদিন জন্মোৎসব । উপলক্ষে ভবানীপতি, ব্যস্ত্ৰ, জ্যোতিষ্ক এবং বৈমানিক দেবগণ দেব-লোকে মহোৎসবেৰ আয়োজন কৰিলেন । রাজা সিদ্ধাৰ্থ প্ৰত্যুষেই নগৰপালগণকে আহ্বান কৰিয়া বিবিধ আনন্দ-উৎসবেৰ আদেশ দিলেন । কুন্দপুৰ নগৰে কাৰাগাৰে যে সকল কয়েদী ছিল, তাহাদিকে মুক্ত কৰিয়া দেওয়া হইল । বিক্ৰেয় দ্ৰব্যাদিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবাৰ জন্তু রাজাদেশ প্ৰচাৰিত হইল । নগৰ এবং নগৰ-উপকণ্ঠসমূহ গোময়-সংযুক্ত পবিত্ৰজলে পবিত্ৰীকৃত হইতে লাগিল । রাজপথসমূহ, রাজ-অটালিকাসমূহ—পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰিবাৰ ব্যবস্থা হইল । স্থানে স্থানে মঞ্চসমূহ নিৰ্ম্মিত হইতে লাগিল । রাজধানী ধ্বজপতাকাৰ শোভিত এবং স্তম্ভজিত বজ্জাবাসে সুসজ্জিত হইয়া, মনোহাৰী মূৰ্ত্তি ধারণ কৰিল । প্ৰাচীৰ-গাৱসমূহ চন্দন-বৰ্ণে রঞ্জিত হইতে লাগিল । শুভলক্ষণযুক্ত পূৰ্ণ-কলস-সমূহ দ্বাৰে দ্বাৰে স্থাপিত হইবাৰ ব্যবস্থা হইল । পুষ্পমালাসমূহ এবং পতাকাসমূহ চাৰিদিকে দোহুলায়মান রহিল । দেবালয়ে দেবাক্ষন্যৰ ব্যবস্থা হইল । কোথাও নাট্য, কোথাও নৃত্য, কোথাও ছায়াবাজী, কোথাও সঙ্গীত, কোথাও ব্যায়াম, কোথাও প্ৰদৰ্শনী—কত দিকে কত আনন্দেৰ ধুম পড়িয়া গেল । নানা স্থানে স্তম্ভসকল প্ৰোথিত ও তোৱণ-দ্বাৰসমূহ নিৰ্ম্মিত হইল । আনন্দেৰ শতধাৰা চতুৰ্দ্দিকে প্ৰবহমান হইতে লাগিল । এই ৰূপে দশ দিন কাল অবিচ্ছেদে নগৰ যখন আনন্দ-কোলাহলে পৰিপূৰ্ণ রহিল ; রাজা সিদ্ধাৰ্থ সপৰিজন স্তম্ভনোহৰ বেশে সুসজ্জিত হইয়া উৎসব-ক্ষেত্ৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিতে লাগিলেন । কুমারেৰ জন্ম-উপলক্ষে যে দশ দিন কাল উৎসব-সমারোহ চলিল, সে দশ দিন রাজা ও রাজ-পৰিজনবৰ্গ বহুমূল্য বেশভূষাৰ ভূষিত রহিলেন ; পুষ্পসম্ভাৰে তাঁহাদেৰ অঙ্গ সুশোভিত রহিল ; বহুমূল্য গন্ধদ্রব্যে তাঁহাদেৰ বসনাদি সুবাস বিস্তাৰ কৰিতে লাগিল । সপৰিজন রাজা সিদ্ধাৰ্থ যখন নগৰভ্ৰমণে বহিৰ্গত হইলেন, জয়চন্দ্ৰা-নিবাদে সে সংবাদ চাৰিদিকে সংবাহিত হইল ; তাঁহাদেৰ শোভাযাত্ৰাৰ জন্তু সৈন্তশ্ৰেণী শ্ৰেণিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল । পুৰবাসিগণ শঙ্খ-ধ্বনিতে মাজল্য-ঘোষণা কৰিলেন ; তুৰি, ভেৰী, মূৰজ, মৃদঙ্গ, ছন্দুভি প্ৰভৃতি বাস্ত-নিবাদে দিক্ প্ৰতিধ্বনিত হইল । রাজকৰ বাণিজ্য-কৰ রহিত হইয়া গেল । যাহাদেৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে তাহা ফিৰাইয়া দেওয়া হইল । ক্ৰয়-বিক্ৰয় নিষিদ্ধ, অধমৰ্ণকে খণমুক্ত, দণ্ডপ্ৰাপ্ত অৰ্থ প্ৰত্যৰ্পিত হইতে লাগিল । রাজকৰ্মচাৰীগণ

কাহারও গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। তখন সৰ্ব্বত্রই আনন্দ-ধ্বনি। সকলেই নৃতন বসনে ও পুষ্পমালা বিভূষিত। নগরের সকল নরনারী আনন্দ-মগ্ন। সমগ্র-দেশ আনন্দে পূর্ণ হইল। এইরূপে দশ দিন কাল উৎসব-সমারোহে জ্ঞতিবাহিত হইলে, রাজা সিদ্ধার্থ শত শত সহস্র সহস্র উপঢৌকন দেবগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথম দিনে কুমারের জাতকৰ্ম্ম সম্পন্ন হইল; তৃতীয় দিনে কুমারকে চন্দ্রসূর্য্য প্রদর্শন করান হইল; ষষ্ঠ দিবস ধর্ম্মসাধনার্থ উপবাসে ও জাগরণে কাটিয়া গেল। একাদশ দিবসে

জাতকৰ্ম্ম
নাম-করণাদি! শুদ্ধি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দ্বাদশ দিবসে প্রচুর খাদ্য, পানীয়, মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব ও অল্পচর প্রভৃতিকে এবং

জাতক জন্মদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইল। অতঃপর পিতামাতা উভয়ে স্নান করিয়া গ্রহ-দেবতার পূজা সম্পন্ন করিলেন, এবং যাবতীয় মঙ্গল্য-কার্য্যে ব্রতী রহিলেন। ঐ সময় তাঁহারা মূল্যবান অথচ অল্প বেশ-ভূষায় ভূষিত ছিলেন। এইরূপে পূজা প্রভৃতি সম্পন্ন হইলে, পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়-স্বজন-সহ তাঁহারা ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ভোজনাগ্নিতে নিমজ্জিত ব্যক্তিগণের সর্ষদ্বন্দ্বপূর্ব্বক পুষ্প, বস্ত্র, সুগন্ধ, মালা ও অলঙ্কারাদি তাঁহাদিগকে দান করা হইল। অতঃপর পিতামাতা উভয়েই বন্ধুবান্ধবগণকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন,—“নবকুমারের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংসারে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তজ্জন্ত কুমার ‘বর্দ্ধমান’ নামে অভিহিত হইবে।” এইরূপে কাশ্মপ-গোত্রজ ভগবান মহাবীরের তিনটি নাম নির্দিষ্ট হইল। তাঁহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, স্মৃতরাং পিতামাতা তাঁহাকে ‘বর্দ্ধমান’ নামে অভিহিত করিলেন। তিনি স্ততি-নিদ্রার অতীত ও তপস্যা-নিরত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার দ্বিতীয় নাম হইল—“শ্রমণ”। কিবা বিপদে, কিবা বিভীষিকায়, তিনি অটল অচল ছিলেন বলিয়া, কিবা হৃদেবে, কিবা হৃৎকণ্ঠে, তাঁহার সচিফুতা অপরিমীম ছিল বলিয়া, ধর্ম্মবিধি-পালনে ঐকান্তিকতা, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান, অপিচ, আত্মসংযমে তাঁহার অশেষ শক্তি ও বীরত্ব ছিল বলিয়া, তিনি “মহাবীর” নামে অভিহিত হইলেন।

ভগবান মহাবীরের পিতামাতার এবং নিকট-আত্মীয়গণের একটু পরিচয় এই স্থলে প্রদান করা যাইতেছে। তাঁহার পিতা কাশ্মপ-গোত্রজ এবং তিনটী নামে পরিচিত;

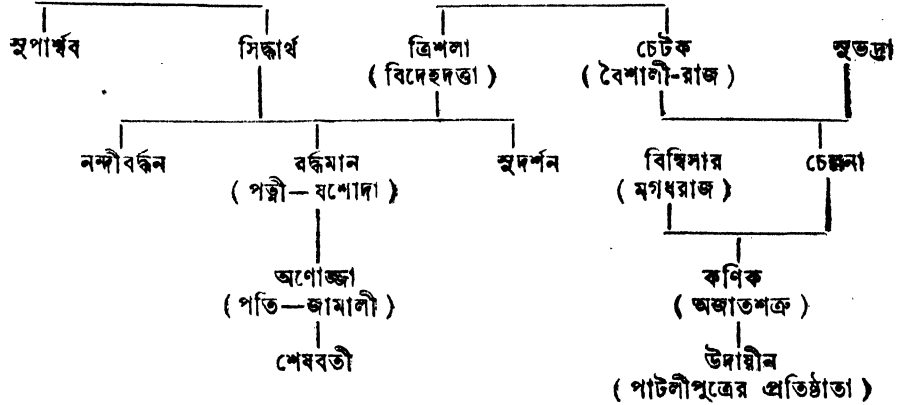
পিতামাতা
আত্মীয় প্রভৃতি। (১) ‘সিদ্ধার্থ’, (২) ‘শ্রেয়াংশ’ (৩) ‘শশাংশ’ (যশস্বী) *। তাঁহার মাতা বাশিষ্ঠগোত্রজা; তিনিও তিনটী নামে পরিচিতা; (১) ‘ত্রিশলা’, (২) ‘বিদেহদত্তা’, (৩) ‘প্রিয়কারিণী’।† তাঁহার এক খুল্লভাত

‘সুপার্শ্ব’ নামে পরিচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম—‘নন্দিবর্দ্ধন’। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ‘সুদর্শনা’ নামে পরিচিত। মহাবীরের পত্নীর নাম—যশোদা; তিনি কোণ্ডপ-গোত্রজা। তাঁহার এক কন্যা; সে ‘অধোজ্জা’ ও ‘প্রিয়দর্শনা’ নামে পরিচিতা; কোশিক গোত্রে

* কল্পবৃক্ষের ভাষায় ঐ নাম,—“সিদ্ধতো ই বা, সিদ্ধসে ই বা, জয়সে ই বা।”

† কল্পবৃক্ষে তাঁহার মাতৃনাম—“ত্রিশলা ই বা, বিদেহদত্তা ই বা, প্রিয়কারিণী ই বা।”

তাহার বিবাহ হয়। তাহার আবার দুই কন্যা ; শেষবতী ও যশোবতী । * মহাবীরের জনক-জননী পার্শ্বদেবের উপাসক ছিলেন এবং শ্রমণগণের উপদেশ মান্য করিতেন। তাঁহাদের পূর্ববৃত্তান্ত অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ। তাঁহারা জন্মজন্মান্তরে যে অমাতৃবিক ভাগ-স্বীকার ও ধর্মপালন করেন, তাহারই ফলে, মহাবীরকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বাধা হউক, পিতৃপক্ষে ও মাতৃপক্ষে ভগবান মহাবীর ইহজগতে কোন্ কোন্ বংশের সহিত কি ভাবে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন, নিম্নোক্ত বংশলতার তাহা বোধগম্য হইতে পারে। সে বংশপর্যায় এই,—



বংশ-পর্যায়ের বৃত্তিতে পারা যায়, মাতৃসম্পর্কে মহাবীর স্বামী মগধ-রাজবংশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। তাঁহার মাতা ত্রিশলা—বৈশালীর রাজা চোটকের ভগ্নী। আবার চোটকের কন্যা 'চেল্লানা'—মগধের অধিপতি বিম্বিসারের পত্নী ছিলেন। সূতরাং ত্রিশলা—মগধাধিপতি বিম্বিসারের পিতৃবশা হইতেছেন। রাজা বিম্বিসার, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম উভয় ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষক জন্ম প্রতিষ্ঠান্বিত হন। 'চেল্লনার' পুত্র—কণিক ; ইনিও ইতিহাসে প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি। অপিচ, রাজা সিদ্ধার্থও যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, সমসাময়িক বর্ণনায় তাহা উপলব্ধি হয়।

ভগবান মহাবীর ত্রিশ বৎসর সংসার-আশ্রমে অবস্থিতি করেন। আটশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পিতামাতা জীবিত ছিলেন। জনক-জননীর অচ্ছেদ্য স্নেহভোর সে দীর্ঘকাল তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই বন্ধনের মধ্য হইতেও তিনি মহাবীরের সংসার-বাস। যে লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হয় না। তিনি সংসারে কর্মজীবনের মধ্যে থাকিয়াও নৈর্দোষের আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। সংসারে নানা প্রলোভনের সামগ্রী পরিবেষ্টিত থাকিয়াও তিনি তৎসমুদয়ে সর্বতোভাবে নির্লিপ্ত ছিলেন। বিজ্ঞা-বিনয়াদি ভূষণে বিভূষিত হইয়াই তিনি যেন মর্ত্যভূমে অবতরণ করিয়া-ছিলেন। শৈশবে তাঁহার এমন বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল যে, অতি-বড় বীরও তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধে সমর্থ হইত না। আবার ধৈর্য্যগুণ এমন ছিল যে, সর্বসংসার পৃথ্বীমাতাও বুকি সে ধৈর্য্যের নিকট নতমুখী হইতেন। তাঁহার জ্ঞান-বারিধির গভীরতা নির্ণয়ে—মহুঘ

* কল্পতরুর ভাষায় মহাবীরের গুল্লতাত প্রভৃতির নাম,—“ভগবন্ত মহাবীরস্ পিতিক্কে হুপাসে, মিটে ভাস্স কন্দিবন্ধণে. ভগিনী হুংগনা, ভারিয়া জশোষা কোড়িয়া গুংগেং।” তাঁহার কন্যা,—“অশোক্কা ই বা প্রিয়দংশনা ই বা।” দৌহিত্রী—“সেসবই ই বা, উসবই ই বা।”

তো দূরের কথা—দেবগণেরও জ্ঞান-গবেষণা পর্য্যাপ্ত হইত। অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় পিতামাতা তাঁহাকে গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। সেদিন তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হইবেন, সেদিন রাজ-ভবনে বিপুল উৎসব-সমারোহের আয়োজন হইয়াছিল। সেদিন, কুমারকে যথারীতি স্নান করাইয়া বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত করা হয়; তিলকচন্দনে চর্চিত করিয়া তাঁহার হস্তে শ্রীফল ও সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করা হয়; এবং সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া বিড়ালয়ে প্রেরণ করা হয়। পণ্ডিতগণ ও বিদ্যার্থীগণ, মিষ্টান্নে পরিভুক্ত হইয়া ও বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া, কুমারের অনুসরণ করেন। যাত্রাকালে বাস্তবনিতে ও সঙ্গীতস্বরে রাজপথ মুখরিত হয়। কুমার বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুগৃহে গমন করিলেন বটে; কিন্তু গুরু তাঁহাকে কি বিদ্যা শিখাইবেন? যিনি ত্রিলোকের জ্ঞানধরূপ, তাঁহাকে আবার নূতন জ্ঞান কে শিখাইবে? অতরাং দেবলোকে ইন্দ্রের আসন টলিল। ইন্দ্রদেব, ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া, কুমারের গুরুগৃহে (বিদ্যামন্দিরে) উপস্থিত হইলেন। কুমারের গুরুগৃহে আসিয়া, ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রদেব ব্যাকরণ-সংক্রান্ত দুই একটি জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। সে প্রশ্নের সমাধানে পণ্ডিতের মস্তক বিচ্যূর্ণিত হইল। কিন্তু অষ্টমবর্ষীয় বালক বর্দ্ধমান যথাযথ সে প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিলেন। পণ্ডিতের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ইন্দ্রের প্রশ্নে বালক বর্দ্ধমান অবধি-জ্ঞানের পরিচয় দিলেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় জাগিল। পণ্ডিত, বালকের আশ্চর্য্য প্রতিভা দেখিয়া, সংশয়ান্বিত চিত্তে, ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের নিকট বালকের স্বরূপতত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। ইন্দ্রের মুখে ভগবানের অবতার-তত্ত্ব বিবৃত হইল। বর্দ্ধমান যে বালক নহেন—ত্রিলোকনাথ, পণ্ডিত ক্রমশঃ মর্মে মর্মে তাহা উপলব্ধি করিলেন। তখন, যিনি শিক্ষক ছিলেন, তিনি ছাত্র হইলেন। যিনি শিক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনিই গুরুর আসন লাভ করিলেন। গুরু প্রশ্ন করেন; ছাত্র সমাধান করিয়া দেন। এই ভাবে অনেককাল অতিবাহিত হইল। এই সময়ে গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরের ফলে, ‘জিনেন্দ্র-ব্যাকরণ’ সঙ্কলন হইয়া গেল। সংজ্ঞাসূত্র, পরিভাষাসূত্র, বিধিসূত্র, নিয়মসূত্র, প্রতিষেধসূত্র, অধিকারসূত্র, অতিদেশসূত্র, অমুবাদসূত্র, বিভাষাসূত্র, বিপাকসূত্র—দশ অধিকার বিশিষ্ট সওয়া লক্ষ শ্লোক-সমবিত্ত মহান ব্যাকরণ এইরূপে লিখিত হয়। অতঃপর ব্রাহ্মণের সজ্জনতার প্রসঙ্গ হইয়া, ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদানানন্তর, ইন্দ্রদেব স্বধামে প্রস্থান করিলেন। গুরুগৃহে বিদ্যালভ করিয়া ভগবান মহাবীর যখন রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, পুত্রের বিদ্যাবতার বিষয় অবগত হইয়া জনক-জননীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। যৌবনাগমের শুভমুহুর্তে তাঁহার মহা-উৎসবে কুমারের বিবাহ দিলেন। নরবীর সামন্ত-কন্ডা যশোদার সহিত মহাবীরের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইল। * তাঁহার প্রিয়দর্শনা নাম্নী কন্ডা সেই যশোদারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীরের ভগ্নীর জামালী নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহারই সহিত প্রিয়দর্শনার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

* ভগবান মহাবীরের বিবাহ প্রকৃতির এ বিবরণ করনসূত্রে প্রদত্ত হয় নাই। অরিস্টোনেসী পুরাণের অন্তর্গত জৈন হরিবংশে মহাবীর স্বামীর যে জীবন-চরিত আছে, সেখানেও বিবাহাদির প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না।

মহাবীর প্রভুর ঘেমনই রূপ, ভেমনই গুণ । পিতামাতার লোকান্তর গমনের পর ত্রিশ বর্ষ বয়সে তিনি যখন সংসার-ত্যাগ করেন, তখন লোকান্তিক দেবগণ তাঁহার

স্বব উচ্চারণ করিয়াছিলেন । সেই স্বব উপলক্ষে কল্পহুত্রে তাঁহার
মহাবীরের
গুণগ্রাম ।
কয়েকটা মাত্র গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল । লোকান্তিক দেবগণ

কি বলিয়া তাঁহার স্বব করিয়াছিলেন, আর কল্পহুত্রে তাঁহার কি পরি-
চয় প্রদত্ত হইয়াছিল, এ প্রসঙ্গে তাহারই একটু আভাব দিতেছি । তাহাতেই বুঝা যাইবে—
তিনি কি উন্নত পদবীতেই আরূঢ় ছিলেন ! তাঁহার গুণ-জ্ঞান-বিষয়ে, কল্পহুত্রে,—

“সমগ্রে ভগবৎ মহাক্ষীরে দক্ষে দক্ষপইমে পডিকবে আলীণে তদএ বিণীএ নাএ
নায়পুত্তে নায়কুগচংদে বিদেহে বিদেহদিমে বিদেহজ্জছে বিদেহহুমাণে ভীসং বাসাইং
বিদেহংসি কদু অম্মাপিউহিং দেবত্তগএহিং গুরুমত্তরএহিং অন্তগুমাএ সমত্তপইমে ।”

মহাবীর প্রভু কেমন ছিলেন ? তিনি দক্ষ ; অর্থাৎ সর্বকলাবিদ্যার পারদর্শী ছিলেন ।
তিনি দক্ষপ্রতিজ্ঞ ; অর্থাৎ যাহা বলিতেন, তাহাই সম্পন্ন করিতেন । তিনি প্রতিরূপ ;
অর্থাৎ সুন্দর রূপ-সম্পন্ন । তিনি আলীন ; অর্থাৎ সর্বগুণময় । তিনি তদ্র ; অর্থাৎ সরল ।
তিনি বিনীত ; অর্থাৎ মানীর মান রক্ষায় সমর্থ । তিনি জ্ঞাত ; অর্থাৎ প্রখ্যাত, প্রতিষ্ঠা-
যিত । তিনি জ্ঞাতপুত্র ; অর্থাৎ জ্ঞাতক্ষত্রিয়বংশীয় সিদ্ধার্থের পুত্র । তিনি জ্ঞাতকুলচন্দ্র ;
অর্থাৎ জ্ঞাতক্ষত্রিয়কূলে চন্দ্রের সমান জ্যোতিঃ-মাধুর্য্য-সম্পন্ন । তিনি বিদেহ ; অর্থাৎ বজ্র,
রুবত, নারচ, সংঘয়ন সমচতুরস্র শক্তি-সম্পন্ন । তিনি বিদেহদ্রি ; অর্থাৎ ত্রিশলার পুত্র ।
ইত্যাদি । মাতাপিতার স্বর্গলাভের পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি লইয়া আপন প্রতিজ্ঞা-পূরণার্থ
তিনি সংসার-আশ্রম ত্যাগ করেন । তাঁহার সেই সংসার-ত্যাগ-কালে লোকান্তিক দেবগণ
তাঁহার সমাপে উপস্থিত হইয়া মধুর বচনে তাঁহার স্বব উচ্চারণ করিয়াছিলেন । সেই স্বব,—

“জয় জয় নন্দা ! জয় জয় তদা ! তদং তে, জয় জয় ধত্তিঅবরবসহা ! বুজ্জ্বাহি
ভগবৎ লোগনাহা ! সয়লজগজ্জীবহিরং পবতেহি ধম্মতিথং, হিয়সুহনিসুসেয়সকরং
সকলোএ সকলীবাণং ভবিসুসইতিয়কট্টু জয় জয় সদং পউংজংতি ।”

অর্থাৎ,—“হে জগতের আনন্দদাতা ! আপনার জয় হউক । হে কল্যাণবন্ত ! আপনার
লয় হউক । হে ক্ষত্রিয়কূলের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্ত-প্রধান ! আপনার জয় হউক । হে ভগবান্
লোকনাথ ! দীক্ষা-গ্রহণে আপনি জগৎকে জাগ্রৎ করুন । হে ভগবান্ ! আপনি কেবল-
জ্ঞান লাভ করিয়া সকললোকহিতকর ধর্ম্মতীর্থ প্রকাশ করুন । আপনার ধর্ম্মসকল
লোকের সুখকারী ও মোক্ষপ্রদ । সেইজন্ত নিরন্তর আপনার জয়-ঘোষণা করি ।”

যে জ্ঞানালোক বিতরণ করিবার জন্ত, যে দিব্যজ্যোতিঃ বিচ্ছুরণ করিবার জন্ত, মহা-
বীর মর্ত্যালোকে অবতীর্ণ হন, সে জ্ঞান—‘কেবল’-জ্ঞান—তাঁহাতে বীজরূপে অটনশব বিস্তমান

ছিল । এখন সে জ্ঞান ক্ষুতি লাভ করিবার অবসর আসিল । অগ্নি ভস্ম
আচ্ছাদিত ছিল ; ঝঞ্ঝার ভস্ম উড়িয়া গেল ; বহি স্বরূপ-মূর্তিতে প্রকাশ
পাইল । অনল প্রজ্জ্বলিত হইলে বায়ু সহায় হয় ; সে তখন ইন্ধন আপনা-
আপনিই অধেষণ করিয়া লয় । পিতামাতার লোকান্তরের পর, মহাবীরের সাধনার

মহাবীরের
সন্ন্যাস-গ্রহণ ।

পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারিলেন যে, এইবার তাঁহার প্রকৃত নিষ্কর্ণকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইবার তিনি স্বর্ণ-রোপ্য পরিত্যাগ করিলেন। এইবার তিনি ধনধাতু পরিত্যাগ করিলেন। এইবার তিনি রাজ্য-ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিলেন। এইবার তাঁহার সৈন্তদল পরিত্যক্ত হইল। এইবার তাঁহার শতভাগ্যার ধনভাগ্যার পরিত্যক্ত হইল। সোভাগ্যপূর্ণ নগর, সুখময় অট্টালিকা, সুখ-সোভাগ্য-বর্দ্ধক প্রজাকুল—এইবার তিনি সকলই পরিত্যাগ করিলেন! স্বর্ণ-রোপ্য ও মণি-মাণিকা-মুক্তা—সংসারে মূল্যবান সামগ্রী বলিতে বাহ্য কিছু ছিল, কিছুই প্রতি তিনি আর ক্রক্ষেপ করিলেন না। উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে দাতৃত্বভার তুল্য করিয়া, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে আপন ধন-সম্পত্তি দান করিয়া, তিনি সম্যাস-গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সম্যাসাবলম্বনের—দীক্ষা গ্রহণের দিন, নগরে মহা-সমারোহে শোভা-যাত্রার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ, অগ্নিরূপ এবং রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নরনারী সকলেই সে শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া-ছিলেন। দীক্ষা-গ্রহণের পূর্বে, দেবরাজ ইন্দ্র এবং অগ্রজ নন্দীবর্দ্ধন, তাঁহাকে যথারীতি বর্জন করাইয়া, চন্দ্রনাদিতে তাঁহার দেহ অগ্নিরঞ্জিত করিয়া, মুকুট-কুণ্ডলে তাঁহাকে ভূষিত করিয়া, তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরিশেষে, চন্দ্রপ্রভ নামক প্রখ্যাত শিবিকায় মহাবীর অধিষ্ঠিত হইলে, নগর মধ্য দিয়া শোভাযাত্রা বাহির হয়। শম্ভু-ধ্বনিতে, বটধ্বনিতে ও বিবিধ বাস্তবধ্বনিতে নগর আনন্দ-মুগ্ধরিত হইয়া উঠে। স্তুতিপাঠক-গণ স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করেন। চারণগণ জয়জয়-নাদে দিক প্রতিক্রান্ত করিয়া তোলে। রাজলিক গীতে চারিদিক মঙ্গলময় হইয়া উঠে। আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করেন। উগ্রকুল, ক্ষত্রিয়কুল, সেনাপতিগণ, নগরবাসিগণ, সকলেই তত্ত্বিতরে জয় জয় স্বরে অনুগমন করেন। সে সময় যাহারা তাঁহার সৌম্যমূর্তির প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই পলক ফিরাইতে পারেন নাই। সহস্র সহস্র ভূষিত নেত্রের অন্তর্কর্ত্তী হইয়া, সহস্র সহস্র কর্ণের প্রশংসা-গীতে পরিবৃত্ত হইয়া, সহস্র সহস্র লোকের অন্তরে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া, সহস্র সহস্র লোকের আশীর্বাদভাজন হইয়া, সহস্র সহস্র লোকের অঙ্গুলির দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া, সহস্র সহস্র নর-নারীর আভিবাধনে প্রত্যাভিবাধন করিয়া, তিনি যখন প্রাসাদের পর প্রাসাদ অতিক্রম পূর্বক অগ্রসর হইলেন; সঘর্ষনাশ্রুত মধুর সঙ্গীতে, বীণাধ্বনিতে ও তুর্য্য-নিনাদে, জয়-ধ্বনিতে ও চক্ৰাঘিনিাদে, জনসাধারণের আনন্দবাজক মুহু মধুর কলকলস্বরে, তাঁহার শোভাযাত্রায় অনুগম শোভার সঞ্চার করিল। সকল সৈন্তদল সহ, সকল আত্মীয়-অন্তরঙ্গ সহ, সকল সেবক-অনুচর সহ, সর্ববিধ সমারোহ সহ, মহাবীর কুন্দপুরের স্ত্রীসিদ্ধ উদ্যানে উপনীত হইলেন। জাতক-গণের সেই উদ্যান ‘সাক্যাবন’ নামে প্রখ্যাত ছিল। উদ্যানে প্রবেশ করিয়া, শিবিকা তত্ত্বতা অতি-সুদৃশ অশোক-ভরতলে উপস্থিত হইল। তৎক্ষণে শিবিকা উপনীত হইলে, মহাবীর শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন। তার পর, আপন হস্তে আপনার গাজলকারসমূহ উন্মোচন করিলেন,—আপন হস্তে আপনার মালা-চন্দন ছিন্ন বিশুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন,—আপন হস্তে আপনার মস্তকের কেশরাশি উৎপাটন করিয়া উড়াইয়া দিলেন। অবশেষে, সকলকে বিদায় দিয়া, আড়াই দিবস কাল নির্জল উপবাসী থাকিয়া,

চন্দ্রের সহিত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে সরাস-আশ্রম গ্রহণ করিলেন। তদবধি সংসারের সহিত আর তাঁহার কোনই সম্বন্ধ রহিল না।

সংসার-আশ্রম পরিভ্যাগ করিয়া ভগবান মহাবীর এক বৎসর এক মাস পর্য্যন্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই তিনি নগ্ন অবস্থায় দিনবাপন করিতে লাগিলেন। কোথায় বস্ত্র—কে পরিবে? কোথায় আহাৰ্য্য—কে মুখে
কঠোর
সংযম-সাধনা।
দিবে? অশন-সম্বন্ধে, বসন-সম্বন্ধে, তিনি কি কৃচ্ছ্র ব্রতই অবলম্বন করিয়াছিলেন! আপন হস্ততালু মধ্যে যে ভিক্ষার ধারণ করা যাইত, সেই পরিমাণ ভিক্ষার গ্রহণ করিয়াই তিনি জীবন-ধারণ করিতেছিলেন। দ্বাদশ বৎসর কাল আপন দেহের প্রতি তিনি কি উপেক্ষাই দেখাইয়াছিলেন! কি দেবতা হইতে, কি মনুষ্য হইতে, কি পশু-পক্ষী হইতে, যে প্রকারে, যে স্থখ বা যে কষ্টই প্রাপ্ত হউন না কেন, কোনও দিকেই তাঁহার জ্ঞক্ষেপ ছিল না। রোদ্র-বৃষ্টি ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত দেহের উপর দিয়া অবিরাম চলিয়া যাইতেছে; দেহের উপর দিয়া কীট-পতঙ্গের গতাগতি-হেতু দংশনের পর দংশনের বস্ত্রণায় দেহ জর্জরিত হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই গ্রাহ্য নাই। এ সময় এমনই নিম্পৃহ নির্লিপ্তভাবে তিনি জীবন বাপন করিতে অভ্যস্ত হন। এই প্রকারে মহাবীর যে সংযম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন; সে সংযম-সাধনায় একমাত্র তিনিই পারদর্শী—সে সিদ্ধিলাভে একমাত্র তিনিই অধিকারী ছিলেন। পাদচারণে সংযম, বাক্য-কথনে সংযম, ভিক্ষাকরণে সংযম, দান-গ্রহণে সংযম, পানপাত্র ও বস্ত্রনাদি গ্রহণে সংযম, মল মূত্র পরিত্যাগে ও দেহ-সংস্কারে সংযম, চিন্তায় সংযম, বাক্যে সংযম, কার্য্যে সংযম;—সে সংযমের তুলনা নাই। পূর্বে যে সমিতির ও গুপ্তির বিষয় বলিয়াছি, * তাহাদের সার্থকতা মহাবীরের জীবনে এই সময় সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ হয়। চিন্তায় সতর্কতা, বাক্যে সতর্কতা, ইঞ্জির-পরিচালনে সতর্কতা, চরিত্রে সতর্কতা—এই সময়ই তাঁহাতে প্রকাশ পায়। রাগ নাই, অহঙ্কার নাই, ঈর্ষা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই; স্থির, প্রশান্ত, উন্নততা-বিরহিত, সম্ভাপ-রহিত, তৃষ্ণাশূন্য, মমতাশূন্য, অবলম্বনশূন্য;—তখন তাঁর সে এক অব্যক্ত অব্যয় ভাব। সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে!—সাংসারিক কোনও সম্বন্ধহেতু চিত্ত কলঙ্কিত নহে!—সে এক অপূর্ব অব্যক্ত অবস্থা! তাম্রপাত্রে যেমন জলের দাগ পড়ে না, শব্দে যেমন অঞ্জলি লিপ্ত থাকিতে পারে না; সেইরূপ, পাপ তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারে নাই। জীবনের গতি যেমন কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না, তাঁহার গতি সেইরূপ অনবরুদ্ধ ছিল। আকাশের যেমন আধার আবশ্যক হয় না, তাঁহারও তরুণ আশ্রয়ের আবশ্যক ছিল না। বায়ুপ্রবাহ যেমন বাধা মানে না, তাঁহাকেও সেইরূপ কোনও বাধা মানিতে হইত না। তাঁহার অন্তর—শরতের স্বচ্ছ সলিলের ত্রায় নির্মল ছিল। পদ্মপত্রে যেমন জল লিপ্ত হয় না, তাঁহাতেও সেইরূপ কিছুই লিপ্ত হইতে পারিত না। তাঁহার ইঞ্জিয়সমূহ মৃত্তিকা-সংশ্লিষ্ট কচ্ছপের ত্রায় অনাসক্ত ছিল। গণ্ডারের শৃঙ্গের ত্রায় তিনি একাকী সংগ্রামে প্রবৃত্ত

* এই খণ্ডের ৮২ পৃষ্ঠায় সমিতির ও গুপ্তির বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

ছিলেন। পক্ষীর জ্ঞান তাঁহার স্বাধীনতা ছিল। উপকথা-কথিত ভারত-পক্ষীর * জ্ঞান তিনি অবাধে ভ্রমণ করিতেন। তিনি হস্তীর জ্ঞান পরাক্রান্ত, বুকের জ্ঞান বলিষ্ঠ, সিংহের জ্ঞান ছুরাক্রমা, মন্দার-পর্বতের জ্ঞান অচল ও দৃঢ়, মহাসাগরের জ্ঞান গভীর, চন্দ্রের জ্ঞান মূঢ়, সূর্যের জ্ঞান খরকর, স্বর্ণের জ্ঞান নির্মল, ধরিত্রীর ন্যায় সর্বসংস্হা, প্রজ্জলিত অনলের ন্যায় ঐজ্জল্য-সম্পন্ন ছিলেন। একটা প্রাচীন গাথায় তাঁহার ঐ সকল গুণের বিষয় সংগ্ৰথিত আছে;—

“কংসে সংখে জীব, গগনে বাউ য সরষসলিলে অ।

পুঙ্খরপতে কুন্তে, বিহগে স্বগুণে য ভারংডে॥

কুংজর বসহে গীহে, নগরায়্য চেষ সাগর মথোহে।

চংদে সুরে কণগে, বসুংধরা চেষ হুয়বহে॥”

ভগবান মহাবীর স্বামীর কোনদিকেই কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না। প্রতিবন্ধক সাধারণতঃ চতুর্বিধ; দ্রব্য, স্থান, কাল ও ভাব—এই চারি বিষয়ের সহিত তাহার সন্মিলিত।†

প্রতিবন্ধক
দূর।

দ্রব্য-বিষয়ে তাঁহার সর্ববিধ প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইয়াছিল। কি জীব, কি অজীব, অথবা কি জীবাঞ্জীব, অর্থাৎ চেতন অচেতন চেতনাচেতন—কোনও বিষয়ের সহিতই তাঁহার সন্মিলিত ছিল না। স্থান বা ক্রিতি বিষয়েও

তাঁহার সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইয়াছিল। কিবা গ্রামে, কিবা নগরে, কিবা অরণ্যে, কিবা প্রান্তরে, কিবা গৃহে, কিবা অগ্ননে—কিছুই সহিত তিনি সন্মিলিত রাখেন নাই। এইরূপ কাল-বিষয়েও তাঁহার সর্ববিধ প্রতিবন্ধক দূরীভূত হইয়াছিল। অর্থাৎ, সময়, আবলিকা, স্বাস্থ্যস্বাস, দিবা, রাত্রি, বৎসর, পক্ষ, মাস, ঋতু, মুহূর্ত্ত—কিছুই প্রতি তাঁহার মমত্ব ছিল না। এইরূপ ভাব-বিষয়ক প্রতিবন্ধকও তিনি সর্বতোভাবে দূরীভূত করিয়াছিলেন; অর্থাৎ, ক্রোধ, মান, মায়, লোভ, ভয়, হাশ, প্রেম, ঘেব, কলহ, কলঙ্ক, পরনিন্দা, রতি, অরতি, মিথ্যাত্ব প্রভৃতি কোন ভাবই তাঁহাতে আর স্থান পায় নাই। বর্ষা ঋতু ভিন্ন, শীত গ্রীষ্মের আট মাস কাল তিনি কোনও গ্রামে এক রাত্রির অধিক বসতি করিতেন না; কোনও নগরে পঞ্চ রাত্রির অধিক আশ্রয় লইতেন না। পাছে আসক্তি আসে, তজ্জন্তই এই আদর্শ তিনি পালন করেন। চন্দনে ও বিষ্ঠায়, তৃণে ও জহরতে, মৃত্তিকায় ও সূবর্ণে, সূখে ও দুঃখে, তাঁহার সমজ্ঞান ছিল। ইহলোক বা পরলোক,

* উপকথা কথিত ভারত-পক্ষী ত্রিপদবিশিষ্ট ও দ্বিপ্রাণ। একপ পক্ষী অধুনা দৃষ্ট হয় না বলিয়া উহাকে কল্পনার সামগ্রী বলা হয়।

† মহাবীর স্বামী যে সকল প্রতিবন্ধক হইতে মুক্তিরূপ করেন, তাহাষয়ে এইরূপ লিখিত আছে;—“নখিণং তস্মৈ ভগবন্তস্মৈ কথং পুণ্ড্রিকং—নে অপুণ্ড্রিকং চটুর্বিধং পন্নতে, তং হা, দক্খণ, থিত্তণ, কালণ, ভাবণ।” অর্থাৎ, জৈনশাস্ত্র-মতে, দ্রব্য, ক্রিতি, কাল ও ভাব—এই চতুর্বিধ প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধক দূরীকরণে মহাবীর স্বামী যে অবস্থায় উপনীত হন, কল্পনাত্রে তাহার এইরূপ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়;—“দক্খণ, থং সচিচ্চাচিন্তামীসেহ দক্খণ, থিত্তণ থং গামে বা নগরে বা অরণ্যে বা থিত্তে বা থলে বা থরে বা অংগনে বা নহে বা, কালণ থং সমএ বা আবলিআএ বা আণাপাণএ বা থোবে বা থণে বা লেবে মুহত্তে বা অহোরত্তে পক্খে বা মাসে বা উউএ বা অরণ্যে বা সংবচ্ছরে বা অরণ্যে বা দীহকাল-সজোএ, ভাবণ থং কোহে বা মাণে বা মায়াএ বা লোভে বা ভয়ে বা পিচ্ছে বা দোষে বা কলহে বা অভক্খাণে বা পেহুয়ে বা পরপরিবাএ বা অরহরই বা মায়ামোসে বা মিচ্ছাদংসণসমে বা তস্মৈণ ভগবন্তস্মৈ নো এবং ভবই।”

জীবনে বা মরণে—কিছুই প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিল না। কৰ্ম্মশত্রুকে বিনষ্ট করিয়া, তিনি যেন সংসারের পরপারে বিরাজ করিতেছিলেন। দ্বাদশ বৎসর কাল, ভগবান মহাবীর আশ্রিতক্বে নিমগ্ন ছিলেন। অমৃতর জ্ঞান, অমৃতর দর্শন, অমৃতর চরিত্র, অমৃতর (নির্দোষ) আলয়, অমৃতর (নির্দোষ) বিহার, অমৃতর বীৰ্য্য, অমৃতর সরলতা, অমৃতর কোমলতা, অমৃতর লঘুতা, অমৃতর ক্ষান্তি, অমৃতর মুক্তি, অমৃতর গুপ্তি, অমৃতর সন্তোষ, অমৃতর সত্য, অমৃতর সংযম, অমৃতর সদাচরণ প্রভৃতির অধিকারী হইয়া, তিনি অমৃতর মুক্তি-পথের পথিক হইয়াছিলেন। সততা, সংযম, সচ্চারিত্রা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতির কলস্বরূপ যে নির্দোষ-মুক্তি, তাহাই এখন তাঁহার সমীপস্থ হইয়াছিল। সন্ন্যাস-গ্রহণের ত্রয়োদশ বর্ষে বৈশাখ মাসের দশম দিবসে শুক্লপক্ষে শুভরাত্রিতে ‘বিজয়’ নামা মুহূর্ত্তে জুস্তিক-গ্রাম-প্রান্তে ক্ষুদ্রপালিকা নদীতীরে একটি পুরাতন মন্দির-সন্নিকটে শালবৃক্ষমূলে বসিয়া মহাবীর স্বামী কেবল-জ্ঞান লাভ করেন। সে সময়ে চন্দ্রের সহিত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের সংক্রমণ ঘটিয়াছিল। সেই শ্রেষ্ঠ পূর্ণ অনন্ত অবাধ কেবল-জ্ঞান লাভের পূর্বে আড়াই দিবস কাল, নির্জল-উপবাসে পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, তিনি গভীর ধ্যানে নিরত ছিলেন। এইরূপে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়া, ভগবান মহাবীর যখন জিন এবং অহং পদ লাভ করিলেন—কেবলী হইলেন; তখন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সর্ববিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিল। পৃথিবীর, দেবগণের, মনুষ্যগণের এবং দৈত্য-গণের অগতি গতি হিতি সকলই তিনি দেখিতে ও বুঝিতে পারিলেন। চিন্তা, ভাব, আহাৰ, বিহার,—কাহারও কোনও বিষয় তখন আর তাঁহার দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিতে পারিল না। সংসারের সকল পদার্থের—সর্বপ্রকার অবস্থা, সর্বপ্রকার চিন্তা, সর্বপ্রকার বাক্য এবং প্রতি-মুহূর্ত্তের কার্যকলাপ—তাঁহার দিব্যদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইল। পূর্ণজ্ঞান লাভের পর ভগবান মহাবীর প্রথম বর্ষাকাল অস্থিক-গ্রামে * বাপন করেন। তিনটি বর্ষাকাল চম্পায় ও পৃষ্টিচম্পায় অতিবাহিত হয়। দ্বাদশ বর্ষাকাল বগিছগ্রামে, চতুর্দশ বর্ষা রাজগৃহে এবং নালন্দার উপকণ্ঠে, ছয় বর্ষা মিথিলার, দুইবর্ষা ভদ্রিকায়, এক বর্ষা আলভিকায়, এক বর্ষা পণিতভূমিতে, এক বর্ষা শ্রাবস্তীতে এবং এক বর্ষা রাজা হস্তীপালের কাছারী-বাটিতে পাণা-নগরীতে অতিবাহিত হয়। শেষোক্ত বর্ষাই তাঁহার পার্থিব জীবনের শেষ বর্ষা-কাল। কার্ত্তিক মাসের পঞ্চদশ দিবসে, কৃষ্ণ পক্ষের শেষ রাত্রিতে, পাণা-নগরীতে রাজা হস্তীপালের কাছারী-বাটিতে মহাবীর স্বামী ইহলীলবন শেষ হয়। সেই দিন তিনি, জন্ম-জরা-মৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করিয়া, ইহজগৎ হইতে অন্তর্ধান হন। সেই দিন হইতেই তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হয়। সেই দিন তিনি সিদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হন। যে বৎসর মহাবীর স্বামী দেহত্যাগ করেন, সেই বৎসর চন্দ্রবৎসর নামে অভিহিত হয়। সে মাস প্রীতিবর্দ্ধন, সেই পক্ষ নন্দীবর্দ্ধন, সেই দিন সুলভাশ্রি বা উপসম নামে পরিচিত। সেই রাত্রির নাম দেবানন্দা বা নিশ্চলি। সেই লব ‘আর্য্য’, সেই প্রখাস ‘মুক্ত’, সেই শ্লোক ‘সিদ্ধ’, সেই করণ ‘নাগ’, এবং সেই

* এই গ্রাম পূর্বে বর্দ্ধমান নামে পরিচিত ছিল। শূলপাণি নামে এক বক্ষ নরহত্যা করিয়া ঐ স্থানে তাহার অস্থিস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই অস্থিস্থাপনের উপর নগরবাসীরা একটি মন্দির নির্মাণ করেন। তদনুসারে, ঐ স্থান অস্থিগ্রাম বা অস্তিগ্রাম নামে অভিহিত হয়।

মুহূর্ত্ত 'সর্বার্থসিদ্ধ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যেদিন মহাবীর স্বামী পূর্ণমুক্ত লাভ করেন, সেদিন সেই সময় চক্রে সহিত স্বাতী নক্ষত্রের সংক্রমণ হইয়াছিল,—দেবগণের গভাগতি স্থ্রে বোমপথ আলোকিত হইয়াছিল। এইরূপে মহানির্বাণ-লাভের সময় সম্পর্গাক গোমাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি যে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া যান, তাহাও জগৎ আজিও সমুজ্জ্বল। তাত্‌কালিক তাঁহার উপদেশ-পরম্পরাই জৈনধর্ম্মের প্রাণভূত।

যে রাশিতে মহাবীর প্রভু দেহত্যাগ করেন, সে রাশিতে নগর আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। নবমল্লকী ও নবলিচ্ছবী—সন্ধিবদ্ধ এই অষ্টাদশ সামন্তরাজসহ কাশী ও কোশলের নৃপতিবর্গ, ঐ সময় প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিয়া-দেহত্যাগ। ছিলেন। ঐ দিবস সংসার-সাগর উত্তরণের তরলী-স্থানীয় 'পৌষধ' উপবাসের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। তথাপি, সেই মহাপুরুষের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ নগরবাসীরা নগরী আলোক-মালায় বিভূষিত করিয়াছিল। সকলেই তখন কহিতেছিল,—“জ্ঞানের আলোক নির্বাপিত হইল। এখন আমরা পার্গিব আলোকে নগর আলোকিত করিতেছি।” এ সময় মহাবীর স্বামীর অসংখ্য ও ভক্ত-অনুরক্তে তাঁহার সম্প্রদায় পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ভগবান মহাবীর যেদিন দেহত্যাগ করেন, যেদিন প্রভুর সহিত তাঁহার প্রিয়শিষ্য গৌতম-গোত্রজ ইন্দ্রভূতির সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হয়; সেই দিন ইন্দ্রভূতি * কেবলীপদ লাভ করেন,—পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হন। চতুর্দশ সহস্র শ্রমণ এখন ইন্দ্রভূতিকে আচার্য্য-পদে বরণ করিয়া প্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধ্বী চন্দনার অধিনায়কত্বে ষট্‌ক্রিংশ সহস্র সাধ্বী ভিকুণী ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য-প্রচারে ব্রতী হইলেন। এক লক্ষ ঊণবাট তাক্সার সংসারী গৃহস্থ শঙ্কশতককে আচার্য্য-পদে বরণ করিয়া ধর্ম্ম-পালনে প্রবৃত্ত হন। তিন লক্ষ আঠার হাজার সংসার-আশ্রম-বাসিনী রমণী, স্থলসা ও রেবতীর কর্ত্তব্যধীনে, ধর্ম্মপালন করিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণ যথাক্রমে সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক, শ্রাবিকা নামে প্রসিদ্ধ। এইরূপ, আর এক শ্রেণীর তিন শত সাধু ছিলেন;—তাঁহারা জিনগণের সত্তিত নৈকট্য-সম্বন্ধ লাভ করিতে না পারিলেও, চতুর্দশ পূর্ব্বশাত্ত প্রভৃতির জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন এবং জিনগণের ত্রায় সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এইরূপ, আরও তের শত সাধু ছিলেন;—তাঁহারা অবধি-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন হইয়াছিলেন। সাত শত কেবলী, সাত শত বৈক্রিয়লন্ধিধারক, পাঁচ শত বিশ্বল-মতি এবং অন্যান্য নানা শ্রেণীর জ্ঞানী এখন জৈনধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। মহাবীর প্রভু জীবনের কত কাল, কত বর্ষ, কি ভাবে বাপন করিয়াছিলেন, স্থজে সংক্ষেপে তাহার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনের ত্রিশ বৎসর কাল গৃহস্থাশ্রমে অতিবাহিত হইয়াছিল। তারপর, বিয়াল্লিশ বৎসর সন্ন্যাসের অবস্থা। তাহার মধ্যে বার বৎসরের অধিক কাল তিনি ছদ্মহ (ছদ্মহ) অবস্থায় অতিবাহিত করেন। ঐ সময়কে দীক্ষা-গ্রহণ-কাল

* মহাবীর স্বামীর দেহত্যাগের সময় ইন্দ্রভূতি জৈনধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই সময় তিনি কেবলী পদ লাভ করেন। ইহার পর তিনি বার বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার আয়ুঃকাল ১২ বৎসর; তাহার মধ্যে সন্ন্যাস-আশ্রমে তিনি ৫০ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

বা জ্ঞানোন্মেষণ-কাল বলা হইয়া থাকে । উহার পর অনধিক ত্রিশ বৎসর কাল তিনি কেবলী-পর্যায়ে অবস্থিত ছিলেন । সন্ন্যাসের ৪২ বৎসর কাল তিনি দীক্ষা-প্রতিপালনে শ্রমণ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । সর্বসাকুল্যে মহাবীর প্রভু বাহান্তর বৎসর কাল মর্ত্যভূমে বিচরণ করেন । উহাই তাঁহার পূর্ণ আয়ুঃকাল । ঐ আয়ুঃকাল পূর্ণ হইলেই তাঁহার কৰ্ম্মজীবনের অবসান হয়,—কৰ্ম্ম আর জ্ঞানাবরণীয় দর্শনাবরণীয় আয়ুষ্ক প্রভৃতি রূপে ফলোৎপাদনের সমর্থ হয় না । সেই অবস্থাই নির্কাণ, মোক্ষ, পূর্ণ, কেবল-জ্ঞান—যখন বেদনীয় মোহনীর আয়ুষ্ক প্রভৃতি কৰ্ম্মের বীজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । এইরূপে, ইহজীবনের কৰ্ম্ম শেষ করিয়া, সকল কৰ্ম্মবীজ ধ্বংস করিয়া, এই বর্তমান অবসর্পিণী কালে হুঃসম-সুসমা কালাংশের শেষভাগে মহাবীর প্রভু যখন উহার আলোকে লীন হন, তখন সেই চির-সমাধির অবস্থায় তাঁহাকে মুখকমলনিঃসৃত ‘উত্তরাধায়ন-সূত্র’ প্রভৃতি রূপ উপদেশের অমৃতধারা জগৎকে নূতন জীবন দান করিবার জন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল । সে অমৃত-অভিষেক ভারতের নিম্পন্দ প্রাণে যে সঞ্জীবনী-শক্তি প্রদান করিয়া যায়, তাহাই জৈনধর্ম ।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম একই জননীর অগ্রজ-অমুজ দুইটি সন্তান-রূপে ভারতের অন্ধে পরিপুষ্ট হইয়াছিল । সুতরাং ঐ দুই ধর্মের পরস্পরের মধ্যে যে বহু সাদৃশ্য বিস্তমান থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তবে, সাদৃশ্য-সত্ত্বেও একই বুদ্ধের দুইটি পত্র

জৈন-বৌদ্ধ
অগ্রজ-অমুজ ।

যেমন অভিন্ন নয়, সেইরূপ বহু-সাদৃশ্য-সত্ত্বেও জৈন ও বৌদ্ধ দুই ধর্ম দুই বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছিল । কি সাদৃশ্যের বা কি পার্থক্যের ভিত্তিক উপর জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত, সে আভাস আমরা প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন স্থানে প্রদান করিয়াছি । অপিচ, যে সকল কারণে বুদ্ধদেবকে এবং মহাবীরকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতীত হয়, আবার যে কারণে তাঁহাদের দুই জনকে দুই বিভিন্ন মহাপুরুষ বলিয়া বুঝা যায়, তৎসম্বন্ধে এ স্থলে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে । পূর্বেই দেখাইয়াছি, মহাবীরের ও বুদ্ধদেবের নাম-বিশেষণ প্রায় একই । অপিচ, তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নামের ও স্থান প্রভৃতির সাদৃশ্যও আশ্চর্য্যজনক । মহাবীর স্বামীর কতকগুলি আত্মীয়-অন্তরঙ্গের নাম এবং বুদ্ধদেবের কতকগুলি আত্মীয়-অন্তরঙ্গের নাম—প্রায় একই । মহাবীরের জ্বরী নাম—যশোদা ; বুদ্ধদেবের জ্বরী নাম—যশোধরা । মহাবীরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম—নন্দীবর্দ্ধন, বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ‘নন্দ’ নামে পরিচিত । বুদ্ধদেব যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল—সিদ্ধার্থ । এদিকে আবার মহাবীরের পিতা ইতিহাসে ‘সিদ্ধার্থ’ নামে পরিচিত । এই যে নামের সাদৃশ্য, ভারতের ইতিহাসে,—ভুখু ভারতের বা বলি কেন, পৃথিবীর অনেক স্থানেই,—অনেকের মধ্যে দৃষ্ট হয় । কিন্তু তাই বলিয়া, একের সহিত অন্নের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন হয় না । এ দিকে, আর একটু অতিনিবেশ-সহকারে চিন্তা করিলে, মহাবীরের এবং বুদ্ধদেবের জীবনের বহু ঘটনার বহু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় । বুদ্ধদেবের জন্মস্থানের নাম—কপিলাবস্তু ; উহা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত বলিয়া পরিচিত । মহাবীর স্বামীর জন্মস্থান—কুমগ্রাম বা কুমপুর ; উহা বৈশালীর নিকটে অবস্থিত । কথিত আছে,—বুদ্ধদেবের জন্মের পরই তাঁহার জননীর দেহান্তর ঘটে । কিন্তু মহাবীরের পিতামাতা তাঁহাকে বয়স্ক সংসারী দেখিয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করেন ।

বুদ্ধদেব, পিতার জীবিত-কালে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংসারত্যাগী হন। কিন্তু মহাবীর স্বামী আপন পিতামাতার মৃত্যুর পর, অগ্রজের এবং রাজপুরুষগণের অনুমতি লইয়া, সংসার-ত্যাগ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব ছয় বৎসর কুচ্ছু কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন; মহাবীর স্বামী ষাট বৎসর কাল কঠোর সাধনায় ত্রী থাকেন। কঠোর কুচ্ছু সাধনায় যে সময় অতীত হয়, সে সময় বৃথাই নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বুদ্ধদেব মনে করেন। কিন্তু মহাবীর প্রাণে প্রাণে সে সাধনার আবশ্যকতা অনুভব করেন, এবং তীর্থঙ্কর পদ লাভ করিয়াও সে সাধনায় ত্রী থাকেন। গোশাল-মঙ্গলিপুস্তকের ভ্রায় মহাবীরের যেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তদ্রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী বুদ্ধদেবের অতি অল্পই দেখিতে পাই। জামালীর ভ্রায় শত্রুর উপদ্রবও বুদ্ধদেবকে সহ্য করিতে হয় নাই। জামালী জৈনধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম বিচ্ছেদ সংঘটন করাইয়াছিলেন। আর এক বিষয়ে উভয় ধর্ম-সম্প্রদায়ের পার্থক্য পরিগণিত হয়। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের নামের সহিত মহাবীর স্বামীর শিষ্যগণের নামের কোনও সাদৃশ্য নাই। উপসংহারে উভয়ের মহানির্বাণ-লাভের স্থান-কাল-বিষয়ে পার্থক্য পরি-লক্ষিত হয়। বুদ্ধদেবের মহানির্বাণ-লাভের ক্ষেত্র—কুশীনগর। তাঁহার মহানির্বাণ-লাভের পূর্ববর্তী কালে, পাণা-নগরীতে মহাবীর স্বামী মহানির্বাণ-লাভ করেন। বাহা হউক, এতাদৃশ ব্যবধান সত্ত্বেও, আজিও জৈন ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক-সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা অনেকের অন্তর হইতে অন্তর্হিত নহে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতাস্তরের অবধি নাই। তাঁহাদের কাহারও মতে,—‘বৌদ্ধধর্ম হইতে জৈন-ধর্মের উৎপত্তি’; কেহ আবার বলেন,—‘জৈনধর্মই বৌদ্ধধর্মের আদিমূর্তি’। * আমরা কিন্তু কে আদি বা কে প্রধান, তাহা বলিতে চাহি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ দুই ধর্মের অভ্যুদয়েই ভারতের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, এবং ঐ দুই ধর্মই সনাতন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-রূপ কলবৃক্ষের দুইটা প্রধান কাণ্ডস্থানীয়।

মহাবীর-সম্বন্ধে অন্যান্য কথা।

মহাবীর স্বামী সম্বন্ধে আর আর বক্তব্যের মধ্যে তাঁহার জন্মস্থান ও পিতৃ-পরিচয়াদি বিষয়ে সাধারণতঃ যে সকল বাদানুবাদ উপস্থিত হয়, উপসংহারে তৎপ্রসঙ্গ একটু আলোচনা করা যাইতেছে। কি ষেতাধর, কি দিগধর, উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত কুন্দগ্রাম ও সিদ্ধার্থ-বিষয়ে। জৈনগণ মহাবীর স্বামীকে রাজা সিদ্ধার্থের পুত্র বলিয়া নির্দেশ করেন। তাঁহাদের মতে,—‘সিদ্ধার্থ কুন্দনপুরের (কুন্দগ্রামের) অধিতপ্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন। কুন্দনগ্রাম রাজধানী—সুবৃহৎ নগর-মধ্যে গণ্য ছিল।’ জৈন-সাধারণের ইহাই বিশ্বাস। কিন্তু সিদ্ধার্থ ও কুন্দনগ্রাম সম্বন্ধে জৈনগণের ঐ

* ইউরোপের দুইজন অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত এইরূপ দুই মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রোফেসর ওয়েবারের মত এই যে,—জৈন-সম্প্রদায় হইতেই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি; He regards “the Gains merely as one of the oldest sects of Buddhism.” প্রোফেসর লাসেন বলেন এই যে,—বৌদ্ধধর্ম হইতেই জৈনধর্মের উৎপত্তি; “The Gains have branched off from the Buddhas.”—Compare Professor Weber, *Indische Studien*, XVI, ২১০ and Professor Lassen, *Indische Alterthumskunde*, IV, ৭৬.

উক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া জ্যাকোবি প্রভৃতি অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যে, কপিলাবস্ত্র ও শুদ্ধোদন সম্বন্ধে বৌদ্ধগণের উক্তি বেরূপ অতিরঞ্জিত, এ উক্তিও তদ্রূপ অতিরঞ্জিত। কিবা শুদ্ধোদন, কিবা এই সিদ্ধার্থ—ইহারা কেহই প্রকৃতপক্ষে নৃপতি-পদবাচ্য ছিলেন না। ক্ষুদ্র জায়গীরদার বা ভূস্বামী মধ্যে তাঁহাদিগকে গণনা করা যাইতে পারে মাত্র। এ পক্ষের যুক্তি এই যে, আচার্য্য-সূত্রে কুন্দন-গ্রামকে “সন্নিবেশ” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। টীকাকারগণ ‘সন্নিবেশ’ শব্দে ‘বণিকগণের বিশ্রামস্থান’ বা ‘চটি’ অর্থ নির্দেশ করেন। অপিচ, আচার্য্য-সূত্রের (দ্বিতীয় শ্রুতস্কন্ধ, পঞ্চদশ অধ্যায়ন) বর্ণনাক্রমে ঐ গ্রামকে বিদেহ-রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ঐ গ্রামের বিষয়ে আরও যে উক্তি পরিদৃষ্ট হয়, তাহাতেও মহাবীরের জন্মস্থান সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই দৃঢ় হইয়া আসে। বৌদ্ধধর্ম-গ্রন্থ ‘মহাবগ্গে’ লিখিত আছে,—বুদ্ধদেব কিছুকাল কোটি-গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গণিকা অম্বাপালী এবং বৈশালী রাজধানীর লিচ্ছবীগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ঐ স্থলে আরও লিখিত আছে,—সেই কোটি-গ্রাম (কটিগাম) হইতে তিনি ঐতিহ্যগণের (গাতিক, জাতক প্রভৃতি রূপেও ঐ শব্দ লিখিত হয়) বাসস্থানে গমন করেন। সেখানে কিছু কাল ঐতিহ্যগণের ইষ্টক-নির্মিত ভবনে বুদ্ধদেব বসতি করিয়াছিলেন বলিয়াও উল্লেখ দেখা যায়। ঐতিহ্যগণের সেই বাসস্থানের অনতিদূরে গণিকা অম্বাপালীর একটা প্রমোদোদ্যান ছিল। সেই উদ্যান ‘অম্বাপালী ঘন’ নামে অভিহিত হয়। বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের উদ্দেশে অম্বাপালী ঐ উদ্যান উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সেই উদ্যান হইতে যাত্রা করিয়া বুদ্ধদেব বৈশালী-নগরে গমন করেন। সেখানে লিচ্ছবীগণের সেনাপতি তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ লিচ্ছবী-সেনাপতি প্রথমে নিগ্রহগণের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার বৌদ্ধধর্ম-গ্রহণ উপলক্ষেই তাঁহার বিষয় মহাবগ্গে উল্লিখিত হয়। যাহা হউক, এই বর্ণনা হইতে বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত কোটিগ্রামকে জৈনশাস্ত্রোক্ত কুন্দগ্রাম (কুন্দনগ্রাম) বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। নামের সাদৃশ্য তিন্ন ঐতিহ্য-গণের উল্লেখ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন নহে বলিয়াই মনে হইতে পারে। মহাবীর যে সম্রাটের জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার ঐতিহ্য-কল্পিত বলিয়া পরিচিত। সুতরাং কোটিগ্রামে বুদ্ধদেবের অবস্থান-কালে ঐতিহ্যগণের উল্লেখ, কোটিগ্রামে ও কুন্দগ্রামে অভিন্ন উপলব্ধি হয়। কুন্দগ্রাম যে বিদেহ-রাজ্যের রাজধানী বৈশালী-নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল, এতদ্বারা তাহাও সপ্রমাণ হইতে পারে। সূত্রকৃত্যে (প্রথম শ্রুতস্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়ন) মহাবীর স্বামীকে বৈশালী বা বৈশালী বা বৈশালিক বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। “বৈশালিক” শব্দ সাধারণতঃ বৈশালীর অধিবাসী অর্থই স্মৃতি করে। কুন্দগ্রাম—বৈশালীর সহরতলী মধ্যে পরিগণিত ছিল; আর সেই জন্তই মহাবীর স্বামী “বৈশালিক” নামে পরিচিত হইতেন,—ইহাই অনেকের অভিমত। এইরূপে বুঝিতে পারা যায়, বৈশালীর অধিপতি প্রকৃতপক্ষে দেশের রাজা ছিলেন; কুন্দগ্রামের সিদ্ধার্থ তাঁহার একজন সর্দার বা তাঁহার অধীন ভূস্বামী মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে আরও একটা কারণ নির্দিষ্ট হয়। সিদ্ধার্থের পত্নী ত্রিশলা কখনও রাণী বা মহারাণী বলিয়া উল্লিখিত হন

আই। প্রধানতঃ কজিরাণী নামেই তাঁহাকে পরিচিত হইতে দেখা যায়। ঐতিহাসিক কজিরাগণের উল্লেখে তাঁহাদিগকে কোথাও ‘সিদ্ধার্থের সামন্ত’ বলিয়াও অভিহিত করা হয় নাই। তাঁহার সকলেই সিদ্ধার্থের সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ, সিদ্ধার্থ রাজাও ছিলেন না, অথবা আপন সম্প্রদায়ের দলপতিও ছিলেন না ;—ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। তবে তাঁহার অনেকটা প্রতিপত্তি ছিল নিশ্চয়ই। বিবাহ-সূত্রে তিনি রাজসংসারের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। তাঁহার পত্নী ত্রিশলা—বৈশালীর রাজা চটকের ভগ্নী বলিয়া অভিহিত হন। তিনি বৈদেহী বা বিদেহদত্তা নামেও পরিচিতা। বিদেহ-রাজবংশে জন্মগ্রহণ-হেতু ত্রিশলা ঐ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের ধর্মগ্রন্থে কিন্তু চটক বৈশালীর রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে,—‘বৈশালীতে তৎকালে এক অভিনব শাসনতন্ত্র-প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন একটা সদস্ত-সভার মতে রাজকার্য্য পরিচালিত হইত, এবং রাজা সেই সদস্ত-সভার সভাপতি মধ্যে গণ্য ছিলেন। সেই সদস্ত সভার গঠন-ক্রমে রাজা, রাজপ্রতিনিধি এবং সেনাপতি প্রভৃতির মধ্যে রাজ্যশাসন-ক্ষমতা বিভক্ত ছিল। সদস্ত-সভার মত লইয়া রাজকার্য্য নির্বাহিত হইত।’ ঐ সময়ে ভারবর্ষে যে অভিনব সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, পারিপার্শ্বিক লিচ্ছবীরাজ্যের বিধি-বিধান অনুসন্ধান করিলেও তাহা উপলব্ধ হইতে পারে। জৈনগণের “নিরুণাবলি সূত্রে” লিখিত আছে যে, চম্পার রাজা কুণিক (অজাতশত্রু) একসময়ে রাজা চটকের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্ত সৈন্ত-সমাবেশ করেন। চটক সেই সময়ে কাশী-কোশল প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ রাজগণকে এবং লিচ্ছবীগণকে ও মল্লকী-গণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কুণিকের দাবী পূরণ করা হইবে, কি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে,—তদ্বিষয়ে মীমাংসার জন্তই সকলকে লইয়া ঐ পরামর্শ-সভা আহত হয়। জৈন-গ্রন্থের এই বর্ণনায়, ঐ সময়ে “সামন্ত-প্রথা” প্রবর্তিত ছিল বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। তদনুসারে আরও বুঝা যায়, চটক প্রধান নৃপতি মধ্যে গণ্য ছিলেন, এবং আমন্ত্রিতগণ সামন্তরাজ-পর্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন। তবে একটা বিষয়ে সে সম্বন্ধে সংশয় আনয়ন করে। মহাবীর স্বামীর নির্বাণ-লাভের পর তাঁহার স্মৃতি-সম্মানের জন্ত পরস্পর সন্ধিবদ্ধ অষ্টাদশ রাজ্যের অধিপতি মিলিত হইয়া যখন উৎসব-সমারোহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; সে ক্ষেত্রে বিশেষভাবে চটকের কোনও উল্লেখ নাই। তিনি যদি সামন্ত-রাজগণের প্রধান-স্থানীয় হইতেন, তাহা হইলে সেস্থলে বিশিষ্ট-ভাবে তাঁহার উল্লেখ থাকিত। অতএব, সন্ধি-বদ্ধ রাজগণের মধ্যে “চটক” একজন সাধারণ রাজা মাত্র ছিলেন মনে করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ, বৈশালী-রাজ্যে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত হওয়ায় তাঁহার ক্ষমতা অনেকটা খর্ব হইয়া আসিয়াছিল বলিয়াও মনে হয়। বৌদ্ধগ্রন্থে চটকের বিশেষ উল্লেখ কিছুই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু জৈনগ্রন্থে তাঁহার বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই। বৈশালী জৈনধর্মের কেন্দ্রস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধগণ ঐ স্থানকে নাস্তিক-গণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বৌদ্ধগণ তাঁহাদের বিষয় উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, সার্কসভোম সম্রাটের পুত্র না হইলেও অথবা কোনও স্বাধীন নৃপতির সন্তান বলিয়া পরিচিত না হইলেও, তৎকালিক বিশিষ্ট রাজবংশের সহিত মহাবীর স্বামী যে সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে

কোনও সংশয় থাকিতে পারে না । অপিচ, তিনি যে ভোগ-বিলাস ও রাজ্যার্থ্য্য অবহেলায় ভাগ্য করিয়া, নৈষ্কর্ষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন, তদ্বিষয়েও কোনও মতান্তর ঘটিতে পারে না ।

মহাবীর স্বামীর জীবনে ত্যাগ-স্বীকারের, নিলিপ্ত ভাবের এবং সমদৃষ্টির যে উজ্জল আদর্শ দেখিতে পাই, উপসংহারে তদ্বিষয়ে দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি । সম্মান-

মহাবীরের
ত্যাগ ।
আশ্রম গ্রহণ করিয়া মহাবীর স্বামী প্রায় এক বৎসর এক মাস কাল এক-
বস্ত্রে দিনযাপন করিয়াছিলেন । শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার অভিধাত তাহারই

উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল । এক দিন সেই বস্ত্রখানির প্রতিও এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের দৃষ্টি পড়িল । প্রভু যখন সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করেন, তিনি যখন দুই হস্তে অকাতরে আপনায় অতুল ধন-সম্পৎ সকলই বিতরণ করিয়া ফেলেন ; ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তখন স্থানান্তরে ছিলেন ; স্মৃতরাং প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা-প্রার্থনায় তাঁহার স্মরণ ঘটে নাই । পরিশেষে, ব্রাহ্মণ যখন বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, মহাবীর স্বামীর অলৌকিক দান-মাহাত্ম্যের বিষয় যখন লোকমুখে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল ; তখন, ব্রাহ্মণের গৃহিণী পতিকে অস্বাভাবিক করিয়া কহিলেন,—“তুমি হেলায় রত হারাইয়াছ । যদি এখনও পার, তাঁহার অনুসরণ কর । এখনও কিছু-না-কিছু পাইলেও পাইতে পার ।” পত্নীর নির্বন্ধাতিশয়ো ব্রাহ্মণের প্রাণে উৎসাহের সঞ্চার হয় । মহাবীর স্বামী কোন্ বনে কোথায় অবস্থিত করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধানে ব্রাহ্মণ বহির্গত হন । যেদিন মহাবীর স্বামীর সহিত ব্রাহ্মণের প্রথম সাক্ষাৎ হইল, সেদিন প্রভুর আর কোনও সম্বলই ছিল না,—পরিধানে সেই বস্ত্রখানি মাত্র ছিল । প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মণ কাতর-কণ্ঠে যখন ভিক্ষাপ্রার্থী হইলেন, প্রভু আপন পরিধেয় বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন । ব্রাহ্মণ কিন্তু সেই বস্ত্রাংশ গ্রহণ করিয়াও পুনরপি প্রভুর পশ্চাদানুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন । প্রভু এই সময় পদব্রজে একটি নদী পার হইতেছিলেন । সেই নদীগর্ভে এক-খণ্ড কাষ্ঠ ভাসমান ছিল । প্রভুর পরিহিত অর্দ্ধখণ্ড বস্ত্র সেই কাষ্ঠে সংলগ্ন হইয়া অঙ্গস্থলিত হইল । যে আপনি চলিয়া গেল, তাহার প্রতি আর কেন মায়া করি ? যে আপনি নিলিপ্ত করিল, কেন আর তাহাতে লিপ্ত হইতে চাই ? প্রভু সে বস্ত্রখণ্ডের প্রতি আর ফিরিয়া চাহিলেন না । তিনি যেমন এক মনে পথ চলিতেছিলেন, তেমনই চলিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মণ তখন সে অর্দ্ধখণ্ড বস্ত্রও কুড়াইয়া লইলেন । অতঃপর, নগ্নদেহে মহাবীর স্বামী যখন পরিলক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার কি অলৌকিক পুণ্য-প্রভা—কেহই তাঁহাকে উলঙ্গ দেখিতে পাইল না ! নিষ্কাম-নিলিপ্ত মহাপুরুষগণের নগ্নদেহই বা কি, আর আবৃত-দেহই বা কি ! তাঁহাদের তেজঃপ্রভার উভয় অবস্থাই সমান । যাহা হউক, প্রভুর পরিত্যক্ত সেই ছিন্ন বস্ত্র দুইখণ্ড লইয়া ব্রাহ্মণ যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহার আর ঐশ্বর্য্যের অবধি রহিল না । দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেই ছিন্ন বস্ত্র দুই খণ্ডের বিনিময়ে কোনও এক ভক্ত শ্রেষ্ঠীর নিকট হইতে আড়াই লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন । বিষয়ী সংসারী বুঝিল—মহাবীর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রাহ্মণ বড় একটা ‘দাঁও’ মারিয়া বসিয়াছে ; আর ভক্ত ভাবুক জন বুঝিলেন—ব্রাহ্মণ নখর বিস্তার লোভে প্রভুর সংসর্গ-রূপ অবিদ্যার রত্ন হারাইয়াছে ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

জিনগণ ।

[অষ্টাশ্র জিন ও তীর্থররগণ,—পার্শ্বনাথ ;—অরিষ্টনেমী ;—ঋষভদেব ;—শ্রীমন্তাগবতের বর্ণিত ভগবান্ ঋষভদেবের সহিত আদি-তীর্থরর ঋষভদেবের সাদৃশ্য-ভব ;—জৈনশাস্ত্রের ও ভাগবতের বর্ণনা ;—মহাবীরের পরবর্তী ঋগ্বেদ-সঙ্কলনের সময় পর্য্যন্ত কালের হুবিরগণের নাম-পরিচয় ;—উপসংহার ।]

জৈনধর্মের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, উহার প্রাণভূত জিনগণের প্রসঙ্গ মানসপটে স্বতঃ-প্রকটিত হয়। মনে পড়ে—পার্শ্বদেবের কথা ; মনে পড়ে—অরিষ্টনেমীর ইতিহাস ; মনে পড়ে—তৎপূর্ববর্তী বিংশতি তীর্থররের বিষয় ; মনে পার্শ্বনাথ । পড়ে—তাঁহাদের সকলের আদিভূত ঋষভদেবের জীবনবৃত্ত। মহাবীরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী জিন—‘অর্হৎ পার্শ্ব’ বা ‘পার্শ্বনাথ’ নামে প্রখ্যাত। সকল জিনগণেরই জীবনবৃত্তান্ত সাধারণতঃ একই উপাদানে নির্মিত। জন্মকাল বা জন্ম-নক্ষত্র বিভিন্ন হইলেও, জন্মগ্রহণ-প্রণালী ও কার্য্য-পরম্পরায় তাঁহাদিগকে একই ছাঁচে বিগঠিত দেখি। প্রত্যেকেরই জীবন-নাট্য কয়েকটি নির্দিষ্ট অঙ্কে বিভক্ত। তাহার এক এক অঙ্কে তাঁহারা এক এক অবস্থায় উন্নীত হইয়া পরিশেষে চরম মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পার্শ্বদেবের জীবনের পাঁচটি শুভ মুহূর্ত্তে চন্দ্রের সহিত বিশাখা নক্ষত্রের সংক্রমণ ঘটিয়াছিল। তিনি দেবগণের দশম বাসস্থান প্রাণতক্ল হইতে অবতরণ করেন। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষ-খণ্ডে বারাণসী-ধামে তিনি অবতীর্ণ হন। তাঁহার পিতার নাম—রাজা অশ্বসেন ; জননীর নাম—রানী বামা। গ্রীষ্মকালে চৈত্র মাসে চতুর্থ দিবসে কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে বিশাখা-নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের সংক্রমণ-কালে তিনি জ্রণ অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাহার নয় মাস সাড়ে সাত দিবস পরে পৌষ মাসের দশম দিবসে তাঁহার জন্ম হয়। জন্মের পর, লোকান্তিক দেবগণ আসিয়া তাঁহার স্তুতিগান করেন। মহাবীর স্বামীর জীবনবৃত্তে তাঁহার যেমন গৃহধর্ম্ম ত্যাগস্বীকার প্রভৃতির পরিচয় পাইয়াছি, পার্শ্বদেবের জীবনেও সে পরিচয় সেইরূপ ভাবেই পরিদৃশ্যমান। পৌষ মাসের একাদশ দিবসে, ‘বিশাখা’ নামক যানে আরোহণ করিয়া, আত্মীয়-অন্তরঙ্গ ও দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া, তিনি ‘আশ্রমপদ’ উদ্ভানে গমন করেন ; এবং সেখানে শ্রেষ্ঠ অশোক-তরুমূলে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেন। সাড়ে তিন দিবস নিরঞ্জন উপবাসী থাকিয়া তিনি সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিন শত সহস্র তাঁহার অনুগমন করেন। ৮৩ তিরাণী দিবস কাল শীতোষ্ণাদি সহ্য করিয়া, সর্ব্ববিধ প্রাণীর অত্যাচারে অবহেলা করিয়া, তিনি জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। পরবর্তী ৮৩ দিবস বাক্-সংযম কার-সংযম প্রভৃতি সংযম-সাধনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অতিবাহিত হয়। ৩১৭ পরে চতুর্দশ অশীতিতম দিবসে, চৈত্র মাসের চতুর্থ দিবসে, বিশাখা-নক্ষত্রের

সংক্রমণ-কালে তিনি কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হন। অর্হৎ পার্শ্বদেবের অষ্ট গণ এবং অষ্ট গণধর ছিলেন। তাঁহাদের নাম,—শুভ, আৰ্য্যঘোষ, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মচারী, সোম্য, ক্রীধর, বীরভদ্র, যশ। পার্শ্বদেবের সময়ে জৈন-সম্প্রদায়ের যে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে বুঝিতে পারি, তখন, আরিয়া-দিগ (আৰ্য্যদত্ত) নামক আচার্য্যের অধীনে ষোল হাজার শ্রমণ ছিলেন; পুষ্পকুলার অধিনায়িকাতে আটত্রিশ হাজার সাধবী জৈনধর্ম পালন করিতেছিলেন; স্ত্রবতেষ অধীনে এক লক্ষ ষাট হাজার গৃহী এবং সুনন্দার অধীনে তিন লক্ষ সাতাশ হাজার সংসারী জী-জৈনধর্ম দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এইরূপ, আরও বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন স্তরের জৈনগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; যথা,—অবধি-জ্ঞানসম্পন্ন চৌদ্দ হাজার জ্ঞানী, কেবলী-জ্ঞানসম্পন্ন এক হাজার জ্ঞানী, ইত্যাদি। পার্শ্বদেবের আয়ুঃকাল শতবর্ষ। তন্মধ্যে ত্রিশ বৎসর গৃহবাস, তিরানী দিবস দীক্ষার অবস্থা, অনধিক সত্তর বৎসর কেবলী এবং পূর্ণ সত্তর বৎসর শ্রমণ অবস্থা। তাঁহার সকল কর্ম ক্ষয় হইলে, অবসর্পিণী কালের হ্রঃসম-সুসমা কালাংশ অতীত হইলে, শ্রাবণ মাসের অষ্টম দিবসে, চন্দ্রের সহিত বিশাখা নক্ষত্রের সংক্রমণ সময়ে, তিনি মহানির্বাণ লাভ করেন। পূর্ববর্তী এক মাস কাল সম্মত-গিরিশিখরে নির্জল উপবাসী অবস্থায় তিনি সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন।

পার্শ্বদেবের পূর্ববর্তী জিন ও তীর্থঙ্কর ‘অর্হৎ অরিষ্টনেমী’ নামে অভিহিত হন। রাজ্য সমৃদ্ধ-বিজয় এবং রাণী শিবা তাঁহার পিতামাতা বলিয়া পরিচিত। শোরিপুত্র-নগর তাঁহার জন্মস্থান। যে যানে শোভাযাত্রা করিয়া তিনি সংসার-তাগ অরিষ্টনেমী। উদ্দেশ্যে গমন করেন, তাহার নাম—উত্তরপুরা। দ্বারাবতী নগরীর রেবতীকা উদ্যানে অশোক-তরুতলে তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। গির্গার-পর্বতে বেতস-তরু-তলে সাড়ে তিন দিবস কাল নির্জল উপবাসে সাধনায় মগ্ন থাকিয়া তিনি কেবল-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টাদশ গণ ও গণধর ছিল। অরিষ্টনেমীর অমুবর্তী জৈনগণের পরিচয়ে লিখিত আছে যে,—তখন বরদত্ত নামক আচার্য্যের অধীনে আঠার হাজার শ্রমণ, আৰ্য্য-যজ্ঞিনীর অধিনায়িকাতে চত্রিশ হাজার সাধবী, নন্দন অধিনায়কতে এক লক্ষ ঊনসত্তর হাজার গৃহস্থ এবং মহাস্ত্রবতার অধিনায়িকাতে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার গৃহস্থ-স্ত্রীলোক জৈনধর্ম পালন করিয়া আসিতেছিলেন। তখন, পূর্ব-শাক্ত জ্ঞানীর সংখ্যা চারি শত, অবধি-জ্ঞানে জ্ঞানীর সংখ্যা পনের শত ইত্যাদি রূপ জৈনধর্মাবলি-গণের সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। অরিষ্টনেমীর আয়ুঃকাল সহস্র বৎসর বলিয়া কথিত হয়। তাহার মধ্যে তিনি তিন শত বৎসর যুবরাজ-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; চুয়ান্ন দিন তাঁহার দীক্ষা-অবস্থায় কাটিয়াছিল। পূর্ণ সাত শত বৎসর তিনি শ্রমণ-পদাতিবিক্ত ছিলেন; তাহার মধ্যে দীক্ষার কয়েক দিন ভিন্ন অন্য সময় তাঁহার কেবলী-অবস্থা বলিয়া কথিত হয়। অবসর্পিণী কালে হ্রঃসম-সুসমা কালাংশের অধিক ভাগ অতীত হইলে, আষাঢ় মাসের অষ্টম দিবসে তাঁহার পুনর্নির্বাণ লাভ হয়। গির্গার গিরিশিখরে এক মাস কাল নির্জল উপবাস অবস্থায় সাধনায় যাপন করিয়া, চন্দ্রের সহিত চিত্রা নক্ষত্রের সংক্রমণকালে তিনি মহানির্বাণ লাভ করেন।

তীর্থঙ্কর মধ্যে পরিগণিত। তৎপূর্ববর্তী একবিংশ তীর্থঙ্কর নমি বা নমিনাথ নামে অভিহিত হন। কল্পহ্রদ যে সময়ে লিপিবদ্ধ * হইয়াছিল, তাহার ৫,৮৪,৯৭৯ বৎসর পূর্বে অর্হৎ নমিনাথ মহানির্কাণ লাভ করেন; তৎপূর্ববর্তী বিংশতিতম তীর্থঙ্কর—মুনিমুত্রত। তাঁহার মহানির্কাণ লাভ ১১, ৮৪, ৯৮০ বর্ষ পূর্বে ঘটয়াছিল। ঊনবিংশতিতম তীর্থঙ্কর—মল্লিনা, ৫৫,৮৪,৯৮০ বর্ষ পূর্বে মহানির্কাণ লাভ করেন। অষ্টাবিংশতি তীর্থঙ্কর অরনাথ, মল্লিনাথের কোটা বৎসর পূর্বে মহানির্কাণ লাভ করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর-গণের কাল-পরিমাণ নির্ণয় করা অধুনা অসাধ্য বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। অরনাথের পূর্ববর্তী সপ্তদশ তীর্থঙ্কর কুহুনাথের মহানির্কাণ-লাভ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি মল্লিনাথের পূর্ববর্তী চতুর্থাংশ পলিয়পমকালে মহানির্কাণ লাভ করেন। তৎপূর্ববর্তী ষোড়শ তীর্থঙ্কর শাস্তিনাথ পলিয়পম-কালের তিন অংশ, পঞ্চদশ তীর্থঙ্কর ধর্ম্মনাথ তিন সাগরোপম পূর্বে (মল্লিনাথের), চতুর্দশ তীর্থঙ্কর অনন্তনাথ সাত সাগরোপম কাল পূর্বে (মল্লিনাথের), মহানির্কাণ লাভ করিয়াছিলেন। এই পলিয়পম ও সাগরোপম কালের পরিমাণ সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। সুতরাং মল্লিনাথের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্করগণের মহানির্কাণের কাল-নির্ণয় গণনাক্ষের সীমায় নির্দেশ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। অতএব, আমরা (১৩) বিমলনাথ, (১২) বাসুপুজ্য, (১১) শ্রেয়াংশনাথ, (১০) শীতলনাথ, (৯) সুবিধিনাথ বা পুষ্পদন্ত, (৮) চন্দ্রপ্রভ, (৭) সুপার্ব, (৬) পদ্মপ্রভ, (৫) জুমতিনাথ, (৪) অভিনন্দ, (৩) সম্ভবনাথ, (২) অজিতনাথ, (১) ঋষভদেব—ইহাদের কাল-নির্ণয়ে বৃথা চেষ্টায় বিরত রহিলাম।

প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব সম্বন্ধে এবং অত্রাণ্ড তীর্থঙ্করের বিষয়েও পূর্বে আমরা সামান্যরূপ আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান অবসর্পিণী কালের তীর্থঙ্করগণের মধ্যে ঋষভদেব আদিভূত। চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর জীবন-বৃত্ত যে ভাবে ঋষভদেব। এবং যেরূপ ভাগে বিভক্ত, ইহার জীবনবৃত্তান্তও অনেকাংশে সেইরূপ বিভাগে বিভাগীকৃত। ইহার জীবনের প্রথম প্রধান চারি মুহূর্ত্ত চন্দ্রের সহিত উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের এবং পঞ্চম মুহূর্ত্ত অভিজিৎ নক্ষত্রের সংক্রমণকালে উপস্থিত হইয়াছিল। সর্কার্থসিদ্ধ নামক বিমানে তেত্রিশ সাগরোপম কাল অবস্থিতির পর, আষাঢ় মাসের চতুর্থ দিবসে, ভারতবর্ষের ইক্ষুকু-ভূমিতে ইনি আবির্ভূত হন। কুলকর নাভির ওরসে মরুদেবীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষুকুভূমি কোশলরাজ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। সেইজন্য ঋষভদেব কোশালী নামেও অভিহিত হন। ঋষভদেবের এবং মহাবীরের জন্মকালের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মহাবীরের জননী প্রথম স্বপ্নে ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু ঋষভদেবের জননী মরুদেবী প্রথম স্বপ্নে হতী দর্শন করেন। পতির নিকট জিশলা স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবৃত করিলে, দেবগণের দ্বারা তাহার ফলাফল নির্ণীত হইয়াছিল। কিন্তু মরুদেবীর স্বপ্নবৃত্তান্তের ফলাফলের বিষয় তাহার পতি নাভি বিবৃত করেন। ঋষভদেব কাম্পপগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীরও কাম্প-গোত্রজ

* এই খণ্ডের ৩৮ পৃষ্ঠায় সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হওয়ার কালবিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি গর্ত্ত হইতে গর্ত্তান্তরে সঞ্চালিত হওয়ার, তাঁহার গোত্র-সম্বন্ধ কাহারও কাহারও বিভ্রম উপস্থিত হয়। ঋষভদেব পাঁচ নামে পরিচিত;—ঋষভ, প্রথম রাজা, প্রথম ভিক্ষু, প্রথম জিন, প্রথম তীর্থঙ্কর। কিন্তু মহাবীরের তিনটা প্রধান নাম। অর্হৎ ঋষভ—বুদ্ধিমান, উত্তমশীল, অতিসুন্দর, সংযমী, অদৃষ্টবান্ ও নম্র ছিলেন। সে পক্ষে তাঁহার সহিত মহাবীরের সাদৃশ্যের অসম্ভাব নাই। ঋষভদেব কুড়ি লক্ষ বৎসর যুবরাজ-পদে এবং তেঘটি লক্ষ বৎসর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে জনসাধারণের সুশিক্ষা-বিধানের ও উপকার-সাধনের জন্ত তিনি বিশেষরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে দ্বিসপ্ততি বিজ্ঞান স্মৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার মধ্যে গণিতবিজ্ঞান, ভবিষ্যজ্ঞান, নারীজাতির শিক্ষণীয় চতুষষ্টি (নৃত্যগীতাদি) বিজ্ঞা, শতবিধ শিল্প এবং পুরুষজাতির প্রতাপাল্য ত্রিবিধ বৃত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফলতঃ, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি পর্যায়ে তখন অশেষ প্রকার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ঋষভদেবের শত পুত্র; তিনি সেই পুত্র-শতককে দীক্ষা-দানান্তর এক এক রাজ্য প্রদান করেন। পরিশেষে সুদর্শন নামক যানে আরোহণ-পূর্ব্বক, দেবগণে মনুষ্যগণে ও অসুরগণে পরিবৃত্ত হইয়া, তিনি সন্ন্যাস-অবলম্বনার্থ যাত্রা করেন। বিনীতা-নগরীতে সিদ্ধার্থ-বন নামক উদ্ভানে অশোক-তরুতলে চক্রে সহিত আবাচা নক্ষত্রের সংক্রমণ-কালে তিনি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। আড়াই দিবস নির্জল উপবাসী থাকিয়া, চারি সহস্র উচ্চপদস্থ সম্রাট রাজ-বংশীয় ব্যক্তির ও স্ত্রীপুত্রগণের সহিত, কেশপাশ ছিন্ন করিয়া, তিনি সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করেন। পরিশেষে, যথারীতি কেবলী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, যথাকালে তিনি মহানির্বাণ লাভ করেন। তাঁহার আয়ুঃকাল চুরাশী লক্ষ বৎসর নির্দিষ্ট হয়। সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সাড়ে ছয় দিন কাল নির্জল উপবাসী অবস্থায় সাধনা-মগ্ন থাকিয়া, তিনি মহানির্বাণ লাভ করেন। ঋষভদেবের গণ ও গণধরগণ সংখ্যায় চুরাশী জন। তাঁহার শিষ্য-সেবক-গণের মধ্যে আচার্য্য ঋষভসেনের অধিনায়কত্বে চুরাশী হাজার শ্রমণ, সাধবী ব্রাহ্মীসুন্দরীর অধিনায়িকাত্বে তিন লক্ষ সাধবী ছিলেন। সংসারী পুরুষের মধ্যে সাড়ে তিন লক্ষ পুরুষ শ্রম্যাংশের অধীনে, এবং পঞ্চাল লক্ষ চারি হাজার স্ত্রীলোক স্তম্ভতার অধিনায়িকাত্বে পরিচালিত হইতেন। পুষ্কাদি শাস্ত্রাভিজ্ঞ, অবধি-জ্ঞান-সম্পন্ন এবং কেবলী প্রভৃতির সংখ্যাও তাঁহার সম্প্রদায়ে অনেক ছিল। অষ্টপাদ পূর্ব্বতশিখরে দশ সহস্র সন্ন্যাসী পরিবেষ্টিত হইয়া, ‘সম্পর্ধ্যাক্ষ’ যোগাসনে বসিয়া, ভগবান ঋষভদেব মুক্তিলাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলিয়া যে ঋষভদেবের উল্লেখ আছে, তাঁহার সহিত জৈন-শাস্ত্রোক্ত এই ঋষভদেবের অভিন্নত্ব পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন।

জৈনশাস্ত্রের বর্ণনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনার অশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। তীর্থঙ্কর ঋষভদেব যেরূপভাবে স্তরে স্তরে মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন; জৈন-সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ মুক্তিলাভের পথে সোপান-পদম্পরা দৃষ্ট হয়; জৈনশাস্ত্র-অনুসারে জিনপদে উন্নীত হইবার পথে যে অশেষ বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রমের ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার আবশ্যক হয়; ঋষভদেবের ও মহাবীর প্রভৃতির জীবনবৃত্তে যেরূপ কঠোর সন্ন্যাস-গ্রহণের এবং পবিত্র পরমার্থতত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবতে
ঋষভদেব।

পাই ; শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেবের চরিত্রে সেই আদর্শ পরিদৃশ্যমান। পুত্রগণের উপর রাজাভাৱ জ্ঞাত করিয়া ঋষভদেব কি কঠোর সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় ;—“ঋষভদেব স্বয়ং উপশমশীল উপরতকর্ম্ম মহামুনিদিগের ভক্তিজ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণ পারমহংসধর্ম্ম শিক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষায়, আপনার শ্রুতশ্রুতের মধ্যে সর্ব্বজ্যোষ্ঠ পরমভাগবত ভগবজ্জনপরায়ণ ভরতকে ধরণীমণ্ডল-পালনার্থ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে, শরীরমাত্র পরিগ্রহ হইয়া তিনি উন্মত্তের ত্রায় নগ্নবাসে ও বিমুক্তকেশে আবহনীঃ অগ্নি আপনাতেই রক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশ করিবার জ্ঞাত ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে তাঁহার সহিত কেহ কথা কহিতে গেলে, তিনি তাহাদের মধ্যে জড় মুক অন্ধ বধির পিশাচ অথবা উন্মত্তের ত্রায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না ;—তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া তৃষ্ণীস্তাব ছিলেন। তিনি পুর, গ্রাম, আকর, কৃষীল-গ্রাম, পুষ্পাদি বাটীকা, খর্কট, শিবির, গোস্থান, আভির-পল্লী, যাত্রিকদিগের সম্মিলন-স্থান, পর্ব্বত, বন এবং আশ্রম প্রভৃতি যে যে স্থানে গমন করেন, সেই সেই স্থানের পথে, মক্ষিকাগণ যেমন বজ্রগজকে বাস্ত করে, তদ্রূপ দুর্য্যাস সকলে তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন, তাড়ন, গায়ে প্রস্রাব ও শ্লেষ্মা পরিত্যাগ, প্রস্তর বিষ্ঠা ও ধূলি-প্রক্ষেপ, সম্মুখে অধোবায়ু ত্যাগ এবং ঘূর্কাক্য প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা নানা প্রকারে বাতিবাস্ত করিতে লাগিল। তিনি সেই সকলের প্রতি কিছুই জ্ঞান করিলেন না। মিথ্যাভূত এই সংসার নামে মাত্র সং ; ইহাতে সং ও অসতের অমৃতত্ব-স্বরূপ স্বীয় গহিমাৱ অবস্থান করিয়া তাঁহার ‘আমি আমার’ ইত্যাকার অভিমান দূরীভূত হইয়াছিল। যখন লোকসকল তাঁহার যোগানুষ্ঠানের প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিল, তখন তিনি উহার প্রতিকার করা নিতান্ত নিন্দনীয় বিবেচনা করিয়া আজগর ব্রত অবলম্বন করিলেন। তাহাতে একস্থানে অবস্থান করিয়া অশন, পান, চর্কণ ও মলমূত্র পরিত্যাগ-ক্রিয়া হইতে লাগিল। তিনি সময়ে সময়ে বিষ্ঠার উপর বিলুপ্তিত হইতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীরের স্থানে স্থানে বিষ্ঠা লিপ্ত হইল। ঐ বিষ্ঠায় হুর্গন্ধের লেশমাত্র ছিল না। যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত, খেচরঙ্গ, মনুষ্যবৎ, অন্তর্ধান, পরকার প্রবেশ এবং দূরদর্শন প্রভৃতি স্বয়ং আগত যোগৈশ্বর্য্য সকলে তাঁহার কিছুমাত্র আদর ছিল না। কি প্রকারে কলেবর ত্যাগ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার জ্ঞাত তিনি আপনার কলেবর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আত্মাতেই সাক্ষাৎ অবস্থিত পরমাত্মাকে আপনার সহিত অভেদভাবে দেখিয়া দেহাভিমান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ভগবান ঋষভদেব নিত্য-অমৃতভূত নিজ-স্বরূপ-লাভেই সমস্ত তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। দেহাদির জ্ঞাত স্বকাম কল্যাণ-বিষয়ে বাহাদের বুদ্ধি চিরশূণ্য ছিল, তিনি তাহাদিগকে করুণা করিয়া অভয়রূপ নিজলোক উপদেশ দিয়াছিলেন।” শ্রীমদ্ভাগবতের এই বর্ণনার সহিত মহাবীর স্বামীর ও ঋষভদেবের (মহাবীর স্বামীর আর ঋষভদেবেরই বা বলি কেন—সকল তীর্থঙ্করগণেরই) জীবনের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। কল্পসূত্রে বর্ণিত ঋষভদেবের চরিত্রে (২১২ম সূত্রে) এবং মহাবীর-চরিত্রে (১১৭ম সূত্রে) * অপিচ, আচারাজ্য সূত্রে

* ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সূত্রের সংখ্যা দেখিতে পাই।

(দ্বিতীয় শ্রুতসংকে, দ্বিতীয় অধ্যায়নের পঞ্চদশ সূত্রে) অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। যথা,-
অযতচরিত্রে ও মহাবীর-চরিত্রে, যথাক্রমে কল্পসূত্রে ও আচার্য্য-সূত্রে,—

“উসভে গং অরহা কোসলিএ এগং বাসসহস্ স নিচং বোসটুকাএ চিয়ত্তদেহে জে কেই
উবসগ্গা জাবং অপ্পাণং ভাবেমাণস্ ইকং বাসসহস্ সং বিইকং তং, তও গং জে সে হেমং-
ভাণং চ উথে মাসে সত্তমে পক্খে ফগ্গণবহুলে, তস্ গং ফগ্গণবহুলস্ ইকারসী-
পক্খেণং পুত্তরাহকালসময়ংসি পুরিমতালস্ নয়রস্ বহিআ সগড়মুহংসি উজ্জাণংসি
নগ্গোহবরপায়বস্ অহে অট্টমেনং ভত্তণং অপাণএণং আসাট্টিহিং নক্খত্তেণং জোংগ-
মুবাগএণং ফাণংতরিআএ বট্টমানস্ অণংতে জাবং জাণমাণে পাসেমাণে বিহরই ॥”

“তওগং সমণে ভগবং মহাবীরে বোসটুচত্তদেহে অন্তরেনং আলএণং, অন্তরেনং বিহা-
য়েণং, এবং সংজমেনং, পগ্গহেণং, সংবরেনং, ভবেণং, বভচেরবাসেনং থংভীএ, মোত্তীএ,
তুট্টিএ, সমিত্তীএ, শুত্তীএ, ঠাণেনং, কম্মেণং, সূচরিয়কলণেকাণমুক্তিমগ্গেণং অপ্পাণং
ভাবেমানে বিহরই। (১০২২) ; এবং বা বিহরমাণস্ জে কেই উবসগ্গা সমুপ্প-
জ্জিঃসু—দিব্বা বা, মাণুসা বা, তেরিচ্ছিয়া বা, তে সৰ্বে উপসগ্গে সমুপ্পে সমাণে,
অনাইলে, অবহিতে, অদীণমাণসে তিবিহ মণবয়ণকায়ন্তে সন্ম সহই থমই তিতিক্খই
অহিঃসেই ।” (১০২৩) । আচার্য্য-সূত্র, চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়নম্, তৃতীয়া চূণা ।”

“চত্তারী সাহি এমাসে, বহবে পানজাইয়া আগম্ম ;
অতিক্কম্ম কায়ং বিহারিংসু, আক্কহিয়া গং তথ হিংসিংসু ।
সংবচ্ছরং সাহিয়ং মাস, জং ন রিকাসি পথগং ভগবং ;
অচেলএ ততো চাঙ্গি, তং বোসজ্জ বখ-মণগারে ।”

(আচার্য্য-সূত্র, নবম অধ্যায়ন, প্রথম উদ্দেশ, তৃতীয়—চতুর্থ সূত্র ।) †

“ভণকাসে সীয়ফাসে, তেউকাসে য দংসমসগেয় ;
অহিয়াসএ সয়া সমিএ, ফাসাইং বিরুবক্ববাইং ।”

(আচার্য্য-সূত্র, নবম অধ্যায়ন, তৃতীয় উদ্দেশ, প্রথম সূত্র ।) ‡

* ঐ অংশের ইংরাজী মধ্ভাবাদ—“The Arhat Rishabha, the Kosalian, for one thousand years neglected his body, and abandoned the care of it ; he with equanimity bore, underwent, and suffered all pleasant and unpleasant occurrences arising from divine power, men or animals etc.”

† আচার্য্য-সূত্রে মহাবীর স্বামীর সহিষ্ণুতা বিষয়ক ঐ অংশের ইংরাজী অনুবাদ,—“More than four months many sorts of living beings gathered on his body, crawled about it and caused pain there. For a year and a month he did not leave off his robe, since that time the Venerable One, giving up his robe was a naked, world-relinquishing, houseless (sage). Without food he should lie down and bear the pains which attack him. When crawling animals or such as live on high or below, feed on his flesh and blood, he should neither kill them nor rub (the wound). Though these animals destroy the body he should not stir from his position.”

‡ “Always well-guarded, he bore the pains (caused by) grass, cold, fire, flies, and gnats, manifold pains.”

শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেবের পুত্রদিগের প্রতি যে উপদেশ দেখিতে পাই, সে উপদেশ জৈনশাস্ত্রের সারভূত। সংসার ত্যাগের পূর্বে ভগবান ঋষভদেব পুত্রদিগকে উপদেশ দিতেছেন;—“যাহারা নরলোকে জন্ম লইয়া মানব দেহ পাইয়াছে, তাহাদের ঐ দেহে বিষ্ঠাভোজী শূকরাদির ভোগ্য হুঃখদ বিষয় ভোগ করা কর্তব্য নহে। তপস্তা সার বস্তু। এই তপস্তার দ্বারা সন্তপিত হয়। তাহাতেই অনন্ত ব্রহ্মসুখ লাভ হইয়া থাকে। মহতের সেবা মুক্তির দ্বার এবং যোষিৎ সঙ্গীদিগের সঙ্গ সংসারের কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যাহারা সকলের সুহৃৎ, প্রশান্ত, অক্রোধ, সদাচারী এবং যাহারা সর্ব প্রাণীকেই সমান দেখেন, তাহাঁরাই মহৎ। আমি কৈশর। যাহারা আমাতে সৌহৃদ্য করিয়া তাহাঁই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করেন; যাহারা বিষয়াসক্ত ব্যক্তি ও পুত্র-কলত্র-ধন-মিত্রাদি-বিশিষ্ট গৃহে শ্রীতি-যুক্ত নহেন এবং যাহারা লোক-মধ্যে দেহযাত্রা নির্বাহোপযোগী অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের প্রয়াসী নহেন; তাহাঁরাই মহৎ। মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে ব্যাপ্ত হইলে প্রায়ই প্রমত্ত হইয়া বিরুদ্ধ কৰ্ম্ম করে। একবার বিরুদ্ধ কৰ্ম্ম করিয়া আত্মার এই ক্রেশকর দেহ উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমি ইহা ভাল বলিতে পারি না। লোকে যে পর্যাস্ত না আশ্রয়িত জানিতে চাহে, সে পর্যাস্ত তাহার নিকট অজ্ঞানকৃত আশ্রয়রূপের অভিভব হয়; যে পর্যাস্ত ক্রিয়া থাকে, সে পর্যাস্ত এই মনে কৰ্ম্ম স্বভাব প্রকাশ পায়;—ইহাই দেহবন্ধের কারণ। এই হেতু পূর্বকৃত কৰ্ম্মই মনকে পুনর্ব্বার কৰ্ম্মকরণে প্রবৃত্তি দেয় এবং আত্মা যতকাল অবিচ্ছিন্ন উপাধিযুক্ত থাকে, ততকাল মন পুরুষকে কৰ্ম্মবশ করিয়া রাখে। আমি বাসুদেব! লোকে যে পর্যাস্ত আমাতে শ্রীতি না করে, সে পর্যাস্ত দেহযোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। পুরুষ যতক্ষণ বিবেকী হইয়া ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টাকে অলীক বলিয়া না দেখে, ততক্ষণ তাহার স্বরূপের স্থিতি থাকে না; সুতরাং সেই মূঢ়, মিথুনসুখ-প্রাপক গৃহ প্রাপ্ত হইয়া ভোগ করিতে থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ, প্রত্যেকের জন্মাবধি এক একটা হৃদয়-গ্রন্থি আছে। পুরুষ, স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে, তাহাদের পরস্পরের আর একটা হৃদয়গ্রন্থি হয়। এই দুর্ভেদ্য হৃদয়-গ্রন্থি হইতে পুত্র, মিত্র, ক্ষেত্র, ধন ইত্যাদি বিষয়ে মোহ উৎপন্ন হয়। এই হেতু সংসারে স্ত্রীর সহিত মিলন সুখ-কারণ নহে, বরং ইহা মহামোহ উৎপাদন করিয়া আত্মাত্মিক হুঃখের কারণ হয়। তবে, কৰ্ম্মাসুবদ্ধ মনোরূপ দৃঢ় হৃদয়-গ্রন্থি সেই মিথুনীভাব হইতে শিথিল হইলে অর্থাৎ আমার অভিমুখীন হইলে, লোক সংসারের হেতুভূত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি ও পরম পদ পাইতে পারে। হংস ও গুরু স্বরূপ যে আমি—আমাতে ভক্তি সহকারে অগ্রবৃত্তি করা, বিতৃষ্ণা, সুখ-হুঃখাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, ইহ পরলোক সর্বত্র সকল প্রাণীর হুঃখ-দর্শন, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, তপস্তা, কাম্য কৰ্ম্ম পরিত্যাগ, আমার জন্মই কৰ্ম্ম করা, আমার কথা কথন, যাহারা আমাকে পরম দেব বলিয়া জানে—তাহাদের সহিত নিত্য সহবাস, আমার গুণকীর্তন, নির্বৈরতা, সমতা, উপশম, আশ্রয়দেহ ও ‘আমি আমার’ এইরূপ বুদ্ধি পরিত্যাগের কামনা, অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের অভ্যাস, নির্জুন স্থানে বাস, প্রাণ ইন্দ্রিয় মন—এ



আবু-পর্বতস্থ দিলওয়ারা মন্দিরের অভ্যন্তর।

সকলের সম্যক প্রকারে জন্ম, সংপ্রদা, ব্রহ্মচর্যা, কৰ্ত্তব্য-কর্মের অপরিত্যাগ, বাক্য-সংযম, সর্বদা মদীয়-চিঙাদিপূর্ণ—অমৃতভব পর্যন্ত জ্ঞান-সমাধি,—এই সকল দ্বারা ধৈর্য্য, ব্রত ও বিবেকবান হইয়া, অহঙ্কার নামক উপাধিকে নিরাকৃত করিবে।”

শ্রীমত্তাগবতে ঋষভদেবের যে উপদেশ দেখি, জৈনশাস্ত্রের সর্বত্রই সেই উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়। কর্মফলেই যে দেহাদির উৎপত্তি, কামনা-মূলক কর্ম দ্বারাই যে পুনঃপুনঃ জন্ম জরা-মৃত্যুর অধীন হইতে হয়, ঋষভদেবের এই উক্তির প্রতিধ্বনি জৈনশাস্ত্রে কোথায় নাই? জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয় প্রভৃতি কন্ম্যাটকের প্রসঙ্গে এ বিষয় বোধগম্য হয়। আচারাজ-সূত্রে (ষষ্ঠ অধ্যয়নে, প্রথম উদ্দেশ্যকে) ‘ধৃত’ প্রসঙ্গে কর্মফলে জন্ম-জন্মান্তরে জীব যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তদ্বিষয় বিশদভাবেই বিবৃত রহিয়াছে। সেখানে বলা হইতেছে,—‘অতি-লোভী কচ্ছপ যেমন জলাশয়ের শৈবাল-পত্রাদির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরিশেষে আর উপরে উঠিতে সমর্থ হয় না; অথবা, শিকড়ের দ্বারা মৃত্তিকার রস গ্রহণ করিতে গিয়া উদ্ভিদ যেমন চলচ্ছক্তি বিহীন হইয়া পড়ে, এমন কি ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতেও তাহাকে নড়াইতে পারে না; মানুষেরও সেই দশা।’*

মানুষ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সেই পরিবারের প্রতি মমতা তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে; তাহার ইচ্ছা-সমূহ কামনার প্রাবল্যে কাম্যবস্তুর আসক্ত হইয়া পড়ে। ফলে, মানুষকে চিরজীবন হাহাকার করিতে হয়। তাহার কর্মরূপ পাপবন্ধনে তাহাকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে দেয় না। মানুষ যে বিবিধ পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তাহারও কারণ—সেই জন্মান্তরীণ কর্মফল-ভোগ। পুরুষাভুগত ব্যাধি-বিপত্তি—কর্ম-বন্ধনজনিত জন্মগ্রহণের ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এবিধ মর্ম্ম-কথাই ঐ অধ্যয়নে ‘ধৃত’ প্রসঙ্গে আলোচিত আছে। ফলতঃ, কর্মফলে দুর্দৈব জীবনভার বহন—ঋষভদেবের এই উক্তি—জৈনশাস্ত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ বলিলেও অতুক্তি হয় না। তার পর, জীলোক-সম্বন্ধে ঋষভদেব যে উপদেশ দিয়াছেন, জৈন-শাস্ত্রের সর্বত্র তাহার প্রতিধ্বনি দেখি। জীগণ সম্বন্ধে পুরুষগণকে নানা স্থানে নানা প্রকারে সাবধান করা হইয়াছে। পুরুষ যাহাতে জীলোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করে, তদ্বিষয়ে উপদেশের অবধি নাই। দুই-একটি দৃষ্টান্ত মাত্র নিয়ে উল্লেখ করিতেছি। সূত্রকৃতান্ত্রে (চতুর্থ অধ্যয়নে) ‘জীলোকদিগের সম্বন্ধে জ্ঞান’ বিষয়ক একটি প্রসঙ্গ আছে। জীগণ কিরূপে মোহজালে পুরুষকে আবদ্ধ করে, দৃষ্টান্তে ও উপমা—নানারূপে তাহা বিবৃত হইয়াছে। যথা;—‘যেমন এক খণ্ড মাংসের প্রলোভন দেখাইয়া হৃদ্যন্ত নির্ভীক সিংহকে মানুষ জাল-বদ্ধ করে, যতই সতর্ক হউন না কেন, সাধুজনকে সেইরূপ রূপাদির প্রলোভন দেখাইয়া রমণীরা জালে আবদ্ধ করে। তার পর, তাহার দ্বারা সে যদৃচ্ছা কর্ম সম্পন্ন করাইয়া লয়। চক্রবান-নিষ্ঠ্যাতা যেমন শনৈঃ শনৈঃ চক্র-বিঘূর্ণন করে, রমণীর দ্বারা তখন পুরুষও সেইরূপ বিঘূর্ণিত

* সূত্রের ভাষায় উপমাটি এইরূপ দৃষ্ট হয়;—“সে যেমি—সে জহাবি কুন্সে, হরএ বিনিবুটিচিৎতে পচ্ছন্নপলাসে উম্মগ্গং সে ণ লভতি।” (৩০৬)। “ভংজগা ইব সন্নিবৎসং গো চরতি। এবং এগে অণেগক্কেবেহি কুলেহিং জায়া ক্কেবেহি সত্তা কল্লং ধংসতি। নিদাণতো তে ণ লভতি মোক্খং।” (৩০৭)।”

হয়। জালবন্ধ মুগ যেমন বহু চেষ্টা করিয়াও মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না, পুরুষেরও তখন সেই দশা ঘটে। বিষমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে পরিশেষে যেমন অনুশোচনার অন্তর্দাহে দগ্ধীভূত হইতে হয়; রমণীগণের সংসর্গে অতিবিজ্ঞ সাধুকেও পরিশেষে সেইরূপ পরিতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়। জীলোকের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে না; তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। কদাচ তাহাদের সহিত সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না। জীলোকের সংসর্গে যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সকল দুঃখের হেতুভূত।* তার পর, হিন্দুশাস্ত্রের যে সার শিক্ষা,—বেদান্তের যে চরম উপদেশ—সেই আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, তদ্বিষয়েই বা জৈনশাস্ত্রে কি উপদেশ প্রাপ্ত হই? শ্রীমদ্ভাগবতে ঋষভদেব যাহা বলিয়াছেন, জৈনশাস্ত্রের পত্রে পত্রে তাহারই প্রতিধ্বনি নাই কি? ‘আমাকে জানিলেই সকল জানা হইবে।’ ‘আমার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা।’—তীর্থঙ্করগণ সকলেই সেই চরমজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। ‘আত্মাই জ্ঞান।’ ‘জ্ঞানই আত্মা।’†—এ উক্তি আচার্য্য-স্বত্রে (পঞ্চম অধ্যয়নে, পঞ্চম উদ্দেশকে) স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই। ‘কাষ্ঠে যেমন অগ্নি আছে, দুগ্ধে যেমন নবনী আছে, তিলে যেমন তৈল আছে; ইহসংসারে আত্মা সর্বত্র সেইভাবে বিস্তৃত।‡ উত্তরাধ্যায়নের (চতুর্দশ অধ্যয়নে) এবম্বিধ উপমা সমূহ কি শিক্ষা প্রদান করিতেছে? এ সকল বিষয় পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, কর্ম্মের দ্বারা চিনিতে পারা যায় না; আবার কর্ম্মের দ্বারাই স্বরূপতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। বন্ধনও কর্ম্ম; মুক্তিও কর্ম্ম। কতকগুলি কর্ম্মে বন্ধন অনিবার্য্য; আর কতকগুলি কর্ম্মে মুক্তি অবশ্যসম্ভাবী। সংকর্ম্মের সংপরিণতি; অসংকর্ম্মের অসংপরিণতি। বিচারপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া যাও। ফল পুরোভাগে প্রতীক্ষা করিতেছে। জৈনশাস্ত্রেরও ইহা সার উপদেশ।

* স্ত্রতকৃতাস্ত্রের মূল অংশের ইংরাজী অনুবাদ; যথা,—

“As men (by baiting) with a piece of flesh a fearless single lion get him into a trap, so women may capture an ascetic though he be careful.

And then they make him do what they like, even as a wheel-wright gradually turns the felly of a wheel.

As an antelope caught in a snare, so he does not get out of it, however he struggles.

Afterwards he will feel remorse like one who has drunk milk mixed with poison ; considering the consequences, a worthy monk should have no intercourse with women.”

† স্ত্রতের ভাষায়, যথা,—“জে আত্মা সে বিদ্যা। জে বিদ্যা সে আত্মা। জেণ বিজ্ঞাপতি সে আত্মা। জে পড়ুচ পরিসংখার এএ আত্মাবাদী সখিয়াএ পরিয়াএ বিয়াহিতে—ত্তি বেদি।”

‡ মূল্যংশের ইংরাজী অনুবাদ,—

“As fire is produced in the Arani-wood, as butter in milk, and oil in sesamum seed, so, my sons, is the soul produced in the body. ” &c.

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

স্ববিরগণ ।

[গণ ও গণধরগণ,—কুল শাখা গচ্ছ প্রভৃতি ;—চতুর্দশ গণধর স্ববির,—তাহাদের শাখা-প্রশাখা ও শিষ্য-পরম্পরা ;—আখ্যা মহাত্ম্যের প্রভাব-প্রতিপত্তি —তাহার শিষ্য-প্রশিষ্যের ও শাখা-প্রশাখার পরিচয় ;—পঞ্চদশ হইতে উনচত্বারিংশ গণধরের বিবরণ ;—শেষোক্ত কয়েক জন আচাখ্যের বন্দনা-গীতি ।]

মহাবীর স্বামীর মহা-নির্কণ্ণলাভের পর, তাঁহার জৈনসম্প্রদায়ের প্রাণভূত ছিলেন, তাঁহাদের একটা ধারাবাহিক পরিচয় কল্পস্থত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভদ্রবাহু, কল্পস্থত্র-সঙ্কলন-

গণ ও
গণধরগণ ।

কালে, মহাবীরস্বামীর গণ ও গণধরগণের পরিচয়ের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাধারণতঃ ‘স্ববির’ নামে

অভিহিত হন। গণ, কুল, শাখা, গচ্ছ প্রভৃতির উৎপত্তি-তত্ত্ব তাঁহাদের

পরিচয়-গ্রন্থে অবগত হওয়া যায়। মহাবীর স্বামীর যিনি সর্বাঙ্গেক্ষা প্রাচীন শিষ্য

ছিলেন, তাঁহার নাম—ইন্দ্রভূতি। তিনি গৌতম-গোত্রজ। পাঁচ শত শ্রমণকে তিনি ধর্ম-

শিক্ষা দান করেন। মহাবীর স্বামীর দ্বিতীয় শিষ্য মধ্যবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার নাম—

অগ্নিভূতি। তিনিও গৌতম-গোত্রজ। তিনিও পাঁচ শত শ্রমণের উপদেষ্টা ছিলেন।

মহাবীর স্বামীর তৃতীয় শিষ্য—গৌতম-গোত্রজ বায়ুভূতি। শিষ্যগণের মধ্যে তিনি

সর্বাঙ্গেক্ষা অল্পবয়স্ক ছিলেন। তিনিও পাঁচ শত শ্রমণের শিক্ষাগুরু বলিয়া পরিচিত।

তৎপরে, ভারদ্বাজ-গোত্রজ স্ববির আখ্যাব্যাক্ত, অগ্নিবেশ্যায়ন-গোত্রজ স্ববির আখ্যাসুধর্ম্মন,

বাশিষ্ঠ-গোত্রজ স্ববির মণ্ডিকপুত্র, কাশ্যপ-গোত্রজ স্ববির মৌর্য্যপুত্র, বিশেষ প্রসিদ্ধিসম্পন্ন।

তাঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুই জন, প্রত্যেকে পাঁচ শত শ্রমণের এবং শেষোক্ত

দুই জন প্রত্যেকে আড়াই শত শ্রমণের শিক্ষাগুরু ছিলেন। ইহাদের পর গৌতম-

গোত্রজ স্ববির অকম্পিত ও হারিতায়ন-গোত্রজ স্ববির অচল-ভ্রাতৃ, উভয়ে একত্রে

তিন শত শ্রমণের শিক্ষক ছিলেন, এবং কৌণ্ডিন্য-গোত্রজ মেতাধ্য ও প্রভাস নামক

স্ববিরদ্বয় একত্রে তিন শত শ্রমণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইন্দ্রভূতি হইতে প্রভাস

পর্য্যন্ত এগার জন ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাবীর স্বামীর একাদশ ‘গণধর’ নামে অভিহিত হন।

আর তাঁহার যে নয় সম্প্রদায়ের শ্রমণকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, সেই নয়টা শ্রমণ-

সম্প্রদায় মহাবীর স্বামীর ‘গণ’ বলিয়া পরিচিত। অন্ত্যান্ত জিনগণের গণ ও গণধর সংখ্যা

একই রূপ। কিন্তু মহাবীর স্বামীর গণসংখ্যা হইতে গণধর-সংখ্যা দুই জন অধিক।

তাঁহার কারণ এই যে, শেষোক্ত দুই গণ দুই জন হিসাবে চারি জন গণধরের অধিনায়কত্বে

পরিচালিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত একাদশ গণধর দ্বাদশ অঙ্গশাস্ত্রে, চতুর্দশ পূর্বশাস্ত্রে

এবং সমগ্র সিদ্ধান্তশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। এক মাস কাল নির্জল উপবাসী থাকিয়া

ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁহার মহানির্কণ্ণ লাভ করেন। ইন্দ্রভূতি ও আখ্যা-সুধর্ম্মন স্ববিরদ্বয়

মহাবীরের নির্কণ্ণের পর নির্কণ্ণ-লাভ করিয়াছিলেন। নিগ্রহ শ্রমণগণ সকলেই আখ্যাসুধর্ম্মণের

বংশধর ; অত্যাচ্ছন্ন গণপদগণের কোনও বংশধর ছিল না। সুতরাং আৰ্য্যসুধর্মণ হইতেই মহাবীর স্বামীর শিষ্য-প্রশিষ্য স্থবিরগণের পর্য্যায় আরম্ভ হইয়াছে ; যথা,—

নাম ।	গোত্র ।
১। আৰ্য্যসুধর্মণ	অগ্নিবৈশ্রায়ন
২। „ জম্বুনামন	কাশ্যপ
৩। „ প্রভাব	কাত্যায়ন
৪। „ শযাস্ত (মানকের পিতা)	বাংস্ত
৫। „ যশোভদ্র	ভৃগিকায়ন

স্থবিরগণের নাম সংগ্রহ করিয়া যখন প্রথম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল, তখন আৰ্য্য-যশোভদ্রের পরবর্ত্তী নিম্নলিখিত স্থবিরগণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যথা,—

নাম ।	গোত্র ।
৬। (ক) আৰ্য্য সম্ভূতবিজয়... ..	মাপর
(খ) „ ভদ্রবাহু	প্রাচীন
৭। „ স্থলভদ্র	গৌতম
৮। (ক) „ মহাগিরি	ঐলাপত্য
(খ) „ সুহস্তীন্	বশিষ্ঠ
৯। (ক) „ সুস্থিত (কোতিক)	ব্যাভ্রাপত্য
(খ) „ সুপ্রতিবুদ্ধ (কাকন্দক)... ..	ঐ
১০। „ ইন্দ্রদত্ত (ইন্দ্রদিস)	কৌশিক
১১। „ দত্ত (দিয়)	গৌতম
১২। „ সিংহগিরিজাতিশ্বর	কৌশিক
১৩। „ বজ্র	গৌতম
১৪। „ বজ্রসেন	উৎকৃষ্ণ

বজ্রসেনের চারি জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম—আৰ্য্য নাগিল, আৰ্য্য পদমিল, আৰ্য্য জয়ন্ত এবং আৰ্য্য তাপস্। ইহাদের প্রত্যেকে এক একটি শাখার প্রবর্ত্তক। ইহাদের নাম অনুসারে সেই শাখা-চতুষ্টয়ের নামকরণ হয়। যথা,—আৰ্য্যনাগিলা শাখা, আৰ্য্যপদমিলা শাখা, আৰ্য্য-জয়ন্তী শাখা, আৰ্য্য-তাপসী শাখা।

স্থবিরগণের পুত্রাপুত্র পরিচয়-মূলক যে তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা হইতে আৰ্য্য যশোভদ্রের পরবর্ত্তী স্থবিরগণের শাখা-প্রশাখার ও শিষ্য-প্রশিষ্যের নিম্নলিখিতরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—

৬। (ক) মাপর-গোত্রজ আৰ্য্য সম্ভূতবিজয়ের বার জন শিষ্য ও সাত জন শিষ্যা ছিলেন। শিষ্যগণের নাম—নন্দনভদ্র, উপানন্দ, তিষ্ঠভদ্র, যশোভদ্র, সুনোভদ্র, মণিভদ্র, পুণ্ড্রভদ্র, গৌতমগোত্রজ স্থলভদ্র, ঋজুমতি, জম্বু, দীর্ঘবাহু, পাণ্ডুভদ্র। তাঁহার সাত জন শিষ্যের নাম—বক্ষা, বক্ষদত্তা (বক্ষদিস), ভূতা, ভূতদত্তা, ভূতাদিস, সেনা (এনা), বেণা, রেণা।

৬। (খ) প্রাচীনগোত্রজ আৰ্য্য ভদ্রবাহুর কাশ্যপগোত্রজ চারি জন শিষ্য ছিল। তাঁহার প্রথম শিষ্যের নাম—গোদাস; তিনি গোদাস-গণের প্রবর্তক। সেই গণ-চারি শাখায় বিভক্ত ছিল;—(১) তাত্রলিপ্তিকা শাখা, (২) কোতিবৰ্ষীয়া শাখা, (৩) পুণ্ড্রবৰ্দ্ধনীয়া শাখা, (৪) দাসীখারবতীকা শাখা। আৰ্য্য ভদ্রবাহুর দ্বিতীয় শিষ্যের নাম—অগ্নিদত্ত; তৃতীয়—জনদত্ত, চতুর্থ—সোমদত্ত।

৮। (ক) ঐলাপত্য-গোত্রজ আৰ্য্য মহাগিরির আট জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম—(১) উত্তর, (২) বলিসহ; ইঁহারা দুই জনে উত্তরবলিসহ গণ প্রবর্তনা করেন। চারিটি শাখায় সেই গণ বিভক্ত হয়; যথা,—কৌশাধিকা, সৌতপ্তিকা (সৌরিতিকা, সৌহিত্তিকা), কৌতুধিনী (কুণ্ডধারী, কোণ্ডবাণী), চন্দনাগরী (চন্দ্রনাগরী)। (৩) মহাগিরির তৃতীয় শিষ্য—ধনর্দ্বি (ধনাড্), (৪) চতুর্থ শিষ্য—শীরদ্ধি বা শ্রীভদ্র (বাসিরিড্), (৫) পঞ্চম শিষ্য—কোডিণ্য (কোডিন্ন), (৬) ষষ্ঠ—নাগ, (৭) সপ্তম—নাগপুত্র, (৮) অষ্টম—ছালুক রোহগুপ্ত; ইনি কৌশিক গোত্রজ এবং ত্রৈরাশিক শাখার প্রবর্তক।

৮। (খ) বাশিষ্ঠ গোত্রজ আৰ্য্য স্নহস্তীনের বার জন শিষ্য ছিল। তাঁহার প্রথম শিষ্য—আৰ্য্যরোহণ; তিনি কাশ্যপ-গোত্রজ। তৎকর্তৃক উদ্ভেদে ‘গণ’ প্রবর্তিত হয়। সেই গণ—চারিটি শাখায় এবং ছয়টি কুলে বিভক্ত হইয়াছিল। শাখা-চতুষ্টয়ের নাম;—উদ্রমবারিকা (উদ্রমবাড়ি-জিয়া), মাসপূরিকা, মতিপত্রিকা, পূর্ণপত্রিকা (পূর্ণপতিয়া)। ছয়টি কুলের নাম;—নাগভূত, সোমভূত, উল্লগচ্ছ (আর্দ্রগচ্ছ), হস্তিলিপ্ত (হস্তিলিঙ্গ), নান্দিক (নন্দিজ), পরিহাসক। আৰ্য্য স্নহস্তীনের দ্বিতীয় শিষ্যের নাম—ভদ্রবশস্; তিনি ভারবাজ-গোত্রজ। তৎকর্তৃক উদ্রবাতিক ‘গণ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ‘গণ’ চারি শাখায় ও তিন কুলে বিভক্ত। শাখা চারিটির নাম;—কম্পীয়িকা (কম্পিজিয়া), ভদ্রীয়িকা (ভদ্রিজিয়া), কাকন্দিকা, মেখলীয়িকা (মেহলিজিয়া)। কুল তিনটির নাম—ভদ্রয়ঙ্ক (ভদ্রজসিয়), ভদ্রগুপ্তিকা, যশোভদ্র (জসভদ্র)। আৰ্য্য স্নহস্তীনের তৃতীয় শিষ্যের নাম—মেঘ। তাঁহার চতুর্থ শিষ্যের নাম—কামর্দ্বি (কামির্দ্বি); তিনি কুণ্ডল-গোত্রজ। বৈশবাতিক ‘গণ’ তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ‘গণ’ চারিটি শাখায় ও চারিটি কুলে বিভক্ত ছিল। সেই শাখার নাম—শ্রাবস্তিকা, রাজ্যপালিকা, (রাজ্যপালিয়া), অন্তরঞ্জিকা (অন্তরিজিয়া), ক্ষেমলিপ্তিকা (ক্ষেমলিজিয়া)। চারিটি কুল; যথা,—গণিকা, মৈথিকা, কামরিদ্ধিকা, ইন্দ্রপূরক। স্নহস্তীনের পঞ্চম শিষ্যের নাম—‘শ্রীগুপ্ত’। তিনি হারিত-গোত্রজ। তৎকর্তৃক চরণ ‘গণ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই গণ চারি শাখায় ও সাত কুলে বিভক্ত। শাখা-চতুষ্টয়ের নাম—হারিতমালাকারী, সংকাশিকা, গভেধুকা, বজ্রনাগরী। সপ্তকুল; যথা,—বাৎসলীয়া (বাচ্ছলিজিয়া), প্রতিধর্ম্মিকা, হারিদ্রক (হালিজ), পুষ্পমিত্রিক (পুষ্পমিত্তিজিয়া), মালাক (মালিজ), আৰ্য্যচেতক, কৃষ্ণশাখা (কনহসহ)। স্নহস্তীনের ষষ্ঠ শিষ্যের নাম—ঋষিগুপ্ত কাকনক। তিনি বশিষ্ঠ-গোত্রজ। তৎকর্তৃক ‘মানবগণ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ‘গণ’ চারি শাখায় ও তিন কুলে বিভক্ত। শাখাচতুষ্টয়; যথা,—কাশ্যপীয়া (কাসবিজিয়া), গৌতমীয়া (গোয়মেজিয়া), বাসিষ্ঠীয়া (বাসিথিয়া), সৌরাষ্ট্রীকা। কুল-ত্রিতয়; যথা,—ঋষিগুপ্তিকা, ঋষিদত্তিকা, অভিযশস্। স্নহস্তীনের সপ্তম ও অষ্টম শিষ্যদ্বয়ের—

নাম—সুস্থিত ও সুপ্রতিবদ্ধ। তাঁহারা যথাক্রমে কৌতিক এবং কাকন্দক নামে পরিচিত। উভয়েই ব্যাপ্তাপত্য গোত্রজ। উহাদের কর্তৃক কৌতিক ‘গণ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই ‘গণ’ চারি শাখায় ও চারি কুলে বিভক্ত। শাখা-চতুষ্টয়ের নাম;—উচ্চনাগরী, বিভাধরী, বজ্রী, মধ্যমিকা (মাজ্জিমিরা)। কুল-চতুষ্টয়; যথা,—ব্রহ্মলিঙ্গক (বংভালিজ্জ), বাৎসলী (বচ্ছলিজ্জ), বাণী (বাণিজ্জ), প্রশ্নবাহনক। সুস্থিত ও সুপ্রতিবদ্ধ হুবিরহের পাঁচ জন শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম;—(১) আৰ্য ইন্দ্রদত্ত (ইন্দ্রদিস); ইনি কাশ্মপ গোত্রজ ছিলেন; (২) প্রশ্নগহ; ইনি মধ্যমা-শাখা প্রবর্তক; (৩) বিভাধর গোপাল; ইনি কাশ্মপ-গোত্রজ এবং বিভাধরী শাখার প্রবর্তক; (৪) ঋষিদত্ত; (৫) অর্হদত্ত (অরিহদত্ত)। সুহন্তী হইতে এইরূপ বহু কুলের ও শাখার উৎপত্তি হইয়াছিল। জৈনধর্মের বিস্তার-পক্ষে সুহন্তীনের প্রতিষ্ঠার অবধি নাই। রাজচক্রবর্তী অশোকের পৌত্র ও উত্তরাধিকারী সম্ভ্রাতি তাঁহারই কর্তৃক জৈনধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সুহন্তীনের অভ্যাদয়কালে জৈনধর্মের প্রভাব সর্বতোভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সুহন্তীনের শিষ্যশাখার পর, গৌতম-গোত্রজ আৰ্যদত্তের শিষ্যশাখার বিষয় উল্লিখিত হয়। তিনি একাদশ পর্যায়ে অবস্থিত। তাঁহার দুই শিষ্য ছিল। প্রথম শিষ্য—আৰ্য শান্তিসেনিক; তিনি মাথর-গোত্রজ। তৎকর্তৃক ‘উচ্চনাগরী’ শাখা প্রতি-
 পরবর্তী
 হুবিরগণ।
 ঠিত হয়। তাঁহার চারি জন শিষ্য ছিল। সেই শিষ্য-চতুষ্টয়ের—(১) আৰ্যসেনিক হইতে আৰ্যসেনিকা শাখা, (২) আৰ্যতাপস হইতে আৰ্য-তাপসী শাখা, (৩) আৰ্যকুবের হইতে আৰ্যকুবেরা শাখা এবং (৪) আৰ্যঋষিপালিত হইতে আৰ্যঋষিপালিতা শাখা প্রবর্তিত হয়। আৰ্যদত্তের দ্বিতীয় শিষ্যের নাম—আৰ্যসিংহগিরি জাতিস্মর; তিনি গৌতমগোত্রজ। তাঁহারও চারিটি শিষ্য ছিল;—(১) ধনগিরি, (২) ব্রহ্মবীপিকা শাখা প্রবর্তক গৌতম-গোত্রজ আৰ্যসমিত, (৩) আৰ্যবজ্র শাখার প্রবর্তক গৌতম-গোত্রজ আৰ্যবজ্র, (৪) অর্হদত্ত (অরিহদিস)। মহাবীর স্বামীর শিষ্য সুধর্ম্মন হইতে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের একটি পর্যায় নির্দিষ্ট আছে। সুধর্ম্মণাচার্য হইতে আৰ্য বজ্রসেন পর্যন্ত চতুর্দশ হুবির সেই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। * তদনুসারে আৰ্যদত্ত আৰ্য-শান্তিসেনিক, ধনগিরি এবং আৰ্য বজ্রসেন যথাক্রমে একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পর্যায়ে পরিগণিত। আৰ্য বজ্রসেন কর্তৃক আৰ্যনাজিলা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার সহযোগী আৰ্য পদ্ম কর্তৃক আৰ্যপদ্মাশাখা এবং বাৎসগোত্রজ আৰ্য রথ কর্তৃক আৰ্য জয়ন্তী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। † এইরূপে সুধর্ম্মণাচার্য হইতে দেবর্দ্ধি পর্যন্ত (কল্পসূত্র লিপিবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত) মোট ৩৯ জন প্রধান আচার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বে চতুর্দশ পর্যায় পর্যন্তের নাম-পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে পঞ্চদশ পর্যায়

* এই চতুর্দশ হুবিরের নাম ও গোত্রের বিষয় ১২৪ পৃষ্ঠার ত্রুটিব্য।

† আৰ্য পদ্ম এবং আৰ্য রথ ইঁহারা দুই জন আৰ্য বজ্রসেনের শিষ্য ছিলেন বলিয়া এবং ইঁহারা অল্প নামেও পরিচিত বলিয়া বোধ হয়। কেন-না, আৰ্যজয়ন্তী শাখার প্রবর্তক আৰ্য জয়ন্ত নামও দেখিতে পাই এবং আৰ্য পদ্মীল কর্তৃক আৰ্যপদ্মিলা শাখার প্রবর্তনার বিষয় অবগত হই।

(আর্য্য পুষ্পগিরি) হইতে উনচত্বারিংশ পর্য্যায় (কমাত্রমণ দেবর্জি) পর্য্যন্ত যে সকল স্ববিরের নাম ও গোত্র-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল। যথা,—

স্ববিরের নাম ।				গোত্র ।
১৫ ।	আর্য্য পুষ্পগিরি	...	...	কৌশিক
১৬ ।	“ ফল্গুমিত্র	...	...	গৌতম
১৭ ।	“ ধনগিরি	...	...	বাশিষ্ঠ
১৮ ।	“ শিবভূতি	...	...	কৌৎস
১৯ ।	“ ভদ্র	...	...	কাশ্যপ
২০ ।	“ নক্ষত্র	...	...	কাশ্যপ
২১ ।	“ রক্ষ	...	...	কাশ্যপ
২২ ।	“ নাগ	...	...	গৌতম
২৩ ।	“ জেহিল	...	...	বাশিষ্ঠ
২৪ ।	“ বিষ্ণু	...	...	মাথর
২৫ ।	“ কালক	...	...	গৌতম
২৬ ।	“ সম্পলিত ও ভদ্র	...	...	গৌতম
২৭ ।	“ বুদ্ধ	...	...	গৌতম
২৮ ।	“ সজ্জপাণিত	...	...	গৌতম
২৯ ।	“ হস্তান্	...	...	কাশ্যপ
৩০ ।	“ ধর্ম্ম	...	...	মুত্রত
৩১ ।	“ সিংহ	...	...	কাশ্যপ
৩২ ।	“ ধর্ম্ম	...	...	কাশ্যপ
৩৩ ।	“ শাঙিল্য *	...	...	...
৩৪ ।	“ জম্বু	...	...	গৌতম
৩৫ ।	“ নন্দিত	...	...	কাশ্যপ
৩৬ ।	“ কমাত্রমণ দেশিগাণিন	...	...	কাশ্যপ
৩৭ ।	“ স্থিরগুপ্ত	...	...	বাৎস
৩৮ ।	“ ধর্ম্ম (কুমার)	...	...	...
৩৯ ।	“ কমাত্রমণ দেবর্জি	...	...	কাশ্যপ

কল্পহুত্রে স্ববিরগণের নাম-পরিচয়ের উপসংহারে স্ববিরগণের একটি বন্দনা আছে। সেই বন্দনা গাথাকারে গ্রথিত। ষোড়শ-পর্য্যায়ভুক্ত স্ববির ফল্গুমিত্র হইতে উনচত্বারিংশ পর্য্যায়ভুক্ত স্ববির দেবর্জির বন্দনা সেই গাথার গ্রথিত আছে। গাথাটি চতুর্দশ শ্লোকে

* জেকবীর অনুবাদে প্রকাশ,—১৭শ হইতে ৩০শ পর্য্যন্ত আচার্য্যদিগের নাম কোনও কোনও পুঁথিতে পাওয়া যায় নাই। তিনি আরও বলেন,—এই শাঙিল্যই বহুবীদিগের অতিযোগী মথুরার সত্বেশ্বর প্রধান আচার্য্য 'হনিল' হওয়া সম্ভব।

নিবন্ধ। প্রাচীন গাথায় প্রাকৃত ভাষায় কোন্ নাম কোন্ গোত্র কি ভাবে উচ্চারিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় সেই গাথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গাথাটি এই; যথা,—

বন্দামি ফগুশ্মিতং, চ গোয়মং ধগগিরিং চ বাসিটুং।
 কুচ্ছং সিবভূইংপিয়, কোসিয় হুজ্জংতকণ্‌হে অ ॥ ১।
 তে বংদিউণ সিরসা, ভদং বন্দামি কাসবসগুত্তং।
 নক্‌থং কাসবগুত্তং, রক্‌থংপিয় কাসবং বংদে ॥ ২।
 বন্দামি অজ্জনাগং, চ গোয়মং জেহিলং চ বাসিটুং।
 বিগছ মাটরগুত্তং, কালগমবি গোয়মং বংদে ॥ ৩।
 গোয়মগুত্তকুমারং, সংপলিয়ং তহয় ভদয়ং বংদে।
 থেরং চ অজ্জবুডুং, গোয়মগুত্তং নমংসামি ॥ ৪।
 তং বংদিউণ সিরসা, থিরসত্তচরিত্ত নাগসংপন্নং।
 থেরং চ সংধবালিয়, গোয়মগুত্তং পণিবয়ামি ॥ ৫।
 বন্দামি অজ্জহথি, চ কাসবং থংতিসাগরং ধীরং।
 গিম্‌হাণ পটমমাসে, কালগয়ং চেব স্কুদস্প ॥ ৬।
 বন্দামি অজ্জধম্মং, চ সুববং সীললঙ্কিসংপন্নং।
 জস্প নিক্‌থমণে দেবী, ছত্তং বরমুত্তমং বহই ॥ ৭।
 হথিং কাসবগুত্তং, থম্মং সিবসাহগং পণিবয়ামি।
 সীহং কাসবগুত্তং, ধম্মংপিয় কাসবং বংদে ॥ ৮।
 তং বংদিউণ সিরসা, থিরসত্তচরিত্তনাগসংপন্নং।
 থেরং চ অজ্জজংবু, গোয়মগুত্তং নমংসামি ॥ ৯। *
 মিউমদবসংপন্নং, উবউত্ত নাগদংসণচরিত্তে।
 থেরং চ নংদিয়ংপিয়, কাসবগুত্তং পণিবয়ামি ॥ ১০।
 তত্তো য থিরচরিত্তং, উত্তমসম্মত্তসত্তসজুত্তং।
 দেবট্টিগিথমাসমণং, মাটরগুত্তং নমংসামি ॥ ১১।
 তত্তো অণুওধরং, ধীরং মহিসাগরং মহাসত্তং।
 থিরগুত্তথমাসমণ, বচ্ছসগুত্তং পণিবয়ামি ॥ ১২।
 তত্তো য নাগদংসন—চরিত্ততবসুট্টিয়ং গুণমহত্তং।
 থেরং কুমারধম্মং বন্দামি পণিং গুণোবেয়ং ॥ ১৩।
 স্কুত্থরয়ণভরিএ, থমদমমদবগুণেহিং সংপন্নং।
 দেবিড্‌ট্টিথমাসমণে, কাসবগুত্তে পণিবয়ামি ॥ ১৪।

* জেকবীর গ্রন্থে নবম শ্লোক হইতে চতুর্দশ শ্লোকের অনুবাদ মাত্র আছে। তিনি বলেন,—এ সকল গাথায় প্রধান প্রধান আচার্য্যগণের স্তব দৃষ্ট হয়; নবম শ্লোকের অধু দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ের অধুনামনকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু মূল দেখিয়া তাহা মনে হয় না। ষোড়শ আচাধ্য হইতে উনচত্বারিংশ আচার্য্যের স্তবই উদ্ধাতে প্রকটিত দেখি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

— † * † —

বিবিধ বিদ্যা ।

[জৈনধর্মের অভ্যাসে আধ্যাত্মিক উন্নতি,—আধুনিক সভ্য-সমাজের জায় তাৎকালিক সমাজের আচার-ব্যবহার প্রভৃতির নিদর্শন ;—রাজসভার বিবরণ ও রাজার দৈনন্দিন কার্যাবলী ;—উদ্ভিদের ও মনুষ্যের সাদৃশ্য-তত্ত্ব—জ্ঞানোন্নতির নিদর্শন ;—বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষুণ্ণ লাভ,—বিশিষ্ট বিজ্ঞান ও চতুঃষষ্টি কলা-বিজ্ঞান বিবরণ ;—ঋষভপুরাণ ;—দূর-অভীতে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালী জাতির প্রতিষ্ঠা-পরিচয় ।]

ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসে জৈনধর্ম একটি প্রসিদ্ধ পরিচ্ছেদ । কি রাজনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি ধর্মনৈতিক—ভারতবর্ষের সর্ববিধ উন্নতির নিদর্শন জৈনধর্মের অভ্যাসে-

কালে পরিলক্ষিত হয় । ত্যাগের আদর্শ মনুষ্য ভুলিতে বসিয়াছিল ;
আধ্যাত্মিক উন্নতি । কামনা-মূলক কর্মকাণ্ডের শাখা-পল্লবে চতুর্দিক বেঠন করিয়া কেলিয়াছিল ;

জৈনধর্ম সেই কর্মের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হন । অনাসক্ত আকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য ভাবে জৈনধর্ম তখন যে কর্ম্যমুঠান প্রবর্তিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তদ্বারা কর্ম-মূল সর্বতোভাবে উৎপাটিত হইতে চলিয়াছিল । মহাবীর স্বামীর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া জৈন-যতিগণ ত্যাগ-স্বীকারের (নিষ্কাম-কর্মের) যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যান, তাহা যে মনুষ্যের ধর্মোৎকর্ষ-সাধনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ—তাহাতে সংশয় নাই । সর্বজীবে সমদর্শনের ভাব—জৈনধর্মের ষাট সারস্বত শিক্ষা, এই সময়েই ক্ষুণ্ণ-লাভ করিয়াছিল । সর্বত্র জীব-দর্শন, আর জীব-হিতে জীবন-নিয়োগ,—জৈনধর্মের যে প্রধান শিক্ষা, আধ্যাত্মিক উন্নতির যে চরম নিদর্শন, তাহার নিকট পৃথিবীর সকল নীতিবিদগণের মস্তক অবনত হইয়া আছে ।

জৈনধর্মের অভ্যাসে মাহুকের যেমন আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তেমনই সমাজের বহিরঙ্গের ক্রী-সম্পৎ বৃদ্ধি পাইয়াছিল । মহাবীর স্বামীর পিতা রাজা সিদ্ধার্থের

দৈনন্দিন কর্মকাহিনীর বিষয় স্মরণ করিলে, আধুনিক বিংশ শতাব্দীর
সভ্য-সমাজের নিদর্শন । সভ্য-সমুন্নত রাজপুরুষের চিত্র মানসপটে প্রতিভাত হয় । প্রভাতে

গাত্রোত্তান করিয়া তিনি যে ভাবে স্নানাহার ব্যায়ামাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, তদ্বিবরণ পাঠ করিলে, তাহা আধুনিক মূপতিগণের দৈনন্দিন কর্মের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য-সম্পন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । অপিচ, তদ্বারা তৎকালের রাজ-সভা, রাজ-অট্টালিকা এবং রাজ-পারিষদগণের বেশ একটা জীবন্ত চিত্র প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারে । কল্পহ্রদে (৬০—৬২ হ্রদে) এতৎসংক্রান্ত যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহা এই ;—

“তএবং সিদ্ধখে খতিএ কল্পং পাউল্লভায়াএ রয়নীএ ফুল্লগ্গলকমলকোমলুম্মীলিয়ংমি অহাপংডুরে পভাএ, রতাসোগগ্গাসকিংসুঅম্মঅমুহংগজ্জরগবংগুজীবগপারাবরচলণ-ময়ণ পরহুঅম্মরত্তলোঅজ্জাঅগকুহুমরাসিহিংগলণিঅরাতিরেঅরহংত সরিসে কমলায়-রসংডবোহএ উট্টিঅংমি হুরে সহস্সরসুসিংমি দিণরয়ে তেঅসা জলংতে, তস্স য

করপহরাপরদংমি অংধয়ারে বালায়বকুংকুমেণং খচিঅ ব জীবলোএ, সরণিজ্জাও
অত্তুট্টেই ॥ ৬০ ॥ অত্তুট্টিতা পায়পীটাও পচোকুহই পচোকুহিতা জেণেব অট্টণসাল
তেণেব উবাগচ্ছই উবাগচ্ছিতা অট্টণসালং অণুপবিসই, অণুপবিসিতা অণেগবায়ামজোগ-
বগ্গণবামদগমজ্জক্করণেহিং সংতে পরিসংতে সরণাগসহস্সপাগেহিং স্গংধবরতিজ-
মাইএহিং পীগণিজ্জেহিং মরণিজ্জেহিং বিংহণিজ্জেহিং দগ্গণিজ্জেহিং সন্নিবংদিয়গায়পল-
হায়ণিজ্জেহিং অত্তংগিএ সমাণে তিল্লচম্মংসি নিউণেহিং পডিপুগ্গণাগিণায়সুসুমাল-
কোমলতলেহিং পুরিসেহিং অত্তংগণপরিমদগুবলগকরণগুণনিম্মাএহিং ছেএহিং
দক্খেহিং পট্টেহিং কুসলেহিং মেহাবীহিং জিঅপরিসসমেহিং অট্টিসুহাএ মংসসুহাএ
তদ্যসুহাএ রোমসুহাএ চউবিহাএ সুহপরিঅগাএ সংবাট্টিগাএ সংবাহিএ সমাণে
অবগয়পরিসসমে অট্টণসালো পডিগিক্খমই ॥ ৬১ ॥ পডিমিক্খমিত্তা জেণেব
মজ্জণঘরে তেণেব উবাগচ্ছই, উবাগচ্ছিতা মজ্জণঘরং অণুপবিসই অণুপবিসিতা
লম্মত্তজালাকুলাভিরামে বিচিত্তমণিরয়ণকুট্টিমতলে রমণিজ্জে গ্গাণমংডবসি নাণামণি-
রয়ণভত্তিচিত্তংসি গ্গাণপীটংসি সুহনিসল্লো পুপ্ফোদএহিঅ গংখোদয়এহি অ উগ্গ্হোদ-
এহি অ সুহোদএহি অ সুহোদএহি অ, কল্লাগকরণপবরমজ্জণবিহীএ মজ্জিএ, তথ
কোউঅসএহিং বহুবিহেহিং কন্নাগগপরমজ্জাণাবসাণে পমুহলসুসুমালগংধকাসাইঅলুহি-
অংগেঅহরসুমহগ্গদুসরয়ণসুসংবুডে সরসসুসুভিগোসীসচংদণাগুলিত্তগত্তে সুইমালাবল্ল-
গবিলেবণে আবিক্কমণিসুবেল্লো কল্লিয়হারদ্ধহারতিসরয়ণালাংবপালাংবমাগকডিহুত্তসু-
কয়সোভে পিগদ্ধগেবিজ্জে অংগুভিজ্জগল্লিয়করাত্তরণে বরকডগতুডিঅথংভিঅতুএ
অহিঅরুবসসুসিরীএকুংডলউজ্জেইআণে মউডদিত্তসিরএ হারোথয়সুসুযরইঅবছে
মুদ্বিআপিংগলংগুলীএ পালাংবপলাংবমাগসুসুপডউত্তরিজ্জে নাণামণিকগণরয়ণবিমলমহ-
স্মিগিউণোবচিঅমিসিমিসিংতবিরইঅসুসিলিট্টবিসিট্টলট্টাবিদ্ধবীরবলয়ে, কিংবহুনা ?
কল্পক্খএ চেব অলংকিঅবিভূসিএ নরিংদে, সেকোরিটমল্লদামেণং ছত্তেণং ধরিক্জ-
মাণেণং সেঅবরচামরাহিং উক্কুবমানীহিং মংগলজয়সদকরালীএ অণেগগণনাগগদং-
ডনাগরাজ্জিসরতলবরমাডংবিঅকোডংবিঅমংতিমহামংতিগণগদোবারিয়অমচ্চেডপীটমদ-
নগরনিগমসিট্টুসেনাবইলখবাহদুঅসংখিবালা সচ্ছিং সংপরিবুডে ধবলমহামেহনিগ্গএ
ইব গহগণদিগ্গন্তরিক্খতারাগণাণ মজ্জো সসিব পিঅদংসণে নরবই নরিংদে নর
বসহে নরগীহে অত্তহিঅয়াতেঅলচ্ছীএ দিপ্পমাণে মজ্জণধরাও পডিগিক্খমই ॥ ৬২ ॥

অর্থ—‘নিশাবসানে অরুণোদয়ে প্রাশুট কমলদল বিকাশ পাইল। দিনদেব, অশোক-পুষ্পের
ছায়, প্রাশুট কিংগকের ছায়, ভোতাপক্ষীর চকুর ছায়, অথবা গুঞ্জারের ছায়, রক্তমূর্তি
পরিগ্রহ করিলেন। ক্রমশঃ সে মূর্তি বহুজীব পুষ্পের ছায়, পারাবতের চকুর ও চরণের ছায়,
কোকিলের রক্তচকুপ্রায়, ধোলাপ-স্তবকের অথবা সিন্দূরের ছায়, প্রগাঢ় হরিদ্রাভ রক্তবর্ণ
প্রাপ্ত হইল। অতঃপর, সহস্র কিরণজাল বিস্তার করিয়া উজ্জলতার দিক উদ্ভাসিত করিয়া
কমল-স্তবক-সমূহকে জাগ্রৎ করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। দিনদেব উদিত হইয়া
আপন কিরণজাল-বিস্তারে অন্ধকারকে বিদূরিত করিলে, জীব-জগৎ জাগ্রৎ হইল।

রাজা সিদ্ধার্থ শয্যা ত্যাগ করিয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন। প্রাসাদের একাংশে ব্যায়াম-গৃহ ছিল। তিনি সেখানে গমন করিলেন। তথায় নানাপ্রকার স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যায়ামকৌড়ার নিবৃত্ত হইলেন। উল্লম্বদণ্ড, অঙ্গমোড়ন, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ব্যায়াম-কৌড়া চলিতে লাগিল। ব্যায়াম-কৌড়ার দেহে ক্লান্তি উপস্থিত হইলে, পরিচারকগণ গাত্র-মর্দনে প্রবৃত্ত হইল। শতপাক সহস্রপাক তৈল—শত ও সহস্র বনস্পতির ও ভেষজের সংযোগে প্রস্তুত হইয়াছিল। সে তৈল পুষ্টিকর, সৌন্দর্য্যবর্ধক, শক্তিপ্রদ, সঙ্গন্ধযুক্ত এবং ইন্দ্রিয়ের ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টিসাধক। তৈলসিক্ত চর্ম্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক এই তৈল-মর্দন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দক্ষ ও চতুর তৈলমর্দকগণ সেই তৈলমর্দন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। বাহাতে শরীরের ক্লেশ অপগত হয়, অথচ অস্থি মাংস চর্ম্ম কেশ প্রভৃতি দৃঢ় ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হয়, তৈলমর্দকগণ তেমনই কৌশলক্রমে মর্দন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিল। অতঃপর ব্যায়াম-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া রাজা সিদ্ধার্থ স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। সেই অতিমনোহর আনন্দপ্রদ স্নানাগার মুক্তাখচিত বহুবর্ণবিশিষ্ট কাচের বাতায়ন-সমূহে সুশোভিত ছিল। স্নানাগারের তলদেশ নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তরে গ্রথিত হইয়াছিল। জহরতাদিখচিত বহুমূল্য প্রস্তরে নির্ম্মিত এক আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সিদ্ধার্থ স্নানক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। যে জলে তাঁহাকে স্নান করান হইল, সে জল নানাবিধ পুষ্পে ও গন্ধদ্রব্যে সুগন্ধীকৃত ছিল। বিশুদ্ধ পবিত্র জল এবং উষ্ণ জল উভয়ই স্নানাগারে রক্ষিত থাকিত। যে ভাবে স্নান করিলে স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায়, ভ্রাতৃগণ তেমনই ভাবে তাঁহাকে স্নান করাইল। আনন্দের সহিত স্নানক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, সঙ্গন্ধযুক্ত উত্তম বস্ত্রের দ্বারা গাত্রমোক্ষণপূর্ব্বক তিনি বস্ত্র-পরিবর্তন করিলেন। বহুমূল্য নূতন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ‘গোশীর্ষ’ ও চন্দন প্রভৃতির সঙ্গন্ধে এবং পুষ্পমালায় ভূষিত হইলেন। অতঃপর মণিমুক্তা-জহরতাদিখচিত বহুমূল্য অলঙ্কারসমূহ তাঁহার অঙ্গশোভা বর্ধন করিল। গলদেশে মুক্তার মালা দোহলায়মান হইল। করে কঙ্কণ বলয় শোভা পাইল। করাজুলি অঙ্গুরীয়ক-দ্বাতিতে দ্বাতিমান হইল। এইরূপে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া তিনি দরবার-গৃহে গমন করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন, জয়ধ্বনিতে দিক নিনাদিত হইল। দুই পার্শ্বে দুই জন রাজকর্ম্মচারী খেত চামর লইয়া ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। রাজা সিদ্ধার্থকে বেষ্টন করিয়া, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, সেনাপতি, সিপাহী, অমাত্য, দাস, ব্যবসায়ী, সার্থবাহ, জ্যোতিষী, সন্ধিপাল (বৈদেশিক দূত) এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ পদমর্যাদা অনুসারে আপন আপন আসন গ্রহণ করিলেন। যেন নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রমার স্তায় সেই নরসিংহ নৃপতি সিংহাসনে শোভমান রহিলেন। রাজা সিদ্ধার্থ পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট ছিলেন। দরবার-গৃহের উত্তর-পূর্ব্ব অংশে আটখানি স্বতন্ত্র আসন স্থাপিত হয়। মূল্যবান বস্ত্রাদিতে সেই আসনগুলি সুসজ্জিত ছিল। সেই আসন-গুলির অনতিদূরে অন্দরের দিকে পর্দার অন্তরালে রাজ্যের বসিবার আসন নির্দিষ্ট থাকে। সে আসন বহুমূল্য প্রস্তরে বিনির্ম্মিত ও জহরতাদি-বিখচিত ছিল। যেখানে সে আসন প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই কক্ষটি নানা বিচিত্র চিত্র-সমন্বিত কোমল মসৃণ বস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত হয়। সেই সকল চিত্রের মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, অশ্ব, সর্প, পক্ষী, মনুষ্য, যুগ, বৃক্ষ, ওদ্র

প্রভৃতির প্রতিমূর্তি বিশেষ চিত্তাকর্ষক ।” ইত্যাদি । উপরি উক্ত বর্ণনার আমরা ব্যাঙ্গ্যমগ্ধ, স্নানাগার, সুগন্ধি তৈল, অলঙ্কার, সিংহাসন, রাজসভা প্রভৃতির যে বিবরণ প্রাপ্ত হই, তাহা যে সভ্য-সমুদ্র সমাজের চিত্রপট, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না । সিদ্ধান্তগ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল—কতকাল পূর্বে, আর তাহাতে বর্ণিত আছে—আরও কতকাল পূর্বের ঘটনা ! এখন যে সকল আচার-পদ্ধতিকে আদর্শ সুসভ্য সমাজের আচার বলিয়া মনে করি, তখনও সেই সকল আচার-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল,—পূর্বোক্ত বর্ণনায় তাহা বোধগম্য হয় না কি ?

আরও তখন—সে দূর অতীতকালে—বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান যে শূষ্টি-লাভ করিয়াছিল, জৈনশাস্ত্র-সমূহে তাহারই কি অল্প নিদর্শন পাই ! উদ্ভিদের জীবন ও সংজ্ঞা বিষয়ক

মাহুষে অভিজ্ঞতা বিজ্ঞান-জগতে এখন যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । কিন্তু এই
ও অভিজ্ঞতার প্রমাণ জৈনশাস্ত্রের পত্রে পত্রে দেদীপ্যমান । মাহুষের ত্রায় উদ্ভিদে ।
উদ্ভিদের সংজ্ঞা আছে ; মাহুষের ত্রায় উদ্ভিদগণ জন্ম-জরা-মরণের অধীন ;

মাহুষের ত্রায় উদ্ভিদের আহার্যগ্রহণ ও শ্বাস-প্রশ্বাস পরিত্যাগ প্রভৃতি জীবনী-শক্তির পরিচয়-জ্ঞাপক উক্তি—জৈনশাস্ত্রের নানা স্থানে দেখিতে পাই । একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

“সে বেমি,—ইমংপি জাইধম্ময়ং, এয়ংপি জাইধম্ময়ং ; ইমংপি বুড়্টিধম্ময়ং, এয়ংপি বুড়্টিধম্ময়ং ; ইমংপি চিত্তমংতয়ং, এয়ংপি চিত্তমংতয়ং ; ইমংপি ছিন্নং মিলাতি, এয়ংপি ছিন্নং মিলাতি ; ইমংপি আহারগং, এয়ংপি আহারগং ; ইমংপি অগিচ্চয়ং, এয়ংপি অগিচ্চয়ং ; ইমংপি অসাসয়ং, এয়ংপি অসাসয়ং ; ইমংপি চওবচইয়ং, এয়ংপি চওবচইয়ং ; ইমংপি বিপরিণামধম্ময়ং, এয়ংপি বিপরিণামধম্ময়ং ।”

অর্থাৎ,—“মহুঘ্য যেমন জন্মধর্মের অধীন, বৃক্ষাদিও সেইরূপ জন্মধর্মের অধীন । মহুঘ্যের যেমন বুদ্ধিধর্ম আছে, বৃক্ষাদিরও সেইরূপ বুদ্ধিধর্ম আছে । মহুঘ্য যেমন চিত্তমন্ত, বৃক্ষাদিও সেইরূপ চিত্তমন্ত । মাহুষের কোনও অঙ্গ ছিন্ন করিলে সে যেমন ব্যথিত ও স্নান হয়, বৃক্ষকে ছিন্ন করিলে সেও তদ্রূপ স্নান হইয়া পড়ে । মহুঘ্যের যেমন খাওয়ার আবশ্যক, বৃক্ষাদিরও সেইরূপ খাওয়ার আবশ্যক । মহুঘ্যের দেহ যেমন অনিশ্চিত, ক্ষয়ধর্মশীল ; বৃক্ষাদিরও দেহ সেইরূপ অনিত্য, ক্ষয়ধর্মশীল । মহুঘ্য যেমন চিরস্থায়ী নয়, বৃক্ষও সেইরূপ চিরস্থায়ী নয় । মহুঘ্য যেমন পরিবর্তনশীল, বৃক্ষও সেইরূপ পরিবর্তনশীল । মহুঘ্য যেমন পরিণাম-ধর্মশীল, বৃক্ষও তদ্রূপ পরিণাম-ধর্মশীল ।”

জৈনধর্ম যখন প্রতিষ্ঠাবিহীন হইয়াছিল, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ পরিপুষ্টি-লাভ করিয়াছিল । জ্যোতিষ-বিজ্ঞান তখন প্রসিদ্ধিলাভ করে ; গণিত-বিজ্ঞানে তখন

অনেকের পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হয় । শিল্পবিজ্ঞান তখন শত বিভাগে
জ্ঞান-বিজ্ঞানের শূষ্টি ।
শূর্ভিলাভ করে । রমণীগণ পর্য্যন্ত তখন বিবিধ বিজ্ঞান যশস্বিনী

হন । রমণীগণের জ্ঞানোন্নতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রত্যেক জিনের আবির্ভাব-কালে প্রত্যক্ষীভূত হয় । সাধীগণ বহুসংখ্যক রমণীর অধিনেত্রী ছিলেন । সে নেতৃত্ব তাহাদের জ্ঞানোন্নতির এবং কর্তৃত্ব-শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক । ঋষভদেবের জীবনবৃত্ত

আলোচনার দেখিয়াছি, তখন দ্বিসপ্ততি বিজ্ঞান ক্ষুণ্ণীভাব করিয়াছিল ; আর তখন রমণীগণ চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। সেই দ্বিসপ্ততি বিজ্ঞানই বা কি, আর সেই চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যাই বা কি ? যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে কি বুঝিতে পারি ? জৈনশাস্ত্রের টীকাকারগণ সেই দ্বি-সপ্ততি বিজ্ঞান সম্বন্ধে এবং রমণীগণের অধিগত সেই চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। সেই দ্বিসপ্ততি বিজ্ঞান ; যথা,—

‘লেখন, গণিত, গীত, নৃত্য, বাস্তব, পঠন, শিক্ষা, জ্যোতিষ, ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, নিকৃতি, কাব্য, কাত্যায়ন, নিঘণ্টু, গজারোহণ, অখারোহণ, শাস্ত্রাভ্যাস, রস, মন্ত্র, যন্ত্র, বিষ, খনিকর্ম্ম, গন্ধবাদ, প্রাকৃত, সংস্কৃত, পৈশাচিক, অপভ্রংশ, স্মৃতি, পুরাণ, বিধি, সিদ্ধান্ত, তর্ক, বৈজ্ঞক, বেদ, আগম, সংহিতা, ইতিহাস, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, আচার্য্য-বিদ্যা, রসায়ন, কপট বিদ্যামুবাদ, দর্শন, সংস্কার, ধূর্ত, সঞ্চয়, মণিকর্ম্ম, তরু-চিকিৎসা, খেচরী কলা, অমরী কলা, ইন্দ্রজাল, শিশাচসিদ্ধি, রসবত্তা, পঞ্চক, সর্ক-করনী, প্রাসাদ-লক্ষণ, পণ, চিত্রোপল, লেপ, চর্ম্মকর্ম্ম, পত্রচ্ছেদ, নথচ্ছেদ, পত্র-পরীক্ষা, বশীকরণ, কাষ্ঠঘটন, দেশভাষা, গারুড়, বোগাজ, ধাতুকর্ম্ম, কেবলবিধি, শকুন রূত।’

যদিও টীকাকারের ঐ ব্যাখ্যায় সর্ব্ববিধ বিজ্ঞানের স্বরূপ-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তথাপি বিবিধ বিদ্যায় দেশের উন্নতির বেশ একটা আভাস পাওয়া যায়। রমণীগণের অধিগত ঐ চৌষষ্টি কলাবিদ্যা (টীকাকারগণের ব্যাখ্যাক্রমে) তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। তাহাতেও বুঝা যাইবে, রমণীগণ তখন কত গুণে গুণাবিতা ছিলেন। রমণীগণেরই আয়তাবীন সেই চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায় ; যথা,—

‘নৃত্য, ওঁচিভ্য, চিত্রবাদিত্র, মন্ত্র, তন্ত্র, ধনবৃষ্টি, কলাকৃষ্টি, সংস্কৃতবাণী, ক্রিয়াকল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দন্ত, জলস্তুগীত, তাল, আকৃতি-গোপন, আরাম-রোপণ, কাব্যশক্তি, বক্রোক্তি, নরলক্ষণ, গজপরীক্ষা, অখপরীক্ষা, বাস্তবগুণি, লঘুবুদ্ধি, শকুনবিচার, ধর্ম্মাচার, অঙ্গনযোগ, চূর্ণযোগ, গৃহধর্ম্ম, সুপ্রসাদনকর্ম্ম, সোণাসিদ্ধি, বর্ণিকাবুদ্ধি, বাক্গটুতা, করলাঘব, ললিতচরণ, তৈলস্নরভিকরণ, ভূত্যাগচারণ, গৃহাচার, ব্যাকরণ, পরনিরাকরণ, বীণাবাদ, বিতণ্ডাবাদ, অঙ্কহিতি, জনাচার, কুস্তকম, সারিশ্রম, রত্নমণিভেদ, লিপিপরিচ্ছেদ, বৈজ্ঞক্রিয়া, কামাবিকরণ, রসসঞ্চরণ, শবংধ, শলীখণ্ডম, মুখমণ্ডন, কথা-কথন, কুসুম-গ্রন্থন, বরবেশ, সর্ব্বভাষাবোধ, বাণিজ্য, ভোজ্য, অভিধান পরিজ্ঞান, যথাস্থান ভূষণ-ধারণ, অন্ত্যাকরিকা ও প্রহেলিকা।’

বলা বাহুল্য, এই চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার অনেকগুলিই এখন প্রহেলিকাময়। এইরূপ প্রহেলিকাময়—তৎকাল-প্রচলিত অষ্টাদশ লিপির অন্তর্গত বহু লিপি। লিপি-সমূহের নাম,—

‘হংস, জুত, যক্ষ, রাক্ষস, উট্ট, যাবনী, তুরকী, কীরী, জাবিড়ী,

সৈন্ধবী, মালবী, বড়ী, নাগরী, ভাটী, পাবসী, অনিমিত্তি, মূল দেবী।’

ইহার অনেক লিপির মর্ম্ম এখন অমুধাবন করাই কঠিন। ঋষভদেব এক ব্রাহ্মী কুমারীকে অষ্টাদশ লিপি এবং গণিত শিখাইয়াছিলেন। আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরতকে তিনি কাষ্ঠকর্ম্ম শিক্ষা দেন এবং বলিপুরুষলক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যায় ও বিজ্ঞানে তখন

দেশ যেমন উন্নত ছিল, রাজ্যোৎখাও তেমনই সৌভাগ্যশালী হইয়াছিল। আপন শত পুত্রকে ঋষভদেব আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। তাহাতে কোন্ কোন্ দেশে তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল, বুঝিতে পারি। জৈনশাস্ত্রে ঋষভদেবের শতপুত্রের নাম এইরূপ দৃষ্ট হয়;—

“ভরত, বাহুবলী, শম্ভু, বিশ্বকর্মা, বিমল, সুলক্ষণ, অমল, চিত্রাঙ্গ, খ্যাতকীর্তি, বরদত্ত, সাগর, যশোধর, অমর, রথবর, কামদেব, ধ্রুব, বৎসনন্দ, সুর, সুবন্দ, কুরু, অঙ্গ, বঙ্গ, কোশল, বীর, কলিঙ্গ, মাগধ, বিদেহ, সঙ্গম, দশার্ণ, গঙ্গীর, বসুধা, সুবধা, রাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, সুযশা, যশঃকীর্তি, বুদ্ধিকর, বিবিধিকর, যশস্কর, কীর্তিকর, সুরগ, ব্রহ্মসেন, বিক্রান্ত, নরোত্তম, পুরুষোত্তম, চন্দ্রসেন, মহাসেন, নভসেন, ভানু, সুকান্ত, পুষ্পযুত, শ্রীধর, তদর্শ, সুসুমা, দুর্জয়, অজয়মান, সুধা, ধর্মসেন, আনন্দ, নন্দ, অপরাঞ্জিত, বিশ্বসেন, হরিশেণ, জয়, বিজয়, বিজয়ন্ত, প্রভাকর, অরিদমন, মান, মহাবাহু, দীর্ঘবাহু, মেঘ, সুঘোষ, বিশ্ব, বরাহ, সুসেন, সেনাপতি, কুঞ্জরবল, জয়দেব, নাগদত্ত, কাশ্যপ, বল, বীর, শুভমতি, সুমতি, পদ্মনাভ, সিংহ, সুজাতি, সঞ্জয়, সুনাম, মরুদেব, চিত্রহর, সরবর, ত্রুটরথ, প্রভঞ্জন।”

বলা বাহুল্য, গণনায় এক শত নাম মিলিল না। কতকগুলি নামকে বিশেষণ বলিয়াও মনে হইল। কয়েকটি নাম সন্ধিসূত্রে আন্তের সহিত মিশিয়া থাকা অসম্ভব নহে। * বাহা হউক, এই সকল নাম হইতে এবং এতৎপ্রসঙ্গে যে যে দেশের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে দূর-দূরান্তরে রাজ্য-সীমা বিস্তারের বিষয় মনে আসিতে পারে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের তো কথাই নাই; চীন, মহাচীন এবং মধ্যএসিয়া পর্য্যন্ত যে তাঁহার আধিকারভুক্ত ছিল, সে বিভাগে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গদেশের এবং বাঙ্গালী-জাতির আধুনিকও প্রতিপন্ন করিবার জন্ত এক শ্রেণীর পণ্ডিতের যে প্রয়াস দেখা যায়, ঋষভদেবের ইতিবৃত্ত অমূলীন করিলে, তাঁহাদের সে প্রযত্ন বার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তাঁহার এক পুত্রের নাম—বঙ্গ, এবং তিনি বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত। সে প্রাচীনকালে বঙ্গ এবং বাঙ্গালী এইরূপ উল্লেখ দৃষ্টে বঙ্গদেশের আধুনিকত্বের যুক্তি-পরম্পরা অবশ্যই উড়াইয়া দেওয়া যায়। অপিচ, বঙ্গদেশের প্রাচীন গৌরব-বিভবের স্মৃতি নয়নপথে প্রতিভাত হয়। বাহা হউক, জৈনধর্মের প্রাচীনের সময়, বহু দেশের বহু জাতির সহিত সঙ্ঘ-সংশ্রবের এবং বিবিধ বিজ্ঞান উৎকর্ষের প্রমাণ জৈনশাস্ত্রের নানা স্থানেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই বলিয়াছি, জৈনধর্ম—ভারতের উন্নতির একটি প্রধান স্তর।

* জ্যোতিষ ভরতের নাম এবং আর দুই একটি নাম ভিন্ন অস্ত্রান্ত নামের সহিত ঐমতগবতে উল্লিখিত ঋষভ-পুত্রগণের নামের মিল নাই। ঐমতগবতে ঋষভদেবের পুত্রদিগের নাম-সম্বন্ধে লিখিত আছে,—‘জ্যোতিষ-পুত্র ভরত। তাঁহার নাম অনুসারে ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি। তাঁহার অস্ত্রান্ত পুত্রের মধ্যে,—কুলাবর্ত, ইলাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, মলয়কর্ত, ভদ্রসেন, ইন্দ্রস্পৃক, বিদর্ভ, কীকট—এই নয়টি প্রধান। ইঁহারা ভরতের অনুগত ছিলেন। তৎপরবর্তী কবি, হরি, অম্বরীক, প্রবুদ্ধ, পিঙ্গলায়ন, অবিহোত্র, ত্রিবিড়, চমস, করভাজন—ইঁহারা পরম ধার্মিক ছিলেন। এই সকলের কনিষ্ঠ একাশীতি পুত্রেরা পিতাজ্ঞা-পালক, বিনয়বিত্ত, যজ্ঞবান্ ও বিদ্বৎ-কর্মশীল ছিলেন।’—ঐমতগবতে, পঞ্চম স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়।

নবম পরিচ্ছেদ।

জৈন-ধর্মনীতি ।

[জৈনশাস্ত্র সন্নীতির ভাণ্ডার,—প্রকৃত মুনি কাহাকে বলে, বন্ধনই বা কি—তাহার বিবরণ ;—প্রকৃত জ্ঞানী ও বীর,—তাহাদের কর্ত্ত্বলক্ষণ ;—রমণী-সংসর্গ পরিত্যাগ-বিষয়ে জৈনশাস্ত্রের কঠোর আদেশ ;—সম্যকত্ব-লাভের উপায়-পরম্পরা ;—মোক্ষলাভ-সম্বন্ধে কঠোর বিধিবিধান ;—বিমুক্ত কোন্ জন ;—বিবিধ নীতিকথা ।]

সন্নীতি-সদাচার শিক্ষাদান-সম্বন্ধে জৈনশাস্ত্রে অমূল্য উপদেশ-পরম্পরা দৃষ্ট হয়। জৈন-যতিগণের প্রতিপাল্য বিধি-বিধান যেমন কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধা, জৈনশাস্ত্রের নীতি-সমূহও সেইরূপ মর্শ্বেভেদী শিক্ষামূলক। জৈনশাস্ত্র মানুষের প্রতি পদক্ষেপে জৈনশাস্ত্র সন্নীতির ভাণ্ডার। মানুষকে পাপের পথে অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেছেন। কঠোর ত্যাগ-শিক্ষাই যেন জৈনধর্মের মেরুদণ্ডস্থানীয়। জৈনশাস্ত্রের যে অংশই অধ্যয়ন করি না কেন, সর্বত্রই বন্ধন-ছেদনের অস্ত্র প্রাপ্ত হই। কর্ম্মবন্ধনই জীবকে পুনঃপুনঃ জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন করিয়া রাখিয়াছে। সে অধীনতার কবল হইতে কি প্রকারে মুক্তিলাভ সম্ভবপর? সে বন্ধন ছিন্ন করার প্রধান অস্ত্র কি আছে? তদ্বিষয়ে জৈনশাস্ত্র বড় এক গুন্দর উপদেশ দিয়াছেন; বলিয়াছেন,—‘প্রথমে আত্মপদার্থবিচার ও কর্ম্মবন্ধ-হেতু-বিচার কর; যদি আত্মপদার্থ উপলব্ধি হয়, আর যদি কর্ম্ম-বন্ধনের কারণ-পরম্পরা অধিগত হয়, তাহা হইলে সে কারণ-মূল ছিন্ন করিবার চেষ্টা আসে। সেই চেষ্টাই অস্ত্র-স্বরূপ।’ সত্যের ধারণা, আর অসত্যের পরিবর্জন,—ইহাই সেই অস্ত্র। ভগবান ভাই বলিয়াছেন,—‘ইহজীবনে সম্মান-বৃদ্ধির জন্ত, গৌরব-বৃদ্ধির জন্ত অথবা জাঁকজমক দেখাইবার জন্ত, বাহা কিছু অমুষ্টিত হয়; জন্ম-হেতু, মৃত্যু-হেতু অথবা মুক্তি-হেতু আমরা বাহা কিছু আকাজক্ষা করি; অপিচ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক হুংখ-দুরীকরণের জন্ত যে কোনও প্রযত্ন মানুষের দেখিতে পাই; তাহা সকলই পাপের মূলীভূত। এই বিষয় বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া এই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। যিনি পাপের এবিধ কারণ-পরম্পরা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তৎসমুদায়কে দুরীভূত করিয়াছেন, অর্থাৎ অসত্যের পরিহারে যিনি সত্যের আশ্রয় লইতে পারিয়াছেন, তাহাকেই প্রকৃত ‘মুনি’ (জ্ঞানী) বলিয়া জানিবে।’ এ সম্বন্ধে মহাবীর স্বামীর উপদেশ এই,—

“ইমস্‌সচেব জীবিস্সস পরিবংদণমাণগপুয়ণাএ,

জাইমরণমোরণাএ, দুক্খ পড়িধায়হেউং। ৭।

এয়াবংতি সন্নাবংতি লোগংসি কন্সসমাংতা পরিজাণিহকা ভবংতি। ৮।

জস্‌সেতে লোগংসি কন্সসমাংতা পরিজায়া ভবংতি,

সে হ মুণী ত্তি বেমি। ৯।”

এই সত্যজ্ঞান সদ্ভাজন করুণে সজ্ঞাত হয়, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কি উপদেশ প্রাপ্ত হই—দেখা দেখা যাউক । জৈনমতে,—সাধারণভাবে সকল পদার্থেরই প্রাণ আছে ; সুতরাং কোনও

পদার্থেই অজ্ঞাঘাত করা কর্তব্য নহে । অন্ধজনের হস্ত পদ বা কোনও সন্ন্যাসী বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন করিলে, সে তাহা দেখিতে পায় না বটে ; কিন্তু মুনি কে ?

অঙ্গ-ছেদনের যন্ত্রণা তাহার সম্পূর্ণ অমুভূত হয় । সেইরূপ উদ্ভিদাদির প্রতি অজ্ঞাঘাত-জমিত যন্ত্রণা মানুষের দৃষ্টিগোচর হইতে না পারে ; কিন্তু যাহাদের প্রতি অজ্ঞাঘাত করা হয়, তাহার মর্মে মর্মে সে যন্ত্রণা অমুভব করে । যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি, তিনি সে যন্ত্রণার বিষয় নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন । * যিনি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহাকেই লোকে সাধারণতঃ সন্ন্যাসী বলিয়া সম্মান করেন ; কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসী কাহাকে কহে ? প্রকৃত সংসার-ত্যাগীই বা কোন্ জন ? জৈন-শাস্ত্র বলিতেছেন,—‘সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁহাকেই বলি,—যিনি সংকর্মে মতিমান, যিনি পবিত্র-চরিত্র, আর যিনি অকপট ও সরল ।’ + ফলতঃ, সংসার-ত্যাগ ত্যাগ নহে ; গুণ বা বিষয়ে আসক্তি ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ । বিষয়ই আবর্ত ; সেই আবর্তে পড়িয়াই মানুষ ছাবুডুবু খাইতেছে । গুণ বা বিষয়—বন্ধনের মূলস্বরূপ । গুণ বা বিষয়ের দ্বারা মানুষ আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে । যিনি গুণ বা বিষয়ের বাসনার অভিভূত, তাঁহার কষ্টের কখনও শেষ নাই । তিনি মনে করেন,—‘তাঁহার পিতা আছে, মাতা আছে, ভাই আছে, ভ্রাতৃপুত্র আছে, স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, কণ্ঠা আছে, পুত্রবধূ আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, নিকট-আত্মীয় ও দূর-আত্মীয় আছে । এইরূপ, বিস্ত-সম্পত্তি-লাভের প্রতি, অসন-বসন প্রভৃতি কত বিষয়ের প্রতি—মানুষের চিত্ত দিবারাত্রি আকৃষ্ট । তৎসমুদায় রক্ষার জন্ত মানুষ কত না পাপকর্মের অনুষ্ঠান করিতেছে ! তাহারই ফলে, মানুষকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে । জৈনশাস্ত্র তাই তারত্বের ঘোষণা করিয়াছেন,—‘গুণ জান, গুণ ত্যাগ কর ।’

“জে গুণে, সে আবট্টে । জে আবট্টে, সে গুণে ।” ‡

“জে গুণে, সে মুলট্টাণে । জে মুলট্টাণে, সে গুণে ।” §

“ইতি সে গুণটি মহতা পরিয়াবেণং বসে পমত্তে ।” ¶

যেখানে বিষয় (গুণ), সেখানেই আসক্তি । বিষয়-ত্যাগ বলিতে, আসক্তি-ত্যাগই বুঝাইয়া থাকে । বাহ্যভাবে লৌকিক দৃষ্টিতে বিষয়-সঙ্গ ত্যাগ করিলে, বিষয় ত্যাগ করা হয় না । বিষয়ের প্রতি আসক্তি-ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ । সেই আসক্তি-ত্যাগেরই অপর নাম—অরতি । জ্ঞানী বলি কাহাকে ?—না, বিষয়ে যাহার অরতি জন্মিয়াছে । মুক্তি-লাভের অধিকারী হন—কোন

* আচার্য্য পুত্র, প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় উদ্দেশ, পঞ্চদশ পুত্র,—“সে বেমি—অঙ্গের অংঘ মবত্তে. অঙ্গের অংঘ মচ্ছে” ; ইত্যাদি ।

+ জৈনশাস্ত্রের উক্তি ; যথা,—“সে বেমি, সে জহাবী অণগারে উজ্জুকডে, গিরায়পডিবরে, অমায়কুকরমানে, বিয়াহিতে জাএ সদ্ধাএ গিক্খংতে তমেব মণু পালিজ্জা বিজহিত্তা বিসোতিমঃ ।”

‡ “Quality is the whirlpool (Avatta—Sansara), and the whirlpool is quality.”

§ “Quality is the seat of the root and the seat of the root is quality.”

¶ “He who longs for the qualities, is overcome by great pain and he is careless.”

জন্ম?—না, বিষয়ে বাঁহার অরতি জন্মিয়াছে, অর্থাৎ আসক্তি নাই । জৈনশাস্ত্রের নির্দেশ তাই,—

“অরহং আউটে সে মেহাবী ; খংগসি মুকে ।”

অর্থাৎ,—‘বাঁহার সংযম-শিক্ষা হইয়াছে ; বিষয়ের প্রতি বাঁহার অরতি জন্মিয়াছে ; তিনিই মেহাবী বুদ্ধিমান্ পুরুষ ; তিনিই অল্পকাল মধ্যে মুক্তিলাভের অধিকারী হন ।’ অপিচ, ‘অলোভের দ্বারা যিনি লোভকে পরাজয় করিয়াছেন, লক্ষ্যমান্ স্ব-ভোগেও বাঁহার অরতি জন্মিয়াছে, লোভকে নির্মূল করিয়া যিনি কৰ্ম্মরহিত হইতে পারিয়াছেন, সেই সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্বদর্শী নিকাম জনই প্রকৃত সন্ন্যাসী-পদবাচ্য ; মুক্তি তাঁহারই অধিগত ।’ জৈনশাস্ত্র তারত্বের কহিতেছেন,—

“বিমুক্তা হু তে জণাঃ, জে জণা পরিগামিণো লোভং অলোভেণ হুগংছমাণে
লদ্ধে কামে নাতিগাহই, বিণাবি লোভং নিক্খম্ম এস অকম্মে জাগতি
পাসতি । পভিলেহাঐ গাবকংখতি, এস অণগারেত্তি বুচ্চতি ।” *

সংযমই সৰ্ব্বমূল্যধার । যিনি সংযমী, মূলতত্ত্ব তাঁহারই অধিগত । অপিচ, যিনি মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার আত্মদর্শন লাভ হইয়াছে,—তাঁহার আর কোনও নূতন শিক্ষার আবশ্যক করে না,—“উদ্দেশো পাসগস্স মখি ।” একবার একস্থানে নহে, এ উক্তি পুনঃপুনঃ বিধোষিত হইয়াছে । পরমার্থদর্শী মুনি যিনি, তাঁহার আর কি শিক্ষা অবশিষ্ট আছে ?

যিনি অমুনি—অজ্ঞানী, তিনি চির-নিদ্রিত রহিয়াছেন । যিনি মুনি—জ্ঞানী, তিনি চির-জাগ্রৎ আছেন । ইহসংসারে অজ্ঞানতাই দুঃখের মূলীভূত ; তদ্বারাই সৰ্ব্ববিধ অনিষ্ট প্রকৃত জ্ঞানী সংসাধিত হইতেছে । জ্ঞানিগণ দুঃখের মূল কারণ অবগত আছেন বলিয়াই কখনও দুঃখেরে রত নহেন । বাঁহারা ভ্রান্ত, অসংযত, তাঁহারা দুঃখের মূলীভূত কৰ্ম্মের বিষয় অবগত হইয়াও, সে কৰ্ম্মে বিরত হইতে পারে না ; স্তত্রাং পুনঃপুনঃ জন্ম-জরা-মরণের ক্লেশভোগে প্রবৃত্ত হয় । কিন্তু যিনি সুবুদ্ধি-সম্পন্ন, শব্দ বর্ণ প্রভৃতির পাশ ছিন্ন করিয়া, কামকে (মারকে) অবহেলা করিয়া, তিনি মুক্তি-পথের পথিক হন । এ বিষয়ে জৈনশাস্ত্রের এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় ; যথা,—

“সুত্তা অমুনী সন্ন । মুণিণো সন্ন জাগরংতি ।

লোয়ংসি জাগ অহিয়াঅ হুকং ।

সময়ং লোগস্স জাগিত্তা এথ সখোবরএ ।”

যে পুরুষ প্রকৃতরূপে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, যিনি আত্মদর্শী জ্ঞানী এবং সংসার-বিষয়ে সত্যজ্ঞান-সম্পন্ন, অর্থাৎ সংসারকে যথার্থরূপে চিনিতে পারিয়াছেন ; মুনি তাঁহাকেই বলে,—মুক্তি তাঁহারই অধিগত । শব্দ গন্ধ রূপ রস

“Those who are freed (from attachment to the world and its pleasures), reach the opposite shore (Moksha—final liberation). Subduing desire by desirelessness, he does not enjoy pleasures that offer themselves. Desireless, giving up the world, and ceasing to act, he knows, and sees, and has no wishes because of his discernment; he is called houseless.”

স্পর্শের স্বরূপ-তত্ত্ব না বুঝিয়া বাহ্যি কৰ্ম্ম করে, তাহাদের দুঃখের অবধি থাকে না । যথা,—

“আর্যভজং হৃক্খ মিণংতি গচ্চা, মায়ী পমাদী পুনরেই গত্ত্বং ।

উবেহমাণে সদক্কেবেহু অংজু, মায়াসিসংকী বরণা পমুচ্চতি ॥”

দুঃখ কি, জানিতে হইবে ; দুঃখের কারণ কি, বুঝিতে হইবে । তার পর, বীরের জ্ঞান দুঃখকে জয় করিতে হইবে,—দুঃখের কারণ পরিহার করিতে হইবে । বীর কাহাকে বলে ? বীর তিনি—যিনি নিরানন্দ জয় করিয়া চির-আনন্দময় আছেন ! বীর তিনি—যিনি কামনা জয় করিয়া নিষ্কাম হইয়াছেন ! বীর তিনি—যিনি মনুষ্যশক্তিকে জয় করিয়া চির-জাগ্রৎ রহিয়াছেন ! বীর তিনি—শক্তি গন্ধ রূপ রস স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াকর্ষক কোনও পদার্থে যিনি আকৃষ্টচিত্ত নহেন । বীর তিনি—যিনি ক্রোধ ও অহঙ্কারকে জয় করিয়াছেন । বীর তিনি—যিনি লোভকে কামনাকে নিরয়-কারণ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন ! আর বীর তিনি—যিনি প্রাণিহত্যা-কার্য্যে বিরত থাকিয়া দুঃখকে বিনাশপূর্ব্বক নির্বাণ-পথের পথিক হইয়াছেন ; অর্থাৎ, প্রাণীকে বিনষ্ট না করিয়া দুঃখকে বিনষ্ট করাই বীরের লক্ষণ ।

“কোহাইমাণং হণিমায বীরে, লোভসু পাসে নিরয়ং মহন্তং ;

তম্হায় বীরে বিরতে বহাও, ছিংদিজ্জ সোয়ং লঙ্কভুর গামী ।

গংথং পরিমায় ইহজ্জ বীরে, সোয়ং পরিমায় চরিজ্জ দংতে ;

উম্মজ্জ লঘুঘু ইহ মাণবেহিং, গো পাণিণো পাণ সমারত্তেজ্জসি ।” *

বীর যিনি, তিনি বন্ধন কি, তাহা জানেন ; দুঃখ কি, তাহাও অবগত আছেন । দুঃখ ও দুঃখের কারণ, বন্ধন ও বন্ধনের হেতু, অবগত থাকিয়া, বীর যিনি, তিনি সংযম-সাধনার প্রভাবে উচ্চগতি প্রাপ্ত হন । যিনি মনুষ্য-জয়ী, তিনি বীর নহেন ; যিনি রাষ্ট্র-বিজয়ী, তিনিও বীর নহেন ; যিনি ক্রোধজয়ী, যিনি মান-জয়ী, যিনি লোভ-জয়ী, যিনি মোহ-জয়ী—তিনিই প্রকৃত বীর । ক্রোধ হইতে মান, মান হইতে মায়া ; মায়া হইতে লোভ, লোভ হইতে অমুরাগ ; অমুরাগ হইতে ঘেব, ঘেব হইতেই মোহ জন্মে । মোহ হইতেই অমুভূতি (গর্ভ-সঞ্চার) ; তাহা হইতেই জন্ম, জন্ম হইতেই মৃত্যু ; মৃত্যু হইতেই নরক । নরকের কল জীবদেহ ; জীবদেহই দুঃখের নিলয় । যিনি একের অমুবর্ত্তন করেন, তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে সকলগুণেরই অমুবর্ত্তী হইতে হয় । জ্ঞানিজন এইজন্ত ক্রোধ মান মায়া লোভ রাগ ঘেব মোহ দূর করিয়া গর্ভ জন্ম মরণ নরকগতি জীবজন্ম ও দুঃখের কবল

“And the hero should conquer wrath and pride,

Look at the great hell (as the place) for greed.

Therefore the hero abstaining from killing,

Should destroy sorrow, going the road of easiness.

Here now the hero, knowing the bondage,

Knowing sorrow, should restrain himself.

Having risen to birth among men,

He should not take the life of living beings.

হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন। এ বিষয়ে জৈন-শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথা,—

“জে এগং নামে সে বহু নামে, জে বহু নামে সে এগং নামে।...সে মেহাবী অভিনি-
বট্টেজ্জা কোইংচ মাংচ মাংচ লোহংচ পেজ্জংচ দোসং চ মোহং চ গন্তং চ মরং
চ পরং চ তিরিয়ং চ হুখং চ এং পাসগস্ দংসং উবরসস্বথ পলিয়ংতকরস্।”

যাহারা সংসারের মোহে আকৃষ্ট, তাহারা পুনঃপুনঃ সংসারেই প্রবিষ্ট হন; জন্ম-জরা-
মৃত্যুর ক্লেশভোগ করেন;—“সমেমাণা পলপাণা পুণো পুণো জাতিং পকলংতি।” যাহারা
সংসারকে চিনিতে পারিয়াছেন, কর্মবন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তাহারা—
“কুস্মুণো সফলত দট্টুং তও গিজ্জতি বেয়ংবি”—কর্মমাত্রকে ফলপ্রসূ বুঝিয়া শাস্ত্রজ্ঞান-
অনুসারে কর্মত্যাগ করিয়াছেন।

সংসারে সর্বাপেক্ষা মোহনীয় সামগ্রী—রমণী। রমণীই সংসার-বন্ধনের প্রধান কারণ।
জৈনশাস্ত্র তাই পুনঃপুনঃ রমণী-সংসর্গ-রূপ প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া
:

রমণী-সংসর্গ
পরিত্যাগ।

গিয়াছেন। জৈনধর্মশাস্ত্রের যে অংশই অনুশীলন করি না কেন,
সেখানেই রমণী-সংসর্গ সম্বন্ধে কঠোর বিধি-বিধান দেখিতে পাই। এ

বিষয় পূর্বেও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে নীতিপ্রসঙ্গেও
অল্প-বিস্তর আলোচনা করিতেছি। আচারানুসারে স্পষ্টতঃ উপদেশ আছে,—মুক্তি-অভিলাষী
পুরুষ কখনও রমণীর সহিত বাক্যালাপ করিবেন না, কখনও রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত
করিবেন না, কখনও কোনও রমণীকে আপনায় আত্মীয় জ্ঞান করিবেন না, কখনও তাহাদের
কোনও কার্য মাত্র সম্পন্ন করিবেন না। এইরূপে বাক্য ও মনে সংযত হইতে পারিলে,
পাপ পরিত্যক্ত হইবে; আর তদ্বারা জ্ঞান-পর্যায়ভুক্ত হওয়া যাইবে। রমণী হইতে চিত্ত
সর্বতোভাবে অপস্থত করা প্রয়োজন। রমণী-সংসর্গে যে সুখ, সে সুখ প্রাপ্তির পক্ষে
হুঃখ আছে; আবার সে সুখ প্রাপ্ত হওয়ার পরও বিপত্তি আছে। নরকাদি যন্ত্রণাভোগ—
সে সুখেরই পরিণতি। সাধুগণ তাই বলিয়াছেন,—“এস সে পরমারামে জাও লোগং-
সিইখিও।” রমণী-সংসর্গ-সুখের অগ্র-পশ্চাৎ যে হুঃখময়, জৈনশাস্ত্র একটা উপমা এইরূপে
তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন;—“পুংবং দংডা পচ্ছা ফাসা, পুংবং ফাসা পচ্ছা দংডা।”
রমণী প্রতি চিত্ত যেন কদাচ আসক্ত না হয়। রমণী-সংসর্গে সুখ-হুঃখ অগ্রপশ্চাৎ ওতঃপ্রোত-
ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। অগ্রে হুঃখ পরে সুখ, অগ্রে সুখ পরে হুঃখ,—এইরূপ প্রতিবন্ধিতা
চলিয়াছে। নির্মল সুখ সে সংসর্গে কদাচ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সে সংসর্গে হুঃখ থাকিবেই
থাকিবে;—সে হুঃখ কখনও পরিহার করিতে পারিবে না। এ বিষয়ে আরও বলা হইয়াছে;—

“আসং চ ছংদং চ বিগিং চ ধীরে। ১।

তুমং চেব তং শল্লমাইটু। ২।

জে সিন্না, তেণ গো সিন্না। ৩।

ইণমেব গাববুজ্জাংতি, জে জণা মোহপাউডা। ৪।

বীলোভপক্কহিএ তে ভো বয়ংতি—‘এদ্বাইং আয়তণাইং।’ ৫।

সে হুখ্খাএ, মোহাএ, মারীএ, গরগাএ, গরগতিরিক্খাএ। ৬।

সততঃ মুঢ়ে দম্বং গাভিজাগতি।

উদাহ বীরে,—‘অঙ্গমাদো মহমোহে।’ ৮।

অর্থাৎ—‘হে বীর পুরুষ! বিষয়ের প্রতি আশা ও লালসা পরিহার কর। ১। যে আশা-রূপ শলা হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া আছে; তাহাকে উৎখাত কর। ২। ভোগাভোগের মোহে যে আবদ্ধ, সে কখনও প্রকৃত সুখের অধিকারী হইবে না। ৩। যে প্রাণী মোহঘোরে আবদ্ধ, সে কদাচ এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে। ৪। যাহারা রমণীর মোহে আসক্ত, তাহারাই বলিয়া থাকে,—‘জীর্ণ গৃহের তরলীশ্বরূপ।’ ৫। কিন্তু রমণীই হৃৎকেন্দ্রে মোহের মরণের নরকের এবং তিথ্যাগাদি গতির হেতুভূত। ৬। মুঢ়জন এ ধর্মতত্ত্ব অবগত নহে। ৭। মহাবীর প্রভু তাই বলিয়াছেন—‘সে মহামোহে কদাচ মগ্ন হইবে না। ৮।’ স্বত্রকৃতাদের চতুর্থ অধ্যায়নে রমণী-সংসর্গ-বিষয়ে আরও কঠোর উপদেশ আছে। যাহারা ধর্মব্রত গ্রহণ করিবেন; তাঁহারা পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিবেন; জীবিত সহিত সম্বন্ধ-রক্ষা তো দূরের কথা, কন্যা বা পুত্রবধূর পর্য্যন্তের সহিত সাক্ষাৎ আলাপ তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। যাহারা শ্রমণ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াও জী-সংসর্গ করেন, তাঁহারা বলাৎকারের অপরাধী বলিয়া গণ্য হন। তাঁহাদের হস্ত-পদ কাটিয়া ফেলিবার এবং গায়ে মংস-চর্ম ছিন্ন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার বিধি পর্য্যন্ত বিহিত আছে। নাগিকা, কর্ণ ও জিহ্বা ছেদন করিয়া সেই সকল নরপিশাচগণের ক্ষতস্থানে জলন্ত দ্রাবক প্রদান করার বিধি পর্য্যন্ত স্বত্রকৃতাদি দৃষ্ট হয়। মধ্যদি সংহিতা-শাস্ত্রেও পরদার-গ্রহণ প্রভৃতি পাপ সম্বন্ধে এবিধ কঠোর অনুশাসন বিহিত আছে। ভর্তৃহরির ‘বৈরাগ্যশতক’ প্রভৃতিতে রমণী-জাতির প্রতি যে বিদ্বেষভাব পরিদৃষ্ট হয়, জৈনশাস্ত্রের অনেক স্থানেই সেই ভাব একটু দেখি। নীতি-শিক্ষার পক্ষে, নৈতিক চরিত্রোন্নতি-সাধন বিষয়ে, এবিধ শিক্ষার যে মূল্য আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে, পুরুষ যে সমাজ-শরীরের অঙ্গস্বরূপ, রমণীও যে সেই সমাজ-শরীরের অঙ্গস্বরূপিনী, কোনও শাস্ত্রই তাহা অস্বীকার করেন নাই। যত কিছু কঠিন-কঠোর বিধি-বিধান, সে কেবল ব্যাভিচার-দমনের উদ্দেশ্যে—নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণের শুভসঙ্কল্প মাত্র। সদাচার, সচ্চারিত্র্য প্রভৃতি সংগুণাবলিসম্পন্ন না হইলে, সংপদ লাভ হইবে কি প্রকারে? সম্বৎসরের অধিকারী না হইলে, সং-অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পঞ্চভূতাত্মক দেহ, জল বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতিতে পরিণত হইতে না পারিলে, ভূতসমূহের সহিত মিশিয়া অভিন্নত্ব লাভ করিতে পারে না। এক্ষেত্রেও তাহাই বুঝিতে হইবে। সম্বৎসরময় না হইলে, মানুষ সংস্বরূপে বিলীন হইবে কি প্রকারে?

সকল শাস্ত্রই তারম্বরে বলিতেছেন,—চিন্ত-বৈধ্বা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যাহার চিন্তা স্থির নহে, সে কখনও সমাধির অধিকারী হয় না। আমাদের শাস্ত্র-গ্রন্থ কি ভাবে কত

প্রকারে এ কথা বক্ত করিয়া গিয়াছেন, চিন্তবৈধ্বাবিস্ময়ে উপদেশ দিয়াছেন,

চিন্তবৈধ্বা। প্রসঙ্গতঃ নানা স্থলেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যোগ আর কি?—

‘যোগশ্চিন্তবৃত্তিনিরোধঃ।’ চিন্তবৃত্তিনিরোধ—চিন্তবৈধ্বা, মুক্তি-লাভ-পক্ষে

প্রথম ও প্রধান আবশ্যক। যাহা হউক, জৈনশাস্ত্রেই বা এসম্বন্ধে কি উক্তি দেখিতে

পাই, অমূল্যকান করিয়া দেখা যাউক । আচারাজ্যের তারতম্যে ঘোষণা করিতেছেন,—

“কিতিগিচ্ছ সমাবল্লগং অপ্রাণেণং গো লভতি সমাধিং ।”

অর্থাৎ,—‘যাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া ফিরিতেছে, সে কখনও সমাধিলাভে সমর্থ হয় না ।’
আবার, সমাধি লাভ ভিন্ন আত্মদর্শন সম্ভবপর নহে । স্মৃতরাং, মোহের বশত রমণী-সঙ্গ প্রভৃতি হইতে চিত্তকে অন্তরিত করিয়া, আব্রহ্মভূতে মন লীন করিতে হইবে । আত্ম-পদার্থে চিত্ত লীন করারই নামান্তর—‘সমাধি ।’ সমাধিই সমদর্শন । সমদর্শনই সমাধির মূল । তাই শাস্ত্রের উপদেশ,—সর্বজীবে সমদর্শী হও । সকলকে আপনার বলিয়া জ্ঞান কর । কায়ে মনে বা বাক্যে কোনও জীবকে কখনও কষ্ট দিবে না, বা কষ্ট দিবার কল্পনা মাত্রও করিবে না । তাহাতে পরিশেষে আপনাকেই কষ্ট পাইতে হইবে । অপরকে যন্ত্রণা দিয়া

যাহার আনন্দ হয়, তাহার জন্ম ততোধিক যন্ত্রণাভোগ পুরোভাগে
মননে বা কর্মে অবস্থিতি করে । এ বিষয়ে জৈনশাস্ত্র অশেষ উপদেশ প্রদান করিয়া
অনিষ্ট-কল্পনা ।

গিয়াছেন । স্মৃদ্ধভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, জৈনধর্মের
মেরুদণ্ডই সর্বজীবে সমদর্শন । এ সম্বন্ধে জৈনশাস্ত্রের একটা প্রধান ও পরম উপদেশ,—

“তুমংসি গাম তং চেব, জং হন্তব্বং তি মমসি । তুমংসি গাম তং চেব,
জং অজ্জাবেয়ব্বতি মমসি । তুমংসি গাম তং চেব, জং পরিভাবেয়ব্বতি
মমসি । তুমংসি গাম তং চেব, জং পরিষেতব্বতি মমসি । এবং তুমংসি
গাম তংচেব, জং উদবেয়ব্বতি মমসি । অংজু চেয়পডিবুদ্ধজ্জীবী তম্হা ।

ণ হন্তা, ণ বিঘায়এ ; অণুসংবেরণ—মপ্রাণেণং, জং হন্তব্বং পাতিপথএ ।” †

কাহাকেও হত্যা করিতে ইচ্ছা করিলে, অথবা কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অথবা কাহাকেও যন্ত্রণা দিতে চেষ্টা পাইলে, অথবা কাহাকেও শাস্তি দিতে বহুপরিকর হইলে, অর্থাৎ মননে বা কর্মে যাহা কিছু পাপ করিবে, সে সকলই নিজের জন্ম সঞ্চিত থাকিবে । জ্ঞানী ব্যক্তি এই সকল বিষয় অবগত আছেন বলিয়া, কদাচ কোনও প্রাণীর অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত বা কোনও প্রাণীর বিনাশের কারণ হন না । জানিয়া শুনিয়া কোনও মানুষই আপনার শাস্তি আপনি আহ্বান করিয়া আনেন না । যাহারা বাক্য মন বা কর্মের দ্বারা কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট না করেন, তাঁহারা পাপের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন ।

* “He whose mind is always wavering, does not reach abstract contemplation (সমাধি) ।”

† জৈনশাস্ত্রে ইহা একটা প্রধান উপদেশ । এই অংশের ইংরাজী অনুবাদ এইরূপ দৃষ্ট হক্—“As it would be unto thee, so it is with him whom thou intendest to kill. As it would be unto thee, so it is with him whom thou intendest to tyrannise over. As it would be unto thee, so it is with him whom thou intendest to torment. In the same way (it is with him) whom thou intendest to punish, and to drive away. The righteous man who lives up to these sentiments, does therefore neither kill nor cause others to kill (living beings). He should not intentionally cause the same punishment for himself.”

জানী যিনি, বিমুক্ত যিনি, তিনি সংসারের সকল সম্বন্ধ-সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন। জানী জানেন, বিমুক্ত যিনি তিনি জানেন,—সকলই অনিত্য, সংসারে আগমন মাত্র করেক দিনের জন্ম।

সুতরাং জানী যিনি, বিমুক্ত যিনি, প্রথমেই তিনি পরিজনবর্গের সম্বন্ধ-বন্ধন বিমুক্ত—জানী। স্বতঃপরতঃ ছিন্ন করিবেন,—কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক, আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক,

নির্লিপ্তভাবে বিচরণ করিবেন। বিমুক্ত তিনিই—যিনি অনিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন! বিমুক্ত তিনি—বাহ্যার চিত্ত পর্কতের ত্রায় দৃঢ় আছে;—যিনি রণজয়ী মত্ত-হস্তীর ত্রায় রিপুজয়ী! বিমুক্ত তিনি—যিনি বিষয়-হেতুভূত সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন,—যিনি স্থান কাল প্রভৃতির সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া উজ্জ্বল জ্ঞানালোকের অমুবর্তী হইতে পারিয়াছেন! বিমুক্ত তিনিই—যিনি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি কোন পদার্থে আকৃষ্ট নহেন। আচারাদ্ব-স্বত্রের উপসংহারে বিমুক্তজনের স্বরূপ-তত্ত্ব এইরূপ বিবৃত আছে;—

“অগিচ্চ মা বাস যুবেংতি জংতুণো, পলোরএ সূচ মিদং অণুত্তরং ;

বিউসিরে বিম্ম অগার বংখণং, অভীক্ক আরংতপরিগ্গহং চএ। ১।

তহাগহং ভিক্খু মণংত সংজয়ং, অণেলিসং বিম্ম চরংত ভেসণং ;

ভুদংতি বারাহিং অভিদবং পরা, সরেহি সংগাময়ং ব কুংজয়ং। ২।

তহপ্পগারেহিং অণেহিং হীলিএ, মসদকাসা ককসা উদীরিয়া ;

তিত্তিক্খএ পাণি অহুট্টেতসা, গিরিক বাতেল ৭ সংপবেবএ। ৩।

উবেহমাণে কুশলেহি সংবসে, অকংত দুক্খা তস থাবরা দুহী ;

অল্লসএ সসসহে মহামুণী, তথাহি সে স্সসমণে সমাহিএ। ৪।

বিহু গতে ধম্মপয়ং অণুত্তরং, বিগীয়তহ্গহস্স মুণিস্স জ়ারও ;

সমাহিয়স্সগ্গিসিহা ব তেরসা, তবো ব পল্লা ব জসা ব বড্ঢতি। ৫।

দিসোদিসি গংতজ্জিণে ৭ তাইণা, মহকর্যা থেমপনা পবেদিতা ;

মহাণ্ডক গিস্সররা উদীরিতা, তমং ব তেউ তিদিং পগাসয়া। ৬।

সিতেহিং ভিক্খু অসিতো পরিবএ, অসজ্জ মিখীসু চএজ্জ পুঅণং ;

অগিস্সিও লোগং মিণং তহা পরং, ৭ মজ্জতী কামণ্ডপেহিং পংডিএ। ৭।

তিহা বিমুক্কস্স পরিপ্পচারিণো, ধিতীমতো দুক্খখমস্স ভিক্খুণো ;

বিসুখ্যাএ জং সি মলং পুরেকডং, সমীরিয়ং রুপ্পমলং ব জোইণা। ৮।

সে হ প্পরিপ্পাসময়ংসি বট্টই, পিরাসসে উবরয়মহুণে চরে ;

ভুঅংগমে জুপ্পতরং জহা জহে, বিমুচ্চতী সে দুহমজ্জ মাহণে। ৯।

জ সাহ ওহং সলিলং অপারগং, মহসমুদং বং ভুয়াহিং দুত্তরং ;

অহেবণং পপ্পিলানাহি পংডিএ, সেণহ মুণী অংতকডে ত্তিবুচ্চই। ১০।

জহাহি বজ্জ ইহ মাণবেহিং, জহায় তেসিং তু বিমোক্খ আহিও ;

অহাভহাংবধবিমোক্খ জে বিউ, সে হ মুণী অংতকডে ত্তি বুচ্চই। ১১।

ইমংমি লোএ পরতে জ দোহুবি, ৭ বিজ্জই বংখণং জস্স কিংচিবি ;

সে হ পিরালংবণে অপ্পতিটে, কলংকলী ভাবমহং বিমুচ্চই। ১২।”

ধর্মার্থ,—‘জীবের এই আবাস অনিত্য। এই সত্য অবগত হইয়া, অন্তরে অন্তরে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। সেই বিচারের ফলেই, জ্ঞানিগণ ইহসংসারের পারি-
 বারিক সকল প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবেন,—নির্ভয়ে কর্ম এবং আসক্তি
 পরিত্যাগ করিবেন। ১। পার্থিব পদার্থের সহিত সষঙ্কবিহীন হইয়া বিজ্ঞ ভিক্ষু যখন ভিক্ষা
 চাহিয়া করেন, বাক্যে ও কার্যে জনসাধারণ তাঁহার প্রতি কতই দুর্ক্যবহার করিয়া থাকে।
 কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মত্তহস্তী যেমন তীরবৃষ্টিকে অবহেলায় উপেক্ষা করে, নিম্পৃহ সন্ন্যাসী
 লোকের অত্যাচারও সেইরূপ অবোধে সহ্য করেন। ২। বজ্রাবাতে যেমন পর্কিত বিচঞ্চল
 হয় না, মানুষের বাক্যে বা উপদ্রবে বিজ্ঞ ভিক্ষুগণও সেইরূপ অবিচলিত-চিত্ত থাকেন। ৩।
 সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্ভিক্ষপদে উপেক্ষা করিয়া, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী হইয়া, সাধুসঙ্গে যিনি
 বাস করেন; গতিশীল বা গতিহীন কোনও জীবের কোনরূপ অনিষ্ট-সাধনে যিনি পরাশ্রুত;
 তিনিই প্রকৃত শ্রমণ-পদবাচ্য। ৪। প্রজ্জলিত অগ্নির শিখা যেমন প্রভা বিস্তার করে; যে
 মুনি সাংসারিক অশেষ যন্ত্রণা সহ করিয়া তৃষ্ণাত্যাগী ধ্যানপরায়ণ ও ধর্মপদাত্মচারী হইয়াছেন,
 তাঁহার জ্ঞান ও গৌরব সেইরূপ স্বতঃবিকাশপ্রাপ্ত হয়। ৫। আলোক যেমন ত্রিলোকের
 অন্ধকার নাশ করে, জিনদেবের আদেশানুযায়ী মহাব্রত নিষ্কাম সাধুগণ সেইরূপ সংসারকে
 জ্ঞানালোকে আলোকিত করেন। ৬। তিনিই বিমুক্ত,—যিনি এই বন্ধনমূল সংসারের মধ্যে
 নিম্পৃহ ভিক্ষুর জীবন যাপন করেন,—ইহলোকে বা পরলোকে যাহার কোনও আকাঙ্ক্ষা
 নাই, এবং কামক্ষণের দ্বারা কদাচ যাহার জ্ঞানের পরিমাপ হয় না। ৭। অশেষ কষ্ট
 সহ করিয়াও যিনি জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন, অগ্নি দ্বারা সংস্কৃত রৌপ্যের স্তায় তাঁহার
 পূর্বকৃত পাপ-কলুষ দূরীভূত হয়। ৮। কামনার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া,
 কামকে জয় করিয়া, সংযম-সাধনার ফলে যিনি জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করিয়াছেন; তিনিই
 পরম সুখী। সর্প যেমন জীর্ণ-চর্ম পরিত্যাগ করে, ব্রাহ্মণ সেইরূপ দুঃখ-শয্যা পরিত্যাগ
 করেন। ৯। মানুষ মহাসমুদ্রকে যেমন অনন্ত-অসীম জলরাশি বলিয়া জানে, সত্ত্বরূপে যেমন
 মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব; বিজ্ঞান সংসারকেও সেইরূপ হুপার অনন্ত গাণের নিলয়
 বলিয়া অবগত আছেন। সেই কারণেই, যিনি জ্ঞানী—মুনি, ইহসংসারে তিনি দুঃখের অন্তকারী
 বলিয়া অভিহিত হন। ১০। বন্ধনই বা কি, আর মুক্তিই বা কি, তাহা (জৈনধর্মে)
 বিধোষিত হইয়াছে। ধর্মের শিক্ষা অল্পসারে যিনি বন্ধন ও মুক্তির বিষয় সর্বতোভাবে
 পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেই জ্ঞানী জনই ইহসংসারের সকল দুঃখের অন্তকারী বলিয়া অভিহিত
 হন। ১১। ইহসংসারে যাহার কোনও বন্ধন নাই; স্বর্গে ও নরকে অথবা অন্ত কোনও
 মহাদেশে যিনি কোনও সষঙ্কই রাখেন নাই; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোনও আধারের বা
 আশ্রয়ের আবশ্যক করে না। তিনিই সর্বতোভাবে জন্মের পথ রোধ করিয়াছেন। বিমুক্ত
 তাঁহাকেই বলে। ১২।’ ফলতঃ, মান, মায়া, ক্রোধ, লোভ, ভয়-বিভীষিকা প্রভৃতির
 কোনও আকর্ষণে যিনি আকৃষ্ট নহেন; পরন্তু, সকল বিভীষিকার অতীত, যিনি সকল প্রকার
 সাংসারিক সষঙ্ক-বন্ধন ছেদন করিতে পারিয়াছেন; একমাত্র তিনিই বিমুক্ত নামে অভিহিত
 হইয়া থাকেন।

কি কঠোর সংযম-সাধনার ফলে, সেই বিমুক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, জৈনশাস্ত্র ভিক্ষুর প্রতিপাল্য বিধি-বিধানের তাহা পুনঃপুনঃ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

পরিগ্রহণ-কালে যে প্রতিজ্ঞা-পঞ্চকে আবদ্ধ হইতে হয়, তদ্বিষয় অনুধাবন পক্ষমহাত্রত। করিলে, বিষয়টী বুঝিতে পারা যায়; আর তদ্বারাই মুক্তির পথ পুরোভাগে

পরিদৃশ্যমান হয়। সেই পঞ্চপ্রতিজ্ঞা জৈনশাস্ত্রে ‘পঞ্চ-মহাত্রত’ নামে অভিহিত। মহাবীর প্রভু, মহানির্বাণ-লাভের সময়, পূর্ণ-জ্ঞান-সম্পন্ন অবস্থায়, সেই ‘পঞ্চ-মহাত্রত’ গ্রহণের বিষয় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। নিগ্রহ্‌গণ এবং শ্রমণগণ সেই পঞ্চ-মহাত্রত পালন করিবেন। ভিক্ষু-ধর্ম গ্রহণকালে প্রত্যেককে সেই মহাত্রত পালন জন্য প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। পঞ্চ-মহাত্রতের প্রত্যেক মহাত্রতের মধ্যে পাঁচটি করিয়া ভাবনা বা বিভাগ আছে। সেই মহাত্রত-পঞ্চক ও তদন্তর্গত ভাবনা-সমূহ বোধগম্য হইলে, জৈন-ধর্মনীতির মূল তথ্য উপলব্ধি হইবে। মহাবীর প্রভুর উপদিষ্ট সেই পঞ্চ-মহাত্রতের অন্তর্গত প্রথম মহাত্রত; যথা,—

“পটমং ভংতে মহবয়ং,—‘পচ্চক্খামি সবং পানাইবায়ং;

সে সূহমং বা, বায়রং বা, তসং বা, থাবরং বা, গেব সয়ং পাণাইবায়ং করেজ্জা;

জাবজ্জীবাএ তিবিহংতিবিহেণং মণসা বয়সা কায়সা।

তসং ভংতে পড়িক্খামি, নিংদামি, গরিহামি, অগ্নাণং বোসিরামি’।”

অর্থাৎ,—আমি এই প্রথম মহাত্রত গ্রহণ করিতেছি;—‘আমি সর্ব প্রাণাতিপাত ত্যাগ করিলাম; স্বপ্ন কিংবা স্থূল, গতিশীল কিংবা গতিহীন (স্থাবর ও অস্থাবর), কোনও প্রাণীকেই আমি নিহত করিব না। স্বয়ং প্রাণীহত্যায় বিরত থাকিব। অপরের কৃত হত্যাকাৰ্য্যের সহায় হইব না, এবং কোনরূপ প্রাণীহত্যা-কর্মে কখনও অনুমোদন করিব না। যতদিন জীবিত থাকিব, মন বাক্য কায় ত্রিবিধ উপায়ে প্রাণীহত্যা-রূপ পাপকাৰ্য্যে বিরত থাকিব, ঐরূপ পাপ কাৰ্য্যের জন্য অনুশোচনা করিব, ঐরূপ পাপকাৰ্য্যকে সর্বথা দূষণীয় বলিয়া ঘোষণা করিব।’

এই প্রথম মহাত্রতের অন্তর্গত ভাবনা-পঞ্চক; যথা,—প্রথম ভাবনা;—অতি সাবধানতার সহিত, একটুও অসাবধান না হইয়া, নিগ্রহ্‌ পাদচারণা করিবেন। কেবলী ইহার কারণ নির্দেশ করিয়াছেন যে,—‘যদি কোনও নিগ্রহ্‌ অসাবধানভাবে বিচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পদতলে পড়িয়া কত জীবিত প্রাণী আহত নিহত স্থানভ্রষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। এই কারণ নিগ্রহ্‌গণ পদচালনে সতত সাবধান থাকিবেন। কখনও অসাবধান হইয়া তাঁহারা পরিভ্রমণ করিবেন না।’

দ্বিতীয় ভাবনা এইরূপ;—নিগ্রহ্‌ নিরন্তর আপন চিত্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। চিত্ত যদি পাপপূর্ণ হয়, অভিপ্রায় যদি দূষণীয় থাকে, আর তদ্রূপ যদি কোনও প্রাণীর কোনরূপ যন্ত্রণার আশঙ্কা থাকে, নিগ্রহ্‌ কখনও চিত্তকে সে পথে পরিচালিত করিবেন না। পরন্তু, যে কাৰ্য্যে কোনও পাপের সম্ভাবনা নাই, চিত্তকে সেইদিকে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে।

তৃতীয় ভাবনা এইরূপ; যথা,—নিগ্রহ্‌কে সতত আপনার বাক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাক্য যদি পাপপূর্ণ দোষাবহ বা কোনও প্রাণীর কোনরূপ অনিষ্টকর হয়, সে

বাক্য কখনও তিনি উচ্চারণ করিবেন না । পরন্তু, যে বাক্য পাপশূন্য, যে বাক্য কোনও প্রাণীর অনিষ্টসাধক নহে, সেই বাক্য মাত্র তিনি উচ্চারণ করিতে পারিবেন ।

চতুর্থ ভাবনা এইরূপ ;—নিগ্রহ আপন ভিক্ষাপাত্র-রক্ষণে সদা সাবধান থাকিবেন, কদাচ অসাবধান হইবেন না । কেবলী বলিয়াছেন,—‘যে নিগ্রহ আপন ভিক্ষাপাত্র রক্ষার অসাবধান, তাঁহার দ্বারা সর্বপ্রকার জীবের সংহার-সাধন বা কোন-না-কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে । এই কারণ নিগ্রহকে ভিক্ষাপাত্র রক্ষার কার্যে পর্য্যন্ত সাবধান থাকিতে হইবে, কদাচ অসাবধান হইলে চলিবে না ।’

পঞ্চম ভাবনা এইরূপ ;—নিগ্রহ আপন খাদ্য ও পানীয় বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে তাহা গ্রহণ করিবেন । ভালরূপ না দেখিয়া কোনও দ্রব্য আহার করা বা পান করা, তাঁহার কখনও কর্তব্য নহে । কেবলী বলিয়াছেন,—‘যে নিগ্রহ ভালরূপ না দেখিয়া শুনিয়া পানাহার গ্রহণ করেন, তাঁহার দ্বারা প্রাণীর প্রাণনাশ প্রভৃতি অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে । অতএব, খাদ্য ও পানীয় বিশেষরূপ পরীক্ষা ভিন্ন কোনও নিগ্রহ কখনও গ্রহণ করিবেন না ।’

উল্লিখিত প্রথম মহাব্রত এবং তদন্তর্গত ভাবনা-পঞ্চক কায় মন ও বাক্য দ্বারা পালন করিতে হইবে । আপনার কার্যে উহার সার্থকতা দেখাইতে হইবে । অপরকে উহার সার্থকতা বুঝাইয়া দিতে হইবে । উহার সার্থকতা-পক্ষে সর্বথা প্রযত্নপর থাকিতে হইবে, এবং আজ্ঞা-প্রমাণে উহার সাধনা করিতে হইবে । প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি-বিধায়ক—ইহাই প্রথম মহাব্রত । অতঃপর মহাবীর স্বামীর উপদিষ্ট দ্বিতীয় মহাব্রত,—

“অহাবরং দোহং মহাক্ষরং,—‘পচক্খামি সসং সুসাবায়ং বতিদোসং সে কোহাবা, লোহাবা, ভয়াবা, হাসাবা, গেব সয়ং মুসং ভাসেজ্জা, গেবল্লোং মুসং ভাসায়েজ্জা, অয়ং পি মুসং ভাসতং ণ সমগ্গজ্ঞাণেজ্জা, ত্রিবিহং তিবি হেণং, মণসা বয়সা কায়সা, তন্তু ভংতে পড়িক্কামি জাব বোসিরামি ।”

অর্থঃ,—‘ক্রোধ, লোভ, ভয় বা হাঙ্গুর জন্তু মিথ্যা-বাক্য-রূপ বচন-দোষ পরিত্যাগ করিতেছি । আমি কদাচ মিথ্যা বলিব না, কাহারও মিথ্যা বাক্যের হেতু হইব না, অথবা কাহারও মিথ্যা-কথনে কদাচ অহুমোদন করিব না । কায়মনোবাক্য ত্রিবিধ উপায়ে যাবজ্জীবন মিথ্যা পরিহার করিব ; মিথ্যার জন্ত অনুশোচনা করিব, এবং মিথ্যা ভাষণে অশ্রুকে প্রতিক্রিয়িত করিব,—মিথ্যার দোষ দেখাইব ।’

এই দ্বিতীয় মহাব্রত পঞ্চ-ভাবনার বিভক্ত । সেই ভাবনা-পঞ্চকে উপদেশ আছে ;

(১) নিগ্রহ বিচার-পূর্বক বাক্য প্রয়োগ করিবেন । বিচার না করিয়া কদাচ কথা কহিবেন না । কেবলী বলিয়াছেন,—‘বিচার-পূর্বক বাক্য-প্রয়োগ না করিলে মিথ্যা বাক্য উচ্চারিত হইতে পারে ।’ (২) নিগ্রহ ক্রোধের স্বরূপ অবগত হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ করিবেন । কেবলী বলিয়াছেন,—‘যে নিগ্রহ ক্রোধের দ্বারা অভিভূত হন, তিনি ক্রোধবশে মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করিতে পারেন ।’ (৩) নিগ্রহ লোভের স্বরূপ অবগত হইয়া লোভ পরিত্যাগ করিবেন । কেবলী বলিয়াছেন,—‘যে নিগ্রহ লোভের দ্বারা অভিভূত হন, তিনি লোভ-বশতঃ মিথ্যা বাক্য বলিতে পারেন ।’ (৪) নিগ্রহ ভয়ের স্বরূপ অবগত হইয়া ভয় পরিহার

করিবেন। কেবলী বলিয়াছেন,—‘যে নিগ্রহ ভয়ের দ্বারা অভিভূত হন, ভীত হইয়া তিনি মিথ্যা কথা বলিতে পারেন।’ (৫) নিগ্রহ হাত্তের স্বরূপ অবগত হইয়া হাত্ত পরিহার করিবেন। কেবলী বলিয়াছেন,—‘হাত্ত পরিহাসে অভিভূত হইয়া নিগ্রহ মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করিতে পারেন।’ প্রথম মহাত্মতের জ্ঞান এই দ্বিতীয় মহাত্মত কার্যমনোবাক্যে পালন করিতে হইবে।

মহাবীর প্রভুর উপদিষ্ট পঞ্চ-মহাত্মতের অন্তর্গত তৃতীয় মহাত্মত ; যথা,—

‘অহাবরং তচ্চ মহাবরং,—‘পচ্চকথতি সৰ্বং অদিগ্না দাগং ;

সে গামে বা গগরে বা অরণ্যে বা অগ্নং বা বহং বা অগুং বা

খুলং বা চিন্তমংতং বা অচিন্তমংতং বা শেব সন্নং অদিগ্নং গিগ্গহেজ্জা,

শেবল্লোহিং অদিগ্নং গেগ্গহাবেজ্জা, অগ্নংপি অদিগ্নং গিগ্গহংতং ণ

সমগ্গ্জাণেজ্জা ; জাবজ্জীবারে, জাব বোসিরামি।’

অর্থাৎ,—‘প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদত্ত দ্রব্য কদাচ গ্রহণ করিব না। গ্রামে বা নগরে বা অরণ্যে, ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, অল্প হউক বা অধিক হউক, জীবিত হউক বা মৃত হউক, অদত্ত কোন বস্তুই আমি গ্রহণ করিব না। আপনি লইব না ; অপরে লওয়ার কারণ হইব না ; অথবা অপরের লওয়ার অনুমোদন করিব না।’

এই তৃতীয় মহাত্মতের অন্তর্গত ভাবনা-পঞ্চক ; যথা,—(১) নিগ্রহ বিচার-পূর্বক, বিশিষ্ট কারণ বিস্তর্যানে, ভিক্ষার্থী হইতে পারেন। অবিচারে কখনও তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। কেবলী বলিয়াছেন,—‘যদি কোনও নিগ্রহ বিশিষ্ট কারণ ভিন্ন মর্কিচারে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহাতে তিনি অদত্তগ্রহণকারী হইতে পারেন।’ (২) নিগ্রহ শুক্লর অনুজ্ঞাক্রমে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিবেন। বিনামুমতিতে তাঁহার পানাহার অবিধি। কেবলী বলিয়াছেন,—‘যদি কোন নিগ্রহ আচার্য্যের অনুমতি ব্যতীত পানাহার গ্রহণ করেন, তাহাতে তাহার পক্ষে অদত্তাহার অসম্ভব নহে।’ (৩) নিগ্রহ সীমাবদ্ধ স্থানে নির্দিষ্ট কালের জন্ত অবস্থান করিবেন। কেবলী বলেন,—‘যদি কোন নিগ্রহ নির্দিষ্ট কালের জন্ত সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে অবস্থিতি না করেন, তাহা হইলে অদত্ত-গ্রহণ-পাপে লিপ্ত হইতে পারেন।’ (৪) নিগ্রহ যেখানেই বাস করুন, সর্বদা তদ্বিষয়ে ভূস্বামীর সম্মতি গ্রহণ করিবেন। কেবলী বলিয়াছেন,—‘যদি কোন নিগ্রহ আপন বাসস্থান বিষয়ে ভূস্বামীর অনুমতি গ্রহণ না করেন, তাহাতে অদত্ত-গ্রহণ-জনিত পাপ স্পর্শিতে পারে।’ (৫) নিগ্রহ আপন সহধর্মীর বাসের জন্ত বিচার-পূর্বক সীমাবদ্ধ স্থান ভিক্ষা করিতে পারেন ; কিন্তু অবিচারে কখনও নহে। কেবলী বলিয়াছেন,—‘বিচার না করিয়া যদি কোনও নিগ্রহ স্থান-ভিক্ষা করেন, তাহাতে অদত্ত-গ্রহণ-জনিত পাপ বর্জিতে পারে।’ এই তৃতীয় মহাত্মত, পঞ্চভাবনা-সহ, কার্যমনোবাক্যে প্রতিপালন করিতে হইবে।

মহাবীর স্বামীর উপদিষ্ট পঞ্চ-মহাত্মতের অন্তর্গত চতুর্থ মহাত্মত ; যথা,—

অহাবরং চউথং মহাবরং,—‘পচ্চকথামি সৰ্বং মেহগং ;

সে দিব্বং বা মাগুসং বা, তিরিক্খজোণিসং বা,

ণেব সন্নং মেহুণে গচ্ছে, তং চেব

অদিগ্নাদানবত্তব্বয়া ভাণিয়ব্বা জাববোসিরামি ।”

অর্থাৎ,—‘আমি সৰ্ব্বপ্রকার মৈথুনসুখ পরিহার করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছি । দেব মহাশয়! বা তিৰ্থাঙ্ক—কিছুতেই আসক্ত হইব না । আমি সৰ্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়-সেবার বিরত থাকিব ।’

এই চতুর্থ মহাব্রতের ভাবনা-পঞ্চক ; যথা,—(১) নিগ্রহ বারম্বার জীলোকের কথা আলোচনা করিবেন না । কেবলী বলিয়াছেন,—‘পুনঃপুনঃ রমণীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে অধঃপতন ঘটিতে পারে, অশান্তি আসিতে পারে ।’ (২) রমণীর মনোহারিনী মূর্তির বিষয়ে নিগ্রহ কখনও চিন্তা করিবেন না । কেবলী বলিয়াছেন,—‘তজ্জপ চিন্তায় অধঃপতন ঘটে,—শান্তি ভঙ্গ হয় ।’ (৩) পূর্বে জীসংসর্গে যে সুখ বা যে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, নিগ্রহ ভ্রমেও কখনও সে স্মৃতি মনে আনিবেন না । কেবলী বলিয়াছেন,—‘সে আনন্দের বা সে সুখের স্মৃতি দারুণ অশান্তির ও অধঃপতন হেতুভূত ।’ (৩) নিগ্রহ কদাচ অধিক খাওয়া বা অধিক পানীয় গ্রহণ করিবেন না । তাঁহার পক্ষে, মত্তপান বা অতিরিক্ত রসবান্ খাওয়া গ্রহণ নিষেধ । কেবলী বলিয়াছেন,—‘অতিরিক্ত পান-ভোজন-হেতু, অথবা মত্তপানে এবং অতিরিক্ত রসবান্ খাওয়া-গ্রহণে অশান্তি ও অপবিত্রতা আসে ।’ (৫) নিগ্রহ কদাচ জী পশু অথবা নপুংসক পরিবৃত্ত হইয়া কোনও শয্যা শয়ন বা উপবেশন করিবেন না । কেবলী বলিয়াছেন,—‘যে শয্যা-সান্নিধ্যে জীগণ পঞ্চাদি অথবা নপুংসক অবস্থিতি করে, সে শয্যা উপবেশন বা শয়ন করিলে নিগ্রহের অশান্তি ও অধঃপতন ঘটে ।’ এই চতুর্থ মহাব্রত, ভাবনা-পঞ্চক-সহ, কায়মনোবাক্যে প্রতিপালন করা আবশ্যক ।

মহাবীর স্বামীর উপদিষ্ট পঞ্চম মহাব্রত ; যথা,—

অহাবরং পংচমং মংতে মহব্বরং,—‘সব্বং পরিগ্গহং পচ্চক্খামি ;

সে অঙ্গং বা বহুং বা অণুং বা থূলং বা চিত্তমংতং বা অচিত্ত-

মংতং বা ণেব সন্নং পরিগ্গহং গিণ্হজ্জা, ণবল্লেণ পরিগ্গহং গিণ্হবিজ্জা,

অল্লং পি পরিগ্গহং গিণ্হংতং ণ সন্নগু জাণেজ্জা জাব বোসিরামি ।’

অর্থাৎ,—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি সৰ্ব্বপরিগ্রহ (অর্থাৎ সংসার-সুখের সকল প্রকার আসক্তি) পরিত্যাগ করিলাম । অঙ্গ বা অধিক, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, জীবিত বা মৃত, কোনও পদার্থের প্রতি আর আমার আসক্তি থাকিবে না । আমি নিজে কাহারও প্রতি অনুরক্ত হইব না, কাহারও অনুরাগের কারণ হইব না, অথবা কাহারও অনুরাগ অনু-মোদন করিব না । অপিচ, কায়মনোবাক্যে—ত্রিবিধ উপায়ে আপনাকে আসক্তির বিষয় হইতে অন্তরিত করিব ।

পঞ্চম মহাব্রতের ভাবনা-পঞ্চক ; যথা,—(১) কর্ণে তৃপ্তিকর ও অতৃপ্তিকর শব্দ ধ্বনিত হয় । কিন্তু, তৃপ্তিকরই হউক আর বিরক্তিকরই হউক, কোনও শব্দই আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয় ; অথবা কোনও শব্দই আনন্দপ্রদ, অভিলাষিত, মোহদ, বিবেক-ভ্রষ্ট বা বিরক্তিকর হওয়া কর্তব্য নহে । কেবলী বলিয়াছেন,—‘যদি কোন নিগ্রহ আনন্দকর অথবা নিরানন্দকর শব্দ শ্রবণে অভিভূত হন, তাহা হইলে তাঁহার পতন ও অশান্তি

‘অনিবার্য্য।’ (২) দর্শন ইন্দ্রিয়ে তৃপ্তিপ্রদ ও অতৃপ্তিকর দৃশ্য (বর্ণ প্রভৃতি) প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাহার প্রতি কদাচ আসক্ত হওয়া উচিত নয়। দৃশ্য-পদার্থে আনন্দ, নিরানন্দ, অমুরাগ, বিরাগ প্রভৃতি পরিহর্তব্য। কেবলী বলিয়াছেন,—‘যদি কোনও নিগ্রহ তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর দৃশ্য-পদার্থে অভিভূত হন, তাহার অধঃপতন অনিবার্য্য।’ (৩) ব্রাহ্মেন্দ্রিয়ে তৃপ্তিকর এবং অতৃপ্তিকর গন্ধ উপস্থিত হয়। কিন্তু, তাহাতে কদাচ আসক্ত হওয়া কর্তব্য নহে। ‘যিনি ব্রাহ্মেন্দ্রিয়ের কার্য্যে অভিভূত হন’, কেবলী বলিয়াছেন, ‘তাঁহার অধঃপতন ও অশান্তি অনিবার্য্য।’ (৪) রসেন্দ্রিয়ে তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর আশ্বাদ পরিপরিগৃহীত হয়। কিন্তু তৎপ্রতি আসক্ত হওয়া কর্তব্য নহে। কেবলী বলিয়াছেন,—‘যে নিগ্রহের রসেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর আশ্বাদে অভিভূত হয়, তাহার অধঃপতন ও অশান্তি অবশ্যম্ভাবী।’ (৫) স্বগেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর স্পর্শ অনুভব করে। সে অনুভব পরিভ্যাজ্য। কেবলী বলিয়াছেন,—‘যে নিগ্রহ স্পর্শেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর স্পর্শে অভিভূত হন, তাঁহার অধঃপতন ও অশান্তি অপরিহার্য্য।’

সার উপদেশ ।

সর্বশাস্ত্রেরই সার উপদেশ,—‘জানী হও, জ্ঞানলাভ কর; কেন না, জ্ঞানই মুক্তি—জ্ঞানামুক্তিঃ।’ কিন্তু জ্ঞান কি, আর কিরূপেই বা তাহা অধিগত হয়? উপরি উক্ত পঞ্চ-মহাব্রতের অনুশীলন উপলক্ষে জৈন-শাস্ত্র তাহারই উপদেশ দিতেছেন; ^{জ্ঞানলাভে প্রধান আবশ্যক।} বলিতেছেন—‘তোমার সকল অনর্থের সকল মোহের মূল—তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম; যদি জ্ঞানলাভ করিতে চাও, যদি মুক্তির প্রয়াসী হও, তবে তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামকে আগে বশীভূত কর। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে না পারিলে, তোমার সকল প্রযত্নই ব্যর্থ হইবে।’ সার শিক্ষা—ইন্দ্রিয়-সংযম। সে সংযম কেমনভাবে অর্জন করিতে হইবে, অতঃপর তাহারই উপদেশ প্রদান করা হইতেছে। প্রথম—শ্রবণেন্দ্রিয়। উহার সংযম কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে? শ্রবণেন্দ্রিয়ে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইবে; সে ধ্বনি রোধ করিতে পারিবে না, সত্য; কিন্তু, তৃপ্তিকর হউক বা অতৃপ্তিকর হউক, অমুরাগ বা বিরাগ তাহাতে যেন সঞ্চিত না হয়, ইহাই সার উপদেশ।

ধো সন্না গ সৌউং সদা, সোরবিসর মাগতা ;

রাগদোসাউ জে তথ, তং ভিকখু পরিবজ্জএ । ১ ।

ভিক্ষু সন্ন্যাসী বা মুনি তাঁহাকেই বলি, বিমুক্তি তাঁহারই অধিগত হয়,—কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইলেও কোনরূপ শব্দে কদাচ তাহার অমুরাগ বা বিরাগ উপস্থিত হয় না; শ্রবণেন্দ্রিয়ের সংযম তাঁহারই হইরাছে; শ্রোত্র তাঁহারই সার্থক।

এইরূপ, নেত্র—তাঁহারই সার্থক,—কোনরূপ দৃশ্য-পদার্থে যিনি আসক্ত বা বিরক্ত নহেন।

ধো সন্না রুব মদট্টং, চকখুবিসর মাগরাং ;

রাগদোসাউ জে তথ, তং ভিকখু পরিবজ্জএ ।

নেত্রপথে তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর দৃশ্যপট নিপতিত হইবেই হইবে; কেহ তাহা রোধ

করিতে পারিবে না । কিন্তু, প্রকৃত ভিক্ষু যিনি, জ্ঞানী যিনি,—দৃষ্ট-পদার্থের প্রতি অমুরাগ বা বিরাগ তিনি যুগপৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন ।

এইরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাঁহারই সার্থক,—যিনি কোনরূপ আত্মাণে আকৃষ্ট নহেন ।

গো সন্ধা গন্ধ মগ্ধাউ, গাসাবিসয় মাগয়ং ;

রাগদোসাউ জে তথ, তং ভিক্ষু পরিবজ্জএ ।

নাসারক্কে, গন্ধ প্রবেশ করিতেছে ; সে গতি কে রোধ করিবে ? কিন্তু প্রকৃত ভিক্ষু যিনি, যতি যিনি,—তৃপ্তিকরই হউক বা অতৃপ্তিকরই হউক, কোনরূপ গন্ধের প্রতি তাঁহার অমুরাগ বা বিরাগ নাই । সর্বপ্রকার আত্মাণেই তাঁর নির্লিপ্ত ভাব ।

এইরূপ, তাঁহারই রসেন্দ্রিয় সার্থক,—যিনি কোনরূপ আত্মাদে আকৃষ্ট নহেন ।

গো সন্ধং রস মণাসাতুং, জীহাবিসয় মাগয়ং ;

রাগদোসাউ জে তথ, তে ভিক্ষু পরিবজ্জএ ।

রসনার তৃপ্তিকর বা অতৃপ্তিকর আত্মাদ উপস্থিত হইবেই হইবে ; কিন্তু ভিক্ষু যিনি, যতি যিনি,—কোনরূপ আত্মাদেই তাঁহার প্রাণে অমুরাগ বা বিরাগ সঞ্চারিত হইবে না ।

তার পর, স্পর্শেন্দ্রিয়ের কথা । তাঁহারই স্পর্শেন্দ্রিয় সার্থক,—যিনি আদৌ স্পর্শানুভবে আসক্ত নহেন । সর্ববিধ স্পর্শেই তাঁহার অনাসক্ত ভাব ।

গো সন্ধং ফাসং ণ বেদেতুং, ফাসং বিসয়মাগয়ং ;

রাগদোসাউ জে তথ, তে ভিক্ষু পরিবজ্জএ ।

স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্পর্শ অনিবার্য ; কিন্তু, স্পৃহকরই হইক, বা হৃৎকরই হউক, তৃপ্তি প্রদই হউক, আর অতৃপ্তি প্রদই হউক, স্পর্শেন্দ্রিয়ের কোন কার্যে যাহার অমুরাগ বা বিরাগ নাই, অর্থাৎ যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের সকল অমুরাগ-বিরাগ পরিত্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু । বিমুক্তি তাঁহারই অধিগত ।

বিবিধ নীতি-কথা ।*

জৈন-ধর্মগ্রন্থ-সমূহ—যেমন প্রাকৃত ভাষায়, তেমনই সংস্কৃত-ভাষায় বিরচিত । সুতরাং জৈন-ধর্মের প্রাচীন নীতি-সমূহ যেমন প্রাকৃত ভাষায় প্রচারিত ; তেমনই সংস্কৃত-ভাষায়ও বহু

জৈন-নীতি প্রচারিত আছে—দেখিতে পাই । * জৈন-শাস্ত্রে জ্ঞানের

বিবিধ নীতিকথা । শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র বিঘোষিত । ভাবহীন ক্রিয়ার সহিত যোগসিদ্ধ জ্ঞানের তুলনা করা হইয়াছে । সে তুলনার পরস্পরের কি পার্থক্য, তাহা

‘যোগদৃষ্টিসমুচ্চর’ নামক গ্রন্থে একটি উপমায় এইরূপ ভাবে বিবৃত আছে ; যক্ষ,—

“তাৎকালিকপক্ষপাতভাবশূভা চ বা ক্রিয়া । অনমোরন্তরং জেরং ভাষ্যন্তোন্তরোণিব ॥”

অর্থাৎ,—‘যোগলব্ধ জ্ঞানের সহিত ভাবশূন্ত ক্রিয়ার প্রভেদ, সূর্য্যের ও খন্তোত্তের প্রভেদের

* এ বিষয়ে যগীর রামদাস সেন মহাশয় “জৈনমত সমালোচন” গ্রন্থে বাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সকলিও জ্ঞাতব্যতত্ত্বপূর্ণ নীতিকথার কয়েকটি মাত্র আমরা এইস্থলে উদ্ধৃত করিলাম । বঙ্গ-ভাষায় জৈন-মত আলোচনা বিষয়ে, বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই পথপ্রদর্শক বলিয়া মনে করিতে পারি ।

জ্ঞান ।' এই জ্ঞান সম্বন্ধে ('দ্রব্যাস্বযোগ টীকাকারের' ব্যাখ্যায়) আরও লিখিত আছে,—

“জ্ঞানং হি জীবন্ত গুণো বিশেষো জ্ঞানং ভবাক্কেত্তরংগেণ পোতঃ ।

জ্ঞানং হি মিথ্যাস্বভবোবিনাশো ভানুঃ কৃশাভুঃ পৃথুকর্ষকক্ষে ॥

জ্ঞানং নিধানং পরমং প্রধানং জ্ঞানং সমানং ন বহুক্রিয়াভিঃ ।

জ্ঞানং মহানন্দরসং রহস্তং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম জদ্রত্যানন্তম্ ॥

বাহ্যগারপরাস্ত বোধরহিতা ইজ্যাস্বযোগোক্ততাঃ ।

যে কেহপি প্রতিসেবনাবিধুরিতান্তে নিন্দিতাঃ শাসনে ॥”

অর্থাৎ,—“জ্ঞান জীবের একটি বিশেষ গুণ, জ্ঞানই ভব-সমুদ্র তরণের নৌকা, জ্ঞানই মিথ্যাত্ব অজ্ঞানের বিনাশক। জ্ঞানই কর্মরূপ ভূণের অগ্নি। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও প্রধান, জ্ঞান কোন প্রকার ক্রিয়ার তুল্য হয় না। জ্ঞানই আনন্দ, জ্ঞানই রহস্ত, জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম। বাহ্যার রহস্য আচারে রত, যাগ-যজ্ঞযোগে উদ্ধত, প্রতিসেবন অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত, তাহার জৈনশাস্ত্রসম্মত নিন্দ্য ব্যক্তি।” জিনদত্ত স্থরি কৃত ‘বিবেক-বিলাস’ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে

যে সকল জৈন-নীতি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা;—

“গুণিনঃ স্মৃতং শৌচং প্রতিষ্ঠা গুণগোরবম্ । অপূর্ণজ্ঞানলাভশ্চ যত্র তত্র বসেৎ সূধীঃ ॥ ১ ।

বালরাজ্যং ভবেদ্যত্র দৈরাজ্যং যত্র বা ভবেৎ । জীরাজ্যং মূর্খরাজ্যং বা যত্র স্যাত্তত্র মো বসেৎ ॥ ২ ।

একাকিনা ন গন্তব্যং স্বপেত্রৈকাকিনো গৃহে । নৈবোপরি নাপি পথি বিশেৎ কস্যাপি বেশ্মনি ॥ ৩ ।

দেবা বৃদ্ধাশ্চ ন প্রাট্জদ্বন্ধনীয়ঃ কদাচন । ভাব্যং প্রতিভুবা নৈব দক্ষিণেন চ সাক্ষিণা ॥ ৪ ।

বহিস্তোহভ্যাগতো মেহমুপবিশ্র ক্ষণং সূধীঃ । কুর্ঘ্যাস্বত্পর্যাবর্তং দেহশৌচাদি কর্ম্মচ ॥ ৫ ।

পেষণী খণ্ডনী চুল্লী গর্গরী বন্ধনী তথা । অমী পাপকরাঃ পঞ্চ গৃহিণো ধর্ম্মবাধকাঃ ॥ ৬ ।

দয়া দানং দমো দেবপূজা ভক্তিশুঁরৌ কমা । সত্যং শৌচং তপোহস্তেয়ং ধর্ম্মোহয়ং গৃহমেধিনাম্ ॥ ৭ ।

হীনোদ্ধরণমদ্রোহো বিনয়েল্লিয়সংবধে । জ্ঞানবৃত্তিমূর্ত্ত্বঞ্চ ধর্ম্মোহয়ং পাপসংচ্ছিদে ॥ ৮ ।

অতিথীনর্থিনো হুঃস্থান্ ভক্তি শত্ৰুভুজস্পনৈঃ । আগতঃ সোহতিথিঃ পূজ্যো বিশেষণ মনীষিণা ॥ ৯ ।

আর্জস্বক্ষাস্থাভ্যাংযো বিত্রস্তো বা স্বমন্দিরং । আগতঃ সোহতিথিঃ পূজ্যো বিশেষণ মনীষিণা ॥ ১০ ।

দ্রুশ্রাপাং প্রাপ্য মানুষ্যং কার্য্যং তৎ কিঞ্চিদুত্তমৈঃ । মুহূর্ত্তমেমপ্যস্য নৈব যাতি যথা বুধা ॥ ১১ ।

অর্থাৎ—‘সুধিগণ সেই স্থানে বসতি করিবেন—যেখানে গুণিজন সত্য শৌচ প্রতিষ্ঠা ও গুণ-গোরব আছে, এবং যেখানে অপূর্ণ জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা আছে। ১। সে রাজ্যে কখনও বাস করিবে না,—যেখানে বালক জী বা মূর্খ রাজা বা দুই জন রাজা রাজত্ব করেন। ২। একাকী গমন বা একাকী শয়ন বা উচ্চস্থানে শয়ন বা একাকী কাহারও ঘরে প্রবেশ করিবে না। ৩।

প্রোজগণ কদাচ দেবতাদিগকে ও বুদ্ধদিগকে বঞ্চনা করিবেন না ; কদাচ কাহারও প্রতিভূ হইবেন না বা সাক্ষাদান করিবেন না। ৪। পরিভ্রমণান্তর গৃহে আসিয়া প্রথমে বিশ্রাম করিবে ;

পরে বস্ত্র পরিভ্যাগ করিবে ; অবশেষে দেহ-শৌচাদি অর্থাৎ হস্ত-পদাদি প্রৈকালন করিবে। ৫। পেষণী (জাঁতা), খণ্ডনী (অস্ত্র), চুল্লী (পাকস্থান), গর্গরী (কুন্ত), বন্ধনী (তৈজস)

—গৃহস্থের ব্যবহার্য্য এই পঞ্চবিধ দ্রব্য—ধর্ম্মবাধাপ্রদ ও পাপজনক। ৬। দয়া, দান, দম

(ইঞ্জিরসংবধ) দেবপূজা, শুক্লভক্তি, কমা, সত্য, শৌচ তপস্তা, অস্তেয়—এই গুলিই গৃহস্থ-

দিগের ধর্ম । ৭। হীনজনের উদ্ধার, অদ্রোহ (নির্বিকার), বিনয়, ইন্দ্রিয়-সংযম, ভ্রামরভক্তি, মুদ্রত্ব—এই সকল ধর্ম দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয় । ৮। অতিথি ভিক্ষার্থী বা দুঃস্থ জন গৃহে উপস্থিত হইলে, ভক্তিসহকারে যথাশক্তি অভ্যর্থনা-পূর্বক আহাৰ্য্য প্রদান করিবে । ৯। আর্ত, তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত বা সন্তপ্ত জন গৃহে উপস্থিত হইলে, যথারীতি তাহার সংকার করিবে । ১০। মনুষ্য-জন্ম দুর্লভ ; সে জন্ম লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ সংকর্ম করিবার জন্তই সর্বদা যচেষ্ট থাকিবে ; দেখিও, যেন মুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা না গেল । ১১। ' সদ্গুরু বা অসদ্গুরু কাহাকে বলে ? পঞ্চ-মহাব্রত, অহিংসা ও সত্য প্রভৃতিরই বা মূল লক্ষ্য কি ? আত্মার ও ধর্মের স্বরূপ তত্ত্ব এবং পুণ্য লক্ষনই বা কিরূপ ? এ সকল বিষয়েও জৈনশাস্ত্রে যে সকল উক্তি দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ও অনু্য নীতিকথার অন্তর্ভুক্ত । সদ্গুরু বা অসদ্গুরু ; যথা— 'মহাব্রতধরা ধীরা ভৈক্ষুমাত্রোপজীবিনঃ । সামায়িকস্থা ধর্মোপদেশকা গুরবো মতাঃ । ১। লক্ষ্যভিলাষিণঃ সর্বভোজিনঃ সপরিগ্রহাঃ । অত্রক্ষচারিণো মিথোপদেশা গুরবো মতাঃ । ২। অর্থাৎ—'যিনি পঞ্চ-মহাব্রত পালনশীল, ভিক্ষুমাত্রজীবী ধীর, এবং যিনি ধর্ম-সাধনের উপকরণ ভিন্ন অত্র কিছুই সংগ্রহ করেন না ; তত্রূপ ধর্মোপদেশটাকেই সদ্গুরু বলিয়া জানিবে । আর, যে গুরুর সর্বদ্রব্যো সর্ববিষয়ে অভিলাষ, সর্বদ্রব্য ভোজনে স্পৃহা ; যে গুরু গৃহবাসী—ত্রক্ষচারী নহে এবং যে গুরু মিথ্যা উপদেশ দেয়, তাহাকে অসদ্গুরু বলিয়া জানিবে।' এইরূপ,—

“অহিংসা স্নৃতাণ্ডেয়ত্রক্ষচর্য্যাপরিগ্রহাঃ । পঞ্চভিঃ পঞ্চভিযুক্তা ভাবনাভিবিমুক্তয়ে ॥

ন যৎ প্রমাদযোগেন জীবিতব্যপরোপণম । ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ তদহিংসাব্রতম্ মতং ॥

প্রিয়ং পথাং বচস্তথা স্নৃতব্রতমুচাতে ।”

অর্থাৎ,—‘অহিংসা স্নৃত অন্তেয় ত্রক্ষচর্য্য অপরিগ্রহ—এই পঞ্চ কার্য্য মহাব্রত নামে অভিহিত । ১। ইহার মধ্যে অহিংসা বলিতে ত্রসজীব এবং স্থাবরজীব অর্থাৎ একেত্রিয় দ্বিত্রিয় প্রভৃতি হইতে পৃথিবীজীব বায়ুজীব প্রভৃতি কোন জীবের ভ্রমক্রমেও কদাচ অনিষ্ট না করা । ২। স্নৃত বলিতে সেই বাক্যকে বুঝায়, যে বাক্যে জীবের মঙ্গল, হর্ষ ও পরিণাম সুখকর হয় ।’ ধর্মই বা কি, আর আত্মাই বা কি, তৎসম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় ;— ‘যথাবস্থিততত্ত্বানাং সংক্ষেপাধিস্তরেণ বা । যোহববোধন্তমত্রাহঃ সম্যক্জ্ঞানং মনীষিণঃ ॥

যঃ কর্ত্তা কর্ম্মভেদানাং ভোক্তা কর্ম্মফলস্তচ । সংসত্তা পরিনির্বাতা সহায়্যা নাশ্রয়লক্ষণঃ ॥

অর্থাৎ—‘যথাবস্থিত তত্ত্ব (শাস্ত্রোক্ত উপদেশ) সংক্ষেপে বা বিশদ ভাবে অবগত হইয়া যে জন তাহার সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী হন, সেই মনীষি ব্যক্তিই প্রকৃত ধর্মতত্ত্বজ্ঞ—সম্যক্-জ্ঞানসম্পন্ন । যে কর্ম্মকর্ত্তা, কর্ম্মফলভোক্তা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মফল ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত আত্মা ; আত্মার অশ্রয় লক্ষণ নাই ।’ বলা বাহুল্য, এ সকল নীতিকথা সকল কালে সকল শাস্ত্রেই বিবোদিত হইয়া আসিয়াছে । পেষণী প্রভৃতি পঞ্চব্যবহার্য্য দ্রব্যো ধর্ম্বাবধক পাপ জন্মে,—এ উক্তি, মন্বাদি শাস্ত্রে উপদিষ্ট পঞ্চস্নানা পাপের লক্ষণাদির প্রতিধ্বনি নহে কি ? এইরূপ, আত্মজ্ঞান আত্মদর্শন প্রভৃতি বিষয়ক উপদেশও সনাতন ধর্মের সনাতন বাক্য ভিন্ন অত্র কিছুই নহে ।

দশম পরিচ্ছেদ।

— ‡ * ‡ —

জৈনশাস্ত্রের শিক্ষা।

[শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের—গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ,—সংঘমে সে সম্বন্ধের দৃঢ়তা ;—পরীষদ, অপবিত্রতা, ইচ্ছামৃত্যুর প্রসঙ্গ ;—ভগ্নতপস্বীর ও তৃকাত্যাগীর দৃষ্টান্ত ;—জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ;—প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ ;—ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষুর জীবনের দৃষ্টান্ত ; নিগ্রহের আচার-লক্ষণ ;—বিবিধ দৃষ্টান্ত ;—নিগ্রহের কর্তব্য-বিষয়ক দৃষ্টান্ত ;—ত্যাগী ও শমাসারী,—তদ্বিষয়ক দৃষ্টান্ত ;—বিবিধ বস্তব্য ।]

জ্ঞানের মূল—শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ। গুরু জ্ঞান-রত্ন বিতরণ করেন ; শিষ্য যত্ন-সহকারে সে রত্ন সংগ্রহ করিয়া লয়। শিক্ষক ভিন্ন

শিক্ষালাভ হয় না ; দাতা ভিন্ন দান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আবার
শিক্ষার মূল—
সংঘম-সাধনা। শিক্ষার্থী ভিন্ন শিক্ষালাভে কেহ কখনও সমর্থ হয় না ; দানপ্রার্থী না

হইলে দাতার দান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অপিচ, যেরূপ দাতার নিকট যে

প্রকার দানের প্রার্থী হইবে, যোগ্যতাও তদনুরূপ হওয়া আবশ্যিক। যে মুষ্টিভিক্ষুক, সে কি কখনও রাজ-পদের প্রার্থী হইতে পারে ? বর্ণমালা বাহার অধিগত হয় নাই, সে কি কখনও কাব্য-মহাকাব্যের রসান্বাদে সমর্থ হয় ? সুতরাং, যে সামগ্রী লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিবে, উপযুক্ততা তদনুরূপ হওয়া আবশ্যিক। এই কারণেই শাস্ত্রে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ-বিচার অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। গুরুই বা কিরূপ গুণ-সম্পন্ন হইবেন, আর শিষ্যই বা কিরূপ গুণে গুণান্বিত হইবেন,—এ প্রশঙ্গ প্রায়শঃ উত্থাপিত হইয়া থাকে। কোনও শাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্বে, অথবা জ্ঞানমার্গের কোনও স্তরে প্রবেশ করিবার অগ্রে, আপনার ক্ষমতা-অক্ষমতার বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। যেমন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মগ্রন্থে, তেমনই জৈনশাস্ত্রে, এ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি দৃষ্ট হয়। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি, যিনি ধর্মপথের পথিক হইতে চাহেন, প্রথমে তাঁহাকে ‘বিনয়’ শিক্ষা করিতে হইবে। জৈনশাস্ত্রানুসৃত ‘বিনয়’ যে কি কঠোর সংঘম-সাধনা-সাপেক্ষ, সে আভাষও পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। * শিক্ষার উহাই প্রথম সোপান। জৈনধর্ম-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে, সেই সোপানের প্রতি প্রথম লক্ষ্য করিতে হয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে বিনয় প্রথম শিক্ষণীয়। সত্যবাদী, মিতভাবী, আচ্ছাদ্যবর্তী হইয়া গুরুর নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে ; গুরুর ভৎসনার ক্রোধ-সঞ্চার হইলে চলিবে না, সর্বথা সহিষ্ণুতার আদর্শ দেখাইতে হইবে। শিক্ষার্থী তবে শিক্ষার অধিকারী হইবে। শিক্ষার্থী কেমন হইবেন, তাহার লক্ষণ,—“নাপুট্টী বাগেরে কিংচি পুট্টীবা নালিয়ং বএ। কোহং অসচ্চং কুব্বেজা ধারেজ্জা পিয়মাপ্পিয়ং ১। অগ্গাচেব দমেয়কে। অগ্গাহ খলু দুদমো। অগ্গাদংতো সূহী হোই অসংসীলোএ পরথম। ২।

এই খণ্ডের ৮০ পৃষ্ঠায় ‘বিনয়’ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য-তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে।

অন্নং মে অন্নাদন্তো সংযমেণ তবেণ্নং । মাহং পয়েহিং দম্মংতো বংধেহিং বহেহিয়ং । ৩ ।

পাতিগীরংচ বুদ্ধাণং বায়া অহু ব কস্মুণা । আবীবা জইবা ব্রহ্মস্লে নেবকুজ্জা কস্মাইবি । ৪ ।*

মর্থার্থ,—‘বিনি শিক্ষার্থী, তিনি কখনও অজিজ্ঞাসিত অবস্থায় বাক্যোচ্চারণ করিবেন না ; জিজ্ঞাসিত হইলেও কোনও প্রশ্নের উত্তরে কদাচ মিথ্যা বাক্য কহিবেন না । তিনি কখনও রাগের বশীভূত হইবেন না ; স্তম্ভজনক অথবা হুংখজনক—সকল অবস্থাতেই তিনি নিম্পৃহ থাকিবেন । ১ । আত্মসংযম কর ; আত্মসংযম বড় কঠিন । যদি আত্মসংযমে সমর্থ হও, ইহলোকে ও পরলোকে, সর্বত্র সুখী হইতে পারিবে । ২ । বন্ধনে বা দৈহিক ক্লেশ-সহনে আত্মজয়ী হওয়া যায় না ; সংযম-সাধনাই আত্মজয়ের প্রধান অস্ত্র । ৩ । জ্ঞানার্থেবী জন কদাচ গুরুজনের অপ্রীতিকর কোনরূপ কার্য্য করিবেন না । তাঁহার বাক্য বা কার্য্যে, গোপনে বা প্রকাশ্যে, কদাচ গুরুজনের প্রতি অসম্মানের ভাব আদিবে না । ৪ ।’

‘বিনয়’ সংযম-সাধনা-সাপেক্ষ । ‘পরীসহ’ তদন্তরায়ভূত । দ্বাবিংশ পরীসহ-প্রসঙ্গে সে আঁভাষ প্রদত্ত হইয়াছে । ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার পথে প্রথমেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রোগ-শোক প্রভৃতি অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয় । মহাবীর স্বামী তাই উপদেশ

পরীসহ । দিয়া গিয়াছেন,—‘সাবধান ! যেন পরীসহ আসিয়া তোমায় অভিভূত না করে । সম্মাস-আশ্রমে প্রবেশ করিবার সময় প্রথমেই দ্বাবিংশ পরীসহের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবে ; তার পর তাহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত জয় করিবে । দেখিও, যেন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরীসহ আসিয়া কখনও তোমায় আক্রমণ করিতে না পারে ।’ পরীসহ-বিজয় বিষয়ে জৈনশাস্ত্রে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় ; যথা,—

“ইমে থলু তে বাবীসং পরীসহা সমণেণং ভগবয়া মহাবীরেণং কাসবেণং পবেহিয়া ।

জে, ভিক্খু সোচ্চানচ্চাজিচ্চা অভিজ্জয়ত্তিক্খায়রিয়্যএ পরিকম্মংতো পুত্তী নো

বিহংনিজ্জা । দিগিংচ্ছা পরীসহে (১) পিবাঙ্গা পরীসহে (২) সীয় পরীসহে

(৩) উসিণ পরীসহে (৪) দংস মঙ্গ পরীসহে (৫) অচেল পরীসহে (৬) অরই

পরীসহে (৭) ইথী পরীসহে (৮) চরিয়্যা পরীসহে (৯) নিসীহিয়্যা পরীসহে

(১০) সিজ্জা পরীসহে (১১) অক্কোস পরীসহে (১২) বহ পরীসহে (১৩)

জাযণা পরীসহে (১৪) অলাভ পরীসহে (১৫) রোগ পরীসহে (১৬) তণফাস

পরীসহে (১৭) জল্প পরীসহে (১৮) সকার পুরকার পরীসহে (১৯) পন্না

পরীসহে (২০) অন্নাণ পরীসহে (২১) দংসণ পরীসহে (২২) পরীসহাণং

পবিতত্তী কাসবেণং পবেহিয়া তংভে উদাহরিস্সামি আগুপু’বং স্মণেহমে ।” *

ইহার পর একে একে প্রত্যেক পরীসহের বিশেষভাবে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । আর, সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কি বাহ্য কি মানস—সকল উপদ্রবেই চাক্ষুশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে । রোদ্র বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত, ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক, লজ্জা ভয় অপমান, স্তম্ভ সন্তাপ মোহ—কিছুরই প্রতি ক্রক্ষেপ করিলে চলিবে না । যুদ্ধক্ষেত্রে মন্ত-

* এই দ্বাবিংশ পরীসহের সংজ্ঞা, উচ্চারণ ও বর্ণবিবৃতিসমূহ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থে পাঠান্তর দৃষ্ট হয় । এই খণ্ডের ৭০ পৃষ্ঠায় পরীসহ (পরিসহ, পরীসহ) বিষয়ে বাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত বিবিধটী বোধগম্য হইবে ।

হুতী যেমন আততায়ীকে বিনাশ করে, সেই ভাবে বহিরাভ্যন্তরের সমস্ত শত্রুকে পরাজয় করিতে হইবে ;—“নাগো সংগাম সীসেবা সুরো অভিহণে পরং ।” সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ অরতি হওয়া চাই । রতির—আসক্তির এক প্রধান আশ্রয়-স্থান—রমণী । অত্যাশ্রয় প্রসঙ্গেও রমণীর সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত, পরীসহ-প্রসঙ্গেও জৈনশাস্ত্র সেই উপদেশ দিতেছেন ; যথা,—

“সংগো এস মণুস্সাণং জাও লোগংসি ইথিও । জস্‌স এয়া
পরিয়ায়া স্ককউং তস্‌স সামণং ॥ এব মায়ায় মেহাবী
পংকভুয়াও ইথিও । নো তাহিং বিহম্‌মেজ্জা চরেজ্জও গবেসএ ॥”

অর্থাৎ,—‘ইহসংসারে রমণীর প্রতি মানুষের আসক্তি স্বাভাবিক । যিনি তাহা উপলব্ধি করিয়া সে আসক্তি পরিহার করিতে পারেন, তিনিই শ্রমণ-ধর্ম পালন করিতে সমর্থ হন । যে মেধাবী পুরুষ রমণীকে পঙ্কস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাতে লিপ্ত না হন, পরন্তু আত্মচিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকেন, রমণী হইতে তাঁহার কোনই অনিষ্ট সাধিত হয় না ।’ মুক্তিকামী সন্ন্যাসীর সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য—ইহজীবনই কর্মের শেষ নহে । সংযম-সাধনার দ্বারা উন্নত অবস্থা লাভ হইতে পারে । এই বুদ্ধি লইয়া যাহারা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, তাঁহারা ই পরীসহ-বিজয়ে সমর্থ হইতে পারেন । সংকর্মের ফল—এ জীবনে না হয়, পরজন্মে প্রাপ্ত হইব,—এই সত্যতত্ত্ব প্রাণে প্রাণে ধারণা করিয়া মানুষ সংকর্ম-শীল হও ; তোমার মুক্তির পথ কেহই রোধ করিতে সমর্থ হইবে না ।

ইহসংসারে মোক্ষসাধনের উপায়স্বরূপ চারিটি পরম তত্ত্ব আছে । বহুজন্মের পুণাপুঞ্জ-ফলে সে তত্ত্ব অধিগত হয় । সেই পরম তত্ত্ব-চতুষ্টয়ের আদিভূত—মনুষ্যজন্ম । বিশ্বসংসারে

অনন্ত প্রাণিপথ্যায় বিচরণ করিতেছে । কিন্তু দুর্লভ—এই মনুষ্যজন্ম ।
পরম তত্ত্ব-
চতুষ্টয় ।
সৃষ্টির এই শ্রেষ্ঠ-সুন্দর মনুষ্য-জন্ম, কত সাধনার ফলে যে লাভ করা

যায়, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে ? কত কোটি কোটি জন্মের অভ্যন্তরে বিচরণ করিয়া পরিশেষে মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় ! পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ—তাহাদের জীবন—আহার বিহার শয়ন স্বপন প্রভৃতিতে অতিবাহিত হয় । সে সকল জন্মে এমন কর্ম সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না,—যদ্বারা উচ্চগতি লাভ করিতে পারা যায় । কিন্তু মনুষ্যজন্মের কর্মফলে উচ্চ ও নীচ উভয় গতিই মনুষ্যের আয়ত্তাধীন । সেই জগৎই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—মনুষ্যজন্ম লাভ এক পরম-তত্ত্ব লাভ । দ্বিতীয় পরম তত্ত্ব—ধর্মলাভ । ঐতিধর্ম শ্রবণ, ঐতিধর্ম্যে শ্রদ্ধা, ঐতিধর্ম্যে রুচি অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস—ইহাই হইল তৃতীয় তত্ত্ব । মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া যিনি ‘ধর্ম কি’—তাহা জানিতে পারিয়াছেন, আর ‘ধর্ম কি’—তাহা জানিয়া তৎসম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান হইতে পারিয়াছেন ;—ত্রিবিধ তত্ত্ব তাঁহারই অধিগত হইয়াছে । চতুর্থ তত্ত্ব—সংযম-সাধনা । সংযমে সাধাচার-পালনে যাহার বীর্ধ্য-সামর্থ্য-শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, চতুর্থ তত্ত্ব তাঁহারই অধিগত । এ বিষয়ে জৈনশাস্ত্রের উক্তি,—

“চত্তারি পরমংগাণি দুল্লহাণি হজ্জত্তুণো । মাণুসন্তঃ সূইসদ্ধা সংজমংমিয়বীরিয়ং ॥

চটুরংগং দুল্লহং নচা সংজমং পড়িবজ্জিয়া । তবসা ধুয় কন্মং সেসিক্কে হবই সাংএত্তিবেমি ॥”

অর্থাৎ,—‘চতুর্বিধ পরম তত্ত্ব অবগত হইয়া যিনি আত্মসংযমশীল স্বধর্মপরাগণ, তাঁহার

কৰ্মাবশেষ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন।’ বিনয়ে যাহাঁক সূচনা, পরীসহে য়াহার পরীক্ষা, পরমতত্ত্ব অধিগত হওয়ার তাহার চরমোৎকর্ষ—সিদ্ধিলাভ ।

জন্ম-জন্মান্তরের বহু পুণ্যফলে মনুষ্য জীবন লাভ করিয়াছে। মানুষ! মনে রেখ—এ জীবন চিরস্থায়ী নয়; মনে রেখ—তোমার ইচ্ছায় এ জীবন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না; মনে রেখ—

পবিত্রতা আয়ুঃকাল দিন দিন ক্ষয় পাইয়া আসিতেছে; মনে রেখ—সময় অতীত
ও হইলে, বার্কিক্য আসিয়া আক্রমণ করিলে, আর অবসর পাইবে না।
অপবিত্রতা। স্মৃতরাং সতর্ক হও। পাপকর্মের কখনও স্মৃথ নাই। কুকর্মের দ্বারা

ধনসঞ্চয় করিয়া যে জন স্মৃথী হইবার আকাঙ্ক্ষা করে, কামনার পাশে আবদ্ধ হইয়া সে জন দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে জৈনশাস্ত্রের উক্তি; যথা,—

“জে পাব কর্মে হিংস্রং মণ্ডা সমায়মন্তী অময়ং গহায়

পহায়তে পাস পয়টিএ নরে বেরাণুবদ্ধা নরয়ং উবেংতি।”

অগৎ কর্মের দ্বারা, অপকর্মের দ্বারা মানুষ যে নরকে পাশবদ্ধ হয়, সে কেমন? না—
‘চোর যেমন সিঁধের মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া ধৃত হয় ও গুরু দণ্ড প্রাপ্ত হয়; এ জীবনে ও পরজীবনে দুর্কর্মকারীর অবস্থাও তদ্রূপ।’ অপরের অশুভই অশুষ্টিত হউক বা আত্মস্বার্থের অভিলাষেই অশুষ্টিত হউক, পাপকর্মের ফলভোগ তোমার নিজেকেই করিতে হইবে। আত্মীয়-স্বজন কেহই তোমার সে পাপ-কর্মের ফলভাগী হইবে না। অসতর্ক জনকে ইহলোকে বা পরলোকে রক্ষা করিবার কেহই নাই। অর্থ-সম্পদ কখনও কাহাকেও পাপকর্মের ফলভোগ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যে জন পাপাচারী, সে জন ধর্মপথ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। আলোক নির্বাপিত হইলে, অন্ধকারে যেমন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, জ্ঞানের অভাবে মানুষও সেইরূপ সকলই অন্ধকারময় দেখে।

“তেনে জহা সংধি মুহে গহীএ স কশ্মুণা কিচ্চই পাবকারী। এবং

পয়া পেচ্চ ইহংচ লোএ কডাণ কস্মাণ ন মোক্থ অখি ॥ সংসার মাণ

পরস্প অট্টা সাহারণং জংচ করেই কস্ম কস্মস তে তস্প উবেই কালে

ন বংধ বাবংধবয়ং উবেংতি ॥ বিস্তেণতাণং ন লভে পমত্তে ইমস্সিলীএ

অহুবাপরথা। দীবপ্পগট্টেব অণংতমোহেনেয়াউয়ং দট্টুম দট্টুমেব ॥”

অজ্ঞানী নিদ্রিত থাকেন; জ্ঞানিজন সদা সতর্ক ও সদা জাগরুক আছেন। পাপ নিয়ত প্রলোভন-জাল বিস্তার করিয়া মানুষকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। স্মৃতরাং প্রতিপদবিক্ষেপে সতর্কতা প্রয়োজন। পাপের প্রলোভনে বশীভূত না হইয়া, কামনাকে দমন করিয়া, শিক্ষিত অশ্বের যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের স্তায়, যিনি সংসারে বিচরণ করিতে পারেন, মোক্ষ তাঁহারই অধিগত হয়। পাপজনিত অপবিত্রতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বাহ্যবস্ত সর্বদা চিত্তকে চঞ্চল করিবার জন্ত চেষ্টা পাইতেছে; স্মৃতরাং চিত্তকে সর্বদা বাহ্যবস্ত হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা কর। ভ্রান্তি দূর কর। অহঙ্কারে জলাঞ্জলি দাও। প্রবঞ্চনা পরিহার কর। কামনা বিসর্জিত হউক। উহাই পবিত্রতা। যাহারা অপবিত্র, পাপী ও মিথ্যার বশীভূত, তাহারাই কেবল অমুরাগের ও বিরাগের অধীন,—তাঁহারাই কেবল কামনার দাস

হইয়া আছে। সেরূপ মানুষকে অপবিত্র বলিয়া জানিবে; আর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী থাকিবে। যাহারা পাপী, তাহারা কামনার দাস; যাহারা নিষ্পাপ, তাহারা নিষ্কাম।

“মংদাম কাপা বহুলী হনিজ্জা তহপ্পগারেসু মণং ন কুজ্জা। রক্থেজ্জ কোহং বিণএজ্জ-

মাণং মাণং গেসেবেজ্জপহেজ্জলোহং ॥ জে সংখমা তুচ্ছ পরপ্পবাইতেপেজ্জ দোসাপু-

গয়া পরোজ্জা এএ অহ স্মোত্তি দুগংছমাণোকংথেত্তে জাব সন্নীরভে উত্তিবেমি।”

সত্য বটে, ইহসংসারে পাপীর লক্ষণ—সকাম; আর নিষ্পাপ যিনি, তিনি নিষ্কাম (অকাম)। কিন্তু একটা বিষয়ে এ ভাবের ব্যত্যয় দেখি! সেখানে উভয়ে পরস্পর আর

এক বিপরীত-ভাবাপন্ন। সেখানে—নিষ্পাপ যিনি, তিনি সকাম; আর

সকাম ও
অকাম মরণ।

পাপী যিনি, তিনি অকাম। সে কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ বিষয় সম্বন্ধে? শাস্ত্র

বলিতেছেন—মরণ-সম্বন্ধে। সকল বিষয়েই মানুষের কামনা দেখি; কিন্তু

মরণ-সম্বন্ধে মানুষ সম্পূর্ণরূপ কামনা-রহিত। মৃত্যুর জন্ত মানুষ কখনও কামনা করে না।

তাই মৃত্যু হই প্রকার; ইচ্ছা-মৃত্যু ও অনিচ্ছা-মৃত্যু; সকাম মরণ ও অকাম মরণ। যথা;—

“সংতিমেস দুবেটাণা অক্থায়া মরণং তিন্না।

অকাম মরণংচেব সকাম মরণং তহা ॥

বালাণং অকামংতু মরণং অসইং ভবে।

পংডিয়াণং সকামংতু উক্কোসেণং সইং ভবে।”

অজ্ঞানী মূঢ় জনের মৃত্যু—অকাম মরণ নামে অভিহিত হয়। তাহারা মৃত্যু চাহে না বলিয়াই পুনঃপুনঃ জন্মের অধীন হয়। পাপরূপ কর্ম্ম-বন্ধন মরণের পরেও তাহাদিগকে সংসারে টানিয়া আনে। কিন্তু যাহাদের মৃত্যু সকাম, অর্থাৎ সংসারের কোনও মায়া-মমতা যাহাদিগকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই, পরন্তু মৃত্যুই যাহাদের একমাত্র কামনার বিষয় হইয়াছে, তাহাদিগকে আর কখনও জন্ম-জন্ম-মরণের আবর্ত্তে কষ্ট পাইতে হয় না; কামনারূপ মৃত্যু—মহানির্বাণ—তাহাদেরই অধিগত হয়। মহাবীর স্বামী বলিয়া গিয়াছেন,—“মূঢ়জন ইহলৌকিক সুখের জন্ত কত জীবের প্রতি কত নির্দয় ব্যবহার করিয়া থাকে। বাহারা ঐহিক সুখে ও আমোদে আসক্ত, তাহারা কি বিষম ভ্রান্তিজালে আবদ্ধ আছে! তাহারা মনে করে—‘পরলোক কখনও দেখি নাই, কিন্তু ইহলোকের সুখ প্রত্যক্ষীভূত।’ তাহারা আরও বলে—‘তোমার ইহজীবনের সুখ তোমার আয়ত্তাধীন। কিন্তু পরজীবন অনিশ্চিত। পরলোক আছে কি না, কে বলিতে পারে?’ এবাধি-চিন্তার ফলে, লোকান্তরে অবিস্বাসবান হইয়া অজ্ঞানী জন যত-কিছু পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। সেই অবিস্বাসের ফলেই প্রাণিহত্যা মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা মত্তপান মাংসাহার প্রভৃতি অপকর্ম্ম করিয়াও সংকার্য্য করিতেছি বলিয়া মানুষ মনে করে। আর তাহারই ফলে তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ জন্ম-জন্ম-মরণের যন্ত্রণা ভুগিতে হয়।” এ যে নির্বুদ্ধিতার ফল, এ যে অজ্ঞানতার পরিণাম, জৈনশাস্ত্র একটা সুন্দর উপমা এইরূপে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন; যথা;—

“অহাসাগডিউজাণং সংসং হিচ্চা মহাপহং বিসমং মগ্গং মোইণো অক্থে ভগ্গংমি সোয়ঙ্গ।

এবং ধম্মং বিউক্কম্ম অহম্মং পত্তিবজ্জিয়া বালে মচ্চু মুহং পত্তে অক্থে ভগ্গংব সোয়ঙ্গ ॥”

অর্থাৎ,—‘যেমন কোনও শকটবান, অজ্ঞানতা নিবন্ধন, সমতল পথ পরিত্যাগ করিয়া বজ্র পথে শকট পরিচালনা করিতে গিয়া শকটের অক্ষভঞ্জে অশুশোচনার অন্তর্দাহে দক্ষীভূত হয়; সেইরূপ অজ্ঞান, ধর্মপথ পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম-পথ গ্রহণ পূর্বক, অশুতাপের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে।’ মৃত্যু সম্মুখীন বুঝিয়া অজ্ঞান আত্মে কাঁপিয়া উঠে। তখন, মৃত্যু আসিয়া কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া যায়। তাহার সেই মৃত্যুই অকাম-মৃত্যু—অনিচ্ছা-মৃত্যু। আর, যাহারা মৃত্যু নিকট দেখিয়া আনন্দিত হন, আনন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, তাহাদেরই মৃত্যু—সকাম মৃত্যু—ইচ্ছা-মৃত্যু। জ্ঞানজন হই প্রকার মৃত্যুরই স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত আছেন, হই প্রকার মৃত্যুরই সাফল্য-অসাফল্য তুল্যদণ্ডে পরিমাপ করিয়া দেখিয়াছেন; দেখিয়া, তাহারা পরিশেষে সকাম-মৃত্যুরই—ইচ্ছা-মৃত্যুরই অনুসরণ করিয়াছেন।

যাহারা সত্য তত্ত্ব অবগত নহে, তাহারাই হুঃখ-কবলিত; তাহারাই অনন্ত সংসারে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। চটুল ও চতুর বাক্যে মুক্তি অধিগত হয় না। দার্শনিক বিতর্কেও মোক্ষ-লাভ সম্ভবপর নহে। ভগ্নজন শুধুই বিতর্কের ছটায় মগ্নমুখে ভুলাইতে চায়। মূঢ়জন পাপ-কর্মের ফলে কেবলই অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে; অথচ, তাহারা আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া বড়াই করিয়া আসিতেছে। ফলতঃ, পার্থিব পদার্থে অধুরক্ত আত্মতত্ত্ব অনভিজ্ঞ ভগ্নজনের মুক্তি কখনই নাই। অপিচ,—

“জে কেই সন্নীরে সত্তা বধে রুবেয় সর্বসো।

মণসা কায় বকেণং সবেতে দুক্খ সংভবা ॥”

যে জ্ঞানবাদী, শারীরিক স্মৃতিস্বয়ী হইয়া, গৌর আদি বর্ণের, সুন্দর-নয়ন-নাসাদি অবয়বের ও শব্দ-রস-গন্ধ-স্পর্শাদি গুণের অনুরাগী হয়, এবং কায়মনোবাক্যে তৎসমুদয়ে সংলিপ্ত থাকে; তাহাকে নিশ্চয়ই হুঃখভাগী হইতে হয়। সে জন যুগপতঙ্গমীনমধুপমাতঙ্গবৎ ইহলোকে যথামরগ হুঃখভাগী এবং পরলোকে আত্মদ্ব্যনে মৃত্যু-হেতু অশেষ হুঃখের অধিকারী হয়।

মানুষ জন্মজন্মান্তরে ঐহিক সুখের দাস হইয়া রহিয়াছে। ঐহিক সুখে যাহারা আপনাদিগকে সুখী বলিয়া মনে করে, তাহাদের অবস্থার সহিত একটি গৃহপালিত মেঘের তুলনা হইয়া থাকে। গৃহস্থ যেমন মেঘ-শাবককে দৈনন্দিন খাদ্যদানে পরিপুষ্ট করে, এবং শেষে একদিন তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অতিথি-অভ্যাগতের বা আত্মীয়-অন্তরঙ্গের উদরপূর্তির সহায়তা করে; মানুষের সাংসারিক সুখভোগও সেই প্রকার। ইন্দ্রিয়সমূহ নিত্য-নূতন উপভোগ্য দ্রব্যে যখন আকৃষ্ট অভিভূত হইয়া পড়ে, কালের করাল হস্ত আসিয়া তখনই তাহার মুণ্ডচ্ছেদে প্রবৃত্ত হয়;—

নিত্য-নূতন ভোগাদি ভক্ষণজনিত সুখে আত্মহারা মেঘশাবকের পরিণতির ত্রায় ইন্দ্রিয়সুখ-প্রমত্ত মানুষের পরিণাম হুঃখকর হইয়া আসে। এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত আছে। তিন জন বণিক বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। একজন যথেষ্ট লাভবান হন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মূলধন মাত্র লইয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তৃতীয় ব্যক্তি যথানক্স নষ্ট করিয়া আসেন। মানুষের জীবন-নাট্য এইরূপ প্রহেলিকাময়। মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিয়া, মানুষ,

ধর্ম-পণের পথিক হও । তোমার মূলধন—মহুয়া-জন্ম । যদি লাভবান হও—সে স্বর্গ । মূলধনের বিনাশ অর্থ—দুর্ভাগ্য-জন্ম ভ্রষ্ট হইয়া নরকের কীটমধ্যে বা নীচ বোনিতে জন্মগ্রহণ । সকল পথই তোমার জন্ত মুক্ত রহিয়াছে ; লাভালাভ তোমার কর্ম-সাপেক্ষ । যদি লাভবান হইতে চাও, কর্ম-বন্ধন ছিন্ন কর ; যদি ডুবিয়া মরিবার অভিলাষ থাকে, তবে স্রোতে যেমন গা ভাসাইয়া দিয়াছ, তাহাতেই শেষ হইবে । যে জন কামের ক্রীতদাস হইয়া আছে, তাহারই মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে বসিয়াছে ;—মহুয়া-জন্ম হইতে পরিত্রাণ হইয়া তাহাকে নীচ-বোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে । মহুয়া-রূপ তাহার যে মূলধন ছিল, কামনার বশীভূত হইয়া অপব্যয়ে সে ধন সে যে উড়াইয়া দিল ! এইরূপ, যে জন কেবলমাত্র মূলধন লইয়া ফিরিয়া আসিল, সে কেবল আপনার মহুয়া-টুকু বজার রাখিয়াছিল মাত্র ; অর্থাৎ, সংসারে থাকিয়া গৃহীর যেটুকু কর্তব্য, সেইটুকু মাত্র পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিল ; অধিক আর কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই । কিন্তু যিনি, মহুয়া-জন্ম লাভ করিয়া মহুয়ের অধিক কর্তব্য পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; অমাস্যিক গুণ-গরিমার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন ; তিনিই লাভবান হইয়াছেন,—অনন্ত স্রুথের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন । পার্থিব স্রুথ আর কতটুকু স্রুথ ? কুশাগ্রে নিপতিত জলবিন্দু যেমন মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশির সহিত তুলিত হইতে পারে না, স্বর্গীয় স্রুথের তুলনায় ইহজগতে মহুয়ের স্রুথ ততটুকু মাত্র । কুশাগ্রে পতিত একবিন্দু জলবৎ ঐহিক স্রুথের কামনার, কেন মানুষ অনন্ত অসীম স্রুথ-সমুদ্রকে উপেক্ষা করিতেছে ? এ সকল বিষয়ে জৈনশাস্ত্রে বড় সুন্দর উক্তি দৃষ্ট হয় ।

তদন্ত তিন জন বণিকের লাভালাভ প্রসঙ্গ ; যথা,—

“জহায়তিগ্নিবাণিয়ামুণংবত্তুণনিগগয়া । এগোতথলহএ লাভং এগোমুলেণ আগও ॥

এগো মূলপি হারিত্তা আগও তথ বাণিও ববহারে উবমাএসাএবং ধ্মে বিয়াণহ ॥

মাগুসত্তং ভবেমুলং লাভো দেব গঙ্গিতবে । মূল ছেএণ জীবাণং নরগং তিরক্খত্তণং ধুং ॥” *
কুশাগ্রে জলবিন্দু ও মহাসমুদ্রে জল-রাশির সহিত ঐহিক স্রুথের ও অনন্ত স্রুথের তুলনা ;—

“দায়ং জহাকুসগ্গে উদবং সমুহেণ সমংমিণে ।

এবং মণুসস্মাকামাদেবাদেবকামাণ অংতিএ ॥

কুসগ্গমিত্তা ইমেকামা সন্নিক্কম্মি আউএ ।

কস্স হেউং পুরাকাউং জোগক্খেমং নসংবিদে ॥”

* বাইবেলের অন্তর্গত ম্যাথু (Mathew, XXV, 14) এবং লুক (Luke, XIX, 11) গ্রন্থে তিন জন বণিকের একটি প্রসঙ্গ আছে । তাহা উত্তরাধ্যায়নের উল্লিখিত আখ্যানিকার সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন । কেহ কেহ এই জন্ত অনুমান করেন যে, বাইবেল হইতে ঐ উপমা পরিগৃহীত হইয়া থাকিবে । কিন্তু হারমান জ্যাকোবি এ বিষয়ে বিশেষরূপ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—“Taking into consideration (1) that the Gaina version contains only the essential elements of the parable, which in the Gospels are developed into a full story ; and (2) that it is expressly stated in the Uttaradhyayana, VII, 15, that ‘this parable is taken from common life’, I think it probable that the Parable of the Three Merchants was invented in India, and not in Palestine.”

যিনি জ্ঞানী জন, তিনি পাপীর ও পুণ্যবানের অবস্থা তুলনা করিয়া, পাপীর অবস্থা পরিত্যাগ পূর্বক পুণ্যবানের অবস্থা গ্রহণ করিবেন। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মুনিপদবাচ্য।

“তুণিয়াণ বালভাবং অবালং চেব পংডিএ।

চইউণ বালভাবং অবালং সেবই মুণিভিবেমি ॥”

এই অনন্ত দুঃখপূর্ণ সংসারের দুঃখবন্ধন হইতে কি প্রকারে পরিত্রাণ লাভ হইবে? সাধকের চিন্তে যখনই এই চিন্তার উদয় হয়, যখনই তিনি সংসারের অনন্ত দুঃখের প্রতি

দৃষ্টিপাত করেন, তখনই তাঁহার মনে সত্যের আলোক উদ্ভাসিত হয়।
পরিত্রাণের উপায়। ঐহিক স্রুথের লালসা পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন। একদিকে

আত্মীয়জনের স্নেহাসুরাগের বন্ধন, অন্যদিকে নিত্য-নূতন স্রুথের লালসা। যে মনুষ্যকে চারিদিকে এবিধ বৃত্তির দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, সে কেমন করিয়া মুক্তিলাভ করিবে? যাহার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তিনি দেখিতেছেন, সে মুক্তির এক উপায়—তৃষ্ণা-ত্যাগ। যিনি প্রকৃত সাধক, যিনি প্রকৃত ভিক্ষুদম্ভাবলম্বী, তিনি কখনই তৃষ্ণার বশীভূত নহেন। তাঁহার অসুরাগেরও কেহ নাই, বিরাগেরও কেহ নাই। ভাল বাসিলেও তিনি কাহাকেও ভালবাসেন না; আবার, ভাল না বাসিলেও তিনি সকলকেই ভালবাসেন। সর্বত্র সমদর্শনই তাঁহার তৃষ্ণাত্যাগের মূল। তিনি বুঝিয়াছেন,—তৃষ্ণার নিবৃত্তি কিছুতেই নাই, কামনার পূরণ কখনও সম্ভবপর নহে, সমগ্র পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও মানুষের আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় না। তিনি বুঝিয়াছেন—কামনা-ত্যাগেই পরিত্রাণ।

“কসিগংপি জো ইমং লোয়ং পডিপুন্নং দলেজ্জ একস্স তেণাবিসেন

তুসেজ্জ ইই দুপ্পুরএ ইমেআয়া ॥ জহা লাভোতহা লোভোলাভা-

লোভো। পবডুচই। দোমাসকয়ং কজ্জং কোজীএবি ননিউয়ং ॥”

ভাষ্য : যতই বিতৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, ততই তাহার অভাব বাড়িয়া যায়। তুমি যতই পাইবে, ততই তোমার অভাব বাড়িবে। আয়ের সঙ্গে সঙ্গে নূতন অভাবের সৃষ্টি হয়। ছই ‘মাসা’ মাত্র অর্থ প্রাপ্ত হইলে বাহার অভাব মিটিত, কোটি মুদ্রা পাইয়াও সে এখন সম্ভ্রষ্ট নহে। এ সংসারের রীতিই এই! জৈনশাস্ত্রের এই উক্তি হিন্দুশাস্ত্রের একটি শ্রেষ্ঠ উপদেশের সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। সে উপদেশ—‘তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ।’ যথা—

“নিঃস্বো ব্যষ্টিশতং সতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো,

লক্ষশঃ ক্রিতিপালতাং ক্রিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।

চক্রেশঃ পুনরিত্ততাং সুরপতি ব্রহ্মাপদং বাহতি।

ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিহরপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ ॥”

অর্থাৎ,—‘নিঃস্ব দরিদ্র জন শত মুদ্রালাভের আকাঙ্ক্ষা করে; কিন্তু শতমুদ্রা প্রাপ্ত হইলেই সে আবার সহস্র মুদ্রার আকাঙ্ক্ষা করে। সহস্রাধিপ লক্ষপতি হইতে চায়; লক্ষপতি ক্রিতিপালক হইতে আকাঙ্ক্ষা করে। ক্রিতিপতির আকাঙ্ক্ষা—চক্রেশ্বরত্ব-লাভ; চক্রেশ্বর ইন্দ্রত্বের অভিলাষী। সুরপতি ব্রহ্মাপদ আকাঙ্ক্ষা করেন। ব্রহ্মার বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তির, আর জীহরির হর-পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা। তৃষ্ণার সীমা কে নির্ণয় করিতে পারে?’ এই

শেষক কোনও শৈবের রচনা বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু, তাহা হইলেও, ইহা যে লনাতন শাস্ত্রোক্তির প্রতিধ্বনি, তাহাতে সংশয় নাই।

তৃণাত্যাগের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জৈনশাস্ত্রে সুন্দর একটি উপাখ্যান আছে। নমী নামে মিথিলায় এক রাজা ছিলেন। কোনও এক ভাস্কর্য্যে স্বর্গচ্যুত হইয়া তিনি মিথিলার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মর্ত্যে মহম্মদজন্ম পরিগ্রহ করিলে, পূর্বার্জ্জিত কর্ম্মফলে, তাঁহার তৃণা-ত্যাগের পূর্ব্বস্থিতি জাগিয়া উঠে। তখন তিনি রাষ্ট্রোচ্ছ্রা পরিভ্যাগ করিয়া

প্রতজ্ঞা গ্রহণ করেন। সুখের রাজধানী মিথিলা, প্রাণপ্রিয়া সহধর্ম্মিনী, দেহাধিক কুমার, সৈন্ত-সামন্ত, দাসদাসী, পরিজনবর্গ—কোনও আকর্ষণই তখন আর তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, তিনি যেদিন প্রতজ্ঞায় গমন করেন ; ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া, শক্রদেব তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পান।

রাজা নমীর নিকট উপস্থিত হইয়া শক্রদেব প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন,—“রাজন্ ! মিথিলা আজ কেন আর্জনাতে পরিপূর্ণ ! প্রাসাদ-মধ্যে এবং প্রতি গৃহে কিসের ক্রন্দন-কোলাহল শ্রুত হইতেছে ?”

প্রশ্নের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিয়া, রাজা উত্তর দিলেন,—“মিথিলায় মনোরমা নামে এক পুণ্য-তরু আছে। পত্র-পুষ্প-ফল-সমবিত সেই তরু স্নিগ্ধছায়া দান করিত। সে তরু বহু পক্ষীর প্রিয়-নিকেতন ছিল। সহসা বিষম বজ্রাবাতে আজ সে তরু প্রকল্পিত। পাক্ষীগণ কুলায়-ক্রষ্ট নির্যাতনগ্রস্ত দুর্দশাক্রিষ্ট ; তাই তাহারা উচ্চ চীৎকারে দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে।”

উত্তর শুনিয়া, দেবরাজ কহিলেন,—“আপনার প্রাসাদ অগ্নিসংযুক্ত। অগ্নি ও বজ্রা যুগপৎ আপনার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছে। রাজন্ ! আপনার অন্তঃপুর রক্ষার প্রতি এখনও কেন আপনি উদাসীন রহিয়াছেন ?”

রাজা উত্তর দিলেন,—“আমি বড় সুখী ; কেন-না, আমার আর আপনার বলিবার কিছুই নাই। মিথিলায় আগুন লাগিয়াছে ; তাহাতে আমার তো কিছু পুড়িবে না ! যে ভিক্ষু পুত্র-পরিজন পরিভ্যাগ করিতে পারিয়াছে, যাহার কর্ম্মশ্রোত অবরুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে সুখের অথবা দুঃখের কিছুই তো থাকিতে পারে না ! যিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, যিনি সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত, যিনি কাহারও সহিত কোনও বিষয়ে সম্বন্ধযুক্ত নহেন বলিয়া আপনাকে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহার আবার অশান্তির কারণ কি আছে ?”

ইহা কহিলেন,—“আপনি ক্ষত্রিয় ; প্রাচীর, তোরণ ও দুর্গসমূহ প্রস্তুত করুন, পরিখা খনন করুন ; শতদ্রী প্রস্তুতে প্রবৃত্ত হউন ! তবে তো আপনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবেন !”

রাজা উত্তর দিলেন,—“হাঁ ! ক্ষত্রিয় তিনিই বটেন ;—যিনি ধর্ম্মবিশ্বাসকে দুর্গরূপে পরিণত করিয়াছেন,—যাহার তপঃসংযম সে দুর্গ-তোরণের অর্গলরূপে পরিণত হইয়াছে,—যাহার ক্ষান্তিরূপ সুদৃঢ় প্রাকার নগরকে বেটন করিয়া আছে,—আর ত্রিগুপ্তর (মনোগুপ্তি, বাগ্গুপ্তি, কায়গুপ্তি) ত্রিবিধ উপায়ে যিনি সে নগর অজয়ের করিয়া রাখিয়াছেন। পরাক্রম-রূপ ধর্ম্ম, ইখ্যারূপ (পদচারণ প্রভৃতিতে সতর্কতা) জ্যা, ধৃতি বা সন্তোষ-রূপ প্রত্যক্ষ (ধর্ম্ম-প্রাশুভাগ), সত্যরূপ পরিমহন—এতদ্বারা যিনি কর্ম্মরূপ শক্রর হৃদয়ে সংযম-রূপ গোহ-তীর

বিদ্ধ করিয়া জয়লাভে সমর্থ হন, তাঁহার আর ভাবনা কিসের? তিনিই তো অনায়াসে সংসার হইতে বিমুক্ত হন।” তিনিই তো প্রকৃত ক্ষত্রিয়! এ বিষয়ে রাজা নমীর উক্তি; যথা,—

“সঙ্কট গগনং কিচ্চা তবসংবর মগ্গলং । খংতীনিউণপাগারং তিগুত্তং দ্ৰুপ্ধংসগং ॥

ধূপ্পরকমং কিচ্চা জীবৎচ ইরিয়ং সয়া । ধিইংচকেয়ণং কিচ্চা সচেণং পলিমংথএ ॥

তবণারায় জুত্তেণং তিত্তুণংকম্ম কংচুরং । মুণীবি গয় সংগামো ভবাও পরিমুচ্চস্ ॥”

ইন্দ্র কহিলেন,—“প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করুন। সুদৃশ্য অট্টালিকাসমূহ নির্মিত হউক। তাঁহার চূড়াসমূহ গগন স্পর্শ করুক। তবে তো আপনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন!”

নমী উত্তর দিলেন,—“ইহসংসার পথ-স্বরূপ। পথিমধ্যে যিনি গৃহ নির্মাণ করেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই বিপদে পড়িতে হয়। কিন্তু সন্ন্যাসী যিনি,—যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই তিনি তাঁহার বাসস্থান লইতে পারেন।”

ইন্দ্র উত্তর দিলেন,—“দন্য-তত্ত্বের দণ্ড-বিধান করিয়া জনসাধারণকে রক্ষা করুন; দেশমধ্যে শান্তি স্থাপিত হউক। তবেই তো আপনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবেন!”

নমী উত্তর দিলেন,—“মানুষ সর্বদাই অত্যাচারে দণ্ড-বিধান করে। নিরীহ জন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়; অপরাধী মুক্তি পাইয়া যায়।”

ইন্দ্র কহিলেন,—“হে রাজন! যে সকল রাজা আজিও আপনার প্রাধাত্য স্বীকার করে নাই, তাহাদিগকে বশে আনয়ন করুন। তবে তো আপনি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইবেন!

নমী উত্তর দিলেন,—

“জো সহস্সং সহস্সাণং সংগামেদুজ্জএজিণে । এগংজিণেজ্জঅপ্পাণং

এসসেপারমোজও ॥ অপ্পাণমেবজুজ্জাহিং কিং তে জুজ্জো গবজ্জাও ।

অপ্পাণমেব অপ্পাণং জুইত্তা সুহমেএ ॥ পংচিদিয়াণ কোহংমাণং

মায়াংতহেবলোহংচ । দুজ্জয়ংচেব অপ্পাণং সন্নমপ্পে জিএজিয়ং ॥”

‘মদুশ্য সহস্স সহস্স দুর্ধ্ব শত্রুকে যদিও পরাজয় করিতে পারে, কিন্তু সে শত্রুকে জয় করা অপেক্ষা আত্ম-জয়ই প্রধান জয়। মানুষ কেন বহিঃশত্রু-জয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়? আত্মজয়ের জন্ত সংগ্রাম কর। যিনি আপনার দ্বারা আপনাকে জয় করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত স্ত্রী হন। এই পঞ্চোদ্রিয়, ক্রোধ, অহঙ্কার, মোহ, কামনা—এই সকল আত্ম-শত্রুকে জয় করা বড়ই কঠিন। তাহাদিগকে যখন জয় করিতে পারিবে, মানুষ তখনই সর্বজয়ী হইবে।’

ইন্দ্র কহিলেন,—“তোমার স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার, তোমার জহরৎ-মণি-মাণিক্যের ভাণ্ডার, তোমার পোষাক-পরিচ্ছদ, তোমার ঘর-বাড়ী-গাড়ী-সম্পত্তি যাছাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা পাও। তবেই তো তুমি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবে!”

নমী উত্তর দিলেন,—

“সুবল্ল রুপ্পসুয় পরয়্যাভবে সিয়াছ কেলাস সমাঅসংখয়া । নরসুপ লুদ্ধসু

ন তেহিং কিংচি ইচ্ছাছ আগাসসমা অণংতিয়া ॥ পুত্বী সালী জবা চেব

হিরণ্নং পসুভিসুসহ । পড়িপুণ্ণনা লমেগসু ইই বিজ্জা তবংচরে ॥”

‘মানুষের এতই লোভ যে, কৈলাস পর্বতের তায় অত্যাচ্ছ সুবর্ণের ও রৌপ্যের পর্বত সকল

প্রাপ্ত হইলেও তাহার লোভের শাস্তি হয় না। আকাশ যেমন অসীম অনন্ত, মানুষের আকাঙ্ক্ষাও সেইরূপ অসীম অনন্ত। এই ধনধান্তপূর্ণ বসুন্ধরা অর্পণ করিলেও, মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। সংযম-সাধনা ভিন্ন সে কামনা-নিবৃত্তির উপায় নাই।

ইন্দ্র কহিলেন,—“আশ্চর্য্য! রাজন! আপনি ক্লান্ত স্নেহের অনুসন্ধানে কেন প্রত্যক্ষ-স্বখ পরিহার করিতেছেন? উহাই আপনার ধ্বংসের কারণ হইবে।”

নমী উত্তর দিলেন,—

“সল্লং কামা বিসংকামা কামাআসী বিসোপমা।

কামেপথে মাণা অকামা জংতি দুঃগইং॥

অহোবয়ই কোহেং মাণেংঅহ মাগঙ্গী।

মায়া গঙ্গী পড়িগ্ধাও লোহাও দুহও ভয়ং॥”

‘ইহসংসারের স্বখ—কাম—শব্দ-স্বরূপ; কাম—বিষ-স্বরূপ। কাম আশীবিষবৎ। যে জন কামনার অনুসরণ করে, সে কখনও সুখী হইতে পারে না! তাহার শেষ পরিণাম বড়ই দুঃখপ্রদ। কাম হইতে মানুষ ক্রোধে অভিভূত হয়; রাগ হইতে অহঙ্কার আসে; তৎপরে মোহ আসিয়া মুক্তির পথ অবরোধ করে। কামনার বশবর্তী মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে সর্বত্র অশেষ কষ্ট প্রাপ্ত হয়।

রাজার উত্তরে ইন্দের ভ্রম-ধারণা অপসৃত হইল। তখন তিনি ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া, আত্ম পরিচয় প্রকাশ করিলেন; এবং যথাযোগ্য অভিবাদন-পূর্ব্বক রাজা নমীকে কহিলেন,—

“অহো তেনিজ্জিও কোহো অহো তে মাণো পরাজিও। অহো তে

নিরক্কিয়া মায়া অহোতে লোভোবসীকও॥ অহো তে অজ্জবং সাহ

অহোতে সাহ মদবং। অহো তে উত্তমাংখন্তী অহো তে মুত্তি উত্তমা॥”

‘ধত্ত রাজন্!—আপনি ক্রোধ-জয়ী হইয়াছেন! ধত্ত রাজন্!—আপনার অহঙ্কার দূরীভূত হইয়াছে! ধত্ত রাজন্!—আপনার মোহ অপসৃত! ধত্ত রাজন্!—আপনার কামনা পরাভূত। ধত্ত আপনার সরলতা! ধত্ত আপনার নম্রতা! ধত্ত আপনার সন্তোষ! ধত্ত আপনার উত্তমা মুক্তি!’

এ জীবন কয়-দিনের জন্ত? অনন্ত কালসাগরের বুদ্ধিবৃত্তি—এ জীবন লইয়া, মানুষ কিসের বড়াই করিতেছে? একে এই সীমাবদ্ধ অল্প সময়; সে সময়টুকুও যদি তুমি অবহেলায়

হারাইয়া ফেল, উপায় কি হইবে? পত্র পরিণত হইলেই বৃক্ষ হইতে জীবন স্থলিত হইয়া পড়ে; দিবা অতীত হইলে, রাত্রি আসিলে, মানুষেরও সেইরূপ আয়ুঃ শেষ হইয়া আসে। কুশ-তুণে শিশির-বিন্দু কতকক্ষণ

চাক্ষুঃকাময় থাকে? মানুষেরও জীবন কুশতৃণস্থিত শিশিরবিন্দুবৎ। মহারীর স্বামী আপন প্রিয় শিষ্য গৌতমকে সঙ্কোচন করিয়া তাই বলিতেছেন,—“গৌতম! সাবধান হও; জীবন-ভরী আবর্তে নিগতিত, সদা-সকটাপন্ন। সত্তর উৎসর পাপভার লাঘব কর। ভাগ্য-ক্রমে বহু জন্ম পরে দুর্লভ মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়াছ; কর্ম্মফলে যেন আর অধঃপতিত হইও না। কর্ম্মফলে যদি পৃথিবী দেহে পরিণত হও, অসংখ্যকাল সেই অবস্থায় কাটিয়া যাইবে। কর্ম্মফলে যদি জলদেহ প্রাপ্ত হও, আত্মাকে সেই অবস্থাতেই বহুকাল বাপন

করিতে হইবে। কৰ্মফলে অগ্নিদেহে বা বায়ুদেহে প্রবিষ্ট হইলে, সেই ভাবেই অসংখ্য-কাল কাটিয়া যাইবে। কৰ্মফলে আরও কত কত দেহে পরিণত হইবার আশা আছে। একবার অধঃপতন ঘটিলে পুনরুত্থানের আশা বড়ই অল্প। বড় দুর্লভ—মহুঘ্য-জন্ম-লাভ! মহুঘ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও আৰ্য্যজন্ম-লাভ আবার বহু সাধনা-সাপেক্ষ। আবার আৰ্য্যজন্ম-প্রাপ্ত হইলেও পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিকারী হওয়া আরও কঠিন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিকারী হইলেও আবার ধৰ্মলাভ সম্ভবপর নহে। আবার সত্যধৰ্ম প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে শ্রদ্ধা-অমুরাগ সঞ্চার হওয়া বড় কঠিন। শ্রদ্ধা-অমুরাগ সঞ্চিত হইলেও ধৰ্ম-প্রতিপালনে কচিং স্পৃহা জন্মে; কেন না, মানুষ সদাই কামনার দাস,—মানুষ সদাই ঐহিক সুখের অমুখ্যানে রত রহিয়াছে। দিন দিন দেহে বান্ধিক্যের সঞ্চার হইতেছে; মন্তকের কেশরাশি ওল হইয়া আসিতেছে, কর্ণের শ্রবণশক্তি কমিয়া যাইতেছে, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাইতেছে, জ্ঞান-শক্তি ও স্পর্শানুভব শক্তি লোপ পাইতেছে; একে একে সব যাইতে বসিয়াছে। এ সকল দেখিয়া, গৌতম! তুমি সৰ্বদা সাবধান হও। আসক্তির সামগ্রী, সমস্ত দূরে নিক্ষেপ কর। পদ্মপত্র যেমন শরতের বারি বর্ষিত হইলে, পদ্মপত্র তাহাতে আসক্ত নহে; হে গৌতম! তুমি সেইরূপ অনাসক্ত-ভাবে সংসারে বিচরণ কর। দিন ফুরাইয়া আসিল।’ গৌতমকে সম্বোধন করিয়া মহাবীর স্বামীর যে উক্তি, তাহার কিয়দংশ;—

“দ্রুমপত্রে পংডুঅএ জহানিবউই রাই গণাণ অবরএ।

এবং মণুয়াণ জীবিয়ং সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ১।

কুসগগে জহ ওসবিংহুএ থোবং চিট্টই লংবমাণএ।

এবং মণুয়াণ জীবিয়ং সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২।

ইই ইত্তরিয়ংমি আউএ জীবিএ বহু পচ্চবায়এ।

বিহুগাহি রয়ং পুরে কডং সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ৩।

হুলহে থলু মাণুসে ভবে চিরকালেণ বিসকপাণিণং।

গাঁটার বিবাগ কন্মণো সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ৪।

লঙ্কূণবি মাণুসত্তণং আয়রিয়ত্তণং পুণরাবিহুলহং।

বহবে দসুয়ামিলকুথুয়া সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ১৬।

লঙ্কূণবি আয়রিয়ত্তণং অহীণ পংচিদিয়াল হুলহা।

বিগলিংদিয় যাহুদীসঙ্কে সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ১৭।

অহীণপংচিংদিয়ত্তণিসেলহে উত্তমধম্মসুইহু হুলহা।

কুতিথি নিসেবএ জণে সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ১৮।

লঙ্কূণবি উত্তমংসুয়ং সদ্ধহণা পুণরবি হুলহা।

মিছত্তণিসেবএজণে সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ১৯।

ধম্মং পিহু সদ্ধহংতরা হুলহয়াকাএণকাসরা।

ইহকামণুণেহিং মুচ্ছিয়া সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২০।

দুর্লভ মহুঘ্য-জন্ম, ততোধিক দুর্লভ আৰ্য্যজন্ম, ততোধিক দুর্লভ পঞ্চেন্দ্রিয়-লাভ, ততোধিক

দ্রষ্টব্য দর্শন শিক্ষার অবসর, ততোধিক দ্রষ্টব্য দর্শনবিশ্বাসে বিশ্বাসবান হওয়া, ততোধিক দ্রষ্টব্য সে বিশ্বাস কার্যে পরিণত করা ।’ এই বলিয়া, মহাবীর স্বামী গৌতমকে উপদেশ দিতেছেন,—

“পরিজুরহিতে সন্নীরয়ং কেসাপংডুরয়া হবংতি তে ।

সেসোমবলেয় হারজৈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২১ ।

পরিজুরহিতে সন্নীরয়ং কেসাপং পংডুরয়া হবংতি তে ।

সেসকুবলেয় হারজৈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২২ ।

পরিজুরহিতে সন্নীরয়ং কেসাপংপংডুরয়া হবংতি তে ।

সেসাণবলেয় হারজৈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ । ২৩ ॥

পরিজুরহিতে সন্নীরয়ং কেসাপংডুরয়া হবংতি তে ।

সেসজিভবলেয় হারজৈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২৪ ।

পরিজুরহিতে সন্নীরয়ং কেসাপংডুরয়া হবংতি তে ।

সেসাসবলেয় হারজৈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২৫ ।

পরিজুরহিতে সন্নীরয়ং কেসাপংডুরয়া হবংতি তে ।

সেসববলেয় হারজৈ সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২৬ ।

‘তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, জ্ঞাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়—এমনি কি, তোমার দেহের সকল বল—দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিল । গৌতম, এখনও সাবধান হও ।’ এই বলিয়া মহাবীর ঐভু গৌতমকে সংসারের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন,—

বোচ্ছিংদসিণেহ মগ্গণো কুমুয়ং সারইয়ংবপাণিয়ং ।

সেসববসিণেহবজ্জিএ সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ২৮ ।

শরতের বারিতে অনাসক্ত পদ্মপত্রের স্থায় সংসারে অনাসক্ত হইতে উপদেশ দিয়া, সর্ব-প্রকার আসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্ত উদ্বুদ্ধ করিয়া, মহাবীর ঐভু শেষ কহিতেছেন,—

“অবলে জহ ভারবাহএ মামগ্গে বিসমেব গাহিয়া । পচ্ছাপচ্ছাপু তাবএ

সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ৩০ । তিল্লোহিসি অল্পবংমহংকিংপুণ চিট্টিসি-

তিরাত্তাও । অভিতুরপায়ংগমিত্তয়ে সময়ংগোয়মমাপমায়এ ॥ ৩৪ ।”

‘মস্তকে গুরুভার, অথচ তুমি দুর্বল । উচ্চ-নীচ বন্ধুর পথে অগ্রসর হইও না । তাহাতে পরিশেষে তোমাকে অসুখতাপ করিতে হইবে । গৌতম ! তুমি সাবধান হও । মহাসমুদ্র প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছ । তীর-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কেন নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ ? পরপারে পৌছিবার পক্ষে ত্বরান্বিত হও । গৌতম ! তুমি এখনও সাবধান হও ।

অজ্ঞানীই বা কেমন, আর জ্ঞানীই বা কেমন ;—তাহার লক্ষণ বলা হইয়াছে । যে জন বিজ্ঞানহীন অর্থাৎ সত্য-তত্ত্ব অবগত নহে, যে জন স্তব্ধ অর্থাৎ অহঙ্কারী, লুক্ক অর্থাৎ

জ্ঞানী লোভপরতন্ত্র, অবিদিত এবং যথেষ্টবাক্য, তাহাকেই অজ্ঞানী বলা যায় ।

ও পঞ্চবিধ কারণে সে অজ্ঞানতা সঞ্জাত হয় । সেই কারণ-পঞ্চক ;—রাগ,

অজ্ঞানী। প্রমাদ, স্তম্ভ, রোগ, আলস্য । উল্লিখিত পাঁচ কারণে যেমন বিনয়-প্রতিপালন

ধর্ম্মানুশীলন অসম্ভব, তেমনিই নিম্নলিখিত অষ্টবিধ কারণে ধর্ম্মশিক্ষা সুসাধ্য । (১) হান্ত-

বৰ্জ্জন, (২) দানতত্ত্ব অৰ্থাৎ সংযমশীলতা, (৩) পরমস্ফীমুদ্বাটন-বিরতি অৰ্থাৎ পরনিন্দা-পরিবৰ্জ্জন, (৪) শীলসম্পন্নতা, (৫) বিশীলবৰ্জ্জন, (৬) অতি-লোলুপত্ব-নিষেধ অৰ্থাৎ অতিলোভ-পরিহার, (৭) ক্রোধ পরিভ্যাগ, (৮) সত্য কথন। এই আটটি বিষয় ষাঁহার অধিগত হইয়াছে, তিনিই শীলসম্পন্ন অৰ্থাৎ জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত। যে ভিক্ষুর পক্ষে নির্বাণ-পথ অবরুদ্ধ, সে ভিক্ষু চতুর্দশ-দোষহুই। আর যে ভিক্ষু নির্বাণ-পথের পথিক, তিনি পঞ্চদশ-গুণসমম্বিত। চতুর্দশ দোষ; যথা,—পুনঃপুনঃ ক্রোধ, দীর্ঘস্থায়ী ক্রোধ, মিত্রের উপদেশে অবজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞানের অহঙ্কার, অপরের দোষানুসন্ধান, মিত্রের প্রতি রোষ, মিত্রের অসাক্ষাতে মিত্রের নিন্দাবাদ, প্রতিজ্ঞাবাদী, হিংস্র, স্তব্ধ, লুকা, রসগুহ, সন্ধিভাগ-রহিত, অগ্নীতিকর। ভিক্ষুর পঞ্চদশ গুণ; যথা,—তিনি বিনীত, অচপল, মায়ারহিত ও অকুতূহল; তিনি কাহাকেও কটুবাণ্য বলেন না; ক্ষুধ হইলেও তিনি কদাচ রাগের বলীভূত নহেন; মিত্রের সুপরামর্শে তিনি সর্বদা কর্ণপাত করেন; বিজ্ঞানদ তাঁহার আদৌ নাই; অন্যের দোষানুসন্ধান তিনি নিয়ত পরাশ্রুত; মিত্রের প্রতি কখনও তাঁহার রাগ নাই; অসাক্ষাতেও তিনি কুমিত্রের অমঙ্গল কামনা করেন না; বিবাদে ও কোলাহলে তিনি সর্বদা বিরত থাকেন; তিনি বুদ্ধিমান, কুলীন, শাস্ত্র ও সচ্চরিত্র। এবশ্চকার গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ধর্ম্ম-শিক্ষালাভের উপযোগী পাত্র বলিয়া গণ্য হন। স্বচ্ছ পাत्रে জল রাখিলে সে জল যেমন উজ্জ্বল দেখায়, পূর্বোক্ত সদ্গুণসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট বিজ্ঞাও সেইরূপ জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী ভিক্ষুর স্বরূপ-বিষয়ে জৈনশাস্ত্রে এইরূপ উপমা-সমূহ দৃষ্ট হয়; যথা,—

“জহাসংখ্যমিপয়ং পিহিতং দুহঃ বিবিরায়দে এবং বহুস্নুএ ভিক্ষুধম্মো কিত্তীতহা সুয়ং ।

জহাসে কংবোয়াণং আইসে কংখএসিয়া আসেজবেণপবরে এবং হবই বহুস্নুএ ॥

জহাইপ সমাক্ষেত্রে সুরেদটপরকমে উভও নংদিঘোসেণং এবংহবই বহুস্নুএ ।

জহাসে তিমিরবিজ্ঞসে উত্তিত্তেতে দিবাঅরে । জলংতে ইব তেএণং এবং হবই বহুস্নুএ ॥

জহাসে উড়ুব্ধে চংদে নক্খতে পরিবারিএ । পডিপুণ্ণে পুঞ্জমাসীএ এবং হবই বহুস্নুএ ॥

জহাসে সয়ংভু রমণে উদহী অক্খওদএ নাণা রয়ণ পডিপুণ্ণে এবং হবই বহুস্নুএ ।”

সমুদ গংভীরসমা দুৱাসয়া অচক্কিয়া কেণই দুপ্পহংসয়া

সুয়সস পুণ্ণা বিউলসস তাইণো থবিত্তু কস্মং গইমুত্তমংগয়া ।”

অৰ্থাৎ,—শব্দে নিপতিত বারি যেমন দ্বিগুণ ওজ্জ্বল্য-সম্পন্ন মনে হয়; জ্ঞানী ভিক্ষুর জ্ঞান-বশ-কীর্ত্তিও সেইরূপ ওজ্জ্বল্য-সম্পন্ন হয়। কাষোজ-দেশীয় সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন রণকোলাহলে ভীত না হইয়া দ্রুতগতিতে অস্ত্রাস্ত্র অথকে অতিক্রম করে, জ্ঞানী ভিক্ষুও সেইরূপ সকলকে অতিক্রম করেন। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিদূরিত হয়, আর সকল আলোক যেমন তাহার নিকট নিশ্চত হয়; জ্ঞানী ভিক্ষুর নিকটও অজ্ঞ সকলে সেইরূপ নিশ্চত। সূর্য্যের যেমন তুলনা নাই; তাঁহারও সেইরূপ তুলনা নাই। নিশামণি পূর্ণচন্দ্র যেমন তারাদল পরিবেষ্টিত হইয়া আকাশে বিরাজ করেন; আর, তাঁহার যেমন তুলনা নাই; বিজ্ঞ ভিক্ষুরও সেইরূপ তুলনা নাই। অনন্ত জলাধার মহাসমুদ্র যেমন স্বয়ম্ভুর আনন্দ-নিকেতন-রূপে অসংখ্য অমূল্য রত্নগাজি বক্ষে ধারণ করিয়া অতুলনীয় হইয়া আছেন; জ্ঞানী ভিক্ষুও

সেইরূপ অভুলনীয় জ্ঞান-সম্পদের অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন।’ যে ভিক্ষুতে মহাসমুদ্রের তায় গাভীয়া আছে, যাহার জ্ঞান-বারিষি পরিমাপ করা অসম্ভব, যিনি কোনও বস্তুর বা কোনও ব্যক্তির দ্বারা কখনও সন্তুষ্ট নহেন, যাহাকে কদাচ অভিভূত করা যায় না, যাহার অগাধ জ্ঞান এবং যিনি আত্মসংযমশীল, তাঁহার কৰ্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি নিঃসন্দেহে সেই অত্যাচ মহান মুক্তিপদ লাভ করিবেন।’

ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষুর জীবনে জ্ঞানের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত দেখি। হরিকেশ বল, ঋণচকুলে জগৎগ্রহণ করেন; কিন্তু কৰ্মপ্রভাবে তিনি মুক্ত-পুরুষমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন- সৰ্ব্বকৰ্ম-পরিভূত্যাগী সন্ন্যাসী, তাহাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হরিকেশ-প্রসঙ্গ। হইয়াছিল। প্রতিপক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—“আপনি যে যতি, আপনি যে যোগী, কৈ আপনার যজ্ঞবেদী কৈ? কোথায় আপনার অগ্নি, কোথায় আপনার বলিদ্রব্য? কোথায় আপনার যজ্ঞস্থানী? কোথায় আপনার গোময়? অগ্নি-মুখে আপনি কি আহুতি অর্পণ করিবেন?” হরিকেশ তাহাতে উত্তর দেন,—

“তবো জোঁজী জীবো জই ঠাণং জোগোসুয়া সরীরং কারিসংগং।

কস্মংপহাসংজমজোগ সংতীহোমং হুণামীইসিণং পসথং ॥”

অর্থাৎ,—‘সংযম আমার হোমাগ্নি। জীবন আমার যজ্ঞবেদী; সত্ত্বতম আমার যজ্ঞস্থানী; দেহ আমার শুদ্ধ গোময়; কৰ্ম আমার ইন্ধন-স্বরূপ; আত্মসংযম, সত্ত্বতম, শান্তি—আমার নৈবেদ্য; জ্ঞানী জনের প্রশংসিত এবম্বিধ যজ্ঞ লইয়াই আমি যোগরত আছি।’

তার পর আবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল,—‘হে মুনি! তবে তোমার নানকরণযোগ্য অলাধারণ হ্রদ কৈ? তোমার পাপনাশক তীর্থ কোথায়? কোথায় অবগাহন করিয়া তুমি বিশুদ্ধ হইবে?’

মুনি উত্তর দিলেন,—“আমার ধর্মরূপ বিনয়মূল নানকরণোপযোগী হ্রদ আছে। কৰ্ম-মলাপহারক ব্রহ্মচর্য্যরূপ আমার তীর্থস্থান রহিয়াছে। সেই ব্রহ্মচর্য্য-তীর্থে রাগদ্বৈষাদি মল বিধোত করিয়া আমি আত্ম-প্রসঙ্গরূপ নির্মলত্ব প্রাপ্ত হই। বিজ্ঞজন নানোপযোগী এবম্বিধ হ্রদই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই ব্রহ্মচর্য্যরূপ হ্রদে অবগাহন করিয়া কাম-ক্রোধাদি মল অপসারণ করিতে পারিলেই উচ্চগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।” যথা,—

ধম্মে হরয়ে বংভে সন্তি তিথে অণাবিলে অণপসন্নলেসে।

জহিং পিণ্হাও বিমলো বিম্বজ্জো সূসীই ভূয়োপজহানিদোসং ॥

এয়ং সিণাণং কুশলেহিং দিট্টং মহাসিণাণং ইসিণং পসথং।

জহিং সিণ্হারা বিমলা বিম্বজ্জা মহারিসী উত্তমঠাণং পতেত্তিবেমি।”

অপর এক আধ্যাত্মিকায়, চিত্র ও সত্ত্বত দুই বজ্র চরিত্র-কথায়, আসক্তি-ত্যাগীর ও আসক্ত জীবের অবস্থার বিষয় পরিবর্তিত আছে। চিত্র ও সত্ত্বত দুই জনে বহুজন্মের পর

অনাসক্ত

মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্য-জন্মে দুই জনেই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া-

ও

ছিল। চণ্ডাল-জন্মে দুই জন দুই পথের পথিক হইবার আকাঙ্ক্ষা করে।

আসক্ত।

ইহসংসারে রাজচক্রবর্তীর পদ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সত্ত্বতের মনে হয়। আর,

যতি সন্ন্যাসীর পদকেই চিত্র শ্রেয়ঃসাধক বলিয়া মনে করে। স্মরণ্য দুই ভাবে দুই জনের

জীবন-গতি পরিবর্তিত হয়। সমুত্ত পরজন্মে যখন ব্রহ্মদত্ত-নামা রাজচক্রবর্তী বলিয়া পরি-
গণিত হন, চিত্র তখন এক প্রসিদ্ধ বণিক-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্বস্ব পরিত্যাগ-পূর্বক
সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। সেই সময়ে দুই বন্ধুর পরস্পর মিলন হয়; আর সে
মিলনে পরস্পরের পূর্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তখন, দুই বন্ধুতে আপনাদের অবস্থার বিষয়
আলোচনা করেন। অনেক কথাবার্তা হয়। বুঝিতে পারেন,—তঁাহারা উভয়ে আপনা-আপন
কর্মের ফলস্বরূপ, আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ, পদসম্পৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একজন সন্ন্যাসী;
অপর জন দেশপতি রাজচক্রবর্তী। অবস্থার এই তারতম্য উপলব্ধি করিয়া, রাজা ব্রহ্মদত্ত
(সমুত্ত) আপন বন্ধু চিত্রকে কহিলেন,—“দেখ বন্ধু! আমার কত সুখৈশ্বর্য! আমার উচ্চ
মনোহর প্রাসাদ, অসংখ্য দাস-দাসী, শ্রেষ্ঠ ধন-সম্পৎ। বন্ধু! কেন তুমি, এই দারুণ ক্লেশ
সহ করিতেছ? এস, আমার এই অতুল ধনৈশ্বর্যের অংশভাগী হও। স্নানরীণ মনো-
হর নৃত্য-গীতে তোমায় সর্বদা মুগ্ধ রাখিব। এস, সুখ ভোগ কর। কেন বুধা ব্রহ্মচর্যের
ক্লেশ সহ করিতেছ? বন্ধুকে ইন্দ্রিয়-সুখে একান্ত আসক্ত দেখিয়া, অন্তরে অন্তরে তঁাহার
মঙ্গল কামনা করিয়া, বন্ধুর জীবনগতি পরিবর্তিত করিবার উদ্দেশে, চিত্র উত্তর দিলেন,—

“সবং বিলাসবিয়োগীয়াং সৰ্বং নট্টং বিড়ংবিয়ং। সৰ্বং আভরণাভারা সৰ্বেকামা
দুহাবহা ॥ ১৬। বালাভিরামেন্ন দুহাবহেন্ন গতংসুহংকামগুণেন্ন রায়ং বিরক্ত-
কামাণ তবোহগাণং। জংভিকুখং সীলগুণে রয়াণং ॥ ১৭। ইহজীবীএ রায়
অসাসযংমি। ধণিয়ংতু পুন্নাইং অকুব্বমাণো। সে সোয়ন্ট মচ্চু মুহো বণীএ।
ধম্মং অকাউণ পরম্মিলোএ ॥ ২১। জহেহ সীহোবমিয়ং গহায়। মচ্চু নরংণেইহ
অংতকালে। গতস্সমায়াবপি যাবভারা। কালংমি তম্মং স হরা ভবংতি ॥ ২২।
গতস্সহুখং বিভয়ং তিগাইণ্ড। গমিত্তবগ্গাণ স্ময়াণ বংধবা। একোসয়ং পচগ্গহই
হুখংকত্তা রমেবং অগ্গজা ইকম্মং ॥ ২৩। গাগোজহাপংকজ্লাবসন্নো দট্টুংখলংগাভি
সমেতি তীরং। এবং বয়ং কামগুণেন্নগিচ্ছাণ ভিকুখংগোমগ্গমণুবয়ামো ॥ ৩০। অকোই-
কালোত্তরংতি রাইওণয়াবি ভোগা পুরিসাণ নিচ্চা। উম্মিচ্চভোগা পুরিসং বয়ংতি।
দুমং জহাখীণফলং বপকুখী ॥ ৩১। জইতংসিভোগে চইউ অসত্তো অজ্জাইং কম্মাইং
করেহিরায়াং। ধম্মে টিও সৰ্পপয়াণু কংপী। তোহোহিসি দেবোইউ বিউকী ॥” ৩২।

অর্থাৎ,—‘হে রাজন্! সে তো সঙ্গীত নয়; সে যে বিলাপ-ধ্বনি! সে তো নৃত্য
নয়; সে যে বিড়ম্বনা—ভূতাবিষ্টের বিক্ষেপ মাত্র! সে তো আভরণ নয়; সে যে ভার-
বিশেষ! সংসারের সুখমাত্র—সর্বপ্রকার কামই—হুঃখদায়ক। ১৬। অজ্ঞান জনই কামনার
দাস। তাহারা জানে না যে, কামনাই সকল হুঃখের হেতুভূত। ধার্মিক ভিক্ষু কখনও
সুখের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তঁাহারা ধৰ্ম্মানুগত হইয়াই আনন্দ উপভোগ করেন।
মুদ্র জনেরা আশু হর্ষোৎপাদক পরিণাম-হুঃখকারণ কামকে অবলম্বন করে। সাধুজন কদাচ
তাহার অনুসৃত্ত নহেন। ১৭। ইহজীবনে যিনি কোনও সংকল্প না করিলেন, ইহজীবনে যিনি
ধৰ্ম্মানুগত না রহিলেন, মৃত্যুর কবলগত হইয়া পরজীবনে তঁাহাকে অশেষ পরিতাপ করিতে
হয়। ২১। গিৎথ যেমন মৃগকে আক্রমণ করে, মৃত্যু আসিরা মানুষকে সেইরূপ আক্রমণ

করে। মাতা বল, পিতা বল, ভাই বল, বন্ধু বল, সে সময়ে কেহই (জীবনের) কণামাত্র রক্ষা করিতে পারে না। ২২। কিবা আত্মীয়-স্বজন, কিবা বন্ধু-বান্ধব, কিবা পুত্র-কন্যা—কেহই সে যন্ত্রণার অংশভাগী হয় না। কর্ম্মকর্ত্তাকেই কর্ম্মের ফলভাগী হইতে হয় ; একাই যন্ত্রণাভাগী হয়। ২৩। হতী যেমন পঙ্ক-মধ্যে নিপতিত হইয়া সমুখস্থ উচ্চ ভূ-খণ্ড দেখিয়াও তাহাতে উঠিতে সমর্থ হয় না ; যাহারা কামাসক্ত, ইঞ্জিয়-সুখ-মগ্ন, ধর্ম্মপথের পথিক নহে, তাহাদেরও সেই দুর্দশা। ৩০। কাল অতীত হইতেছে ; দিন দ্রুতগতি চলিয়া যাইতেছে ; মনুষ্যের সুখ চিরস্থায়ী নয়। বৃক্ষ ফলশূন্য হইলে পক্ষী যেমন বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, আত্মা-কাল-কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভোগসুখ সেইরূপ শেষ হইয়া আসে। ৩১। ভোগসুখ পরিহার করিতে যদি একান্ত অপারক হইয়া থাকেন, হে রাজনু ! তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের অমুঠানে প্রবৃত্ত হউন ; ধর্ম্মের অনুসরণ করুন, জীবে দমার্জ-চিত্ত হউন ; তাহার ফলে, পরজন্মে উচ্চ দেব-গতি লাভ হইতে পারে। ৩২।” এই বলিয়া চিত্র বিদায় লইলেন ; উপসংহারে কহিলেন,—‘যদি মোহ পরিহার করিতে না পারেন, যদি ধনৈশ্বর্য্যেই আসক্ত থাকেন, নিরুপায় জানিবেন।’

স্বর্গভ্রষ্ট দেব-ঘটকের নরলোকে বিচরণ উপলক্ষে জৈনশাস্ত্রে তৃণা-ত্যাগের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাই। পুরাকালে উত্তরার (ইণ্ডকার—কুরুদেশ) নামে সুরলোকের ন্যায়

তৃণাত্যাগ-
দৃষ্টান্ত।

এক রম্য নগর ছিল। সেই নগরে সেই দেবগণ মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হন। দুই

জন চিরকুমার ছিলেন ; তৃতীয় জন ভৃগু নামে পরিচিত হইয়া পোরোহিত্য-

কার্য্যে ব্রতী হন ; চতুর্থ—তঁাহার পত্নীরূপে যশা নামে পরিচিতা ছিলেন ;

পঞ্চম—ইণ্ডকারের প্রথাতনামা অধিপতি ‘রাজা ইণ্ডকার’ ; ষষ্ঠ—তঁাহার পত্নী ‘রাজ্ঞী কমলা-বতী’। ইঁহারা কি প্রকারে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করেন, ধর্ম্মপথের পথিক হন, উপাখ্যানে তাহাই বিবৃত আছে। চিরকুমার দুইজন পুরোহিতের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেশ্বতি জাগরুক হওয়ায় প্রথমেই তঁাহাদিগের চিত্তে নির্ব্বিদ উপস্থিত হইয়াছিল। মুক্তিকামী হইয়া প্রথমেই তঁাহারা পিতৃসমীপে বিদায়-প্রার্থনা করেন। পিতা অনেকরূপ বুঝাইয়া তঁাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু পিতার সকল যুক্তি পুত্রদ্বয় তর্কদ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলেন। পিতা প্রথমে সাংসারিক সুখের বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা পান, পুত্রেরা সে কথায় কর্ণপাত করেন না।

পিতা তখন বুঝাইবার প্রয়াস পান—“ইহসংসারের সুখই সুখ ; পরলোকের কল্পনা বুখা মাত্র’। তিনি বলেন,—“অরণি-কাষ্ঠ হইতে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয়, দুগ্ধ হইতে যেমন নবনী উৎপন্ন হয়, তিল হইতে যেমন তৈলের উৎপত্তি ; হে পুত্র, এই দেহ হইতেই সেইরূপ আত্মার উৎপত্তি। উহারা কেহই পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না। এখন উহাদের বিদ্যমানতা দেখি। পরে উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কি আত্মা, কি দেহ,—কেহই চিরস্থায়ী নয়।”

কুমারেরা কহিলেন,—“পিতঃ ! ইঞ্জিয়ের দ্বারা অমূর্ত্ত আত্মার ধারণা সম্ভবপর নহে। আত্মা যখন অরূপ অমূর্ত্ত, তখন উহা অনন্ত। মিথ্যাভাদি গুণের দ্বারা আত্মা আবদ্ধ হয় ; সেই বন্ধনই আত্মার সংসার-হেতু ; অর্থাৎ, কর্ম্ম দ্বারাই আত্মা আবদ্ধ হইয়া সংসারচক্রে বিঘূর্ণিত হয়। ধর্ম্মতত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকিয়া পাপকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছি। তাহারই ফলে

এই অধঃপতন ঘটিয়াছে। মনুষ্যজীবন সর্বদা প্রপীড়িত, সর্বদা আক্রান্ত, সর্বদা পরিভ্রষ্ট।
এ জীবনে গৃহবাসে কোনও শান্তি নাই।”

পিতা কহিলেন,—“কে প্রপীড়িত করিবে? কে আক্রমণ করিবে?”

কুমারেরা কহিলেন,—“মৃত্যু আসিয়া মনুষ্যকে প্রপীড়িত করিতেছে; বার্কক্য আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। দিন অতীত হইতে চলিল। যে দিন একবার চলিয়া যায়, সে আর ফিরিয়া আসে না। যে জন ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহার দিন বিনালাভে অতিবাহিত হয়। আর যে জন ধর্ম্মানুসারী হন, তিনিই দিন দিন লাভবান হন। যিনি মৃত্যুকে আপনার মিত্র বলিয়া আবাহন করিতে পারেন, কিম্বা যিনি তাহার সংসর্গ পরিহার করিতে সমর্থ হন, অথবা যিনি জানেন যে, তাহার মৃত্যু নাই, তিনিই কর্তব্য অবধারণে সমর্থ হইয়াছেন।”

ইহার পরই কুমারদ্বয় গৃহত্যাগী হন। তখন, ভৃগু আসিয়া পত্নী বাশিষ্ঠীকে কহেন,—
“প্রিয়ে! গার্হস্থ্য জীবনে আর কোনও আকর্ষণ নাই। যতদিন শাখা-প্রশাখা থাকে, বৃক্ষ ততদিনই প্রকৃত বৃক্ষ নামের বাচ্য। সে যখন শাখা-প্রশাখা ভ্রষ্ট হয়, তখন কাণ্ডমধ্যে পরিগণিত হয়। পক্ষভ্রষ্ট পক্ষী যেমন, রণস্থলে অস্ত্রচরবিহীন নৃপতি যেমন, বাণিজ্য-দ্রব্যশূণ্য বাণিজ্য-পোতে বণিক যেমন, পুত্রাদি বিহনে আমারও এখন সেই অবস্থা।”

বাশিষ্ঠী বহুপ্রকারে পতিকে সন্ন্যাসে বিরত করিবার প্রয়াস পাইলেন। বুঝাইলেন—
সাংসারিক সুখের বিষয়। বুঝাইলেন—সন্ন্যাস-জীবন দুঃখপূর্ণ। কিন্তু ভৃগু কোনও কথায় প্রলুব্ধ হইলেন না। ভৃগু কহিলেন,—“প্রিয়ে! সর্প যেমন কঙ্ক (খোলস) পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ লাভ করে, তার পর যথেষ্ট-গমনে সমর্থ হয়, আমার পুত্রেরা সেইরূপ সাংসারিক সুখভোগ বিসর্জন দিয়া সত্যপথে অগ্রসর হইয়াছে। আমিই বা কেন তাহাদের অনুসরণ না করিব? রোহিত মংস্ত্র যেমন জীর্ণ জাল ছিন্ন করিয়া প্রধাবিত হয়, আদর্শচরিত্র জ্ঞানিজনও সংযম-সাধনার প্রভাবে সেইরূপ ইহলৌকিক সুখকে ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করেন। ৩৫ ॥”

পতিকে সংসারের প্রতি এবাধিধ বীতরাগ দেখিয়া বাশিষ্ঠী কহিলেন,—“ক্রোধ ও হংস যেমন জলে ছিন্ন করিয়া আকাশে উড়ীন হয়; আমার পতি ও পুত্র সেইরূপ সংসার-জাল ছিন্ন করিয়াছেন। আমিই বা কেন, তাহাদের অনুসরণ না করিব? ৩৬ ॥”

এইরূপে পুরোহিত, পুরোহিত-পত্নী ও তাহাদের পুত্রদ্বয় যখন সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন; রাজার মনেও তখন নির্বেদ উপস্থিত হইল। নৃপতিকে সঙ্কোচন করিয়া রাজা কহিলেন,—“বমনোদগত আহাৰ্য্য পুনগ্রহণ কদাচ প্রাণনীয় নহে। ব্রাহ্মণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আপনি কেন রাজকোষের অন্তর্ভুক্ত করেন? সমগ্র পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পত্তি যদি আপনার হয়, তাহা হইলেও আপনার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবে না। আর সেই সমগ্র ধন-সম্পত্তিও আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। হে রাজন্! মৃত্যু-কালে বনোমদ ঐশ্বর্য্য-সম্পৎ, সকলই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। কোনও পার্থিব পদার্থই সেদিন আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না! বিহঙ্গ যেমন পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করে

না, আমারও সেইরূপ এ সংসারে আর আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছা নাই । ৪১ ॥ দাবানলে আরণ্য পুত্র দক্ষীভূত হইলে রাগ-দেবাভিভূত অগ্নি কতকগুলি প্রাণী যেমন প্রেমোদ-প্রফুল্ল হয়, অজ্ঞানী আমারও সেইরূপ রাগ-দেবের অনলে পৃথিবীকে দক্ষীভূত হইতে দেখিয়া প্রেমোদে আসক্ত রহিয়াছি । ৪২—৪৩ ॥ ভোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাহার্য বায়ুর জ্বায়া বেচ্ছা-গতি লাভ করিতে পারিয়াছেন, আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীর জ্বায়া বাহার্য্য আবাসগতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই জীবন সার্থক । ৪৪ ॥ পক্ষীকে যখন ধৃত করিয়া হস্তমধ্যে রক্ষা করি, সে পলায়নের জগ্ন কত যত্নবান হয় । আগাদেরও সেইরূপ কামনার বন্ধন হইতে নিৰ্ম্মুক্ত হইবার জগ্ন সর্বদা চেষ্টা করা আবশ্যক । ৪৫ ॥ আমিষ-লোভী গৃধ্র জালবদ্ধ হইলে অগ্নি পক্ষী যেমন তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া সতর্ক হয়, কামলুরু জীবের দুর্দশা দেখিয়া আমাদেরও সেইরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক ; বিষয়াদির প্রলোভন পরিহর্তব্য । ৪৬ ॥ সর্প যেমন গরুড়-ভয়ে ভীত হইয়া শঙ্কিত-ভাবে বিচরণ করে, সংসার-বন্ধ-হেতুভূত বিষয়-বাসনাকেও সেইরূপ শঙ্কার সহিত বর্জন করা আবশ্যক । ৪৭ ॥ শৃঙ্খল ভঙ্গ করিতে পারিলে হস্তী যেমন যথেষ্ট-স্থানে পলায়ন করে, মারুৎও সেইরূপ কামনার শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হয় । ৪৮ ॥ হে রাজন্ ! এই যে রাজ্য, এই যে স্নখ-সম্পদ, এই যে কামনার বিষয়, তাহা পরিত্যাগ করুন । ইঞ্জিরের তৃপ্তিসাধনে প্রয়াস পরিহার করুন । ধন-সম্পদে আসক্তি ছিন্ন হউক । সংসারের স্নখ বিসর্জন দিয়া ধর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হউন । দৃঢ় চেষ্টার কলে সংযম অধিগত হয় । ৪৯—৫০ ॥

জহায়ভোজী তণ্ডুল ভুংগো নিম্মোয়নিং হিচ্চপলেই মুত্তে । এমেব জায়া পরহংতি-
ভোএনোহং কহং নাগু গতিস্গমেকো ॥ ৩৪ ॥ ছুদিতুজাং অবলং বরোহিরা মচ্ছাজ্জহা
কামগুণেপহায় ধোরেন সীলাতবসা উদার্য ধীরাহভিক্খারিঅং চরংতি ॥ ৩৫ ॥
নহেব কুংচা সমইকমংতা তন্নগি জালাগি দলিতুহংসা । পলেংতি পুত্তার পজ্জমজ্জবংতেহং
কহংনাগুগমিস্গমেকো ॥ ৩৬ ॥ নাহং রমেপংক্খিণি পংজরেবা সন্তাণছিরা চরিস্গামি-
মোং । অকিংচনাউজ্জু কডা নিরামিসাপরিগ্গহারাংত নিরত্তদোসা ॥ ৩৭ ॥ দবগ্গিণা
কহারেনেউজ্জামাণেন্স জংতুহ । অয়েসন্তাপ মোয়ংতি রাগদোস বসংগয়া ॥ ৩৮ ॥ এবমেব
বয়ং মুচা কামভোগেন্স মুচ্ছিয়া উজ্জুমাং নবুজ্জামো । রাগদোবগ্গিণা জগং ॥ ৩৯ ॥
ভোগেভোচ্চাবমিতায় লহত্তর বিহারিণো । অমোয়মাণা গচ্ছংতি দিয়াকম কমাইব ॥ ৪০ ॥
ইমেয় বদ্ধা ফংদংতি মমহথজ্জমাংগয়া বয়ংচ সত্তাকামেন্স ভবিস্গামো জহাইমে ॥ ৪১ ॥
সামিসং কুললংদিসং বজ্জমাংগ নিরামিসং আমিসং সন্সমুজ্জবিত্তা বিহারিস্গামো
নিরামিসা ॥ ৪২ ॥ গিচ্ছো বমেউ গচ্ছাং কামে সংসারবড্ঢণে । উরগো স্তবয় পাসেক
সংকামণো তণ্ণচরে ॥ ৪৩ ॥ নাগোব বংগং ছিত্তা অল্পণো বসহিংবএ । এয়ং পথং
মহারায়ং উত্তরারেত্তিমেষুং ॥ ৪৪ ॥ চজ্জিতা বিউলং রজ্জং কামভোগেন্স ছুচএ ।
নিব্বিসয়া নিরামিসা নিয়েহানিপরিস্গহা ॥ ৪৫ ॥ সন্সং ধন্সং বিয়া পিত্তা চিত্তাকাম-
গুণে বরে । তবংগিঅ হক্খায়ং যোরং যোর পরকমা ॥ ৪৬ ॥

রাজ্যের এবিধ উৎসাহপূর্ণ বাক্যে রাজ্যের চৈতন্য উদয় হয় ; রাজ্যের ব্যাধ্যে জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানাবস্থার দূরীভূত হইলে রাজ্যও সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করেন ।

সংসার-ত্যাগে ভিক্ষু-ধর্ম-গ্রহণে ভিক্ষু-জীবন কল্পে বাপন করিতে হইবে, অতঃপর তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । উত্তরাধারনের পঞ্চদশ অধ্যায়নের বর্ণিতবা বিষয়—

“স ভিক্ষু” । ঐ অধ্যায়নের প্রতি শ্লোকেরই শেষ বাক্য—“স ভিক্ষু” । অর্থাৎ ভিক্ষু কে ? কি গুণ-ধর্মের অধিকারী হইলে প্রকৃত ভিক্ষু পদ লাভ করা যায়, কি কঠোর সংযম-সাধনার সিদ্ধিলাভ করিলে প্রকৃত ভিক্ষু হইতে পারা যায়, এই অধ্যায়নের শ্লোক-বোধ্য তাহাই বিবৃত আছে । যদি কাহারও মনে প্রশ্ন উঠে, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—ভিক্ষু কে ? (কঃ ভিক্ষু) তাহার উত্তর,—

“যোগং চরিস্সামি সমেচ্চবস্সং সহিএউজ্জু কডেনিয়াণ ছিন্নে । সংথবং জহেজ্জ অকামকামে অগ্গায়এসী পরিকএ স ভিক্ষু ॥ ১ ॥ রাগোবরয়ংচরেজ্জমাচে বিয়এ বের বিয়য় রক্খিএ । পরে অভিত্তর সব্বদংসী জে কম্হি বিনমুচ্ছিএ স ভিক্ষু ॥ ২ ॥ অকোপবহংবিদিত্তুঘীরে মুনীচরে লাচে মিচ্চমায় শুত্তে । অবগ্গমণে অসংপ-হিট্টে জে কসিণং অহিয়ারসএ স ভিক্ষু ॥ ৩ ॥ পংতং সরণাসণং ভইত্তানি উন্থং বিবিহংচ দংসমসগং অবগ্গং অবগ্গমনে অসংপহিট্টে জে কসিণং অহিয়ারসএ স ভিক্ষু ॥ ৪ ॥ নোসত্তির মিচ্ছক্কণ পুয়ং নোবির বংঘণগংকওপসংসং । সসংজএ ত্বকএ তবস্সী সহিএ আর গবেসএ স ভিক্ষু ॥ ৫ ॥ যেন পুণো জহাই জীবিয়ং মোহং বাক-সিণং নিরুচ্ছই । নরনারিংপজহে সয়া তবস্সীনয় কোউহলং উবেজ্জি স ভিক্ষু ॥ ৬ ॥ ছিন্নং সরংভোণ মংতলিক্খং সুবিণ লক্খণ দংডবথু বিজ্জং । অংগবিয়ারং সরস্স বিজ্জয়ংজো বিজ্জাহিং ন জীবজ্জি-স ভিক্ষু ॥ ৭ ॥ মূংতং মূলং বিবিহং বিজ্জচিংতং বমণ বিয়য়ণ ধুত্তেনত্ত সিণাণং আউরে সরণংতিগিচ্ছিন্নংচ । তং পরিয়ার পরিবএ স ভিক্ষু ॥ ৮ ॥ খত্তিয়গণউগ্গরারপুত্তমাহণ ভোইয় বিবিহার সিঞ্জিণো গোতেসিং বয়ই সিলোগ পুয়ং তং পরিয়ার পরিবএ স ভিক্ষু ॥ ৯ ॥ গিহিণোজে পব্বইএণ দিট্টা অপব্বই এণবসংথুয়া হবেজ্জা তেসিংইহলোইয় ফলট্টা জো সংথবং ন করেই স ভিক্ষু ॥ ১০ ॥ সরণাসণপাণ ভোয়ণং বিবিহং খাট্টম-সাইমং পরেসিং অদএ পডিসেহিএ নিয়ংটে জেতখনপও সজ্জি স ভিক্ষু ॥ ১১ ॥ জং কিংচি আহারপাণং বিবিহংথাই সমাইমং পরেং সিং লঙ্খুং জোতংতিবিহেণনাপু কংপেমণ বয়কার সুসংবডে স ভিক্ষু ॥ ১২ ॥ আরামগংচেব জবোদগংচ সীয়ংসো বীরংচ জবোদগংচ নোহীলএ শিডং নীরসংতু পংতং কুলাইং পরিবএ স ভিক্ষু ॥ ১৩ ॥ সদ্ধা বিবিহাভবংতিলোএ দিব্বামাগুস্সার তহাতিরিচ্ছা । ভীমাভয়ভেরবা উরালাজে সোচ্চা ন বিহিচ্ছই স ভিক্ষু ॥ ১৪ ॥ বায়ং বিবিহং সমেচ্চলোএসহিরেথেরাপু গএ কোবিয়প্পা । পরেঅভিত্তর সব্বদংসী উবসংতেঅ বিহেউএ স ভিক্ষু ॥ ১৫ ॥ অসিঞ্জজীবীঅ গিহেঅমিত্তেজি ইংদিএ সব্বওবিয়মুকে অণুসসস্কেলহ অল্পভক্খী । চিচ্চাগিহং এগচরে স ভিক্ষুত্তিবেমি ॥ ১৬ ॥”

অর্থাৎ,—“ভিক্ষু-ধর্ম-গ্রহণে অধীকার পূর্বক যিনি সাধুসঙ্গে সরল অন্তঃকরণে কায়না-বর্জিত হইয়া বাস করেন ; এবং পূর্ব-সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া সুখাশা-পরিবর্জন পূর্বক অজাত

অপরিচিত ভিক্ষকের ভ্রাম্য পরিভ্রমণ করেন ; তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য । ১ ॥ অমুরাগ-বিবর্জিত হইয়া সততার আদর্শ রূপে পাপকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক যিনি ধর্ম্ম-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করেন ; এবং আত্মাকে সর্ব্ববিধ অপবিত্র সংসর্গ হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞানী দৃঢ়চিত্ত ও সর্বদর্শী হইতে পারেন ; অপিচ, সর্ব্ববিষয়েই যিনি আসক্তি-পরিশূন্য হন ;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষুপদবাচ্য । ২ ॥ কোনরূপ নিন্দার বা ক্ষতিকর কার্য্যে যিনি অবিলম্বে-চিন্ত্ত, সততার আদর্শ-স্বরূপ যে দৃঢ়চিত্ত ভিক্ষু আপন আত্মাকে সর্বদা পাপ-সংসর্গ হইতে নির্লিপ্ত রাখিতে পারিয়াছেন ; কোনও বিষয়ের প্রতিই যাহার রতি বা আকাজ্ঞা নাই ; যিনি সকল বিষয়েই সর্ব্বথা সহ্য করিতে সমর্থ ;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য । ৩ ॥ নিকৃষ্ট শয্যায় বা বাসস্থানে যাহার পরিতুষ্টি ; শৈত্যে বা উত্তাপে, মক্ষিকার বা মশকের উপদ্রবে যিনি কদাচ বিচলিত নহেন ; সকলই যিনি সহ্য করিতে পারিয়াছেন ;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য । ৪ ॥ যিনি সম্মানজনক ব্যবহারের, অথবা আতিথ্য-সংকার লাভের আকাজ্ঞা করেন না ; যিনি প্রশংসার অথবা শ্রদ্ধা-ভক্তির আশায় আশাবিত্ত নহেন ; যিনি আত্ম-সংযমশীল প্রতিজ্ঞাপালন-তৎপর, কঠোর নিয়ম-পালনে সদা-অভ্যস্ত ; সাধু সঙ্গে বাসে সতত সচ্চিন্তায় যাহার আত্মা নিবিষ্ট ;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য । ৫ ॥ যিনি আপনায় জীবনকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন ; মোহকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সম্মুখাভে যিনি উদাসীন ; যিনি সর্বদা কঠোর সংযম-সাধনা-পরায়ণ ; কোনও বিষয়েই যাহার কোতুহল নাই ;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য । ৬ ॥.....পাণ্ডিৎস্ব স্বখ-সম্পৎ-লাভের জন্ত যিনি কখনও কোনও গৃহীর সহিত সন্ধ স্বাপন করেন নাই, কিংবা কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ নহেন ;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য । ১০ ॥ কোনও গৃহী যদি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া শয্যা, বাসস্থান, পানাহার কিংবা কোনও সুখাত্ত প্রদান না করে, নিগ্রহ কদাচ তাহা গ্রহণ করিবেন না । গৃহীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইলেও যে নিগ্রহ কখনও ক্রোধের বশীভূত হন না ; তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য । ১১ ॥ যদি কোনও নিগ্রহ খাণ্ড পানীয় প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া বাক্যে চিন্তায় বা কার্য্যে আপনায় সমধর্ম্মী ভিক্ষুগণের প্রতি সহানুভূতি-পরায়ণ না হন ; তাহা হইলে তাঁহাকে প্রকৃত ভিক্ষু বলা যায় না ; অপিচ, যিনি চিন্তায় বাক্যে বা কার্য্যে সম্পূর্ণ বিনয়-সম্পন্ন ;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য । ১২ ॥.....যাহার গৃহ নাই, যাহার বন্ধু নাই ; যিনি ইঞ্জিরগণকে জয় করিতে পারিয়াছেন ; যিনি সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন ; যিনি নিষ্পাপ এবং স্নানাহারী গৃহত্যাগী ও সঙ্গ রহিত ;—তিনিই প্রকৃত ভিক্ষু-পদবাচ্য । ১৬ ॥

নিগ্রহ বা ভিক্ষু হইতে হইলে বড় কঠোর সংযম-সাধনা আবশ্যক । জৈন-শাস্ত্রে সাধারণ-ভাবে নিগ্রহের প্রতিপাল্য দশটি বিধি আছে । জৈন-ধর্ম্ম-গ্রহণ কালে যে পঞ্চ

মহাব্রত গ্রহণ করিতে হয়, দশবিধ বিধি বা অমুশাসন তাহারই অন্তর্ভুক্ত
নিগ্রহের
আচার-লক্ষণ । বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতিতে

আকৃষ্ট না হইয়া কঠোর সংযম-সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে নিগ্রহ বা ভিক্ষু হইতে পারা যায় । নিগ্রহের প্রতিপাল্য যে দশবিধ নিদেশ আছে, তৎসমুদায়ের

মৰ্ম এই যে, নিগ্রহ কখনও এক স্থানে অবস্থিতি করিবেন না, কদাচ জীলোকের সংসর্গে আসিবেন না, কদাচ নৃত্য-গীত-বাঞ্চে আসক্ত হইবেন না, কদাচ সুখান্তের বা সুবেশের অমুরাগী হইবেন না। বাক্যে, কার্য্যে বা চিন্তায় কোনও বিষয়ে তাঁহার আসক্তি না জন্মে,—ইহাই এ সম্বন্ধে স্থূল উপদেশ। নিগ্রহ নামের সার্থকতা এবং নিগ্রহের পদস্থলন প্রভৃতি বিষয়ে শাস্ত্রে অশেষ দৃষ্টান্ত আছে। আবার সংসার-কীট মাত্রব, রাজ্যার্থার্থ্য আকৃষ্ট নরপতি, কিরূপে ভিক্ষু-জীবন গ্রহণ করিয়া চিরশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হন, তাহারও ভূয়সী দৃষ্টান্ত জৈন-শাস্ত্রে দেখিতে পাই। রাজা সঞ্জয় প্রভৃতির প্রসঙ্গে, তাঁহাদের সংসার-ত্যাগের দৃশ্য উজ্জল হইয়া আছে। জৈন-শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—কাম্পিল্য নগরে সঞ্জয় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বহু সৈন্ত-সামন্ত, বহু গজাশ্ব-রথ ছিল। রাজা সঞ্জয়ের উপাখ্যান। সঞ্জয় একদা যুগ্মায় বহির্গত হন। সঙ্গে অসংখ্য ঘোটক, অসংখ্য গজ, অসংখ্য রথ এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্ত সুসজ্জিত ছিল। যুগ্মায় গমন করিয়া অখারোহণ পূর্বক সঞ্জয় এক যুগের অমুসরণে ধাবমান হন। কাম্পিল্য নগর সান্নিধ্যে ‘কেশর’ উত্তান মধ্যে সেই যুগ্ম পলায়ন করে। রাজা সঞ্জয় ক্রীড়াচ্ছলে সেই ভীত ভ্রস্ত যুগ্মের সংহার-সাধন করেন। তখন কেশর উদ্যানে এক সন্ন্যাসী যোগ-মগ্ন ছিলেন। সংসারের সর্বপ্রকার পাপ-জনক প্রবৃত্তি ধ্বংস করিয়া বৃক্ষমূলে আশ্রয়-গ্রহণ পূর্বক তিনি তপস্বী করিতেছিলেন। যুগ্ম যখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া সেই সাধু-সন্নিধানে উপস্থিত হয়, রাজা সঞ্জয় তখনই তাহাকে নিহত করেন। যুগ্ম নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার দৃষ্টি সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্বক সাধুর নিকটে গমন করেন। অমুশোচনায় তীব্র তাপে নৃপতির হৃদয় বিদগ্ধ হইতে থাকে। তিনি মনে মনে বলেন,—‘হায়, আমি কি সর্বনাশই করিয়া-ছিলাম! ক্রীড়ামদে উন্নত হইয়া এখনই সাধুর সংহার-সাধন করিতে বসিয়াছিলাম! আমি কি নির্দয়!—আমি কি হতভাগ্য!’ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, অশ্বকে বিদায় দিয়া, নৃপতি সেই ভিক্ষুর পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া আর্তস্বরে কহিলেন,—‘মহাত্মন! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।’ সাধু ভগবচ্চিন্তায় নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন। নৃপতির প্রার্থনায় কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। রাজার মনে তাহাতে অধিকতর ভয়ের সঞ্চায় হইল। তিনি আর্তস্বরে কহিলেন,—‘আমি রাজা সঞ্জয়। হে মহাত্মন! আপনি আমার ক্ষমা করুন। আপনার ক্রোধানলে যেন আমার এ লক্ষ লক্ষ সহচর ভস্মসাৎ না হয়।’ ভিক্ষুর ধ্যান-ভঙ্গ হইল। নৃপতিকে আশ্বস্ত করিয়া তিনি উত্তর দিলেন,—‘হে রাজন! কোনও শঙ্কা নাই! আপনার সহচরগণকেও অস্ত্র প্রদান করুন। পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীব-জীবনে কেন আপনারা নিষ্ঠুরাচারে আসক্ত হইয়াছেন? নিশ্চয়ই এক-দিন এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের অবসান হইবে। সংসারের সকল বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইবে। এ অবস্থার বিষয় অবগত থাকিয়াও কেন আপনার রাজ-শক্তিতে আসক্তি দেখি! জীবন এবং সৌন্দর্য্য বিদ্যা-প্রবাহের জ্ঞান ক্ষণস্থায়ী! তাহাতেই আপনার এত আসক্তি! মনে ভাবিয়া দেখুন—পরজীবনে উহাদের দ্বারা কি উপকার সাধিত

হইবে! জী বনুন, পুত্র-কন্যা বনুন, বন্ধু-বান্ধব বনুন, আত্মীয়-স্বজন বনুন, মনুষ্যের জীবন-কালে যাহারা পোষ্য ছিল, মৃত্যুর সময় তাহারা কেহই অমুসরণ করে না! পুত্রগণ হুঃখ প্রকাশ করিয়া পিতার মৃতদেহ অপসৃত করে। পুত্রগণের এবং আত্মীয়গণের সম্বন্ধে পিতামাতারও সেই ব্যবহার। এ সকল দেখিয়া, হে রাজন, সংযম-সাধনা শিক্ষা করুন। মৃত ব্যক্তি যে ধনরাশি সঞ্চয় করিয়া যায়, তাহার আত্মীয়-স্বজন আনন্দে সে ধন-সম্পত্তি উপভোগ করে। এমন কি, মৃত ব্যক্তির স্মরণিত সহধর্ম্মীকে পর্য্যন্ত পরিশেষে অপরের অকৃশায়িনী হইতে দেখা যায়। ইহা দেখিয়াও কি মনুষ্যের জ্ঞান-চৈতন্য হয় না! ইহ-সংসারে মানুষ ইহ-জীবনে সদস্য যে কোনও কার্য্য করে, পরজীবনে তাহাকে তাহার ফল-ভাগী হইতে হয়। * ভিক্ষুর এবিধ উপদেশ-বাক্যে নৃপতির জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি সেই ভিক্ষুর নিকট সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তদবধি আত্মার পবিত্রতা সাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি আসিল। পার্থিব-সর্ববিধ পদার্থে তাঁহার অরতি জন্মিল। তিনি বুঝিলেন,—যিনি সকল বন্ধন, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছেন, তিনিই মুক্ত-পুরুষ। †

নৃপতি সঞ্জয় সাধু-বাক্যে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্থায় আরও বহু নৃপতি জ্ঞানালোক লাভ করিতে সমর্থ হন। রাজা ভরত, বাহার নাম অমুসারে ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি, জৈনশাস্ত্রানুসারে তিনিও এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

বলজীর উপাঙ্গান। রাজা সগর, এই সদ্জ্ঞান লাভ করিয়া সমাগরা ধর্ম্মজীর আধিপত্য অবহেলায় পরিত্যাগ করিয়া যান। বিশ্বব্যাপী রাজ-শক্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজা মঘবন, রাজা সনৎকুমার, শান্তি, কুহু, অর, মহাপদ্ম, হরিসেন, জয়, বশার্ণভদ্র, কলকণ্ঠ, ত্রিমুখ, নমী, নথজিৎ, উদয়ন, বিজয়, মহাবল এবং কাশীরাজ প্রভৃতি নৃপতিগণ সেই জ্ঞান লাভ করিয়া সর্বত্যাগী হইয়াছিলেন। ‡ পূর্ববর্ত্ত রাজগণ যে জ্ঞান লাভ করিয়া যে

ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া যান, অক্ষুট-কোরক-সদৃশ কত কত রাজকুমারের জীবন-

রাজা সঞ্জয়কে ভিক্ষু যে উত্তর দিয়াছিলেন, উক্তরাখ্যন সূত্রের ভাষায় তাহা এইরূপ বিবৃত হইয়াছে; বধা,—

“অতঃ পথিবাত্ত্বং অতঃসার্য্য ভবাহিয়। অগিচে জীবলোগমি কিংহিংসাঃ পসজ্জনী ॥ ১১ ॥

জয়সবং পরিচজ্জ গাতব্ব মবসসন্তে। অগিচে জীবলোগমি কিংরজ্জমি পসজ্জনী ॥ ১২ ॥

জীবসং চেবল্লবণে বিজ্জুসংপার চংবলং। জথং মুজ্জবসীরাং পীচেথং নাববুজ্জসে ॥ ১৩ ॥

মারাপিয় হুমাচেব মিভায় তহ বংখতা। জীবন্ত মনুজীবন্তি ময়নাগু কয়্যতিয় ॥ ১৪ ॥

নৌহরতি ময়পুত্তা পিয়রঃ পরমহুত্থিয়। পিয়রোবি তহা পুত্তে বংখুরায় তবংচরে ॥ ১৫ ॥

তত্তেপজ্জিএ দকেদারের পরিবত্থিয়ে। কীলঃ তয়ে নরারায়ঃ হট্টতুট্ট মলকিআ ॥ ১৬ ॥

ভেগা বিজঃ কয়ঃ কয়ঃ হুহংবাজইবাহুহং। কস্মুগাতেগং সজ্জুত্তো গচ্ছইও পরঃভবং ॥ ১৭ ॥

কহংখিয়ে অহে উহিং অজ্জাণং পরিবাবসে। সসসংগং বিশিমুকে সিজ্জে হবই নীরএত্তিবেসি ॥ ১৮ ॥

জৈনধর্ম্ম গ্রহণ উপলক্ষে পূর্বোক্ত যে সকল রাজার ত্যাগ-বীকারের দৃষ্টান্ত জৈনশাস্ত্রে উক্ত দেখি, তাহারা আর সকলেই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পৃষ্ঠ-পোষক ও আদর্শ-অমুসরণকারী ছিলেন বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে পরিচিত আছেন। এই বিবরণ চিন্তা করিয়া দেখিলে জৈনধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম যে অভিন্ন, এবং একেরই দুই প্রতিকল্প, তাহা অতঃই মনে আসে। যে ভারতের নাম অমুসারে ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি, তাঁহার সম্বন্ধে নানা সত্যান্তর আছে। জৈন-শাস্ত্রের মত এই যে, প্রথম জৈন-ভারতের স্বতন্ত্রতাবশত জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই ভারত। তিনি প্রথম রাজচক্রবর্ত্তী

হাতেও সেই দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইতে পাই। কুমার বলশ্রী তাঁহাদের অন্ততম। মনোহর উজ্জানাদি শোভিত সুর্য্যীব নগরে রাজা বলভদ্র ও রাণী যুগা প্রতিষ্ঠাষিত ছিলেন। বলশ্রী তাঁহাদের একমাত্র প্রিয়পুত্র, ভাবী রাজ্যেশ্বর যুবরাজ। যুগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কুমার বলশ্রী যুগাপুত্র নামেও পরিচিত ছিলেন। আনন্দের সংসারে একমাত্র স্নেহের নন্দন—যখন সুর্য্যেশ্বরের মধ্যে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, সেই সময় সহসা এক শ্রমণের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁহাকে দেখিয়া কুমারের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—তিনি যেন সে মূর্ত্তি কোথাও দেখিয়াছেন। একদৃষ্টে সেই শ্রমণের প্রতি চাহিতে চাহিতে কুমারের মনে পূৰ্ব্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মনে পড়িল,—কি স্মৃত্তে কি আকাঙ্ক্ষার ফলে তিনি রাজ্য-

হইয়াছিলেন এবং অযোধ্যায় তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি যখন জৈনধৰ্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন ইন্দ্রদেবের আদেশ অনুসারে তিনি আপনার মন্তক হইতে পঞ্চমুষ্টি পরিণিত কেশ উৎপাটন করিয়াছিলেন। জৈনধৰ্ম্ম-সম্প্রদায়ে প্রবেশ-কালে জৈন যতিগণের সন্ধকে ঐ নিয়ম আজিও প্রচলিত আছে। সমাগরা ধরিত্রীর অধিপতি সগর যুগান্ত সন্ধকে পৌরাণিক বিবরণ পুরাণজ্ঞ হিন্দুর অবিদিত নাই। জৈনশাস্ত্রের মত এই যে, অজিৎ—দ্বিতীয় জৈন-তীৰ্থঙ্কর ছিলেন। তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঐ সগর অযোধ্যার অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীতে দ্বিতীয় রাজচক্রবর্তী বলিয়া অভিহিত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অজিৎ কর্তৃক তিনি ধৰ্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামায়ণে সগর রাজার যে বিবরণ আছে, জৈন-শাস্ত্রোক্ত সগর রাজার উপাখ্যান তাহারই অনুসরণ ভিন্ন অল্প কিছুই মনে হয় না। মঘবন্—শ্রাবস্তীর রাজা সমুদ্রবিজয়ের পুত্র বলিয়া পরিচিত। তাঁহার মাতার নাম—ভদ্রা। জৈনশাস্ত্র মতে তিনি তৃতীয় রাজচক্রবর্তী। সনৎকুমার—হস্তিনাপুরের অধিপতি রাজা অশ্বসেনের পুত্র। রাজ্যী সহদেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি চতুর্থ রাজচক্রবর্তী বলিয়া পরিচিত। শান্তি—ষোড়শ তীৰ্থঙ্কর। কুশু—সপ্তদশ তীৰ্থঙ্কর; এবং আর—অষ্টাদশ তীৰ্থঙ্কর। জ্যাকোবি বলেন,—কুশু নামটী কুহুংহ নামের অপভ্রংশ। তিনি ইন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করেন। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র কুহুংহ নামে পরিচিত। তিনিই প্রাকৃত ভাষায় কুশু নামে অভিহিত হইয়াছেন। মহাপদ্ম—নবম রাজচক্রবর্তী বলিয়া পরিচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুকুমার, হস্তত কর্তৃক জৈনধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই হস্তত বিংশতিতম জৈন তীৰ্থঙ্কর মুনি-হস্ততের শিষ্য ছিলেন। পিতা পদ্মোত্তরের মন্ত্রীর (নমুচির) নিকট হইতে মহাপদ্ম পৃথিবীর আধিপত্য কাড়িয়া লন। পদ্মোত্তর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি নমুচির নিকট একটা প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইয়াছিলেন। নমুচিকে তিনি ত্রিপাদ ভূমি দান করিবেন,—ইহাই তাঁহার সৰ্ত্ত ছিল। এই স্মৃত্তে পদ্মোত্তরের সাম্রাজ্য নমুচি অধিকার করিয়া বসেন। মহাপদ্ম কর্তৃক তাহার উদ্ধার-সাধন হয়। হস্তিনাপুরে মহাপদ্মের রাজধানী ছিল। জ্যাকোবি বলেন,—এই উপাখ্যানটী ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রের বর্ণিত বিষ্ণু ও বলির উপাখ্যান হইতে গৃহীত হইয়াছে। জৈনশাস্ত্রের মত এই যে, মন্ত্রী নমুচি বিবাদের ফলে রাজ্য অধিকার করিয়া জৈন ভিক্ষুদিগকে পরাভূত করেন। অপিত প্রতিশোধ-গ্রহণের উদ্দেশ্যেই জৈনগণকে রাজ্য পরিভ্রাণ করিতে আদেশ দেন। হরিসেন—কাম্পিলোর রাজা মহাহরির পুত্র। তিনি দশম রাজচক্রবর্তী বলিয়া পরিচিত। জয়—রাজগৃহের অধিপতি রাজা সমুদ্র-বিজয়ের পুত্র ছিলেন। তিনি একাদশ রাজচক্রবর্তী বলিয়া পরিচিত। দর্শণভদ্র—চতুর্বিংশ তীৰ্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সমসাময়িক। রাজা উদয়নও মহাবীর স্বামীর সমসাময়িক বলিয়া অভিহিত হন। কাম্বীরাজ বলিয়া যাহার উল্লেখ আছে, তাঁহার নাম—নন্দন। তিনি অশ্বিনিধি রাজার পুত্র এবং সপ্তম বদদেব নামে পরিচিত। বিজয়—বারকাবতীর রাজা ব্রহ্মরাজের পুত্র এবং বাহুদেব দ্বিপুত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া পরিচিত। মহাবল—হস্তিনাপুরের রাজা বলের পুত্র। ত্রয়োদশ তীৰ্থঙ্কর বিমলের সময়ে তিনি প্রতিষ্ঠাষিত ছিলেন।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রাধিপতির আনন্দ তখন কুমারের নিকট তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হইল, সংযম-সাধনার প্রবৃত্তি আসিল।

কুমার তখন পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—“আমি পঞ্চ মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছি। আমি জানিতেছি, পাপীর জন্ম নরকে বা ইহসংসারে পশুজন্মে কি কষ্ট—কি যন্ত্রণা! এই সংসার মহা-সমুদ্রে আর আমার আনন্দ বোধ হইতেছে না। মা, আমার সন্ন্যাস গ্রহণে অস্বস্তি দেও। হে পিতা! হে মাতা! আমি বহু স্নেহ ভোগ করিয়াছি। কিন্তু এখন বুঝিতেছি,—সে স্নেহ বিষফলবৎ। স্নেহ স্নেহের পরিণাম বড় যন্ত্রণাপ্রদ। সে যন্ত্রণা অবিচ্ছিন্ন অনন্তস্থায়ী। দেহ চিরস্থায়ী নয়। ইহা অপবিত্র ও অপবিত্রতা হইতে উৎপন্ন। আত্মার ক্ষণবিশ্বংসী এই বাসস্থান যন্ত্রণার আকর-স্বরূপ। এই ক্ষণস্থায়ী দেহ, যাহা অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আমার কোনও আনন্দ নাই। ইহা ফণপুঞ্জ-বৎ বা জলবুদ্বুদ সদৃশ। বৃথা মনুষ্য জীবন—অশান্তির ও পীড়ার আশ্রয়স্থল। বার্কক্য এবং মৃত্যু এ জীবন গ্রাস করিয়া ফেলে। এ জীবনে আমার মুহূর্তের জন্যও আনন্দ নাই। জন্ম—দুঃখদায়ক, বার্কক্য—দুঃখদায়ক, জরা-মৃত্যুও—দুঃখদায়ক! হায়! আর কিছুই নয়, কেবল দুঃখ লইয়াই সংসার। এ সংসারে মানুষ কেবল দুঃখেই ভোগ করে। এই ভূ-সম্পত্তি, এই অট্টালিকা, এই স্বর্ণ-রৌপ্য, এই স্ত্রী-পুত্র, এই আত্মীয়-স্বজন, এমন কি এই দেহ পর্যন্ত একদিন আমাকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিম্বাক ফল ভক্ষণের পরিণাম যেমন শোচনীয়, ইহসংসারে স্নেহভোগের পরিণামও সেইরূপ দুঃখপ্রদ। দূরদেশে যাত্রাকালে যদি কেহ আহাৰ্যাদির ব্যবস্থা না করিয়া গমন করে, পথে যেমন তাহার কষ্টের অবধি থাকে না, সে যেমন ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে; সেইরূপ, যে জন সঙ্কল্পের সম্বল না লইয়া পরজীবনের পথে যাত্রা করে, তাহাকেও পথে সেইরূপ অশান্তির ও পীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আর যে জন দূরদেশে যাত্রাকালে পূৰ্ব হইতেই আহাৰ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া লয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জনিত কোনও কষ্টই পরজীবনে তাহাকে অভিজুত করিতে পারে না। ধর্ম-সম্বলে বলীয়ান হইয়া পরজীবনের জন্য যাত্রা করিলে মানুষ কর্মবন্ধন ও যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। গৃহ অগ্নি-সংযুক্ত হইলে গৃহস্থায়ী যেমন মৃগ্যবান সামগ্রী-সমূহ সর্ব্বাঙ্গে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং অকিঞ্চিংকর দ্রব্য-সমূহ গৃহ-মধ্যে পড়িয়া থাকে; সেইরূপ, যখন দেখিতেছি—সমগ্র পৃথিবী অগ্নিসংযুক্ত হইয়াছে, বার্কক্য এবং মৃত্যু আসিয়া জীবনকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আত্মাকে রক্ষা করিবার উপায় কি? * হে জনক-জননী! অস্বস্তি করুন, আমি আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করি।”

* স্থাননিমেষে মহাব্রতনির অষ্টদ্বকং চ তিরিক্তজ্ঞেয়নিষু নিবিশ্ব কামোমি।

মহাব্রতং অগ্নি-জাহনকবইস্মামি অম্মো ॥ ১১ ॥

অন্যতরমএভোগা ভুত্বা বিসকলোবমা। পচ্ছা কড়ম বিবাগা অগ্নিবৎ দুহাবহা ॥ ১২ ॥

ইমং সরীরং অগ্নিচং অহুঈ অহুইসংভবং। অসানরা বাসনিগং দ্বকংকেসাগ ভারগং ॥ ১৩ ॥

অসানএ সরীরং মিরঈং নোবলভামিহং। পচ্ছাপুয়াচঈবকো ক্ষেণবুক্স সংগিত্তে ॥ ১৪ ॥

জনক-জননী উভয় দিলেন,—বৎস ! বড় কঠোর—শ্রমণ-ধর্ম প্রতিপালন । তিকুর মহত্ব গুণ-ধর্ম আবশ্যক । শত্রু মিত্র পৃথিবীর সর্ব জীবের প্রতি সমবশিতা চাই ; সারা-জীবনে সর্ববিধ জ্বালীর প্রতি অহিংসার বিরত থাকা আবশ্যক ;—এ বড় কঠোর কর্তব্য । মিথ্যা-বাক্যে বিরতি-বিষয়ে কদাচ অসতর্ক হইবে না ; মনোহারী অথচ সত্য বাক্য প্রয়োগে সর্বদা প্রবৃত্তির থাকিতে হইবে ;—এ বড় কঠোর কর্তব্য । অদম্য ত্রয়া (এমন কি খড়্গিকাচী পর্যন্ত) গ্রহণে বিরত থাকিতে হইবে এবং কেবলমাত্র নির্দোষ তিক্কা-গ্রহণে অধিকার থাকিবে ;—এ বড় কঠোর কর্তব্য । ইন্দ্রিয়-সুখের আবাদ প্রাপ্ত হইরাও সে সুখ-সন্তোষে বিরতি এবং সংযম-সাধনার জন্য দৃঢ়ব্রত ;—এ বড় কঠোর কর্তব্য । ধন-ধান্যের ও ভৃত্যবর্গের উপর আধিপত্যাত্যাগ, সর্বকার্য্যে বিরতি এবং কোনও বস্তু গ্রহণ না করা ;—এ বড় কঠোর কর্তব্য । খাদ্য পানীয় প্রভৃতি চতুর্দিক সামগ্রী রাজিতে গ্রহণ না করা অথবা পরদিনের বা অতাবপূরণের জন্য সঞ্চয় না রাখা ;—এ বড় বিষম কর্তব্য ! ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত গ্রীষ্ম, মশক-মক্ষিকার উপদ্রব, অপমান, বাসের কষ্ট, তৃণশয্যা, অপরিচ্ছন্নতা প্রহার ও ভয়-প্রাপ্তি, দৈহিক কষ্ট ও কারারূপ, তিকুর জীবন, নিফল তিক্কা,—এ সকল বড় কষ্টপ্রদ । পিজরাবদ্ধ পারাবতের ন্যায় এ জীবন নিরন্তর শঙ্কাকুল । মন্তকের কেশ উৎপাটন দারুণ যন্ত্রণাদায়ক । মহাব্রত-গ্রহণ এবং তাহা প্রতিপালন—উচ্চবংশীর জনের অসাধ্য । বৎস ! তুমি সুখের ক্রোড়ে লালিত ; তোমার নির্মল ও কোমল স্বভাব ; তুমি কখনই শ্রমণের ধর্ম পালন করিতে সমর্থ হইবে না । যতদিন জীবন, ততদিন শান্তি নাই—বিশ্রাম নাই । কর্তব্যের ভার—গুরুভার লোহভার অপেক্ষা দুর্ব্বল । মন্দাকিনী আত-ক্রম করা যেমন অসাধ্য, স্রোতের বিরুদ্ধে সন্তরণ করা যেমন হুঃসাধ্য, বাহুবলে সাগর-সন্তরণ যেমন অসম্ভব ; কর্তব্যের মহাসাগর উত্তীর্ণ হওয়াও সেইরূপ অসাধ্য । আত্মসংযম—সুখবিবরণপূর্ণ বাসুকা-রাশির ন্যায় স্বাদহীন । কঠোর সংযম-সাধনা—শাণিত তরবারিমুখে বিচরণের ন্যায় হুঃসাধ্য । সচ্চরিত্র বিনয়সম্পন্ন হওয়া বড় কঠিন । সর্প যেমন সর্বদা চক্ষুঃস্পর্শ করিয়া সদা-সতর্ক থাকে ; বিনয়-সম্পন্ন সচ্চরিত্র জনের পক্ষেও সেইরূপ সতর্কতা আবশ্যক । কিন্তু সে কি কঠিন সমস্তা ! লোহনির্মিত শস্ত চর্কণ বেরুণ অসম্ভব, মাহুঘের পক্ষে বিনয়-সম্পন্ন সচ্চরিত্র হওয়াও সেইরূপ কঠিন । প্রোজলিত অগ্নি গলাধঃকরণ করা যেমন অসাধ্য, বুঝাপুঙ্কবের পক্ষে শ্রমণ-ধর্ম পালন করাও সেইরূপ

মানুষ সন্তে অসারবিবাহী রোগাণ আলএ । জরামরণধর্মখি খণপি নরমামিহং ॥ ১৪ ॥

জরদ্রব্ধজরাদ্রব্ধং রোগাণ মরণাণি । অহো দুঃখেহ সংসারো অথকীসতি জাতুণো ॥ ১৫ ॥

খিতঃ বখুঃ হিরণ্যঃ চ পুতনারঃ চ বংধবা । চইত্তাণ ইমং দেহং গাতকং সবসসংঘে ॥ ১৬ ॥

জহা কিংগাংস্তাণাং পরিণামো ন হুংঘেরো । এবংতুত্তাণ ভোগাণাং পরিণামো ন হুংঘেরো ॥ ১৮ ॥

অভ্যাংগো মহত্তং সুসাহিষ্যো পবজ্জই । গচ্ছত্তোসেহুহীহোইচ্ছু হাতণহাযি পীতিও ॥ ১৯ ॥

এবং ধম্ম অকাউণঃ জো গচ্ছই পরত্তং । গচ্ছত্তোসে হুহীহোই বাহীরোম্মেহি পীতিও ॥ ২০ ॥

অভ্যাংগো মহত্তং সুসাহিষ্যো পবজ্জই । গচ্ছত্তোসেহুহী হোই হুহাতণহাএ বজ্জও ॥ ২১ ॥

এবং ধম্মপিকাউণঃ জোগচ্ছই পরত্তং । গচ্ছত্তোসে হুহীহোই অরুত্তরে অবেরণা ॥ ২২ ॥

জহাংগেহে পলিত্তাবি তসংগেহসং জোগহুসারত্তাংহি নীণেই । অসারঃ অবত্তন্মবক ॥ ২৩ ॥

অসাধ্য। সছিদ্র বস্ত্রে যেমন বায়ু পূর্ণ করা অসম্ভব; হুর্কল মাছুষের পক্ষে সেইরূপ শ্রমণ-ধর্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। তুলানিতে মন্দার-পর্বত পরিমাপ করা যেমন অসম্ভব; শ্রমণধর্ম-গ্রহণ পূর্বক নির্ভরে ও দৃঢ়চিত্তে বিচরণও সেইরূপ অসম্ভব। বাহার চিত্ত প্রশান্ত নহে, বাহু ধারা সমুদ্র-সত্তরণের চেষ্টায় ভ্রাস তাহার আত্ম-সংযম-চেষ্টা ব্যথাই হয়। পঞ্চবিধ মাহুতিক সুখ-সভোগে প্রবৃত্ত হও। সুখ-সভোগ শেষ হইলে, বৎস, তুমি ধর্ম-পথ অবলম্বন করিও।’

কুমার বলজী কহিলেন,—‘পুত্ৰা জনকজননী! আপনারা যেমন সরলভাবে আপনাদের বক্তব্য বিবৃত করিলেন, ধর্মের পথও সেইরূপ সরল। যে জন সর্বকামনা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে এ পৃথিবীতে কিছুই কঠিন নহে। অনন্তকাল হইতে আমি দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ করিয়া আসিতেছি, পুনঃপুনঃ হুঃখ ও হুর্কিপদ আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে। এ সংসার হুঃখের আকর; আমি এই ভরাবহ সংসারে পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু-জরা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া চলিয়াছি। এখানে যে অনলে যে উত্তাপ, নরকের সে অনলে সে উত্তাপের অতি আধিক্য! সেই নরকের সেই জ্বালা আমি কত জন্ম ভোগ করিয়াছি! এখানে যে শৈত্য দেখি, সেখানকার শৈত্য এ শৈত্য অপেক্ষাও তীব্র ও অসহনীয়। নরকে আমার সে শৈত্য ভোগ করিতে হইয়াছে। উর্দ্ধগমে নিয়মুখে অবস্থিত থাকিয়া প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে আমি কত বার দগ্ধ হইয়াছি ও চীৎকার করিয়া কাদিয়াছি।...এইরূপ যন্ত্রণার পর অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। এখন কিসে সে যন্ত্রণার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিব, তাহাই উপায় অবেষণ করিতেছি। প্রতি জন্মে আমি যন্ত্রণাই ভোগ করিয়া আসিতেছি, কখনও মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার উপশম পাই নাই।’

জনকজননী উত্তর দিলেন,—‘বৎস, শ্রমণ-ধর্ম গ্রহণে সকলেরই স্বাধীনতা আছে সত্য; কিন্তু শ্রমণ-ধর্ম-গ্রহণেও যে কষ্ট নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিব? পীড়িত প্রভৃতির যন্ত্রণা উপশম করিতে না পারিলে শ্রমণগণের হুঃখ শেষ হয় কি?’

কুমার উত্তর দিলেন,—‘আপনারা যেক্রপ সরলভাবে এই উপদেশ প্রদান করিলেন, হুঃখকট-নিবারণের পথও সেইরূপ সরল। এই যে অসংখ্য পশুপক্ষী অরণ্যে বিচরণ করিতেছে, কে তাহাদের কট-নিবারণে বর লইতেছে! বজ্রজন্তু যেমন নির্ভরে বনমধ্যে বিচরণ করে, আমি সেইরূপ আত্মসংযম ও কঠোর সাধনার সাহায্যে ধর্মপালন করিব। বিহ্বল-অরণ্যমধ্যে বস্ত্রপণ্ড বধন পীড়িত হইল, বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন কে তাহার শুশ্রূষা করিতে ধীর! কে তাহাকে ঔষধ প্রদান করে! কে তাহার স্বাস্থ্যের বিবরণ জিজ্ঞাসা করে! কে তাহার খাদ্য পানীর সংগ্রহ করিয়া দেয়? সে যখন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ অবস্থায় থাকে, তখন অরণ্যমধ্যে বা হ্রদের তীরে খাদ্য-পানীর সন্ধান করিয়া লয়। পবিত্রচেতা ভিক্ষুও সেইরূপ বস্ত্রপণ্ডের ভ্রাস বিচরণ করিবে, কাহারও অপেক্ষা রাখিবে না। ফলে আপনিই উচ্চগতি লাভ করিবে। আমি সেই পশুদের জীবন অণুকরণ করা বরং শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। তাহাতেই আমার হুঃখের অবসান হইবে।’

এই বলিয়া, পিতামাতার অঙ্গুমতি লইয়া, কুমার বলজী সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। সর্প যেমন কক্ষুক পরিত্যাগ করে, মাছুষ যেমন পায়ের ধূলা কাড়িয়া ফেলে, সেইরূপ আত্মীয়-

স্বজন বিষয়-বৈষম্য পরিভ্যাগ করিয়া কুমার শ্রমণ-ধর্ম গ্রহণ করিলেন। ইহলোকে বা পরলোকে কোনও লোকেই তাঁহার আর আকাঙ্ক্ষা রহিল না। সুখকর বা অসুখকর সকল বিষয়েই তিনি উদাসীন হইলেন। অশনে বা অনশনে কিছুতেই তাঁহার স্পৃহা রহিল না। এইরূপে কর্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া যুগাপ্ত নির্বাণ-পথের পথিক হইলেন।

এ সংসারে কে কাহার রক্ষাকর্তা ? এ সংসারে কে কাহার যত্নণা দূর করিতে পারে ? এ সংসারে কে কাহার হুঃখ দূর করিতে সমর্থ ? মানুষ মনে করে, আমি পিতা, আমি

শ্রেনীকের
উপাখ্যান।

মাতা, আমি ভ্রাতা, আমি বনিভা, আমি রাজা, আমি রক্ষাকর্তা। কিন্তু সে তাহাদের ভ্রম মাত্র। পুত্রের হুঃখ-দূরীকরণে যত্নণা-নিবারণে পিতামাতা যত্ন করেন; প্রজার কষ্ট-নিবারণে রাজা যথোচিত চেষ্টা করেন;

কিন্তু কাহার কষ্ট কে দূর করিতে পারে ? অরক্ষিত জনকে কে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় ! ইহসংসারে রক্ষাকর্তা বা হুঃখদূরকর্তা কেহই নাই। মগধাধিপতি রাজা শ্রেনীক এক সময়ে মোহমগ্নে মনে করিয়াছিলেন,—‘আমিই রাজা, আমিই প্রজার রক্ষাকর্তা।’ তাঁহার সেই মোহ কিরূপে ভঙ্গ হয়, জৈনশাস্ত্রে তদ্বিষয়ক একটা উপাখ্যান আছে। ইজ্জের নন্দন-কাননের স্থায় রাজা শ্রেনীকের এক পরম রমণীয় উত্তান ছিল। ‘মন্দিরুকি’ চৈত্যা নামে সে উত্তান অভিহিত হইত। বিবিধ সুদৃশ্য বৃক্ষলতার সে চৈত্যা শোভমান ছিল। নানা-জাতীয় বিহঙ্গমকুলের কলকাকলী তানে সে উত্তান সদা সুখরিত থাকিত। আর নানা-জাতীয় পুষ্প-স্তবকে সে উত্তান সুশোভিত হইয়া ছিল। একদিন সেই উত্তানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক সৌম্য-মূর্তি সাধুর প্রতি রাজা শ্রেনীকের দৃষ্টি নিপতিত হয়। সাধুর তরুণ বয়স, কোমল দেহ, স্নানর আকৃতি। সাধু-সন্দর্শনে রাজা বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহার মনে হইল, সে সাধু যেন রূপের সার, যেন বর্ণের শ্রেষ্ঠ, যেন মাধুর্যের আকর, যেন শান্তির নিলয়, যেন পূর্ণতার আশ্রয়, যেন কামনার অতীত। নৃপতি তদগতচিত্তে সাধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—‘অহোবরো অহোব্রবং অহোঅজ্জোসসোমর। অহোংতী অহোমুতী অহোভোগে অসংগর।’ ‘হে আশ্চর্য্য বর্ণ ! হে আশ্চর্য্য মূর্তি ! হে আশ্চর্য্য কমনীয়তা ! হে আশ্চর্য্য শান্তি ! হে আশ্চর্য্য সম্পূর্ণতা ! হে আশ্চর্য্য নিদাম !’—এই বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া যুক্তকরে নৃপতি কহিলেন,—‘হে তরুণবয়স্ক উচ্চবংশ-সম্বৃত যুবক ! আপনি কেন শ্রমণ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন ? যে বয়স আয়োদ্য-প্রমোদে অতিবাহিত হয়, সেই বয়সে আপনি শ্রমণধর্ম-পালন জন্ত কেন উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন ? কেন আপনার এরূপ মতি হইল,—আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।’

সাধু-পুরুষ উত্তর দিলেন,—‘হে মহারাজ ! আমার কেহ রক্ষাকর্তা নাই। আমাকে রক্ষা করে, কিংবা আমার প্রতি প্রকৃত সমবেশনা প্রকাশ করে, আমার এমন আত্মীয়-বন্ধু কেহ নাই।’

রাজা শ্রেনীক ক্রীষং হস্ত করিয়া কহিলেন,—‘আপনার স্থায় এরূপ ভগবান রূপবান ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন বা রক্ষাকর্তা কেহ নাই,—এ কি কথা কহিতেছেন ! আমি নৃপতি ; আমি ধার্মিকগণের রক্ষাকর্তা ! আপনার আত্মীয়-স্বজন বহুবান্ধব সহ আমার নিকট

আসিরা আনন্দ উপভোগ করুন। হুজুত মনুজর লাভ করিয়া কেন আপনি সুখ-সন্তোষে বিরত হইতেছেন? আমিই আপনার রক্ষাকর্তা হইলাম।’

সাধু-পুরুষ উত্তর দিলেন,—‘হে মগধাধিপতি মহারাজ শ্রেয়ীক! আপনি নিজেই যে-অনাথ! আপনারই যে রক্ষাকর্তা কেহ নাই। আপনি কি করিয়া অপরকে রক্ষা করিবেন!’

রাজা বিশেষ একটু আশ্চর্য্যাবিত হইয়া কহিলেন,—‘এ আপনি কি বলিতেছেন! আমার অর্থ, গজ, প্রজা, নগর, প্রাসাদ, প্রভৃৎ-কমতা রহিয়াছে। আমার আবার কিসের অভাব! আসুন, মাহুযোচিত আনন্দ উপভোগ করুন। বাহার অধিকারে সুখ-ভোগের এত সামগ্রী বিস্তারিত রহিয়াছে, তাহার আবার রক্ষাকর্তা নাই, কি প্রকার? মহাশয়, আপনি অসত্য বলিয়াছেন!’

সাধু-পুরুষ কহিলেন,—‘হে রাজন! আমি বাহা বলিয়াছি, আপনি তাহার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই! আমি বলিয়াছি—আপনি অনাথ! কিসে আপনি অনাথ—রক্ষক-শূন্য, একটু অমুখাবন করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।’

এই বলিয়া সাধু-পুরুষ রাজার নিকট আত্মকাহিনী বিবৃত করিলেন। কহিলেন,—ইঙ্গপূরীভূলা কোশারী নগরে অমিতবিশ্বশালী পিতার পুত্ররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। আর কহিলেন,—‘অতি শৈশবে আমি চক্ষের পীড়ার কাতর হই। সঙ্গে সঙ্গে অতি যত্নপ্রদ পীড়ার আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দগ্ধীভূত হইতে থাকে। আমার চক্ষের যত্নগা এতই অসহ্য হইয়াছিল যে, আমার মনে হইতেছিল—যেন কোনও নিষ্ঠুর শত্রু ভীক্শুধার অস্ত্র লইয়া আমার বিদ্ধ করিতেছে। আমার পৃষ্ঠদেশে হৃদপিণ্ডে মন্তকে তখন আমি বড়ই অসহনীয় যত্নগা অমুভব করিতেছিলাম; যেন বিদ্রাৎ-প্রবাহ আসিরা আমার দেহে যত্নহুটী বিদ্ধ করিতেছিল। দেশের প্রধান প্রধান ভীষকৃগণ আমার চিকিৎসা করিলেন; কিন্তু যত্নগার অবসান হইল না! পিতা আমার জন্ত অজস্র অর্থ ব্যয় করিলেন; আমি শান্তি লাভ করিলাম না। আমার জননী আমার জন্ত দারুণ বেদনা অমুভব করিলেন! আমার সহধর্ম্মিণী আমার যত্নগার মরমে মরিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুতেই আমার যত্নগার শান্তি হইল না। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম,—সত্যই আমি অনাথ; ইহসংসারে সত্যই আমার রক্ষাকর্তা অস্ত্র কেহই নাই! তখন আমার মনে হইল,—জন্মচক্রে পরিভ্রমণের এ যত্নগার আর তুলনা নাই! তখন আমি সন্ধান করিতে লাগিলাম—কিসে কেমন করিয়া এ যত্নগার অবসান হয়! বুঝিলাম—জন্মজরা-মরণের পঞ্চ রোধ করিতে না পারিলে শান্তি আর কোথাও নাই। বুঝিলাম,—আমি নিজেই আমার সুখ-স্বখের কর্তা ও অকর্তা। বুঝিলাম—আমি নিজেই আমার সুখ ও শত্রু। বুঝিলাম—আমি সং বা অসং বেক্রপ কার্য্য করিব, ফলভাগী আমাকে তৎক্ষণেই হইতে হইবে।’

‘অপ্লাকতা বিকতার ছহাণর সুহাণর। অপ্লামিত মনিতং চ হুপট্টর হুপট্টং।’
‘মাহু আপনার হুহুতির দ্বারা আপনার প্রতি বেক্রপ শত্রুতাচরণ করিয়া থাকে, কর্তৃক্ষেদকারী শত্রুও সেক্রপ অনিষ্টকারী নহে। বাহার অন্তরে দরার দান নাই, হুত্বাকালে নিষ্ঠুরই তাহাকে অমুতাপ করিতে হয়। যিনি সচ্চরিত্রসম্পন্ন, বাহার জীবন পয়স আত্ম-সংযম-

পরায়ণ, যিনি পাপকার্য্য হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে পারিয়াছেন এবং যিনি আপনার কর্ম্মকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই সেই অত্যন্তম চিরস্থায়ী সম্পৎ মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন ! তাঁহাকেই সনাথ বলিতে পারা যায় ।

“নতং অরীকংঠচ্ছেতা কবেই জংসেকরে অঙ্গণিরা হরঙ্গরা

সেনাহর্জ মচ্চুহংতু পত্তে পচ্ছাগুতাবেণ দরাবিহুণো ॥

নিয়টিরা নিঙ্গরুজউ তঙ্গসজেউত্তমটে বিবজ্জাসমেই

ইমে বিসেনথি পরেবিলোএ ছহও বিসেজ্জিআইতথ লোণে ॥

চরিত্তমায়ার গুণগরিএতও অগুত্তরং সংজমপালিয়াণং ।

নিরাসবেসংকথবিরাণকস্মং উবেইটাণং বিউলুত্তমং ছুবং ॥”

নিগ্রাহের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ শ্রেলীক তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অহঙ্কার দূর হইল ।

একই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রেক্ষিতা-পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হয় ! যে কারণে যে সময়ে সে বিভিন্নতা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার মূল-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারায়

অনেক স্থলে বিভক্তা উপস্থিত হইয়া থাকে । হিন্দু-শাস্ত্রে তাই একটা
কেশী-গৌতম
প্রসঙ্গ ।
প্রবাদ আছে,—“বেদা বিভিন্না স্বতরো বিভিন্না নাসৌ মুনির্ব্বজ মতং ন
ভিন্নম্ । ধর্ম্মস্ত তস্মাৎ নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পদ্মাঃ ॥”

দেশ-কাল-পাত্রই যে মত-বিভিন্নতার ও কর্ম্মপদ্ধতি-পরিবর্তনের হেতুভূত, তাহা বলাই বাহুল্য । জৈন-শাস্ত্রে কেশী গৌতম প্রসঙ্গে সেই বিষয়টা বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে ।
তীর্থঙ্কর পার্শ্বদেব মহাব্রত গ্রহণ সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়া যান, মহাবীর স্বামীর মত তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র । পার্শ্বদেব চতুর্কিধ মহাব্রত গ্রহণের উপদেশ দিয়াছিলেন ; মহাবীর স্বামী পঞ্চ-মহাব্রত পালন করিতে উপদেশ দিয়া যান । এই উপলক্ষে জৈন সম্প্রদায় প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল । এক পক্ষ পার্শ্বদেবের মতানুবর্তী ছিলেন । অপর পক্ষ মহাবীর স্বামীর নির্দেশ মাত্র করিয়া চলিতেন । কেশী ও গৌতমের বিচার-ব্যাপদেশে সেই দুই বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য সাধিত হয় । *

সমস্থানে গৌতমকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘পার্শ্বদেব চারি মহাব্রত গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন ; কিন্তু বর্দ্ধমান (মহাবীর স্বামী) পঞ্চমহাব্রত-গ্রহণের উপদেশ

* মহাবীর স্বামীর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী তীর্থঙ্কর—পার্শ্বদেব । মহাবীর স্বামীর আবির্ভাবের ২৫০ বৎসর পূর্বে তাহার নিক্কাণ-লাভ হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । কেশী—পার্শ্বদেবের মতানুবর্তী ছিলেন ।
গৌতম (স্বতর্পণ্)—মহাবীর স্বামীর শিষ্য মথো পরিগণিত । উভয়-সম্প্রদায়ের প্রধাম প্রধান ব্যক্তিগণ একত্র সমবেত হইলে পার্শ্বদেবের মতানুবর্তী সম্প্রদায়ের অধিনায়ক-রূপে কেশী করেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন । গৌতম সে সকল প্রশ্নের যে সমস্তর প্রদান করেন, তাহাতে বিবাদ মিটিয়া যায় । উভয়-সম্প্রদায় একমুত্রে আবদ্ধ হয় । কিছু কাল পরে বুদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা কারণে পুনরায় মতানৈক্য ঘটয়াছিল । আর তাহারই ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বিশেষ জৈন-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল । বাহা হউক, পার্শ্বদেব-প্রবর্তিত ও মহাবীর স্বামীর প্রচারিত ব্রতের সামঞ্জস্য-সাধন করিতে গিয়াছিল, কেশী-গৌতম-প্রদোক্ত-প্রসঙ্গে তাহার আভাস পাওয়া যায় ।

দিয়া গিয়াছেন। উত্তর ধর্মমতই যখন একই উদ্দেশ্যে বিহিত, তখন এরূপ পার্থক্য কেন হইল? হে বিজ্ঞ! এ বিষয়ে আপনার কি কোনও সংশয় উপস্থিত হয় না?

কেশী এই প্রশ্নে গৌতম উত্তর দিলেন,—

“পল্লাসমিক্খএ ধম্মং তত্ত্বং তত্ত্বং বিপিজ্জয়ং । ২৫

পুন্নিমা উজ্জুজ্জুডাও বক্কজ্জুডার পচ্ছিমা ।

মচ্ছিমা উজ্জুপল্লাও তেণ ধম্মে হুহা কএ ॥ ২৬ ॥

পুন্নিমাণং ছব্বিসুচ্ছোউ চরিন্নাণং ছরুণুপালও ।

কপ্পো মচ্ছিন্নমাগাণং তু সুবিসুচ্ছো সুপালও ॥” ২৭ ॥

ধর্মের সত্য-তত্ত্ব, সমস্তর সন্ধান—জ্ঞানের দ্বারা অধিগত হয়। পূর্ববর্তী তীর্থঙ্করগণ তাৎকালিক ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের উপযোগী করিয়া যে ধর্মবিধান বিহিত করিয়াছিলেন; কালের গতি অনুসারে শেযোক্ত তীর্থঙ্কর তাহার কিছু পরিবর্তন আবশ্যক বোধ করেন। তদনুসারে ছই বত প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণে অস্বভব করে। প্রথমে চারিটি মহাব্রতে যে কার্য্য সিদ্ধ হইত, শেষে সেই কার্য্যসিদ্ধির জন্যই পঞ্চ-মহাব্রত গ্রহণের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষ যখন সরল-স্বভাব ছিল, একটা প্রতিজ্ঞার মধ্যেই অল্প প্রতিজ্ঞার বাধ্য-বাধকতা তাহার উপলব্ধি করিত। কিন্তু তাহার যতই কুটিল-স্বভাব-সম্পন্ন হইতে লাগিল, ততই তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ নিয়মে বাধ্য করা আবশ্যক বোধ হইল। ‘সং হও’—এই বলিলেই পূর্বে যে মানুষ বাক্যে কার্য্যে মনে সর্ব্বথা সংকার্য্যে সচ্চিন্তায় নিবিষ্ট হইত; কালক্রমে তাহারই পরিবর্তে বলার আবশ্যক হইল—‘তুমি সচরিত্র হয়, তুমি সংকার্য্য কর, তুমি সচ্চিন্তায় রত থাক।’ ফলতঃ, মহাব্রত-চতুষ্টয় ও পঞ্চ-মহাব্রত মূলে উভয়ই এক। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগত পার্থক্য উভয়ের মধ্যে আদৌ নাই।

কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘তাল, আরও একটা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। বর্দ্ধমান (মহারীর স্বামী) বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পার্শ্বদেবের মতে বহির্কাস ও অন্তর্কাস বিহিত আছে। উভয়ের ধর্মমতই যখন একই উদ্দেশ্যে বিহিত, তখন এ পার্থক্য কেন? ধর্মের এই দ্বিভাব বিষয়ে আপনার মনে কখনও কোনও সংশয় আসে না?’

গৌতম উত্তর দিলেন,—‘প্রজ্ঞা দ্বারা তাঁহার বাহ্য আবশ্যক অস্বভব করিয়াছিলেন, ধর্মপালন পক্ষে তাহাই বিহিত করিয়া গিয়াছেন। ধর্মাবলম্বীদিগের যে বিভিন্ন বাহ্যচিহ্ন প্রবর্তিত হয়, তদ্বারা জন-সাধারণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিবেন,—এই উদ্দেশ্য ছিল। সেই সকল বাহ্য-চিহ্ন দ্বারা ধর্ম-জীবনের আবশ্যকতার বিষয় মানুষের মনে প্রতিভাত হইবে, ইহাই লক্ষ্য ছিল। জনসাধারণকে ধর্মে অহরন্তর করিবার জন্য এবং সাধুবশেয়র সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে সাধুতাবের বিকাশ-করণোদ্দেশ্যে তীর্থঙ্করগণ বেশভূষার বা সন্ন্যাসোচিত চিহ্নাদি ধারণের আবশ্যকতা অস্বভব করিয়াছিলেন। বাহ্য বা বেশভূষার বা চিহ্নাদি ধারণের পক্ষপাতী নহেন, তাঁহার জ্ঞান ধর্মবিশ্বাস এবং সচরিত্রতা প্রভৃতিকেই মুক্তি-পথের সার-সম্পদ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মূল লক্ষ্য বিষয়ে কোনই পার্থক্য নাই। বিবিধ ব্যবহারে বিবিধ লক্ষণ মাত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে।’

অতঃপর কেনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘আপনার চতুর্দিকে সহস্র শত্রু আপনাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত রহিয়াছে । আপনি কেমন করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিবেন ?’

গৌতম উত্তর দিলেন,—

“এগে জিএ জিরা পংচ পংচে জিএ জিরা দস ।

দসহাও জিগিতাণং সৰ্ব সন্তু জিণামিহং ॥ ৩৬ ॥”

‘একটিকে জয় করিতে পারিলেই পাঁচটিকে জয় করা হইবে । শতজরী হইতে পারিলেই দশজরী হইতে পারিবে । দশজরী হইয়া আমি সকল শত্রু বিমর্দিত করিয়াছি ।’

কেনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘আপনি শত্রু বলিতেছেন—কাহাদিগকে ?’

গৌতম উত্তর দিলেন,—

“গগ্গা অজিএ সন্তু কলারা ইন্দিরাণির ।

তেজিগিতু জহানারং বিহরামি অহংসুণী ॥” ৩৮ ॥

‘অহং আত্মাই একমাত্র অজের শত্রু । জ্রোথাপি চতুর্বিধ কলার (অর্থাৎ—রাগ, ক্রোধ, অহঙ্কার, মোহ) এবং পঞ্চৈজির;—এই দশ শত্রুই প্রধান । আমি ইহাদিগকে জয় করিয়াছি ।’

কেনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘ইহসংসারে দেখিতে পাই, সকল প্রাণীই শৃঙ্খলে আবদ্ধ । আপনি কেমন করিয়া সে শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন ?’

গৌতম উত্তর দিলেন,—

“তেপাসে সসসো ছিত্তা নিহংতুণ উবারও ।

মুকপাসো লহন্তুও বিহরামি অহংসুণী ॥ ৪১ ॥”

‘সকল শৃঙ্খল, সকল বন্ধন আমি সহস্রবার দ্বারা ছিন্ন করিয়াছি । তাই আমি বন্ধন-মুক্ত ।’

কেনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘আপনি বন্ধন বা শৃঙ্খল কাহাকে বলেন ?’

গৌতম উত্তর দিলেন,—

“রাগদোসাদও তিঝানেহপাসা তরংকরা ।

তেছিংদিতু জহানারং বিহরামি অহংসুণী ॥” ৪৩ ॥

‘অমুরাগ ও হিংসাধেব প্রভৃতি বিষম বন্ধন । আসক্তি অতি বিপজ্জনক । আমি যথারীতি তাহাদিগের ধ্বংস-সাধন করিয়া বিনয়-সম্পন্ন হইয়াছি ।’

কেনী কহিলেন,—‘অন্তরের অভ্যন্তরে বিষ-কল-উৎপাদনকারী বিষবৃক্ষ বৃদ্ধি পাইতেছে । আপনি তাহাকে কি ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন ?’

গৌতম উত্তর করিলেন,—‘হাঁ, আমি সে তরুকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছি ; তাহার মূল-উৎপাটনে পর্য্যন্ত সমর্থ হইয়াছি । আর সেই স্রষ্টাই সে বিষবৃক্ষের বিধকলের আশঙ্কা আর আহার নাই ।’

কেনী জিজ্ঞাসিলেন,—‘বিষবৃক্ষ বলিতে আপনি কি বুঝিয়াছেন ?’

গৌতম উত্তর কহিলেন,—

“ভবতপ্হালুরা বৃত্তা ভীমাভীম কলোদরা ।

তমুদিতু জহানারং বিহরামি অহংসুণী ॥” ৪৫ ॥

‘ভবভূত’ অর্থঃ সংসারের প্রতি আসক্তি সেই ভরাবহ বিব-জলোৎপাদনকারী ভীষণ রিম্বুক । সে বুককে বখারীতি ছিন্ন করিতে পারিয়াছি বলিয়াই আমি এখন সুখে বিচরণ করিতেছি ।’

কেলী কহিলেন,—‘ভরাবহ অলস অনলে বাহুবকে অহর্নিশ ভেরিয়া রহিয়াছে । কি প্রকারে আপনি সে অনল নির্কাণ করিলেন ?’

গৌতম উত্তর দিলেন,—‘বিশাল মেঘ হইতে উৎপন্ন পবিত্র নদীর জলে আমি আমার শরীর সিক্ত করিয়াছি । তাহাতে অনল নির্কাণিত হইয়াছে । তাই সে অনল আমার মন্থ করিতে সমর্থ হয় নাই ।’

কেলী জিজ্ঞাসিলেন,—‘আপনি কাহাকে অনল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ?’

গৌতম কহিলেন,—

“কসারা অগ্নিগণোবুত্তাপুরসীল তবোজলং ।

সুধারাত্তিহরা সংতাভিরাহ নউহংতিমে ॥” ৫৩ ॥

‘রিপু অগ্নি-স্বরূপ । জ্ঞান, পবিত্র চরিত্র এবং সংযম জল স্বরূপ । জ্ঞানরূপ বারিবিন্দুর নিবেকে রিপুরূপ-অগ্নি নির্কাণিত হইয়াছে । সুতরাং সে অগ্নি এখন আর আমাকে মন্থ করিতে সমর্থ হইতেছে না ।’

কেলী কহিলেন,—‘যে অশান্ত হৃদিত্ত অশ্বের উপর আপনি আরোহণ করিয়া আছেন ; সে যে নিরস্ত উদ্বারগামী । আপনি কি প্রকারে তাহাকে সংযত রাখিতে সমর্থ হইলেন ?’

গৌতম উত্তর দিলেন,—‘জ্ঞানরূপ রশ্মি দ্বারা আমি তাহার গতি সংযত করিতে সমর্থ ।

সেই কারণ অথ আমার বিপথে লইতে পারে না ; যথা-পথেই প্রধাবিত হয় ।’

কেলী জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘আপনি কাহাকে সেই অথ বলিয়া অভিহিত করেন ?’

গৌতম কহিলেন,—

“মনোমানসিত ভীমো হুট্‌সো পরিধাবজী ।

তৎ সন্মৎ নিগিগ্‌হামি ধম্মসিদ্ধাএ কংথগং ॥” ৫৪ ॥

‘মন অশান্ত হৃদিত্ত অশ্ব-স্বরূপ । আমি বিনয়-সাহায্যে তাহাকে দমন করিয়াছি । সে এখন কাবোজ দেশীয় সুশিক্ষিত ঘোটকের দ্যায় আমার আজ্ঞাবাহী ।’

কেলী কহিলেন,—‘ইহ-সংসারে বহু কুপথ আছে । মনুষ্যকে তাহা পথপ্রদীপ করে । হে গৌতম ! আপনি কি প্রকারে সে পথ পরিহার পূর্বক সংপথের অন্বেষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ?’

গৌতম উত্তর দিলেন,—‘কোন্ পথ সং ও কোন্ পথ অসং, আমি তাহা বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়াছি । আর শুদ্ধতাই আমি আর বিপথগামী নই ।’

কেলী জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘ঐ যে ভীষণ জলপ্লাবনে সকলকে ডালাইরা লইয়া চলিয়াছে ; তাহাদের আশ্রয় বা আশ্রয়োপযোগী দৃঢ় ভূমি কোথায় ? কোথায় সে দীপ, হে গৌতম, আপনি কি তাহা অবগত আছেন ?’

গৌতম উত্তর করিলেন,—‘আছে বৈ কি ! বিশাল বিস্তৃত ঐ দীপ জলের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে । বজ্রের দ্বারা সে দীপ কল্যাণ ভাগ্যমান হয় না ।’

কেশী কহিলেন,—‘কাহাকে আপনি সেই স্বীপ বলিয়া অভিহিত করেন? বড়াই বা কি প্রকার?’

গৌতম উত্তর দিলেন,—

‘জরামরণ বেগেণং বুড্‌ডমাণাণ পালিণং ।

ধম্মাদীবো পজ্জট্টায় গহ্জসরণমুত্তমং ॥ ৬৮ ॥’

‘জরামরণের প্রবল পীড়নে প্রাণিপুঞ্জ ভাসিয়া চলিয়াছে । একমাত্র ধর্ম স্বীপ-স্বরূপ অবস্থিত আছে । সেই স্বীপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অতি উত্তম আশ্রয়-স্থান ।’

কেশী কহিলেন,—‘মহা-সমুদ্রে তরঙ্গ-প্রবাহে তরলী বিচলিতপ্রায় । সেই তরলীতে আরোহণ করিয়া কি প্রকারে আপনি পরপারে উত্তীর্ণ হইবেন?’

গৌতম কহিলেন,—

‘জাও অম্‌সাবিলীনাবা নসা পারস্‌সগামিলী ।

জানিস্‌সা বিলীনাবা সাউপারস্‌সগামিলী ॥ ৭১ ॥’

‘সহিষ্ণু তরলী কখনও পরপারে পৌছিতে পারে না । কিন্তু ছিট্রহীন তরলীর সাহায্যে পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া যায় ।’

কেশী জিজ্ঞাসিলেন,—‘আপনি কাহাকে তরলী বলিয়া অভিহিত করিতেছেন?’

গৌতম কহিলেন,—

‘সরীরমাছনাবিত্তি জীবো বুচ্চই নাবিও ।

সংসারো অন্নবোবুত্তো জন্তরংতি মহেসিলো ॥ ৭৩ ॥

‘এই দেহ তরলী-স্বরূপ । জীবন নাবিক । জন্মচক্ররূপ সমুদ্র । সংসারে অনাসক্ত জ্ঞানিগণ প্রজ্ঞা দ্বারা সে সমুদ্র উত্তীর্ণ হন ।’

কেশী কহিলেন,—‘এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যে অসংখ্য প্রাণী অবস্থিত রহিয়াছে, কে তাহাদের জন্ত আলোক-রশ্মি বিকীরণ করিবে?’

গৌতম কহিলেন,—‘সেই নিষ্কলঙ্ক সূর্য্য উদিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী আলোকিত করিবেন । তিনিই সংসারের প্রাণি-সমূহের মধ্যে আলোক বিতরণ করেন ।’

কেশী কহিলেন,—‘কাহাকে আপনি সূর্য্য বলিয়া অভিহিত করিতেছেন?’

গৌতম উত্তর করিলেন,—‘বাহার্য জন্মগতি রোধ করিতে পারিয়াছেন, তাহারাই সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া জগতের জীবকে আলোক-রশ্মি বিতরণ করিতেছেন ।’

কেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘এই যে জীবসত্ত্ব কায়িক ও মানসিক অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ইহাদিগের উপযোগী নিরাপদ শান্তিপ্রদ স্থান কোথায় আছে, আপনি কি তাহা বলিতে পারেন?’

গৌতম উত্তর দিলেন,—‘সকলেরই পরিদৃষ্টমান এক নিরাপদ স্থান আছে । সেখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, যন্ত্রণা নাই, পীড়া নাই । তবে সে স্থানে উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন ।’

কেশী জিজ্ঞাসিলেন,—‘সে স্থান কি নামে অভিহিত হয়?’

গৌতম উত্তর দিলেন,—‘তাহারই নাম নির্ঝাঁপ, বাহাতে সকল যন্ত্রণার অবসান হয়,

যাহাতে সম্যকত্ব প্রাপ্তি ঘটে । সেই স্থানই সকলের লক্ষ্যস্থানীয় । সেই নিরাপদ অর্থময় শান্তিপ্রদ স্থানে জ্ঞানী মহাঅগণই পৌছিতে পারেন । সেই চিরশান্তিময় নিকেতনে তাঁহারাই পৌছিতে পারেন, যাঁহারা জীবনগতি রোধ করিতে পারিয়াছেন । তাঁহারাই সর্ব্ব দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন ।*

কেনী গৌতমের এই প্রস্তোত্তরে সকলেরই সর্ব্ব প্রকার সংশয় দূরীভূত হইল । সকল সম্প্রদায় একপ্রাণ একমন হইলেন ।

ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ? কি শ্রেষ্ঠ গুণ-ভূষণে ভূষিত হইলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় ? যেমন হিন্দু-শাস্ত্রে, তেমনই বৌদ্ধ-শাস্ত্রে, আবার তেমনই জৈন-শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের সে মাহাত্ম্য-তত্ত্ব প্রকটিত দেখিতে পাই । পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যের এবং গুণ-গৌরবের অশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই । স্বয়ং নারায়ণ ব্রাহ্মণের ক্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, ইহার অধিক ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য আর কি হইতে পারে ? কিরূপ গুণসম্পন্ন জন ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হন—বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে তাহার যে উল্লেখ দেখি ; তাহাতেও বুঝা যায়, ব্রাহ্মণের স্থান কত উচ্চ ! স্বয়ং বুদ্ধদেব নিজ মুখেই ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন । * জৈনশাস্ত্রেও বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত দেখি । উত্তরাধ্যায়নের পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়নে ; যথা,—

“জোলোএ বংভণো বুদ্ধো অগ্গীবা মহিও জহা ।

সন্মাকুসল সংদিটুং তংবয়ং বুমমাহণং ॥ ১৯ ॥

জোন সজ্জই আগং তু পক্কয়ংতো ন সোয়ঙ্গৈ ।

রস্মঙ্গৈ অজ্জবয়গংমিতংবয়ং বুমমাহণং ॥ ২০ ॥

জায় রূবং জহামটুং নিদ্ধংত মলপাবগং ।

রাগদোস ভয়ঙ্গিন্নং তবয়ং বুমমাহণং ॥ ২১ ॥

তবস্‌সিদ্ধং কিসংদংতং অবচিন্ন মংসসোণিন্নং ।

সুবয়ং পত্তনিকবাণং তংবয়ং বুমমাহণং ॥ ২২ ॥

তসেপাণে বিয়াণিত্তা সংগহেণয়থাবরে ।

জোন হিংসইতি বিহেণং তংবয়ং বুমমাহণং ॥ ২৩ ॥

কোহাবা জইবাহাসা লোভাবা জইবা ভয়্যা ।

মুলাং নবথঙ্গৈজোউ তংবয়ং বুমমাহণং ॥ ২৪ ॥

চিত্তমংত মচিত্তংবা অগ্গংবা জইবা বহুং ।

ন গিণ্‌হই অদত্তংজে তংবয়ং বুমমাহণং ॥ ২৫ ॥

দিব্বমাণুসুতেরিচ্ছং জোনসেবই মেহণং ।

মণসা কায়বকেণং তংবয়ং বুমমাহণং ॥ ২৬ ॥

জহাপোমং জলেজারং নোবলিঙ্গই বারিণা ।

এবং অলিত্তং কামেহিং তংবয়ং বুমমাহণং ॥ ২৭ ॥

* পৃথিবীর ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ডে, ৩৮১ পৃষ্ঠায় বুদ্ধদেবের উক্তি দ্রষ্টব্য ।

অলৌক্যং সুহৃদীবি অণগারং অকিংচণং ।

অসংসত্তং গিহথেষু তংবরং বুমমাহণং ॥ ২৮ ॥

জহিত্তা পুঙ্কসংজোগং নাতি সংগেয়ং বংধবে ।

জোনসজ্জই এএঙ্ক তংবরং বুমমাহণং ॥ ২৯ ॥”

অর্থাৎ,—‘যিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন, তিনি অগ্নির ত্রায় মহিমান্বিত । জ্ঞানিগণ তদ্রূপ প্রকৃত ভেজসম্পন্ন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করেন । ১৯ ॥ যিনি কোনও পার্থিব আকর্ষণে আবদ্ধ নহেন ; সন্ন্যাস গ্রহণে কদাচ যাহার মনে অমুশোচনা আসে না ; সংকথায়ই যাহার আনন্দ ;—তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলে । ২০ ॥ যিনি রাগ-দ্বेष-আশঙ্কা প্রভৃতির অতীত, যিনি অগ্নিদগ্ধ স্তবর্ণের ত্রায় জ্যোতিঃ-সম্পন্ন ;—তাহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা যায় । ২১ ॥ যে আত্মসংযমশীল সাধু অস্থি-কঙ্কালসার হইয়াও পবিত্রতা-সম্পন্ন নির্দোষ-পথের পথিক, —তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায় । ২২ ॥ যিনি সর্বতোভাবে প্রাণি-পর্যায়-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন, গতিশীল বা গতিহীন কোনও জীবের প্রতিই যিনি কোনও প্রকার অনিষ্টকারী নহেন,— তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায় । ২২ ॥ যিনি ক্রোধে বা পরিহাসচ্ছলে অথবা লোভপরবশ হইয়া বা ভীতি প্রাপ্ত হইয়া কদাচ মিথ্যাভাষ্য প্রয়োগ করেন না,—তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায় । ২৩ ॥ অন্ন হউক, অধিক হউক, প্রয়োজনীয় হউক বা অপ্রয়োজনীয় হউক, যিনি অদত্ত বস্তু কদাচ গ্রহণ করেন না ;—তাহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা যায় । ২৪ ॥ চিন্তায়, বাক্যে বা কার্য্যে কোনও মনুষ্যের বা কোনও প্রাণীর প্রতি যাহার ইন্দ্রিয় আসক্ত নয়,—তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য । ২৫ ॥ পদ্ম যেমন জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও জলে আসক্ত আর্দ্র নয়, সেইরূপ সংসারে স্নেহের মধ্যে থাকিয়াও যাহার চিত্ত সে স্নেহে কলুষিত নহে,—তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায় । ২৬ ॥ যাহার লোভ নাই, যিনি অজ্ঞাতবাসে জীবন যাপন করেন, যাহার গৃহ নাই বা যিনি কোনও সম্পত্তির অধিকারী নহেন এবং সাংসারিক কোনও ব্যক্তির সহিত যিনি বন্ধু-বন্ধনে আবদ্ধ নহেন,—তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায় । ২৭ ॥ আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতির সহিত যাহার সর্বরূপ সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে এবং যিনি কোনরূপ স্নেহের জন্ত আদৌ আকাঙ্ক্ষা যুক্ত নহেন,—তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায় । ২৮ ॥’

অত্ৰুত্ৰ আবার দেখিতে পাই,—

“নবি মুংডিএণ সমণো নঙংকারেণ বংভণো ।

ন মুণীন্নবাসেণং কুসচীরেণ ন তাবসো ॥ ৩১ ॥

সময়াএ সমনো হোই বংভচেরেণ বংভণো ।

নাণেণয় মুণী হোই তবেণং হোই তাবসো ॥ ৩২ ॥

কম্মুণা বংভণো হোই কম্মুণা হোই থত্তিও ।

বইসো কম্মুণা হোই স্কেদো হবই কম্মুণা ॥ ৩৩ ॥”

‘কেবল মন্তক মুণ্ডন করিলেই শ্রমণ হওয়া যায় না ; কেবল ঠংকার শব্দ উচ্চারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না ; কেবল অরণ্যে বাস করিলেই তাপস হওয়া যায় না । রাগদ্বেষ প্রভৃতির প্রতি সাম্যভাবে উপস্থিত হইলেই শ্রমণ হওয়া যায় ; ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা

ব্রাহ্মণ হওয়া যায় ; জ্ঞানের দ্বারাই মুনি হওয়া যায় ; সংঘের দ্বারাই তাপস হওয়া যায় ।
কর্ণের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, কর্ণের দ্বারাই ক্ষত্রিয়, কর্ণের দ্বারাই বৈশ্য, কর্ণের দ্বারাই মাহুষ
শূদ্র হয় ।’ যিনি সর্ব-কর্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইরাছেন, তিনিই ‘প্রকৃত ব্রাহ্মণ ;—

“সর্ব কাম্য বিনিমুকং তং বয়ং” বুধমাহরণ ॥ ৩৪ ॥”

অনন্ত—কাল, অনন্ত—দুঃখ-সমুদ্র, অনন্ত—দুঃখ-হেতু । কেমন করিয়া মানুষ সে দুঃখ-
পারাবার উত্তীর্ণ হইবে ; কেমন করিয়া মানুষ সে অনন্ত আকর্ষণ ছিন্ন করিবে ; কেমন করিয়া

মানুষ মুক্ত হইতে পারিবে ;—মহাবীর স্বামী তৎসম্বন্ধে সুধর্ম্মাচার্য্যকে একটা
অনন্ত
দুঃখনাশ । সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন । তাঁহার সেই উপদেশের সার-মর্ম্ম—

সদজ্ঞান লাভ করিতে হইবে ; অজ্ঞানাক্রকার দূর করিতে হইবে ; অমুরাগ
ও ঘেব ধ্বংস করিতে হইবে । যে জন তাহাতে সমর্থ হন, তিনিই পরম মুক্তির—চির-
আনন্দের অধিকারী হন । উত্তরাধ্যয়ন-শ্রুতের দ্বাত্রিংশ অধ্যয়নে মহাবীর স্বামীর উক্তি ; যথা,—

“নাগস্ সর্বস্ স পগাসনাএ অগ্নাণ মোহস্ স বিবজ্জগাএ রাগস্ স

দোসস্ সয় সংখএণং এগংত সোকথং সমুবেইমোকথং ॥”

কিন্তু সে জ্ঞান কিরূপে অধিগত হইতে পারে ? সে অজ্ঞানাক্রকার কিরূপে দূরীভূত হয় ?
সে অমুরাগ বা ঘেব কিরূপে ধ্বংস করা যায় ? তৎসম্বন্ধে মহাবীর স্বামী বলিতেছেন,
—‘প্রথমে গুরুজনের ও জ্ঞানবৃদ্ধ জনের সেবা-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক । আশৈশব দুর্জ্ঞান
লোকের সংসর্গ পরিহার করা প্রয়োজন । একান্ত-চিত্তে ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠে আত্মনিয়োগ
করা বিধেয় । সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের অর্থ অভিনিবেশ সহকারে উপলব্ধি করা আবশ্যক ।’
সমাধি-লাভের জন্য সংযম-সাধনার আবশ্যক । সে সাধনার আহারে, সজ্জি-নির্কীচনে ও
স্থান-নির্কীরণে একান্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন । যদি সংসঙ্গ না মিলে, নির্জ্ঞান-বাস বরং
শ্রেয়ঃ । সর্ববিধ সুখস্পৃহা ও সর্বপ্রকার পাপকর্মে বিরতি সর্বতোভাবে আবশ্যক ।

“জহায় অংউপ্পভবা বলাগা অংডং বলাগপ্তবং জহায় এমেব ।

মোহার বণংখুতন্থা মোহংচ তন্থায়য়ণং বয়ংতি ॥ ৬ ॥

রাগোর দোসোবির কাম্বীরং কাম্বচ মোহপ্তবং বয়ংতি ।

কাম্বচ জাসী মরণস্ স মূলং দুক্খং চ জাসী মরণং বয়ংতি ॥ ৭ ॥

দুক্খং হয়ং জস্ স ন হোই মোহো মোহো হও জস্ স ন হোই তন্থা ।

তন্থা হয় জস্ স ন হোই লোহো লোহোহও জস্ স নকিংচগাইং ॥ ৮ ॥”

‘বলাক পক্ষী হইতে যেমন অণ্ডের উৎপত্তি, আবার অণ্ড হইতে যেমন বলাক পক্ষীর
উৎপত্তি ; সেইরূপ মোহ হইতেই তৃষ্ণার উদ্ভব, আবার তৃষ্ণা হইতেই মোহের উৎপত্তি । ৬ ॥
কর্ম্ম হইতেই যেমন অমুরাগ ও ঘেবের উৎপত্তি ; সেইরূপ মোহ বা রাগ ঘেব হইতেই
অমুরাগের উৎপত্তি । কর্ম্মই জন্মমৃত্যুর মূল, আবার জন্মমৃত্যুই দুঃখ । ৭ ॥ মোহ দূর
হইলেই দুঃখ দূর হয় ; আবার তৃষ্ণা দূর হইলেই মোহ দূর হইয়া থাকে । লোভ দূর
হইলেই তৃষ্ণার বিরতি ; আবার বিষয় না থাকিলেই লোভের শাস্তি । ৮ ॥’ কলতঃ ভব-
তৃকাই জন্ম, আবার জন্মই ভব-তৃষ্ণার হেতুভূত ।

যিনি সম্পূর্ণরূপে অমুরাগ ঘেব মোহ প্রভৃতি অন্তর হইতে নির্মূল করিতে চাহেন, কয়েকটা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । সরস স্নানাহার্য্য রসনার তৃপ্তিকর

হইলেও তাহা পরিহৃতব্য । কেন-না, তদ্বারা দেহে অত্যধিক শক্তি
রসে সঞ্চয় হয় । আর সেই শক্তি-সঞ্চয়ের ফলে তৃষ্ণা আসিয়া অভিতৃপ্ত করে ।
বীতম্প্রহা ।

স্নানাহার্য্য কলভারাবনত বৃক্ষের প্রতি পক্ষীর যেমন আসক্তি, সরস সর্বল মনুষ্যের প্রতিও তৃষ্ণার সেইরূপ আধিপত্য । শুক কাষ্ঠপূর্ণ অরণ্য অগ্নি-সংযুক্ত হইলে বায়ু প্রবাহ যেমন সে অগ্নি নির্দীপিত হইতে দেয় না ; সেইরূপ যে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষার অমুরূপ সরস খাণ্ড আহার করে, তাহার পক্ষেজ্বরের আকাঙ্ক্ষা-অনল সদা প্রজলিত থাকে । কোনও সাধু-সচ্চরিত্র মনুষ্যের তাহা উপকারে আসে না । বাহার্য্য নিভৃতবাসী, অন্নাহারী, ইঞ্জিয়জয়ী, তৃষ্ণা আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না । তাঁহাদের অমুরাগ ঔষধ-সেবনে পীড়া-নিবৃত্তির ন্যায় নিবৃত্তি-প্রাপ্ত হয় । যেখানে মার্জার বাস করে, মুষিকের বাস যেমন তথায় নিরাপদ নহে ; সচ্চরিত্র সাধুর পক্ষে সেইরূপ রমণী-পরিবৃত্ত গৃহে বাস করা নিরাপদ নহে । যে সাধু ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি কদাচ রমণীর রূপ, লাভণ্য, মৃদাহাস্ত, অঙ্গ-ভঙ্গী, বক্রদৃষ্টি প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না ; অথবা অন্তরে কখনও ভ্রমেও সে ভাব স্থান দিবেন না ।' উত্তরাধায়নে, যথা,—

“রসাপগামং ন নিসেবিস্বকা পায়ং রসা দিত্তিকরা নরাণং ।

দিত্তং চ কামা সমতিদুবংতি হুমং জহা সাহ কলংব পক্খী ১০ ।

জহা দবগ্গী পউরিংধণে বনে সমারুও নোবসমং উবেই ।

এবিংদিয়গ্গীত্রি পগাম ভোইণো ন বংভয়ারিস্‌সহিয়ায় কস্মজ্জি ১১ ॥

বিবিত্ত সেজ্জাসণ জংতিয়াণং ওমাসণাণং দমিহিংদিয়াণং ।

ন রাগ সত্তু ধরিসেই চিত্তং পরাইও বাহিরিবো সছেহিং ১২ ॥

জহা বিরাদা বসহস্‌স মুলে ন মুসগাণং বসহী পসথা ।

এমেব ইথী নিলয়স্‌স মজ্জো ন বংভয়ারিস্‌স খমো নিবাসো ১৩ ॥

ন রূবলাবর বিলাস হাসং ন জংপিয়ং ইংগিয়পেহিয়ংবা ।

ইথীণ চিত্তংসি নিবেসইত্তা দট্টুববস্‌সে সমণে তবস্‌সী ১৪ ॥’

‘রমণীর প্রতি আসক্তি বাহার্য্য পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের গন্তব্য পথে আর কোনও বাধাই কার্য্যকরী হয় না । যিনি মহা-সমুদ্র অতিক্রমে সমর্থ, গঙ্গার ন্যায় বৃহৎ নদী অতিক্রমও তাঁহার পক্ষে অকিঞ্চিংকর । স্নান-তৃষ্ণা হইতেই নরলোকে হুঃখের উৎপত্তি । যিনি তৃষ্ণা-ত্যাগে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি কারিক ও মানসিক সৰ্ব্ববিধ হুঃখকে দূর করিয়াছেন । যিনি সাধনার পথে অগ্রসর, যিনি সম্যকত্ব সমাধি-লাভের অভিলাষী, ইঞ্জিয়-সুখকর পদার্থের প্রতি তাঁহার চিত্ত কখনও আকৃষ্ট নয় ; অপিচ, অপ্রিয় অভ্যুপ-
কর পদার্থের প্রতিও তাঁহার চিত্ত বিদেহ-পরায়ণ নহে । ফলতঃ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয় সৰ্ব্ব-বিষয়ে যিনি বীতরাগ নিম্প্রহ হইতে পারিয়াছেন ; কোনও বিষয়েই বাহার্য্য আসক্তি বা অনাসক্তি নাই ;—হৃদয় হুঃখ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে অনারাগে তিনি সমর্থ হন ।’ যথা,—

“এএয় সংগে সমইকমিত্তা স্তুত্বরাচেব ভবংতি সেসা ।

জহা মহাসাগর মুত্তরিভা নজ্জভবে অবি গংগা সমাণা ॥ ১৮ ॥

কামাগুগিদ্ধিগ্নভবং থু হুখং সৰ্বসু লোগসুসদেবগসু ।

জং কাইয়ং মানসিয়ংচ কিংচি তসুং তগং গচ্ছই বীররাগো ॥ ১৯ ॥

জে ইংদিয়াং বিসয়া মণ্ণা গতেসু ভাবং নিসিরে কয়াইজ্জি ।

নয়া মণ্ণেসু মণংপি কুজ্জা সমাহি কামে সমণে তবসুসী ॥ ২১ ॥”

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ওষু—এই পঞ্চেন্দ্রিয় মানুষের মোক্ষের পথে বিষম অন্তরায় ।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঘ্যবহার অপব্যবহার অহুসারেই শাস্তি ও অশাস্তি নির্ভর করে । রূপে চক্ষু

আকৃষ্ট হয় । রূপ-দর্শনেই অহুরাগ আসে, আবার রূপদর্শনেই বিরাগ

রূপে উৎপন্ন হয় । কিন্তু রূপ-দর্শনে যাঁহার অহুরাগ বা বিরাগ কিছুই উৎপন্ন

হয় না, সৰ্ব-বিষয়েই যিনি বীতরাগ অনাকৃষ্ট; তিনিই মোক্ষ-লাভের

অধিকারী হন । চক্ষু—অহুভব করে; রূপে চক্ষু আকৃষ্ট হয় । সেই আকর্ষণ বা অহুরাগ

আনন্দপ্রদ; আর তৎপ্রতি যে বিরাগ, তাহাই নিরানন্দকর । যিনি রূপ-দর্শনে রতীযুক্ত হন,

তাঁহাকেই অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হয় । রূপমুগ্ধ পতঙ্গ যেমন আলোক-রশ্মিতে আকৃষ্ট

হইয়া অনলে প্রাণ বিসর্জন দেয়; রূপমুগ্ধ মানুষেরও সেই অবস্থা । এইরূপ মানুষ যখনই

রূপ-দর্শনে ঘেষযুক্ত হয়, তদগোঁই তাহার কষ্ট অহুভূত হয় । অবিনীত জন রূপের দ্বারা

উভাক্ত হয় ।.....যিনি রূপে অনাসক্ত নির্লিপ্ত, তিনিই সৰ্ব হুঃখ হইতে মুক্ত । যদিও

তিনি সংসারে বাস করেন; কিন্তু অবিচ্ছিন্ন হুঃখে তাঁহাকে কখনও অভিভূত হইতে

হয় না । পদ্মপত্র জলের দ্বারা যেমন আর্দ্র হয় না; রূপের প্রতি নির্লিপ্ত জনও সংসারে

ধাকিয়াও সেইরূপ কদাচ কলুষগ্রস্ত নহেন । উত্তরাধায়ন সূত্রে, যথা,—

“চক্ষুসুস রূবং গহগংবয়ংতি তংরাগ হেউংতু মণ্ণর মাছ ।

তং দোস হেউং অমণ্ণরমাছ সমোয় জো তেসু স বীররাগো ॥ ২২ ॥

রূবস্ত চক্খং গহগং বয়ংতি চক্খুসুস রূবং গহগং বয়ংতি ।

রাগসুস হেউং মণ্ণর মাছ দোসসুস হেউং অমণ্ণর মাছ ॥ ২৩ ॥

রূবেসু জোগিদ্ধি মুবেই তিব্বং অকালিয়ং পাবই সে বিণাসং ।

রাগাউরে সে জহ বাপয়ংগে অলোয় লোলে সমুবেই মচ্চুং ॥ ২৪ ॥

রূবে বিরত্তো মণুও বিসোগো এএণ হুখোহ পরংপেরেণ ।

ন লিপ্পএ ভবমজ্জোব সংতো জলেণবা পুখ্খরিণী পলাসং ॥ ৩৪ ॥”

রূপ বা বর্ণ বিষয়ে যেমন চক্ষুকে নির্লিপ্ত রাখিতে হইবে, শব্দ-বিষয়ে সেইরূপ কর্ণকে

নির্লিপ্ত রাখিতে হইবে । যে কর্ণ শব্দে অহুরক্ত হয়, অথবা যে কর্ণ শব্দে বিরক্ত

প্রকাশ করে,—উভয় অবস্থাতেই সে অশাস্তি ভোগ করে । যে জন

শব্দে আকৃষ্ট হয়, তাহার অবস্থা ব্যাধের বংশী-ধ্বনিতে আকৃষ্ট কুরুরের

অবস্থার জায় বুঝিতে হইবে । যথা,—“সদেসু জো গিদ্ধি মুবেই তিব্বং

অকালিয়ং পাবই সে বিণাস । রাগাউরে হরিনমিএস মুছে সছে অতিত্তে সমুবেই

মজ্জুং ॥ ৩৭ ॥^১ এইরূপ, আত্মাণ গ্রহণে অমুরাগ ও বিরাগ যেন না জন্মে। জ্ঞানেন্দ্রিয়কে যিনি সর্ববিধ আত্মাণ বিষয়ে নির্লিপ্ত রাখিতে পারিয়াছেন, তিনিই হৃৎথের কবল হইতে পরিজ্ঞাণ লাভ করিয়াছেন। নচেৎ জ্ঞাণে যাহার অমুরাগ, তাহার অবস্থা কি শোচনীয়!

ভেষজ-বিশেষের গন্ধে উন্মত্ত সর্প যেমন তাহার বিবর হইতে বহির্গত
গন্ধে
বীতস্পৃহ। হইয়া প্রাণদানে বাধ্য হয়; জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন জন্ত মামুষেরও
সেইরূপ হৃৎথের অবধি থাকে না। যিনি মুক্তির অভিলাষী, তাহাকে

তাই সর্ববিধ আত্মাণের প্রতি বীতস্পৃহ থাকিতে হইবে। জ্ঞানমুগ্ধ জনের অবস্থা; যথা,—

“গংধেন্ন জো গিদ্ধি মুবেই তিব্বং অকালিয়ং পাবই সে বিণাসং।

রাগাউরে ওসহি গংধগিদ্ধে সঙ্গো বিলাওবিব নিক্খমংতো ॥ ৫০ ॥”

হার রসনা! রসনার তৃপ্তি-সাধনের জন্ত জীব যে কত প্রকারে বিপন্ন হইতেছে, কে
তাহার ইয়ত্তা করে? মংস্ত্র যেমন আমিষ-লোভে অগ্রসর হইয়া বড়ী গলাধঃকরণ-
পূর্বক প্রাণদানে বাধ্য হয়, মামুষও সেইরূপ রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্ত কত প্রকার
বড়ীতে দিন দিন আবদ্ধ হইতেছে! সে অবস্থা,—“রসেন্ন জো গিদ্ধি

রসে
বীতস্পৃহ। মুবেই তিব্বং অকালিয়ং পাবই সে বিণাসং। রাগাউরে বড়িস বিভিন্ন
কাএ মছে জহা আমিস লোভ গিদ্ধে ॥ ৬৩ ॥” যে জন এ তত্ত্ব

উপলব্ধি করিতে সমর্থ, যে জন রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধক পদার্থের প্রতি বীতরাগ;
হৃৎথের কবল হইতে সে জন নিমুক্ত। এইরূপ স্বগিঞ্জিয়ের তৃপ্তি-সাধন জন্ত বিষয়-
বিশেষে রতি ও অরতি নিবন্ধন জীব যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার তুলনা হয় না!

প্রবল-পরাক্রান্ত মত্তহস্তী স্বগিঞ্জিয়ের তৃপ্তি-সাধন-কামনায় উন্মত্ত অন্ধ
হইয়া হস্তিনীর পশ্চাদমুসরণ পূর্বক ব্যাধের বন্ধনে আবদ্ধ ও পরিশেষে
স্পর্শে
বীতস্পৃহ। নিহত হয়। ইঞ্জিয়ের তৃপ্তি-সাধন-তৎপর কামামুগত মামুষের এই

শোচনীয় পরিণাম সংসার নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছে! জৈন-শাস্ত্র তাই পুনঃপুনঃ উপদেশ
দিয়াছেন,—“স্বগিঞ্জিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থে যেন অমুরাগ বা বিরাগ কদাচ উপস্থিত না
হয়; স্বগিঞ্জিয়ের ভোগাভিলাষের প্রতি সদা অনাসক্ত থাকিবে। তাহা না হইলে,—

“ভাবেন্ন জো গিদ্ধি মুবেই তিব্বং অকালিয়ং পাবই সে বিণাসং।

রাগাউরে কামগুণেন্ন গিদ্ধে করেন্ন মগ্গা বহিএব নাগে ॥ ৮৯ ॥”

অতএব বৃত্তিতে হইবে, ইঞ্জিয়ের ও মনের বিষয়ীভূত পদার্থ কামী জনেরই কষ্টের কারণ;
নিকাম ব্যক্তি তদ্বারা কদাচ অভিভূত হন না। পদার্থ—পদার্থেই আছে। স্তম্ভকর হউক
বা হৃৎকর হউক, তাহা কদাচ অমুরাগ বা বিরাগ উৎপন্ন করে না। মামুষ কেবল
তাহাদের প্রতি অমুরক্ত বা বিদ্বেষ-বিশিষ্ট হইয়াই মোহবশে কষ্ট পাইয়া থাকে। যথা,—

“কোহংচ মাণংচ তহেব মায়াং লোভং হৃগংছং অরহং রহংচ।

হাসং ভয়ং সোগ পুমিখিবেয়ং নপুংস বেয়ং বিবিহেয় ভাবে ॥ ১০২ ॥

আবজ্জর্জ এব মণে গরুবে এবং বিহে কামগুণেন্ন সত্তো।

অন্নেয় এবগ্গতবে বিসেসে কারুন্ন দীণে হরমে বইসুসে ॥ ১০৩ ॥”

মূল-তত্ত্ব—কামনার নাশ ; মূল-তত্ত্ব—অহিংসার বিরতি ; মূল-তত্ত্ব—সর্ব ইঞ্জিরের দমন । সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তের আভারণায়, শত শত আদর্শের প্রদর্শনে, জৈন-শাস্ত্র ঐ তত্ত্বই বিশদ করিয়া গিয়াছেন । আর একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, আর একটি মূল-তত্ত্ব । মাত্র আদর্শের আবরণ উন্মোচন করিয়া, এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি । সৌরপুর নগরে এক অমিতপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন । তাঁহার নাম—বাসুদেব । তাঁহার এক পুত্রের নাম—কেশব । কুমার কেশবের সহিত সোদামিনীর ন্যায় রূপ-সম্পন্ন রাজসীমতী নামী এক রাজকন্যার বিবাহ-প্রসঙ্গ স্থির হয় । যে দিন শোভা-যাত্রা করিয়া বররূপে কুমার কেশব বিবাহ-বাটীতে যাত্রা করেন, পশ্চিমধ্যে কতকগুলি নিরীহ পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । নিরীহ পশুগুলি তাঁহার দিকে দৃষ্টি-নিষ্কেন্দ্র করিয়া যেন আর্তস্বরে কাদিতেছিল । যেমনই সেই ভাব তাঁহার মনে উদয় হইল, অমনি তিনি সেই নিরীহ পশুগুলির পরিচালককে নিকটে আহ্বান করিলেন । পশুগুলিকে সেরূপভাবে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া তাহারা কোথায় লইয়া যাইতেছে ? কুমার জিজ্ঞাসা করায়, তাহাদের অধিকারী উত্তর দিল,—‘এ পশুগুলি বড় ভাগ্যবান ! আপনার বিবাহে ইহারা খাত্ত-রূপে পরিণত হইয়া বহু জনের তৃপ্তি-সাধন করিবে !’ পশুচালকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুমার চমকিয়া উঠিলেন । তিনি মনে মনে কহিলেন,—‘আমার বিবাহে অভ্যাগত জনের আনন্দ-বর্দ্ধন জন্ত এই সকল জীব নিহত হইবে ! আমিই তবে ইহাদের হত্যার নিমিত্ত-স্থানীয় ! পরজন্মে আমার তবে কি গতি হইবে ?’ কুমার আপনার কর্ণাভরণ উন্মোচন করিলেন ; কণ্ঠহার ও সর্কাজের আভরণ-সমূহ খুলিয়া ফেলিলেন ; পরিশেষে পশুপালককে কহিলেন,—‘এই তুমি পুরস্কার গ্রহণ কর । এই নিরীহ পশুগুলিকে ছাড়িয়া দাও ।’ এই বলিয়া, পশুপালককে বিদায় দিয়া, কুমার একে একে আপনার সাজোপাঙ্গগণকে বিদায় দিলেন । পরিশেষে শিবিকা হইতে অবতরণ-পূর্বক মস্তকের কেশ উৎপাটন করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন । রাজকন্যা রাজসীমতী যখন শুনিলেন, তাঁহার পাণিপ্রার্থী যুবক সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিও তখন সংসার-ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিলেন । রাজপুত্রের এবং রাজ-কুমারীর এইরূপে সংসার-ত্যাগ উপলক্ষে বাসুদেব তাঁহাদের দুই জনকে দুইটি উপদেশ প্রদান করিলেন । তিনি প্রথমে কুমারকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন,—

‘নাগেণং দংসেণংচ চরিত্তেণং তহেবয় ।

খংতীএ মুত্তীএ বট্টমাণো ভবাহির ॥ ২৬ ॥’

‘অর্থাৎ,—জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি চরিত্র, সংযম প্রভৃতি সাহায্যে চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধন করিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হও ।’ পরিশেষে সেই রাজ-কুমারীকে সন্মোদন করিয়া বাসুদেব কহিলেন,—‘আমি আশীর্বাদ করিতেছি,

‘সংসারং সাগরং ঘোরং তরক্সে লহং লহং ॥’

‘অন্যাসে তুমি ভীষণ সংসার-সাগর হইতে পরিজ্ঞাপ লাভ কর ।’ অহিংসা-ধর্ম-পালনে ধার্মিকের চিত্ত কিরূপ উদ্বেলিত হয় ; আর তাহার কলে সংসার কেমন ত্যাগ-স্বীকারের আদর্শ দর্শন করে, প্রোক্ত দৃষ্টান্তে তাহাই প্রত্যক্ষীকৃত হয় ।

কামিকে (কামিনাকে) কিরূপে বশীকৃত করিতে হয়, কুমারী রাজকীয়তীর এবং রাজ-
কুমার রথনেমির দৃষ্টান্তে তাহা প্রদর্শিত হইরাছে । রথনেমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

কাম-আর
মুক্তি ।

রাজকীয়তী সন্ন্যাসিনী হন । একদিন সহসা রাজকীয়তীর প্রতি রথনেমির
দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । সেই রূপ, সেই যৌবন, সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া রথনেমি
বিচলিত হইরা পড়েন । রথনেমি, কুমারীকে ঐহিক সুখের প্রলোভনে
প্রলুব্ধ করিবার প্রয়াস পান । কুমারী তাহাতে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা এই,—

“জইসিক্কেবেণ বেসমণো ললিএণ নলকুবরো ।

তহাবি তেনইচ্ছামি জইসিসক্কেং পুরংদরো ॥ ৪১ ॥

পংখংদে জলিয়ং জোইং ধুমকেউং দুয়াসয়ং ।

নেচ্ছংতি বংতয়ং তুত্তং কুলেজায়া অগংখণে ॥ ৪২ ॥

ধিরথুতে অসোকামীজোতং জীবির কারণা ।

বংতং ইচ্ছসি আবেউং সেযংতে ময়ংগং ভবে ॥ ৪৩ ॥

অহংচ ভোগরায়সু তংচসি অংখগক্কেংহীণী ।

মাকুলেগংখণাহোমো সংজমং নিহুটচর ॥ ৪৪ ॥

জইতং কাহিসিভাবং জাজ্জাদিচ্ছসি নারীও ।

বারাবিক্কোহহোতা অট্টমপ্পা ভবিসুসসি ॥ ৪৫ ॥

গোবালো ভংউ বালোবা জহা তদক্কানিসুসরো ।

এবং অনিসুসরোতংপি সাময়সু ভবিসুসসি ॥ ৪৬ ॥”

অর্থাৎ,—“যদি আপনি বৈশ্রবণের (কুবেরের) জ্ঞান রূপসম্পন্ন এবং নলকুবেরের
(কুবের-পুত্রের) ন্যায় জীর্ণতা-সম্পন্ন হইতেন, অধিক কি, যদি আপনি পুরন্দর ইন্দ্রও
হইতেন; তথাপি আপনার প্রতি আমি কখনও আসক্ত হইতাম না । হে বীমান!
যিক আপনি আমাকে! আপনি ইহজীবনের সুখের আশায় বমনোদগত ত্রাব তরুণ করিতে
অভিলাষী হইরাছেন । ইহা অপেক্ষা আপনার পক্ষে মরণই শ্রেয়ঃ । আমি ভোজরাজ-পুত্রী,
আপনি অন্ধক-বৃত্তি বংশীয় । এমন উচ্চ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গন্ধন সর্পের • জ্ঞান
আমাদের ব্যবহার হওয়া কদাচ উচিত নহে । আত্মসংযম অত্যাশ করুন । যে কোনও
রমণীকে দেখিয়াই যদি আপনি তাহার প্রেমে পতিত হন; হঠবৎ (শৈবাল—পানার জ্ঞান)
আপনি মূলশূন্য হইবেন; বাত্যাগ্রবাহে আপনারকে কেবল ইতস্ততঃ বিচলিত হইরাই রহিতে
হইবে । অপিচ, আপনি বুঝিয়া দেখিবেন, গোপালক রাখাল, অথবা পরধনরক্ষাকারী
ব্যক্তি যেমন গোধনের বা গচ্ছিত ধনের অধিকারী হইতে পারে না; আপনিও সেইরূপ
শ্রমণ-ধর্ম্মের অধিকারী নহেন । অর্থাৎ,—আমি ভিক্ষুর আশ্রমে আশ্রয় লইরাছি । আপনি
রক্ষক হইরা তক্ষক হইলে আপনার সে আশ্রম-ধর্ম্ম কখনও প্রতিপালিত হইতে পারে না ।”
রাজকুমারীর এইবিধ তৎসলা-বাক্যে রথনেমির জ্ঞানপ্রকাশ হইল । অশুশ্রাব্যে হস্তী যেমন

• ভবিষ্যৎ-হয়, গন্ধন এবং অগন্ধন দুই জাতীর সর্প আছে । গন্ধন-জাতীর সর্প বার) উল্লীকৃত বিষ পোষণ
করান দ্বায়েতে পারে । অগন্ধন-জাতীর সর্প উল্লীকৃত বিষ কদাচ পুষ্যগ্রহণ করে না ।

বিচালিত হয়, অতঃপর রথনেমিও সেইরূপ বিচালিত হইলেন; চিন্তা, বাক্য ও কার্য দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন করিয়া তিনি মহাব্রত-প্রতিপালনে প্রবৃত্তপন্ন রহিলেন। প্রলোভনের সামগ্রীতে অনাসক্ত হইতে পারিলে, ইন্দ্রিয়গণকে শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-রূপ-রস প্রভৃতি বিষয়ে বিরত করিতে পারিলে, তবেই সাধনার সিদ্ধিলাভ হয়। জৈনধর্মের এই সার উপদেশ—শব্দ-গন্ধ-রূপ-রস-স্পর্শ বিষয়ে তোমার চিত্ত যেন অনাকৃষ্ট থাকে; অমুরাগ বা ঘেঘ যেন কোনও বিষয়েই উৎপন্ন না হয়।

জৈনশাস্ত্র সর্বত্র তারত্বের প্রায় একই বাক্য—একই উপদেশ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। যেমন আচার্য-স্বত্রে, তেমনই উত্তরাধ্যয়ন-স্বত্রে, তেমনই সূত্রকৃতাজ্ঞে এবং তেমনই অন্তান্ত জৈন ধর্মশাস্ত্রে সেই বন্ধনের বিষয় আর সেই বন্ধন-ছেদের বিষয়ই বিবৃত রহিয়াছে। সূত্রকৃতাজ্ঞের আরম্ভেই প্রশ্ন উঠিয়াছে,—‘কেমন করিয়া জানিব, আমার বন্ধনের কারণ কি; আর সে বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায়ই বা কি আছে?’ জম্বুস্বামী এই প্রশ্ন সূত্রধর্মগাঢ্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন,—‘বলুন দেব! বন্ধনের কারণ কি? তৎসম্বন্ধে মহাবীর স্বামী কি বলিয়া গিয়াছেন? আর সে বন্ধন-মুক্তির উপায়ই বা কি করিয়া জানিব?’ সূত্রধর্ম উত্তর দিলেন,—‘ভ্রূ বা চেতন অতি সামান্য সম্পদেরও যিনি অধিকারী, অথবা অস্ত্রের তজ্জপ অধিকারে যিনি সম্মতি প্রদান করেন; তিনি কখনও দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না।’ সেই একই কথা—কোনও বিষয়ে আসক্তি থাকিলে চলিবে না। যাহারা ভ্রমবশে বিষয়াসক্ত হয়, তাহাদের অবস্থা সছিদ্র-তরুণীর সাহায্যে জম্বাক-জনের সাগর-উত্তরণের প্রয়াস মাত্র। চিন্তায়, বাক্যে, কাব্যে—সর্বপ্রকারে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে, আর সেই আসক্তির মূল মান ক্রোধ মায়া ও লোভ বিসর্জন দিতে হইবে। এই দেহ-ধারণ ও জন্ম-জরা-মৃত্যু সকলই কর্মের ফল। স্মৃতরাং কর্মত্যাগ ভিন্ন মোক্ষলাভ পক্ষে আর উপায়ান্তর নাই। এক স্থলে নয়, এক বার নয়, এক উপদেশে নয়, পুনঃপুনঃ জৈনশাস্ত্র এই কথাই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। মান, ক্রোধ, মায়া, লোভ পরিহার কর। পুত্র-কলত্র ধন-সম্পৎ বিষয়-বিত্তব পরিহার কর। কোনও বিষয়েই তোমার রতি বা অরতি উপস্থিত না হয়। এই উপদেশই জৈন-শাস্ত্রের সার উপদেশ। এই উপদেশ হৃদয়ে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার উদ্দেশ্যে একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একই ভাষায় একই বাণী বিঘোষিত হইয়াছে। অহিংসা পরিহার কর (অহিংসা সমরং); তোমার কেহ নিহত করুক,—তোমার যেমন ইচ্ছা নয়; অপরেরও সেইরূপ ইচ্ছা করে না যে, কেহ তাহাকে হত্যা করুক। * এই উক্তি এক সূত্রকৃতাজ্ঞেই একাধিক বার দৃষ্ট হয়। এইরূপ মান (উক্কস), ক্রোধ (জলণ), মায়া (নুমা), লোভ (মহ্বাখ) পরিহার কর,—এই উপদেশও নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

* সূত্রকৃতাজ্ঞ, প্রথম প্রতিলিপ, প্রথম অধ্যায়ের দশম সূত্রে ও একাদশ অধ্যায়ের দশম সূত্রে অহিংসা-বিষয়ে এবং নামাদি পরিহার-সম্বন্ধে প্রথম প্রতিলিপে প্রথম অধ্যায়ের ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ও অন্তান্ত স্থানে উক্তব্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের বাদ-বিতণ্ডা ।

[লক্ষ্য ও পথ,—বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ;—সাম্প্রদায়িক বাদ-বিতণ্ডা,—বেদান্ত-দর্শনের ভাবোপলব্ধি মতের আলোচনা ও নিরাস-প্রসঙ্গ ;—সাংখ্য-মতের নিরাস,—তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় ও তাহাতে অসামঞ্জস্য প্রদর্শন ;—বৈশেষিক মতের (পরমাণুবাদের বা আরম্ভবাদের) মূল তত্ত্ব ও তাহাতে অসামঞ্জস্য প্রদর্শন ;—কণিক বাদ, বৈশাখিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক প্রভৃতির বিচারে অসামঞ্জস্য প্রদর্শন ;—জৈন-ধর্মের মূলতত্ত্ববিচার ও তাহাতে দোষ-প্রদর্শন ;—শাক্তবাদাদির আলোচনার অসামঞ্জস্য প্রদর্শন ;—উপসংহারে সর্বদর্শন-সার-প্রসঙ্গ ।]

লক্ষ্য অভিন্ন ; কিন্তু পথ বিভিন্ন । অমূল্যধর্মের সামগ্রী এক ; কিন্তু অমূল্যধর্মের পদ্ধতি অভিন্ন নহে । অপিচ, সেই পথ ও পদ্ধতি লইয়াই যত-কিছু গুণগোল । বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় সেই হেতু ; বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের বিচার-বিতণ্ডাও সেই লক্ষ্য অভিন্ন । কারণে । যে মনীষি মহাপুরুষ যখন যে পথ পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন ; তাঁহার অমূল্যধর্মী দলের সংখ্যা তখনই বৃদ্ধি পাইয়াছে ।

তীক্ষ্ণ বীণশক্তি প্রভাবে যিনি যখন বিচার-বিতণ্ডার অপরকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই তখন যশের জয়মালা লাভ করিয়াছেন । ধর্ম-প্রবর্তকগণের অথবা দার্শনিক-সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের প্রাধান্য তদনুসারেই প্রকাশ পাইয়াছে । যিনি যখন যে ভাবে যুক্তির উপর আপন মত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ; তাঁহার প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য তখন সেই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । যে প্রতিষ্ঠা-প্রভাবে যে মহাপুরুষ আপনাদি মত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন, তাঁহার অমূল্যধর্মগণের মধ্যে সে প্রতিষ্ঠা তাদৃশ পরিফুট না হইলে, সে মত রূপান্তরিত পরিবর্তিত বা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে, আর তাহার স্থলে নূতন এক মত প্রতিষ্ঠিত এবং নূতন এক পথ প্রদর্শিত হইয়া থাকে । ভারতবর্ষে—কেবল ভারত-বর্ষেই বা বলি কেন—পৃথিবীতে যত ধর্মমত প্রবর্তিত হইয়াছে, সকলেরই মূল কারণ অমূল্যধর্ম করিতে গেলে, ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ।

এই ভারতবর্ষে হিন্দুর মধ্যেই কত শাখা-সম্প্রদায় দেখিতে পাই । কত সম্প্রদায় কত দার্শনিক মতেরই অমূল্যধর্ম করিয়া চলিয়াছেন । কেহ সাংখ্য-মতাবলম্বী, কেহ বৈশাখিক, কেহ যোগমার্গাবলম্বী,—একই হিন্দুর মধ্যে কত মত-পার্থক্য । সকলেরই

সাম্প্রদায়িক
বাদ-বিতণ্ডা।

লক্ষ্য—সেই . পরমতত্ত্ব মোক্ষ । অথচ, পথ-প্রক্রিয়া সকলেরই বিভিন্ন ।

জ্যোতিষ—সাধারণ দৃষ্টির অন্তরালে রহিয়াছেন । বিভিন্ন জনে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হইবার প্রয়াস পাইতেছেন । যিনি যখন যে যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইতেছেন, তাঁহারই প্রতিষ্ঠা তখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । জ্যোতিষ-দর্শনে দৃষ্টি-শক্তির সাক্ষ্য প্রদর্শন করিতে গিয়াই এত বিভিন্ন ধর্মমতের এবং

এত বিভিন্ন দর্শনের অভ্যাস ঘটানো। একের অপ্রতিষ্ঠা ধাপন করিতে না পারিলে, অপরের সুপ্রতিষ্ঠা সাধন হয় না,—প্রধানতঃ সেই জন্তই দর্শন-শাস্ত্রের বিচার-বিতণ্ডা। সাংখ্য দর্শনকে পণ্ডিতগণ আদি-দর্শন বলিয়া মান্ত করেন। অথচ, বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় সেই সাংখ্য-মতের প্রতিবাদ দেখিতে পাই। এইরূপ, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য বিভিন্ন শাখা-সম্প্রদায়ের দর্শন-শাস্ত্র-সমূহ পরস্পর স্বদ-বিতণ্ডার প্রতিষ্ঠাপন্ন। যখন বৌদ্ধধর্মের অভ্যাস ঘটে; তখন তৎকাল-প্রচলিত দার্শনিক মত-সমূহকে বৌদ্ধ-দার্শনিকগণ যুক্তি-কুঠারে ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতীত হয়। আবার জৈনধর্মের যখন অভ্যাস ঘটে, তখন জৈনগণ কর্তৃক তৎকাল-প্রচারিত দার্শনিক মত-সমূহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছিল বলিয়া জৈনশাস্ত্রে উল্লেখ দেখিতে পাই। এইরূপ, বৈষ্ণব ধর্মের বিজয়-পতাকা যখন উড্ডীন হয়, তাহারাই তখন তৎপূর্ববর্তী দার্শনিক মতসমূহকে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এ সকল আর কিছুই নয়—পাণ্ডিত্যের গবেষণার বা বিচার-শক্তির প্রভাবে এক পথ কণ্টকসমাকুল বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়, আর অন্য পথ সুগম বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া যায়। এই হইল—বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের ও ধর্মমতের উৎপত্তি-মূল। আমরা যদিচ ধর্মের কোনও পথকেই কুপথ বলিয়া মনে করি না; পরন্তু যদিও অধিকারী-অনুসারে প্রত্যেক পথেরই উপযোগিতা স্বীকার করি; তথাপি, ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক মতের বাদ-বিতণ্ডার বিষয় আলোচনা করিয়া, তত্তৎমতের মূলতত্ত্ব প্রদর্শনের আবশ্যক বোধ করি। বেদান্ত-দর্শনে শ্রীমৎ বলদেব বিজ্ঞানভূষণ কৃত ‘গোবিন্দ-ভাষ্যে’ সাংখ্য-মত, বৈশেষিক-মত (পরমাণুবাদ), বৌদ্ধ-মত এবং জৈন-মত প্রভৃতি কিরূপে খণ্ডিত হইয়াছে, তাহা প্রণিধান করিলে, ভারতবর্ষীয় ঐ সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মূল তথ্য অনেকাংশে স্বদয়ক হইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রচারিত সকল দার্শনিক মতের সংক্ষেপে আলোচনা করার পর, উপসংহারে এক্ষণে আমরা সেই গোবিন্দ-ভাষ্য-বিবৃতি উপলক্ষে সকল মতের সার নিষ্কাশন করিতেছি।

বেদান্ত-দর্শন (দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম পাদে) প্রথমে নিজ-পক্ষে পর-কর্তৃক উদ্ভাবিত দোষ-সকল নিরাস করিয়াছেন। বিরুদ্ধ-সম্প্রদায় কর্তৃক বেদান্ত-মতের যে দোষ-খাপন

সাংখ্য-মতের
নিরাস।

হইয়াছে, প্রথম পাদে তাহার খণ্ডন করিয়া, দ্বিতীয় পাদে বিরুদ্ধ-পক্ষের দোষ খাপন করা হইয়াছে। সেই দ্বিতীয় পাদে আত্মপূর্বিক অনুশীলন

করিলে আর তৎপক্ষে ‘গোবিন্দ-ভাষ্য’ অনুসৃত হইলে, বিষয়টা সম্যক বোধগম্য হইবে। ভাষ্যকার বলিতেছেন,—‘যদি অন্য পক্ষের দোষ প্রদর্শন করা না হয়, তাহা হইলে অজ্ঞান বৈদিক পথ পরিত্যাগ করিবে। তাহাতে, অসংপক্ষের অনুসরণে তাহাদের অনর্থ ঘটিবে।’ তাই তিনি প্রথমেই সাংখ্য-মতের নিরাস-কল্পে কহিতেছেন,—

“যপক্ষে পটৈরুদ্ভাবিতা দোষা নিরস্তাঃ প্রথমে পাদে। দ্বিতীয়ে তু পরপক্ষা দৃষ্টান্তে।

ইতরথা বৈদিকং বাক্য বিহার তেবু জনানাং প্রবৃতিঃ শ্রাদ্ধনর্থং চ তে সমীযুঃ। তত্র

তাবৎ সাংখ্যানাং মতং নিরস্ততে। সাংখ্যাচার্যাঃ কপিলভট্টানি সংগ্রহাঃ। নন্দরজ-

স্বমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোহংকারঃ অহংকারাং পঞ্চতন্ত্রাঙ্গানি

উত্তরমিথিঃ স্থলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণ ইতি । সামান্যাবস্থিতানি সৎবাদীনী
প্রকৃতিঃ । তুনি চ স্তব্ধঃ স্তব্ধমোহাশ্রয়ানি ক্রমাধোধ্যানি । তৎকার্যে জগতি স্তব্ধাদি-
রূপদর্শনাৎ । তথাহি তদ্বর্ণী রত্যা পত্যাঃ স্তব্ধেতি সাত্বিকী ভবতি মানেন দৃঃপদেতি
রাজসী বিরহেণ মোহেতি তামসী চেত্যেবং সর্কে ভাবা দৃষ্টব্যাঃ । উত্তরমিথিমিতি ।
দশবাহেজ্জিহ্মাণ্যেকমস্তরিত্রিঃ মন ইত্যেকাদশেত্যর্থঃ । নিত্য্য বিভী চ প্রকৃতিঃ ।
মূলে মূলভাবাদমূলং মূলম্ । ন পরিচ্ছিন্নং সর্বোপাদানম্ । সর্বত্র কার্যদর্শনাৎ
বিভূষমিতি স্ত্রেভ্যঃ । মহদাকারপঞ্চতন্মাত্রাণি সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ । অহমাদেঃ
প্রকৃতয়ঃ প্রধানাদেস্ত বিকৃতয় ইতি । একাদশেজ্জিহ্মাণি পঞ্চভূতানি চেতি ষোড়শ
বিকৃতয় এব । পুরুষস্ত নিষ্পরিণামদ্বায় কস্যাপি প্রকৃতির্নি চ বিকৃতিরিতি । এবমেবেশ্বর-
কৃষ্ণচাহ । মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাত্মাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকণ্ড
• বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ ইতি । সা খলু প্রকৃতির্নিত্যবিকারী স্বরমচেত-
নাপ্যনেকচেতনভোগাপবর্গহেতুরাত্মাতীজ্জিহ্মাণি তৎকার্যেণাহুমীরতে । এটেকব বিষম-
শুণা সঃী পরিণামশক্ত্যা মহাদিবিচিত্ররচনং জগৎ প্রসূতে ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা
সেতি । পুরুষস্ত নিজ্জিহ্মো নিগুণো বিভূচিৎ প্রতিকারঃ ত্রিঃ সত্ত্বাতপরার্থাদহুমৈদ্রশ্চ
সঃ । বিকারক্রিয়য়োর্বিরহাৎ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্বিরহঃ । এবং স্থিতে প্রকৃতি-
পুরুষয়োস্তবে সন্নিধিমাাত্রাৎ তয়োমিথো ধর্ম্যাবিনিময়ঃ প্রকৃতৌ চৈতন্ত্যং পুরুষে তু কর্তৃত্ব-
ভোক্তৃত্বয়োর্মধ্যাসো ভবতি । ইখমবिवেকাৎ ভোগো বিবেকাৎ তু অপবর্গঃ ।
প্রকৃত্যোদাসীথ্যবপূরিত্যেবমাদীনর্ধান্ সোপপত্তিকৈঃ সূত্রৈর্নিববদ্ধ । অস্তাং
প্রক্রিয়ায়াং প্রত্যক্ষাহুমানাগমান্ প্রমাণানি মেনে । ত্রিবিধং প্রমাণং তৎসিদ্ধৌ সর্ব-
সিদ্ধেন্দ্রিয়াদিক্যসিকিরিতি । তত্র প্রত্যক্ষাগমসিদ্ধেযঃখধু নাতীব বিসংবাদঃ । যত্ন
পরিমাণাৎ সময়্যাৎ শক্তিতশেচত্যাাদিসূত্রৈঃ প্রধানং জগৎকারণমহুমিতং তন্নিত্যং
ভবতি তেনৈব সর্বতন্মত্ননিরাসাৎ । তত্র প্রধানং জগন্নিমিত্তোপাদানং তবেৎ ন বেতি
সংশয়ে প্রধানমেব তথা জগতঃ সাত্বিকাদিরূপত্বাৎ প্রধানন্তেব সৎবাদিরূপস্ত তদুপাদান-
ত্বেনাহুমানাৎ । ঘটাদিকার্যাস্তোপাদানং খলু তৎসজাতীরং মৃদাত্তেব দৃষ্টম্ । ফলতি
বৃক্ষশ্চলতি জলমিতিবৎ জড়স্ত্যপি তন্ত কর্তৃত্বক । তন্মাৎ প্রধানমেব জগদুপাদানং
জগৎকর্তৃ চেত্যেবং প্রাপ্তে—“রচনাহুপপত্তেচ্চ নাহুমানম্ ॥” ১ ॥

সাংখ্যচার্য্য মহর্ষি কপিল তত্ত্ব (পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব) ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন । তদন্তু-
সারে সৎ রজঃ তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি । প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব,
মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে উত্তরেজ্জিহ্ম (জ্ঞানে-
জ্জিহ্ম ও কর্মেজ্জিহ্ম) এবং স্থলভূতসকল উৎপন্ন । ঐ সকল আর পুরুষ—এই লইয়া
পঞ্চবিংশতি গণ বা তত্ত্ব । সাম্যে অবস্থিত সৎবাদি ত্রিগুণ—প্রকৃতি । ঐ তিনটি গুণ
যথাক্রমে স্তব্ধঃ স্তব্ধ ও মোহাশ্রয়ক । প্রকৃতিকার্য্যভূত জগৎ—স্তব্ধাদি-রূপদর্শন-হেতু ।
যেমন তদ্বর্ণী, রতির দ্বারা পতির স্তব্ধদান করেন, আর ভাবাতে সাত্বিক ভাবের প্রকাশ
পায়; তেমনই তিনি আবার মানিনী হইয়া দৃঃপদান হেতু রাজসিক ভাবের, এবং বিরহ-

জনিত মোহ উৎপাদন জন্য তামসিক ভাবের প্রকাশিকা হন। প্রকৃতিতে সেইরূপ সর্ব-ভাবে প্রকাশ পায়। ইন্দ্রিয় বিবিধ; দশ বাহ্যেন্দ্রিয় এবং একটি অন্তরেন্দ্রিয় মন—সর্ব-সম্ভব ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশ। প্রকৃতি নিত্য ও বিভূষ-সম্পন্ন। মূলে মূল্যবান জন্য মূলই প্রধান অর্থাৎ কারণান্তরহিত আদি। সেই মূল অপরিচ্ছিন্ন ও সর্বোপাদান। ‘সর্বত্র কার্যাদর্শনাৎ বিভূষ’—এই সূত্র হইতে উহার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহত্ত্ব, অহঙ্কার-ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র—এই সাতটি প্রকৃতির বিকৃতি। অহংত্বাদি প্রকৃতি-বিকৃতি। একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত—প্রকৃতির এই ষোড়শ বিকার। পুরুষ পরিণাম-শূন্যতা-হেতু কাহারও প্রকৃতি বা বিকৃতি নহেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—‘মূল প্রকৃতি অবিকৃত; মহত্ত্বাদি প্রকৃতির সাতটি বিকৃতি। বিকার—ষোড়শ প্রকার। যিনি পুরুষ, তিনি প্রকৃতি বা বিকৃতি নহেন।’ সেই প্রকৃতি নিত্যবিকারশালিনী। তিনি স্বয়ং অচেতন হইয়াও অনেক চেতন জীবের ভোগাপবর্গের হেতুস্বরূপা; তিনি অতীন্দ্রিয় হইয়াও জ্ঞৎকার্য্য দ্বারা অহুমিত হন। এক হইয়াও বিবমণ্ডলা বলিয়া পরিণাম-শক্তির দ্বারা প্রকৃতি মহাদি বিচিত্র রচনাময় জগৎ সৃষ্টি করেন। এই জগ্গই তাঁহাকে অগরিমিতোপাদানভূতা বলা হয়। নিজের নিগুণ পুরুষ—বিভূ চিৎস্বরূপ; তিনি প্রতি দেহে ভিন্ন; সংঘাত-পর্য্য প্রভৃতি হেতু তিনি অহুমের। বিকার ও ক্রিয়ার বিরহ—হেতু তাঁহার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নাই। প্রকৃতি পুরুষের ত্ব এই ভাবে অবস্থিত। উভয়ের সারিধ্য মাত্র পরস্পরের ধর্ম-বিনিময় ঘটে; তাহাতে প্রকৃতিতে চৈতন্যের এবং পুরুষে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের অধ্যাস হয়। এই অব্যবেক-হেতু ভোগ এবং বিবেক-হেতু অপবর্গ বা মোক্ষ। ঔপপত্তিক সূত্র দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্তই পুরুষের ধর্ম। এই প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ অহুমান ও আগম প্রমাণ দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। উক্ত দ্বিবিধ প্রমাণেই উহা সিদ্ধ হয়। উহাতেই সর্বসিদ্ধি; তৎসিদ্ধি পক্ষে অধিক আশাস অনাবশ্যক। প্রত্যক্ষ আগম দ্বারা সিদ্ধ অর্থে বিসম্বাদ নাই। পরিমাণ হইতে, সমন্বয় হইতে, আর শক্তি হইতে (পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ)—ইত্যাদি সূত্রে প্রধানের জগৎকারণত্ব অহুমিত হইয়াছে। তাহা নিরাসের উপরই সকল মতের নিরাস নির্ভর করে। যিনি প্রধান অর্থাৎ পুরুষ, তিনি জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান—এ বিষয়ে সংশয়-নিরাসের জগ্গ তাঁহার নিমিত্তত্ব উপাদানত্ব উভয়ই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সাত্ত্বিকাদি রূপ-হেতু সৎবাদিক্রূপ প্রধানকে জগতের উপাদান-কারণ রূপে অহুমান করা যায়। ষটাদি কার্যের উপাদান তৎস্বজাতীয় সূক্তিকাদি দৃষ্টে এই অহুমান নিশ্চয় হয়। বৃক্ষের ফলোৎপত্তি, জলের গতি প্রভৃতি দৃষ্টে অকু প্রধানের কর্তৃত্ব সূচিত হইয়া থাকে।

সেই যে সাংখ্য মত, সেই যে প্রধানের জগৎ-কর্তৃত্ব, সেই যে প্রধানের জগৎউপাদানত্ব ও নিমিত্ত-কারণত্ব, বেদান্ত-দর্শনের কয়েকটি সূত্রের ব্যাখ্যায়, ভাষ্যকার একে একে তাহার

সাংখ্য-মতে

বোধ-প্রদর্শন।

খণ্ডন করিতেছেন। বেদান্ত-দর্শনের সূত্র (দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ,

প্রথম সূত্র)—“রচনামুপপত্তেচ্চ নাহুমানম্। ১।” অর্থাৎ,—‘জগৎরচনাদৃষ্টে

অহুপপত্তি হয়। সূত্রসাং অহুমান সিদ্ধ নহে।’ এ সঙ্ক্ষেপে প্রথমে

জ্ঞানের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া পরে তাহার বর্ণনামূলক প্রদান করিতেছি। ভাষ্য, যথা,—

“অহুসীরতে জগদ্ধেতুতর্যাহুমানঃ জড়ং প্রধানম্। তন্ন জগদুপাদানং ন চ তন্নি-
মিত্তম্। কুতঃ রচনেন্তি। বিচিত্রজগদ্রচনারাশ্চেতনানিধিষ্ঠিতেন জড়েন তেনা-
সিদ্ধেরিত্যর্থঃ। ন খলু চেতনানিধিষ্ঠিতৈরষ্টকাদিভিঃ প্রাসাদাদিরচনা সিদ্ধা লোকে।
চ শব্দেনাব্রাহ্মণপত্তিঃ সমুচ্চिता। ন হি বাহ্য ঘটাদয়ঃ সূত্রাদিরূপভরাধিতাঃ।

সূত্রাদীনামান্তরত্বাৎ ঘটাদীনাম্ সূত্রাদিহেতুত্বাৎ তদ্রূপত্বাপ্রতীতেশ্চ।” উহার ভাবার্থ,—
যদি অহুমান করিয়া লওয়া হয়, জড় প্রধানই জগতের হেতু; কিন্তু তাহাতে জগদুপাদানত্ব
বা জগন্নিমিত্তত্ব প্রতিপন্ন হয় না। জগদ্রচনার বিষয় বিচার করিলেই তাহা বুঝা যায়।
এই জগতের রচনা অতি বিচিত্র। বিচিত্র জগদ্রচনার চেতনের অধিষ্ঠান পরিদৃষ্ট হয়।
সুতরাং জড়ের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় না। ইহসংসারে দেখিতে পাই, চেতনের সাহায্য
ব্যতীত ইষ্টকাদি দ্বারা কখনও প্রাসাদ রচনা সিদ্ধ হয় না। চ শব্দ দ্বারা অব্রাহ্মণপত্তি
টুপলক্ষি হইতেছে। বাহ্য ঘটাদিকে কখনও সূত্রাদি রূপে অস্থিত অর্থাৎ অবস্থিত দেখা
যায় না। কেননা, সূত্রাদি ঐ সকলের বহির্ভূত ধর্ম। বাহ্য বস্তুতে উহাদের সঙ্গতি হইতে
পারে না। ঘটাদি সূত্রের হেতু বলিয়া তদ্রূপত্ব প্রতীত হয় মাত্র। নচেৎ, স্বরূপতঃ
উহা সূত্রের নিমিত্ত বা উপাদান নয়।

যেমন প্রথম সূত্র, তেমনই দ্বিতীয় সূত্রও সাংখ্য-মত নিরাস-কর প্রযুক্ত দেখি।
দ্বিতীয় সূত্র, যথা,—“প্রবৃত্তেশ্চ। ২।” অর্থাৎ,—‘প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত দ্বারাও প্রধানের তদ্রূপত্ব
অর্থাৎ জগদুপাদানত্ব প্রতিপন্ন হয় না।’ সূত্রের ভাষ্য, যথা,—

“জড়স্ত চেতনানিধিষ্ঠিতত্ব সত্যীতি শেষঃ। যন্নিমিষ্ঠীতরি সতি জড়ং প্রবর্ততে তন্ত্বেব
সা প্রবৃত্তিরিতি নিশ্চিতং রথস্বতাদৌ। ইৎক্ষ কলভীত্যাদিকং প্রত্যুক্তম্। তত্রাপি
চেতনানিধিষ্ঠিতত্বাৎ তচ্চাস্তর্ঘ্যামিত্রাক্ষণাৎ। এতৎ পরত্র স্মৃতিভাবে। চোহবধারণে।
অহং করোমীতি চেতনন্ত্বেব প্রবৃত্তির্দর্শনাৎ জড়স্ত কর্তৃত্বং নেতি বা। নহু প্রকৃতি-
পুরুষয়োঃ সন্নিধিমায়েণ মিথো ধর্ম্মাধায়াৎ জগদ্রচনোপপত্তিরিতি চেহুচ্যতে।
অধ্যাস-হেতুঃ সন্নিধিঃ কিং তয়োঃ সম্ভাবঃ কিং বা প্রকৃতিপুরুষগতঃ কশ্চিৎকার
ইতি। নাত্তঃ মুক্তানামপ্যধ্যাসপ্রসঙ্গাৎ। অন্তোহপি ন তাবৎ প্রকৃতিগতো বিকারঃ

অধ্যাসকার্যভিন্নাভিন্নতয়া তস্তাধ্যাসহেতুত্বাযোগাৎ ন চ পুরুষগত অস্বীকারাৎ॥”
চেতনানিধিষ্ঠিত জড়েই প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। বাহ্য অধিষ্ঠিত হইয়া জড়কে প্রবর্তনা করে, সে
প্রবৃত্তি সে অধিষ্ঠাতারই। রথ ও রথচালকের দৃষ্টান্তে ইহা উপলক্ষি হয়। ইহার
প্রত্যুক্তিস্বরূপ বৃক্ষের ফলোৎপাদনত্ব উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রমাণের অভাব
স্থলেও চেতনানিধিষ্ঠিতত্ব স্বীকৃত হয়। অন্তর্ঘ্যামী ব্রাক্ষণে এ বিষয় উক্ত আছে। পরে
এ বিষয় নিশ্চীকৃত করা হইতেছে। চ শব্দ অবধারণার্থ প্রযুক্ত। ‘আমি করিতেছি’—
এবশ্যকার প্রয়োগে চেতনেরই কর্তৃত্ব সূচিত হয়। প্রবৃত্তি-দর্শনে জড়ের কর্তৃত্ব সপ্রমাণ
হয় না। প্রকৃতি-পুরুষের সন্নিধি-মায়েই উভয়ের ধর্ম্মাধ্যাস-হেতু জগদ্রচনাও অহুপপত্তি
হইয়া থাকে। অধ্যাস-হেতু সে সন্নিধি, তাহা প্রকৃতি-পুরুষের সম্ভাবজনিত, কি প্রকৃতি-পুরুষগত
কোনরূপ বিকারবশতঃ সাধিত হয়? সম্ভাব-বশতঃ যে ঐরূপ ঘটনাছে, তাহা স্বীকার করা

যদি না; কেননা; তাহাতে মুক্ত পুরুষের অধ্যাস-প্রশ্ন আসে। বিকার-বর্জিত উহা যে ব্যক্তিগ্ৰাহ্য, তাহাও স্বীকার করা যায় না। কেননা, পুরুষে বিকার অব্যবহা; অধ্যাস-কার্যরূপে অতিমত প্রকৃতিগত বিকারেরও অধ্যাস-হেতুকের অন্তর্ভাবনা। অতএব, প্রশ্নানের বা পুরুষের জগৎ-কারণত্ব সৃষ্টি কর্তৃক অনিচ্ছ হয়।

একত্রে আরও একটা প্রশ্ন উঠে,—‘হৃদ্র আপনা-আপনিই দ্বিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। একই বারিদ-বিসৃক্ত অমু তাল-চূতাদি বিবিধ কলে বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয়। তজ্জন, একই প্রধান পুরুষ কর্তৃ-বৈচিত্র্য-হেতু দেহভূবনাদি-রূপে পরিণত হইতে পারেন।’ কিন্তু তৃতীয় সূত্রে তাহারও উত্তর দেওয়া হইয়াছে। যথা, পূর্বপক্ষের প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর,—

“নমু পয়ো যথা দ্বিভাবেন স্বতঃ পরিণমতে যথা চাষু বারিদমুক্তমেকরস-
মপি তালচূতাদিষু মধুগান্ধাদিবিচিত্ররসরূপেণ তথা প্রধানমপি পুরুষকর্তৃবৈচি-
ত্র্যাৎ তস্ম ভূবনাদিরূপেণৈতি চেৎ তত্রাহ। “পয়োহমুযচেৎ তত্রাপি।” ৩।”

উত্তরে তৃতীয় সূত্রে বলা হইতেছে,—“পয়োহমুযচেৎ তত্রাপি। ৩।” (২য় অঃ, ২য় পঃ, ৩য় সূত্র।) উহার ভাষ্য, যথা,—

“তয়োঃ পয়োহমুনোরপি চেতনাবিধিতয়োরেব প্রবৃত্তিঃ ন তু স্বতঃ রথাদিদৃষ্টান্তেন
তথাক্রমানাৎ। তয়োস্তদবিধিতত্বং চান্তর্ঘ্যামিত্রাক্ষণাৎ সিদ্ধম্ ॥ ৩ ॥”

হৃদ্র ও জল প্রভৃতি অচেতন পদার্থ চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ মিলিত হইয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। রথাদির দৃষ্টান্ত হইতেই ইহা অনুমান করিতে পারি। অন্তর্ঘ্যামী
ভ্রাক্ষণ হইতেই অচেতনে চেতনের অধিষ্ঠিতত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অন্তঃপর চতুর্থ সূত্র। চতুর্থ সূত্রে বুঝান হইতেছে, প্রধান বা পুরুষ ব্যতীত অন্য
কোনও কর্তৃকর্তার অস্তিত্ব যখন সৃষ্টির পূর্বে সপ্রমাণ হয় না; তখন কেমন করিয়া
সম্বন্ধিত পারি যে, প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে? এ বিষয়ে সূত্র,—

“ব্যতিরেকানবস্থিতেচ্চানপেক্ষাৎ ॥ ৪ ॥”

“অপার্থে চকারঃ। সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রধানব্যতিরেকেণ হেতুস্তরানবস্থিতেরনপেক্ষদ্বার
কেবলমাত্র প্রধানমাত্র স্বপরিণামকর্তৃত্বম্। প্রধানব্যতিরিক্তত্বং প্রবর্তকত্বনিবর্তকো বা
হেতুসাদিসর্গাৎ পূর্বং নাবতিষ্ঠতে ইতি যৎ স্বীকৃতং তত্রাপি পুনরপেক্ষণাৎ।
চৈতন্যসরিষোহৈতদ্ব্যস্তানীকারাদিত্যে বাবৎ। তথাচ কেবলজড়কর্তৃত্ববাদভঙ্গঃ।
কিন্তু ব্যতিরিক্তহেতুত্বাৎ সন্নিধিসম্বাদ প্রলয়েহপি কার্য্যোদয়প্রসঙ্গঃ। ন চ তদা-
বৃত্তোদ্যোদ্যাতাৎ কার্য্যাতাবঃ তদ্ব্যবস্থাপি তদৈবাণাত্তমানত্বাৎ ॥ ৪ ॥”

অপি শব্দে চকার বা সযুজ্য। সৃষ্টির পূর্বে প্রধানব্যতিরিক্ত হেতুস্তরের অনবস্থিতি
স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রধানযোগে সৃষ্টিকর্তৃক মানিতে হইলে সে অনবস্থিতি
উপেক্ষিত সূত্রতঃ প্রধানেরই স্বপরিণামকর্তৃক প্রতিপন্ন হয়। অতথা প্রধান ব্যতিরিক্ত
প্রবর্তক, নিবর্তক বা কোনও কারণই সৃষ্টি সম্বন্ধে থাকিতে পারে না। কিন্তু এবিধ
সৃষ্টি-ব্যাপারে সে মত উপেক্ষিত হইতেছে। চৈতন্যের সন্নিধান হেতুস্তরের স্বীকার
হয়। এইরূপে কেবল জড়কর্তৃত্ববাদ ভঙ্গ হয়। পরন্তু প্রলয় ও কার্য্যোদয় প্রশ্ন উত্থাপিত

হয়; কেন-না, প্রলয়-কালেও হেতুস্তরের অভাব ও প্রধানের সান্নিধ্য থাকে। অদৃষ্টে উদ্বোধনভাবে কার্য্যভাবও বলিতে পারি না। যেহেতু, তৎকালে তদ্বোধক অসম্ভব নহে।

বিবিধ বিতর্কে পরাজয়ের পরও সাংখ্যবাদিগণ বিতর্ক করিতে পারেন,—‘তৃণপল্লবাদি যেমন গবাদি পশু কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া স্বতঃই ক্ষীরাকারে পরিণত হয়; মহাদাদি তত্ত্বের আকারে পরিণত

হইয়া প্রধানও তরুণ অবস্থিত থাকিতে পারেন।’ এই প্রশ্নের উত্তরে বলা
সাংখ্যমত
ধ্বননে।
হইয়াছে,—“অন্ত্রাত্মাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।” (২অঃ, ২পাঃ, ৫ম সূত্র)।

অর্থাৎ,—সর্বত্র যখন সে ভাব পরিদৃষ্ট হয় না, সর্বত্র যখন তৃণাদিকে ক্ষীরাকারে পরিণত হইতে দেখি না, তখন সে পরিণাম স্বভাবসম্মত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এ বিষয়ে প্রশ্ন (ভাষ্যকারের) ও উত্তররূপে সূত্র (বেদান্তদর্শনের) উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“নহু লতাতৃণপল্লবাদি বিনৈব হেতুস্তরং স্বভাবাদেব ক্ষীরাকারেণ পরিণমতে তথা
প্রধানমপি মহাদাত্মাকারেণেতি চেত্তত্রাহ—‘অন্ত্রাত্মাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥’ ৫ ॥”

সূত্রের ভাষ্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে; যথা,—

“অবধূর্তো চশবঃ। নৈতচ্চতুরশ্রম্। কুতঃ অন্ত্রাত্মাভাবাৎ। বলীবর্দাদিত্ত্বিকিতে
তৃণাদিকে ক্ষীরাকারপরিণামভাবাদিত্যর্থঃ। যদি স্বভাবাদেব তৃণাদি
ক্ষীরাত্মনা পরিণমতে তর্হিচত্বরাদিপতিতেহপি তথা শ্রাম চৈবমন্ত্যতো ন
স্বভাবমাত্রং হেতুঃ কিন্তু ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধাৎ সর্ব্বেশসম্বন্ধ এব তথেন্তি ॥”

অর্থাৎ,—যে রূপ গবাদি কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া তৃণপল্লবাদি ক্ষীরাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রধান পুরুষও মহাদাদি তত্ত্বের আকারে পরিণত হন;—এবমিধ যুক্তিও অসম্মত। কেন-না, বলীবর্দাদি কর্তৃক ভক্ষিত তৃণাদিকে কেহ ক্ষীরাকারে পরিণত হইতে দেখেন নাই। সুতরাং তৃণাদির ক্ষীরাকারে পরিণতি স্বাভাবিক নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে চত্বরাদিতে পতিত তৃণাদিরও ঐরূপ পরিণাম দেখা যাইত। তাহা যখন দেখা যায় না, তখন স্বভাবমাত্র পরিণামের হেতু নহে। ফলতঃ, ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে (গবাদি কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া) ক্ষীরাদি ভাবে তৃণাদির পরিণতি ঘটুক, সর্ব্বেশ্বরের এইরূপ সম্বন্ধই উহার কারণ। জড়ত্ব-প্রযুক্ত প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি বর্জিত হইতে পারে না।’

ভাষ্যকার পরিশেষে আরও দেখাইতেছেন, যদি পূর্ব্বপক্ষের সন্তোষের জন্ত উহা (তৃণাদির ক্ষীরাকারে পরিণতি স্বাভাবিক—এরূপ) স্বীকার করিয়া লওয়াও যায়, তাহাতেও কোনও অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বেদান্ত-দর্শনের ষষ্ঠ সূত্রে সে তত্ত্ব বিশদীকৃত দেখি।

“প্রধানশ্চ জাড্যাং স্বতঃপ্রবৃ্ত্তির্ন সমসীত্যাপাদিতম্। অথ তন্মুখোজ্জাসায় তাক্ষেদভ্যা-
পগচ্ছামন্তথাপি ন কিঞ্চিৎবাতীষ্টং সিধ্যেদিতিত্যাহ—‘অভ্যুপগমেষ্বর্থাত্মাবাৎ ॥’ ৬ ॥”

এই ষষ্ঠ সূত্রের (অভ্যুপগমেষ্বর্থাত্মাবাৎ) ভাষ্য; যথা,—

“চতুর্ধু নেত্যনুবর্ততে। পুরুষো মাং ভুক্ত্বা মদোদ্যানমুভয় মদোদ্যাসীত্তলক্ষণং মোক্ষং
প্রাপ্যাতীতি তদ্ভোগাপবর্গার্থাং প্রধানপ্রবৃ্ত্তিং মন্ততে। প্রধানপ্রবৃ্ত্তিঃ পরার্থা স্বতোহ-
প্যভোক্ত্বা হুত্বকুসুমবহনবদিতি। অকর্ত্তাপি পুরুষো ভোক্তেতি চ মন্ততে। অকর্ত্ত-
রপি কলোপভোগোহিহাদবাদিতি। সৈবা প্রবৃ্ত্তির্ন যুক্তা মন্তম্। কুতঃ তত্ভাঃ স্বীকারে

ফলাভাবাৎ । পুরুষস্ত প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগন্তদোদাসীভূতরূপো মোক্ষঃ প্রবৃত্তেঃ
ফলম্ । তত্র ভোগস্তাবশ্চ সম্ভবতি । প্রবৃত্তেঃ প্রাক্ চৈতন্তমাত্রস্ত নিরীকারস্তাকর্তুঃ
পুরুষস্ত তদর্শনরূপবিকারায়োগাৎ । ন চাপবর্ণঃ । প্রাগপি প্রবৃত্তেস্তস্ত সিদ্ধত্বেন
তদ্বৈয়র্থ্যাৎ । সন্নিধিমাাত্রস্ত ভোগহেতুত্বেন মুক্তানামপি তদাপত্তিঃ তস্ত নিত্যত্বাৎ ॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ,—‘পরবর্তী চারিটি সূত্রে ন (নহে) ভাব আসিবে। পুরুষ আমাকে
(প্রধানকে) ভোগ করিয়া আমার (প্রধানের) দোষ অমুভব পূর্বক আমাতে (প্রধানে)
ওদাসীনা-লক্ষণ-রূপ মোক্ষ লাভ করিবেন; এইরূপ ভোগাপবর্ণের জন্ত প্রধানের প্রবৃত্তি
অমুমান করা যায়। উক্ত যেমন পরের জন্ত কুসুম-ভার বহন করে, এ ক্ষেত্রে স্বয়ং
ভোগ না করায় পরার্থে প্রধানের প্রবৃত্তি সূচিত হয়। অকর্তা যে পুরুষ, এইরূপে
তাঁহাতে ভোক্তৃত্ব আরোপ হইতে পারে। অন্যের প্রস্তুতকারী না হইয়াও অন্যের যেরূপ
ভোক্তা হয়; পুরুষেও সেইরূপ ভোক্তৃত্বের ভাব আসে। অতএব, পুরুষের অবশ্রকার
প্রবৃত্তি কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। অপিচ, তাহা স্বীকারেও কোনও ফল নাই। কেন-না,
প্রকৃতি-দর্শন-রূপ ভোগ ও তদ্বিষয়ে ওদাসীন্য রূপ যে মোক্ষ, এতদন্তই প্রবৃত্তির ফল।
তাহার (পুরুষের) ভোগ সম্ভব নহে। চৈতন্তমাত্র নিরীকার যে পুরুষ, তাহাতে প্রবৃত্তি
অসিদ্ধ হয়। সন্নিধি-মাাত্রকে ভোগের হেতু বলিলেও আপত্তি ঘটে; কেন-না, নিত্য
মুক্ত পুরুষের ভোগ সম্ভব নহে।’

এক্ষেত্রে সাংখ্যবাদিগণ একটা প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে
পারেন,—‘গতিশক্তিরহিত অথচ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পশু পুরুষের সহিত গতিশক্তিবিশিষ্ট
অথচ দৃকশক্তিরহিত অন্ধজনের মিলন হইলে যেমন গমনাদি কৰ্ম সম্পন্ন হইতে পারে;
অথবা অন্নসত্ত্ব মণির সন্নিধান-বশতঃ জড় লৌহ যেরূপ গতিশক্তিবিশিষ্ট হয়; সেইরূপ
চিন্মাত্র পুরুষের সন্নিধান-হেতু অচেতন প্রকৃতিও তচ্ছারা দ্বারা চেতনের জ্ঞান তদর্থে
(পুরুষের নিমিত্ত) সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।’ কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তও যুক্তিযুক্ত
নহে। সপ্তম সূত্রে সেই অযৌক্তিকতার বিষয় নির্দেশ করা হইয়াছে; উত্তরে বলা
হইয়াছে,—‘ঐরূপ (অন্ধ-পশুর বা অন্নসত্ত্ব-লৌহের মিলনে গতি) গতি-কার্য্য লক্ষ্য হইলেও
নির্লিপ্ত স্তবরাং জড়বস্তুর জ্ঞান পুরুষের স্বতঃপ্রবৃত্তি সপ্রমাণ হয় না।’ পূর্বপক্ষ-রূপে ভাষ্য-
কারের প্রশ্ন ও উত্তর-পক্ষ-রূপে সূত্রের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

“নমু যথা গতিশক্তিরহিতস্ত দৃকশক্তিসহিতস্ত পশুপুরুষস্ত সন্নিধানাদ্গতি-
শক্তিমান্ দৃকশক্তিরহিতোহপ্যন্ধঃ প্রবর্ততে যথা চায়স্কাস্তান্মনঃ সন্নিধানাজ্জড়-
মপ্যন্নচলতি এবং চিন্মাত্রস্ত পুংসঃ সন্নিধানাদচেতনাপি প্রকৃতিস্তচ্ছারায়
চেতনেব তদর্থে সর্গে প্রবর্ত্তেতেতি চেত্তত্রাহ—‘পুরুষান্নবাদতি চেতথাপি।’ ৭ ॥”

সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্যের যুক্তি খণ্ডন করা হইতেছে; যথা,—

“তথাপি তেনাপি প্রকারেণ জড়স্ত স্বতঃপ্রবৃত্তির্ন সিদ্ধতি। পদোর্গতি-
বৈকল্যোহপি বস্তুদর্শনতদ্রূপদেশাদয়োহন্ধস্ত দৃকশক্তিবিরহেহপি তদ্রূপদেশ-
গ্রহাদয়ো বিশেষাঃ সন্তি। অন্নসত্ত্বমণেশ্চায়ঃ সামীপ্যাদয়ঃ। পুরুষস্ত তু

নিত্য নিষ্ক্রিয়ত্ব নির্ধৰ্মকত্ব ন কোহপি বিকারঃ। সন্নিধিমাঞ্জেণ তস্মিন্
স্বীকৃতে তত্ত্ব নিত্যত্বান্নিত্যং সৰ্গো মোক্ষাভাবশ্চ প্রসজ্যাত। কিঞ্চ পঙ্গুদ্বা-
বুভো চেতনৌ অন্নস্বাস্তায়সৌ চ হে জড়ো ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যং বিক্ষুটম্। ৭।”

ভাষ্যের ভাবার্থ এই যে,—‘তথাপি এ প্রকারে জড়ে স্বতঃপ্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। পঙ্গুর গতিবৈকল্য হইলেও সে বস্তুদর্শনে তৎপক্ষে উপদেশাদি দানে সমর্থ; এবং অন্নজন দৃষ্টিশক্তিরহিত হইলেও পঙ্গুপ্রদত্ত উপদেশ-গ্রহণাদিতে সমর্থ। এইরূপ অন্নস্বাস্ত মণিরও লৌহ-সামীপ্য সাধিত হয়। কিন্তু পুরুষ নিত্য, নিষ্ক্রিয়, নির্ধৰ্মক; এবং তাঁহাতে কোনরূপ বিকারই সম্ভবপর হয় না। সন্নিধিমাঞ্জ বিকার যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার নিত্যত্ব বশতঃ সৃষ্টির নিত্যত্ব সূতরাং মোক্ষাভাব প্রতিপন্ন হয়। অত্র পক্ষে, পঙ্গু ও অন্ন উভয়েই চেতন এবং অন্নস্বাস্ত ও লৌহ উভয়েই জড়; এ হেতু দৃষ্টান্ত-বৈষম্যও পরিস্ফুট হইতেছে।’

সাংখ্যবাদিগণ আরও এক যুক্তির অবতারণা করেন। গুণ-ত্রিতয়ের উৎকর্ষ অপকর্ষ নিমিত্ত অঙ্গাঙ্গিভাব বশতঃ বিশ্ব সৃষ্টি হইয়া থাকে;—সাংখ্যবাদের এই এক প্রকৃষ্ট বুক্তি। অষ্টম সূত্রে ও তাহার ভাষ্যে সে যুক্তিরও খণ্ডন করা হইতেছে। যথা,—

“যন্তু গুণানামুৎকর্ষাপকর্ষবশেনাঙ্গাঙ্গিভাবাঙ্খিস্বসৃষ্টি-

রিতি মন্ততে তস্মিন্নসৃষ্টি—‘অঙ্গিভাবপপত্তে’চ। ৮ ॥”

অর্থাৎ,—‘অঙ্গিভবই অনুপপত্তি হইতেছে।’ এই সূত্রের ভাষ্য এইরূপ; যথা,—
“সদ্বাদীনাং সাম্যোন্মাবস্থিতিঃ প্রধানাবস্থা। তত্ভাং চ নিরপেক্ষস্বরূপাণাং
তেবাং কচ্চিৎকিঞ্চিদঙ্গিভাবঃ নোপপত্ততে ইতরয়োস্তৎ সমত্বেন গুণীভাবা-
সন্দবাৎ। তথা চ গুণাণামঙ্গিভাবাসিদ্ধিঃ। ন চেত্বঃ কালো বা তৎকৃত্ব
অস্বীকারাৎ। যথাহ কপিলঃ। জৈশ্বর্যাসিদ্ধেঃ মুক্তবন্ধয়োঃ তরাভাবান্ন তৎ-
সিদ্ধিরিতি। দিক্কালাবাক্ষাশাভিভ্য ইতি চ। ন চ পুরুষতৎকৃত্ব তত্ত্ব
তত্রোদাসীত্তাৎ। তথা চ গুণবৈষম্যাহেতুকঃ সৰ্গো নেতি। কিঞ্চৈবং হেত্বাভাবাৎ
প্রতিসর্গেহপি তে বৈষম্যং ভজেরন্। আদি সর্গে তু ন ভজেরন্নতি। ৮ ॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ এই,—‘সদ্বাদি গুণের সাম্য ভাবে অবস্থিতিই প্রধান অবস্থা। অর্থাৎ, প্রধানের অবস্থিতির নামই সদ্বাদি গুণের সাম্য ভাব। এই অবস্থায় গুণসকল নিরপেক্ষ স্বরূপ থাকে বলিয়া কেহ কাহারও অঙ্গিভব হইতে পারে না। একটাকে অপরের অঙ্গিভাবে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করিলে তদিতর গুণত্বের সমত্ব-হেতু গুণিভাব অসম্ভব হয়। অর্থাৎ,—সবগুণ যদি রজস্তমঃ গুণ প্রভৃতির সহিত মিশিয়া যায়, তাহা হইলে সবগুণের অবিকার অবস্থা থাকে না। অতএব গুণ-সকলের অঙ্গাঙ্গিভাব এ ক্ষেত্রে অসিদ্ধ হয়। জৈশ্বর্য বা কাল যে সেই অঙ্গাঙ্গিভাবের কর্তা হইতে পারে, তাহা অস্বীকৃত হইয়াছে। যেহেতু কপিল বলিয়াছেন,—‘মুক্ত ও বন্ধের অন্ততর ভাবের অভাব হেতু জৈশ্বর্যসিদ্ধি ঘটে; অর্থাৎ,—জৈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না।’ আকাশ হইতেই দিক কাল উৎপন্ন; পুরুষ তাহাদের কর্তা হইতে পারেন না; কেন-না, তিনি কর্তৃত্ব

বিষয়ে সম্পূর্ণ-রূপ উদাসীন। অতএব গুণবৈষম্য-হেতু সৃষ্টির যুক্তি স্বীকার করা যায় না। অপিচ, হেতুর অভাব বশতঃ প্রতি সৃষ্টিতে বৈষম্য ঘটিলেও আদি-সৃষ্টিতে বৈষম্য ঘটতে পারে না।

এ ক্ষেত্রে সাংখ্যগণ আর একটা প্রশ্ন তুলিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন,— কার্য্যাহুরোধে গুণসকল বিচিত্র স্বভাব প্রাপ্ত হইবে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু নবম সূত্রে সে প্রশ্নের উত্তর; যথা,—

“নহু কার্য্যাহুরোধেন গুণা বিচিত্রস্বভাবা ভবন্তীত্যনুমেরম্। তেন নোক্ত-

দোষাবকাশ ইতি চেত্তদ্রাহ—‘অন্তথাহুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥’ ৯ ॥”

অর্থাৎ,—এইরূপ অনুমানেও দোষের নিস্তার হয় না। কেন-না, উহাতে জাতৃত্ব শক্তির বিরোধ-ভাব দেখা যায়। সূত্রের ভাষ্যে এতদ্বিষয় এইরূপ আলোচিত হইয়াছে; যথা,—

“বিচিত্র শক্তিকতয়া গুণানামনুমানেনপি ন দোষানিস্তারঃ। কৃতঃ জ্ঞেতি,

জাতৃত্ববিরহাদিত্যর্থঃ ইদমহমেবঞ্চ স্বজ্ঞানীতি বিমর্শাভাবাদিতি যাবৎ।

জ্ঞানশূণ্যজ্ঞান সৃষ্টিরিষ্টিকা দেবিরবর্তে চেতনাধিষ্ঠানাদিতি ॥ ৯ ॥”

অর্থাৎ,—‘বিচিত্র-শক্তি-হেতু গুণসমূহের অনুমানেও দোষের নিস্তার হয় না। কেন-না, এই আমি—এরূপ জ্ঞান, অথবা এই আমি সৃষ্টি করিতেছি—এ প্রকার বিচারের অসম্ভাবনা লক্ষ্য হয়। জাতৃত্ববিরহ অর্থাৎ জ্ঞানশূণ্য জড়পদার্থে সৃষ্টি অসম্ভব হয়। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন (ইষ্টক কাষ্ঠাদি) কোনও কার্য্য করিতে পারে না; সেইরূপ গুণ-সকলও চেতনতমর পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ভিন্ন সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থ হয় না।’

এইরূপে বুঝা যায়, যিনি শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত পুরুষ, তিনি নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত, তাঁহাতে কাহারও অধিষ্ঠান সম্ভবপর নহে এবং তিনি সৃষ্টি-কার্য্যের কখনও কারণ হইতে পারেন না।

সাংখ্যের প্রতিবাদের উপসংহারেও বেদান্ত-দর্শনে সেই মত অভিব্যক্ত হইয়াছে। দশম সূত্রে—“বিপ্রতিষেধাশ্চাসমঞ্জসম্।” অর্থাৎ,—বিপ্রতিষেধ উপসংহার। বশতঃ বহুবিধ বিরোধ-হেতু অসামঞ্জস্ত ঘটতেছে। উক্ত “বিপ্রতিষেধ-

শ্চাসমঞ্জসম্” সূত্রের ভাষ্যে বিভ্রান্তভাষণ মহাশয় উপসংহার করিতেছেন; ভাষ্য; যথা,—

“পূর্ব্বোক্তবিরোধোচ্ছেদঃ কপিলদর্শনমসমঞ্জসং নিঃশ্রেয়সকামৈর্হেয়মিত্যর্থঃ।

তথাহি প্রকৃতে: পারার্থ্যাৎদৃশ্যত্বাচ্চ তত্ত্বা ভোক্তা দ্রষ্টাধিষ্ঠাতা চ পুরুষ ইতি শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ। পুমান্ সংহতপরার্থস্বাদিত্যাতিভিন্নভূতপগম্য তত্ত্ব পুন-নির্জীকারণনির্ধর্ম্মক চৈতন্যকর্তৃত্বভোক্তৃত্বশূন্যং কৈবল্যরূপত্বকাভিহিতম্।

জড়ঃ প্রকাশাব্যোগাৎ প্রকাশঃ নিগুণত্বাৎ চিদ্বর্ণ্মেত্যাতিভিঃ। গুণাবিবেক-বিবেকৌ পুংসো বন্ধমোকৌ স্বীকৃত্য তৌ পুনগুণানামেব ন তু পুংস ইত্যুক্তম্। নৈকান্ততো বন্ধমোকৌ পুরুষত্বাবিবেকাদৃতে প্রকৃতেয়াজ্ঞাতাং

সদকর্ষাৎ পশুবদিত্যেবমান্নোহনেকে বিপ্রতিষেধান্তং স্মৃতাবেব মৃগ্যা: ॥ ১০ ॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ,—‘পূর্ব্বোক্ত বিরোধ ঘটায় অর্থাৎ মুক্তশুদ্ধ পুরুষের কর্তৃত্ব অসিদ্ধ হওয়ার, কপিল-প্রবর্তিত দার্শনিক মতের অসামঞ্জস্ত ঘটতেছে। এই হেতু সাংখ্যমত নিঃশ্রেয়স-

মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের নিকট হের বলিয়া গণ্য হইবে; প্রকৃতির পরার্থত্ব ও দৃশ্যত্ব হেতু ভোগকর্তা দৃষ্টাধিষ্ঠাতা পুরুষ শরীরাদি বাতিরিক্তরূপে পরিকল্পিত; ‘সংহতপরার্থত্বাৎ’ প্রভৃতি সূত্রে এবধিধ মত পরিব্যক্ত হইয়াছে। আবার সেই পুরুষই নির্দ্বন্দ্বিতার নির্দ্বন্দ্বিত চৈতন্যত্ব-কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-শূন্যত্ব-কৈবল্যরূপত্ব বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। অতীতকালে ‘জড়-প্রকৃতি-যোগাৎ প্রকাশঃ নিগূর্ণত্বাৎ নোচিচ্ছন্দা’ প্রভৃতি সূত্র দ্বারা বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইতেছে। গুণের বিবেক ও অবিবেক এতদ্ব্যতিরিক্ত উপর পুরুষের বন্ধমোক্ষ স্বীকার করা হইয়াছে। আবার ঐ বন্ধমোক্ষ গুণ সকলেরই অথচ পুরুষের নহে, এরূপ বলা হইয়াছে। অবিবেক ভিন্ন পুরুষের বন্ধমোক্ষ ঘটে না, আবার প্রকৃতি-সংসর্গেই পুরুষ পশুর দ্বারা বন্ধন-প্রাপ্ত হন,—এবধিধ অভিমতও প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রকার বিবিধ মতবিরোধ সাংখ্য-মতে দৃষ্ট হয়। সুতরাং মতবিরোধ-হেতু অসামঞ্জস্য-নিবন্ধন ঐ মত মান্য হইতে পারে না।

সাংখ্যমত নিরাস করিয়া অতঃপর আরম্ভবাদের (পরমাণুবাদের—বৈশেষিক মতের) নিরাস করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বলিতেছেন,—‘তর্কিকগণ কর্তৃক পার্থিবাদি চতুর্বিধ পরমাণুর বিষয় কীর্তিত হয়। সেই চতুর্বিধ পরমাণু নিরবয়ব, রূপাদি-বিশিষ্ট, পারিমাণুল্যপরিমাণ এবং প্রলয়কালে অনারম্ভ কার্যরূপে অবস্থিত।

পরমাণুবাদ
নিরাস।

সৃষ্টিকালে ঐ সকল পরমাণু জীবাণুদৃষ্টাদি পুরঃসর হইয়া (পরমাণুর ক্রিয়োৎপত্তির কারণ হইয়া) দ্ব্যণুকাপি ক্রমে সাবয়ব স্থূলতর জগৎকার্য আরম্ভ করে। সেই পরমাণুদ্বয়ের ক্রিয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ। তদ্বারা উহাদের সংযোগ হইলে হ্রস্ব দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। সে ক্ষেত্রে সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত-কারণ ক্রমে কার্য্য হয়। পরমাণুদ্বয় সমবায়ী, তৎসংযোগ অসমবায়ী ও জীবাণুদৃষ্ট নিমিত্ত কারণ। এইরূপে দ্ব্যণুকত্বের সংযোগে ক্রিয়ার দ্বারা মহৎ ত্র্যণুক উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুইটি অণুর দ্বারা ত্র্যণুকারম্ভ অসম্ভব। কেন-না, মহৎকার্য্যের উৎপত্তি-হেতু বহু কারণের আবশ্যক হয়। এবম্প্রকারে চারিটি ত্র্যণুক দ্বারা চতুরণুক হয় এবং তাহাতে অপর স্থূলতরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্থূল হইতে স্থূলতরের উৎপত্তি-ক্রমে মহতী পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। মহৎ অপ, মহৎ তেজ, মহান্ বায়ু—এইরূপে উৎপন্ন হয়। কার্য্যগত রূপাদি—স্বাশ্রয়-সমবায়ী কারণগত রূপাদি হইতে উৎপন্ন। কারণ-গুণ হইতেই কার্য্যগুণের আরম্ভ। এবম্প্রকারে উৎপন্ন পৃথিব্যাদির সংহারে পরমেশ্বর যখন অভিলাষ করেন, তখন পরমাণুতে ক্রিয়া আরম্ভ হয়; আর সেই ক্রিয়ার দ্বারা পরমাণুসমূহের বিভাগ-সংযোগনাশ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। দ্ব্যণুক-সকলের নাশে আশ্রয়-নাশ, ত্র্যণুকাপি নাশ, ক্রমে পৃথিব্যাদিও নাশপ্রাপ্ত হয়। পটের তদনাশের দ্বারা পৃথিব্যাদির নাশ ঘটে। তদগত রূপাদির স্বাশ্রয়-নাশই জগদ্বিলয়। ইহাই পৃথিব্যাদি নাশের ক্রম। পরিমণ্ডল শব্দে পরমাণু এবং পরমাণুসমবেত পারিমাণই পারিমাণুল্য বুঝিতে হইবে। দ্ব্যণুকই অণুসংজ্ঞক। তৎসমবেত পরিমাণ—অণুত্ব হ্রস্বত্ব। ত্র্যণুকাপি পরিমাণ—মহত্ব। এইরূপেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া চলিতেছে। এ বিষয়ে সংশয় এই যে, পরমাণু প্রভৃতি দ্বারা জগদারম্ভের সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে না। ফলতঃ, আরম্ভবাদের মত এই যে, আত্মা অদৃষ্ট-বিশিষ্ট; সেই অদৃষ্টই আত্ম-সংযোগের হেতু। পরমাণুগত আত্ম ক্রিয়ার জগৎ পরমাণু-যুগ্মের যে সংযোগ, তাহাই অদৃষ্ট-

বিশিষ্ট আশ্রয় সংযোগের হেতু। তাহা হইতে দ্বাণুকাদি উৎপন্ন। তদনুসারেই সৃষ্টিঃ সম্ভাবনা বিহিত হয়। বলা বাহুল্য, একাদশ সূত্রে এই মতের খণ্ডন করা হইতেছে।

“অখারম্বাদো নিরন্তরে । তর্কিক। মন্তস্তে পার্থিবানন্ততুর্বিধা । পরমাণবো
নিরবয়বা । রূপাদিসমুদয়ঃ পারিমাণুল্য-পরিমাণাঃ প্রেলয়কালেহনারক্কাৰ্য্যাত্তিষ্ঠতি
সৰ্গকালে তু জীবাদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সমুদয়ঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সাবয়বং স্থূলতরং জগৎ
কাৰ্য্যমারম্ভস্তে । তত্র দ্বয়োঃ পরমাধোরদৃষ্টগোপেক্ষা ক্রিয়া তয়া সংযোগে সতি দ্ব্যণুকং
ব্রহ্মসুংপত্ততে । তত্র সমবায়্যসমবায়িনিমিত্তকারণানি ক্রমাৎ পরমাণুযুগ্মতৎসংযোগ-
জীবাদৃষ্টানীত্যোবমগ্ৰেহপি । ততজ্জয়াণাং দ্ব্যণুকানাং ক্রিয়য়া সংযোগে সতি ত্র্যণুকং
,মহৎপত্ততে । ন চ দ্ব্যভ্যামণ্ড্যাং ত্র্যণুকারমুদয়ঃ কাৰণভূম্য কাৰ্য্যমহৎসোংপাদনাৎ ।
এবং চতুৰ্ভিদ্ভ্যাণুৈকশ্চতুরণুকং চতুরণুৈকরপং স্থূলতরং তৈশ্চ স্থূলতরং তৈশ্চ স্থূল-
তমমিত্যেবং ক্রমেণ মহতী পৃথিবী মহতা আপো মহন্তেজো মহান্ বায়ুশ্চোৎপত্ততে ।
কাৰ্য্যগতরূপাদিকম্ব স্বাশ্রয়সমবায়িকারণগতাক্রপাদেঃ । কাৰণগুণা হি কাৰ্য্যগুণানা-
রম্ভস্তে । ইথমুৎপন্নান্ পৃথিব্যাদীনীশ্বরে সংজিহীৰ্ষৌ সতি পরমাণুযু ক্রিয়য়া বিভাগাৎ
সংযোগনাশেন দ্ব্যণুৈকম্ নষ্টে স্বাশ্রয়নাশাৎ ত্র্যণুকাদিনাশ ইতি ক্রমেণ পৃথিব্যাদেৰ্নাশঃ ।
যথা পটন্ত তন্তনাশে । তদগতন্ত রূপাদেস্ত স্বাশ্রয়নাশেনৈবেতি জগদ্বিলয় প্রকারঃ ।
কিঞ্চ পরমাণুরত্ন পরিমাণুল সংজ্ঞস্তৎ সমবেতং পরিমাণং তু পারিমাণুল্যমভিधीरते ।
দ्व्यणुकमणुसंज्ञः तत्समवेतं परिमाणं तद्वत्तत्तु ब्रह्मवत् । त्र्यणुकादि परिमाणस्तु
महत्त्वकेति प्रक्रिया । तत्र संशयः परमाणुभिर्जगदारमस्तु समग्रसो न वेति । तत्रादृष्ट-
वदाद्यसंयोगहेतुकं परमाणुगतञ्चक्रियजगत्तद्व्युत्पत्तिसंयोगारकद्व्यणुकदिक्रमेण सृष्टेः
सम्भवात् समग्रस इति प्राप्ते परिह्रियते—‘‘महदीर्घवद्वा ब्रह्मपरिमणुलाभ्याम् ॥’’ ११ ॥”

অর্থ্যাৎ,—‘মহদীর্ঘ বা ক্রম পরিমণ্ডল অর্থ্যাৎ অণু হইতে যথাক্রমে এই জগৎ উৎপন্ন—
এই উক্তি সমীচীন নহে।’ স্বত্বে ভাষ্যে বিষয়টি এইরূপ বুবান হইয়াছে; যথা,—

“ইহ বেতি চার্থে। পূৰ্ব্বতোহসমঞ্জসমিত্যনুবর্ততে। হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্বাণুক-
পরিমাণভ্যাং মহদীৰ্ঘাণুকবন্তস্ততঃ সৰ্ব্বমসমঞ্জসম্। পরিমণ্ডলেভ্যো দ্বাণুকানি
তেভ্যাদ্বাণুকানি তেভ্যশ্চতুরণুকাদিক্রমেণ পৃথিব্যাदीनामुৎपत्तिरितिवदन्नापि त-
त्प्रक्रिया विकल्पेत्तार्थः। तथाहि निम्नवयवैः परिमाणभिः सावयवानि द्वाणुकाश्चा-
रन्त्य इति न वृत्तम्। सावरवैः षड्भिः पार्श्वैः संयुज्यामानानां तन्मनामवर-
विपटारन्तकददर्शनात्। तन्मां सप्रदेशाः परिमाणबोहदीकार्थ्याः। इतरथा
सहस्रपरमाणूनां संयोगेहपि परिमाणुल्यानधिकपरिमाणतया प्रथिमाहपणपत्तेरगुण-
ह्रस्वमहत्वात्सिद्धिः। न च कारणभूयो कार्यमहत्वात्पादकः मनःकलनमात्रत्वात्।
तथागीकृतेहपि प्रदेशेभ्योदे तेहपि सांशाः श्वैररंशैश्चेहपि पुनः श्वैरित्या-
नवत्वात् अंशानन्त्यासाम्येन मेकसर्वपरिमाणौलोप्यसदृशः। तन्मात्रमहदीर्घाणुकं
ह्रस्वाणुकेऽपरां ह्रस्वाणुकं परिमण्डलोऽपरमिति रिक्तं वचः। न चैतत्
सूत्रं श्रुदोषनिवासकतया व्याख्येयम् अत्र पादस्त परणकाक्षेपकत्वात् ॥ ११ ॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ,—‘এ মতে পূর্বাগত অসামঞ্জস্যই সূচিত হইতেছে। হ্রস্ব-পরিমণ্ডল (দ্ব্যণুক) ও দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে মহদীর্ঘ ত্র্যণুকের উৎপত্তি প্রভৃতি মতের জ্ঞান এ পক্ষের সর্ববিধ মতেই অসামঞ্জস্য ঘটে। পরিমণ্ডল (পরমাণু) হইতে দ্ব্যণুক, তাহা হইতে ত্র্যণুক এবং তাহা হইতে চতুরণুকাদি ক্রমে যে পৃথিব্যাদির উৎপত্তি ঘটিয়াছে,—এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে তৎপ্রক্রিয়া বিকল্প হয়। কেন-না, নিরবয়ব পরমাণু হইতে সাবয়ব দ্ব্যণুকাদির উৎপত্তি যুক্তিসম্মত নহে। অবয়ববিশিষ্ট তত্ত্বের সংযোগেই অবয়বী পট উৎপন্ন হয়,—ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এ হিসাবে, অবয়ববিশিষ্ট পরমাণুর বিষয় অঙ্গীকার বা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। অল্পখা, সহস্র সহস্র পরমাণুর সংযোগেও পারিমাণ্ডল্যের (অণুর) অনধিক পরিমাণ-বিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং অণুত্ব, হ্রস্বত্ব, মহত্ব প্রভৃতি অসিদ্ধ হয়। কারণ-বাহুল্য—কার্য্য-মহত্ব উৎপাদক নহে। সে কেবল মনঃকল্পনা মাত্র। প্রদেশভেদ স্বীকার করিলেও অনবস্থা ঘটে। অর্থাৎ,—অংশ অংশ দ্বারা ইত্যাদি অংশেরই কল্পনা মনে আসে। এইরূপ অনন্ত অংশের সাম্য-স্থাপন করিতে যাইলে মেরু ও সর্বপের তুল্যতা প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এই সকল কারণে মহদীর্ঘ ত্র্যণুক যে হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন এবং হ্রস্ব দ্ব্যণুক যে পরিমণ্ডলোৎপন্ন,—এবমিধ উক্তি বাগাড়ম্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এতৎপ্রসঙ্গে নিজপক্ষের দোষ নিরাস তো দূরের কথা; পরন্তু এতদ্বারা পরপক্ষের আক্ষেপ বা আপত্তির কারণই প্রাপ্ত হওয়া যায়।’

এই পরমাণুবাদে আরও কত প্রকার অসামঞ্জস্য ঘটিতে পারে, অতঃপর দ্বাদশ সূত্রে সে তত্ত্ব আলোচিত হইতেছে। দ্বাদশ সূত্র; যথা,—“উভয়থাপি ন কস্মীতন্তদভাবঃ ॥” অর্থাৎ,—

পরমাণুবাদে ক্রিয়ার অভাবে পরমাণুর সংযোগ সিদ্ধ হইতে পারে না। অসংখ্য
অপরাপর পরমাণু বিক্ষিপ্ত-ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কি প্রকারে তাহাদের সংযোগ
আপত্তি। সাধিত হইবে? কে সে সংযোগ-সাধনে সহায় হইবে? এ পক্ষে বিবম

সমস্তা রহিয়া যাইতেছে। ভাষ্যকার সেই সমস্তার বিষয়ই উল্লেখ করিতেছেন; যথা,—

“পরমাণুক্রিয়াজ্ঞাত্ব তৎসংযোগপূর্বকদ্ব্যণুকাদিক্রমেণ তার্কিকৈর্জগৎপত্তিরিদ্ধ্যতে।

তত্র পরমাণুক্রিয়া কিং পরমাণুগতাদৃষ্টজ্ঞাত্ব। কিংবা অগতাদৃষ্টজ্ঞাত্বিতি। নাত্তঃ

আত্মপুণ্যাপুণ্যজ্ঞাত্বাদৃষ্টে পরমাণুগতত্বাসম্ভবাৎ। নাপ্যন্তঃ আত্মগতেন তেন

পরমাণুগতক্রিয়োৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ন চ সংযুক্ত-সমবায়-সম্বন্ধাৎ সম্ভবিস্থতি

নিরবয়বানাং পরমাণুনাং নিরবয়বেনান্যন্য সংযোগানুপপত্তেঃ। তদেবমুত্তরথাপি

নাত্মক্রিয়াজনকমদৃষ্টম্। জাড্যাচ্চ ন হৃচেনং চেতনানিধিষ্ঠিতং স্বতঃ প্রবর্ত্ততে

প্রবর্ত্তয়তি বেতি পরীক্ষিতং শ্রোতৃ। ন চাত্মা বা তৎপ্রবর্ত্তকঃ। তদানুৎপন্ন-

চৈতন্যস্ত তস্যাপি তত্বাৎ। ন চাদৃষ্টোদ্যোগাভাবাৎ তৎক্রিয়াহেতুঃ তত্বা নিত্যত্বেন

নিত্যাং তৎপ্রসঙ্গাৎ। ন চাদৃষ্টোদ্যোগাভাবাৎ প্রতিসর্গে তদভাবঃ তত্বাপি সামগ্রীসম্ব-

হনাবশ্যকত্বাৎ। ততশ্চ নিরন্তর কল্পচিৎ ক্রিয়াহেতোরভাবান সা। পরমাণুবু-

তদভাবান তৎসংযোগঃ। তদভাবাচ্চ ন দ্ব্যণুকাদিকমিত্যতন্তদভাবঃ সর্গাভাবঃ শ্রোতৃ ॥১২॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ,—‘জগতের উৎপত্তি বিষয়ে তার্কিকেরা বলিয়া থাকেন যে, পরমাণু-ক্রিয়ার জ্ঞাত্ব তাহাদের যে সংযোগ, তাহা হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু ঐ পরমাণু-ক্রিয়া কি? উহা পরমাণুগত অদৃষ্ট জন্ত অথবা আত্মগত অদৃষ্ট জন্ত? আত্মগত পূর্ণাণুগত জন্ত অদৃষ্টের পরমাণুগতত্ব আদৌ সম্ভবপর নহে। আবার সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধেও উহার সম্ভাবনা নাই। কেন-না, নিরবয়ব পরমাণু-সমূহের সহিত নিরবয়ব আত্মার সংযোগ সিদ্ধ হয় না। অতএব আত্ম-ক্রিয়াজনক অদৃষ্ট উভয়ত্রই স্বীকার করা যায় না। জড়ত্ববশতঃও উহার সম্ভাবনা নাই। অচেতন পদার্থ চেতন কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া কার্যের প্রবর্তক বা কার্যে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয় না। এ বিষয় পূর্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আত্মাও প্রবর্তক হইতে পারেন না। অতঃপর চৈতন্য পরমাণুর অচেতনত্বই তাহার কারণ। নিত্যত্ব হেতু অদৃষ্টানুসারী ঈশ্বরের ইচ্ছাও উহার কারণ নহে। পরমাণু অবিভাজ্য হেতু উহার ক্রিয়োৎপত্তি অসম্ভব। ক্রিয়ার অভাবে সংযোগাভাব। তাহাতে দ্বাণুকাদিরও অভাব; দ্বাণুকাদির অভাবে সৃষ্টিরও অভাব ঘটে।

সমবায় স্বীকার করিলেও সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। ত্রয়োদশ সূত্রে এই অসামঞ্জস্যের বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। যথা,—“সমবায়াত্মাপগমাত সাম্যাদনবস্থিতেঃ।” অর্থাৎ,—সমবায় স্বীকারেও সাম্য হেতু অসামঞ্জস্য ঘটে। এ সম্বন্ধে সূত্রের ভাষ্য; যথা,—

“সমবায় স্বীকারাচ্চাসামঞ্জস্যং তন্মতম্। কুতঃ সাম্যাদিতি। পরমাণুনাং দ্বাণুকৈঃ সহ সমবায়ঃ সম্বন্ধস্তার্কিকৈরঙ্গীকৃতঃ। স খলু ন সম্ভবতি। তস্তাপি সম্বন্ধিহ সাম্যং। তত্রাপি সমবায়াপেক্ষায়ানবস্থাপত্তেঃ। তথাহি গুণক্রিয়াজাতিবিশিষ্ট বুদ্ধিং জনয়ন্ সমবায়ন্তেঃ সম্বন্ধ এব জনয়েদত্থাতিপ্রসঙ্গাৎ। তথাচ সমবায়ান্ত-রাজীকারেহনবস্থা। স্বরূপমেব তত্র সম্বন্ধ ইতি চেত্তর্হাণ্ড্যাপি স এবাস্ত কিং তেন। ন চ যুক্তঃ সোহত্মাপগন্তম্। তস্য স্বরূপমাত্রতয়া সর্বত্র সর্বধর্ম-প্রাপ্তেঃ। কিন্তু সমবায়বাদিনাং বার্যৌ গন্ধঃ পৃথিব্যাং শব্দ আত্মনি রূপং তেজসি বুদ্ধিরিত্যাপত্তেত। সমবায়ন্তেকত্বেন তত্তৎ সমবায়স্ত তত্র সম্বাৎ। ন চ তন্নিরূপিতঃ স নাস্তীতি বোধ্যং তত্তন্নিরূপিতত্বস্তাপি স্বরূপমাত্রত্বেন তস্তাপি সম্বাৎ। অতিরিক্তস্ত চ নিয়ত পদার্থবাদেহসম্ভবাৎ। তস্মাদ্বিকল্পন্তর্কসময়ঃ॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ,—‘সমবায়-স্বীকারেও ঐ মতে অসামঞ্জস্য ঘটে। কেন-না, তাহাতে সাম্যাদি কোথায় থাকে? পরমাণু সকলের দ্বাণুক-সমূহের সহিত সমবায়-সম্বন্ধ তার্কিকেরা স্বীকার করেন বটে; কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে। সম্বন্ধিহে উহার সাম্য দৃষ্ট হয়। তাহাতে সমবায়াপেক্ষায় অনবস্থাপত্তি ঘটে। সমবায় দ্বারা গুণাক্রিয়া-জাতিবিশিষ্ট বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; আর তাহাতে সম্বন্ধ স্থাপিত করে। অত্থা অতি-প্রসঙ্গ বা আতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। সমবায়ান্তর অঙ্গীকারেও এইরূপ অনবস্থা ঘটে। উহাতে স্বরূপ-সম্বন্ধ ঘটনাছে বলিলে, পৃথক সমবায়-স্বীকারের হেতুভাব ঘটিয়া থাকে। সমবায়-অস্বীকারে স্বরূপ-সম্বন্ধ-স্বীকারে সর্বত্র সর্বধর্মের প্রাপ্তিরূপ দোষ ঘটে। সমবায়বাদীদিগের মতে বায়ুতে গন্ধ, পৃথিবীতে শব্দ, আত্মাতে রূপ, তেজে বুদ্ধি প্রভৃতির অবস্থিতিতে আপত্তি উপস্থিত হয়। সমবায়ের একত্ব হেতু তত্তৎ সমবায়ের সম্বাতেও দোষ সমুপস্থিত হইয়া থাকে। তন্নিরূপিত সমবায় তাহাতে নাই, এরূপ বুঝা যায় না। কেন-না, তত্তন্নিরূপিতত্ব স্বরূপ

মাত্র । অতএব নিরূপিতত্বের অস্তিত্ব আছে । নিরন্তরদার্থবাদে অতিরিক্তের বিস্তৃতি অসম্ভব । সুতরাং দেখা যাইতেছে, এ বিষয়ে বিরুদ্ধ তর্কই ঘটিতেছে ; সমবায়-স্বীকারেও * উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না ।'

আরম্ভবাদ-মতের অসামঞ্জস্যের আরও বিবিধ হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে । চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ হ্রদ সেই অসামঞ্জস্য-প্রদর্শনের সহায় বলিয়া ভাষ্যকার প্রমাণ করিয়াছেন । হ্রদ-ত্রিতর,—

“নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ১৪ ॥”

“রূপাদিমত্যাচ্চ বিপর্যায়ো দর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥”

“উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ১৬ ॥”

হ্রদ-ত্রিতরের ভাষ্য ; যথা,—

“সমবায়স্য নিত্যত্বস্বীকারাত্তৎসম্বন্ধিনোহপি জগতো নিত্যত্বপ্রসঙ্গাদসমঞ্জস্যং তন্মতম্ ॥ ১৪ ॥ পার্থিবাপাতৈজসবায়বীয়ানাং পরমাণুনাং রূপরসগন্ধস্পর্শবস্বাদী-কারান্তেষু নিত্যত্বনিরবয়বত্ববিপর্যায়োহনিত্যত্বসাবয়বত্বপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ রূপাদিমতি ষটাদৌ তথা দর্শনাদিতি স্বীকারপরিভাষাদসমঞ্জস্যং তন্মতম্ ॥ ১৫ ॥ পরমাণুনাং রূপাভ্বনঙ্গীকারে স্থূলপৃথিব্যাধারপি তদভাবাপ্তিঃ । তৎপরিজিহীর্ষয়া রূপাভ্বনঙ্গী-কারে তু প্রাশস্তদোষ ইত্যভয়থা কোদাক্ষমত্বাদসমঞ্জস্যং তন্মতম্ ॥ ১৬ ॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ,—সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার অথচ তৎসম্বন্ধী জগতের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ,—এই বিপরীত মত হেতু পরমাণুবাদমতে অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে । ১৪ ॥ পার্থিব, জলীয়, তৈজস এবং বায়বীয় পরমাণু-সমূহে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-বস্ব অঙ্গীকার করিলে, উহাদের নিত্যত্ব নিরবয়বত্ব প্রভৃতি বিপর্যয় ঘটে । তাহাতে অনিত্যত্ব ও সাবয়বত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি হইয়া থাকে । রূপাদিবিষিষ্ট ষটাদি দ্রব্যে অনিত্যত্বাদি দর্শনে একই মতের স্বীকার ও পরিভাষা হেতু সে মতের অসামঞ্জস্যই সপ্রমাণ হয় । ১৫ ॥ পরমাণুদিগের রূপাদি অনঙ্গীকারে স্থূল পৃথিব্যাতিরিক্ত তদভাব স্থচিত হইয়া থাকে । এতৎপরিহারার্থ পৃথিব্যাতিরিক্ত রূপাদি অঙ্গীকারেও পূর্বেক্ত দোষেরই আগম হইয়া থাকে । উভয়থা এবমিধ অপরিহার্য্য দোষ হেতু ঐ মত (বৈশেষিক মত) উপেক্ষিত হইতে পারে । ১৬ ॥

এইরূপে সর্বপ্রকারে আরম্ভবাদের অনুপাদেয়ত্ব প্রতিপন্নের জন্য সপ্তদশ হ্রদের অব-তারণার বিষয় প্রকীর্ণিত হয় । হ্রদটি ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

“অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা । ১৭ ॥”

“কপিলাদিমতানাং কেনচিদংশেন শিষ্টৈর্মতাদিভিঃ পরিগ্রহাৎ কথঞ্চিদ-পেক্ষা স্যাৎ । অস্যা তু পরমাণুকারণবাদস্য বেদবিরুদ্ধস্য তৈঃ কেনাপ্যং-শেনাপরিগ্রহাদসঙ্গতেশ্চ নাজ প্রয়োহর্থিনামাপেক্ষা স্যাদিতি । ১৭ ॥”

অর্থাৎ,—‘কপিলাদি ঋষির মত-সমূহের (সাংখ্যবাদের) কোনও কোনও অংশ মত প্রভৃতি শিষ্ট ঋষিগণ গ্রহণ করিয়াছেন । সুতরাং তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ আস্থা স্থাপন করা যাইতে

* সমবায় সম্বন্ধ কাহাকে বলে, দর্শনশাস্ত্রে তাহার এইরূপ পরিচয় আছে ; যথা,—“ষটাদীনাম্ কপিলাদৌ দ্রব্যৈশ্চ গুণকর্মণোঃ । তেহু জাতেশ্চ সম্বন্ধ সমবায়ঃ প্রকীর্ণিতঃ ।”

পারে। কিন্তু পরমাণুকারণবাদ বেদবিরুদ্ধ। উহার কোনও অংশই শিষ্টজন-পরিগ্রহীত নহে। সুতরাং শ্রেয়ার্থী জন কদাচ ঐ মতের অপেক্ষা করিবেন না।’

সাংখ্যবাদ ও পরমাণুবাদ নিরাস করিয়া অতঃপর বৌদ্ধমত নিরাস করা হইতেছে। ভাষ্যকার প্রথমে বৌদ্ধমতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বুদ্ধমুনির বৈভাষিক,

বৌদ্ধমত
খণ্ডন।

সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক অভিধের চারিটা শিষ্য-সম্প্রদায়।

বৈভাষিকগণ বলেন,—‘বাহ্য সকল পদার্থই প্রত্যক্ষ-যোগাচার।’ সৌত্রান্তিক-

গণের মতে—‘বুদ্ধি বৈচিত্র্য-হেতু সর্ববিষয় অমুমেয়।’ যোগাচারগণ বলেন,—

‘সকলই অর্থশূন্য অসৎ। জ্ঞানই একমাত্র পরমার্থ ও সংপদার্থ। বাহ্যবস্তু স্বাপ্নতুল্য অসত্য।’

মাধ্যমিকগণের মতে—‘সকলই শূন্যময়।’ সুগতঃ, এই সকলই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মত। সে

মতে আরও প্রকাশ,—‘ভাব পদার্থ সর্বত্রই কণিক। তাহাদের মধ্যে ভূত-ভৌতিক

এবং চিত্ত-চৈতন্য—এই দ্বিবিধ, সমুদায় বলিয়া স্বীকৃত। রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার

আখ্যায় পঞ্চ স্বক্ক তাঁহারা স্বীকার করেন। খর, স্নেহ, উষ্ণ, চলন—এই চতুর্কিঞ্চ স্বভাব—

চতুর্কিঞ্চ পার্থিব পরমাণু। ইহারাই পৃথিব্যাদি ভূত-চতুষ্টিয়ে পরিণত হয়। সেই ভূতচতুষ্টিই

দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় রূপে প্রকাশমান। ভূত-ভৌতিক আখ্যায় রূপ-স্বক্ক বাহ্য-পদার্থ।

বিজ্ঞান-স্বক্ক—অহংপ্রত্যয়-সমাক্রূঢ় জ্ঞান-সমূহ। আখ্যাই কর্তা ও ভোক্তা। বেদনা-স্বক্ক

বলিতে সুখ-বেদনা ও দুঃখ-বেদনা বুঝায়। দেবদত্তাদি নামই—সংজ্ঞাস্বক্ক। রাগ-

দ্বेष-মোহাদি চিত্তধর্ম সংস্কার-স্বক্ক। এই চারি স্বক্ক সাধারণতঃ ‘চিত্তচৈতন্য’ নামে

অভিহিত হয়। সর্বব্যবহারাস্পদ-স্বরূপ উহার অস্তরে লীন থাকে। অতএব অস্তরের

বিষয় সমুদায়ই চতুঃস্বক্কীরূপ। এই সমুদায়-দ্বয়ই অশেষ জগৎ। এতদতিরিক্ত আকাশাদি

অবস্তু মধ্যে গণ্য।’ এইরূপে সংক্ষেপে বৌদ্ধ-মতের পরিচয় দিয়া ভাষ্যকার সংশয় উত্থাপন

করিয়াছেন,—‘এ কল্পনা কি যুক্তিযুক্ত?’ এইরূপে জগৎপত্তির কল্পনা যে যুক্তিযুক্ত নহে,

অষ্টাদশ সূত্রে তাহারই খণ্ডন করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভাষ্যকারের উক্তি ও সূত্র; যথা,—

“ইদানীং বুদ্ধমতং নিরাক্রিয়তে। তত্র বুদ্ধমুনে বৈভাষিক-সৌত্রান্তিক-যোগাচার-

মাধ্যমিকাত্ম্যাস্ত্ভারঃ শিষ্যাঃ। তেষু বাহ্যঃ সর্বোহপ্যর্থ প্রত্যক্ষ ইতি বৈভাষিকঃ।

বুদ্ধিবৈচিত্র্যাদর্থোহমুমেয় ইতি সৌত্রান্তিকঃ। অর্থশূন্যং বিজ্ঞানমেব পরার্থং সৎ

বাহ্যার্থস্ত স্বাপ্নতুল্য ইতি যোগাচারঃ। সর্বং শূন্যমিতি মাধ্যমিকঃ। ইত্যেবং

তে মতানি ত্রয়ঃ। ভাবপদার্থঃ সর্বত্র কণিকঃ। তত্রাত্তৌ ভূতভৌতিকশ্চিত্ত-

চৈতন্যশ্চেতি সমুদায় দ্বয়ং মন্তেতে। তথাহি রূপবিজ্ঞান-বেদনাসংজ্ঞাসংস্কারাত্মাঃ

পঞ্চস্বক্কাঃ ভবন্তি। তেষু খরস্নেহোষ্ণচলনস্বভাবাঃ পার্থিবাদয়শ্চতুর্কিঞ্চাঃ পরমাণবঃ

পৃথিব্যাদিভূতচতুষ্টিরূপেণ সংহতন্তে। তচ্চতুষ্টিরঞ্চ দেহেন্দ্রিয়বিষয়রূপেণেতি স এব

ভূতভৌতিকাত্মা রূপস্বক্কো বাহ্যসমুদায়ঃ। অহংপ্রত্যয়সমাক্রূঢ়ো জ্ঞানসমুদানো বিজ্ঞান-

স্বক্কঃ। স এব কর্তা ভোক্তা চাত্মা। সুখবেদনা দুঃখবেদনাচ বেদনাস্বক্কঃ।

দেবদত্তাদি নামধেয়ং সংজ্ঞাস্বক্কঃ। রাগদ্বেষমোহাদিশ্চেতসিকে। ধর্মঃ সংস্কার-

স্বক্কঃ। ত এতে চত্বারঃ স্বক্কশ্চিত্তচৈতন্যকাঃ কথ্যন্তে। সর্বব্যবহারাস্পদশ্চেন

চাস্তঃ সংহস্তে । তদন্যমন্তরঃ সমুদায়শ্চতুষ্করীকৃতঃ । ইদমেব সমুদায়ব্রহ্মমংশেবং
জগৎ । এতদন্যদাকাশাদিকমবস্তুভূতমিতি । অত্র সংশয়ঃ । এষা সমুদায়ব্রহ্মকল্পনা
যুক্তা ন বৈতি । এতেনৈব জগদ্ব্যবহারোপপত্তেযুক্তেতি প্রাপ্তে প্রতিবিধন্তে—

“সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥”

অর্থাৎ,—‘উভয়-সমুদায়কে জগতের হেতু স্বীকার করিলেও তাহার অপ্রাপ্তি অর্থাৎ অসিদ্ধি
ঘটে । একরূপ ক্ষেত্রে সমুদায়ী-সমূহের অচেতনত্ব এবং তদতিরিক্ত স্থির-চেতনের সংঘাতাভাব
ঘটিতেছে । সুতরাং ঐরূপ যুক্তি অসিদ্ধ । সর্বত্রই ভাব-কণিক স্বীকৃত । স্বতঃপ্রবৃত্তি
স্বীকার করিলেও তৎসাতত্যা-প্রসঙ্গ ঘটে ; অর্থাৎ, সতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয় ।
অতএব মূল কল্পনা অধৌক্তিক প্রতিপন্ন হইতেছে ।’

ভাষ্যের ভাষায় সূত্রটি এইরূপ বুঝান হইয়াছে ; যথা—

“যোহয়মুভয়সংঘাতহেতু ক উভয়বিধঃ সমুদায়ো নিরূপিতস্তস্মিন স্বীকৃত্তে-
হপি তদপ্রাপ্তির্জগদাত্মকসমুদায়াসিদ্ধিঃ । সমুদায়িনামচেতনত্বাদন্যস্য চ
সংহস্তঃ স্থিরচেতনস্তাভাবাৎ । স চ ভাবকণিকত্বস্বীকারাৎ । স্বতঃ-
প্রবৃত্ত্যুরীকৃত্তৌ তৎসাতত্যা-প্রসঙ্গ । তদ্বাদযুক্তা তৎকল্পনা ॥ ১৮ ॥”

পূর্বোক্ত উভয় সংঘাত হেতু যে উভয়বিধ সমুদায় নিরূপিত হয়, তাহা স্বীকার করিলেও
তাহার অপ্রাপ্তি-বশতঃ জগদাত্মক সমুদায়ের অসিদ্ধি ঘটে । সমুদায়-সমূহের অচেতনত্ব
এবং তদতিরিক্ত স্থির-চেতনের সংঘাতাভাব-বশতঃ ঐ দোষ ঘটে । কেন-না, বৌদ্ধমতে
সর্বত্রই ভাবকণিক স্বীকার করা হইয়াছে, দেখিতে পাই । স্বতঃ-প্রবৃত্তির বিষয় স্বীকার
করিলেও তৎসাতত্যা-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় । অতএব ঐরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে ।

এ ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি কথা উঠিতে পারে । অবিজ্ঞাদিকেই সংঘাত-সংজ্ঞায়
সংজ্ঞিত করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যাইতে পারে । কিন্তু ভাষ্যকার সে আপত্তিরও খণ্ডন
করিতেছেন । প্রথমে পূর্বপক্ষরূপে বৌদ্ধপক্ষের যুক্তি এবং উত্তরে বেদান্ত-সূত্র (১৯শ সূত্র)
ও তাহার ভাষ্য এ পক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ পরিগৃহীত হইতে পারে । বৌদ্ধমতের স্বপক্ষে যুক্তি—

“ননু সৌগতসময়ে বিজ্ঞাদয়ো মিথো হেতুফলভাবমাপন্যঃ স্বীকরীয়েন্তে অপ্রত্যাখ্যোয়াশ্চ
তে সর্বেষাং তেষু চ মিথস্তথাভাবেন ঘটীযন্তবৎ সম্ভবতমাবর্তমানেষথাক্ষিপ্তঃ সম্ভবাত-
স্তমস্তরেণৈবামসিদ্ধেঃ । তে চাবিজ্ঞা সংস্কারো বিজ্ঞানং নামরূপং যড়ায়তনং স্পর্শো বেদনা

তৃষ্ণোপাদানং ভবো জাতিজরামরণং শোকঃ পরিবেদনা হৃৎথং দুর্শ্বনস্তা চেতি ।”

অর্থাৎ,—‘কেহ বলিতে পারেন, সৌগতসময়ে (বৌদ্ধমতে) অবিজ্ঞাদি হেতুফলভাব প্রাপ্ত
হইয়া থাকে । এই মত স্বীকার করিলেও উহা কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না ।
কেন-না, হেতুফলভাবে ঘটীযন্তবৎ সম্ভবতঃ আবর্তমান পদার্থের সংঘাত ঘটে ; আর তদ্বারাই
আক্ষিপ্ত হয় । সংঘাত ভিন্ন অবিজ্ঞা প্রভৃতি অসিদ্ধ । অবিজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম,
রূপ, যড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিবেদনা,
হৃৎথ, দুর্শ্বনস্ত—এইগুলিই সংঘাত ।’ ফলতঃ, অবিজ্ঞাদির সংঘাত-হেতু জগদ্ব্যাপার সাধিত
হয়,—ইহাই স্থূল মর্ম্ম ।

কিন্তু উহাতেও যুক্তি-বৈষম্য রহিয়া যায়। উনবিংশ সূত্রে সে বৈষম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ইতরেতর অবিজ্ঞাদির প্রত্যয়ত্ব (হেতু) নিবন্ধন যে উৎপত্তি (সংঘাত) ঘটতেছে, তাহা স্বীকার করা যায় না। সূত্র ও তাহার ভাষ্য অভিনিবেশ-সহকারে অধ্যয়ন করিলেই এতদ্বিষয়ক অযৌক্তিকতা সম্যক উপলব্ধি হইবে। সূত্র ও ভাষ্য; যথা,—

“ইতরেতরপ্রত্যয়াদিতি চেয়োৎপত্তিমাভিনিমিত্ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥”

“প্রত্যয়শব্দো হেতুবাচী। অবিজ্ঞাদীনাং পরস্পরহেতুত্বাদুপপন্নঃ সজ্বাত ইতি তদ্ব্যুৎপত্তঃ। কৃতঃ উৎপত্তীতি। তেবাং পূর্বপূর্বমুত্তরোত্তরোৎপত্তিমাভ্যঃ প্রতিনিমিত্তং শ্রায় তু সজ্বাতং প্রতি কিঞ্চিৎ তদন্তীতি। কিঞ্চ ভোগার্থং সজ্বাতঃ। ন চ কণিকেষ্বাত্মনু ভোগঃ সম্ভবতি। তদ্ব্যুৎপত্ত্যধর্মাদেতত্ত্বঃ পূর্বমসম্পাদনাৎ।

ন চ তৎসম্পাদনে স সম্পাদিতঃ। তস্মৈ স্থায়িত্বৈ সর্বকণিকত্বপ্রতিজ্ঞাব্যা-

কোপাৎ। কণিকত্বৈ প্রাপ্তকদোষানতিবৃত্তেঃ। তস্মাদসম্ভতঃ সৌগতমময়ঃ ॥ ১৯ ॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ,—‘প্রত্যয় শব্দ হেতুর্থজ্ঞাপক। অবিজ্ঞা প্রভৃতির পরস্পর হেতুত্ব-বশতঃ উপপন্ন যে সংঘাতের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। কিরূপে তাহা উৎপন্ন হইতে পারে? তাহাদিগের পূর্ব পূর্ব ও উত্তরোত্তর উৎপত্তি মাত্রের প্রতিনিমিত্ত হইতে পারে না। সংঘাতেরও প্রতিনিমিত্ততা থাকিতে পারে না। যেহেতু, ভোগের জগুই সংঘাত হইয়া থাকে। কিন্তু কণিক যে আত্মা, তাহাতে ভোগ সম্ভবপর নহে। ভোগ-হেতুক ধর্মাদিদের পূর্বের অসম্পাদন জগু ভোগের সম্ভাবনা থাকে না। আত্ম-সম্পাদনের (নিত্যত্বহেতু) দ্বারা তাহাদের (ধর্মাদিদের) উৎপত্তিও সম্পন্ন হয় না। কেন-না, তাহার স্থায়িত্ব সর্বকণিকত্ব-প্রতিজ্ঞায় ব্যাঘাত জন্মে। সুতরাং কণিকত্ব প্রাপ্তক দোষ অবশ্যস্তাবী হয়। এই সকল কারণে সৌগতমত অসম্ভব বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।’

অবিজ্ঞাদির পারস্পারিক হেতুত্বও দোষ দৃষ্ট হয়। বিংশ সূত্রে ভাষ্যকার সেই দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। ভাষ্যকারের উক্তি ও বেদান্ত-দর্শনের সূত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে;—

“ইদানীমবিজ্ঞাদীনাং মিথো হেতুত্বং দুষ্যতি।

‘উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ॥’ ২০ ॥”

অর্থাৎ,—‘উত্তরোৎপাদে পূর্ব-কারণের নিরোধ ঘটে।’ এ সম্বন্ধে সূত্রের ভাষ্য; যথা,—

“নেতানুবর্ততে। কণভঙ্গবাদিনো মন্তস্তে উত্তরায়নু কণে উৎপত্তমানে-

পূর্বঃ কণো নিরূধ্যত ইতি। উত্তরকণবর্ত্তিনি কার্যো জায়মানে সতি

পূর্বকণবর্ত্তিকারণং বিনশ্রুতীতি তদর্থঃ। ন চৈবমুরীকূর্ত্ততাবিজ্ঞাদীনাং মিথো

হেতুহেতুমত্বাৎ শক্যো বিধাতুং নিরুদ্ধত্ব পূর্বকণবর্ত্তিনো নিরূপাধ্যত্ব-

নোত্তরকণবর্ত্তিহেতুত্বাদুপপত্তেঃ। কারণং হি কার্যানুসৃত্যং দৃষ্টম্। ২০ ॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ,—‘এখানেও পূর্ব সূত্রের ন (নহে) অনুবর্ত্তন উপলব্ধি হইতেছে। কণভঙ্গবাদীদের মত এই যে, উত্তরকালে উৎপাদমান অর্থাৎ সজ্বাত পূর্বকণ নিরোধ হয়। উত্তর-কণবর্ত্তী কার্যের উৎপত্তি হেতু পূর্বকণবর্ত্তী কারণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহাই মর্ম্মার্থ। কিন্তু এতদ্বারা অবিজ্ঞাদির পরস্পর হেতুহেতুমত্বাবের প্রতিষ্ঠা কল্পিতে সমর্থ

হওয়া যায় না। পূর্বকল্পবর্তী নিরুদ্ধ কারণের নিরুপাখ্য (অসম্ভা) উত্তরকল্পবর্তী হেতুতার অমুপপত্তির কারণ বলিয়া মনে হয়। কারণই কার্যমাত্রে অনন্যাত দেখিতে পাই।

বৌদ্ধমতাবলম্বীরা অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কল্পনা করেন। বীজের অমুপপদনে (অর্থাৎ নিস্পীড়ন ভিন্ন) অঙ্গুর প্রাহুভূত হয়,—ইহাই তাঁহাদের হেতুবাদ। একবিংশ সূত্রে বৌদ্ধদিগের সেই মত খণ্ডিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের উক্তি, সূত্র ও তত্ত্বায্য নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে; যথা,—

“অসতঃ সত্ত্বৎপত্তিং তে মন্ততে। নামুপমত্ত্বা প্রাহুভাবাদিতি। তাং দুষয়তি।

‘অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যোগপত্তমত্ত্বা ॥’ ২১ ॥”

“অমতুপাদানে চেৎ কার্যং তদা স্বক্কেহেতুকা সমুদায়োৎপত্তিরিতি প্রতিজ্ঞা-
ভঙ্গঃ। সৰ্বদা সৰ্বত্র সৰ্বং চোৎপত্তেত উৎপন্নকাসৎ। অত্থোপাদানাক্চেৎ
কার্যং তর্হি যোগপত্তং কার্যকারণয়োঃ সহাবস্থিতিঃ স্তাৎ কার্যামুহ্যাতস্তো-
পাদানত্বাৎ। তথাচ ভাবক্ষণিকত্বমতভঙ্গঃ। তস্মাৎসতঃ তত্ত্বৎপত্তিঃ ॥ ২১ ॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ,—‘উপাদানের অবিচ্ছিন্নতানে যদি কার্যোৎপত্তি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে স্বক্কেহেতুক সমুদায় উৎপত্তি এই যে প্রতিজ্ঞা, ইহা ভঙ্গ হইয়া যায়। তাহা হইলে (উপাদান ভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হইলে) সৰ্বদা সৰ্বত্র সর্ববস্তু উৎপন্ন হইতে পারে। অসৎ হইতে অসতেরই উপপত্তি ঘটে। উপাদান—কার্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কার্যামুহ্যাত উপাদান যদি অসৎ না হইয়া সৎ হইত, তাহা হইলে কার্য ও উপাদান সমভাবে সৰ্বদা অবস্থান করিত। তাহাতে ভাবক্ষণিকত্ব মতের অসিদ্ধতা সপ্রমাণ হইত। এই সকল কারণে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কদাচ স্বীকার করা যায় না।’

বৌদ্ধমতাবলম্বিগণের মতে দীপনির্বাণের স্থায় ঘটাদির নাশ স্বীকার করা হয়। দ্বাবিংশ সূত্রে সে মতের দোষ খ্যাপন করা হইতেছে। এ বিষয়ে প্রথমে ভাষ্যকারের মন্তব্য, সূত্র এবং পরিশেষে সেই সূত্রের ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা—

“দীপস্তেব ঘটাদের্নিরবয়ং বিনাশং মন্তস্তে। তং দুষয়তি।

‘প্রতিসংখ্যা প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥’ ২২ ॥”

“ভাবানাং ধীপূর্বকো ধ্বংস প্রতিসংখ্যানিরোধঃ। তদ্বিলক্ষণস্তপ্রতিসংখ্যা-
নিরোধঃ। আবরণাভাবমাত্রমাকামম্। এতদ্ব্যং নিরুপাখ্যং শূন্যমিতিযাবৎ।
তদন্তং সৰ্বং ক্ষণিকম্। যজ্ঞকম্। বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াদন্তং সংস্কৃতং ক্ষণিকং চেতি।
তত্রাকালং পরত্র নিরাকরিশ্চতি। নিরোধৌ তাবদ্বিরাকরোতি প্রতিসংখ্যেতি।
এতন্মোনিরোধয়োরাপ্রাপ্তিরসম্ভবঃ স্তাৎ। কুতঃ অবিচ্ছেদাৎ। সতো নিরবয়-
বিনাশাতাবাৎ। অবস্থাস্তরপত্তিরেব সতো দ্রবস্তোৎপত্তিবিনাশচ্চ। অবস্থাস্তরো
দ্রব্যং যেকং স্থায়ীতি ন চ দীপনাশস্ত নিরবয়ববীক্ষণাদন্তত্রাপি তথাস্থিতি বাচ্যম্
অবস্থাস্তরপত্তেরেবাত্ত্র নাশত্বে নিশ্চিতো দীপেহপি তস্যা এব ভবেন্ন নিশ্চেষ-
ত্বাৎ। অমুপলভ্যত্বতিসৌম্যাদেব। সহস্রনো নিরবয়বশ্চেন্নিনাশত্তর্হি কণানন্তরং
বিখং নিরুপাখ্যং পশ্চেষ্টকং ন ভবেন্ন চৈবমন্তি। তস্মাদমুপপন্নং সঃ ॥ ২২ ॥”

অর্থাৎ,—‘বুদ্ধিপূর্বক ভাবসমূহের ধ্বংস-সাধনের নাম—প্রতিসংখ্যানিরোধ। তদ্বৈলক্ষণ্যই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। আবারণাভাবমাত্র বলিতে আকাশকে বুঝায়। এই তিনটাই নিরূপাখ্য শূন্য বলিয়া অভিহিত হয়। এতদ্ভিন্ন অত্র সকলই ক্ষণিক নামে পরিচিত। কথিত হয়, তিনটি ভিন্ন অত্র সকল পদার্থ বুদ্ধিবোধ্য, সংস্কৃত ও ক্ষণিক। আকাশের বিষয় পরে নিরাকৃত হইবে। এক্ষণে নিরোধদ্বয়ের বিষয়ই নিরাকরণ করা যাইতেছে। নিরোধদ্বয়ের অপ্রাপ্তি বা অসম্ভবের কারণ—অবিচ্ছেদ এবং সমস্তের নিরন্তরবিনাশাতাব। অবস্থান্তরাপত্তি—সংস্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ। অবস্থান্ত্রেও স্রব্যের স্থায়িত্ব। দীপনাশে নিরন্তরত্ব (শূন্য) দর্শনে অত্র ঐ ভাব মনে আসিতে পারে না। অবস্থান্তরাপত্তি নাশরূপে নিশ্চিত হইলে, দীপেও অবস্থান্তরাপত্তিরই নিশ্চয় করিতে হয়। অতি-সূক্ষ্ম-নিবন্ধন উহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। সমস্ত বিনাশ যদি নিরন্তর বা শূন্য হইত, তাহা হইলে ক্ষণান্তরে বিধকে নিরূপাখ্য (শূন্য) দেখিতে হইত এবং কাহারও নিজের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইত না। এই সকল কারণে এই মত মাত্র করা যাইতে পারে না। এইরূপে বুঝা যায়, এ মত অপ্রামাণ্য।’

অনন্তর বৌদ্ধ-মতানুগত মুক্তি-সম্বন্ধে দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। ঋগ্বেদেবিশং সূত্র ও তাহার ভাষ্য তদর্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। সূত্র ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে; যথা,—

“অথ তদভিমতাং মুক্তিং দৃশয়তি।

‘উভয়থা চ দোষাৎ ॥’ ২৩ ॥”

“ত্রিষু মণ্ডুকপ্লুত্যা নেতানুবর্ততে। যোহয়ং সংসারহেতোরবিচ্ছাদেন্নিরোধো বৌদ্ধমোক্ষভিমতঃ। স কিং সাক্ষাত্তত্ত্বজ্ঞানং স্ত্রাং স্বয়মেব বা। নাদ্যঃ নিহেতুকবিনাশস্বীকারবৈয়র্থ্যাৎ নেতরঃ। সাধনোপদেশনৈরর্থ-ক্যাদিত্যভয়থাপি বিচারাসহস্রাত্তদভিমতো মোক্ষোহপি ন সিধ্যতি ॥ ২৩ ॥”

অর্থাৎ,—‘মণ্ডুকপ্লুতি অনুসারে পর্যায়ক্রমে তিনটি সূত্রে ন (নহে) ভাব অনুবর্তিত হইয়াছে। বৌদ্ধগণ সংসার-হেতুত্ব অবিদ্যার নিরোধকে মোক্ষ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। কিন্তু সে মোক্ষ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? তাহা তত্ত্বজ্ঞানোৎপন্ন?—না, স্বয়ং উৎপন্ন! তত্ত্বজ্ঞান-জনিত নহে। কেন-না, তাহা হইলে নিহেতুক বিনাশ (অপ্রতিসংখ্যানিরোধ) বিফল হইয়া যায়। স্বয়ং-উৎপন্নও উহাকে বলা যাইতে পারে না। আপনা-আপনি মোক্ষলাভ হইয়াছে স্বীকার করিলে, সাধনোপদেশাদি বৃথাই প্রযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই প্রকারে উভয় মতই বিচারে দাঁড়াইতে পারে না। সুতরাং বৌদ্ধাভিমত মোক্ষও অসিদ্ধ হয়।’

অত্র দিকে আবার আকাশাদির যে শূন্যতা (নিরূপাখ্যত্ব) কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, তাহাও মুক্তির উপর দাঁড়াইতে পারে না। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের উক্তি, চতুর্বিংশ সূত্র এবং তাহার ভাষ্য নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

“অধাকাশস্ত নিরূপাখ্যত্বং নিরস্যাতে।

‘আকাশে চাবিশেষাৎ ॥’ ২৪ ॥”

“আকাশে বা নিরূপাখ্যতাভিমতা সা ন সম্ভবতি। কুতঃ অবিশেষাৎ। ইহ

শ্রেন উৎপত্তীতি প্রতীত্যা তত্রাপি পৃথিব্যাদিবস্তাবরূপত্বাৎ গন্ধাদিশুণ্ণাণাং পৃথিব্যাদি বস্তুপ্ররূপবীকণাচ্ছদ গুণদ্যাপ্যাকাশো বস্তুভূত এবাশ্রয় ইতানু-
মানাচ্চ । বায়ুরাকাশসংশ্রয় ইতি স্বহৃৎসঙ্গতেশ্চ । অপি চ আবরণাভাব-
মাত্রমাকাশমিতি ন শক্যং বক্তুং ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ । তথাহি ন তাবৎ প্রাগ্ভাবাদি-
ত্রমাকাশঃ । পৃথিব্যাদেবাবরণস্য সৎস্বেন তদপ্রতীতিপ্রসঙ্গাৎ বিশ্বং নিরাকাশং
গ্যাৎ । আকাশস্য সৎস্বেন পৃথিব্যাত্তপ্রতীতিপ্রসঙ্গাচ্চ । নাপ্যন্তোজ্ঞাভাবঃ
তস্য তত্ত্বাবরণ গত্যন্তেন তন্মধ্যাকাশাপ্রতীতিপ্রসঙ্গাদিতি যৎকিঞ্চিদেতৎ ।
যত্রাবরণভাবস্তদাকাশমিতি চেদ্বর্হি বস্তুভূতমেব তৎ আবরণাভাবেন বিশেষিত-
ত্বাৎ । তৎস্বাৎ পৃথিব্যাদিবস্তাবস্তৃতমেবাকাশং ন তু নিরূপাখ্যাম্ ॥ ২৪ ॥”

অর্থাৎ,—‘আকাশের নিরূপাখ্যাতার (শূন্যতাব) বিষয় অনুমান করা হইয়াছে। কিন্তু উহা
সম্ভবপর নহে। অবিশেষ-বশতঃই সেই অসম্ভবতা খাপন করা যাইতে পারে। আকাশে
শ্রেন পক্ষী উড়য়মান—এই যে প্রতীতি, এতদ্বারা আকাশেও পৃথিব্যাদিবৎ ভাবরূপত্ব
অনুভূত হয়। অপিচ, গন্ধাদি গুণসমূহ পৃথিব্যাদি বস্তুর আশ্রয় দেখিয়া এবং শব্দগুণ
আকাশের আশ্রয় জানিয়া, অধিকন্তু বায়ু আকাশের সহিত সংশ্রিত এবশ্রকার উক্তি
অসঙ্গত হয় বলিয়া, পৃথিব্যাদির সহিত আকাশের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না; সুতরাং
আকাশকে শূন্য বলা যাইতে পারে না। অপিচ, আবরণাভাব মাত্র আকাশ—এরূপ
উক্তিও যুক্তিযুক্ত নহে; কেননা, আকাশকে প্রাগ্ভাবাদি অভাবত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করা
যায় না। পৃথিব্যাদির আবরণের সম্বা উপলব্ধি হয়। তাহার অপ্রতীতি প্রসঙ্গ হেতু
(অভাব বশতঃ) বিশ্ব নিরাকাশ হয়। এদিকে আবার আকাশের সম্বার বিষয় অঙ্গীকার
করিলে সম্বস্তুর অপ্রতীতিবৎ পৃথিব্যাদিরও অপ্রতীতি প্রতিপন্ন হয়। উহাকে (আবরণাভাব
রূপ আকাশকে) অজ্ঞোজ্ঞাভাবও মনে করা যাইতে পারে না। অজ্ঞোজ্ঞাভাব আবরণেরই
অন্তর্গত। তাহা স্বীকার করিলে পৃথিবী-মধ্যগত আকাশের অপ্রতীতি-প্রসঙ্গ দোষ ঘটে।
এ পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। যেখানে আবরণের অভাব, সেখানে যদি আকাশের কর্তন
করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে আকাশের বস্তুভূতত্ব স্বীকার করিতে হয়। তদনুসারে
আকাশ যে আবরণাভাবরূপ একটী বস্তু, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে আকাশ অভাব-
ভূত পদার্থ না হইয়া পৃথিব্যাদির জ্ঞায় ভাবভূত পদার্থই সমগ্রমাণ হইয়া যায়। সে হিসাবে
আকাশকে কখনই নিরূপাখ্য বা শূন্য বলা যাইতে পারে না।’

যে কণিকবাদ লইয়া গবেষণার অবধি নাই, পঞ্চবিংশ সূত্রের অনুসরণে সে কণিক-
বাদেও দোষ প্রদর্শিত হইতেছে। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের উক্তি, বেদান্ত-দর্শনের
সূত্র ও তাহার ভাষ্য পর্যায়ক্রমে নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল। বলা,—

“অথ ভাবস্ত কণিকত্বং দৃশ্যতি ।

‘অনুস্মতেশ্চ ॥’ ২৫ ॥”

“পূর্কানুভূতবস্তুবিষয়া বীরনুস্মৃতিঃ । প্রত্যাভিজ্ঞেতি যাবৎ । সমস্তং বস্তু তদেবেদ-
মিতি পূর্কানুভূতমনুসন্ধীরতেততঃ কণিকত্বং ভাবস্য ন । ন চ সেয়ং গজা

তদ্বিধং দীপার্জিরিতিবৎ সাদৃশ্যনিবন্ধনা ন তু বৈজ্ঞান্যনিবন্ধনা সেতি বাচ্যং সাদৃশ্য-
 গ্রহীতুরেকস্য স্থায়িনো ভাবেন তদযোগাৎ। কিঞ্চ বাহ্যে বস্তুনি কদাচিৎ সংশয়ঃ
 জ্ঞানদেবেদং তৎসদৃশং বেতি। আত্মনি তুপলঙ্ঘরি ন কদাচিৎ অজ্ঞানভূত-
 হস্তস্বত্বাসম্ভবাৎ। ন চ সম্ভাবনৈক্যং নিয়ামকং স্থায়িসম্ভাবনস্বীকারে স এব
 স্থির আত্মোক্তি মতান্তরাপত্তেঃ। অস্বীকারেহন্যস্বত্যাসিদ্ধেঃ। অপি চ কিং নাম
 কণিকত্বম্। কিং কণসম্বন্ধঃ কিং বা কণেনৈবোৎপত্তিবিবাক্যো। ন তাবাদাত্তঃ-
 স্থায়িনঃ কণসম্বন্ধসম্ভবাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ প্রত্যক্ষবাধ্যাৎ। এতেন দৃষ্টিসৃষ্টিরপি
 নিরাকৃত্য। অজ্ঞাপ্যার্থাৎ কণিকত্ব স্বীকারাৎ। তস্মিন্ন কণিকো ভাবঃ ॥ ২৫ ॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ,—‘অনুস্মৃতি বলিতে পূর্বানুভূত বস্তু-বিষয়িণী ধী (বুদ্ধি) বুঝিতে হইবে।
 ঐ শব্দে প্রত্যভিজ্ঞা বুঝায়। সমস্ত বস্তু পূর্বানুভূত—এই জ্ঞানে যে পূর্বানুভূতত্ব ভাব আসে,
 তাহাতে কণিক ভাব বার্থ হয়। এই সেই গঙ্গা, ঐ সেই দীপশিখা ইত্যাদি প্রতীতি-
 সাদৃশ্য-নিবন্ধনা, পরন্তু ঐক্য-নিবন্ধনা নহে—এরূপ কখনই সিদ্ধান্ত হয় না। স্থায়িতাব
 ভিন্ন সাদৃশ্য-গ্রহীতার পূর্বানুস্মৃতি জন্মে না। বাহ্য-বস্তুতে কখনও কখনও সংশয় হইলেও
 হইতে পারে; ইহা কি সেই বস্তু বা ইহা তৎসদৃশ বস্তু—এরূপ সংশয় বস্তুবিশেষে ঘটিতে
 পারে। কিন্তু উপলব্ধি-কর্তার আত্মাতে সে সংশয় সম্ভবপর নহে। অজ্ঞোত্তমভূত পদার্থে
 অজ্ঞের অনুস্মৃতি অসম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সম্ভাবনৈক্যই (জ্ঞানধারার একতাই) যে
 বুদ্ধিনিয়ামক হইবে, তাহা বলা যায় না। জ্ঞানধারার স্থায়িত্ব-স্বীকারে আত্মার স্থিরত্ব
 উপপত্তি হয়। কিন্তু স্থির আত্মা বৌদ্ধগণ অস্বীকার করেন। অস্বীকারের অরুণই
 অসিদ্ধ। কণিকত্বই বা কাহাকে কহে? কণসম্বন্ধ-হেতু কণিক অথবা কণে উৎপত্তি-
 বিনাশের নামই কণিক। কণিক-সম্বন্ধ-হেতু কণিক সংজ্ঞা সম্ভব হয় না। কেননা,
 স্থায়িবস্তুও কণ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়। আবার, ক্রমে উৎপত্তি কণে বিলয় হেতু কণিক
 সংজ্ঞা—এবমিধ দ্বিতীয় সিদ্ধান্তও অসম্ভব। উহাতে প্রত্যক্ষের বাধ্য জন্মে। ইহাতে দৃষ্টিসৃষ্টিও
 নিরাকৃত হয়। সে মতে কণিকত্ব স্বীকার অর্থতঃ নামে মাত্র দেখিতে পাই। এই সকল
 কারণে কণিকভাব যুক্তিতে তিষ্ঠিতে পারে না।’

ইহার পর সৌত্রাস্তিকগণের একটা বিশেষ মত খণ্ডন করা হইতেছে। সে মত
 এই যে, জ্ঞানে পীতাদি বর্ণ ও আকার সমর্পিত হইলে, সেই জ্ঞানগত আকার পদার্থ-নামের
 পরও অন্তরে বিদ্যমান থাকে। এতদনুসারে অর্থ-বৈচিত্র্য দ্বারাই জ্ঞান-বৈচিত্র্য সাধিত হয়।
 সৌত্রাস্তিকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। যদ্বিংশ সূত্রে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে।
 এ বিষয়ে পূর্বপক্ষরূপে ভাষ্যকারের উক্তি এবং সূত্র ও তত্ত্বাশ্বে তাহার উত্তর; যথা,—

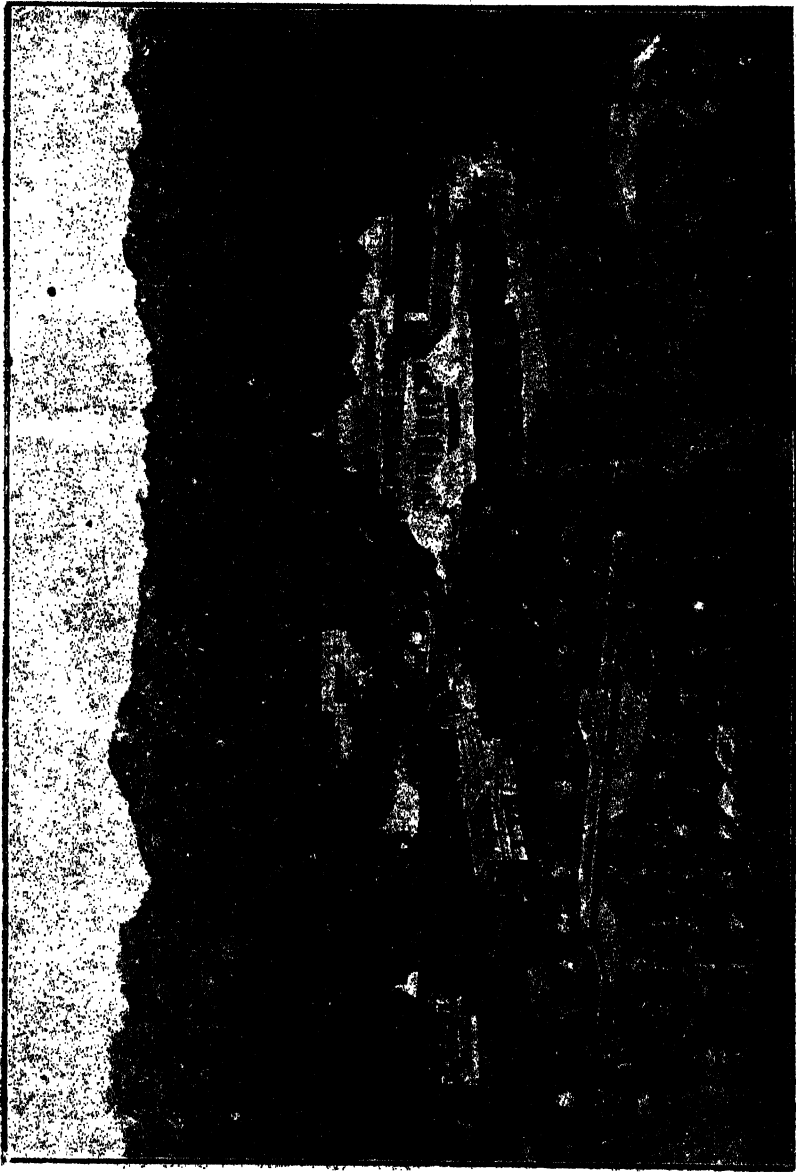
“স্বকীয়ং পীতাত্মকায়ং জ্ঞানে সমর্প্য বিনষ্টোহপ্যর্থো জ্ঞানমতেন পীতাত্মকারণামু-
 নীয়তে। অতোহর্থবৈচিত্র্যাক্রান্তমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি সৌত্রাস্তিকমতং দৃশ্যতি।

‘নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ॥’ ২৬ ॥”

“অসতো বিনষ্টস্ত পীতাত্মকস্ত পীতাদিরাক্যো জ্ঞানে ন সম্ভবতি। কূতঃ অদৃষ্টত্বাৎ।

ধর্ম্মিণি বিনষ্টে ধর্ম্মজ্ঞাত্ত্বয় সম্বন্ধাদর্শনাৎ। ন চানুমেয়ো ঘটাদিন তু প্রত্যক্ষ ইতি শক্যং

পৃথিবীর ইতিহাস।



আবু-পর্বতস্থ দিলওয়ারা মন্দির।

ভণিতুম্ । প্রত্যক্ষণ জানানীতি প্রতীতৈত্ব তন্নিরাসাদিতি সৌত্রান্তিকাসাধারণো

দোষঃ । তন্মুৎ প্রত্যক্ষো ঘটাদিন তু জ্ঞানগতেন তদাকারেণাহমীয়েতে ইতি ॥ ২৬ ॥”

অর্থাৎ,—‘অদৃষ্ট-হেতু অসত্তের সম্ভাবনা নাই; অসৎ অর্থ—বিনাশ-প্রাপ্ত । বাহ্য অসৎ, তাহার বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী । পীতাদি অসৎ বস্তুর যে পীতাদি আকার, সেই আকার জ্ঞানে থাকা সম্ভব নহে । উহা যখন অদৃষ্ট, তখন উহার বিদ্যমানতার অভাব । যে বস্তু যে ধর্ম্মাক্রান্ত, সে বস্তু বিনষ্ট হইলে তদ্বর্ণের সম্বন্ধ অস্তিত্ব অদৃষ্ট বলিতে পারা যায় । ঘটাদি প্রত্যক্ষ পদার্থকে, উহা প্রত্যক্ষ নহে—অনুমেন, এরূপ বলিতে পারি না । বাহ্যকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার প্রতীতি দ্বারাই বিপরীত মত নিরাস হয় । সৌত্রান্তিকগণের এবিধ ভ্রান্তি গুরুতর বলিয়া মনে হয় । প্রত্যক্ষীভূত ঘটাদি জ্ঞানগত তদাকারে অনুমেন, এরূপ উক্ত কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে ।’

এইরূপে বুঝা যায়, ক্ষণিক বলিলেও দোষ আসে, অসত্তে সত্তের আরোপেও ত্রুটি ঘটে । সপ্তবিংশতি সূত্রে উভয়বিধ দোষের বিষয় ব্যক্ত হইতেছে । সূত্র ও তত্ত্বাশ্রয়; যথা—

“উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥”

“এবং ভাবক্ষণিকতয়াসহৃৎপত্তৌ স্বীকৃত্যামুদাসীনানামুপায়শূন্যানামপ্যুপেয়সিদ্ধিঃ স্তাৎ ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবমাত্রস্ত পরক্ষণস্থিত্যভাবাদিষ্টানিষ্টাপ্তিপরিসারমোলোকদৃষ্টমোরহেতুকত্ব-মতোহুপায়বতামপি তৎপ্রাপ্তিঃ স্তাৎ । উপেয়লিপ্সুঃ কশ্চিদপি কুত্ৰাপ্যুপায়ে ন প্রবর্তেত স্বর্গায় মোক্ষায় বা ন কোহপি প্রযতেত । ন চৈবমস্তি সর্বস্থাপ্যুপেয়ার্থিনঃ সোপায়তা তন্মৈবোপেয়লাভশ্চ প্রতীয়তে । তস্মাদ্বিশ্বপ্রতারার্থমতয়োঃ প্রবৃতিঃ ।

যৌ কিল ভাবভূতস্বক্কেহেতুকাং সমুদায়োৎপত্তিং স্বীকৃত্যপি পুনরভাবাত্তাবোৎপত্তিমুচুতঃ

ক্ষণিকানামপ্যাশ্রয়ানাং স্বর্গাপবর্গসাধনান্যুপাদিশিতুরিতি তুচ্ছত্বং সিদ্ধান্তঃ ॥ ২৭ ॥”

অর্থাৎ,—‘ভাব-পদার্থ’ ক্ষণিক হইলে অসৎ হইতে সত্তের উৎপত্তি স্বীকার আবশ্যক হয় । আর তাহাতে উপায়শূন্য উদাসীনের উপেয়-সিদ্ধি ঘটয়া যায় । ক্ষণভঙ্গবাদে ভাবমাত্রের উৎপত্তি-মাত্রেই অভাব ঘটে । তাহাতে ইষ্টানিষ্টপারিসার-রূপ লোকদৃষ্ট-হেতু বৃথা হইয়া আসে । তাহাতে নিকৃপায়ের স্বতঃই উপায় হইয়া যায় । এ মত মানিতে গেলে, কেহ আর উপায়লিপ্সু হইয়া উপায়ে প্রবৃত্ত হইবে না; কেহই আর স্বর্গাপবর্গলাভের নিমিত্ত যত্নবান রহিবে না । কিন্তু তাহাই কি রীতি? তাহাই কি শিক্ষা? সকলেই উপেয়ার্থী হইয়া উপায়ের জন্ত প্রযত্নপর । উপায়ই উপেয়-প্রাপ্তির হেতুভূত । এইরূপে বুঝা যায়, কেবল বিদ্রাস্ত করাই ঐ মতের লক্ষ্য । ভাবভূতস্বক্কেহেতুক সমুদায়োৎপত্তি স্বীকারের পর পুনরভাবাত্তাবোৎপত্তি অর্থাৎ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি পরিকল্পিত হয়; অপিচ, ক্ষণিক আশ্রয় স্বর্গাপবর্গ-সাধনের উপদেশ দেওয়া হয় । এই সকল কারণে তাহাদিগের মত তুচ্ছ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয় ।’

এবম্প্রকার বিতর্কের ফলে বৈভাবিক ও সৌত্রান্তিকের মত খণ্ডন করা হয় । তৎপরে এক্ষণে বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচারের মত নিরাসের জন্য অস্ত্ররূপ যুক্তি গৃহীত হইতেছে । কথিত হয়, বাহু-বস্তুতে অভিনিবিষ্ট শিষ্য-বিশেষের অনুমোদ-ক্রমে বাহ্যার্থ-প্রক্রিয়া-সূচক এই

মত স্মৃগত যুনি প্রবর্তিত করেন। পরন্তু ঐ মত তাঁহার অভিপ্রায়-সম্মত ছিল না। কেন-না, অল্প সকল স্বক্কের তাৎপর্য্য এই বিজ্ঞান-স্বক্কে মধ্যে নিবিষ্ট। বিজ্ঞের ঘটাদি বিজ্ঞানান্তি-রিত্ত নহে। উহাই (বিজ্ঞানই) অর্থাকারে পরিকল্পিত; তদ্ব্যতীত ব্যবহার-সিদ্ধি অসম্ভব ও স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। বাহ্যার্থান্তিবাদীরা জ্ঞানে অর্থাকারত্ব ধর্ম্ম স্বীকার করেন। নচেৎ, ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান ব্যবহার উপপত্তি হয় না। একূপ হইলে, জ্ঞান দ্বারা ব্যবহার-সিদ্ধি ঘটিলে, বাহ্য বস্তুর অঙ্গীকারে কি প্রয়োজন? আন্তর জ্ঞানে ঘট-পর্কতাদির আকার সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না। জ্ঞান প্রকাশমান; নিরাকারের প্রকাশ সম্ভবপর নহে। এ মতে জ্ঞানের সাকারত্ব স্বীকার করিতে হয়। বাহ্যবস্তুর অভাবে বুদ্ধি-বৈচিত্র্য ঘটিলে পারিবে না, একূপ সংশয়-স্থলে বাসনা-বৈচিত্র্য হইতে বুদ্ধি-বৈচিত্র্যের সম্ভাবনাও মনে করা যায়। বাসনা-হেতুক বৈচিত্র্যকে অন্তর-ব্যতিরেকে অবধারণ করা যাইতে পারে। জ্ঞান জ্ঞেয়-পদার্থের সহোপলব্ধ নিয়ম হেতু জ্ঞানজ্ঞেয়-পদার্থের অভেদ সূচিত হয়। জ্ঞানাত্মকই জ্ঞেয় বস্তু। সর্ববস্তু জ্ঞানাত্মক—একূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত কি না, সংশয় হইতে পারে। কিন্তু স্বপ্নবৎ অর্থ ব্যতিরেকে ব্যবহার-সিদ্ধি হেতু পৃথক বলিয়া অঙ্গীকার করিলেও, ফলে অনতিরিক্ত দর্শন যে জ্ঞানাত্মক, তাহা যুক্তিযুক্ত সপ্রমাণ হয়। এই প্রকারে পূর্বপক্ষ খ্যাপন করিয়া অষ্টাবিংশতি সূত্রের অবতারণায় তদ্ব্যযো এ মতের খণ্ডন করা হইতেছে। পূর্বপক্ষ, সূত্র ও ভাষ্য যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

“তদেবং বৈভাষিকে সৌত্রান্তিকে চ নিরন্ত্রে বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচারঃ প্রত্যবর্তিত্তে।
 বাহ্যে বস্তুভূতিনিবেশমানান্ কাংশ্চিচ্ছিয়ানমুক্ষ্য বাহ্যার্থপ্রক্রিয়েয়ং স্মৃগতেন রচিতা।
 তস্তাং ন তস্তাশয়ঃ বিজ্ঞানস্বক্কেমাত্রতাৎপর্যাৎ। তথাহি বিজ্ঞেয়ে ঘটাত্ত্বার্থো বিজ্ঞানান্নান্তি-
 রিচ্যতে। তন্ত্বেবার্থাকারত্বাৎ। ন চার্থান্ বিনা ব্যবহারাসিদ্ধিঃ তান বিনাপি স্বপ্নবৎ
 সিদ্ধেঃ। বাহ্যার্থান্তিভবাদিনাপি জ্ঞানেহর্থাকারত্বং ধর্ম্মোহবশ্যং মতব্যঃ। কথমন্তথা
 ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমিতি ব্যবহারোপপত্তিঃ। তথা চ তেনৈব তৎসিদ্ধৌ কিমর্থঃ। নস্মু
 কথমাস্তরং জ্ঞানং ঘটপর্কতাত্ত্বাকারকম্। মৈবম্। জ্ঞানং কিল প্রকাশমানম্। নির-
 কারস্ত তস্য প্রকাশাসম্ভবাৎ সাকারমেব তৎ। নস্মু কথমসতি বাহ্যেহর্থোবৈচিত্র্যম্।
 বাসনাবৈচিত্র্যাদ্ভবেৎ। বাসনাহেতুকস্ত তদ্বৈচিত্র্যাত্ত্বয়ব্যতিরেকাত্মমবধারণাৎ।
 জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ সহোপলব্ধনিয়মাদপি ন জ্ঞেয়ং জ্ঞানান্তিরম্। কিন্তু জ্ঞানাত্মকমেবেতি।
 ইহ সংশয়ঃ। সর্বজ্ঞানাত্মকমিতি মুজ্যতে ন বেতি স্বপ্নবদ্ভিনাপ্যর্থান্ জ্ঞানেনৈব
 ব্যবহারসিদ্ধেঃ পৃথক্ তদঙ্গীকারে ফলানতিরেকাচ্চ মুজ্যতে ইতি প্রাপ্তে—”

‘নাভাব উপলক্ষে: ॥ ২৮ ॥’

“নাভাব উপলক্ষে:”—এই সূত্রের ভাষ্য; যথা,—

“বাহ্যার্থান্ত্যভাবো ন শক্যো বস্তুম্। কুতঃ উপলক্ষে:। ঘটস্ত জ্ঞানমিত্যাদৌ
 জ্ঞানাত্ত্বার্থস্তোপলব্ধাৎ। ন চোপলব্ধমপলপন্ গ্রাহ্যবাক্ প্রেক্ষাবতাম্। ন চ
 নাহমহং নোপলভে অপি তু জ্ঞানাত্ত্বং নোপলভে ইতি বাচ্যম্। উপলব্ধিবলেনৈব
 তদন্ততারা গলে নিপাতনাৎ। ঘটমহং জ্ঞানামীত্যাদৌ জ্ঞানাত্ত্বার্থং সাক্ষর্যকং

সকলকণ্ঠ সর্বো লোকঃ প্রত্যোতি প্রত্যায়য়তি চাভান্ । তেন জ্ঞানমাত্রং সাধয়ন্
সকলোপহাসহেতুরিতি ভিন্নোহর্থো জ্ঞানাৎ । নহু জ্ঞানান্ত্রুশ্চেষ্টাদিস্তত্ত্ব প্রকাশঃ
কথং জ্ঞানে চেৎ তর্হৌকশ্মিন্ সর্বত্র প্রকাশঃ ত্রাৎ অন্ত্রাবিশেষাদিতি চেন্ন ।
ভক্তিরেহপি তস্মিন্ যত্র বিষয়তাত্পাঃ সম্বন্ধস্ত্রৈব নান্ত্রুশ্চেতি ব্যবস্থানাৎ ।
পীতরক্তাদি বিষয়কসমূহালব্ধনস্ত্র বিবক্ষনানাপীতাদ্যাকারাসম্ভবাচ্চ । যন্তু সহোপ-
লব্ধনিয়মাদর্থো জ্ঞানান্ত্রুশ্চেতি তদসৎ সাহিত্যস্বার্থভেদহেতুকত্বাৎ । ততশ্চ তয়ো-
স্তম্মিয়মো হেতুকলভাবনিমিত্তো মন্তব্যঃ । কিঞ্চ বাহুমর্থং নিরন্ত্রতা সৌগতেন তন্ত্র
পৃথকসম্বৎ স্বীকৃতম্ । যন্তদন্ত্রজ্ঞেয়ং রূপং তদ্বহিবদবভাসত ইতি তদ্ব্যক্তেঃ । অন্ত্রথা
বৎকারণাসম্ভবঃ । নহি বক্ষ্যাপুত্রো বক্ষ্যাপুত্রবদिति কশ্চিদাচক্ষীত ॥ ২৮ ॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ,—বাহ্যার্থের অভাব স্বীকার করিতে পারা যায় না । যেহেতু উহা উপলব্ধি
হইতেছে । ‘ঘটের জ্ঞান’ ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানাভীত অন্ত্র বস্তু উপলব্ধ হয় । প্রত্যক্ষের
যে উপলব্ধি, তাহা অপলাপ করিলে, সে অপলাপ জ্ঞানিগণের অগ্রাহ্য হয় । আমি অন্ত্র বস্তু
উপলব্ধি করিতে পারি না অথবা জ্ঞানাতিরিক্ত অন্ত্র বস্তু আমার উপলব্ধ হয় না,—এবম্প্রকার
উক্তি এ ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য । জ্ঞানে উপলব্ধ হয় না,—এতদ্বাক্য ব্যবহারেই জ্ঞানাভীত বাহ্য
বস্তু বোধ সিদ্ধ হয় । ‘আমি ঘট জানি’—ইত্যাদি জ্ঞা-ধাতুৎ বাক্য সাক্ষ্যক, সাক্ষ্যক এবং
সর্বলোক-প্রত্যয়ের হেতুভূত । জ্ঞা-ধাতুতে জ্ঞানমাত্র ব্য়ায়—এ কথা বলিলে, উপহাসাস্পদ
হইতে হয় । ঘটাদি বস্তু জ্ঞান হইতে অভিন্ন বলিতে গেলে, জ্ঞানে উহার প্রকাশ কি প্রকারে
সিদ্ধ হয় ? এইরূপে ঘটের জ্ঞান অস্বীকার করিলে সকল বস্তুরই জ্ঞান অস্বীকার করিতে
হয় । কারণ, ব্রহ্মাণ্ডের সকলই জ্ঞান হইতে ভিন্ন প্রতাপন্ন হয় । অতএব ঐ প্রকার
যুক্তি অসঙ্গত । জ্ঞানের সহিত বাহার সম্বন্ধ হইবে, তাহাই জ্ঞানে প্রকাশ পাইবে ।
ভিন্ন অন্ত্র কিছু জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইবে না । ইহা ভিন্ন অন্ত্র ব্যবস্থা হইতে পারে না ।
পীতরক্তাদি-বিষয়ক সমূহালব্ধন অর্থাৎ সমষ্টিভাবে পীতরক্তাদির জ্ঞান, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন
পীত-রক্তাদির আকারেও সম্ভব হয় বটে ; কিন্তু তদ্বারা সমূহালব্ধনে সমষ্টিতে নানাব-
ভাব আসিতে পারে না । বাহার বলেন, যখন জ্ঞান ও বিষয়ের পরস্পর কার্যকারণভাবে
লক্ষ্য হয়, তখন বিষয় ও জ্ঞান অভিন্ন ; কিন্তু তাঁহাদের সে মতও যুক্তিযুক্ত নহে ।
কেন-না, সাহিত্য অর্থ—ভেদজ্ঞানেরই বোধক । এ বস্তু অন্ত্র বস্তুর সহিত বিদ্যমান আছে
বলিলে, দুই বস্তুর স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি হয় । এই সকল কারণে হেতুভাব ও ফলভাব বোধক
বলিয়া ঐ নিয়মকে স্বীকার করিতে হইবে । সৌগতমতাবলম্বিগণ বাহ্য অর্থ—বাহ্য বস্তু
নিরাস করিয়া তাহার পৃথক সত্ত্বা অঙ্গীকার করেন । বাহ্য অন্তর্গত জ্ঞেয়রূপ, বহির্ভাগে
তাহারই বিকাশ—এবমিধ উক্তি বিবিধ-ভাব-প্রকাশক । বাহ্য অন্তর্গত জ্ঞেয়রূপ, তাহা
বাহ্য-বস্তুর জ্ঞান প্রকাশমান,—এই ‘বাহ্য’ ও ‘তাহা’ শব্দই ও তদ্যবধি পৃথক সত্ত্বা প্রকাশ
করে । ‘বহিবদবভাসত’ অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর জ্ঞান প্রকাশমান—এতদন্তর্গত ‘বৎ’ বা
‘জ্ঞান’ শব্দ দ্বারা ই-ভাব ধ্যাপন করা হইতেছে । ‘বক্ষ্যাপুত্র’ কখনও ‘বক্ষ্যাপুত্রের জ্ঞান’
এরূপ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয় না ।

এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। স্বপ্নে অনেক পদার্থ মানসপটে উদয় হয়। অনেক সময় সে সকল পদার্থ অলীক বাসনাহেতুক। সংসারে নিত্য-দৃশ্যমান পদার্থকেও সেইরূপ মনে করা যাইতে পারে। বাহ্য ভিন্ন বাসনা-জনিত জ্ঞান-বৈচিত্র্য স্বপ্নে যে ব্যবহার আনয়ন করে, জাগ্রৎ অবস্থাতেও সেই ব্যবহার পরিকল্পিত হউক ;—এবম্বিধ যে বৌদ্ধমত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস দেখি ; উনত্রিংশ সূত্রে সে মতের নিরাস করা হইয়াছে। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের উক্তি, বেদান্ত-দর্শনের উনত্রিংশ সূত্র ও সেই সূত্রের ভাষ্য নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ; যথা,—

“অথ ব্যাহার্যানু বিনাপি বাসনাহেতুর্জ্ঞানবৈচিত্র্যোণ স্বপ্নে যথা
ব্যবহার এবং সর্বং জাগরেহপি স্যাতিতি দৃষ্টান্তেন সাধিতং দৃশ্যতি ।

‘বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২২ ॥’

“চন্দ্রকোহবধারণে। স্বপ্নে মনোরথে চ যথা ঘটান্তর্থাকারকজ্ঞানমাত্রসিদ্ধো ব্যবহারস্তথা
জাগরেহপি ভবেদিত্যেতত্ত্ব সম্ভবতি। কুতঃ বৈধর্ম্যাৎ। স্বপ্নজাগরণপ্রাপ্তয়োর্ব্যস্তনোরসা-
ধর্ম্যাংদেব স্বপ্নে খন্ডভূতঃ স্রষ্টব্যতে জাগরে তু প্রত্যক্ষোণানুভূয়তে। স্বপ্নোপলব্ধং কণদ্বয়-
মাত্রোণানুভূতদ্ব্যবহতি বাধিতঞ্চ বোধে। জাগরোপলব্ধং তু বর্ষশতানন্তরমপি তদ্ব্যবহতি-
বাধিতক্ষেতি। কিন্তু সপ্নেহানুভূতং স্রষ্টব্যত ইতি প্রত্যাভিমান্যং বোধাম্। স্বমতস্ত্ব স্বমাত্রানু-
ভাব্যং তাবন্মাত্রসময়ং বস্ত্ত স্বপ্নে পরেশঃ সৃজতীতি সঙ্কো সৃষ্টিরাহ হীত্যাদিনা বক্ষ্যতে ॥২২॥”

ভাষ্যের তাবার্থ,—‘বৈধর্ম্যা’ হেতু স্বপ্নাদিবৎ অবধারণ করা যায় না। স্বপ্নে ও মনোরথে ঘটাদির জ্ঞান যেরূপ হয়, জাগরণে ব্যবহার-কালে সেরূপ স্বীকার করা যায় না। উভয়কালে স্বপ্নে ও জাগরণে সম্পূর্ণ বৈধর্ম্যা দৃষ্ট হয়। স্বপ্নজাগরণ-প্রাপ্ত বস্ত্তর মধ্যে স্বাধর্ম্যা নাই। স্বপ্নে পূর্কানুভূত বিষয় স্থিতিপথে উদয় হয় ; জাগরণে প্রত্যক্ষের অনুভূতি ঘটে। স্বপ্নোপলব্ধ পদার্থাদি কণদ্বয়মাত্রে ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নাপগমে সে ভাব বাধিত বা লোপপ্রাপ্তও হইতে পারে। জাগ্রদবস্থায় পরিদৃষ্ট বস্ত্তর ভাব শতবর্ষ পরেও রূপান্তর-প্রাপ্ত হয় না। আরও, স্বপ্নে অনুভূত বস্ত্ত যে পূর্কদৃষ্ট বস্ত্তর অনুসরণ, এরূপ বলিলে প্রত্যাভিমান্য বোধগম্য হয়। কিন্তু তাহা উহাদের স্বমত নহে। স্বপ্নদৃষ্ট বস্ত্ত তৎকালে পরমেশ্বর কর্ত্ত্বক সৃষ্ট হইয়াছিল, ‘সঙ্কো সৃষ্টিরাহ হি’ ইত্যাদি বাক্যে বুঝিতে পারা যায়।’

আরও এক কথা, বস্ত্তর সত্ত্বা ভিন্ন বাসনা-বৈচিত্র্য-হেতু যে জ্ঞানবৈচিত্র্য সিদ্ধ হয়, এতদুক্তিও সমীচীন নহে। ত্রিংশ সূত্রে সেই মতের নিরাস হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভাষ্য-কারের উক্তি, সূত্র ও তাহার ভাষা পর্যায়ক্রমে নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ; যথা,—

“যন্তৃত্ত্বং বিনাপার্থানু বাসনাবৈচিত্র্যাজ্জ্ঞানবৈচিত্র্যমুপ-

পত্তত ইতি ভিন্নিরায়াহ ।

‘ন ভাবোহমুপলব্ধে ॥ ৩০ ॥’

“বাসনানাং ভাবো ন সম্ভবতি। কুতঃ অনুপলব্ধে তন্মতে বাহার্থপ্রাপ্তেঃ। অর্থমূল

কিল বাসনার্থাঘরব্যতিরেকসিদ্ধা। তব স্বর্থানঙ্গীকারাৎ সা ন সম্ভবেৎ ॥ ৩০ ॥”

অর্থাৎ,—‘অনুপলব্ধি’ হেতু সত্ত্বা স্বীকার করা যায় না। বাসনার সত্ত্বা সম্ভব নহে। উহা

অনুপলব্ধ। সে মতে বাহ্যার্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অর্থহীনা বাসনা, অর্থাহার-ব্যতিরেক-
ভিন্ন বাসনা সিদ্ধ হয় না। অঙ্গীকার করিলেও বাহ্যার্থের অভাবে বাসনা অস্তিত্বহীন হয়।

আরও, বাসনা সংস্কার-বিশেষ। স্থির আশ্রয় ব্যতীত তাহার অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে।
একত্রিংশ সূত্রে এ তত্ত্ব বিশদীকৃত। ভাষ্যকারের উক্তি, সূত্র ও ভাষ্য যথাক্রমে ; যথা,—

“কিঞ্চ বাসনা নাম সংস্কারবিশেষঃ । স চ স্থিরমাশ্রয়ং বিনা ন সমন্তীত্যাহ ।

‘কণিকত্বাচ্চ ।’ ৩১ ॥

“নেত্যানুবর্ততে। বাসনাশ্রয়ঃ স্থিরঃ পদার্থো নৈব তেহন্তি। কৃতঃ কণিকত্বাৎ ।

প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্থানবিজ্ঞানস্ত চ সর্বস্ত কণিকত্বাঙ্গীকারাৎ । ন হি ত্রিকালস্থির-
সম্বন্ধিনি চেতনেহসতি দেশকালনিমিত্তসাপেক্ষবাসনাদ্যানশ্রয়াদিব্যবহারঃ সম্ভবেৎ ।

তথা চাশ্রয়াভাবায় সা তদভাবাচ্চ ন তদ্বৈচিত্র্যমিতি তুচ্ছে। বিজ্ঞানমাত্রবাদঃ ॥ ৩১ ॥”

অর্থাৎ,—‘বাসনা যখন সংস্কার-বিশেষ, তখন স্থির আশ্রয় ভিন্ন উহার অস্তিত্বাভাব স্বীকার
করিতে হয়। কণিকবাদ হিসাবেই এই মত দৃঢ় হয়। যখন সকলই কণিক, তখন
বাসনার আশ্রয় সেই স্থির পদার্থ কোথায় রহিল? প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান, আলয়-বিজ্ঞান—সকলই
কণিক বলিয়া অঙ্গীকৃত। ত্রিকাল-স্থির-সম্বন্ধী চেতন পদার্থ না থাকিলে দেশকাল-
নিমিত্ত-সাপেক্ষ বাসনা-দ্যান-শ্রয়াদির ব্যবহার অসম্ভব। সুতরাং আশ্রয়-ভাব না থাকায়
বাসনারও অভাব ঘটে। তাহার অভাবে তদ্বৈচিত্র্য এবং তজ্জনিত জ্ঞান-বৈচিত্র্য কিছুই
উপলব্ধি হয় না। সুতরাং বিজ্ঞানবাদ হের বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।’

এই প্রকারে যোগাচারবাদ খণ্ডন করিয়া শূন্যবাদী মাধ্যমিক মত খণ্ডিত হইয়াছে।
সে মতের সারতত্ত্ব-বিসৃতি উপলক্ষে ভাষ্যকার পূর্বপক্ষ রূপে প্রথমে বলিতেছেন,—

“এবং যোগাচারেহপি নিরন্ত্রে সর্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকঃ প্রতিপত্ততে। বুদ্বেন
বাহ্যার্থান্ বিজ্ঞানকালীকৃত্য বিনেয়বুদ্ধ্যারোহায় সোপানবতস্ত কণিকত্বাদি কল্পিতম্ ।

ন তু তে তচ্চ বর্ত্তন্তে । শূন্যমেব তত্ত্বং তদাপত্তিরেব মোক্ষ ইত্যেব তদন্তরহন্তম্ ।

যুক্তক্লেতৎ । শূন্যত্বাহেতুসাধ্যত্বেন স্বতঃসিদ্ধেঃ । সতো হেতুপেক্ষিণোহপ্যুৎপত্ত্যানিরূপ-
ণাচ্চ । তথাহি । ন ভাবস্তাবাহুৎপত্তিঃ সতঃ । অনষ্টাদ্বীজাদিতোহঙ্কুরাচ্চাৎপত্ত্যদর্শনাৎ ।

নাপাত্যভাবাৎ । নষ্টাদ্বীজাদিতো জাতশ্চাঙ্কুরাদেনিরূপাখ্যাতাপাতাৎ । ন চ স্বতঃ ।

আত্মাশ্রয়তাপত্তেরানর্থক্যাচ্চ । ন তু পরতঃ । পরত্বাবিশেষণে সর্বস্মাৎ সর্বোৎপত্তি-
প্রসঙ্গাৎ । এবমুৎপত্ত্যভাবাদিনাশাভাবঃ । তস্মাচ্চাৎপত্তিবিনাশসদসদাদিকং বিভ্রমমাত্র-
মতঃ শূন্যমেব তত্ত্বমিতি । ইহ সংশয়ঃ । শূন্যমেব তত্ত্বমিতি যুক্তং ন বেতি । শূন্যত্ব স্বতঃ-
সিদ্ধেরিতরেবাং পদার্থানাং ভ্রান্তিবিজ্ঞুভিত্ত্যেনাসম্বাচ্চ যুক্তমিতি প্রাপ্তে নিরস্তম্ভি ।”

অর্থাৎ,—‘অতঃপর যোগাচারবাদীদিগকে নিরস্ত করিয়া, সর্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকাদিগের
মতের প্রতিবাদ করা হইতেছে। বুদ্বদেব কর্তৃক বাহ্যার্থ ও বিজ্ঞান—স্বীকৃত হওয়ার পর
বিনেয়বুদ্ধিতে আরোহণের সোপানরূপ কণিকত্বের কল্পনা দেখিতে পাই। মাধ্যমিকগণের
মধ্যে সে ভাব বিদ্যমান নাই। অর্থাৎ, বাহ্যার্থ বা বিজ্ঞান তাঁহার স্বীকার করেন না।
শূন্যই তত্ত্ব আর তদাপত্তিই মোক্ষ,—ইহাই সে মতের রহস্য। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের যুক্তি

এই যে, অহেতু সাধ্যের জন্যই শূন্য স্বতঃসিদ্ধ। সৰ্বস্ব হেতুপেকী অর্থাৎ কারণান্তরের মুখাপেকী হইলে তাহার সম্ভাব থাকে না ; ফলে উৎপত্তি-নিরূপণ-হেতু সতের সঙ্গে বিষ ঘটে। সুতরাং ভাব-পদার্থ হইতে সতের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। অনষ্ট-বীজে অঙ্কুরোদগম দেখিতে পাই না। আবার একেবারে অভাব (অসৎ অবিস্তমান) হইতেও উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। নষ্টবীজ-জাত অঙ্কুর—ইহাতে নিরূপাখ্য (মিথ্যা) বলিয়া সিদ্ধ হয়। আবার অঙ্কুরের স্বতোৎপত্তি বলা যায় না। তাহাতে আত্মপ্রসূতা ও আনর্থক্য দোষ ঘটে। পর হইতেও উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না। সেরূপ স্বীকারে পরস্বের অবিশেষ হেতু সর্ববস্তু হইতেই সর্ববস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। এরূপে উৎপত্তি-বিনাশ উভয়েরই অভাব ঘটে। এ হিসাবে উৎপত্তি-বিনাশ সং-অসং সকলই বিলম্ব—শূন্যই তত্ত্ব। এ ক্ষেত্রে সংশয় উঠিতে পারে,—শূন্য যে তত্ত্ব, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। মাধ্যমিকেরা তাহাতে বলেন, শূন্য স্বতঃসিদ্ধ, আর তদতিরিক্ত পদার্থ ভ্রান্তি-বিজুস্তিত। সুতরাং, সেই মতই যুক্তিযুক্ত।’ কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের দ্বাত্রিংশ সূত্রে সে মতের নিরাস করা হইতেছে। বেদান্ত-দর্শনের সেই দ্বাত্রিংশ সূত্র ও তাহার ভাষ্য ; যথা,—

“সর্বস্বানুপপত্তেঃ ॥ ৩২ ॥”

“নেতানুবর্তনীয়ম্। শূন্যমিতি বদন্ ভাবমভাবং ভাবাভাবং বা প্রতিপাদয়েৎ। সর্বথা নাভিমত সিদ্ধিঃ। কুতঃ অনুপপত্তেরযুক্তত্বাৎ। তথাহি আদ্যোহ-নিষ্টাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে প্রতিপাদয়িতুর্ভাবস্ত তৎসাধনস্ত চ সম্বাৎ সর্বশূন্যতাহানিঃ। তৃতীয়ে তু বিরোধোহনিষ্টতা চেতি। কিঞ্চ যেন প্রমাণেন শূন্যং সাধ্যং তস্ত শূন্যত্বে শূন্যবাদহানিঃ তস্ত সত্যত্বে সর্বসত্যতাপ্রসঙ্গশ্চেতি দ্বষ্টঃ শূন্যবাদঃ। এবং মিথো বিরুদ্ধত্রিমতীনিরূপণাজগৎপ্রতারকতা বুদ্ধত্বাবসীয়েত। লোকায়তিকাদি মতানি তত্তিতুচ্ছত্বাভগবতা সূত্রাকারেণ প্রত্যাখ্যাতুং নোষ্টকিতানীতি বেদিতব্যম্। এতেন বৌদ্ধ-নিরাসেন তৎসদৃশো মারী চ নিরস্তঃ। ঋণিকত্বমুসৃত্য দৃষ্টি-স্বষ্টিবর্ণনাৎ শূন্যবাদমাপ্রিত্য বিবর্তননিরূপণাচ্চ তস্ত তৎসাদৃশ্যম্ ॥ ৩২ ॥”

অর্থাৎ,—‘সর্বস্বা অনুপপত্তি ঘটিতেছে। উহার যে শূন্য বলেন, উহা ভাব, অভাব বা ভাবাভাব, কিছুই প্রতিপন্ন হয় না। সর্বপ্রকারেই অভিমত অসিদ্ধ হয়। কোনও যুক্তিই যুক্তিযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় না। অদৃষ্ট বা যাহা শূন্য, উহাতে আত্মের অর্থাৎ ভাবরূপস্বের স্বীকারে উহার তাদৃশত্বে অনিষ্ট ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, উহার অভাবরূপস্ব-স্বীকারে প্রতিপাদয়িতার এবং তৎসাধনের সম্বা হেতু সর্বশূন্যত্বের হানি হয়। তৃতীয়ে অর্থাৎ ভাবাভাব সম্বন্ধে বিরোধ ও অনিষ্ট দুই-ই ঘটিতে পারে। অপিচ, যে প্রমাণে শূন্য সাধ্য হয়, সেই প্রমাণের দ্বারা তাহার শূন্যত্বে শূন্যবাদে হানি ঘটে। আরও তাহার সত্যত্ব স্বীকার করিলে সর্বসত্যতাপ্রসঙ্গ-হেতু শূন্যবাদ দ্বষ্ট হয়। এবিধ পরস্পর-বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের নিরূপণে বুদ্ধের জগৎপ্রতারকতাই স্বীকার করিতে হয়। লোকায়ত-দিগের মতের অতিতুচ্ছতা-হেতু ভগবান সূত্রকার তাহার প্রতিবাদের চেষ্টা করেন নাই। যাহা হউক, এই প্রকারে বৌদ্ধমতের নিরাসে তৎসদৃশ মারীবাদীদিগের মতও খণ্ডন

করা হইল,—ইহাই বুঝিতে হইবে। ঋণিকবাদ মতের অনুসরণেই দৃষ্টি-সৃষ্টি বর্ণন এবং শূন্যবাদাশ্রয়ে বিবর্তবাদ-নিরূপণ প্রভৃতি হেতু ঐ সকল মার্যাবাদী সম্প্রদায় বৌদ্ধমতের সহিতই সাদৃশ্য-সম্পন্ন; অর্থাৎ—বৌদ্ধমতের খণ্ডনে ঐ সকল মতও খণ্ডিত হয়।’

সাংখ্যবাদ, আরজুবাদ এবং বিভিন্ন বৌদ্ধমত খণ্ডন পূর্বক অতঃপর জৈনমতে দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। এই উপলক্ষে ভাষ্যকার প্রথমে জৈন-দর্শনের একটা সংক্ষিপ্ত

সার মর্ম প্রদান করিয়াছেন। তাহার পর সেই সকল মতের কি কি জৈনমতের অসামঞ্জস্য আছে, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। “অথ জৈনা দৃশ্যন্তে”—

এবম্প্রকার সূচনা আরম্ভ করিয়া জৈনমতের সার-নিষ্কাশণপূর্বক ভাষ্যকার দেখাইতেছেন,— জৈনগণ কি মত ব্যক্ত করিয়া কিরূপ ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

“তে মন্ততে। পদার্থো দ্বিবিধঃ। জীবোহজীবশ্চেতি। তত্র জীবশ্চেতনঃ কার-
পরিমাণং সাবয়বঃ। অজীবঃ পঞ্চবিধঃ ধর্ম্মাধর্ম্মপুন্দ্রলকালাকাশভেদাৎ। গতি-
হেতুর্ধর্ম্মঃ। স্থিতিহেতুরধর্ম্মশ্চ ব্যাপকঃ। বর্ণগন্ধরসস্পর্শবান্ পুন্দ্রগণঃ। স চ
দ্বিবিধঃ পরমাণুস্তৎসজ্জাতশ্চ। বায়ুগ্নিজলপৃথিবীতমুভুবনাদিকঃ। পৃথিব্যাদিহেতবঃ
পরমাণবো ন চতুর্বিধাঃ কিস্তে কস্বভাবাঃ। স্বভাবপরিণামাত্ম পৃথিব্যাধিক্রপো-
বিশেষঃ। কালস্তৃতীতাদিব্যবহারহেতুরণুশ্চ। আকাশস্তেকোহনন্তপ্রদেশশ্চেতি।
তদেবং ষড়মী পদার্থা দ্রব্যরূপান্তদাত্মকমিদং জগৎ। তেষু চাণুভিন্নানি পঞ্চ-
দ্রব্যগুণন্তিকার্য ইত্যাত্ম্যাস্তে। জীবান্তিকার্যো ধর্ম্মান্তিকার্যোহধর্ম্মান্তিকার্যঃ পুন্দ্র-
লান্তিকার্যঃ আকাশান্তিকার্য ইতি। অস্তিকার্যশ্চোহনেকদেশবর্ত্তিদ্রব্যবাচী।
জীবস্ত মোক্ষোপযোগিতয়া বোধান্ সপ্তপদার্থান্ বর্ণয়ন্তি। জীবাজীবাত্ত্রব্যবসম্ব-
নির্জরবন্ধমোক্ষা ইতি। তেষু জীবঃ প্রাণুক্তো জ্ঞানাদিগুণকঃ। অজীবস্তভোগ্য-
জাতম্। আত্মবতানেন জীবো বিষয়েষিত্যাশ্রব ইন্দ্রিয়সজ্জাতঃ। সংবৃণোতি
বিবেকাদিকমিতি সত্ত্বরোহবিবেকাদিঃ। নিঃশেষেণ জীর্ঘ্যতানেন কামক্রোধাদিরিতি
নির্জরঃ কেশোল্লুঙ্ঘনতপ্তশিলারোহণাদিঃ। কস্মাটকেনাপাদিতো জন্মমরণপ্রবাহো-
বন্ধঃ। তদষ্টকং চৈবম্। চত্বারি ষাতিককর্ম্মানি পাপবিশেষরূপানি যৈর্জ্ঞানদর্শন-
বীৰ্য্যমুখানি স্বভাবিকাত্মপি জীবস্ত প্রতিহন্তন্তে। চত্বারি ত্র্যাতিককর্ম্মানি পুণ্যবিশেষ-
রূপানি বৈর্দেহসংস্থানতদভিমানতৎকৃতসুখদুঃখাপেক্ষোপেক্ষাসিদ্ধিঃ। স্বশাস্ত্রোক্ত
সাধনৈস্তদষ্টকাদিমুক্তত্য়াবিভূতস্বভাবিকাত্মরূপস্ত জীবস্ত সদোর্দ্ধগতিরলোকাকাশ-
স্থিতিরীক্ষা মুক্তিঃ। সমাগজ্ঞানদর্শনচারিত্র্যাখ্যং রত্নত্রয়ং তৎসাধনম্। তানেতান্
পদার্থান্ সপ্তভঙ্গিনা ত্রায়েনাবস্থাপয়ন্তি। স যথা শ্রাদন্তি ১ স্যাদন্তি ২ স্যাদবক্তব্যঃ
৩ স্যাদন্তি চ নান্তি চ ৪ স্যাদন্তি চাবক্তব্যশ্চ ৫ স্যাদন্তি চাবক্তব্যশ্চ ৬ স্যাদন্তি চ
নান্তি চাবক্তব্যশ্চেতি ৭। স্যাদিতি কথঞ্চিদিত্যর্থোহব্যয়ম্। সপ্তানাং নিয়মানাং ভঙ্গা
বিভক্তন্তে যন্নিহ্ন প্রতিপাত্ততয়েতি সপ্তভঙ্গী। সত্ত্বম্ ১ অসত্ত্বং ২ সদসত্ত্বং ৩ সদসদ্বিল-
ক্ষণত্বং ৪ সত্ত্বং সতি তদ্বিলক্ষণত্বম্ ৫ অসত্ত্বং সতি তদ্বিলক্ষণত্বং ৬ সদসত্ত্বং সতি তদ্বিল-
ক্ষণত্বম্ ৭ ইতিবাভিভেদেন পদার্থত্রিবিধাঃ সপ্ত নিয়মাতবন্তি। তত্ত্বজ্ঞার্থময়ং ত্রায়ঃ। স

চ সৰ্বজ্ঞাবশুকঃ সৰ্বস্য পদার্থস্য সৎসামান্যনিত্যমানিত্যত্বভিন্নত্বভিন্নত্বাদিভিধর্মৈর-
নৈকান্তিকত্বাৎ । তথাহি যদ্যেকান্ততো বস্তুস্তো ব তর্হি সৰ্বদা সৰ্বত্র সৰ্বান্বানাশ্চ্যে-
বেতি ন তদীপ্সাজিহাসাত্যাং কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কুত্রচিৎ কশ্চিৎ প্রবর্তেত নিবর্তেত
বা । প্রাপ্তস্যাপ্রাপ্তত্বাৎ হেয়হানাসম্ভবাচ্চ । অনেকান্তপক্ষে তু কথঞ্চিৎ কচিৎ
কদাচিৎ কস্যচিৎ কেনচিৎপেণ সশ্বে হানোপাদানসম্ভবাৎ । প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশোপ-
পদ্যেত । দ্রব্যপৰ্যায়ান্নকং কিল সৰ্বং বস্তু । তত্র দ্রব্যান্ননা সৎসাদিকমুপপদ্যেত ।
পৰ্যায়ান্ননা স্বসৎসাদিকম্ । পৰ্যায়ান্ন দ্রব্যাবস্থাবিশেষাঃ । তেষাং ভাবাভাবান্নকতয়া
সৎসামান্যাদেবপত্তিরিতি । ইহ সন্দেহতে । আহতোক্তা জীবাদয়ঃ পদার্থান্তথা যুক্ত্যন্তে
ন বেতি । সপ্তভিনো জ্ঞানস্য সাধকস্য সৎসামান্য যুক্ত্যন্তে ইতি প্রাপ্তে পরিহরতি ।”

ভাবার্থ,—“জীব ও অজীব,—পদার্থ এই দুই প্রকার । জৈনগণ এইরূপ মত ব্যক্ত করেন ।
জীবের স্বরূপ এই যে, জীব—চেতন, কার্যপরিমাণ ও সাবয়ব । ধর্ম, অধর্ম, পুঙ্গল,
কাল ও আকাশ ভেদে অজীব-পদার্থ পঞ্চবিধ । ধর্ম—গাতহেতু । অধর্ম—স্থিতিহেতু
ও ব্যাপক । পুঙ্গল—বর্ণ-গন্ধ-রস-স্পর্শবিশিষ্ট । পরমাণু ও তৎসংঘাত ভেদে পুঙ্গল
দ্বিবিধ । সংঘাত বলিতে বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী তম্বু ও ভুবনাদিকে বুঝায় । পৃথিব্যাদির
হেতুভূত পরমাণু চতুর্বিধ নহে ; উহা একস্বভাব-বিশিষ্ট । সেই স্বভাব-পরিণাম-হেতু
পৃথিব্যাদি রূপ-বিশেষ-সংজ্ঞিত । অতীতাদি ব্যবহার হেতু যে কাল, তাহা অণুস্বরূপ ।
আকাশ একমাত্র ও অনন্তবিস্তৃত । এই সর্ববিধ পদার্থ দ্রব্যরূপ । ইহা লইয়াই এই
জগৎ । তাহাদের মধ্যে অণু ভিন্ন পঞ্চ পদার্থ অন্তিকার আখ্যায় অভিহিত হয় ; যথা—
জীবান্তিকার, ধর্মান্তিকার, অধর্মান্তিকার, পুঙ্গলান্তিকার, আকাশান্তিকার । অন্তিকার শব্দে
অনেকদেশবর্তী দ্রব্য বুঝায় । উহাতে জীবের মোক্ষোপযোগী সপ্ত পদার্থের বর্ণনা উপলব্ধি
হয় ; যথা—জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জর, বন্ধ ও মোক্ষ । পূর্বোক্ত জ্ঞানাদি গুণ
যাহাতে আছে, তাহাই জীব । অজীব—তাহার ভোগ্য-পদার্থ মধ্যে গণ্য । ইন্দ্রিয়-সংঘাত-
বশতঃ জীব যে বিষয়াসক্ত হয়, তাহারই নাম—আস্রব । বিবেকাবরণকারী অবিবেককে
সম্বর নামে অভিহিত করা যায় । নির্জর বলিতে কাম-ক্রোধাদি নিঃশেষে জীর্ণ করার বা
পরিহার করার ভাব বুঝায় । কেশল্লঙ্ঘন, তপশ্শিলারোহণাদি—কামক্রোধাদি জীর্ণ করার
কার্য মধ্যে পরিগণিত । অষ্টবিধ কর্মের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যে জন্মমরণপ্রবাহ উৎপন্ন
হয়, তাহাই বন্ধ । সেই অষ্ট কর্ম এইরূপ ; যথা—চতুর্বিধ ঘাতিকর্ম ; উহা পাপবিশেষ-
রূপ ; উহাতে জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান, দর্শন, বীৰ্য, স্মৃতি বিনষ্ট হয় । অপর চারিটা
কর্মের নাম—অঘাতিকর্ম ; উহা পুণ্যবিশেষ রূপ ; উহার দ্বারা দেহ-সংস্থান, দেহাভিমান,
তৎকৃত সুখ-দুঃখের অপেক্ষা ও উপেক্ষা প্রতিপন্ন হয় । স্বশাস্ত্রোক্ত সাধন-সমূহের সাহায্যে
কর্মাটক হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় । তাহাতে স্বাভাবিক আত্মস্বরূপে আবির্ভাব ঘটে ।
তখন জীব উর্দ্ধগতিলাভে অলোকাকাশে অবস্থিতি করে বা মুক্তি প্রাপ্ত হয় । সম্যক-
জ্ঞান, সম্যক-দর্শন, সম্যক-চারিত্র্য অভিধেয় রত্নত্রয় সেই সাধন-স্বরূপ । পূর্বোক্ত ঐ পদার্থ-
সকল সপ্তভিনজ্ঞানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় । সেই সপ্তভিনজ্ঞান যথা—(১) জ্ঞানজি, (২)

সাম্প্রাতি, (৩) সাদবক্তব্য, (৪) সাদস্তি চ নাস্তি চ, (৫) সাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ, (৬) সাম্প্রাতি চাবক্তব্যশ্চ, (৭) সাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ। * কথঞ্চিৎ অর্থে ‘স্যাৎ’ শব্দ অব্যয় রূপে ব্যবহৃত। যাহাতে সপ্তবিধ নিয়মের ভঙ্গ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই সপ্তভঙ্গিহীন। (১) সত্ত্ব, (২) অসত্ত্ব, (৩) সদসত্ত্ব, (৪) সদসদ্বিলক্ষণত্ব, (৫) সত্ত্ব তদ্বিলক্ষণত্ব, (৬) অসত্ত্ব তদ্বিলক্ষণত্ব, (৭) সত্ত্বাসত্ত্ব তদ্বিলক্ষণত্ব—পদার্থ বিষয়ে এই এই সপ্ত নিয়ম বাদিভেদে নির্দিষ্ট হয়। তাহা ভঙ্গের জন্তই এই ছায়া। সকল প্রকার পদার্থের সত্ত্বাসত্ত্ব, নিত্যানিত্যত্ব, ভিন্নভাভিন্নত্ব প্রভৃতি ধর্ম-সমূহের অনৈকান্তিকত্ব বা অনিশ্চয়তা হেতু সর্বত্র এই সপ্তভঙ্গিহীনের আবশ্যক। যদি একান্তই বস্তুর অস্তিত্ব থাকে, তাহা সর্বদা সর্বত্র সর্বদ্ব্যনে থাকিবেই থাকিবে। জৈম্বা বা জিহাসা বশতঃ তাহা কদাচিৎ কোনও স্থানে কোনও প্রকারে প্রবর্তিত বা নিবর্তিত হইবে না। প্রোপ্য-বস্তুর অপ্রাপ্তত্ব হেতু এবং হেয় বস্তুর পরিত্যাগ অসম্ভব হেতু ঐরূপ হয়। অনৈকান্তপক্ষে—অনির্ণীত স্বরূপত্ব পক্ষে—কচিৎ কোথাও কাহারও কোনরূপ সত্ত্ব থাকিলেই তাহার পরিত্যাগ বা গ্রহণ সম্ভবপর। এতদ্বারাই প্রবৃত্তি বা নিরবৃত্তি সিদ্ধ হয়। পর্যায়ই দ্রব্যাবস্থা-বিশেষ। তাহাদের ভাব ও অভাব হেতু যথাক্রমে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব উপপন্ন হয়। অর্হতত্ত্ব জীবাদি পদার্থে যুক্তিযুক্ত কি না, এই সংশয় নিবারণ সপ্তভঙ্গি-ছায়ের দ্বারা সাধিত হয়। †

* সপ্তভঙ্গিহীনে প্রযুক্ত উক্তি কয়েকটির মর্মার্থ আমরা পূর্বে (এই খণ্ডের ৭৯ম পৃষ্ঠায়) প্রদান করিয়াছি। বিষয়টি আর একটু বিশদভাবে বুঝাইবার জন্ত পণ্ডিত-প্রবর শ্যামলাল বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যাখ্যা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—‘স্যাৎ অস্তি’—যদি কোনরূপে থাকে, তবে আছে—এই কথঞ্চিৎ অস্তিত্ব-জ্ঞাপক ছায়াই প্রথম ছায়া। ‘সাম্প্রাতি’—যদি কোনরূপে থাকে, এই অসত্ত্ববিশ্বকাসুচক ছায়াই দ্বিতীয় ছায়া। ‘সাদবক্তব্যঃ’—যদি কোনরূপে থাকে, তবে অবক্তব্য, এইটি ক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় বিবক্ষায় তৃতীয় ছায়া। ‘সাদস্তি চ নাস্তি চ’—যদি কোনরূপে থাকে তবে আছে অথবা নাই, এইটি যুগপৎ প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় বিবক্ষায় চতুর্থ ছায়া। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব—এককালে বলা অশকা, এইটি বুঝাইবার নিমিত্তই এই তেতুর্থ ছায়া প্রবর্তিত হইয়াছে। ‘সাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ’—প্রথম ও চতুর্থের ক্রমবিবক্ষায় পঞ্চম ছায়া। ইহার অর্থ—যদি কোনরূপে থাকে, তবে আছে অথচ উহা অবক্তব্য। ‘সাম্প্রাতি চাবক্তব্যশ্চ’—যদি কোনরূপে না থাকে, তবে নাই, অথচ উহা অবক্তব্য। এইটি দ্বিতীয় ও চতুর্থের বিবক্ষায় ষষ্ঠ ছায়া। ‘সাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ’—যদি কোনরূপে থাকে তবে আছে, যদি কোনরূপে না থাকে তবে নাই, অথচ অবক্তব্য। এইটি প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থের বিবক্ষায় সপ্তম ছায়া।”

† জৈন-সম্প্রদায় কর্তৃক দৃষ্টান্তের সহিত এই “সাদ্বাদ” প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কি আকারে কি ভাবে এ তত্ত্ব বিশদীকৃত হয়, তাহার আভাস এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। *An Epitome of Jainism* গ্রন্থে তাহার যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা এস্থলে তাহার একটু আভাস দিতেছি।

“Form I.—‘সাদস্তেব সর্বমিতি সদংশকল্পনা বিভজনে প্রথমোভঙ্গঃ।’ as for example—‘স্যাৎ অস্তেব ঘটঃ’ i. e. *May be, partly or in a certain sense the jar exists.*

“Form II.—‘সাম্প্রাস্তেব সর্বমিতি পূর্বাদ্দ্য কল্পনা বিভজনে দ্বিতয়োভঙ্গঃ।’ as “নাস্তেব ঘটঃ” i. e. *May be, partly or in a certain sense the jar does not exist.*

“Form III.—‘সাদস্তেব সাম্প্রাস্তেবেতি ক্রমেণ সদংশাসদংশ কল্পনা বিভজনে তৃতয়োভঙ্গঃ।’ as “স্যাৎ অস্তি নাস্তেব ঘটঃ”—*May be, partly or in a certain sense the jar exists as well as in a sense it does not exist.*

কিন্তু ঐ মত যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভাষ্যকার ত্রয়ক্রিংশ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। বেদান্ত-দর্শনের সেই সূত্র ও তাহার ভাষ্য; যথা,—

“নৈকস্মিন্নসমুৎপাদে ॥ ৩৩ ॥”

“নৈতে পদার্থান্তেন ত্রায়েনান্যানমুপলকুং ক্ষমাঃ। কৃতঃ একস্মিন্নিতি। একস্মিন ধর্ম্মিনি যুগপৎ সত্ত্বাদিবিকল্পদ্বন্দ্বসমাবেশাযোগাদেবেত্যর্থঃ। ন হ্যেকং বস্তুরূপদা শৈত্যোক্ষ্যভাগবীক্ষতে কাপি। কিন্তু অনেকাস্তপক্ষে স্বর্গনরকমোক্ষাণাং মিতঃ সঙ্কীর্ণ-
ত্বাৎ স্বর্গায় নরকহানায় মোক্ষায় চ সাধনবিধিব্যর্থঃ স্ত্রাৎ। এবং ঘটাদীনামপি তথাহাহুদকার্থী বহ্নিনা প্রবর্ত্তেত গৃহার্থী তু বায়ুনা। ন চ তত্র ভেদস্তাপি সত্ত্বা-

“Form IV.—“সাদবস্তবামেবেতি সমসময়ে বিধিনিষেধয়োনির্বচনীয় কল্পনা বিভজনয়া চতুর্থোভঙ্গঃ।” as “সাদবস্তব্য এব ঘটঃ”—May be, *partly* or in a *certain* sense the jar is *indescribable*.

“Form V.—“সাদস্তেব সাদবস্তবামেবেতি বিধিপ্রাধাত্তেন যুগপদ্বিধিনিষেধা নির্বচনীয় প্রাপন কল্পনা বিভজনায় পঞ্চমোভঙ্গঃ।” as “সাদস্তেব সাদবস্তব্য ঘটঃ”—May be, *partly* or in a *certain* sense the jar *exists* as well as in a *certain* sense it is *indescribable*.

“Form VI.—“সাদাস্তেব সাদবস্তবামেবেতি নিষেধপ্রাধাত্তেন যুগপদ্বিধেধ বিধানির্বচনীয় কল্পনা বিভজনয়া ষষ্ঠোভঙ্গঃ।” as “সাদাস্তেব সাদবস্তব্য”। May be, *partly* or in a *certain* sense the jar is *not* and *indescribable* in a *certain* sense as well.

“Form VII.—“সাদস্তেব সাদাস্তেব সাদবস্তবামেবেতি ত্রয়াৎ সদংশাসদংশপ্রাধাত্তকল্পনয়া যুগপদ্বিধিনিষেধানির্বচনীয় প্রাপণা কল্পনা বিভজনয়া চ সপ্তমোভঙ্গঃ।” as “সাদস্তেব নাস্তেব অবস্তব্য”—May be *partly* or in a *certain* sense the jar is and is *not* and is *indescribable* as well as in a *certain* sense.”

সাদবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সপ্তভঙ্গী স্ত্রায়ের অবতারণা। স্ত্রাবাদের মূল তত্ত্ব বুঝিলে সপ্তভঙ্গী স্ত্রায়ের উপ-যোগিতা উপলব্ধি হয়। এই স্ত্রাবাদ-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ সর্গ-স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা,—“Nothing can be truly apprehended unless we take it in the light of not only what it is but also what *it is not*; ...because this *not-ness* of the factors imparts individuality and reality to what it is,...True apprehension can only be possible if we take it in the light of not what it is only; but also what it is not as well...The most firm convictions which we have cherished from our cradles without the least hesitation, are backed up and supported also by the vigorous rules and canons of formal logic whose fundamental principle, as we have seen before, is the laws of identity and contradiction that A is A, cannot be *not-A*. But now we come to a new vision of things in which A appears to be not merely A but *not-A* as well; because A is real in so far it stands in relation with what is *not-A*. The true life of A would then consist not only in A as formal logic teaches us but also in *not-A*. The ideal nature of a thing consists, therefore, not only in assertion of its being but also at the same time in the denial of it—in that which comprehends those antagonistic elements and yet harmonises and explains them.” সপ্তভঙ্গীস্ত্রায়ের যুক্তি-প্রভাবে জৈন-দার্শনিকগণ স্ত্রাবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সপ্তভঙ্গীস্ত্রায়ের প্রভাবেই সকল চিন্তার ও পদার্থের সত্য তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়,—ইহাই স্ত্রাবাদের মতিমত।

ছদকাষ্ঠর্থিনো বহ্নাদিতো নিবৃত্তিরূপপণ্ডিতেতি বাচ্যম্ অভেদশ্রুতি সত্ত্বেন বৃত্তের-
প্যাবশ্যকত্বাৎ । অপি চ নির্দ্ধার্য্যাঃ পদার্থা নির্দ্ধারসামনানি ভঙ্গা নির্দ্ধারকো জীবো
নির্দ্ধারশ্চ তৎফলং সৰ্ব্বমেতৎ শ্রাদন্তীত্যাদিবিকল্পোপত্তাসেন সৎসাসৎসাদিধর্ম্মকতয়া
নিশ্চিতবপূর্ভবেদিতিলুতাত্ত্ববৎ ক্রট্যমানোহসৌ শ্রায়ঃ । কিমশ্চ পরীক্ষয়া ॥ ৩৩ ॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ,—‘একে বিরুদ্ধধর্ম্মীর সমাবেশ অসম্ভব। এই ভায়ে এক পরমাশ্রায়
সকল পদার্থ উপলব্ধি করা যাইতে পারে না। এক ধর্ম্মীতে যুগপৎ সৎসাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের
সমাবেশ সিদ্ধ হয় না। একই বস্তু একই সময়ে শীতোকভাবে অবস্থিত কখনও দেখিতে
পাই না। অনেকান্তপক্ষে স্বর্গ-নরক-মোক্ষ এক করিয়া লইলে স্বর্গলাভে মোক্ষলাভে
নরক-যন্ত্রণা-নিরোধে সাধন-বিধি ব্যর্থ হইয়া যায়। ঘটাদিকে মিশ্রিতভাবে ভাবিলে
উদকার্থিকে বহ্নির নিকট এবং গহাৰ্থিকে বায়ুর নিকট প্রার্থী হইতে হয়। আবার ভেদ
থাকিলেও উদকার্থীর বহ্নিতে কার্য্যাসিদ্ধি হয় না। অভেদের অস্তিত্বেও ভেদের শ্রায়
প্রবৃত্তির আবশ্যক হয়। পদার্থ-মাত্র নির্দ্ধার্য্য। নির্দ্ধারসামন—ভঙ্গসকল। নির্দ্ধারক জীব
তাহার ফলনির্দ্ধারক। ‘শ্রাদন্তি’ ইত্যাদির বিকল্পে ব্যাখ্যায় সৎসাসৎসাদি ধর্ম্মের অনিশ্চয়তাই
সাধিত হইতেছে। ফলে সপ্তভসিতায় লুতাত্ত্ববৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। স্তত্রায়
উহার বিচারের কোনই আবশ্যকতা পরিদৃষ্ট হয় না।’

ইহার পর, স্তত্রকার আশ্রয় দেহ-পরিমাণত্বের বিষয়ে প্রতিবাদ করিতেছেন। ভাষ্যকারের
উক্তি বেদান্তদর্শনের চতুস্ত্রিংশ স্তত্র এবং তদ্ভাষ্য সেই সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা,—

“অথাঅনো দেহপরিমাণত্বং প্রত্যাচটে ।

‘এবং চাত্মাকাংক্ষ্যাম্ ॥’ ৩৪ ॥”

“যথৈকশ্মিন্ সৎসাসৎসাদিবিরুদ্ধধর্ম্মযোগো দোষ এবমাঅনোহকাংক্ষ্য সঃ ।

তথাহি । দেহপরিমাণো জীব ইতি মতম্ । তস্মৈ বালদেহপরিমিতস্য যুবাদি

দেহে পর্য্যাপ্তির্ন শ্রাৎ । মনুষ্যদেহপরিমিতস্ত তস্মাদৃষ্টবিশেষলন্ধে করিশরীরে

চ তথা সর্ক্সাঙ্গীণস্বত্বঃখানুপলব্ধশ্চ পুনর্মর্শকদেহেহসমাবেশশ্চেতি ॥ ৩৪ ॥”

অর্থাৎ,—‘একই বস্তুর সৎসাসৎসাদি বিরুদ্ধধর্ম্মযোগ দোষদ্রষ্ট। আশ্রয় অকাংক্ষ্য (সম্পূর্ণত্ব) সেইরূপ
দোষাবহ। দেহপরিমাণ জীব—এই যে মত, সর্ক্সাঙ্গীণ সমভাবে প্রযোজ্য কি? বালদেহ-
পরিমাণ, যুবার দেহে কদাচ পর্য্যাপ্ত নহে; অর্থাৎ, যদি মনে করা যায়—জীব বালকের
দেহ-পরিমিত; তাহাকে আবার যুবাদেহ-পরিমিত, কি প্রকারে বলিতে পারি? মনুষ্য-
দেহ-পরিমিত জীব অদৃষ্টবিশেষ লাভ করিয়া করিশরীরে যদি পর্য্যাবসিত হয়; তাহা
হইলে তাহার সর্ক্সাঙ্গীণ স্বত্ব-দুঃখ অনুপলব্ধ থাকে। আবার মশকাদি দেহে তাহার
সমাবেশ হইতে পারে না।’

কেহ হয় তো বলিতে পারেন, জীবের অনন্ত-অবয়বত্ব স্বীকার করিলে এ বিরোধ পরিহার
করা যাইতে পারে। কিন্তু পঞ্চত্রিংশ স্তত্রে সে মতও খণ্ডন করা হইতেছে। স্তত্র ও ভাষ্য; যথা—

“ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥”

“নবনস্তাবয়বস্ত জীবস্ত বালযুবাদিদেহানু করিতুরগাদিদেহান বা ভজতঃ

ক্রমাদবয়বাপগমোপগমাত্যাং বৈপরীত্যেন চ তত্তদেহপরিমিতত্বমবিরুদ্ধমিতি
 চেন্ন। কৃতঃ বিকারাদিত্যাং। তথা সতি জীবে বিকারানিত্যতাশ্রয়ত্বাৎ।
 কৃতহাশ্চ কৃতাত্যাগমাত্যাগেতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। যত্তু মুক্তিকালিকেন
 দেহাঘটিতেন নিত্যেন পরিমাণেন বিশিষ্টে জীবে ন বিকারাদিরিতি বদন্তি
 তচ্চ মন্দম্। তত্ত্ব জন্যত্বাজ্ঞত্বস্বাস্বাদিবিকল্পে স্থৈর্য্যাসম্ভবাৎ ॥ ৩৫ ॥”

অর্থাৎ—‘জীব অনন্ত অবয়ববিশিষ্ট। আর সেই হেতু সে বালঘৃবাদি দেহ অথবা করি-
 তুরগাদির দেহ প্রাপ্ত হইতে পারে,—এরূপ উক্তিও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন-না, অবয়বের
 অপগম উপগম হেতু যে বৈপরীত্য, তাহাতে তত্তদেহ-পরিমিতত্বের বিরুদ্ধতা ঘটে; এবং
 জীবের বিকারাদি স্বীকার করিতে হয়। জীবের বিকার স্বীকার করিলে, অনিত্যতা-
 কৃত হানি অকৃতভ্যাগম প্রভৃতি অপরিহার্য্য হয়। মুক্তিকালিক অপরিমাণভূত দেহ নিত্য।
 তাহা পরিমাণবিশিষ্ট ও বিকারাদি-সম্ভব হইলে পূর্ব্বোক্তি অসঙ্গত হয়। জগদ্ব্যাজ্ঞত্ব-
 হেতু সত্যাসত্য-বিকল্প-বশতঃ জীবের স্থৈর্য্যত্ব নিত্যত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে।’

উপসংহারে জৈনাভিমত মুক্তির বিষয়েও দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে। ষট্‌ত্রিংশ
 সূত্রে ও তাহার ভাষ্যে সেই ভাব প্রকাশমান। বেদান্ত-দর্শনের সূত্র ও তত্ত্বাব্য; যথা—

“অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষাৎ ॥ ৩৬ ॥”

“ন চেত্যুত্তর্য্যতে। অন্ত্যাবস্থিতেমোক্ষাবস্থাসাচ্যাবিশেষাৎ। সংসারাবস্থাতো
 বিশেষাভাবায় যুক্তো জৈনসিদ্ধান্তঃ। অবিশেষঃ কৃতঃ উভয়েতি। সদাউর্দ্ধগতির-
 লোকাকাশস্থিতিশ্চ মুক্তিরুক্তা তন্মোক্ষভয়োর্মুক্তিভ্বেন নিত্যত্বাদঙ্গীকারাৎ। ন হি
 সদাউর্দ্ধং গচ্ছন্নিরাশ্রয়তয়া বা তিষ্ঠন্ কশ্চৎ স্মখীভবতি। ন চ সদেহস্য
 তথাহং হঃখাম ন তু নির্দেহসোতি বাচ্যম্। তদাবয়বত্ব চ দেহবদন্তরবত্বাৎ। ন চ
 সা সা চ নিত্যোতি শক্যং বক্তুং ক্রিয়াভ্বেন বিনাশপ্রোবাৎ। তস্মাত্তুচ্ছমেত
 জ্জৈনমতং হাসপাটবমবগাহয়তি লোকানিতি। এতেন বিশ্বং সদসত্ত্বিন্ম উপনিষদ-
 মপি ব্রহ্ম সর্ব্বশব্দাবাচ্যমিত্যাदि বিরুদ্ধং জল্পন্ জৈনসমো মায়া চ দূষিতঃ ॥ ৩৬ ॥”

অর্থাৎ,—‘নিত্যত্ব হেতু উভয় অবস্থার মধ্যে কোনও বিশেষ ভাব নাই। অন্ত্যাবস্থিত
 (সংসারাবস্থা) ও মোক্ষাবস্থা অবিশেষ-ভাবাপন্ন। জৈনসিদ্ধান্ত মতে সংসারাবস্থাতে কোনও
 বিশেষভাব যুক্ত হয় না। উভয়ই অবিশেষ—এই হেতু জীবের সদা উর্দ্ধগতি এবং
 অলোকাকাশস্থিতি, মুক্তির বিষয় উক্ত হইয়া থাকে। উভয়ই মুক্তিত্ব-লাভ-প্রসঙ্গে নিত্যত্ব
 অঙ্গীকার করিতে হয়। সদা উর্দ্ধগতি অথবা অলোকাকাশে নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থিতি এতদ্ব্যয়
 অবস্থার কাহাকেও স্মখী হইতে দেখা যায় না, অথবা কাহারও স্মখী হওয়ার সম্ভাবনা
 নাই। জীব স্বদেহ, স্মৃতরাং সে অবস্থা হঃখকর। এ হেতু জীবকে নির্দেহও বলা যায় না।
 কেন-না, সে অবস্থায়ও দেহ-বৎ অবয়বের ভাব আসে। অপিচ, ঐ অবস্থাদ্বয়কে নিত্যও বলিতে
 পারা যায় না। কেন-না, ক্রিয়াত্বহেতু উহার বিনাশ নিশ্চিত। এই সকল কারণে জৈনমত
 জনসাধারণের নিকট উপহাস্যাম্পদ। বিশ্ব সদসত্ত্বিন ও উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাক্যের
 অতীত—বিরুদ্ধ-মতের কল্পনাকারী জৈনসম্মায়াবাদীরাও এবিধ যুক্তিতেই পরাস্ত হন।’

জৈনাদি মত নিরাস করিয়া অতঃপর পাণ্ডপতাদি মতের খণ্ডন করা হইতেছে। সেই মতের পরিচয় ও প্রতিবাদ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার লিখিতেছেন,—‘এক্কে পাণ্ডপতাদি মত (শৈব,

সৌর, গণপত্য প্রভৃতি পাণ্ডপত সম্প্রদায়ভুক্ত) প্রত্যাখ্যাত হইতেছে।
পাণ্ডপত মত নিরাস। পাণ্ডপতাদিমতে কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি ও হুঃখান্ত—এই পঞ্চ গদার্থ-স্বীকার করা হয়।

পশুপতি ঈশ্বর কর্তৃক পশুপাশ-বিমোক্ষণের জন্ত এই মত উপদিষ্ট হইয়াছিল। এতদনুসারেই এই মত ‘পাণ্ডপত মত’ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। এ মতে—পশুপতিই নিমিত্ত-কারণ, মহাদাদি কার্য্য, ঔকার-পূর্ব্বক ধ্যানাদিই যোগ, ত্রৈকালিক জ্ঞানই বিধি, এবং হুঃখান্তই মোক্ষ। যাহারা গণপত্য ও সৌর সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহারা যথাক্রমে গণপতিকে ও দিনপতিকে নিমিত্ত-কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তদনুসারে গণপতি বা সূর্য্য হইতে প্রকৃতি ও কাল দ্বারা বিশ্ব-সৃষ্টি সাধিত হয়। গণপতির বা সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা জীব তৎসামীপ্য লাভ করিয়া অত্যন্তহুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ লাভ করে। গাণেশ ও সৌর সম্প্রদায়ের ইহাই অভিমত।’ এ বিষয়ে ভাষ্যকারের উক্তি—

“ইদানীং পাণ্ডপতাদিমতানি প্রত্যাখ্যাতী। তত্র পাণ্ডপতা মন্যন্তে। কারণ-কার্য্যযোগবিধিহুঃখান্তাঃ পঞ্চ গদার্থাঃ পশুপাশবিমোক্ষণারম্ভেণ পশুপতি-নোপদিষ্টাঃ। তত্র পশুপতিঃ নিমিত্তকারণং মহাদাদি কার্য্যং ঔকারপূর্ব্বকো ধ্যানাদিযোগঃ ত্রিসবনজ্ঞানাদিবিধিঃ হুঃখান্তো মোক্ষ ইতি। এবং গণপতির্দিন-পতিশ্চৈব নিমিত্তকারণং তস্মাত্তস্মাচ্চ প্রকৃতিকালদ্বারা বিশ্বসৃষ্টিঃ তদুপাসনয়া তদন্তিকমুপাগতস্ত জীবন্ত হুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিমোক্ষ ইতি গাণেশাঃ সৌরাস্তাঃ।”

এক্কে পাণ্ডপতাদি মতের সিদ্ধান্ত ও যুক্তিযুক্ত কি না, তাহা বিচার করা হইতেছে। কুলাদি চক্রেয় নিমিত্তত্ব-দর্শন-হেতু ঘটাদি-কর্ত্তা তত্রূপ সাধন দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারেন,—এবমিহ পূর্ব্বপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার খণ্ডনার্থ সপ্তত্রিংশ সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে। প্রথমে ভাষ্যকার কর্তৃক উপস্থাপিত পূর্ব্বপক্ষের সংশয় এবং তৎপরে মতের খণ্ডন উপলক্ষে সপ্তত্রিংশ সূত্র ও তাহার ভাষ্য প্রকটিত হইয়াছে। যথা,—

“তত্র সংশয়ঃ। পাণ্ডপতাদিসিদ্ধান্তো যুক্তো ন বেতি। ঘটাদিকর্ত্তৃণাং কুলাদী-দানাং নিমিত্তত্বস্যৈব দর্শনাত্তত্ত্বসাধনৈর্মোক্ষস্থাপি সম্ভবাৎ যুক্ত ইতি প্রাপ্তে—

‘পত্ন্যরসামজস্যাত্ ॥’ ৩৭ ॥”

“নেতানুবর্ত্ততে। পত্ন্যঃ সিদ্ধান্তো নোপযুক্ত্যতে। কুতঃ অসামঞ্জস্যাত্ বেদবিরোধাত্। বেদে যথেকট্টস্যৈব নারায়ণস্য বিত্থেকহেতুতাং তদন্যস্য ব্রহ্ম রূপাদেস্তৎকার্য্যাতামভিধত্তে তদপিত্তবর্ণাশ্রমধর্ম্মজ্ঞানভক্তিহেতুত্বং যোক্ষ্যম্। তথা হুঃখর্ব্বম্ পঠ্যতে। তদাহরেকো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মান জ্ঞানো নাপো নায়িসোমো নেমে জ্বাপৃথিবী নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যঃ স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তস্থস্য যত্র স্তোমমুচ্যতে তস্মিন্ পুরুষাশ্চতুর্দশ জায়ন্তে। একা কত্মা দশৈন্দ্রিয়াণি মন একাদশং তেজো দ্বাদশমহঙ্কারজ্ঞানোদশঃ প্রাণা-শ্চতুর্দশ আত্মা পঞ্চদশঃ বুদ্ধিঃ পঞ্চতন্ত্রাণি পঞ্চভূতানীত্যাদি। তস্য ধ্যানান্তস্থস্য ললাটাত্ম্যাকঃ শূলপাণিঃ পুরুষো জায়তে বিজচ্ছিন্নং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপো বৈরাগ্যমিত্যাদি।

তত্র ব্রহ্মা চতুর্শৃংখোহজায়তেত্যাদি চ । তেষেবানাত্র । অথ পুরুষ হ বৈ নারায়ণোহ-
কায়মত প্রজাঃ স্বজেষ্যেয়েত্যারভ্য নারায়ণাঙ্কুক্ষা জায়তে নারায়ণাঙ্কুক্ষো জায়তে নারা-
য়ণাং প্রজাপতিঃ প্রজায়তে নারায়ণাদিঙ্কো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে নারা-
য়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদ্-দ্বাদশাদিত্যা জায়ন্তে ইত্যাদি । ঋকু চ । অহমেব
স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরূত মাহুযেভিঃ । যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং
ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং স্রমেধাম্ অহং রুদ্রায় ধনুৱাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবেহস্ত বা উ অহং
জনায সমদং কৃণোমি অহং জ্বাপাপৃথিবী আবিবেশেত্যাদি । অথ যজুঃসু । তমেতং বেদাহু-
বচনেনেত্যাদি । বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বীত আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য ইত্যাদি চ । স্মৃতয়োহপি
বেদাহুসারিণ্যোহসকৃদেতদর্থমাছঃ । . যে তু পশুপত্যাদয়ঃ শব্দাঃ স্ববাচ্যানাং সর্বেশতাং
সর্বকারণতাং চ প্রকাশয়ন্তঃ কচিৎপলভ্যন্তে তে কিল নারায়ণাঙ্কুতাদৃশস্ববাচ্য-
বাচিন এব স্মারকশ্রুতাবিরোধাৎ । সময়য় লক্ষণনির্ণয়াদেতি সর্বমবদাতম্ ॥ ৩৭ ॥”

ভাষ্যের ভাবার্থ,—‘পূর্বোক্ত (পাশুপতাদি মতের) সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে । ঐ সকল
মতের অসামঞ্জস্যের কারণ—ঐ সকল মত বেদবিরুদ্ধ । নারায়ণই বিশ্বের একমাত্র হেতু ;
তদতিরিক্ত ব্রহ্ম-রুদ্রাদি কর্তৃক তৎকার্য সাধিত । বেদে এইরূপ উপদেশ আছে ।
বর্ণাশ্রম-ধর্মও জ্ঞানভক্তি-মোক্ষের হেতুভূত । অথর্বোপনিষদে দেখিতে পাই—আদিতে
এক নারায়ণ বিद्यমান ছিলেন । তখন ব্রহ্মা, ঈশান, বরুণ, অগ্নি, সোম, স্বর্গ, পৃথিবী,
নক্ষত্র-সমূহ, সূর্য্য প্রভৃতি কিছুই ছিল না । তাঁহার ধ্যান-প্রভাবে তাঁহা হইতে চতুর্দশ
পুরুষ উৎপন্ন হয় । এক কণ্ঠা, দশ ইন্দ্রিয়, একাদশ মন, দ্বাদশ তেজ, ত্রয়োদশ
অহঙ্কার, চতুর্দশ প্রাণ, পঞ্চদশ আত্মা, বুদ্ধি, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত প্রভৃতি উৎপন্ন হয় ।
ধ্যানস্থিত সেই নারায়ণের ললাট হইতে ত্রিনেত্র শূলপাণি পুরুষের উদ্ভব হয় । তাঁহাতে
সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, তপ, বৈরাগ্য ইত্যাদি যুক্ত ছিল । তাঁহা হইতে চতুর্শৃংখ ব্রহ্মা উৎপন্ন
হন । অনন্তর সেই পুরুষ নারায়ণ প্রজাসৃষ্টির অভিলাষী হইয়া সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন ।
তাহাতে নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, নারায়ণ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হন, নারায়ণ
হইতে প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন, নারায়ণ হইতে ইন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, নারায়ণ হইতে
অষ্টবহু জন্মগ্রহণ করেন, নারায়ণ হইতে একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হন, নারায়ণ হইতে
দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন । ঋক, যজুঃ সর্বত্রই নারায়ণের এইরূপ প্রাধান্ত্য পরিকীৰ্ত্তিত ।
তদর্শিত কণ্ঠাদিই মোক্ষ । স্মৃতিও এ পক্ষে বেদের অনুসরণ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন ।
পশুপতি প্রভৃতি শব্দে সেই সর্বেশতা সর্বকারণতা প্রকাশ পাওয়ায় উহার দ্বারা নারায়ণকেই
বুঝাইতেছে । এ প্রকার অর্থের সময়য়-সাধনে ঐ সকল মতের সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে ।’

যাহারা বেদবিরোধী, অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের নিমন্ত্রণ কল্পনা করেন, তাঁহাদিগের
যুক্তি মাত্র করিতে হইলে লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে সম্বন্ধাদি স্বীকার করিতে হয় ।
কিন্তু তাহা বিচারে দাঁড়াইতে পারে না । অষ্টত্রিংশ ও উনচত্বারিংশ সূত্রে এবং
স্বত্বত্বয়ের ভাষ্যে সে অযৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে পূর্বপক্ষ রূপে ভাষ্য-
কারের উক্তি, সূত্র দুইটি এবং তাহাদের ভাষ্য নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল ; যথা,—

“অথ বেদবিরোধিনাং তেষামমুমানেনৈব নিমিত্তমাত্রেখরকল্পনা। তথা
সতি লোকদৃষ্টোত্তমসারণ সম্বন্ধাদি বাচ্যম্। তচ্চ বিকল্পাসহমিত্যা হ।”

‘সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥’ ৩৮ ॥

“পত্ন্যজগৎকর্তৃত্বসম্বন্ধো নোপপত্ততে অদেহত্বাদেব। সদেহশ্চৈব
কুলালাদেহমৃদাদি সম্বন্ধদর্শনাৎ সম্বন্ধোহনুপপন্নঃ ॥ ৩৮ ॥”

‘অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥’ ৩৯ ॥

“ইয়মপাদেহত্বাদেব। সদেহো হি কুলালাদিধরাত্ত্বাধিষ্ঠানঃ কার্য্যং কুরুন্ দৃশ্যতে ॥ ৩৯ ॥”
অর্থাৎ,—‘সম্বন্ধে অনুপপত্তি বশতঃ মত অপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরের অদেহত্ব হেতু তাঁহার
জগৎকর্তৃত্ব সম্বন্ধ সপ্রমাণ হয় না। দেহবিশিষ্ট কুলালাদির সহিত মৃত্তিকাদির সম্বন্ধ
দেখিয়া অদেহী ঈশ্বরের সহিত তদ্রূপ সম্বন্ধ অনুপপন্ন হয়। ৩৮ ॥ অধিষ্ঠানের অনুপপত্তিও
পূর্বোক্ত মতের অসম্ভবত্ব প্রতিপন্ন করে। তাঁহার অদেহত্ব সূতরাং অধিষ্ঠানাভাব।
কুলালাদি ও মৃত্তিকাদি সদেহ সূতরাং অধিষ্ঠানে অবস্থিত হইয়াই কার্য্য করে, দেখিতে
পাওয়া যায়। ৩৯ ॥’

এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে,—জীব দেহরহিত ছিল। দেহের ও ইন্দ্রিয়ের
অধিষ্ঠানে তাহার সদেহত্ব হইল। ঈশ্বরেও সেইরূপ প্রধানের অধিষ্ঠান ঘটিতে পারে।
তাহার উপরে চত্বারিংশ সূত্র প্রযুক্ত রহিয়াছে। পূর্বপক্ষ রূপে ভাষ্যকারের উক্তি,
চত্বারিংশ সূত্র ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

“নষদেহশ্চৈব জীবন্ত দেহেজ্জিয়াদি যথাধিষ্ঠানমেবং
পত্ন্যরপি তাদৃশস্য প্রধানং তৎ সাদৃশ্যং চেত্তদ্রাহ।

‘করণবচ্চের ভোগাদিভাঃ ॥’ ৪০ ॥”

“প্রলয়ে প্রধানমস্তি। তচ্চ করণমিব ক্রিয়োপকারকমধিষ্ঠায় পতির্জগৎ
কুর্বাদিতি ন শক্যং বক্তৃম্। কুতঃ ভোগাদিভাঃ। করণস্থানীয়প্রধানে
পাদানহানাদিনা জন্মমরণপ্রাপ্ত্যা স্খলঃখভোগানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৪০ ॥”

অর্থাৎ,—‘করণবৎ ভোগাদিও বলা যাইতে পারে না। প্রলয়ে প্রধান বিজ্ঞান থাকেন।
তিনি করণ-স্বরূপ। তাঁহার অধিষ্ঠানে জগৎপতি জগৎসৃষ্টি করেন, ইহাও যুক্তিযুক্ত বলা
যাইতে পারে না। তাঁহার ভোগাদি কোথায়? করণ-স্থানীয় প্রধানের উপাদানহানি
হেতু জন্মমরণপ্রাপ্তিরূপ যে স্খলঃখভোগ, তাহাতেই অনীশ্বরত্ব প্রসঙ্গ আসে।’

অদৃষ্ট-অমুরোধে যদি কেহ জগৎপতির কিঞ্চিদেহাদি কল্পনা করেন; যদি কেহ এরূপ
বলেন যে, ইহলোকে পূণ্যপ্রভাবে যেমন মানুষ রাজদেহ ধারণ করে; যেমন অধিষ্ঠানভূত
রাষ্ট্রের অধিপতি হয়; ইহাও সেইরূপ। কিন্তু তাহাতেও দোষ আসে। একচত্বারিংশ
সূত্রে ও তদ্বাচ্যে সেই দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পূর্বপক্ষরূপে ভাষ্যকারের
উক্তি এবং তদোষ-প্রদর্শনে বেদান্ত-দর্শনের একচত্বারিংশ সূত্র ও তাহার ভাষ্য; যথা—

“নষদৃষ্টোত্তমরোধেন পত্নাঃ কিঞ্চিদেহাদিকং কল্পাম্। দৃশ্যতেহ্যগ্রপুণ্যো রাজা
সদেহঃ সাধিষ্ঠানশ্চ রাষ্ট্রসোশ্বরঃ ন তু ভূষিপরীত ইতি চেৎ তত্র দ্বষণং দর্শয়তি।

‘অস্তবত্মসর্কজতা বা ॥ ৪১ ॥’

“এবং সতি দেহাদিসম্বন্ধটিতমস্তবত্বং তস্য জীববৎ স্যাৎ অসার্কজঞ্চ। ন হি কর্মাদীনস্য সার্কজ্যং যুজ্যতে। তথা চাবিনাশী সর্কজশ্চেতাভূতাপগমক্ষতিঃ। ন চৈবং ব্রহ্মবাদে কোহপি দোষঃ তস্য ঋতিমূলক্যং। দর্শিতং চেদং ঋতেস্তু শব্দমূলত্বা-
দিত্যত্র। পতীনাং স্বাতন্ত্র্যমিহ নিরন্তম্। তদীয়ভেদে সংকারস্তস্মীক্ৰিয়তে। এবঞ্চ
পাশুপতাদি ত্রিমতী পরিহারার্থমেবা পঞ্চমুত্রী পরিহার হেতুসামান্য্যং। অতঃ
পত্ন্যুরিতাবিশেষোল্লেকঃ। তার্কিকাদিসম্মতেশ্বরকারণতানিরাসার্থং সেতাচ্ছে ॥ ৪১ ॥”

অর্থাৎ,—‘ইহাতে অস্তবত্ব (শেষত্ব) ও অসর্কজতা দোষ ঘটে। দেহাদি সম্বন্ধ থাকিলেই তাহা অস্তবত্ব আর তাহা জীববৎ অসার্কজ হয়। কর্মাদীন জীবে সর্কজত্ব কখনও প্রযুক্ত হইতে পারে না। অতএব অবিনাশী ও সর্কজ প্রভৃতি যে বিশেষণ, তাহা-নিরর্থক প্রতিপন্ন হয়। ব্রহ্মবাদে একরূপ দোষ সম্ভব নহে। কেন-না, উহা ঋতিমূলক। ঋতি—শব্দ-মূলকত্ব। শাস্ত্রে ইহাই দেখিতে পাই। অতএব জগৎপত্তিগণের স্বাতন্ত্র্য নিরাশ করা হইল। স্বদীয়ত্ব (ঈশ্বরত্ব) হেতু সংকার অঙ্গীকার করিতে হয়। পূর্বোক্ত পঞ্চমুত্র পাশুপতাদি তিনটি মত পরিহারার্থ প্রযুক্ত। পতি ইতি শব্দের অবিশেষ উল্লেক, সাম্য-হেতুই মনে করিতে হইবে। তার্কিকাদি-সম্মত ঈশ্বরকারণতা নিরাসার্থও উক্ত মত-পঞ্চকের অবতারণা হইয়াছে বলিয়াও কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন।’

পাশুপতাদি মতের খণ্ডনান্তর শক্তিবাদে দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। শাস্ত্রগণের মত এই যে, শক্তিই বিশ্বের হেতু। তিনি সার্কজ-সত্যসঙ্কলাদি গুণবতী। এ মত যুক্তিযুক্ত কি অসম্ভব—এবম্বিধ সংশয়ের নিরাসার্থ শাস্ত্রগণ বলিয়া থাকেন যে, শক্তি যখন তাদৃশ গুণশালিনী, তখন তাহা হইতেই যে বিশ্বসৃষ্টি, তাহা উপপন্ন হইতে পারে। এবম্প্রকার পূর্বপক্ষের খণ্ডনার্থ “উৎপত্ত্যাসম্ভবাৎ”—এই দ্বিচত্বারিংশ সূত্রের ও তাহার ভাষ্যের অবতারণা। পূর্বপক্ষ রূপে ভাষ্যকারের উক্তি, বেদান্ত-দর্শনের সূত্র ও তাহার ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; যথা—

“অথ শক্তিবাদং দুষয়তি। সার্কজসত্যসঙ্কলাদিগুণবতী শক্তিরেব
বিশ্বহেতুরিতি শাস্ত্রা মন্তস্তে। তৎসম্ভবেন বেতি বিচিকিৎসায়ঃ
তাদৃশা তয়া বিশ্বস্থাপনপত্তেঃ সম্ভবেদিত্তি প্রাপ্তে প্রত্যাচষ্টে।

‘উৎপত্ত্যাসম্ভবাৎ ॥’ ৪২ ॥”

“নেত্যা কর্ণীয়ম্। ইহাপি বেদবিরোধাদমুমানেনৈব শক্তিকারণতা কল্পনীয়।
তেন লোকদৃষ্টো যুক্তিসংকল্প্য। ততশ্চ শক্তিবিশ্বজনয়িত্বীতি নোপপত্ততে। কুতঃ
কেবলাস্মান্তস্যান্তদ্বংপত্ত্যাবোগাৎ। ন হি পুরুষানন্তগৃহীতাভ্যাঃ জীভ্যাঃ পুত্রাদয়ঃ
সম্ভবন্তো বীক্যন্তে লোকে। সার্কজ্যাদিকং স্বপ্রেক্ষ্যভিহিতং লোকেহদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥”

অর্থাৎ,—উৎপত্তি অসম্ভব হেতু শক্তিবাদ যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাতে বেদবিরোধ ঘটে। কেন-না, অমুমানের দ্বারা শক্তির জগৎকারণত্ব কল্পিত হয়। এই হেতু এ বিষয়ে লৌকিক যুক্তির প্রয়োগের আবশ্যকতা অস্বীকৃত হইতেছে। তাহাতে শক্তির বিশ্বজনয়িত্বী ভাব উপপন্ন হয়

না। কেবল শক্তির দ্বারা জগৎপত্তি অসম্ভব। পুরুষানুগ্রহ বাতীত জীব পুত্রাদি সম্ভব হয় না। পুরুষ-সংসর্গ-শূন্যতায় শক্তির উৎপত্তি অবিচার্য্য এবং ইহলোকে দৃষ্ট হয় না।

এ ক্ষেত্রে যদি বলা হয়, শক্তির অনুগ্রহকর্তা পুরুষ, পুরুষের দ্বারা অনুগ্রহীত হইয়াই শক্তি বিখ্যোৎপত্তিতে সমর্থ্য হন,—তাহাও স্বীকার করা যায় না। ত্রিচছারিংশ সূত্রে এ মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। পূর্বপক্ষরূপে ভাষ্যকারের উক্তি, বেদান্ত-দর্শনের ত্রিচছারিংশ সূত্র ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

“অথান্তি শক্তেরনুগ্রহকর্তা পুরুষন্তেনানুগ্রহীতা তু সা তদ্বৈতুরিতি মতম্। তত্রাহ।

‘ন চ কর্তুঃ করণম্’ ॥ ৪৩ ॥”

“যদি শক্ত্যানুগ্রাহকঃ পুরুষোহপ্যঙ্গীকার্য্যন্তর্হি তত্ৰাপি বিখ্যোৎপত্ত্যুপযোগিদেহেন্দ্রিয়াদি করণং নাস্তীতি নানুগ্রহোপপত্তিঃ। সতি চ তস্মিন্ প্রাপ্তকদোষানতিবৃত্তিঃ ॥ ৪৩ ॥”

অর্থাৎ,—‘যদি শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষকেও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিখ্যোৎপত্তির উপযোগী দেহেন্দ্রিয়াদির স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু নির্দেহ পুরুষে সেরূপ সম্ভবে না। সুতরাং তাহাতেও পূর্বোক্ত দোষের প্রতিনিবৃত্তি হয় না।’

নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদি গুণ-সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিলেও সে দোষের নিরাস হয় না। চতুঃছারিংশ সূত্রে ও তাহার ভাষ্যে পুত্রকার তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। যথা,—

“ননু নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদি গুণকোহসাবিত চৈৎ তত্রাহ—

‘বিজ্ঞানাদিভাবে বা তৎপ্রতিষেধঃ’ ॥ ৪৪ ॥”

“তত্ত পুরুষস্ত নিত্যজ্ঞানেচ্ছাদিকরণমস্তীতি চেত্তর্হি তদপ্রতিষেধো

ব্রহ্মবাদান্তর্ভাবঃ। তত্র তাদৃশাৎ পুরুষাদ্বিত্ব সূত্রঙ্গীকারাৎ ॥ ৪৪ ॥”

অর্থাৎ,—‘বিজ্ঞানাদি ভাবে ও তাহার প্রতিষেধে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হয়। কেন-না, পুরুষকে মৃত্যু-জ্ঞানেচ্ছাদিময় মনে করা এবং তাহার প্রতিষেধ ব্রহ্মবাদেরই অন্তর্গত। সেইরূপে পুরুষেই বিশ্বসৃষ্টি কার্য্য স্বীকৃত হয়।’

নিঃশ্রেয়সকামিগণের নিকট শক্তিমাত্র কারণবাদ যে আবরণীয় হইতে পারে না, পঞ্চচছারিংশ সূত্রে তাহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে। পূর্বপক্ষরূপে ভাষ্যকারের উক্তি, বেদান্তদর্শনের সূত্র ও তাহার ভাষ্য যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

“শক্তিমাত্রকারণতাবাদস্ত নিঃশ্রেয়সকামৈরণাদরণীয় এবৈতু্যপসংহরতি—

‘বিপ্রতিষেধাচ্চ’ ॥ ৪৫ ॥”

“সর্বশ্রুতিস্মৃতিবুক্তিবিরোধাতুচ্ছঃ শক্তিবাদঃ। শ্রুতয়ঃস্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চৈব পরম্। বদন্তি তদ্বিকল্পং যো বদেত্তস্মান চাধম ইতি হি স্মৃতিঃ। চশশ্বে-নোৎপত্ত্যসম্ভবাদিতি হেতুঃ সমুচ্চিতঃ। তদেবং সাংখ্যাদিবাদানাং দোষ-কণ্টকবৈশিষ্ট্যাৎ তদ্রহিতং বেদান্তবদৈব শ্রেয়োহর্থভিরাহ্মৈয়মিতি ॥ ৪৫ ॥”

অর্থাৎ,—‘বিপ্রতিষেধ (তুল্যবলনিরোধ) বশতঃ শক্তিবাদ নিঃশ্রেয়স কারণ হইতে পারে না। শক্তিবাদ সর্বশ্রুতিস্মৃতি বুক্তিবিরোধহেতু তুচ্ছ। শ্রুতিস্মৃতি মতে ঈশ্বর ‘পরম’ বলিয়া উক্ত আছেন। বাহাতে তাহার বিকল্প মত ব্যক্ত হয়, তাহা অধম। স্মৃতিতে এইরূপ উক্তি আছে।

চ শব্দে বিখ্যোৎপত্তির অসম্ভাবনা খাপিত হইতেছে। এবিধ নানা কারণে সাংখ্যাদি পঞ্চ দোষকণ্টকবিশিষ্ট মনে করিয়া শ্রেয়াধী ব্যক্তিগণ বেদাস্তবস্তু^১ অমুসরণ করিবেন।

বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়, এইরূপ বিভিন্ন প্রকার বিচার-বিতর্কের অবতারণায় আপন-আপন মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে প্রয়ত্নপর হইয়াছেন। এই একই বেদাস্ত-সূত্রের ব্যাখ্যায়

শ্রীমৎ বলদেব বিজ্ঞাতৃষণ যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,
পরম্পরের
বিতর্ক-বিভক্ত। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে অনেক স্থলে তাহার আবার প্রকারান্তর

দেখা যায়। বিজ্ঞাতৃষণ বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতিষ্ঠা-কল্পে নারায়ণ বিমুক্তকেই সর্বকারণ-রূপে প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে যে যুক্তি অবলম্বন শ্রেয়ঃ বলিয়া অমুভব করিয়াছেন; শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের ‘সোহং’-বাদ-খ্যাপনে তাহা অন্তরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুর মধ্যেই ভাব-প্রবাহের যখন এতাদৃশ বিভিন্নতা, তখন অন্ত্র সম্প্রদায়ে সে বিভিন্নতা যে গুরুতর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই বেদাস্ত-সূত্রে বা তাহার ব্যাখ্যায় ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মমতের অর্থোক্তিকতা প্রতিপাদনের যেমন চেষ্টা হইয়াছে; অন্ত্রাত্ম ধর্মসম্প্রদায়ের দর্শনকারগণও তেমনই তদিতর সম্প্রদায়ের মতকে তর্ক-কুঠারে ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। একদেশদর্শী-রূপে এক পক্ষের যুক্তিই আমরা প্রকাশ করিলাম বটে; কিন্তু একটু স্থির-ধীর-ভাবে দেখিলে অন্ত্র-পক্ষের যুক্তিও বড় অল্প তীক্ষ্ণ-ধার-সম্পন্ন বলিয়া মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্থলে বেদাস্ত-মত খণ্ডনে, জৈন-দার্শনিকগণের কয়েকটি অচ্ছেদ্য যুক্তির অবতারণা করাও এ ক্ষেত্রে তাই আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। অধিক বলিব কি, শঙ্করাবতার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যের যুক্তিও যে অনেক স্থলে ছিন্ন হইতে পারে, সে আলোচনায় অনেকেরই তাহা প্রতীতি হইবে। পূর্বোক্ত “নৈকশ্মিন্ন-সম্ভবাৎ” (২য় পাদ, ২য় অঃ, ৩৩শ সূত্র) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যও ‘অস্তি নাস্তি’ মূলক জৈনমতের প্রতিবাদ করিয়াছেন; বলিয়াছেন,—“উক্ষ ও শৈত্য যেমন একযোগে অবস্থিতি করিতে পারে না, ‘অস্তিত্ব’ ও ‘নাস্তিত্ব’ সেইরূপ একই পদার্থ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না।” কিন্তু জৈন-দার্শনিকগণ তাহার কি উত্তর দিয়া থাকেন, তাহাও অমুখাবন করিয়া দেখা যাইতে পারে। অধুনা-প্রকাশিত জৈন-সম্প্রদায়ের একখানি ইংরাজী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কিরূপ যুক্তি-তর্ক অবলম্বিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি। * সেই ইংরাজী অংশের

* “Such is the criticism which Shankar makes taking his stand on the ‘Sutra’ ‘Not ; because of the impossibility in one’—(নৈকশ্মিন্নসম্ভবাৎ) of the *Vedanta Sutras* by Vyasa. Or, in other words, ‘it is impossible’, remarks Shankar, ‘that contradictory attributes, such as *being* and *non-being* should at the same time belong to one and the same thing’....But when he starts his criticism with the startling remark that, *being* and *non-being* cannot co-exist in one and the same thing, we begged to differ from him. Shankar puts all through his arguments a great stress on the Law of Contradiction....

“When the Formal Logic laid down the Law of Contradiction as the highest law of thought, what it evidently meant is simply this that distinction is necessary

মর্মার্থ,—একই পদার্থ সম্বন্ধে ‘আছে ও নাই’ (‘অস্তি’ ও ‘নাস্তি’) শব্দ প্রয়োগে বিরুদ্ধ-বাদ-জনিত দোষ ঘটে ;—শঙ্করাচার্য্য এই হিসাবেই ঐ কথা কহিয়া থাকিবেন। তর্কবাদে

অস্তি-নাস্তির
সমাবেশ
অসম্ভব নয় ।

এ পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাব একই পদার্থে তিষ্ঠিতে পারে না সত্য ; কিন্তু চিন্তার মধ্যে, মননে বা সঙ্কল্পে, এ যুক্তির স্থান অবশ্যই আছে। কোনও পদার্থ যদি নির্দিষ্টরূপে নির্ণীত ও সংজ্ঞাপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তৎ-

সম্বন্ধে চিন্তা ও জ্ঞান মুহমান হয়। বাহ্য ‘ক’ এবং বাহ্য ‘ক’-নহে, তাহাকে যদি একই পদার্থ বলি, অভিন্ন-বাক্যে সংজ্ঞিত করি, তাহা হইলে সেই বাক্যেরও কোনও অর্থ পরিগ্রহ

for thought. Unless things are definitely what they are and are kept to their definition, thought and knowledge become impossible. For instance, if *A* and *not-A* be the same it is hardly possible to find any meaning even in the simplest statements, for the nature of the thing becomes absolutely indefinite and so indeterminate. Hence Formal Logic teaches that thought is distinction and is not possible without it.”

“But is thought simply a distinction and nothing else? Is the distinction absolute and ultimate? We, the Jains, would undoubtedly say that it can never be absolute distinction. If thought is distinction yet it implies at the same time relation. Everything implies something other than it: ‘This implies That’; ‘Now implies Then’; ‘Here implies There’; and the like. Each thing, each aspect of reality is possible only in relation to and distinct from some other aspect of reality. If so, *A* is only possible in relation to and distinct from *not-A*. Thus, by marking one thing off from another, it, at the same time, connects one thing with another. A thing which has nothing to distinguish from, is as impossible as equally unthinkable is the thing which is absolutely separated from all others so as to have no community between them. An absolute distinction would be self-contradictory for it would cut off every connection or relation of the thing from which it is distinguished. The principle of absolute contradiction is suicidal; because it destructs itself...

“To illustrate let us take the instance of the jar. I say that the jar is a finite object. Now, what do we mean by finite thing is that it is limited in extent. And the question may be raised: is the limit self-imposed or imposed from without. Or, in other words, is the limit created by the object itself or is it due to the presence of another which limits it. The answer must be that it is limited by something else. Now, may it not be said that the jar is finite only by virtue of something else? It is what it is only in relation with something else, without which its existence as such would be impossible. So the Law of Contradiction, if it speaks of absolute difference, is manifestly a suicidal principle.

“Take any thought-determination and the same principle will hold good. The

হয় না। যাহারা পরস্পর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহাদের অভিন্নত্ব কি প্রকারে সম্ভবপর ? সাধারণ তর্কবাদ এই কারণেই শিক্ষা দেয়,—চিন্তায় পার্থক্য আছেই, আর সে পার্থক্য ভিন্ন চিন্তায়

jar is what it is, because it serves certain purpose, has certain shape, certain colour &c' These different ideas constituting one whole is what we know as the jar. May it not be said then that this whole of the different ideas is what it is only by virtue of some thing or some other which is its negative ? For if we try to hold this *commonplace* whole of ideas to the exclusion of its negative, if we try to hold it to itself it disappears,

"We submit, therefore, that such a remark as made by Sankara is due to his gross misunderstanding of the dialectic principle of our reasoning. For, as we interpret and use the principle it is all right. We, the Jains, hold that every thought or being is only in relation to the fourfold nature of *itself*. But is not in relation to the fourfold nature of the *other* (সর্ববস্তুরূপে পররূপে নাস্তি চ) : for instance, the jar when it is thought in relation to (i) its own constituent substance—earth ; (ii) its own locality of existence in space—Calcutta ; (iii) its own period of coming into existence in time—Summer ; and (iv) its own mode of existence as revealed in its colour (red or the like) and capacity for containing and carrying such and such quantity of water, the jar is said to exist, i. e. only in relation and particular combination of the fourfold nature of itself known technically as *Svachaturstaya*, the jar is (অস্তি), and has the nature and character of *being* (সৎরূপ). But when thought of in relation and particular combination of the fourfold elements, viz, constituent substance, locality, period and mode (দ্ব্যবহেকত্রকালভাব) as belonging to the *other*, say, the picture, the jar is not (নাস্তি) and is of the nature of *non-being* (অসৎরূপ). Thus the picture is the *negation of the jar* and *viceversa* the jar is the *negation of the picture*. Everything is in relation only to the fourfold elements of *itself* but is not in relation only to the fourfold elements belonging to the *other*. If it were, otherwise, were everything said to exist in either relation of *itself* as well as of the *other*, then every thought and being, making up this our universe would have been transformed into one uniform homogeneous whole ; then light and darkness, knowledge and ne-science, being and non-being, unity and plurality, eternity and non-eternity, knowledge and the means thereof, all that go in pairs of opposites, and the like must needs be one homogeneous mass, so to speak, of one uniform nature and character without any difference and distinction between one and the other or between the parts of one and the same thing. But such homogeneity of nature and character in things all round us is contradicted by our sense perception which reveals but differences and diversities in things and realities.

"And now to turn the table, when you, Shankar, say 'Being is *Brahman*', you must

অস্তিত্বই অসম্ভব। আবার শুধুই যে পার্থক্য আছে, তাহাও নহে। পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সম্বন্ধও বিद्यমান। প্রত্যেক পদার্থই তাহার অতিরিক্ত অল্প পদার্থের বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। ‘এইটি’ বলিলে ‘সেইটি’র ভাব মনে আসে; ‘এখানে’ বলিলে ‘সেখানে’র সম্বন্ধ জাগরুক হয়; ‘এখন’ বলিলে ‘তখন’-কার স্মৃতি উদয় হইয়া থাকে। এইরূপ প্রত্যেক পদার্থ, প্রত্যেক সম্ভাব, অল্প ভাবের বা অবস্থার সহিত সম্বন্ধযুক্ত আছেই আছে। এ যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, যাহা ‘ক’ এবং যাহা ‘ক’-নহে—এ দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধও অঙ্গীকার করিতে হয়। এইরূপে বুঝা যায়, একের সহিত অস্ত্রের বৈপরীত্য বিজ্ঞাপন করিলেই তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের বিষয়ও সপ্রমাণ হইয়া যায়। অস্ত্রের সহিত যাহার প্রভেদ নাই এমন যে পদার্থ, তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব ও অচিন্ত্যনীয়। সর্বতোভাবে বৈপরীতাসম্পন্ন পার্থক্য-বিশিষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব-স্থাপন স্বতঃবিরোধ-জ্ঞাপক; কেন-না, অল্প হইতে পৃথক সত্তা মনন করিলেই সে ‘অস্ত্রের’ সম্বন্ধ আপনা-আপনিই আসিয়া পড়িবে। এবং বিধ বৈপরীত্য-বাদ সম্পূর্ণ-রূপ যুক্তিহীন। নির্দিষ্ট বিষয়ের চিন্তায়, তাহার বিপরীত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের বিষয় নিশ্চয়ই সূচিত হয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী এইরূপে বুঝিতে পারা যায়। মনে করুন, এই একটা ঘট—সীমা-বিশিষ্ট পদার্থ। উহাকে সীমা-বিশিষ্ট মনে করিলেই উহার সীমার একটা পরিমাণ আছে, বুঝিতে হয়। কিন্তু সেই সীমা উহার আয়তন বা অল্প কোনও পদার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট? উহার সে সীমা ও নিজে করিয়াছে—না, অল্প কিছু বিद्यমানতা-হেতু ঘটয়াছে? এখানে নিশ্চয়ই বুঝা যায়, ঐ ঘট ভিন্ন ‘অল্প কিছু’ উহার সীমার নির্দেশক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব প্রতিপন্ন হয়, ঐ ঘটের সীমা তদ্বিতর পদার্থ দ্বারাই সূচিত হয়; এবং ঘটের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলেই অল্প কিছু (ঘট ভিন্ন অল্প কিছু) মাথ করিতে হয়। এইরূপ ঘট মনে করিলে, তাহার আকার, বর্ণ প্রভৃতির বিষয় মনে আসে। সেই সকল বিভিন্ন ভাব-উপাদান লইয়াই ঘট-পদার্থের অস্তিত্ব। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়, যে বিভিন্ন ভাব-সমষ্টি ঘট-পদার্থের জ্ঞাপক; তাহা ঐ ঘটে আছে অথবা নাই—‘ঘট’ শব্দের উল্লেখে সেই উভয় ভাবই জ্ঞাপন করে। এইরূপে, ঘটের অস্তি-নাস্তি-মূলক যে সাধারণ ধর্ম, তাহার প্রত্যাখ্যান করিলে ঘটের ঘটত্বই লোপ পায়। অতএব, এ পক্ষে শঙ্করাচার্যের যে যুক্তি, তাহা প্রমাদ-পরিশূন্য নহে। জৈন-দর্শনের দ্বারা প্রত্যেক পদার্থই তাহার আয়তন চতুর্বিধ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; পরন্তু পরগত সে চতুর্বিধ বিষয়ের সহিত সে কোনরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট নহে। “সর্বমন্তি স্বরূপেন পররূপেন নাস্তি চ”;

have to admit that when *Brahman* is thought of in relation to what is *other* than Being, it is equal to Non-being (অসৎ). If you don't admit this, the Non-being of *Brahman* as what is *other* than the nature of Being itself, then your *Brahman* would be of the nature of *Non-Being*, say of Ne-science or illusion as well. But this would lead to the deterioration of the true nature of your *Brahma* which is but *existence* pure and simple.”—Vide, *An Epitome of Jainism*.

অর্থাৎ, আত্ম-রূপের সহিত তাহার যে সম্বন্ধ, পর-রূপের সহিত তাহার সে সম্বন্ধ নাই। সেই ঘটের দৃষ্টান্তই এ পক্ষে প্রমাণ-স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। ঘটের অস্তিত্ব (বিশ্তমানতা) সপ্রমাণ হয়—চতুর্কিধ বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ-হেতু। প্রথম—‘দ্রব্য’; মৃত্তিকা ঘটের উপাদানভূত, সুতরাং ‘দ্রব্য’ বিষয়ে মৃত্তিকার সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে বলিতে পারি। দ্বিতীয়—‘ক্ষেত্র’ (স্থান); ঘট কলিকাতায় বা যে স্থানেই অবস্থিত হউক, সেই ক্ষেত্রের (স্থানের) সহিত তাহার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। তৃতীয়—‘কাল’; শীত বা গ্রীষ্ম যে কালেই তাহার বিশ্তমানতার বিষয় অনুভব করা যাউক, তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ অপরি-হার্য। চতুর্থ—‘ভাব’ (বর্ণাদি); ঘট শ্বেত বর্ণ হইতে পারে, কৃষ্ণ বর্ণ হইতে পারে, অথবা তাহাতে জলাদি ধারণের একটা পরিমাণ থাকিতে পারে; এবং বিধ সম্বন্ধকেই ঘটের চতুর্থ সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায়। ফলতঃ, পূর্বোক্ত চতুর্কিধ সম্বন্ধই (স্ব-চতুষ্টয়) ঘটের ‘অস্তি’ ভাব-জ্ঞাপক এবং তদ্বারাই ঘট ‘সৎ রূপ’ অভিধানে অভিহিত হইয়া থাকে। অন্যপক্ষে ‘পটের’ দৃষ্টান্ত অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। ঐরূপ দ্রব্য-কাল-ক্ষেত্র-ভাব চতুর্কিধ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই পটের পটত্ব প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু সাদৃশ্য-সম্বন্ধ সত্ত্বেও পট—পটই, পট কখনও ঘট নহে। সেখানে ‘পটের’ ‘অস্তি’-ভাব অঙ্গীকার করিব বটে; কিন্তু ঘটের ‘নাস্তি’-ভাব স্বীকার করিতে হইবেই; সেখানে ঘট ‘নাস্তি’, ঘট অসৎ-রূপ। এইরূপে ঘটের ক্ষেত্রে পটের ‘নাস্তি’-ভাব এবং পটের ক্ষেত্রে ঘটের ‘নাস্তি’-ভাব পর্যায়ক্রমে মানিয়া লইতে হয়। ফলতঃ, প্রত্যেক পদার্থই তাহার আত্মগত চতুর্কিধ উপাদান-বিষয়ে ‘অস্তি’-ভাবাপন্ন; আর পরগত সে চতুর্কিধ উপাদান-বিষয় তাহার ‘নাস্তি’-জ্ঞাপক। যদি বলা যায়—প্রত্যেক পদার্থই প্রত্যেক পদার্থের সহিত পূর্বোক্ত আত্মগতভাবে ও পরগত-ভাবে সম্বন্ধযুক্ত আছে; তাহা হইলে সকলই অভিন্ন এক হইয়া দাঁড়ায়; তাহা হইলে, আলোক ও অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, জীব ও অজীব, একত্ব ও বহুত্ব, সাক্ষ ও অনাক্ষ, জ্ঞান ও জ্ঞানের পছা, পরস্পর-বিপরীত-ভাবাপন্ন সমস্তই অভিন্ন একপিণ্ডাকারে পরিণত হইয়া যায়। তখন কোনও পদার্থের সহিত কোনও পদার্থেরই আর পার্থক্য স্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু সে অভিন্নত্ব—সে একত্ব আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ধ্যান-ধারণার অগম্য। কেন-না, জ্ঞানে বস্তুপক্ষে ও সত্যপক্ষে স্বাতন্ত্র্য ও বিভিন্নতাই প্রকট হইয়া আছে। এ ক্ষেত্রে স্বয়ং শব্দের বাক্যই শব্দের সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায় না কি? তিনি যখন বলিলেন—“জীবই ব্রহ্ম”; তখনই কি স্বীকার করিয়া লওয়া হইল না—ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধে ‘জীব’ স্বতন্ত্র ‘অসৎ’ পদার্থ। যদি ইহা অস্বীকার কর, সকলই অভিন্ন এক বলিয়া অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে জীব হইতে স্বতন্ত্র সেই যে অজীব (অসৎ), তাহাকেও ব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে, তোমার যে ‘ব্রহ্ম’, তিনিও ‘অসৎ অজ্ঞান বা মায়া’ মধ্যে পরিগণিত হন। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তে, ব্রহ্মের যে প্রকৃত স্বরূপ—সেই যে বিশুদ্ধ সৎ, তাহা উড়িয়া যায়। অন্তএব ‘অস্তি’ স্বীকার করিতে হইলেই ‘নাস্তি’ স্বীকার আবশ্যক হইয়া পড়ে; “নৈকশ্লিষসত্ত্ববাৎ”—স্বত্রই বার্থ প্রতিপন্ন হয়।

বাদ-বিবাদের অধিক আলোচনা নিম্নরূপে। পূর্বেই তো বলিয়াছি, যে পক্ষ যখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যে পক্ষে যখন জ্ঞানী মনীষিগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; সে পক্ষের সুতীক্ষ্ণ বিতর্ক-অস্ত্রে অপর পক্ষ তখনই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সকল ধর্ম-মতের অভ্যুদয় সম্বন্ধেই এই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সাংখ্যগণ যখন জ্ঞানে গুণে গৌরবান্বিত হন, তখনই তঁাহারা অন্যান্য দার্শনিক-সম্প্রদায়ের দীর্ঘস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। বৈদান্তিকগণের মধ্যে যখন শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের জায় মহাপুরুষের অবির্ভাব হয়, তখন অপর সকল মতবাদই বেদান্তবাদের নিকট নতশির হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয়—সে কোন্ সময়ে ?—যখন ভারতবর্ষের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই বৌদ্ধ-ধর্মের পরিপোষণ-কল্পে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। জৈন-ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠা বিষয়েও ঐ একই জ্ঞানবলের সহায়তা স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানান্নি প্রকৃষ্টরূপে প্রস্রাবিত না হইলে পারিপার্শ্বিক পদার্থ-নিচয়কে ভস্মসাৎ করিবেই বা কি প্রকারে ? আর তাহার দিব্য-জ্যোতিঃই বা বিকাশ পাইবে কি প্রকারে ? সুতরাং যে পক্ষ যখনই আপন জ্যোতিঃ-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে, যে পক্ষ যখনই প্রতিপক্ষকে নিম্নত করিতে পারিয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে—তখনই সে পক্ষ এক অসামান্য অলৌকিক জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়কে বিচারে পরাভূত করিয়া আপন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য-খ্যাপন অমাহুষিক অনৈসর্গিক শক্তিমত্তার লক্ষণ, সন্দেহ নাই। সেই শক্তি যখন যে পথে স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে, সেই পথেই তখন সরল-সুগম ও সংপথ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অথবা ভাবান্তরে বলিতে গেলে বলিতে পারি, বিভিন্ন সমাজের বিপরীত প্রকৃতির মানুষের জন্ত যে পথ যখন উপযোগী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই পথেই তখন শ্রীভগবান ধর্মাস্তরের মধ্য দিয়া প্রকারান্তরে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। নচেৎ, কোনও ধর্মমতই মানুষকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিবার জন্ত প্রবর্তিত হয় নাই, এবং কোনও ধর্মপথকেই আমরা কণ্টকাকীর্ণ বলিয়া মনে করিতে পারি না। এ জগতে নানা প্রকৃতির নানা লোক বসতি করে। জ্ঞানের ভারতম্য সকলেরই মধ্যে দৃষ্ট হয়। সুতরাং, তাহাদের সকলের জন্ত একরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা কখনই বিহিত হইতে পারে না। আমরা মনে করি, সেই কারণেই ধর্মমতের বিভিন্নতা,—শিক্ষা-প্রণালীর ভারতম্য ভাব। কোন্ ধর্মমত যে উচ্চ এবং কোন্ ধর্মমত যে অমুচ্চ, এ ক্ষেত্রে সে ভাব আমাদের মনে আদৌ স্থান পাইতেছে না। পরন্তু সাধকের ও সাধনার ভারতম্য অমুসারে সকল ধর্মের মধ্যেই উচ্চামুচ্চ গতিলাভের পথ পরিস্কৃত হইয়া আছে। এক্ষণে এ ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে,—তবে বিরোধ-বিতণ্ডা কেন ? তবে বিভিন্ন দার্শনিক মতের দ্বন্দ্ব সত্যতত্ত্ব এত জটিল করিয়া তুলিয়াছে কেন ? নানা প্রকারে এ প্রশ্নের সমাধান করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সংকথার আলোচনায়, মনে সন্দাব বদ্ধমূল হয় ;—সত্যের সন্ধান মন সংপথে প্রধাবিত হইতে শিখে। দ্বিতীয়তঃ, ভ্রান্তি বুদ্ধি স্বাভাবিকী ; অসত্যে প্রবৃত্তি মানুষের চিত্তভোবিনী ; সুতরাং মিথ্যার মধ্য দিয়া, বিতর্কের মধ্য দিয়া, ভ্রম বৃত্তিতে পারিয়া, চিত্ত যদি সত্যের প্রতি প্রধাবিত হয় ;—এ পক্ষে সে প্রশ্নসত্ত্বে ব্যর্থ নহে, মনে করা

বাইতে পারে। অবশ্য দর্শনিকগণ এতদূর বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত হন কি না, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু শাস্ত্রালোচনায় শুভফল-প্রাপ্তি পক্ষে বিশ্বাসবানু হইতে পারিলে, বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বিতর্ক-বিতণ্ডার মধ্যে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই উপপন্ন হয়। বিতর্ক কি লইয়া? বিতণ্ডা কিসের জন্য? মাত্র নাম ও সংজ্ঞা ভিন্ন অল্প আর কিসের বিরোধ মনে হইতে পারে? মূলে সকলই এক দেখি; বস্তুপক্ষে সকলেরই অমুসংস্কার একই সামগ্রী বলিয়া বুঝিতে পারি; অথচ, পরস্পরের মধ্যে স্বন্দেহ পারসীমা নাই। সকলেরই সিদ্ধান্তের বিষয়—‘সৎ’ (সত্য)। ‘সৎ’ (সত্য) যাহা, তাহা চিরদিনই ‘সৎ’ (সত্য) আছে। যাহা আজ ‘সৎ’ (সত্য), তাহা কাল ‘অসৎ’ (মিথ্যা) হইতে পারে না। অপিচ, যাহা একরূপে ‘সৎ’ (সত্য), তাহা অত্ররূপে ‘অসৎ’ (মিথ্যা) কখনই সম্ভবপর নহে। ‘সৎ’ (সত্য) যাহা, সকল কালে সকল অবস্থায় তাহা ‘সৎ’ (সত্য) আছে। বিতর্ক—কেবল তাহার স্বরূপ বুঝাইবার জন্ত। যাহার যেরূপ বুদ্ধি, যেরূপ জ্ঞান, তিনি সেইভাবে উহা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বিতণ্ডা তদ্বিন্ন আর অত্র কিছুই নয়। কেহ কহিলেন,—স+ত্য=সত্য হয়; কেহ কহিলেন—স্+অ+ত্+য্+অ=সত্য হয়। বিতণ্ডা প্রায় এই রকমেরই। কেহ বা ভাষান্তরে ভাষান্তরে ‘সচ’, কেহ বা ‘ট্রুথ’ (truth) ইত্যাদি রূপেও সত্যের নির্দেশ করিয়া দিলেন। বস্তুপক্ষে যাহা, তাহা অপরিবর্তিত রহিল; কেবল তাহা বুঝানর জন্তই যত গুণ্ডগোল ঘটিল। এইরূপে, মানুষকে যেমন সত্যের অমুসংস্কার দেখি, তেমনই আবার তাহাকে তাহার এই সাংসারিক আত্মাত্মিক হুঃখ-নিবৃত্তির জন্ত লালায়িত দেখি। সেই যে তাহার আত্মাত্মক হুঃখ-নিবৃত্তির অবস্থা-কল্পনা, সেখানেই আবার কত বিরোধ? নাম-সংজ্ঞাই কতবিধ! কেহ কহিলেন—মোক্ষ, কেহ কহিলেন—মুক্তি, কেহ কহিলেন—কৈবল্য, কেহ কহিলেন—নিঃশ্রেয়স্, কেহ কহিলেন—নির্বাণ, কেহ কহিলেন—সোহং, কেহ কহিলেন—সম্ব। যতই সংজ্ঞার ও বিশেষণের পার্থক্য থাকুক না কেন, দার্শনিকগণের সেই যে অবস্থার পরিকল্পনা, বস্তুপক্ষে তাহা কখনই বিভিন্ন হইতে পারে না। আহাৰ্য্য বলিলে যাহা বুঝায়, অন্ন বলিলেও তাহাই বুঝায়। স্বর্ণস্থানী বলিলে যাহা বুঝায়, সোণার পাত্র বলিলেও তাহাই বুঝায়। অতএব, অমুসংস্কার বিষয় সম্বন্ধে কোনই পার্থক্য প্রতিপন্ন হয় না। দ্বন্দ্ব কেবল—অমুসংস্কারের পদ্ধতি লইয়া। তাহাও আবার অনেক স্থলে একই পরিণামমূলক; অথচ, দৃষ্টি-বিভ্রম-হেতু বিষয় বৈষম্য-মূলক বলিয়া অস্বত্ব হয়। আমরা ‘বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের বাদ-বিতণ্ডা’ অভিধানে এই যে প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছি, এবং ইহারই মধ্যে এক সম্প্রদায় কর্তৃক অপর সম্প্রদায়ের প্রতি যে তীব্র বিতর্ক বাণ নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়াছি; তাহারই যদি মূল অমুসংস্কার করি, স্বরূপ অবগত হইবার চেষ্টা করি, তাহাতেই বা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই না কি—বুঝিতে পারি না কি—বিভ্রম তাঁহাদের নয়। বিভ্রম আমাদেরই বুঝিবার। বলদেব বিভ্রান্তের ভাষে বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যায় যে মত পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি অনেক স্থলে অন্তায় আক্রমণ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তবে তিনি যে সম্প্রদায়ের পরিপোষক, যে সম্প্রদায়ের শুভ-কামনায় তিনি গৃহীতব্রত, তাহার পক্ষে

ঐক্য বাখ্যা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নহে। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে নারায়ণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইবার উপদেশ দিতে গিয়া তিনি যদি বৈষ্ণবেতর সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্প্রদায় বতচু অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক দূরে পিছাইয়া পড়িত। সুতরাং আপন সম্প্রদায়ের উন্নতির পথ প্রদর্শন পক্ষে তিনি যে পন্থা পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিতে চাহি না। অধিকারি বিশেষের নিকট কীর্তিত হইলে, অনেক স্থলে সাম্যে বৈষম্য ও বৈষম্যে সাম্য আনয়ন করে। যে আশীষি সাক্ষাৎ মৃত্যু-স্বরূপ, বিজ্ঞ ভিক্ষকের হস্তে তাহাই আবার প্রাণ-রক্ষার উপাদানভূত ভেষজে পরিণত হইয়া থাকে। তদ্ব্যভিজ্ঞ ও তদ্ব্যনভিজ্ঞ জনের নিকট একই সামগ্রী বিপরীত কল প্রদান করিয়া থাকে, তাহা আমরা সর্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। অতএব সকল স্থলে সমান শিক্ষা প্রচার অব্যোক্তিক বলিয়াই মনে করি। বলদেবের ব্যাখ্যা যখন প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার আবশ্যকতা ছিল—ইহাই মনে করিতে হইবে। কিন্তু তদ্বারা কেহ যেন বিভ্রান্ত না হন, অত্যাচার বাদে কোনও সত্য নাই বলিয়া ভ্রমে না পড়েন,—এ সকল কথা বলিবার ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

তার পর, এ প্রসঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ সূত্রে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, জৈনাচার্য্যগণের পবিত্রিত 'স্বাধাদে' এবং "নৈকশ্মিন্নসমুবাৎ" এই বেদান্ত-সূত্রের শঙ্করাচার্য্য-

কৃত ব্যাখ্যায় যে বিবম সংঘর্ষ ঘটয়াছে; তাহার কি কোনও নিরাস
সেই 'একে' হইতে পারে না? শঙ্করাচার্য্য বিভ্রম-গ্রস্ত, কি জৈনাচার্য্যগণ বিভ্রমগ্রস্ত,
সকলই সম্ভব।

কে তাহা সাহস করিয়া কহিতে পারেন? ঐ দুই বিপরীত মতের মধ্যে

কি কোনরূপ সমতা দৃষ্ট হয় না? আমরা কিন্তু মনে করি, দুই মতের কোনও মতই প্রামাণ-পূর্ণ নহে। শঙ্করাচার্য্য বাহা খ্যাপন করিয়াছেন, তাহাও ঠিক; আবার জৈনাচার্য্যগণ বাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাও অঠিক নহে। দুই সম্প্রদায় দুই ভাবে দুই দিক হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং দৃষ্ট বস্তু দুই ভাবে প্রতিভাত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দুই-জন মহাসাগর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। একজন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংবাদ দিলেন,—‘মহাসাগর অনন্তবিস্তৃত’; আর একজন ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করিলেন,—‘মহাসাগর অতলম্পর্শী।’ অজ্ঞজন মনে করিল, ঐ দুই জনের একজন নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। অথচ দুই জনই যে সত্য কথা কহিয়াছেন, তাহা সুনিশ্চিত। কিন্তু দুই জনের মুখে দুইরূপ পরিচয় শুনিয়া অজ্ঞ জনের মনে মহাসাগর সম্বন্ধে যদি ভ্রম-ধারণা জন্মে, তাহার জন্য তাঁহারা কখনই অসত্যবাদী হইতে পারেন না। সাধারণ-বোধ্য এবম্বিধ সাদৃশ্য খ্যাপন—তর্ক-শাস্ত্র মতে দোষদৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বস্তুপক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, উভয় ব্যাখ্যাই একার্থ-বোধক। এক ব্যাখ্যা ‘বস্তু’-মূলক, অপর ব্যাখ্যা—‘ভাব’-মূলক। যখন প্রকৃত সেই ‘সৎ’ পদার্থকে (পদার্থ সংজ্ঞাই দিতে হইল) বুঝাইতে হইবে, তখন তাহার সহিত অণুর (অসতের) সম্বন্ধ কখনই সূচিত হইবে না বা হইতে পারে না। ‘সৎ’—অবিমিশ্র; সতের সহিত অসতের, সত্যের সহিত মিথ্যার সংযোগ নিশ্চয়ই অসঙ্গীকার করা যায় না। শঙ্করাচার্য্য যে উপমা প্রদান করিয়াছেন, শৈত্যের সহিত উষ্ণতা একত্র থাকিতে পারে

না বলিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ; তাহাতেই বুঝা যায়, তিনি ‘বস্তু’-পক্ষ ধরিয়াই বিচার করিয়া গিয়াছেন। আর জৈন-দার্শনিকগণ যে দিক দিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা তাবাহুগত বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। লক্ষ্য—স্বরূপ-তত্ত্ব-প্রকটন। যিনি যে ভাবে সত্য-তত্ত্ব ব্যক্ত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবেই তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ দুই দিক হইতে দুই ভাবে দেখার দরুণ ব্রহ্মের পরিচয়ে ঐতি কখনও বলিয়াছেন—‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে’, ‘বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা ভুবনস্ত গোপ্তা’ ; কখনও বলিয়াছেন—‘নিগুণং পরমং ব্রহ্ম’। ফলতঃ, যিনি সৰ্বস্বরূপ, তিনি নিগুণ হইলেও গুণময়, আবার গুণময় হইলেও নিগুণ। তিনি অবিচ্ছিন্ন হইলেও বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন হইলেও অবিচ্ছিন্ন। এই লক্ষ্য রাখিয়া “নৈকস্মিন্নসমুবাৎ” সূত্রের অর্থ অতীতরূপেও উপপত্তি করিতে পারি। আর তাহা হইলে, বোধ হয় সকল সম্প্রদায়ের সৰ্বপ্রকার বিরোধ ভঞ্জন হইয়া যাইতে পারে। ঐ সূত্রের অর্থ যদি করি—‘একে সকলই সম্ভব’, তাহাতেও দোষ হয় না। যেখানে দুই ‘ন’ আগম (‘ন’ একস্মিন্ ‘ন’ সমুবাৎ) ; সেখানে ‘ই’ অর্থ স্বীকার সমীচীন নহে কি ? পূৰ্ব্বাপর অর্থসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও এ ভাব মনে আসিতে পারে। পূৰ্ব্ববর্তী দ্বাত্রিংশ সূত্রে “সৰ্ব্বধাতুপত্তেষ্চ” বাক্যে, পূৰ্ব-পূৰ্ব্ব ধর্ম-মত-সমূহের খণ্ডন করিয়া তাহাদের অসুপপত্তির বিষয় ঘোষণা করা হইল। শেষ বলা হইল,— “নৈকস্মিন্নসমুবাৎ।” অর্থাৎ, আর সকল প্রকার বিষয় বিতর্কের স্থান ; কিন্তু ‘এক’ স্বীকার করিলে সকলই সম্ভব হয়, অর্থাৎ সৰ্ব-সম্ভবের হেতু—সেই ‘এক’ ; সেই ‘একে’ সকলই সম্ভবপর। আমরা এই দৃষ্টিতেই দেখি। এই দৃষ্টিতেই বিভিন্ন বিপরীত দার্শনিক মতবাদের সামঞ্জস্য সাধিত হয়। সৰ্বদর্শনের যদি কিছু সার নিষ্কাশন করিতে পারা যায়, সেই ‘এক’ স্বীকারই সেই সার-নিষ্কাশনের ভিত্তিস্থানীয়। সেই একের অস্বীকার-হেতুই নাস্তিক্যাদি দর্শন হইয়া বলিয়া পরিগণিত। আর, সেই একের অস্বীকার হেতু অন্তান্ত দর্শন-শাস্ত্র-সমূহ জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং বিতর্কের সহস্র বিভেদের মধ্যেও পরস্পর সমতা-প্রাপ্ত। দর্শন-শাস্ত্রের সমন্বয়-সাধনে অসুসঙ্গিত হইলে, অসুসঙ্গানকারী অনিশ্চয় সে সঙ্গান লাভ করিতে সমর্থ হন। স্বরূপ অবগত হওয়াই সকল দর্শনের মূল লক্ষ্য। কেহ বলেন—বিবেকোদয়েই নিঃশ্রেয়স ; কেহ বলেন—অবিচার উন্মূলনই অতীষ্ট ফল-লাভ ; কেহ বলেন—পরমাত্মা জীবাশ্মার সাক্ষাৎকারই মোক্ষ ; কেহ বলেন—তত্ত্ব-জ্ঞানেই মোক্ষ লাভ হয়। ভাষাভাষে এইরূপ সামান্য পার্থক্য থাকিলেও প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মধ্যে সামান্য ইতর-বিশেষ থাকিলেও, মূল বিষয় সর্বত্রই অভিন্ন দেখিতে পাই। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক প্রভৃতির যে অধিকার অবসান, তাহারই নাম—সৰ্বভুৎখনাশ। সাধের এই যে সিদ্ধান্ত ; যোগ সাধনার মধ্যেও ইহাই অভিব্যক্ত। কিবা বৈশেষিক, কিবা স্তায়, সর্বত্রই ঐ ভাবেরই জ্বীড়া দেখি। কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয় কর, জ্ঞান-মূলে স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর,—এ ভিন্ন নূতন শিক্ষা কি আর আছে ? কি আর থাকিতে পারে ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।



প্রাগভারতেতিহাসে প্রথম সত্রাট ।

[ধর্মশক্তিই রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করে,—ধর্মশক্তির সাহায্যেই চন্দ্রগুপ্ত রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ;—চন্দ্রগুপ্ত কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন,—তাঁহাকে জৈন-ধর্মাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তি-পরম্পরা ;—চন্দ্রগুপ্তের অমরত্বে চাণক্যের প্রভাব,—কালিদাস যেমন বিক্রমাদিত্যকে অমর করিয়া গিয়াছেন,—চাণক্য সেইরূপ চন্দ্রগুপ্তকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন ;—চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব-কাল,—তাঁহার অভ্যুদয় ও রাজ্যকাল সম্বন্ধে নানা মতের আলোচনা,—জৈন মতে তাঁহার রাজ্যকাল ;—অসাধারণ মানুষ চাণক্য,—তাঁহার জ্ঞান মহাজ্ঞানী, মহা-রাজনীতিক এবং মহা-শক্তিশালী পুরুষ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করে ;—চাণক্যের বংশাদির বিবরণ এবং তাঁহার সহিত চন্দ্রগুপ্তের মিলন-বৃত্তান্ত ;—‘অর্থশাস্ত্র’ রচনার চাণক্যের কৃতিত্ব,—তদ্বারা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাশাসন-প্রণালীর আভাষ-প্রাপ্তি ;—চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে স্বদেশে ও বিদেশে যে সকল কিস্কদন্তী প্রচারিত আছে, তাহার সার নিকাষণ ;—চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে বিবিধ বিস্তার উৎকর্ষ সাধন,—সে সাম্রাজ্য সম্ভব-সমুন্নত সমাজের আদর্শ-স্থানীয় ।]

প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত-ব্যাপনে আমরাদিগকে পুনঃপুনঃ ধর্ম ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইতেছে। আধুনিক ইতিহাসের ধারানুসারী কেহ হয় তো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন—ইতিহাস লিখিতে গিয়া এ অবাস্তব প্রসঙ্গ কেন ? কিন্তু ধর্ম-শক্তিই রাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠা করে। প্রসঙ্গ যে অবাস্তব নহে, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বোধগম্য হয়। কেন-না, ভারতবর্ষে যত ধর্মমতের ও যত ধর্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই সকল ধর্মমতের ও ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান্যের উপরই ভারতের রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা হইতে দেখিতে পাই। ভারতের ধর্মনৈতিক উন্নতিই তাহার রাজনৈতিক উন্নতির মূলভূত প্রতিপন্ন হয়। আধুনিক ইতিহাসের গভীর বাহিরে যে দৃষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেখানে তো সে ভাব পরিস্ফুট হইয়া আছেই ; পরন্তু অধুনা যাহা ‘প্রাগ-ঐতিহাসিক কাল’ বলিয়া বিধোষিত হয়, সেখানেও সেই দৃষ্ট দেখিতে পাই। মাসিডোনিয়ান আলেকজান্ডারের ভারতগমনে পর হইতে ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ বলিয়া যাহারা মনে করেন ; তাঁহাদিগের প্রতীতির অশ্রু দেখাইতে পারি, সে ইতিহাসেরও আরম্ভ—ধর্মের ভিত্তির উপর। আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন, তখন কোন্ শক্তির ক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল ? কেবল অস্ত্রবলে নহে, কেবল বাহুবলে নহে,—এক দৈবশক্তির ক্রিয়াই তখন ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছিল ;—এক ঐশ্বরী-শক্তির লীলাই তাৎকালিক বিচ্ছিন্ন ভারত-রাজ্যকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া বিস্তৃত বিশাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিল। সেই সময়ের কথাই বলিতেছি,—যখন রাজ-চক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত,—যখন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ তাঁহার প্রাধান্তের নিকট নতশির। তাৎকালিক ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থার বিবরণ পর্যালোচনা করিলে, ভারতে ধর্মশক্তির সহিত রাজশক্তির অভেদ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের

বিষয়ে স্পষ্টই প্রীতি জন্মিবে। যে জৈনধর্মের পরিচয়-প্রসঙ্গে এই খণ্ড ‘পৃথিবীর ইতিহাসের’ অনেক স্থান পর্যাবসিত হইয়াছে ; সেই জৈন-ধর্ম-রূপ শক্তির বিদ্যুৎ-প্রবাহ তখন হৃদয়ে হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছিল। চন্দ্রশুকের ছায় শক্তিশালী ভেজস্বী পুরুষে সেই ধর্মমতের প্রভাব মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জৈনধর্ম যেমন ‘অস্তির’ পার্শ্বে ‘নাস্তির’ সংযোগ ঘোষণা করে ; আসক্তির পার্শ্বে অনাসক্তির (ত্যাগের) ক্রিয়াও সে সময়ে সেইরূপ প্রবল হইয়াছিল। জৈনধর্ম যখন শিক্ষা দিল—ত্যাগই সার-সামগ্রী ; আর জনসত্ত্ব যখন দলে দলে সেই ত্যাগের মহীয়সী মহিমার মুগ্ধ হইয়া পড়িল ; মেধাবী চন্দ্রশুক সেই সুযোগ গ্রহণ করিলেন,—সেই ত্যাগের অস্ত্রে আপনার শক্তি-সঞ্চয়ে সমর্থ হইলেন। সুবিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক যেমন একই কেন্দ্র-শক্তিকে নানা ভাবে নানা রূপে পরিচালন করিতে সমর্থ হন ; অগ্নি ও জলের সমবায়ের সৃষ্ট বাষ্পশক্তি লইয়া তিনি যেমন আপন ইচ্ছামত কখনও রেলগাড়িতে, কখনও বা ষ্টীমারে, আবার কখনও বা অস্ত্র কোনরূপ কল-পরিচালনে নিযুক্ত করেন ; জৈনধর্মের অভ্যুদয়রূপ সম্ভবশক্তিকে লইয়া অশেষ ধী-শক্তি-সম্পন্ন চন্দ্রশুক সেইরূপ শক্তি-দগনে সাম্রাজ্য-স্থাপনে কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছিলেন। শক্তি যদি প্রস্তুত থাকে, আর কৃত্তী ব্যক্তির যদি সে শক্তি করতলগত হয়, তাহা হইলে তদ্বারা তিনি যথেষ্ট সুফল লাভ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? জৈনধর্মমতের প্রাধান্তে মানুষের মন মায়ামমতা-পরিশুদ্ধ হইয়াছিল ; এমন কি, আত্মদেহে পর্যাস্ত—জীবন-ধারণে পর্যাস্ত তাঁহাদের স্পৃহা ছিল না। এইরূপ সর্বত্যাগী সম্মান-ব্রতধারী জৈনগণের সহায়তা পাইয়াই সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার চন্দ্রশুক কৃতকার্যতা লাভ করেন, তাৎকালিক ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। এখানে একটা সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে। সর্বত্র জীবদর্শন এবং জীবের দয়া বাঁহাদের ধর্ম-শিক্ষার মূল, তাঁহারা কেন লোকবিশ্বংসকারী বিষম সময়ে সহায় হইবেন ? কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি তো, ত্যাগে ও আসক্তিতে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, শক্তির ক্রিয়া এক দিক দিয়া হইবেই হইবে। আমরা তাই ‘সকাম’ ও ‘নিকাম’ শব্দদ্বয়কে অনেক সময় সমানার্থ-বোধক বলিয়া মনে করি। সে হিসাবে, যে জন যত নিকাম, সে জন তত সকাম নির্দেশ করিতে পারি। *

* মহামতি কবিরের একটা দোঁহায় এই উক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখিতে পাই। কবির বলিয়াছেন,—
 “বন্ধন নিরুবন্ধন ভয়া নিরুবন্ধন বন্ধন হোয়।” বিভিন্ন পণ্ডিত এই গুণ্ডির বিভিন্নরূপ অর্থ নিকাষণ করিতে গারেন। অর্থ হইতে পারে—‘যে জন ভগবানের চরণে বাঁধা পড়িয়াছে, তাহার ভব-বন্ধন মুক্ত হইয়াছে ; কিন্তু যে জন সে চরণে আপনাকে বাঁধিতে পারে নাই, সংসারের বন্ধন তাহাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।’ অর্থ হইতে পারে—‘বন্ধনই নিরুবন্ধন অর্থাৎ আসক্তিই অনাসক্তি ; এবং নিরুবন্ধনই বন্ধন অর্থাৎ অনাসক্তিই আসক্তি।’ বস্তপক্ষে দুই অর্থই এক। আর, তদনুসারেই আমরা বলিতে পারি, সকামই নিকাম, নিকামই সকাম যখন ইহন্যসারে পুত্রকলত্রাদির বা ধন-সম্পত্তির প্রতি মানুষ আসক্ত হয়, তখনই তাহার আসক্তিকে সকাম বলা যায়। কিন্তু তাহার সে আসক্তি যখন সেই ক্ষুদ্র গুণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহার সে আসক্তি অনাসক্তি মধ্যে গণ্য হয় ;—তাহার বন্ধন তখন নিরুবন্ধন হইয়া যায়। উপস্থিত ক্ষেত্রে এই হিসাবে নিকামকে সকাম বলিতে পারি যে, তাঁহার সকল সংসার-কামনা পরিহার-পূর্বক নিকাম হইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু জগতের জীবের হিতসাধন-কর্মেরা তাঁহাদের অন্তরে জাগরুক হইয়াছিল ;—তাঁহাদের বন্ধন নিরুবন্ধন হইলেও নিরুবন্ধন বন্ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কলতঃ, জৈনধর্মের অমুরাগী জনরূপ নিকাম অঙ্গ-সমূহ প্রস্তুত ছিল। অঙ্গ নিজে নিকাম হইলেও কামনার অংশভূত জনের হস্তে পড়িয়া তাহার ক্রিয়া অবশ্রুতাবী হইয়া পড়িয়াছিল; আর তাহারই প্রভাবে চন্দ্রগুপ্তের মৌর্য্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, প্রাগ-ভারতীয় ইতিহাসেও ধর্ম্মশক্তিকেই রাজ-শক্তির প্রতিষ্ঠাতরূপে প্রকট দেখি।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, চন্দ্রগুপ্ত কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন? তিনি হিন্দু ছিলেন, কি বৌদ্ধ ছিলেন, কি জৈন ছিলেন,—তিনি কোন্ ধর্ম্ম মাগ্ন করিতেন? অধুনা মৌর্য্যরাজ-

চন্দ্রগুপ্ত বংশকে স্মরণে চন্দ্রগুপ্তকে পারস্যের অধিবাসী এবং পারসিক রক্ত-
কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী সংশ্রবযুক্ত বলিয়া এক মত বিবোধিত হইয়া থাকে। * সে মত যে ভিত্তি-
ছিল? হীন করনা মাত্র, তাহাতে সংশয় নাই। স্মরণে সে মতে আদৌ

আত্মস্থাপন করিতে পারা যায় না। অপিচ, চন্দ্রগুপ্ত যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাম্বলম্বী হিন্দু-
নৃপতি ছিলেন, তৎপক্ষেও কোনও প্রমাণ নাই। পরন্তু মাতৃ-পক্ষে দোষাশ্রিত বলিয়াই তাঁহার বিষয় প্রখ্যাত আছে। বৌদ্ধনৃপতিগণের নামের মধ্যেও তাঁহার নাম সন্নিবিষ্ট দেখি না। এদিকে জৈন-শাস্ত্রে ও জৈন-প্রবাদাদিতে তাঁহার সম্বন্ধ সর্ব্বথা প্রকীর্ণিত দেখি। চন্দ্রগুপ্ত যে একজন গোঁড়া জৈন ছিলেন, জৈন-গ্রন্থের একটি বর্ণনার তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। এক সময়ে মগধ-রাজ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দৃষ্টিক্ষ উপস্থিত হয়। জৈনাচার্য্য ভদ্রবাহু (ভদ্রবহু) আপন দলবল সহ সেই সময় দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে গমন করেন। মহীশূর-রাজ্যের 'শ্রাবণ বেলগোলা' নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাঁহার বসতি করিয়াছিলেন। সেই হইতে 'শ্রাবণ বেলগোলা' এক পবিত্র স্থান বলিয়া প্রখ্যাত আছে। সেই পবিত্র ক্ষেত্রে ভদ্রবাহু জৈন-রীতি অনুসারে ধ্যানস্থ হইয়া অনশনে দেহভাগ পূর্ব্বক নির্দ্বিগ্ন লাভ করেন। তদ্রূপে জৈনমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য আপনাকে ভদ্রবাহুর অনুবর্ত্তী শিষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। সেখানে প্রচার, এবং জৈন-গ্রন্থাদিতেও প্রকাশ,— রাজচক্রবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত সেই ভদ্রবাহুর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং গুরুর অনুগমন করিয়া

* ডক্টর স্পুনার (Dr. Spooner) এই মতের প্রধান প্রবর্তক। পাটলীপুত্র-নগর সান্নিধ্যে কুমড়াহার পল্লীতে আত্মকাননে (এই স্থান নবনির্ম্মিত পাটনা-সহরের পূর্ব্বাংশে রেল-লাইনের দক্ষিণে বাকিপুর ষ্টেশনের পূর্ব্ব-দক্ষিণে অবস্থিত) একটি স্তূপখনন কালে একটি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই অট্টালিকার শত-স্তম্ভযুক্ত একটি প্রকোষ্ঠ 'হল' ছিল, তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সেই অট্টালিকার হলের ও স্তম্ভাদির গঠনাদি দৃষ্টে, তিনি সিদ্ধান্ত করেন, পার্শ্বপোলিশ-সহরের শত-স্তম্ভযুক্ত 'হলের' আদর্শে এই 'হল' নির্ম্মিত হইয়াছিল। আর তাহা হইতে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চান, জোরোস্ত্রীয়ান-ধর্ম্মাবলম্বী পারসিকগণ কর্তৃক, ভারত ইতিহাসের জোরোস্ত্রীয়ান শাসন-কালে (Zoroastrian period of Indian History) এই অট্টালিকা প্রস্তুত হয়। চন্দ্রগুপ্তের জননী মুরদীগের কথা বলিয়া মুন্না নামে পরিচিতা হন; আর তদনুসারে মুর হইতে মৌর্য্যবংশের উৎপত্তি প্রতিপন্ন হয়। এবং বিধ নানা যুক্তির অবতারণায় তিনি মৌর্য্যগণকে পারসিকগণের সংশ্রবযুক্ত নৃপতি বলিয়া পরিচিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।—'আর্কিয়লজিকেল রিপোর্ট ১৯১৩-১৪ (Archæological Report 1913-14, Eastern Circle) প্রভৃতিতে এই বিবরণের গবেষণা আছে। তবে স্পুনায়ের এই মত এখনও আর্কিয়লজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক সর্ব্বথা পরিগৃহীত হয় নাই। সুতরাং এই বিবরণ এখন আর বাদ-প্রতিবাদ বৃথা। বাহা হউক, এই সিদ্ধান্ত আদৌ ভিত্তিহীন।

গুরুর সঙ্গে 'প্রাণ বেলগোলার' কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অধিকন্তু একপঙ কিশ্বদত্তী আছে যে, চন্দ্রশুভ্র সেইখানেই গুরুর আদেশে অনশনে তপস্ত্যাগ করেন। * বাহা হউক, এই উপলক্ষে, দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে, দাক্ষিণাত্যে যে জৈনধর্মের প্রচার হইয়াছিল, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। স্থানীয় প্রবাদাদির সঙ্গে এবং জৈন-শাস্ত্রের নানা-স্থানে এই ঘটনা বেরূপভাবে বিজড়িত হইয়া আছে, তাহা কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না। জৈন-সম্প্রদায় যে খেতাঘর ও দিগঘর দুই শাখায় বিভক্ত হন, জৈনধর্মের ইতিহাসে যেটি একটি বিশিষ্ট ঘটনা; তাহাও এই বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সে ঘটনাটি এই,—মহাবীর স্বামীর দেহত্যাগের প্রায় দুই শতাব্দী পরে, যখন চন্দ্রশুভ্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—সেই সময়ে, মগধ-রাজ্যে দ্বাদশবর্ষ-বাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ভদ্রবাহু (ভদ্রবহু) তখন জৈন-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দুর্ভিক্ষের ভীষণ গ্রাস হইতে জৈন-সন্ন্যাসীদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে শিষ্যাত্মচর্যবর্গকে সঙ্গে লইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট-প্রদেশ যাত্রা করেন। জৈন-ধর্মাবলম্বী অবশিষ্ট বাহারা এ দেশে থাকেন, তাঁহারা জৈনাচার্য্য স্থলভ্রের তত্ত্বাবধানে অবস্থিত রহেন। সেই সুদীর্ঘ-কাল-বাপী দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, জৈন-ভিক্ষুগণ "সিদ্ধান্ত"-শাস্ত্র-সমূহ একরূপ বিন্যস্ত হইয়া যান। পরিশেষে, দুর্ভিক্ষ নিবৃত্ত হইলে, জৈনশাস্ত্র-সমূহ সঙ্কলন করিবার জন্ত, পাটলিপুত্রে নগরে জৈন-ভিক্ষুগণের একটি সভ্য আহত হয়। ভদ্রবাহু তখনও দাক্ষিণাত্যে হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই। সুতরাং সে সভ্যে তিনি যোগদান করিতে পারেন নাই। বাহা হউক, সেই সভ্যে জৈন-ধর্মগ্রন্থ-সমূহ সঙ্কলিত হওয়ার পর হইতে, জৈনগণের আচার-ব্যবহার কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়া আসে। পূর্বে নিগ্রহগণ সকলেই বেরূপ-ভাবে নগ্নদেহে বিচরণ করিতেন, এখন সে ভাব পরিত্যক্ত হয়। সন্ন্যাসিগণ এখন হইতে খেতবর্ণের পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপক্ষে, দুর্ভিক্ষের প্রকোপে যে সম্প্রদায় দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, তাঁহারা নগ্নদেহেই বিচরণ করিতেন। দুর্ভিক্ষ শান্ত হওয়ার পর তাঁহারা যখন

খেতাঘর ও দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে নগ্নদেহে বিচরণের প্রথা তখনও দিগঘর সম্প্রদায়ের পূর্ণভাবেই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং নবমতাবলম্বী খেতবস্ত্রপরিধানকারী উৎপত্তি। জৈন-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহারা আর মিশিতেই সম্মত হইলেন না। অপিচ, পাটলিপুত্রে-সহরের সভ্যে সঙ্কলিত ধর্ম-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বীতশ্রদ্ধ রহিলেন। তাঁহাদের নিকট সে শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহ বিলুপ্ত গ্রন্থ মধ্যোই পর্যাবসিত হইল। এই প্রকারে দুই মতের ও দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া গেল। খেত-বস্ত্রপরিহিত সম্প্রদায় 'খেতাঘর' নামে এবং নগ্নদেহে-বিচরণকারী সম্প্রদায় 'দিগঘর' নামে পরিচিত হইলেন। ৮২ খৃষ্টাব্দে এই পার্থক্য পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণরূপে নগ্নতাকেই দিগঘরগণ সমাগত-লাভ পক্ষে আবশ্যক

* কোন সময়ে কি ভাবে চন্দ্রশুভ্রের মৃত্যু সংঘটিত হয়, তাহা নিয়ে মতবৈধ আছে। এক মতে, চন্দ্রশুভ্র,— ২১৭ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে দেহ-ত্যাগ করেন, এবং সেই সময় তাঁহার পুত্র বিলুসার রাজপদ প্রাপ্ত হন। অন্য মতে প্রকাশ,—সেই দুর্ভিক্ষ ৩০১ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রশুভ্রের রাজত্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল এবং সেই সময় জৈনগণের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গিয়া তিনি অনশনে জীবন বিসর্জন দেন।

বলিয়া মনে করেন। খেতাঘরগণের মতে—বজ্র-পরিধানেও সম্যগ্ধ-লাভে কোনও বিঘ্ন ঘটে না। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এবংবিধ পার্থক্যের একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। ‘কেবল জ্ঞান’ বা পূর্ণত্ব-লাভের মূলীভূত কারণ—সর্ববিধ কামনা পরিত্যাগ। ক্ষুধা তৃষ্ণা আহার বিহার প্রভৃতি সকল কামনার কবল হইতে যিনি পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, তিনিই ‘কেবলী’ হইতে পায়ের। যিনি তেমনভাবে সর্বত্যাগে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার আবার অদাবরণ বজ্রের আবশ্যক কি? দিগম্বরগণ এইরূপ চিন্তার ফলেই বজ্র পরিত্যাগ করেন। খেতাঘরগণ ভজ্রণ ত্যাগের উপযোগিতা অস্বীকার করেন না বটে; কিন্তু তাঁহারা বলেন—যখন সংসারে বিচরণ করিতে হইবে, তখন বজ্রের আবশ্যকতা নিশ্চয়ই আছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মত-পার্থক্যের ইহাই মূল কারণ বটে; কিন্তু এ ভিন্ন আরও কয়েকটি বিশিষ্ট কারণ আছে। তন্মধ্যে চুরাশী প্রকার মতানৈক্যের বিষয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতেই লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই; এবং তদ্রূপ নানাবিধ সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকল মতানৈক্যের মধ্যে জ্ঞী-গণকে সম্প্রদায় হইতে পরিবর্জন করা একটি প্রধান মতানৈক্য বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। দিগম্বরগণের মতে, রমণী-সম্প্রদায় মুক্তির অধিকারী নহেন; কিন্তু খেতাঘরগণ জ্ঞী-পুরুষ সকলকে সমভাবে মুক্তির অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন। এ বিষয়ে দিগম্বরগণের এতটাই গোঁড়ামী বা বাড়াবাড়ি যে, তাঁহারা তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত কুমারী মল্লীকে (উনবিংশতি তীর্থঙ্করের কন্যা) রমণী বলিয়াই স্বীকার করেন না। সে মতে—সে কুমারী নারী-বেশী পুরুষ মধ্যে পরিগণিত। অল্প পক্ষে আবার কি দিগম্বর কি খেতাঘর, যাহারা জ্ঞানের উচ্চমার্গে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু এ সকল মতবিরোধ লইয়া বিভণ্ডায় প্রবৃত্ত নহেন। তাঁহারা বলেন,—‘খেতাঘরই হউন, আর দিগম্বরই হউন, অথবা বৌদ্ধ বা অজ্ঞ মতাবলম্বীই হউন, যিনি সর্বত্র আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি সর্বজীবেরই পরমাত্মার অধিষ্ঠান দেখিতে পাইয়াছেন; তিনিই মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন।’ যাহা হউক, যে ঘটনা উপলক্ষে জৈন-ধর্মসম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল, তাহার সহিত চন্দ্রগুপ্তের নাম যখন সংযুক্ত রহিয়াছে এবং তিনি যখন জৈন-সম্প্রদায়ের রক্ষার জন্ত ও সেই ধর্ম পালন জন্ত প্রাণত্যাগ পর্যন্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রচারিত আছে; তখন চন্দ্রগুপ্তকে জৈনধর্মাবলম্বী ভিন্ন অজ্ঞ ধর্মাবলম্বী বলিয়া কখনই ঘোষণা করিতে পারা যায় না। পরন্তু জৈনধর্মের নবীন উদ্দীপনার প্রভাবেই তিনি যে নব সাম্রাজ্য-স্থাপনে সফলকাম হইয়াছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। তাঁহার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা এবং সে রাজ্যের ধ্বংস-সাধন—অভ্যুদয় ও অধঃপতন—দুই দিকেই ধর্ম-সংশ্রব যেন প্রকট হইয়া আছে। যখন তাঁহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জৈন-সম্প্রদায় একসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; তখন তাঁহাদের মধ্যে কোনই মত-ভেদ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে, তাঁহার সৌভাগ্য-স্বর্ঘ্য যখন অন্তমিত-প্রায়; তখনই জৈন-সম্প্রদায় বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সম্ভবত্বই যে অভ্যুদয়-প্রতিষ্ঠার মূল, আর বিচ্ছিন্নতাই যে অধঃপতনের ও বিশৃঙ্খলার হেতুভূত, এতদিতিহাসেও সেই সিদ্ধান্ত মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়।

একশ্রেণে দেখা যাউক, চন্দ্রগুপ্ত কোন সময়ে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; কোন সময়ে তাঁহার একছত্র প্রভাব ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়াছিল ? বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে মতান্তরের অবধি নাই। এমন কি, তাঁহার নাম লইয়াও অনেক বিতর্ক আছে। পৌরাণিক মতের অনুসরণ করিলে, চন্দ্রগুপ্তের স্থান ভারত-ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় নির্দিষ্ট হয়, সে আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি। * পরন্তু পুরাণ-পরম্পরার সহিত তাঁহার সম্বন্ধের স্মৃতি-মূল উৎপাটিত করিয়া, বর্তমান ইতিহাসের ধারা অনুসারে, আলেকজান্ডারের ভারত-প্রবেশ-চেষ্টার প্রাক্কাল হইতেই সূত্র ধরিয়া, যদি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বাদির কাল নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাই, তাহাতেই বা কি তথ্য অধিগত হয় ? সে মতে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল যে সময়ে নির্দিষ্ট হয়, তদ্বিষয় আমরা পূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। † মেগাস্থিনীস আনুমানিক ৩০০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে উপস্থিত থাকিয়া ভারতের বৃত্তান্ত-সম্বলিত ‘ইণ্ডিকা’ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। সেই সূত্র ধরিয়া এবং আলেকজান্ডার প্রভৃতির আক্রমণ-প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ ৩২১ বা ৩২২ পূর্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ২৯৬ বা ২৯৮ পূর্ব-খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, সাক্ষ্য প্রায় ২৪ বা ২৫ বৎসর কাল, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব নির্দেশ করিয়া থাকেন। এদিকে চন্দ্রগুপ্তকে জৈন-ধর্মাবলম্বী বলিয়া গ্রাহ্য স্বীকার করেন, তাঁহাদের গণনাক্রমে ঐ রাজত্বকাল আর একরূপ নির্দিষ্ট হয়। জৈন-সাধারণের মত এই যে,— মহাবীর স্বামী ৫২৭ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ বিক্রম-সংবতের ৪৭০ বৎসর পূর্বে) নির্কাল লাভ করেন ; এবং ঐ ৪৭০ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ৫২৭ পূর্ব-খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৭ পূর্ব-খৃষ্টাব্দের (৫২৭—৪৭০=৫৭) মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় ঘটয়াছিল। সিংহল-দেশের বিবরণে চন্দ্রগুপ্ত ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া প্রকাশ আছে। এদিকে জৈনমত-ক্রমে ঐ সময়ের মধ্যে (৪৭০ বৎসরে) বহু বিভিন্ন রাজবংশের অভ্যুদয়-বিবরণ অবগত হওয়া যায়। দুইখানি জৈনগ্রন্থে (‘ত্ৰিখণ্ডাবলি’ পত্রিকা এবং ‘তীর্থঙ্কর প্রকীর্তক’) ঐ সময়ের রাজত্ববর্ণনের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হই। যথা,—

(১) “জং রয়ণিং সিদ্ধিগং অরহং তিথংকরো মহাবীরো ।

তং রয়ণিসংবতিএ অভিসিত্তো পালও রায়্য ।।

পালগরল্লো সট্টী পণ পল্ল সয়বিমাণ নংদাণং ।

মুক্কমাণং অটসয়ং তীসা পুণ পুস মিত্তাণং ॥

বলভিত্ত ভাটুমিত্তা সট্টীচত্তায় হোংতি নরসেণে ।

গদত্ত সয়মেগং পুণ পডিবল্লোত্তো সগো রায়্য ॥

পংচয় মাঙ্গা পংচয় বাঙ্গা ছুচে বজ্জংতি বাঙ্গসয়্য ।

পণিনিব্বয়স্স অরহত্তো উপল্লো সগো রায়্য ॥”

(২) “জং রয়ণিং কালগং অরহা তিথংকরো মহাবীরো ।

* “পৃথিবীর ইতিহাস”, প্রথম খণ্ডে, মহাভারত প্রসঙ্গে, ২৭৭—২৮১ পৃষ্ঠায়, সে আলোচনা দ্রষ্টব্য ।

† “পৃথিবীর ইতিহাস”, পঞ্চম খণ্ডে, ৮৬—৮৮ পৃষ্ঠা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।

ভং রয়ণিং অবংতিবজ্জি অহিসিত্তো পালপো রারা #

সট্টী পালগ রম্মো পণ পল্ল সয়ংতু হোজ্জি নন্দানং !

অট্টসয়ং দুরিরাণং তীসং চিঅ পুস্মিসত্তস #

বলমিত্ত ভাহুমিত্তা সট্টীবরসণি চত্ত নরবহণী ।

তহ গদ্ধভিল্লরজ্জং তেরস বরিসা সমস্প চউ ॥”

উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনাধ্বরের তাবার্থ,—তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী যে দিন নির্কাণ-লাভ করেন, সেই দিন অবন্তীর রাজা পুলকের রাজ্যাভিষেক হয়। পুলক ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর নন্দবংশীর ৯ জন নৃপতি ১৫৫বর্ষ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে মৌর্য্য-বংশীর রাজগণের রাজত্ব-কাল ১০৮ বৎসর। তদন্তে পুষ্পমিত্র ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন। তার পর বলমিত্র ও ভাহুমিত্র রাজা হন। তাঁহারা ৬০ বৎসর রাজত্বও পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বের পর নলবাহন বা নববাহন (নহবহণ, নভোবাহণ) সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার পর গর্দ্ধভিল্ল (গদ্ধভিল্ল) ১৩ বৎসর এবং শক (সগ) রাজা ৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত ঐ বর্ণনায় মহাবীর স্বামীর নির্কাণ হইতে শক রাজগণের রাজত্ব-প্রাপ্তি পর্যন্ত রাজগণের নাম ও রাজত্ব-শাসনকাল নিম্নরূপ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে; যথা,—

(১) মহাবীর স্বামীর নির্কাণ-লাভ	...	...	৫২৭ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে।
(২) রাজা পুলক	...	...	৫২৭—৪৬৭ „
(৩) নন্দ-রাজগণ	...	...	৪৬৭—৩১২ „
(৪) মৌর্য্য-রাজগণ	...	...	৩১২—২০৪ „
(৫) পুষ্পমিত্র	...	...	২০৪—১৭৪ „
(৬) বলমিত্র ও ভাহুমিত্র	...	...	১৭৪—১১৪ „
(৭) নলবাহন বা নববাহন	...	...	১১৪—৭৪ „
(৮) গর্দ্ধভিল্ল	...	...	৭৪—৬১ „
(৯) শকরাজগণ	...	...	৬১—৫৭ „

প্রসিদ্ধ জৈন-গ্রন্থকার হেমচন্দ্র ‘পরিশিষ্ট পর্বে’ বাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে—

‘এবং ৮ ত্রীমহাবীরে মুক্তে বর্ষণতে গতে । পংচ পংচাশদধিকে চ চন্দ্রশ্রেণীভববর্ষঃ ॥”

মহাবীর স্বামীর নির্কাণ-লাভের ১৫৫ বৎসর পরে অর্থাৎ ৩৭২ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশ্রেণীর বিত্তমানতা সপ্রমাণ হয়। কিন্তু চন্দ্রশ্রেণী যখন ভদ্রবাহুর সমসাময়িক বলিয়া পরিচিত, তখন ঐরূপ কাল-নির্দেশ প্রোবাদ-পরিশৃঙ্খ বলিয়া মনে হয় না। কেন-না, ভদ্রবাহুর বিত্তমান-কাল যে ৩৭১—৩৫৭ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না। ঐরূপ হিলাবে প্রায় ৬০ বৎসরের ব্যবধান থাকিয়া যায়। জৈনগণের অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে (পূর্বে এই মতই উদ্ধৃত হইয়াছে) ৩১২ পূর্ব-খৃষ্টাব্দ চন্দ্রশ্রেণীর রাজ্য-প্রাপ্তিকাল বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। হেমচন্দ্র এ সম্বন্ধে গণনার ৬০ বৎসরের ভুল করিয়া থাকিবেন। রাজা পুলকের রাজত্ব-কাল তাঁহার হিসাবে বাদ পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। জৈন-গ্রন্থোক্ত আরও

কয়েকটা বিশিষ্ট ঘটনায় এ ভ্রম বিশেষ-রূপে বোধ-গম্য হইতে পারে। জৈনগ্রন্থাদিতে প্রকাশ, মহাবীর প্রভু যখন ধর্ম্মালোচনায় ব্রতী ছিলেন, রাজা শ্রেণিক তখন রাজগৃহের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ঐ শ্রেণিক—রাজা প্রসেনজিভের পুত্র। সেই প্রসেনজিৎ—বিহিসাঁর বা বাম্বাসার নামেও পরিচিত ছিলেন। মহাবীর স্বামীর সম-সামরিক রাজা শ্রেণিকের উত্তরাধিকারী পুত্রের নাম অশোকচন্দ্র বা কুণিক। তিনি রাজগৃহ হইতে চম্পা-নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। উদায়ী—তাহারই পুত্র ও উত্তরাধিকারী। পাটলীপুত্র-নগর এই উদায়ী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা উদায়ী চম্পা হইতে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। উদায়ীর কোনও সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাহার মৃত্যুর পর নন্দ-রাজগণ পাটলী-পুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। তাহাদের উচ্ছেদ-সাধনে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। মহাবীর স্বামীর নির্ব্বাণের পর রাজা কুণিক হইতে রাজা উদায়ীর রাজ্যাশাসনকাল, গণনায় প্রায় ৬০ বৎসর দাঁড়াইতে পারে। এ দিক দিয়াও, হিসাবে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল ৩১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে প্রতিগম্য হয়। জৈনগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। বাহা হউক, এই ৩১২ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি-কাল বলিয়া মনে করিলে, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের গণনায় সহিতও বিশেষ কিছু অসামঞ্জস্য থাকে না। ৩১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ মৌর্য্য-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার অব্দ বলিয়া আমরা পূর্ব্ব নির্দেশ করিয়াছি। * ৩১২ আর ৩১৫—এ দুই হিসাবে পার্থক্য বড়ই অল্প। সে ঘোর বিপ্লব-বিশৃঙ্খলার দিনে ঠিক কোন দিন তিনি সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং ঠিক কোন দিন লোকে তাহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল, তাহা সঠিক নির্দেশ করা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই। তবে ৩১২ বা ৩১৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দ নির্দিষ্ট করিলেই সকল দিকে সামঞ্জস্য সাধিত হয়। এ হিসাবের সহিত মেগাস্থিনীসের ভারতে অবস্থিতি-কালের হিসাবের সামঞ্জস্যও রক্ষিত হইয়া যায়।

কি স্বদেশে কি বিদেশে রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে অনেক ইতিহাস অনেক কাহিনী অনেক কিস্কদন্তী প্রচারিত আছে। তিনি কি অবস্থা হইতে কি শক্তি-প্রভাবে বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের আধিপত্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন; ঐতি-
 চন্দ্রগুপ্তের
 অমরত্বে
 চাপক্য।
 হাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক সকলেরই এখন তাহা গবেষণার বিষয়। তিনি ‘মুরা’ নাম্নী এক দাসীর গর্ভজাত পুত্র বলিয়া প্রখ্যাত। অথচ, তিনি ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি;—ইতিহাসে তিনি অমর হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তাহার এই প্রতিষ্ঠার মূল কি? কে তাহাকে ভারতের ইতিহাসে আজ অমর করিয়া রাখিয়াছে? হইতে পারেন—তিনি প্রতিভা; হইতে পারে—তাহাতে অগ্নিফুলিঙ্গ ছিল। কিন্তু প্রতিভার অঙ্কুর আপনি শুকাইয়া যায় না কি—যদি উপযুক্ত সময়ে জলসেচন না পায়! অগ্নিফুলিঙ্গ আপনা-আপনিই নির্ব্বাপিত হয় না কি—তাহাতে যদি দ্ব্যুতাহতি না পড়ে—তাহাতে যদি ইন্ধন-সংযোগ না ঘটে! চন্দ্রগুপ্ত-প্রতিভা পরিস্ফুট হওয়ার বা চন্দ্রগুপ্ত-অগ্নিফুলিঙ্গে দিম্বাহী অনলের সৃষ্টি হওয়ার এক শুভ-সংযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সে সংযোগ—সেই অসাধারণ বীশক্তিশালী ব্রাহ্মণ—চাপক্য। মহাকবি কালিদাস যেমন

* “পুথিবীর ইতিহাস”, পঞ্চম খণ্ড, ৩০—৩১ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

রাজচক্রবর্তী বিক্রমাদিত্যকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্তও সেইরূপ মহামন্ত্রী চাণক্যের প্রভাব ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। আলেকজান্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশের চেষ্টা না পাইলেও, মেগাস্থিনীস আসিয়া দূতরূপে ভারতের রাজধানীতে অবস্থিতি না করিলেও, পাশ্চাত্য-প্রদেশে ‘সাস্ত্রাকোটাস’ ইত্যাদিধামে এই ভারতীয় নৃপতির নাম পরিকীর্তিত না থাকিলেও, একমাত্র চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতেন এবং ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ, অধুনা যাহারা চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে কোনরূপ গবেষণা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—তাহারা প্রায় সকলেই, চাণক্যের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। কূটদর্শী সমালোচকগণ চাণক্যকে যতই মসীবর্ণে চিত্রিত করুন; তাঁহাদের কূটকল্পনা-মূলে যতই তিনি হেয় বলিয়া পরিগণিত হউন; ইউরোপের ম্যাকিয়ারভেলী বা বিষমাকের সহিত তুলনায় যতই তাঁহাকে নিম্নতম স্থানে স্থাপন করিবার চেষ্টা হউক; কিন্তু, সকল দিক সমানভাবে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে,— চাণক্যের জ্ঞান অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অসাধারণ রাজনৈতিক এবং অমাহুষিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি জগতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রগুপ্ত-রূপ অস্ত্র অবলম্বন করিয়া তিনি যে মহৎ কার্য সাধিত করিয়া যান, তাহার তুলনা নাই। একদিকে বৈদেশিক আক্রমণের বিভীষিকার, অত্মদিকে আত্মদ্রোহের বঞ্চাবাতে, ভারতবর্ষের সিংহাসন টলটলায়মান হইয়া আসিয়াছিল;— মহাসমুদ্র-বক্ষে বৌচিবিজুক তরঙ্গীর জ্ঞান ভারতবর্ষ প্রমাদ গণিতেছিল। সে ঘোর দুর্দিনে ভারত-তরঙ্গীর কর্ণধার-রূপে চাণক্যের সহায়তা চন্দ্রগুপ্ত যদি না পাইতেন; পরিণাম কি সর্বনাশকর হইত, কে বলিতে পারে? সেই জন্তই বলিতে ইচ্ছা হয়,—‘চাণক্য! যত কলঙ্ক-কালিমায় কলুষিত করিয়াই তোমার চিত্রিত করুক না কেন, কোটিল্যাদি যতই কুনায়ে তোমার লোক-সমাজে নিন্দনীয় করিবার চেষ্টা হউক না কেন, তোমার অভাব সকল দেশ সকল সময়ে অমৃত্যব করিবেই করিবে!’ চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত অথবা তাঁহার একছত্র প্রভাবে ভারতের রাজশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার জন্ত যে কেবল চাণক্য প্রখ্যাতি-সম্পন্ন, তাহা নহে;—মহামতি চাণক্যের মন্ত্রিত্ব-ফলে ভারতবর্ষের রাজ-নৈতিক ও সমাজনৈতিক যে অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহাতেই চাণক্যের স্মৃতি অধিকতর উজ্জল হইয়া আছে। চাণক্য কিরূপ ঐকান্তিকতার সহিত কি ভাবে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং কিরূপে তৎকর্তৃক রাজ্যের শৃঙ্খলা ও জনহিত-কর বিধি-বিধানসমূহ প্রবর্তিত হইয়াছিল; উপজ্ঞান, নাটকে, কিম্বদন্তীতে—বিশেষতঃ তাঁহার অমূল্য গ্রন্থপত্রে, তাহার নিদর্শন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকে চাণক্যের যে চরিত্র-চিত্র দেখিতে পাই, * তাহাতে তাঁহার চরিত্র সহস্র দোষগ্রস্ত হইলেও তাঁহার জ্ঞান অধ্যবসায়ী তীক্ষ্ণদী ও কর্মী পুরুষ সংসারে বিরল বলিয়াই বুঝিতে পারি। লোকমুখে কিম্বদন্তীতেও তাঁহার অসাধারণ শক্তি-মত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাঁহার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান—তাঁহার প্রণীত ও সংকলিত গ্রন্থ-রত্ন-সমূহ। তাঁহার

* ‘পুথিবীর ইতিহাস’ চতুর্থ খণ্ডে ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকের আলোচনার এতদ্বিষয় উল্লেখ।

গ্রন্থ-রচনা চন্দ্রগুপ্তকেও যেমন অমর করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহার নিজেকেও সেইরূপ অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের ও চাণক্যের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, তাই এখন চাণক্যের রচনাবলিই এক প্রধান উপাদান-মধ্যে গণ্য হয়। একদিকে গ্রীক-রাজদূত মেগাস্থিনীসের বিবরণ, অত্রদিকে চাণক্যের গ্রন্থ-রাজি—তুলনার সমালোচনার এই দুইয়ের সামঞ্জস্য-সাধনেই চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্যের মহীরসী মহিমার নিদর্শন পরিদৃশ্যমান।

চন্দ্রগুপ্তের সহিত চাণক্যের সম্বন্ধ এতই অচ্ছেদ্য যে, চন্দ্রগুপ্তের কথা কহিতে হইলে, চাণক্যের বিষয় সর্বত্রই মনোমধ্যে উদ্ভিত হয়। আর, চাণক্যের বিষয় আলোচনা করিতে

করিতে, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল, শাসন-প্রণালী এবং ভাংকালিক সমাজের অসাধারণ মানুষ চাণক্য। আচার-ব্যবহার সকল বিষয়েই অভিজ্ঞতা জন্মে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের

গবেষণার ফলে, মহাকবি কালিদাসের যেমন অনেক নাম ও অনেক কাজ অথুনা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে; মহামন্ত্রী চাণক্যেরও সেইরূপ নানা নাম ও নানা কাজ পরিকল্পিত বা প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। শৈশবে “শিশুবেদ্যকে” আমরা চাণক্য-পণ্ডিতের এক অপক্লপ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার নামে প্রচারিত কতকগুলি শ্রীতিবাক্য কণ্ঠস্থ করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা হৃদয়-মধ্যে পোষণ করিবার প্রয়াস পাইতাম; যৌবনে বিভাগ্য-পাঠ্য ইতিহাসে তাঁহাকে মৌর্য-রাজবংশের প্রতিষ্ঠামূলে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আর এক ধারণা অন্তরে স্থান দিতে বাধ্য হইতাম; পরিশেষে এক্ষণে বার্কাক্যের সীমায় উপনীত হইয়া নব নব অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহাকে আর এক নূতন মানুষ বলিয়া—অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ-প্রবর বলিয়া—ধারণা জন্মিতেছে। এখন দেখিতেছি—চাণক্য অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, অলৌকিক জ্ঞানী ছিলেন, অদ্বিতীয় রাজনীতিক ছিলেন এবং একজন প্রখ্যাত-নামা প্রতিভাসম্পন্ন গ্রন্থকার ছিলেন। এক ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থের আবিষ্কার হওয়ার, তাঁহার যশের পরিমাণ যেন সহস্রগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। “অর্থশাস্ত্রের” বিবরণ-বিন্যাস ও রচনা-প্রণালী পরবর্তী রাজশাস্ত্রবর্গের ও কবিগণের নিকট যুগপৎ সমাদৃত হইরাছিল। অধিক কি, অর্থশাস্ত্রের ভাষা ও ভাব, দণ্ডীর এবং কালিদাসের রচনার মধ্যেও স্থান পাইয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। * এদিকে অশোক-স্তম্ভাদির লিপি-মধ্যেও অর্থশাস্ত্রের

* কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের প্রণীত ‘প্রাচীন হিন্দু রাজনীতি’ সংক্রান্ত ইংরাজী গ্রন্থের ভূমিকায় একেবারে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিশেষ গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। দণ্ডী প্রণীত “দশ-কুমার-চরিত” সংস্কৃত-সাহিত্যের এক রত্নহানী। সেই ‘দশকুমার-চরিতে’ অর্থশাস্ত্র হইতে যে সকল পংক্তি পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার কয়েকটি পংক্তি নিয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে; যথা,—“আরবারানঃ অহুঃ প্রথমেৎষ্টমে ভাগে জ্যোতবাং”; “যিত্তিরে অজ্যোহন্তঃ বিবনমানাঃ প্রজানাঃ আক্রোশৈঃ দহমানকর্ণঃ কষ্টে জীবতি”; “তৃতীরে স্নাতুঃ ভোক্তৃক লভতে”; “চতুর্থে হিরণ্য প্রতি-গ্রহায় হন্তঃ প্রসারয়ন্তে উত্তীঠতি”; ইত্যাদি। এইরূপ, মহাকবি কালিদাস যে স্থানে স্থানে অর্থশাস্ত্রের শব্দাদির অনুকরণ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ;—E. g. Mallinath on *Raghuvansa*, Sarga 17, Sloka 49; “অথ কোটিল্যঃ—কার্বাণাং নিরোগ-বিকল্পা-সমুচ্চরা ভবন্তি অনেনৈবোপারেন নান্তেনেতি নিরোগঃ অনেন অন্তেনবেতি বিকল্পঃ অনেন চেতি সমুচ্চরঃ ইতি”, which is taken from the *Arthasasta*, Bk. ix, Ch vii, pr. 147. *Ibid*, Sloka 55:—“অথ কোটিল্যঃ—কীণাঃ প্রকৃত্তরো লোভঃ লুণ্ঠাসক্তি দ্বিগতমৃত্যু

ভাবার অনুসরণ দেখিতে পাই। * এইরূপে বাহার ভাষা ও ভাব দেশের প্রসিদ্ধ কবিগণ কর্তৃক অনুকৃত হয় এবং বাহার প্রযুক্ত শব্দাদি রাজকীর অহুজ্জাদিতে পরিগৃহীত হয়, তিনি যে সাহিত্য-সংসারে যথেষ্ট প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সংশয় আসিতে পারে না। বিশেষতঃ, অর্থশাস্ত্র-প্রণয়নে তিনি যে রূপ সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং সকল মতের সামঞ্জস্য-সাধনে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী যে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের ও ভূয়োদর্শনের ফল বলিয়াই সপ্রমাণ হয়। † তার পর, “শাস্ত্রভাষ্যের” রচয়িতা বলিয়া এবং “নীতি-শাস্ত্রের” প্রবর্তক বলিয়া তাঁহার অশেষ প্রখ্যাতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। ‘বাংস্তায়ন’ নামে পরিচিত থাকিয়া তিনিই ‘শাস্ত্রভাষ্য’ প্রণয়ন করিয়া যান; আবার কামন্দকীর ‘নীতিসারে’ তাঁহারই প্রভাব পরিফুট হয়। ‘কামন্থ্য’ গ্রন্থ তিনিই প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে চাণক্যের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কীর্তির নিদর্শন প্রাপ্ত হই। প্রসিদ্ধ জৈন-গ্রন্থকার হেমচন্দ্র তদীয় ‘অভিধানচিন্তামণিতে’ চাণক্যের নাম-সংজ্ঞার এইরূপ পরিচয় প্রদান করেন,—“বাংস্তায়নে মল্লনাগঃ কুটিলশৃণকশাস্ত্রজঃ। ত্রামিলঃ পক্ষিলশাস্ত্রী বিষ্ণুগুপ্তোহক্ষুলাচ সংঃ।” কামন্দকীর নীতিসারের জয়মল্ল-টীকার শঙ্করাচার্যের উক্তিতে প্রকাশ,—“বিষ্ণুগুপ্তায়ৈতি সাংস্কারিকী সংজ্ঞা, চাণক্যঃ কোটিল্য ইতি জন্মভূমি গোত্র নিবন্ধনে।” আবার, টীকান্তরে দেখিতে পাই,—“কূটো ঘটন্তং ধান্যপূর্ণং লাভি সংগৃহীতি ইতি কুটলাঃ কুন্তীধানা ইতি প্রসিদ্ধিঃ। অতএব তেবাং গোত্রাপত্যং কোটিল্যো বিষ্ণুগুপ্তো নাম।” আবার শাস্ত্র-ভাষ্যের ‘ভাৎপর্য-টীকাকার’ বাচস্পতি মিশ্রের মতে—“শাস্ত্র-ভাষ্যের রচয়িতা বাংস্তায়নের প্রকৃত নাম—পক্ষিল শাস্ত্রী।’ এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি,—“অথ তগবতা

বিরজা যাত্ৰামিত্রং বা ভর্তারঃ স্ততি বা স্বয়ম্”, which corresponds to *Artha*, Bk. vii, ch v, pr. 108-110. অধিক উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। এইরূপ, উক্ত সর্গের ৬৬, ৭৬ ও ৮১ শ্লোকের সহিত এবং অষ্টাদশ সর্গের ৫০ শ্লোকের সহিত অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কুমারসম্ভবেও এবং বিধি সাদৃশ্যের অসন্দাবনাই। *Vide*, Mr. Law's *Studies in Ancient Hindu Polity*.

* “Some of the technical and peculiar words of *Arthasasthra*...have been used in the Edicts of Asoka...These are যুতাঃ (Rock Ed. III.) equivalent to যুতাঃ of Kautilya (p. 57); রাজ্জা (R. Ed. III) corresponding to রাজ্জ in চৌররাজ্জ of Kautilya (p. 232); পাষণ্ডে (R. Ed. v &c) which occurs in Kautilya (p. 144 and elsewhere); সমাজ (R. Ed. I.) which corresponds to সমাজ in the phrase উৎসবসমাজ of Kautilya (p. 121); মহামাতা (R. Ed. XII) which is equivalent to মহামাজ of Kautilya (p. 58 and elsewhere), and the like.” *Ibid*.

† অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই,—যে বিষয়ে তিনি কোনরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিবরে অভিজ্ঞ-ব্যক্তিগণ তাঁহার পূর্বে কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা আছে। দুইটি-স্থলে ‘অমাত্যোৎপত্তি’ নামক অষ্টম অধ্যায়ের উল্লেখ করি। অমাত্য-নির্বাচন বিষয়ে তরফাজ, কিশালাক, পক্ষাপদ, শিঙন, কোণপদন্ত, বাতব্যাধি, বাহনভী প্রভৃতি পূর্ববর্তী মহাজনগণের মত প্রথমে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। শেষে হার দ্বারাও প্রকাশ পাইয়াছে। ইহারই নাম পাণ্ডি ও ভূয়োদর্শন।

অক্ষপাদেন নিঃশ্রেয়সহেতোশাস্ত্রে প্রণীতেহপুংপাদিতে চ ভগবতা পক্ষিলস্বামিনা কিমপরমব-
শিষ্টতে যদর্থং বার্তিকারজ্ঞঃ ।” এই সকল বিষয়ের আলোচনায়, বিষ্ণুগুপ্ত, কোটিল্য, চাণক্য,
পক্ষিলস্বামী, বাৎস্তায়ন, মল্লনাগ, দ্রমিল প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তাঁহার পরিচিত থাকায় পক্ষে
প্রমাণ পাওয়া যায় । অপিচ, টীকাসকলের তাৎপর্যানুসরণে এবং ধাত্বার্থে চাণক্যাদি শব্দের যে
অর্থ উপলব্ধি হয়, তাহাতেও ঐ সকল নাম একই ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযুক্ত বুঝিতে পারি ।
“চণকস্ত মুনের্গোত্রাপত্যং চণক-গর্গাদি যৎ” —এ হিসাবে চণক-মুনির বংশজ বলিয়া চাণক্য
নাম হওয়া সম্ভবপর । আবার শঙ্করাচার্য্যের টীকাক্রমে বাস-গ্রামের নামানুসারে চাণক্য
নাম হইতে পারে । * কোটিল্য নাম এক মতে—গোত্রজ ; অন্য মতে বংশানুগত । চাণক্যের
পূর্ব পুরুষগণ ‘কুটিল’ বা ‘কুস্তীধাত্ত’ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, তদনুসারে সেই বংশজ ব্যক্তি
‘কোটিল্য’ সংস্থা প্রাপ্ত হন ; এও এক মত । পুরাণাদিতে কোটিল্য নামই দেখি । বিষ্ণু-
পুরাণের মতে, কোটিল্য ব্রাহ্মণের চক্রান্তে নন্দবংশোচ্ছেদে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক হয় ।
শ্রীমদাগবতে কোটিল্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই উল্লিখিত আছে । বায়ু-পুরাণে, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে ও মৎস্য-
পুরাণে কোটিল্য নামেই সে ব্রাহ্মণ পরিচিত । অর্থশাস্ত্রের রচয়িতাও কোটিল্য অভিধানে
অভিহিত । ‘ইহার ক্রোধানলে নন্দ নৃপতি বিনষ্ট ও ইহারই চক্রান্তে মন্ত্রিপুত্র চন্দ্রগুপ্ত তৎ-
সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে, ইনি তাঁহার মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এই কুটিলতার
মূল-স্বরূপ বলিয়া ইনি কোটিল্য নামে অভিহিত হন ।’ এই মতই সর্বাপেক্ষা প্রবল । যাহা
হউক, চাণক্য, কোটিল্য প্রভৃতি নাম যখন একই ব্যক্তি-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়,
তখন ঐ সকল নামের সর্ববিধ কার্য্যের সহিত সেই একই ব্যক্তির সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইয়া যায় ।
তবে পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রধানতঃ তিনি কোটিল্য নামেই পরিচিত ; এবং জৈন-গ্রন্থাদিতে
চাণক্য নামে অভিহিত । ‘হবিরাবলিচরিত’ জৈন-গ্রন্থে চাণক্যের যে জীবনবৃত্ত হেমচন্দ্র প্রকাশ
করিয়াছেন, বিবিধ উপকথা পূর্ণ হইলেও, তাহা পুরাণ-বর্ণিত নন্দ-
বংশোচ্ছেদ-কাহিনীর সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন ; সেখানে চাণক্য নন্দবংশের
ধ্বংস-সাধনে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনারোহণের সহায়তাকারী । প্রাকৃত-ভাষার
লিখিত ‘জৈনমুক্ত’ নামে এক ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে ; চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-সচিব-রূপে চাণক্যের কৃতিত্বের
বশোধোষণ তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় । ‘ঋষিমণ্ডলপ্রকরণ-বৃত্তি’ নামক জৈন-গ্রন্থে
চাণক্যের ও চন্দ্রগুপ্তের বন্ধুত্ব প্রকীর্ণিত । এই গ্রন্থে প্রকাশ,—তাঁহাদের মিত্রতা-সম্বন্ধ-হেতু
নন্দের সংহার সাধিত ও নন্দরাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল । বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে, ‘সমস্তুপশাদিকা’

চাণক্য-নামের
উল্লেখ ।

* গ্রামের নামে ‘চাণক্য’ নাম হইয়াছিল, এবংবিধ উক্তি চাণক্যের বাসস্থানের বিষয়ে একটা ভাব মনে
আসিতে পারে । চাণক্য বাঙ্গালী ছিলেন এবং বর্তমান চাণক (বারাকপুর) তাঁহার জন্মস্থান ছিল, ইহাতে
তাহা মনে আসে না কি ? জব চাণক্যের নাম অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে চাণক গ্রামের নামকরণ
হইয়াছিল বলিয়া যে একটা কিম্বদন্তী ছিল ; সে মত এখন উঠাইয়া গিয়াছে । জব চাণক্যের অস্তিত্বের বহু
পূর্বেও ঐ চাণক-গ্রাম যে ছিল, কর্ণেল ইউল প্রাচীন পুঁথি-পত্রের প্রমাণ দৃষ্টে অনেক দিন পূর্বে তাহা নির্দ্বারণ
করিয়া গিয়াছেন । এ অবস্থায় ঐ প্রাচীন গ্রামের সহিত সেই প্রাচীন মনোবির সম্বন্ধ-স্থাপনের উপাদান-সংগ্রহ
কল্প হইতে পারে না কি ?

নামক বিনয়পটিকের ভাষ্যে, এবং মহানাম হুবিরকৃত মহাবংশের চীকার, চাণক্যের প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কামন্দকীয় ‘নীতিসারে’ নন্দবংশের উচ্ছেদ ও চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক উল্লেখে চাণক্যের বন্দনা করা হইয়াছে। সেই সূত্রে কয়েক পংক্তি কবিতার তাঁহাকে যেন জীবন্ত প্রত্যক্ষ হয়। সে কবিতা-পংক্তি-কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

“বংশে বিশালবংশ্যানামৃষীণামিব ভূয়সাম্ ।

অপ্রতিগ্রাহকগাং যো বভূব ভূবিবিশ্রুতঃ ॥

জাতবেদাইবার্চ্চিয়ানু বেদানু বেদবিদাং বরঃ ।

যোহধীতবানু সূচতরশ্চতুরোহপ্যেক বেদবৎ ॥

যশাভিচারবজ্রেণ বজ্রজলনভেজসঃ ।

পপাত মূলতঃ শ্রীমানু স্পর্কী নন্দপর্কতঃ ॥

একাকী মন্ত্রশক্ত্যা যঃ শক্ত্যা শক্তিধরোপমঃ ।

আজহার নৃচন্দ্রায় চন্দ্রগুপ্তায় মেদিনীম্ ॥

নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানথ শাস্ত্রমহোদধেঃ ।

সমুদগ্ধে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে ॥”

‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকেও এই ব্যাপারই পরিবর্ণিত রহিয়াছে। পরিশেষে—অর্থশাস্ত্র। অর্থশাস্ত্রের একটা উপসংহার-বাক্যে, তিনি যে নন্দ-রাজগণের কবল হইতে বিলুপ্তপ্রায় বিজ্ঞা, শিল্প ও জন্মভূমির উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন, তাহার জীবন্ত-বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়; যথা,—

“যেন শাস্ত্রং চ শাস্ত্রং চ নন্দরাজগতা চ ভূঃ ।

অমর্ষেণোদ্ধৃতাত্মাশু তেন শাস্ত্রমিদংকৃতম্ ॥”

যেমন অর্থশাস্ত্রে, তেমনই কামন্দকের ‘নীতিসারে’ চাণক্যের মহিমা পরিকীর্তিত। কামন্দক তো চাণক্যকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রচারও এই যে, প্রমাণও এই যে, চাণক্য-নীতি সঙ্কলন করিয়াই কামন্দক প্রাতিষ্ঠাপন হন। চাণক্য যে বেদবিদ্দিগের শ্রেষ্ঠ, চাণক্য যে বিদ্বানগণের বরগীয়—কামন্দকের উক্তিতে তাহা পুনঃপুনঃ বিধোষিত দেখি; নীতিসারের প্রথমেই দেখি, কামন্দক গুরুর জয়-ঘোষণা উপলক্ষে কহিতেছেন,—‘যিনি অর্থ-শাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া রাষ্ট্র-বিজ্ঞান-রূপ অমৃত উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণতি করি।’ তার পর তিনি বলিয়াছেন,—‘এই বিজ্ঞান রাজত্ববর্গের বিশেষ প্রিয় বলিয়া আমি সেই সর্ববিজ্ঞাবিশারদের গ্রন্থের সার-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইতেছি।’ চাণক্যের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সারই যে কামন্দকের প্রাতিষ্ঠার মূল, ঐ উক্তিতে তাহাই উপলব্ধি হয়। চাণক্যের জ্ঞান-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,—‘যো বভূব ভূবিবিশ্রুতঃ’; ‘বেদবিদাং বরঃ’; ‘বিজ্ঞানাং পারদৃশচনঃ’; অপিচ,—

“দর্শনাং তস্মা সদৃশী বিজ্ঞানাং পারদৃশচনঃ ।

রাজবিজ্ঞা প্রিয়তয়া সংক্ষিপ্তগ্রন্থমর্থবৎ ॥”

তার পর, কামন্দক তাঁহার নীতিসারে অর্থ-শাস্ত্রের যে অনুসরণ করিয়াছেন, * তাহা নানারূপে

* অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও চতুর্দশ খণ্ড-সমূহ নীতিসারে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তান্ত্রিক অভ্যাস অংশ, কোথাও রূপান্তরে, কোথাও যথেষ্ট ভাবে বিস্তৃত আছে—প্রতিপন্ন হয়।

প্রতিপন্ন হয়। অর্থ-শাস্ত্রের কয়েকটি অধ্যায় সংক্ষেপে নীতিসারে পরিগৃহীত হইয়াছে এবং কয়েকটি অধ্যায় একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এবংবিধ কারণে কেহ কেহ কোটিল্য ও কামন্দক উভয়কেই ‘নীতিসার’ গ্রন্থের অবর্তক বলিয়া খ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। * ফলতঃ, দণ্ডীর ‘দশকুমারচরিতে’, কালিদাসের ‘রঘুবংশ’ প্রভৃতি কাব্যে এবং ‘নীতিসারে’ কোটিল্যের ‘অর্থ-শাস্ত্র’ যে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে, তাহাতে কোনই সংশয় থাকিতে পারে না। আর, ঐ সকল লব্ধ-হেতু ‘অর্থ-শাস্ত্রের’ বিস্তারিত-কাল লব্ধেও একটা ভাব মনো-মধ্যে জাগরুক হয় ও একটা প্রশ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে জানিতে পারি যে, কালিদাস, কামন্দক, দণ্ডী ও অশোক প্রভৃতির পূর্বে অর্থ-শাস্ত্র প্রণীত ও প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অর্থ-শাস্ত্র প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, উহার অণুভূ-সম্বন্ধে কিন্তু অনেক প্রকার সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রধান সংশয়,—কোটিল্য নামধের কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক ঐ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, অথবা কোটিল্য-সংজ্ঞিত রাজনৈতিক-সম্প্রদায়ের ঐ প্রকার মত বলিয়াই উহা কোটিল্য-শাস্ত্র-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল? সাংখ্য-মত বলিতে যেমন সাংখ্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত পণ্ডিতগণের মত বুঝাইয়া থাকে; কোটিল্য অর্থ-শাস্ত্র বলিতে, তদ্রূপ সম্প্রদায়গত কোনও ভাব মনে আসে না কি? অথবা, কোটিল্য নামা কোনও ব্যক্তির রচনাও ঐ গ্রন্থে আছে এবং রাজনীতি-তত্ত্বজ্ঞ অপরের রচনাও উহাতে স্থান পাইয়াছে? এ প্রকার সংশয়-প্রশ্ন উত্থাপনের কয়েকটি বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায়; এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্য বহু মনীষি তৎপক্ষে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং তাঁহাদের সে বিতর্কের ফলে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। স্মরণ্য বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে সে আলোচনারও একটু আভাস প্রদান আবশ্যক মনে করি। বাল-প্রতিবাদ-রূপে দুই জন জন্মাণ-পণ্ডিতের গবেষণার বিষয় প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। মূল তত্ত্ব তাহাতে বোধ-গম্য হইবে। অর্থশাস্ত্রে ‘ইতি কোটিল্য’ এবং ‘নেতি কোটিল্য’ বাক্য-দ্বয় অনধিক দ্বিসপ্ততি স্থানে প্রযুক্ত দেখা যায়। তদ্রূপে হিলব্রান্ট + সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচনা নহে, উহাতে সম্প্রদায়-বিশেষের মত প্রকাশ পাইয়াছে। প্রোফেসর জেকবী ‡ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিবাদের সারমর্ম এই যে, ভারতবর্ষের গ্রন্থকারগণ অপরের মতের প্রতিবাদে প্রায়ই প্রথম পুরুষ অহং-বাচক শব্দ প্রয়োগ করেন না; বিনয়-প্রদর্শন-ব্যপদেশে তাঁহার প্রতিবাদে প্রায়ই তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ অর্থশাস্ত্রকে সম্প্রদায়গত গ্রন্থ মনে করিতে গেলে, সম্প্রদায়-প্রবর্তক যে কে

* ‘সোমবন্ত-উৎপত্তি কথা’ গ্রন্থে দুই স্থানে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। এক স্থানে (প্রথম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়ে) কোটিল্যকে ও কামন্দককে নীতিশাস্ত্রের রচয়িতা বলা হইয়াছে; এবং আর এক স্থানে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) দণ্ডনীতির পরিচয় প্রসঙ্গে উক্ত আছে,—‘মৌর্য সম্রাটের উপকারের জন্ত হয় লক্ষ্য রোকে প্রথিত করিয়া আচার্য্য বিকৃণ্ড সৎকিণ্ডভাবে এই দণ্ডনীতি গ্রন্থ একটন করেন।’

† Hillebrandt—*Das Kautilyasastra und Verwandtes*, Breslau, 1908.

‡ Prof. Jacobi—*Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften*, xxxviii, 1912, pp. 832-849.

ছিলেন এবং শিষ্যশুশ্রূষাক্রমে কিরূপে উহা ঐভাবে উপস্থিত হইল, তাহার একটা উল্লেখ বা নিদর্শন কোথাও পাওয়া বাইত। তার পর, ঐ রাজনৈতিক মতকে যদি কোটিল্য-সম্প্রদায়ের মত অভিধানে অভিহিত করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অসাধারণ রাজনীতিককেই, যাহার মন্ত্রণাবলে অতবড় সেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইল— তাঁহাকেই, ঐ মতের প্রবর্তক বলিয়া মানিতে হইবে। সে শক্তিশালী পুরুষের পক্ষে অসম্ভব কি থাকিতে পারে? কল্পনায় আসিতে পারে না, অথচ প্রত্যক্ষ ব্যাপার—ইউরোপের বিষমার্ক দৈনন্দিন গুরুকার্য্যভার বহন করিয়াও বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকগণের সহিত মিলিত হইয়া রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিতেন; সেইরূপ, অসম্ভব— অথচ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়,—অশেষ রাজকাৰ্য্যের মধ্যে বেষ্টিত থাকিয়াও, শিক্ষার্থীগণকে তিনি রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা দিতেন; আর, তাহারই ফলে, কোটিল্য-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে তিনি এক নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। তাই অর্থশাস্ত্র, কোটিল্য-সম্প্রদায়-প্রবর্তিত মত-প্রতিষ্ঠাপক গ্রন্থ-মধ্যে পরিগণিত। তবে ‘অর্থশাস্ত্রের’ গ্রন্থকার যে একই ব্যক্তি—চাণক্য কোটিল্য, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার পক্ষে আরও যে ছুই একটা বিশিষ্ট কারণ নাই, তাহা মনে করিতে পারি না। অর্থশাস্ত্র যে বিভিন্ন গ্রন্থকারের রচনা, অপিচ উহা যে কোটিল্য-নামা ব্যক্তিবিশেষের রচনা নহে, তৎপক্ষে দ্বিবিধ প্রমাণ সর্বাংগে বলবৎ দেখা যায়। প্রথমতঃ,—অর্থশাস্ত্রের ভাষা এতই বিভিন্ন প্রকৃতির যে, সে রচনা অভিন্ন ব্যক্তির বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ‘কোটিল্য’ (কুটিল-স্বভাবসম্পন্ন) এই নিন্দনীয় নামেই বা গ্রন্থকার আপনাকে পরিচিত করিবেন কেন? প্রথম যুক্তির প্রতিপোষক এই যে, অর্থশাস্ত্রের রচনার দেখি, কোথাও সূত্র-সাহিত্যের অসুস্থতি, কোথাও নিরুক্তের অসুস্থতি, কোথাও ভাষা (গত), কোথাও কবিতা। সে সকল যে এক কালের ও এক লেখকের রচনা, তাহাতে ঘোর সন্দেহ আসে। কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’ হইতে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিয়ে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) “সযোনীয়াবুহশশান-গ্রাম-পথাস্চৈ দণ্ডাঃ ।”

“চতুর্দণ্ডসুসেতুবনপথঃ ।”

“দ্বিদণ্ডোহস্তিক্ষেত্রপথঃ ।”

“পঞ্চারজ্জরো রথপথশ্চত্বারঃ পশুপথঃ ।”

“দ্বৌ ক্ষুদ্রপশুমসুস্থপথঃ ।”

(২) “দেশঃ পৃথিবী; তস্তাং হিমবৎসমুদ্রাস্তরসূদীচীনং

যোজনসহস্রপরিমাণং অতির্ঘ্যক্ চক্রবর্তিক্ষেত্রম্ ।”

(৩) “আকরকর্মাগুজব্যহস্তিবনত্রজবণিকৃপথপ্রচরান্

বারিহুলপথপণ্যপত্তনানি চ নিবেশয়েৎ ।”

(৪) “বিভাবিনীতো রাজাহি প্রজানাং বিনয়ে রতঃ ।

অনন্তাং পৃথিবীং ভূক্তে সর্বভূতহিতে রতঃ ।”

প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলে, এ সকল রচনা বিভিন্ন কালের ও বিভিন্ন জনের রচনা বলিয়াই

প্রতীত হয় বটে; আর তাহাতে একজনকে অর্থ-শাস্ত্রের প্রণেতা বলিতে মনে সংশয় আসে সত্য; কিন্তু আর কয়েকটি বিশেষ বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে সে সংশয় স্বতঃই দূরীভূত হইয়া যায়। অর্থশাস্ত্রের ভাষায় যে বিভিন্ন সময়ের ভাষার ছারপাত বটিয়াছে, তাহার কারণ কি? কারণ এই যে, গ্রন্থকার সর্বশাস্ত্রপারদর্শী অসাধারণ পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন ছিলেন। যাহার অভিজ্ঞতা যত অধিক, তাহার রচনায় তাহা তজ্জপ পরি-ফুট। এ বিষয়ে সাধারণভাবে একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই এক বাঙ্গালা ভাষার রচনায়, আমরা সচরাচরই দেখিতে পাই, টোলের পণ্ডিতগণের রচনা-প্রণালী একপ্রকার এবং ইংরাজী-বিশগণের রচনা আর একপ্রকার। প্রথমোক্তে সংস্কৃতশব্দবাহুল্য; দ্বিতীয়োক্তে ইংরাজী শব্দের আভ্যুদয়। তাই একই বিষয়ের বর্ণনায় অনেক সময় দ্বিবিধ লিপিমুখে দ্বিবিধ মূর্ত্তি প্রকট দেখি। অভিজ্ঞতার অনুরূপ ভাষা-ভাব যে লেখনী-মুখে প্রকাশ পায়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পণ্ডিতপ্রবর চাঁপক্যের কণ্ঠাগ্রে সর্বশাস্ত্র বিজ্ঞমান ছিল। তাহারই নিদর্শন তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশমান। এই শাস্ত্রাভুগত দেশে যে সম্বন্ধে যে ভাবে যেরূপ বাক্য প্রকাশ করা সমীচীন, তিনি সেই ভাবেই সেই বাক্য বিজ্ঞপ্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা-প্রণালী সেই তত্ত্বই বিজ্ঞাপিত করিতেছে। আপন অভীষ্ট-সিদ্ধির সহায়তার জন্ত, কোনও কোনও স্থলে পূর্ব-মহাজনগণের বাক্য তিনি যথাযথ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়াও মনে করিতে পারি। অতএব রচনা-প্রণালীর বিভিন্নতা-দৃষ্টে অর্থশাস্ত্র যে বিভিন্ন লেখকের রচনা, তাহা প্রতিপন্ন হয় না। তার পর, ঐ রচনায় মধ্যে অভিনব এক সাম্যভাব প্রত্যক্ষ হয়। ঐ গ্রন্থ যে এক সময়ে একজন গ্রন্থকার কর্তৃক সঙ্কলিত ও রচিত হয়, উহার ভাষা তাহা প্রমাণ করে। একই ভাষা—প্রদেশ-ভেদে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। একই বাঙ্গালা ভাষা বা একই হিন্দী ভাষা নানা আকারে প্রকাশমান। একই সংস্কৃতভাষার রচনায় মধ্যে যতই সাদৃশ্য থাকুক, কাল-গত বা প্রদেশ-গত পার্থক্য আপনা-আপনিই প্রকাশ পায়। কালিদাসের এবং ভবভূতির রচনা তুলনায় সমালোচনা করিলে, প্রাদেশিক স্বতন্ত্রতা অস্বাধিক উপলব্ধি হইবেই হইবে। ঋতির ভাষায় ও শ্বতির ভাষায় কালগত পার্থক্য আপনিই বোধগম্য হয়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে সে বৈষম্য আদৌ দৃষ্ট হইবে না। স্থানে স্থানে ভাষা জটিল কুটিল হইলেও, উহা যে একই সময়ের সঙ্কলিত ও লিপিত—একই প্রদেশের ভাষা, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই স্থলে কোটিল্য চাঁপক্যের বাসভূমি বা জন্মস্থান সম্বন্ধে একটা দৃঢ় ধারণা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইতে পারে।

চাঁপক্য
বাঙ্গালী কি না?

যে ভাষা, যে ভাব বা যে বর্ণনা দৃষ্টে মহাকবি কালিদাসকে আমরা বাঙ্গালী বলিয়া সিদ্ধান্ত করি, অর্থশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির ভাষা-ভাব-বর্ণনা

আলোচনা করিলে, কোটিল্য চাঁপক্যকেও সেইরূপ বাঙ্গালী বলিয়া ধারণা জন্মিতে পারে। তাঁহার বাস-প্রদেশের বিষয় আলোচনায়, বঙ্গদেশের সহিত তাঁহার সংশ্লিষ্ট প্রতাপ হয়। * এদেশে ইংরেজ আগমনের পূর্বে বা সমসময়ে চাঁপক্য-নীতির প্রচার-প্রযাত্রা স্মরণেও

* যেমন ২৪-পরমণীর চাঁপক (বারাকপুর) আছে, তেমনই রাঢ়ে বীরভূম-জেলায়ও এক চাঁপক গ্রাম আছে।

এদেশের সহিত তাঁহার সংপ্রবেশ কথা মনে আসে। আবার অল্প দেশ অপেক্ষা এই বঙ্গদেশেই বা কেন চাণক্য নামের প্রভাব এত অধিক দৃষ্ট হয়? ফলতঃ, চতুর্বিধ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে, চাণক্যকে বঙ্গদেশবাসী ভিন্ন অল্পদেশীয় বলিয়া মনে করা যায় না। প্রথম,—তাঁহার ভাবার সহিত বঙ্গদেশ-প্রচলিত সংস্কৃত ভাবার সাদৃশ্য; দ্বিতীয়,—তাঁহার চাণক্য নাম জন্মস্থান 'চাণক' গ্রাম হইতে উৎপন্ন এবং বঙ্গদেশে ঐ নামধের গ্রামের বিদ্যমানতা; তৃতীয়,—অল্পাংশ প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে তাঁহার বিষয় অত্যধিক প্রচারিত আছে; চতুর্থ,—বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিবিধ আচার-ব্যবহারের অনুসরণ তাঁহার গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। * কেহ কেহ চাণক্যকে পঞ্চনদ-প্রদেশের অধিবাসী এবং তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত বিষয়-সমূহ বিচার করিয়া দেখিলে, সে সিদ্ধান্ত আদৌ ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। তক্ষশিলায় চন্দ্রগুপ্তের প্রাধান্য বিদ্যুত হইয়াছিল এবং তৎসময়ে তথায় চাণক্যাদির গতি-বিধি ছিল। এ ভিন্ন, তাঁহার রচনার, আচার-ব্যবহারে বা জন্ম-গোত্রে সে পরিচয় কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরন্তু, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ ধাত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন, এ জন্ত তাঁহার যে 'কৌটিল্য' নাম হয়, তক্ষশিলায় বাসের বিষয় মনে করিতে গেলে প্রাচীন টীকাকারগণের সে সিদ্ধান্তের সার্থকতাও থাকে না। ধাত্ত-সম্পদ বঙ্গদেশেরই নিজস্ব; পঞ্জাবের তক্ষশিলায় ধাত্তোৎপত্তির ও সঞ্চয়ের সম্ভবনা অল্পই মনে আসিতে পারে। সে হিসাবে, যবের বা গমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বরং বিচার্য্য বিষয় হইত। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে তত্ত্বলের বিষয়ই পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে।† তার পর, মন্ত্রিত্বের উপযোগী রাজনৈতিক ভীক্স-বুদ্ধি বঙ্গদেশীয় উদ্যোগী পুরুষেই শোভা পায়। রাজপদ-প্রদানে বঙ্গদেশের জিয়া আধুনিক ইতিহাসে এতই প্রকট হইয়া আছে যে, ঐ হিসাবেও চাণক্যকে বাঙ্গালী বলা যায়। কেহ কেহ কহেন যে, কুটিল অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তিনি 'কৌটিল্য' নামে পরিচিত হন। কিন্তু তাহা বিশ্বাস করা যায় না। আপনাকে অপরের হের প্রতিপন্ন করিবার জন্ত কেহ কখনও তক্ষপ সংজ্ঞা গ্রহণ করে না। সাধারণ মানুষের এরূপ প্রকৃতি কখনই স্বীকার করা যায় না।‡ ভগবদ্ভক্ত আপনাকে

সে গ্রাম যে প্রাচীন, তাহারও কোনও সংশয় নাই। এখন কোন্ চাণকের সহিত চাণক্যের সম্বন্ধ স্থির হইতে পারে, অনুসন্ধিৎসুগণ তাহার সন্ধান লউন।

* পরবর্তী অংশে এই বিষয়ের আলোচনা আছে।

† "কাঠপঞ্চবিংশতি পদ্যঃ তত্ত্বলপ্রস্থানধনম্।" ইত্যাদি অর্থশাস্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৭ অধ্যায় প্রভৃতিতে তত্ত্বলের উল্লেখ উল্লেখ্য।

‡ রাজ-চক্রবর্তী অশোকের অনুশাসনে 'দেবানাং প্রিয়' উপাধি দেখা যায়। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, ঐ উপাধি গৌরবজনক নহে; উহা হের-অর্থ-জ্ঞাপক; পাণিনি তাঁহার সূত্রে "দেবানাং প্রিয় ইতি সুৰ্বে" অর্থাৎ সুৰ্বে অর্থে 'দেবানাং প্রিয়' বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে,—এইরূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আবার প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—"অশোক অসাধারণ শক্তিশালী এবং অতি বুদ্ধিমান রাজা ছিলেন। তিনি আপনার গৌরব ঘোষণা করিতে যাইয়া, 'দেবানাং প্রিয়' উপাধি গ্রহণে, লোক-সমাজে আপনাকে হের প্রতিপন্ন করিবেন,—ইহা কখনই মনে হয় না। দেবানাং প্রিয় ইতি সুৰ্বে—এ উক্তি পাণিনির নহে;

‘দাসাহুদাস’ বলিয়া পরিচিত করিতে পারে ; কিন্তু ঘোর বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন জনে সেরূপ সম্ভবে না। সুতরাং ‘কোটীলা’ যে চাণক্যের বংশগত উপাধি, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আর, তাহা অস্বীকার করিতে না পারিলে, চাণক্যকে বঙ্গদেশবাসী বলিয়াই মানিয়া লওয়া আবশ্যক হয়। বংশগত উপাধি,—নীচাৰ্থবোধকই হউক, আর বাহাই হউক, মানুষ তাহা ব্যবহার করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় না। উচ্চশ্রেণীর পূজ্য ব্রাহ্মণ “ঢাক ঢোল” উপাধিতে পরিচিত আছেন বলিয়া যদি কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণতর বর্ণ বলিয়া মনে করে, সে তাহার অনভিজ্ঞতা ভিন্ন অজ্ঞ কিছুই নহে। অতএব, চাণক্যের কোটীলা সংজ্ঞা দেখিয়া অধুনা বাঁহারা নাটকে ও উপজ্ঞাসে তাঁহাকে ঘোর কুটিল ব্রাহ্মণ রূপে অঙ্কিত করিতেছেন, সে তাঁহাদের বিষম ভ্রান্তি। তার পর, যে জম কুটিল রাজনীতি (দণ্ডনীতি) শাস্ত্রের প্রবর্তনা করিতে গিয়া আপনাকে ‘কোটীলা’ অভিধানে অভিহিত করিয়া যান, তিনি সাধারণ মানুষ নহেন,—তিনি নিশ্চয়ই অসাধারণ মহাপুরুষ। বুঝিতে হয়—তিনি জ্ঞান-পথে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, লোকরক্ষার জন্ত ঐ নীতির প্রবর্তনা করিলেও উহা যে কুটিল বুদ্ধির পরিচায়ক, সুতরাং ঐ নীতি-প্রবর্তকরূপে তিনি কোটীলা-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইবার উপযুক্ত,—তাহাই মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার নীচত্বের নহে, পরন্তু মহত্বেরই পরিচায়ক। * চাণক্য অসাধারণ শক্তিশালী মহামনা পুরুষ ছিলেন, এতদ্দৃষ্টান্তে তাহাই উপলব্ধি হয়।

চন্দ্র গুপ্ত চাণক্যের সম্মিলন সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প-উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কবি-নাট্যকারের কল্পনা কতরূপে কতভাবে সে চিত্র যে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রকাশ,—দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য একদিন ক্ষুৎপিপাসার কাতর হইয়া নন্দরাজের ভবনে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়াছিলেন; আর রাজা তাঁহাকে ভৃত্যের দ্বারা অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেই অপমানের প্রতিশোধ-গ্রহণ-উদ্দেশ্যে চাণক্য রাজ-প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিলিত হন।

চন্দ্রগুপ্ত-
চাণক্যের
মিলন।

পরন্তু উহা ভট্টজিদীক্ষিতের।” অধুনা ‘His Majesty’ বলিতে যে উচ্চ ভাব উচ্চ ধারণা মনে আসে, তৎকালে ‘দেবানাং প্রিয়’ উপাধিতে সেই ভাব সূচিত হইত। রাজচক্রবর্তী অশোক যে সময়ে ‘দেবানাং প্রিয়’ বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিয়াছিলেন, সে সময় ঐ উপাধি অর্গোরবজনক ছিল না। অশোক একজন বিখ্যাত রাজনীতিক ছিলেন। তিনি আপনাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত ‘দেবানাং প্রিয়’ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ অমুমান সমীচীন নহে। অশোক-প্রবর্তিত অনুশাসন-সমূহে ‘পাবত্ত’ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ঐ শব্দে তৎকালে ‘পরিবৎ’ অর্থ সূচিত হইত। কিন্তু ক্রমশঃ উহার অর্থ-বিকৃতি ঘটয়াছে। ‘দেবানাং প্রিয়’ এবং ‘পাবত্ত’ শব্দের স্থায় ‘কোটীলা’ শব্দেরও পরবর্ত্তিকালে অর্থ-বিকৃতি ঘটয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। হিন্দু ও পারসিকগণের বিবাদের ফলে, দেব ও অহর শব্দের যে অর্থ-বিপর্যয় ঘটয়াছিল, এ এসক্রে তাহারও উল্লেখ করা বাইতে পারে। হিন্দুগণ, পারসিকগণের উপাস্তদেবতাকে অহর সংজ্ঞা প্রদান করেন; আবার পারসিকগণ হিন্দুদিগের দেবতাকে হর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সেইরূপ মনে হয়, বাঁহারা চাণক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহার ‘কোটীলা’ শব্দে মন্দ অর্থ সূচিত করিয়া, তাঁহাকে হের প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। নচেৎ, অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক চাণক্য আপনাদের নামের সহিত ঐরূপ ঘের উপাধি সংযোগ করিয়া লোক-সমাজে নিম্ননীর হইবেন,—এরূপ মনে করা বাইতে পারে না।

জন্ত মতে প্রকাশ, শত্রুদলনে চাণক্যের ঐকান্তিকতা দেখিয়া চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে আপনাব দলভুক্ত করিয়া লন। এ ক্ষেত্রে শত্রু-দমনে তাঁহার একাগ্রতার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পিপিলিকার দ্বারা কুশমূল-ধ্বংসের উপাখ্যান কথিত হয়।* কিন্তু এ সকল উপাখ্যানের মূল কারণ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। চাণক্যের জ্ঞান মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ক্ষুধার কাতর হইয়া রাজার ভোজনাগারে প্রবেশ করেন এবং ভৃত্যগণ কর্তৃক বিতাড়িত ও অপমানিত হন; আর সেই জন্তই নন্দ-রাজ্যের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছিল;—এবমিধ কিম্বদন্তীতে আস্থা স্থাপন করাচ সমীচীন নহে, কুশমূল-ধ্বংসের উপাখ্যানও কল্পনা বলিয়াই মনে হয়।† পরন্তু চন্দ্রগুপ্তের সহিত চাণক্যের মিলনের অপর কোনও নিগূঢ় কারণ আছে, সিদ্ধান্ত হইতে পারে। সে কারণের নির্দেশ অপর কেহ করিয়াছেন কি না, আমরা আজিও সন্ধান পাই নাই। চাণক্য-নীতি ও অর্থ-শাস্ত্র আলোচনা করিতে করিতে যে নিদর্শন আমরা পাইয়াছি এবং যে ভাব আমাদের মনে আসিয়াছে, তাহাই এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। অর্থ-শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

“যেন শাস্ত্রং চ শত্রুং চ নন্দরাজগতা চ ভূঃ। অমর্ষেণোদ্ধৃতাশ্চ তেন শাস্ত্রমিদং কৃতম॥”

শ্লোকটীতে অর্থ-শাস্ত্রের রচয়িতা আপনাব পরিচয় প্রদান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—‘এই শাস্ত্র (অর্থ-শাস্ত্র) প্রণয়ন করিয়াছেন কে?—না, যিনি শাস্ত্রকে, শত্রুকে এবং নন্দরাজাধিকৃত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।’ এই উক্তিতে কি বুঝিতে পারি? বুঝিতে পারি না কি—তখন শাস্ত্র (ধর্ম-কর্ম) লোপ পাইতে বসিয়াছিল, শত্রে বা যুদ্ধবিজ্ঞান জনসাধারণকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, আর ভূ বা রাজ্য নন্দরাজ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। অর্থাৎ,—বিশৃঙ্খলা বা ব্যভিচার তখন প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আবার দেখিতে পাই,—

“অপনীতো হি দণ্ডঃ মাংস্তজ্জায়মুক্তাবরতি।

বলীয়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে॥” ইত্যাদি।

এই উক্তিতেও বুঝিতে পারি, তখন নন্দরাজগণ বিলাস-বাসনে এতই উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, শাসনের প্রতি তাঁহাদের আদৌ লক্ষ্য ছিল না। ব্যভিচার ও অরাজকতার প্রাবল্যে রাজ্যে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছিল। দুর্বলের পীড়ন দেশের সর্বত্র পরিলক্ষিত হইত; নন্দরাজগণের সৈনিকে ক্রক্ষেপ ছিল না। সুতরাং নন্দরাজগণের উচ্ছেদে রাজ্যে শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্ত চন্দ্রগুপ্তের সহিত চাণক্যের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় আরও বুঝিতে পারি,—নন্দ ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিলেন এবং হিন্দু আচার-ব্যবহার মান্ত করিতেন না। ধর্ম-কর্ম তখন লোপ পাইতে বসিয়াছিল; ব্যভিচার-

* “পৃথিবীর ইতিহাস”, চতুর্থ খণ্ডে ‘মুজারাক্স’ নাটকের আলোচনা-গ্রন্থে এতদ্বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

† এ সম্বন্ধে কথিত হয়, ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ চাণক্য নন্দের ভোজনাগারে গমন করিয়া তাঁহার আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কেশাকর্ষণে চাণক্যকে বহিস্কৃত করিবার আদেশ দেন। ভৃত্যেরা রাজার আজ্ঞানুসারে শিখা ধারণ পূর্বক ব্রাহ্মণকে অপমানিত ও বিতাড়িত করে। ব্রাহ্মণ তখন প্রতিজ্ঞা করেন,—যতদিন না নন্দ-বংশের উচ্ছেদ করিতে পারিবেন, ততদিন আর সে শিখা বন্ধন করিবেন না। ব্রাহ্মণের সেই প্রতিজ্ঞাসময়েই নন্দ-বংশ ধ্বংস হয়।

বিশৃঙ্খলা প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল। বুঝিলাম,—নন্দ-বংশীর রাজগণের রাজত্বকালে, ব্যক্তিচার-বিশৃঙ্খলার প্রাবল্যে, দেশ উৎসন্ন-প্রায় হইয়াছিল ; বুঝিলাম,—তঁাহাদের রাজত্ব-কালে ধর্মের মানি ও অধর্মের প্রাধান্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আরও বুঝিলাম—অধর্মের উচ্ছেদ-সাধনে ধর্ম-প্রতিষ্ঠার দেশে মুশাসন-মুপালন প্রবর্তনার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, চন্দ্রগুপ্তের সহিত বাঙ্গালী চাণক্যের মিলন কিরূপে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? এ বিষয়ে কয়েকটা যুক্তির অবতারণা করিতে পারি। প্রথমতঃ—চন্দ্রগুপ্তকে যদি বাঙ্গালী বলিয়া মানিয়া লই এবং তিনি বঙ্গদেশের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া যদি স্বীকার করি, * তাহা হইলে নৈকট্য-সূত্রে চাণক্যের ও চন্দ্রগুপ্তের মিলনের অস্বাভাবিকতা কতকটা বিদূরিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকে দেখিতে পাই, একদা ব্রাহ্মণ চাণক্য আপনার কুটীর-সম্মুখস্থ পথের কুশ উৎপাটন করিতে-ছিলেন। রাজমন্ত্রী শটকার প্রাতঃভ্রমণে বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণকে তদবস্থ দেখিতে পান। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিতে পারেন, ব্রাহ্মণের পদে কুশমূল বিদ্ধ হওয়ার তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বাহা হউক, কুশ-উৎপাটনে ব্রাহ্মণের এতাদিক একাগ্রতা দর্শনে মন্ত্রীর মনে হয়,—ঐ ব্রাহ্মণ যদি কোনও রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে সে রাজার মূলোচ্ছেদ অবশ্যসাধী। আপন অতিপ্রায় সিদ্ধির উদ্দেশ্যে চাণক্যের সহিত শটকার মিলিত হন। রাজধানীর এক প্রান্তে চাণক্যের পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় রাজবাড়ীতে এক শ্রদ্ধ উপলক্ষে চাণক্য রাজা কর্তৃক অপমানিত হন। তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্বক রাজভৃত্যগণ তাঁহাকে সভাস্থল হইতে বিতাড়িত করে। রাজবংশের উচ্ছেদ-সাধন না করিয়া শিখাবন্ধন করিবেন না বলিয়া চাণক্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই সময় চন্দ্রগুপ্তের প্রতিও রাজা মহানন্দ বিরক্ত হইয়া পড়েন। চন্দ্রগুপ্ত রাজপুরী হইতে বিতাড়িত হন। এই সূত্রে, নন্দবংশোচ্ছেদ কামনার, চাণক্যের সহিত আসিয়া চন্দ্রগুপ্ত মিলিত হইয়াছিলেন। † ‘মুদ্রারাক্ষসের’ এ উক্তিও সমীচীন কিনা, বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। চাণক্য রাজধানীতে চতুশ্চাঠী স্থাপন করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। দলে দলে শিক্ষার্থী আসিয়া তাঁহার নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করিত। তাঁহার বশঃখ্যাতি দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। একরূপ অবস্থার তাঁহার জ্ঞান-গবেষণার বিষয় রাজার বা রাজপুরুষগণের অপরিক্রান্ত ছিল—ইহাও মনে হয় না। স্মরণ্য একরূপ কিংবদন্তীতে আত্মা স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নহে। তৃতীয়তঃ,—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়, চন্দ্রগুপ্তের পিতা—মৌরীর রাজ-হুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই মৌরীর রাজ-কন্ডার গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। অঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্মণ চাণক্য মৌরীর রাজের সভাপণ্ডিত বা দ্বারপণ্ডিত ছিলেন,—এ ধারণাও মনে আসিতে পারে। সর্বশাস্ত্রদর্শী মহাজ্ঞানী চাণক্য মৌরীর রাজসভায় বরগীর আসন লাভ করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। পরবর্ত্তিকালে মহাকবি কালিদাস প্রভৃতি যেমন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, চাণক্যও সেইরূপ মৌরীর রাজসভায়

* পরবর্ত্তী পৃষ্ঠ-সমূহে, চন্দ্রগুপ্তের পিতৃ-পরিচয় ও জাতি প্রভৃতি প্রসঙ্গে এতদ্বিষয়ের আলোচনা হইবে।

† “পৃথিবীর ইতিহাস” চতুর্থ খণ্ডে ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ হইবে।

শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন; আর সেই যজ্ঞে চন্দ্রগুপ্তের সহিত চাণক্যের পরিচয় সংঘটিত হয়; এবং পরে যখন চন্দ্রগুপ্ত মহাপদ্মানন্দ কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন, সেই সময় তিনি মাতামহদ্বারা চাণক্যের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন;—এরূপ মনে করা যাইতে পারে। অধুনা দেশীয় রাজগণ-শাসিত অধিকাংশ রাজ্যে বাঙ্গালীর প্রভাব দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ উচ্চ-রাজপদ বাঙ্গালীর অধিকৃত। প্রাচীন কালেও যে সেরূপ ছিল না, তাহা মনে হয় না। দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির জটিল সমস্তার সমাধানে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব চির-কালই দেদীপ্যমান। চাণক্যের জ্ঞান অসাধারণ ধী-শক্তিশালী মহাজ্ঞানী পণ্ডিতের প্রভাব মৌর্য-রাজধানীতে বিস্তৃত ছিল।

অর্থ-শাস্ত্র বা অর্থনীতি—চাণক্যের অসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন। তাঁহার জ্ঞান অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ এ সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের কেহ কেহ বলেন—চাণক্য, ম্যাকিয়াভেলি অপেক্ষাও অদ্বিতীয় আদর্শ শাসন-প্রণালী। শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বাহা হউক, অর্থ-শাস্ত্রের আলোচনার আমরা দেখিতে পাই, চাণক্য সর্ববিজ্ঞান পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। আর তাহা হইতে বুঝিতে পারি, চন্দ্রগুপ্তের জ্ঞানসনে রাজকীয় বিভিন্ন বিভাগের কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রে যদিও সরাসরিভাবে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের বা রাজ্য-শাসন-প্রণালীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু তথাপি অর্থশাস্ত্রে যেরূপভাবে রাজ্যের ও শাসন-প্রণালীর আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-রক্ষা-প্রণালী বর্ণনাই অর্থশাস্ত্র-প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তস্বলে অর্থশাস্ত্র হইতে কয়েকটা শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে বিষয়টি বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। শ্লোক কয়টা; যথা,—

১। “বিজ্ঞাবিনীতো রাজা হি প্রজানাং বিনয়ে রতঃ।

অনন্তাং পৃথিবীং ভূক্তে সর্বভূতহিতে রতঃ ॥”

২। “তদ্বিক্রমবৃত্তিরবশেষে স্মিংশ্চাত্তরন্তোহপি রাজা সন্তো বিনশ্চতি ॥”

৩। “দেশঃ পৃথিবী। তন্তাং হিমবৎসমুজ্জাস্তরমুদীতীনঃ

যোজন সহস্র পরিমাণং অতির্যাক্ চক্রবর্তিক্ষেত্রম্ ॥”

উপরি-উদ্ধৃত শ্লোক-ত্রিতর হইতে আমরা বুঝিতে পারি, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; তাঁহার একছত্র শাসন রাজ্যের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। ইত্যাদি। রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসনকালে, তাঁহার জ্ঞান অপর কোনও অদ্বিতীয় শক্তিশালী রাজার পরিচয় পাওয়া যায় না। অথবা, এমন কোনও রাজার উল্লেখ পুরাণাদিতে অথবা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় দৃষ্ট হয় না, যাহার রাজ্য হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, অর্থশাস্ত্রে যে রাজ্যের ও রাজ্যশাসনপ্রণালীর উল্লেখ আছে, তাহা রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব বিবিধ-বিষয়িণী উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত পণ্যাদ্যক্ষ, তদ্যাদ্যক্ষ, নাগরিক প্রভৃতি শব্দের আলোচনার বুঝিতে পারি, বাণিজ্য-বিষয়ে ভারতবর্ষ তৎকালে শীর্ষ-

স্থান অধিকার করিয়াছিল। বাণিজ্যের সুশৃঙ্খলার জন্য নানা বিভাগে নানা আখ্যায় উচ্চাঙ্গ কৰ্মচারিসমূহ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ, কিবা বিচারক্ষেত্রে, কিবা ব্যবহারবিধানে, কিবা স্থাপত্য-বিষয়ে, কিবা শিল্প-বাণিজ্যে, কিবা খনিজ-বিভাগে, কিবা পশু-বিভাগে—সর্বত্র সুশিক্ষিত রাজকৰ্মচারীর নিয়োগে রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন-প্রণালী সভ্য-সমুন্নত সমাজের আদর্শ-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। পশুপালন ও পশু-সংরক্ষণ জন্য চারণভূমির সুব্যবস্থায় চন্দ্রগুপ্তের যেরূপ প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়; পয়ঃ-প্রণালী প্রভৃতি খননে দেশে জলসরবরাহের সুবন্দোবস্তে তাঁহার সেইরূপ আয়াস পরিদৃষ্ট হয়। দেশের এক স্থান হইতে অত্র স্থানে সংবাদ আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা যেমন তাঁহার অশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক; দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ও ঔষধাদি সরবরাহের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতিও সেইরূপ তাঁহার অশেষ জনহিতৈষণার পরিজ্ঞাপক।* ফলতঃ, যে দিক দিয়াই দেখি, যে ভাবেই আলোচনা করি না কেন, রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-শাসনপ্রণালী যে সভ্য-সমুন্নত সমাজের আদর্শ-স্থানীয় ছিল, তাহা যেরূপে কোনই সন্দেহ নাই।

চন্দ্রগুপ্তের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই হির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কোথায় তাঁহার জন্মস্থান, তিনি কোন্ বংশ-সমুদ্ভূত, তাঁহার পিতার নাম কি, কি স্ত্রে তিনি পাটলিপুত্র রাজ-বংশ-পরিচয়। ধানীতে উপনীত হইয়াছিলেন,—এ সম্বন্ধে নানা বাদ-বিতণ্ডা দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের অনুসরণে এদেশীয় পণ্ডিতগণের কেহ কেহ বলিয়াছেন,—চন্দ্রগুপ্ত মুরা নাম্নী দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন।† আবার কেহ কেহ নীচ-বংশসমুদ্ভূত বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। কেহ কেহ আবার বলিয়াছেন,—মুরা তাঁহার পিতামহী ছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুটার্ক এবং জাষ্টিনাস্ প্রভৃতির মতে চন্দ্রগুপ্ত নীচবংশোদ্ভব ছিলেন বলিয়া আলেকজান্ডার তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এমন কি, আলেকজান্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি চন্দ্রগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ডিওডোরাসের বর্ণনায়ও আমরা দেখিতে পাই,—আলেকজান্ডারের প্রবেশের উত্তরে পুরুরাজ বলিয়াছিলেন, ‘গান্ধারদেশের সেই রাজা অতি নীচ-বংশোদ্ভব।’ ঐতিকহাসিক রিজ ডেভিডসও ঐরূপ মতই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ঐরূপ সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হইতে পারে। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা যাহাই হউক না কেন, আমাদের ধারণা কিন্তু তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থের এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কাহারও কাহারও মতের আলোচনার প্রতিপন্ন হয়,—চন্দ্রগুপ্ত রাজপুত্র ছিলেন

* এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদ-সমূহে দ্রষ্টব্য।

† এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ভিলসেট স্মিথের উক্তি,—“Chandragupta Maurya presumably was considered to be a Khatriya—his minister Chanakya or Kautilya certainly was a Brahmin.”—Vide, *Early History of India*, p. 408. ম্যাক্রিডলে বলিয়াছেন,—“He was born in humble life.”

এবং তিনিই মগধের রাজ-সিহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। এ সম্বন্ধে আমাদের যুক্তি নিয়ে একটন করিতেছি। বিষ্ণুপুরাণের প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। তাহাতে লিখিত আছে—

“ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি, স চৈকচ্ছত্রামগ্নজ্জিভিতশাসনো মহাপদ্মঃ
পৃথিবীং ভোক্তাতি ॥ ৫ ॥ ততাপ্যষ্টৌ সূতাঃ সূমাত্যাত্মা ভবিতারঃ। তত্ৰ চ
মহাপদ্মাস্তান্ন পৃথিবীং ভোক্তান্তি। মহাপদ্মঃ, তৎপুত্রাশ্চ একং বর্ষশতমবনীপতরো
ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কোটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ভবিস্যতি ॥ ৬ ॥ তেষামভাবে
মৌর্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্তান্তি। কোটিল্য এব চক্ষুগুপ্তং রাজ্যোভিষেকতি ॥ ৭ ॥

উপরি-উদ্ধৃত অংশের “তেষামভাবে মৌর্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্তান্তি” প্রভৃতি বাক্যের টীকার টীকাকার লিখিয়াছেন,—“চক্ষুগুপ্তঃ নন্দস্যেব পদ্মাস্তরশ্চ মুরাসংজ্ঞস্ত পুত্র মৌর্যাণাং প্রথমম্।” অর্থাৎ,—নন্দের মুরা নামী পত্নীর গর্ভে চক্ষুগুপ্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিই মৌর্যাদিগের মধ্যে প্রথম। তবেই বুঝা যাইতেছে—চক্ষুগুপ্ত হীনবংশ-সম্ভূত ছিলেন না। তিনি রাজা নন্দের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং নন্দরাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য। অপিচ, মুরা দাসী ছিলেন না,—তিনি নন্দের পরিণীতা পত্নী। পাশ্চাত্য পণ্ডিত কর্ণেল মেকেঞ্জিও এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।* তিনি দক্ষিণ-দেশীয় এক পণ্ডিতের নিকট হইতে তৈলঙ্গ-ভাষায় লিখিত একখানি সংস্কৃত-গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে মুরার সম্বন্ধে লিখিত ছিল,—‘কালযুগের আরম্ভে নন্দরাজগণ পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। নন্দরাজের দুই মহিষী—মুরা ও সুনন্দা। এক সময়ে রাজা নন্দ মহিষীদ্বয় সমভিব্যাহারে কোনও সিদ্ধ-পুরুষের আশ্রমে গমন করেন। সিদ্ধপুরুষের পদপ্রকালানন্তর রাজা সেই জল উভয় রাণীর মাথায় ছিটাইয়া দেন। মুরা অতি ভক্তিসহকারে সিদ্ধপুরুষের পাদোদক গ্রহণ করেন। আর তাহারই ফলে তিনি অতি স্বকান্ত এক পুত্র প্রাপ্ত হন।’ ডাক্তার বিলের মতে প্রকাশ,—চক্ষুগুপ্ত মৌরীর নগরের রাণীর পুত্র।† যাহা হউক, যে দিক দিয়াই দেখি, যে ভাবেই আলোচনা করি, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়,—রাজচক্রবর্তী চক্ষুগুপ্তই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি রাজবংশজাত রাণীর সন্তান। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে তাঁহাকে দাসীপুত্র বলিয়াছেন, তাহা অপ্রামাণ্য—আদৌ ভিত্তিহীন। চক্ষুগুপ্তের সম্বন্ধে দেশে ও বিদেশে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। দক্ষিণদেশীয় পুঁথিতে প্রকাশ,—চক্ষুগুপ্তের শৌর্য-বীর্য

চক্ষুগুপ্ত প্রভৃতি দর্শনে নন্দগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ দীর্ঘাশ্রিত হন। সূত্রাং নন্দ-
সম্বন্ধে গণের চক্রান্তে তাঁহাকে কিছুদিন বন্দিভাবে কালযাপন করিতে হয় -
বিবিধ-কাহিনী। এই সময় সিংহলরাজ একটি মোমের সিংহ পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া নন্দরাজ

গণের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠান, যদি কেহ পিঞ্জর না খুলিয়া সিংহকে

* *Vide*, H. H. Wilson, *Theatre of the Hindus*, Vol. II, (Ed. 1835)

† “The Buddhists affirm that Asoka belonged to the same family as Buddha because he was descended from Chandragupta, who was the child of the Queen of one the sovereigns of Moriyānagar.”—Bill’s *Records of the Western World*, Vol. I. P. XVII.

চালাইতে পারেন, তাহা হইলে সিংহলরাজ তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া মানিয়া লাইবেন। নন্দরাজগণ ভাবিয়া আকুল। পিঞ্জর না খুলিয়া কিরূপে সিংহ চালাইবেন, নন্দরাজ স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন,—‘যদি তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়, তাহা হইলে তিনি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।’ নন্দরাজগণ তাহাতে সন্মত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত একটা উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা সিংহের গায়ে অর্পণ করিলেন। মোমের সিংহ গলিয়া গেল। চন্দ্রগুপ্ত কারামুক্ত হইলেন। অতঃপর নন্দরাজগণের নিকট অশেষ ধনসম্পদ প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত রাজার ভ্রাতৃ স্নেহবর্ষ্যে কাণব্যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি নন্দরাজগণের স্বেচ্ছা হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন না। নন্দ-রাজগণ তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাহা হউক, চন্দ্রগুপ্ত একদিন ভ্রমণকালে দেখিতে পাইলেন, এক ব্রাহ্মণ পায়ে কুশ বিদ্ধ হওয়ার ক্রমাগত কুশ গাছ ছিঁড়িতেছেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারই সহায়তায় নন্দবংশের উচ্ছেদে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়া ছিলেন। বিনয়পিটক এবং মহাবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ-গ্রন্থের টীকায় চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে আর একরূপ উপাখ্যান পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে দেখিতে পাই—ধননন্দের নিকট অপমানিত হইয়া চাণক্য বিক্ষারণে পলাইয়া যান। সেখানে তিনি আপনার অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। অর্থবলে বলীমান হইয়া তাঁহার মনে অপর এক ব্যক্তিকে মগধের রাজা করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। এই সময় চন্দ্রগুপ্তের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হয়। ইত্যাদি। চন্দ্রগুপ্তের বিষয় উল্লিখিত বৌদ্ধ-গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা গল্প বা উপকথা বলিয়াই অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। বাহা হউক, ঐ সকল গ্রন্থের আলোচনায় জানিতে পারি,—রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্ত মোরিয়-নগরের নৃপতির দৌহিত্র ছিলেন। মোরিয়নগর যখন শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হয়, চন্দ্রগুপ্তের মাতা তখন গর্ভবতী ছিলেন। রাজা শত্রুহস্তে নিহত হইলে তিনি পলায়ন করিয়া পুষ্পপুরে তাঁহার ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যথাকালে তাঁহার একটা গুহসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। নবজাত শিশুকে একটা মৃৎপাত্রের শোয়াইয়া তিনি সেই মৃৎপাত্রটী এক খোঁয়াড়ের দরজায় রাখিয়া আসেন। অরক্ষিতের রক্ষক স্বয়ং ভগবান। বোধ হয় তাঁহারই নির্দেশক্রমে চন্দ্র নামা একটা বৃষভ শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকে। * শিশুকে তদবস্থ দেখিয়া জনৈক রাখালের মনে বাৎসল্যের সঞ্চার হয়। রাখাল শিশুকে আপন গৃহে লইয়া গিয়া লালন-পালন করিতে থাকে। এক ব্যাধ রাখালের বন্ধু ছিল। ব্যাধ আদর করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে আপন গৃহে লইয়া গেল। সেখানে চন্দ্রগুপ্ত অপর রাখাল-বালকগণের সহিত গোমেবাদি চরাইতে লাগিলেন। একদিন রাখাল বালকগণের সহিত খেলা করিতে করিতে তাঁহার মনে রাজা হওয়ার সাধ জাগরিত হইল। রাখাল বালকগণের সকলের সম্মতিক্রমে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইলেন। অপর সকলের কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি, কেহ কোতয়াল, কেহ প্রজা প্রভৃতি হইল। রাজা হইলেই রাজ্যশাসন আবশ্যক, বিচার-

* কেহ কেহ বলেন, চন্দ্র নামা বৃষভ কর্তৃক গুপ্ত রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া শিশুর নাম চন্দ্রগুপ্ত হয়।

ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাহাও ঠিক হইয়া গেল। বিচারালয় বসিল; চন্দ্রগুপ্ত বিচারকের আসনে উপবেশন করিলেন। অপরাধের ভারতম্যাহুসারে দণ্ডের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। এইরূপ একদিন বিচারে অপরাধীর হাত পা কাটিয়া দিবার আদেশ হইল। কিন্তু কুঠার বা ছুরিকা কিছুই নাই; কি করিয়া হাত পা কাটিয়া দেওয়া হইবে; রাজাহুচরণ তাবিয়া আকুল হইল। তাহাদিগকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া চন্দ্রগুপ্ত গভীর স্বরে কহিলেন,—“আমার আদেশ। ছাগ-শৃঙ্গে হাত-পা কাটিয়া দেও।” তাহাই হইল। শৃঙ্গের আঘাতে হাত-পা বিধগ্নিত হইয়া পড়িল। রাজার আদেশ প্রতিপালিত হইল। চন্দ্রগুপ্ত পুনরায় তাহা জুড়িয়া দিবার আদেশ করিলেন। অমনি হাত-পা পূর্ববৎ যথাস্থানে বিভক্ত হইল। এই সময় ঘটনাক্রমে চাণক্য সেই স্থানের সন্নিকটে গমন করিয়াছিলেন। এই অভূতপূর্ব ব্যাপার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে হইল,—এ বালক নিশ্চয়ই সামান্য রাখাল-বালক নহে; বালক নিশ্চয়ই কোনও মহাপুরুষ হইবে। অতঃপর চন্দ্রগুপ্তকে সঙ্গে লইয়া চাণক্য সেই ব্যাধের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাধকে যথোচিত পুরস্কার দিয়া চন্দ্রগুপ্তকে বিভাশিকা দানের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিলেন। ব্যাধ এত অর্থ কখনও দেখে নাই। অর্থলাভে ব্যাধ বশীভূত হইল। চন্দ্রগুপ্তকে দান করিতে সে আর কোনও আপত্তি করিল না। চন্দ্রগুপ্তকে আপন আশ্রমে লইয়া আসিয়া চাণক্য তাঁহার গলায় স্বর্ণহুত্র পরাইয়া দিলেন। চাণক্যের সুশিক্ষার চন্দ্রগুপ্ত কিছুদিন পরে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। রাজকুমার পর্কতও চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা চাণক্যের নিকট বিভাশিকা করিতেন। চাণক্য তাঁহারও গলায় স্বর্ণহুত্রের মালা পরাইয়া দিয়াছিলেন। একদিন শিশুদ্বয় সহ চাণক্য নিদ্রা ঘাইতেছিলেন। হঠাৎ চাণক্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি কুমার পর্কতকে ডাকিয়া কহিলেন,—“এই অসি লও। যাও, চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠ হইতে স্বর্ণ-হুত্র লইয়া আইস। হুত্রগাছি খুলিবে না বা ছিঁড়িবে না—এমনই ভাবে আনিতে হইবে।” পর্কত তীক্ষ্ণধার অসি-হস্তে অগ্রসর হইলেন বটে; কিন্তু হুত্র-গ্রহণে ক্লতকার্য্য হইলেন না। পরদিন চাণক্য ঐরূপভাবে চন্দ্রগুপ্তের হস্তে অসি প্রদান করিয়া পর্কতের কণ্ঠ হইতে স্বর্ণহুত্র আনিবার আদেশ করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—‘হুত্র ছিঁড়িবে না—খুলিতেও পারিব না। তবে কি উপায়ে হুত্র আনিব! চাণক্যের আদেশ পালন করিতেই হইবে। তবে কি পর্কতের মন্তকচ্ছেদনই চাণক্যের অভিপ্রেত! হুত্র-গ্রহণ করিতে হইলে তবে কি আমাকে তাহার মন্তকচ্ছেদন করিতে হইবে?’ যাহা হউক, অনেক তাবিয়া চিন্তিয়া পর্কতের মন্তকচ্ছেদন করাই চন্দ্রগুপ্ত স্থির করিলেন। তাহাই হইল। চন্দ্রগুপ্ত অসির আঘাতে পর্কতের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া চাণক্যের পদতলে স্বর্ণহুত্র রক্ষা করিলেন। চাণক্য বিশেষ চমৎকৃত হইলেন। চন্দ্রগুপ্তের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি চন্দ্রগুপ্তকে সর্ববিদ্যায় উপদেশ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত একজন বিচক্ষণ ও বহুজ্ঞ পণ্ডিত মধ্যে পরিগণিত হইলেন। বৌদ্ধগ্রন্থে অতঃপর চন্দ্রগুপ্তের দ্বিধিকয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই,—প্রথমে চন্দ্রগুপ্তের সকল সিদ্ধ হয় না। চাণক্যের সঙ্কিত অর্থবলে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রথমে যদিও তিনি জনাকীর্ণ নগর ও জনপদ অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন;

কিন্তু জনসাধারণের সমবেত আক্রমণে পরাজিত হইয়া চাণক্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পলায়নপর হইতে হইয়াছিল। বাহা হউক, যুদ্ধে পরাজয়ের পর উভয়ে কিছুদিন বনে বনে ভ্রমণ করেন। পরে ছদ্মবেশে জনসাধারণের অভিপ্রায় জানিবার উদ্দেশ্যে বন পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে নগরে নগরে ঘুরিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থার ভ্রমণ করিতে করিতে উভয়ে এক দিন এক গ্রামে উপনীত হন। সেই গ্রামে এক রমণী আপনার পুত্রকে পিষ্টক খাওয়াইতেছিলেন। বালক পিষ্টকের চারি পাশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মধ্যস্থল হইতে খাইতেছিল এবং তাহা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় পিষ্টক চাহিতেছিল। রমণী জুকা হইয়া পুত্রকে তিরস্কার-হলে বলিল,—‘তোমার আচরণ, দেখিতেছি, রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যজয়ের ছায়া।’ বালক তাহাতে জিজ্ঞাসা করিল,—‘কেন মা, কেন এরূপ কহিতেছ? চন্দ্রগুপ্তই বা কি করিয়াছিলেন, আর আমিই বা কি করিতেছি?’ পুত্রের এবিধ প্রশ্নে মাতা উত্তর দিলেন,—‘কেন বৎস, তুমি তো পিষ্টকের মধ্যস্থল খাইতেছ, আর চারি পার্শ্ব পরিত্যাগ করিতেছ! চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইবার আশায়, তোমারই মত রাজ্যের চারি ধার সীমান্ত-প্রদেশ-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া একেবারে কেন্দ্রস্থল নগর-জনপদাদি আক্রমণ করিতে আগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার এ নির্করুজিতার ফলে সৈন্তগণ শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়া নিহত হইতেছে।’ * রমণীর এবিধ বাক্য শ্রবণে চন্দ্রগুপ্তের জ্ঞানোদয় হয়। চন্দ্রগুপ্ত আপনার নির্করুজিতার বিষয় বুঝিতে পারিয়া তৎপ্রতিকারার্থ বদ্ধপরিকর হন। বাহা হউক, অতঃপর পুনরায় বহুতর সৈন্ত সংগৃহীত হইল। এবার চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত একযোগে দেশজয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ পাটলিপুত্র আক্রান্ত হইল। ধননন্দ +

* সিংহল-দেশীয় সংস্করণে মহাবংশের টীকার এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। ঐ অংশের ইংরাজী অনুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল; যথা,—“In one of the villages a woman (by whose hearth Chandra-gupta had taken refuge) baked a Chupatty and gave it to her child. He, leaving the edges ate only the centre and throwing the edges away, asked for another cake. Then she said,—‘This boy’s conduct is like Chandragutta’s attack on the kingdom.’ The boy said,—‘Why, mother, what am I doing, and what has Chandra-gutta done?’ ‘Thou, my dear’, said she, ‘throwing away the outside of the cake, eatest the middle only. So Chandragutta, in his ambition to be a monarch, without beginning from the frontiers and taking the towns in order as he passed, has invaded the heart of the country.....and his army is surrounded and destroyed. That was his folly.” &c.—Quoted by Rhys Davids in his *Buddhist India*.

+ মহাবংশে নন্দবংশের শেষ রাজা ধননন্দ নামে পরিচিত হইয়া আছেন। পণ্ডিতগণের মতে, রাজা নন্দ অতিশয় লোভপরভ্রষ্ট ছিলেন বলিয়া তিনি ঐ নামে অভিহিত হন। দৈনিক পরিব্রাজক হসেন-নাস তাঁহার অভুল ঐশ্বর্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পাটলিপুত্র নগরের সন্নিকটস্থ বে পাঁচটা গুপ অশোকের গুপ বলিয়া অভিহিত হয়, প্রত্নতত্ত্ববিৎ বিলের মতে ঐ গুপ-সমূহ অশোকের নহে; উহা রাজা নন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঐ গুপ-গন্ধক তাঁহার ধনাগার মধ্যে পরিগণিত ছিল। (*Vide, Beal’s Buddhist Records of the Western World, Vol. II.*) সুত্রারাক্ষস নাটকেও নন্দরাজ্যপত্ন্য লোভ-পরভ্রষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

যুদ্ধে নিহত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সময় চন্দ্রগুপ্তের গুপ্তশত্রুর আশঙ্কা চাণক্যের মনে বলবৎ হয়। কেহ হয় তো তাঁহাকে কোনও দিন বিষ প্রয়োগ করিতে পারে,—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া, চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে বিষ-পানে অভিযুক্ত করেন। চন্দ্রগুপ্ত সন্ধ্যাে স্বদেশে যেমন নানা উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বিদেশে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থেও তাঁহার সন্ধ্যাে সেইরূপ নানা কাহিনী দেখিতে পাই। গ্রীক ঐতিহাসিক জাস্টিনাস লিখিয়া গিয়াছেন,—আলেকজান্ডার ক্রোধ-পরবশ হইয়া চন্দ্রগুপ্তের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। চন্দ্রগুপ্ত পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি যখন পরিক্রান্ত দেহে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই সময় এক সিংহ লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু সিংহ তাঁহার প্রাণবধ না করিয়া গা চাটিয়া চলিয়া যায়। এই ঘটনার চন্দ্রগুপ্তের মনে আশার সঞ্চার হয়। তিনি সৈন্ত-সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন এবং পরিশেষে বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া গ্রীকসৈন্ত পরাস্ত করিয়াছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে প্রকাশ,—চন্দ্রগুপ্ত বিপুল সৈন্তের সাহায্যে দেশজয়ে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় এক বন্যহস্তী তাঁহাকে আপন পৃষ্ঠে তুলিয়া লয়। * পাশ্চাত্য কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে চন্দ্রগুপ্ত নন্দ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া মহাবীর আলেকজান্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করেন; বলেন,—‘মগধরাজ্য নন্দের কু-শাসনে দেশে বিজ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যদি সসৈন্তে মগধের দিকে অগ্রসর হন, তাহা হইলে মগধ-রাজ্য সহজেই তাঁহার পদানত হইতে পারে।’ + কিন্তু আলেকজান্ডার মগধ-আক্রমণে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, উল্লিখিত উপাখ্যান-পরম্পরা হইতে কি বুঝিতে পারি? উহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় না কি, রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্ত

* এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তি,—“Justin (xv. 4), on Greek authority, tells two graceful stories of the effect upon animals of the marvellous nature of the king. Once, when, as a fugitive from his foes, he lay down overtaken, not by them, but by sleep, a mighty lion came and ministered to him by licking his exhausted frame. And again, when he had collected a band of followers and went forth once more to the attack, a wild elephant came out of the Jungle, and bent low to receive Chandragupta on his back.” *Vide, Rhys David's Buddhist India.*

৩। গ্রীক ঐতিহাসিক প্লুটার্ক তাঁহার গ্রন্থে এই বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই অনুসরণে ঐতিহাসিক ভিসেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন,—“In some way or other young Chandragupta incurred the displeasure of his kinsman, Mahapadma Nanda, the reigning King of Magadha, and was obliged to go into exile. During his banishment he had the good fortune to see Alexander, and is said to have expressed the opinion that the Macedonian King, if he had advanced, would have made an easy conquest of the great Kingdom on the Ganges, by reason of the extreme unpopularity of the reigning monarch.”—*Vide, Vincent A. Smith, The Early History of India.*

দেশবাসীর কিরূপ প্রকার, ভক্তির ও আদরের সামগ্রী ছিলেন! অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন না হইলে, অশেষ সদ্গুণাবলীর সমাবেশ না থাকিলে, পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিতে না পারিলে, কেহ কখনও দেশবাসীর জন্ম অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। আর ব্যক্তি-বিশেষে ঐ সকল সদ্গুণাবলীর সমাবেশ না থাকিলে দেশবাসী গাথাই উপাখ্যানে তাঁহার স্মৃতি আবদ্ধ রাখিতে প্রয়াস পার না। চন্দ্রগুপ্ত সকল সদ্গুণের আধার ছিলেন। তাই দেশবাসী তাঁহাকে দেবতার দ্যায় প্রজ্ঞা করিত; আর তাহারই নিদর্শন-বস্তুপ আনা পাখার অবতারণার তাঁহার স্মৃতি জন্মে জন্মে গ্রথিত রাখিবার প্রয়াস দেখিতে পাই। অতীত মনে করেন, দেশপতি সম্রাটের বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবিশেষের লবকে ঐক্সম উপাখ্যানাদির অবতারণা প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উহা তিতিহীন উপকথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ঘাইতে পারে।

পুরাণাদির আলোচনার এবং পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্তের সার্য নিম্নাংশে প্রতিপন্ন হয়,—রাজচন্দ্রবর্তী চন্দ্রগুপ্ত ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার

চন্দ্রগুপ্ত
বাদানী।

মাতা মৌরীর-নগরের রাজকন্যা ছিলেন, কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন

যে, এই মৌরীর-নগর শাক্য-বংশের কোনও রাজকুমার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল। মৌরীর-নগরের অবস্থানাদির বিষয় নিঃসংশয়ে সঙ্গমণ

হয় না। * চৈনিক পরিব্রাজক হুং-উং ও হুয়েন-সাং প্রভৃতি মৌরীর-নগরের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনার প্রকাশ,—উদয়ন-রাজ্যে মৌরীরনগর অবস্থিত।

* বৌদ্ধগণের মতামত এই যে মৌরীর-নগর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এক কিংবদন্তী আছে। তাহা এই,—যুবরাজ বিরুদ্ধকের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শাক্য-বংশীয় কতিপয় যুবক হিমবন্ত দেশে পলায়ন করেন। বুদ্ধদেব সে সময় জীবিত ছিলেন। ইত্যন্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক নির্বিঘ্ন বনমধ্যে এক অতি মনোরম স্থান তাহাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। তাহারা দেখিতে পান, সেই স্থানে স্বচ্ছ-তোয় সরিৎসমূহ সদা প্রবাহিত, নানা-জাতীয় বিহঙ্গের কল-কাকলীতে সে স্থান সদা মুখরিত; নানা শ্রেণীর ময়ূরের কেকাদানিতে ও আনন্দ-নৃত্যে সে স্থান সদা প্রফুল্লিত। সেই মনোরম স্থানে উপনীত হইয়া প্রান্ত স্রাব্দ দেখে যুবকগণ নিম্নাতিভূত হইয়া পড়েন। কথিত হয়, এই সময় ময়ূরগণ কর্তৃক পূর্বত হইতে জল আনীত হয় এবং যুবকগণ সেই জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এই ঘটনা হইতে তাহাদের বংশাবলী ময়ূর, ময়ূরী বা মৌরীর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। *Vide St. Martin, Memoire and Max Muller, History of Ancient Sanskrit Literature.* চৈনিক পরিব্রাজক কা-হিয়ান, হুয়েন-সাং প্রভৃতির গ্রন্থ-পত্রে এই মৌরীর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত উদয়ন-রাজ্যের পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত হয় রাজা প্রসেনজিতের পুত্র বিরুদ্ধক, শাক্যগণের নিকট বিদ্যা-শিক্ষার্থ গমন করেন। শাক্য-রাজ্যের এক প্রান্তে একটা ধর্ম্মালয়ের নিকট তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হন। কথিত হয়, বুদ্ধদেবের ভ্রাতৃ ঐ মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। বাহা হটুক, বিরুদ্ধকের আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া শাক্যগণ সেই স্থানে উপস্থিত হন এবং বুদ্ধদেবের মন্দির অপরিচয় করিয়াছেন বলিয়া বিরুদ্ধককে ভৎসনা করেন। অপমানিত ও লালিত হইয়া বিরুদ্ধক রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে রাজা প্রসেনজিতের মৃত্যু হয়; বিরুদ্ধক রাজ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সিংহাসন-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তিনি অপ-মানের প্রতিশোধ গ্রহণ জন্ত শাক্য-রাজ্য আক্রমণ করেন। শাক্যগণের চারি ব্যক্তি সে আক্রমণে বাধা প্রদান করে। শাক্য-বংশীয় অপরাধর ব্যক্তি তাহাদের এ আচরণে তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে। কলে তাহারা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হয়। নির্দাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তাহারা উত্তর দিকে পার্শ্ব-দেশে পলায়ন করেন।

কশিলাবস্ত হইতে বিতাড়িত শাক্যবংশীয় এক যুবক তথার রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে মোরীয়নগর—হিন্দুকুল ও চিত্রলেখের মধ্যবর্তী উজ্জয়নক দেশে অবস্থিত ছিল। তাহা হইলে চন্দ্রগুপ্ত পর্জাব অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া সম্ভবান্বিত হইতে পারে। কিন্তু নাম প্রভৃতির আলোচনার আমাদের মনে কিছু ভাব জাগ্রিত হয়। উপাখ্যানসমূহ উপকথার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া যদি তাঁহার নামকরণাদির বিষয় আলোচনা করি, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই না কি—তাঁহার নামকরণে বলদেশের প্রভাবই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পর্জাব বা বিহার অঞ্চলে বা উত্তর-ভারতে একজন নাম-সংজ্ঞার কাহাকেও অভিহিত হইতে দেখি না। এই সকল স্থানের বা দেশের নাম-করণ-পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি, এই সকল দেশে ‘গুপ্ত’ উপাধী কাহারও নাই। রামেশ্বর, রামনারায়ণ, বিজ্ঞেশ্বরী, রাজেশ্বর, কমলেশ্বরীপ্রভৃতি এবং তৎস্বরূপ নাম-সংজ্ঞা প্রভৃতির আধিক্যই উত্তর-দেশীয় নামকরণে প্রবল হইয়া আছে। এ হিসাবে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের লোক না হওয়াই সম্ভব। গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাসের বর্ণনার প্রকাশ,—আলেকজান্ডারের ভারতগমন সময়ে ‘গান্দারিদে’ দেশে এক প্রমত্তপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার বিংশ সহস্র অথারোহী সৈন্য, দুই লক্ষ পরাক্রান্ত সৈন্য, দুই সহস্র রথ এবং তিন চারি সহস্র হস্তী ছিল। গ্রীক-ভাষায় সেই রাজার নাম—‘চন্দ্রমেশ’ (Xandrames) রূপে উচ্চারিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের নামই যে ভাষান্তরে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা

নই পার্শ্বা-প্রদেশে তাঁহারের একজন হিন্দুল রাজ্যের, একজন উদয়ন রাজ্যের, একজন মোরীয় রাজ্যের এক একজন কোশাখীর (শাক্য) অধিপতি হন। শাক্য-বংশীয়-যুবক কর্তৃক উদয়ন-রাজ্য অধিকারের একটা বিবরণ ‘সি-উ-কি’ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ‘সি-উ-কি’র বর্ণনার প্রমাণ,—শাক্য-বংশীয় যুবক পঞ্চাশের কাতর হইয়া ‘লান-পো-লু’ পর্বতের পথে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। এমন সময় এক রাজহংস তাঁহার সমুখে অবতরণ করে। তিনি রাজহংসের পৃষ্ঠে আরোহণ করেন। রাজহংস তাঁহাকে লইয়া আকাশে উড্ডীন হয়। ‘লান-পো-লু’ পর্বতে ‘ড্রাগন’ সর্পের আকৃতি-বিশিষ্ট এক হ্রদ ছিল। যুবককে লইয়া রাজহংস সেই হ্রদের তীরে অবতরণ করে। যুবককে সেই স্থানে রাখা করিয়া রাজহংস চলিয়া যায়। যুবক হ্রদের তীরে এক বৃক্ষমূলে নিদ্রিত অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। এই সময় এক নাগ-নন্দিনী সেই স্থানে উপস্থিত হন এবং মন্থা-মুষ্টি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে গুজ্জ্বা করিতে থাকেন। এই মূর্ত্তে নাগরাজের সহিত যুবকের পরিচয় হয়। নাগরাজ উদয়ন-রাজ্যের বিষয় তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া রাজ্য-অধিকারের জন্য যুবককে উদ্ধৃত্ত করিলেন। নাগ-রাজের পরামর্শমত তিনি উপলোচন সহ ‘উ-চাং-না’ (উদয়ন) রাজ্যের রাজার নিকট উপস্থিত হন। উদয়ন-রাজ উপলোচন এক্ষণে অজ্ঞান হইলে যুবক অসির আঘাতে তাঁহাকে নিহত করেন। Vide, Beal's Buddhist Records of the Western World, Vols. I. II. এই উদয়ন-রাজ্যের অবস্থিতি সম্বন্ধে নানা মতামত দৃষ্ট হয়। কা-হিয়ান এই রাজ্যকে ‘উ-চাং’ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষায় ইহা ‘উজ্জান’ রূপে উচ্চারিত হইয়াছে। মিটার ইউল বলিয়াছেন,—উদয়ন-রাজ্য পেশোয়ারের উত্তরে স্বাত নদীর তীরে অবস্থিত। হরেন-নাং উহার বিস্তৃতি প্রভৃতির যে পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও অনুমান হয়, উদয়ন-রাজ্য হিন্দুকুল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত এবং দরন-রাজ্যের দক্ষিণে চিত্রল হইতে সিন্ধুনদের মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (Vide, Yule Marco Polo) হুং-উং বলিয়াছেন,—এ রাজ্য হুং-লিং পর্বতের সাদৃশ্যে ভারতবর্ষের উত্তরে এই রাজ্য অবস্থিত। উহার জ্ঞান উর্বর দেশ কতিং দৃষ্ট হইত। কাহারও কাহারও মতে মোরীয়নগর সম্ভবতঃ উহার পর্য্যবসিত নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

কোনই সন্দেহ নাই। চন্দ্রগুপ্ত যে ‘গঙ্গারিদে’ দেশের রাজা ছিলেন, সেই দেশ বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ‘গঙ্গারিদে’ দেশ বলিতে তৎকালে গঙ্গাতীরবর্তী রাঢ় দেশকে বা গৌড়-দেশকে বুঝাইত।* বঙ্গদেশ সে সময়ে গৌরবের উচ্চ-চূড়ার সমারূঢ় ছিল। মহাবীর আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণে অগ্রসর হন, সে সময় ‘গঙ্গারাত্রী’ নামধের সৈন্তগণ তাঁহাকে বাধা প্রদান করে। গঙ্গাতীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীরা ‘গঙ্গারাত্রী’ নামে অভিহিত হইরাছিলেন বলিয়াই মনে হয়। বাহা হউক, ‘গঙ্গারিদেশ’ শব্দের আলোচনার প্রতিপন্ন হয়, ঐক-ঐতিহাসিক-বর্ণিত রাজা ‘চন্দ্রমেশ’ বা চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশেই রাজত্ব করিতেন; আর গঙ্গাতীরবর্তী রাঢ়-দেশে তাঁহার রাজধানী ছিল। নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ সমুদ্রগড়ে গুপ্তবংশীর রাজা সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল, পৃথিবীর ইতিহাস চতুর্থ খণ্ডে তাহা নিঃশংসয়ে প্রমাণিত হইরাছে। চন্দ্রগুপ্ত—সমুদ্রগুপ্তের পূর্বপুরুষ ছিলেন কি না,—তাহাও এস্থলে বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। বংশ-পর্যায়ের আলোচনার সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতির সহিত চন্দ্রগুপ্তের পর্যায় নির্দেশ করা সুকঠিন হইলেও কেহ কেহ চন্দ্রগুপ্তকে ‘গুপ্ত’-বংশের আদি বলিয়া অনুমান করেন। গুপ্তবংশীয়গণ আগনাদের নামের শেষে ‘গুপ্ত’ শব্দ ব্যবহার করিতেন; যথা—সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, ঘটোৎকচগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, স্বন্দগুপ্ত প্রভৃতি। চন্দ্রগুপ্তের নামের সহিত ঐ সকল নামের সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহাদের একরূপ অনুমান অমূলক বলিয়া মনে হয় না। বাহা হউক, এতৎপ্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে আসে। অধুনা যেমন একাধিক রাজধানী প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রয়াস দেখিতে পাই, প্রাচীনকালেও যে সেরূপ প্রয়াস ছিল না, তাহা স্বীকার করা যায় না। আধুনিক ঐন্দ্রাবাস, শৈলাবাস প্রভৃতির স্থায় চন্দ্রগুপ্তেরও একাধিক রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমান হয়। যেমন পাটলিপুত্র নগরে তেমনই বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ় প্রদেশে গঙ্গাতীরবর্তী সমুদ্রগড়ে তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী ছিল, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। কোটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-শাসনপ্রণালীর বিষয় উল্লিখিত আছে। তাহাতে চাণক্য পুনঃপুনঃ ধাত্ত-সংগ্রহের ও ধান্য-রক্ষার বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। সুজলাসুফলা শস্তশ্যামলা বঙ্গদেশের উৎপন্ন-দ্রব্যের মধ্যে ধান্যই সর্বপ্রধান। এক বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এত প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয় না। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে পুনঃপুনঃ ধান্যের প্রাধান্য পরিকীর্তিত হওয়ার বুঝিতে পারি, চন্দ্রগুপ্তের প্রধান রাজধানী বঙ্গদেশেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। চাণক্য—চন্দ্রগুপ্তের দক্ষিণ-হস্ত-স্থানীয় ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার আদেশমতই কার্য্য করিতেন, কদাচ তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতেন না। এ হিসাবে, যে দেশে অধিক দিন অতিবাহিত হয়, রাজার বা রাজমন্ত্রীর সেই দেশের অভিজ্ঞতাই অধিক হইয়া থাকে। তাই মনে হয়, চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশেরই লোক, আর বঙ্গদেশেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইরাছিল। আর সেই জন্যই চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গদেশীর আচার-ব্যবহারের, বঙ্গদেশোৎপন্ন শস্যাদির ও বঙ্গদেশীয় রীতিনীতির এতাদিক উল্লেখ দেখিতে পাই।

* পৃথিবীর ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ডে, ‘প্রাচীন বঙ্গের গৌরব-বিত্তব’ অংশে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

—o.o—

প্রাগ্ভারতেতিহাসে এক আদর্শ রাজ্য ।

[আদর্শ-রাজ্যের আদর্শ,—ইংরেজ-রাজত্বে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন-পরম্পরা ;—জন-সংখ্যানির্দ্ধারণে আদর্শ,—প্রাচীন ও আধুনিক পদ্ধতি,—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সে প্রথার নিদর্শন ;—ব্যবহার-বিধির ও রাজবিধির ব্যবহার আদর্শ,—রাজ্যশাসনে ব্যবহার-শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা,—প্রাচীন ও আধুনিককালে তাহার আদর্শের তুলনা ;—ঋণ, চুক্তি, দান, বিক্রয় প্রভৃতির প্রসঙ্গ ;—বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমনের ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবহার আদর্শ,—নদী-নালা প্রভৃতি খননে এবং বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ-সাধনে সে আদর্শ পরিস্ফুট ;—পশু-সংরক্ষণের বিধান-পরম্পরা,—চারণভূমি প্রভৃতির বন্দোবস্তে সে ব্যবহার বিশেষ উৎকর্ষ-সাধনের দৃষ্টান্ত,—তৎকার্য-সাধনে বিভিন্ন আখ্যায় কৰ্মচারী-নিয়োগ,—জলসরবরাহের ব্যবহার জলকষ্ট-নিবারণের বন্দোবস্ত ;—জনহিতকর বিবিধ বিধান,—স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা,—চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত,—দুর্ভিক্ষ, জলকষ্ট, বন্যা প্রভৃতি নিবারণের উপায় নির্ধারণ ;—বিবিধ আদর্শের পরিচয়,—উপসংহারে বিবিধ বক্তব্য ।]

এ সংসারে যাহা অমুকরণযোগ্য, সাধারণতঃ তাহাই আদর্শ মধ্যে পরিগণিত । রাজা বল, রাজ্য বল, রাজত্ব বল—সকলের সম্বন্ধেই এ উক্তি প্রযোজ্য । যে রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ-প্রণালী অপরের অমুকরণীয়—বিবিধ-বিবরণী উন্নতিতে যে রাজ্য

আদর্শ
রাজ্য ।

মুখৈখর্যের চরম সীমার উপনীত, মানুষ প্রধানতঃ তাহাকেই আদর্শ রাজ্য অভিধানে অভিহিত করিয়া থাকে । কি প্রাচীনকালে, কি আধুনিককালে—সকল কালেই এ উক্তির সার্থকতা পরিলক্ষিত হয় । দৃষ্টান্তস্বরূপ অধুনাতন ইংরেজ-রাজত্বের বিবরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে । ইংরেজ-রাজত্বের সর্বতোমুখী উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিলে উহাকে ‘আদর্শ-রাজ্য’ নামে অভিহিত করিতে পারি । জনসংখ্যা-নির্দ্ধারণে প্রজাসাধারণের অভাব-অভিযোগ-নিরূপণ এবং খাজাদি সরবরাহের সুবন্দোবস্ত যদি আদর্শ-রাজ্যের লক্ষণ হয় ; তাহা হইলে ইংরেজ-রাজত্বে তাহার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই । প্রজাসাধারণের শিক্ষাদান-করে মুশিক্ষা-বিস্তারের উপায়-পরম্পরা নির্ধারণ যদি আদর্শ রাজ্যের নিদর্শন হয় ; তাহা হইলে, ইংরেজ রাজত্বে সে আদর্শ পূর্ণ-প্রকটিত । পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি খননে দেশে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে দেশবাসীর জলকষ্ট নিবারণ যদি আদর্শ রাজ্যের আদর্শ উপাদান বলিয়া নির্দিষ্ট হয় ; তাহা হইলে ইংরেজ রাজত্বে সে উপাদান সৰ্ব্বথা বিদ্যমান । রোগনিবারণকল্পে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থার বিবিধ প্রয়াস যদি আদর্শ-রাজ্যের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া উক্ত হয় ; তাহা হইলে ইংরেজ-রাজত্বে তাহার পূর্ণ বিদ্যমানতা প্রত্যক্ষ করি । কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির বিস্তারে রাজ্যের উন্নতি-সাধন যদি আদর্শ-রাজ্যের আদর্শ মধ্যে পরিগণিত হয় ; তাহা হইলে ইংরেজ-রাজত্বে সে আদর্শের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান দেখি । দেশের বিভিন্ন স্থানে সংবাদ-আদান-প্রদানের এবং বিভিন্ন দেশে গতিবিধির সু-ব্যবস্থা যদি আদর্শ রাজ্যের পরিচয়-চিহ্ন মধ্যে গণ্য হয় ;

তাহা হইলে ইংরেজ রাজত্বে সে পরিচয় পূর্ণ প্রতিভাত দেখিতে পাই। এইরূপ যে দিক দিরাই দেখি, যে ভাবেই আলোচনা করি, অধুনা ইংরেজ-রাজস সৰ্ব্ব বিষয়েই আদর্শ মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু আধুনিক কালের আদর্শ রাজ্য-সমূহের বিষয় আলোচনা করা, এ প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে। প্রাচীনকালে, খৃষ্ট-জন্মের তিন চারি শত বৎসর পূর্বে, ভারতীয় নৃপতি-শাসিত কোনও রাজ্যে পূর্বোক্ত আদর্শ-সমূহের কোনও নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় কি না—তাহাই এ প্রসঙ্গের প্রধান আলোচ্য।

১। জনসংখ্যা-নির্ধারণে আদর্শ।

[প্রাচীন ভারতে লোক-গণনা;—ইংরেজ-রাজত্বে লোক-সংখ্যা নিরূপণের প্রয়াস,—তাহার পরিচয়,—অধুনাতন লোক-গণনা পদ্ধতি;—জনসংখ্যা-নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা;—প্রাচীনকালের গণনা-পদ্ধতি,—অর্থ-শাস্ত্রে তাহার বিশিষ্ট পরিচয়;—নগরাদির লোক-গণনা-প্রসঙ্গ;—ভূমি-পরিমাপাদির বিষয়;—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক-গণনা-পদ্ধতি,—তৎপরিচয়ে প্রাচীন আদর্শ পরিক্ষুট।]

প্রাচীন ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনার আদর্শ-রাজ্যের বিবিধ লক্ষণের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। দেশের জনসংখ্যা-নির্ধারণ এবং তদ্বারা শাসন-প্রণালীর সুব্যবস্থা—একতম আদর্শ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কোন্ দেশে ভারতে লোক-গণনা বা কোন্ জনপদে কত লোক বাস করে, প্রতি জনপদের শাসন-সংরক্ষণ জন্ত কি পরিমাণ রাজকর্মচারী নিয়োগ আবশ্যিক, এবং সেই সেই স্থানে কি পরিমাণ খাদ্য-শস্তাদির আমদানি-রপ্তানি করা প্রয়োজন—সুশাসন সুপালন প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত কল্পে এ সকল বিষয় নির্ধারণ করা রাজার একটা প্রধান কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত। এতাদৃশ দূরদৃষ্টি না থাকিলে ছুর্ভিক্ষের প্রবল পেষণে দেশ হয় তো উৎসন্ন যাইতে পারে, শাসন-শৃঙ্খলার কু-ব্যবস্থার দেশে অনাচার-ব্যতিচার প্রবল হওয়াও সম্ভবপর। তাই দেশের জন-সংখ্যা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা। খৃষ্ট-জন্মের প্রায় তিন শতাব্দিক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে এ প্রথা প্রবর্তিত ছিল, অর্থশাস্ত্রের আলোচনার তাহা প্রতিপন্ন হয়; আর অধুনা-প্রচলিত পদ্ধতির সহিত তুলনায় সে পদ্ধতি যে কোনও অংশে হীন ছিল না, তাহা বুঝা যায়। সুতরাং প্রথমতঃ আধুনিক নিয়ম-পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা-নিরূপণ-পদ্ধতির আলোচনা করিলে বিষয়টা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

সুসভ্য ইংরেজ রাজত্বে জন-সংখ্যা-নিরূপণের ব্যবস্থা অতি অল্পদিন পূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছে। 'সেন্সাস রিপোর্ট' বা লোক-সংখ্যা-নিরূপক বিবরণী হইতে বুঝিতে পারি—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে সৰ্ব্বপ্রথম লোক-গণনা আরম্ভ হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে লোক-গণনা-পদ্ধতি প্রবর্তিত থাকিলেও ইংরেজ-রাজত্বে ইহার পূর্বে এ প্রথা প্রবর্তনার কোনরূপ উল্লেখ গ্রন্থপত্রে দৃষ্ট না। বলা বাহুল্য, প্রথম গণনা সময়ে দেশীয় নৃপতিগণের শাসিত রাজ্যসমূহ গণনার মধ্যে আসে না। গণনা-পদ্ধতিও তখন অসম্পূর্ণ ছিল, ব্যবস্থা-বন্দোবস্তও এত ব্যাপক ছিল না। এমন কি, দূরদর্শী স্থান-সমূহ তখন দৃষ্টির অন্তরালেই রহিয়া যাইত। এইরূপে ভারতের সকল প্রদেশ গণনার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হইত।

তাই পরবর্তী লোক-গণনার তাহা সংশোধনের প্রয়াস দেখিতে পাই। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী দ্বিতীয়বার লোক-গণনার সময় পূর্ববারের অনেক ত্রুটি-বিচ্ছাদিত নিরাকৃত হয়। কিন্তু সে সময়ও কান্দীর, বেলুচিস্থান ও দূরবর্তী অপর্যাপ্ত অনেক জনপদ বাদ পড়িয়া যায়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৬এ ফেব্রুয়ারী তারিখের লোক-গণনার বিশেষ বিস্তৃত আরোহনের আয়োজন হইয়াছিল। সে সময় বেলুচিস্থান, সীমান্ত-প্রদেশ-সমূহ, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি এবং দেশীয় নৃপতিগণের শাসিত রাজ্য-সমূহ গণনার অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই হইতে এই নিয়মে গণনা-পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষে পাঁচ বার লোক-গণনা হইয়াছে। নিম্নে তাহা প্রকটিত হইল ; যথা,—

প্রথমবার লোক-গণনা—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২১এ ফেব্রুয়ারী।

দ্বিতীয়বার লোক-গণনা—১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী।

তৃতীয়বার লোক-গণনা—১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৬এ ফেব্রুয়ারী।

চতুর্থ বার লোক-গণনা—১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ।

পঞ্চমবার লোক-গণনা—১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ।

এই সকল লোক-গণনার ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা নিম্নরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে,—

বৎসর	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
১৮৭২ খৃষ্টাব্দ	১০,৬০,৫৫,৫৪৫	+ ১০,০১,০৬,৮১৫	= ২০,৬১,৬২,৩৬০
১৮৮১ খৃষ্টাব্দ	১২,৯৯,৪৯,২৯০	+ ১২,৩৯,১৭,০৪০	= ২৫,৩৮,৬৬,৩৩০
১৮৯১ খৃষ্টাব্দ	১৪,৬৭,৬৯,৬২৯	+ ১৪,০৫,৪৫,০৪২	= ২৮,৭৩,১৪,৬৭১
১৯০১ খৃষ্টাব্দ	১৪,৯৯,৫১,৮২৪	+ ১৪,৪৪,০৯,২৩২	= ২৯,৪৩,৬১,০৫৬
১৯১১ খৃষ্টাব্দ	১৬,১৩,৩৮,৯৩৫	+ ১৫,৩৮,১৭,৪৬১	= ৩১,৫১,৫৬,৩৯৬

ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ জাতি বসতি করে, এবং তাহাদের কোন্ জাতির সংখ্যা-পরিমাণ কত, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনার তাহা এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে ; যথা,—

জাতি	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
১। হিন্দু ..	১০,৩৫,৮১,১৬৪	+ ৮৮,২০,০৬৮	= ১১,২৪,০১,২৩২
২। মুসলমান ..	৪৪,৬১,৩৭১	+ ৩৭,৫০,৬১৩	= ৮২,১১,৯৮৪
৩। খৃষ্টান ..	৪,৬৪,৮৮৮	+ ৩,৬১,৪০২	= ৮,২৬,২৮৯
৪। বৌদ্ধ ..	৩,৫৫,৮৩২	+ ৩,৫৩,৩৯১	= ৭,০৯,২২৩
৫। জৈন ..	১,৯৪,৭৪১	+ ১,৭৪,৪৩৭	= ৩,৬৯,১৭৮
৬। শিখ ..	১,৩২,৮০২	+ ৭১,৩৪০	= ২,০৪,১৩৩
৭। ইহুদী ..	৯,৩৪০	+ ৮,৬৭৮	= ১৭,০১৮
৮। জৈন ও ব্রাহ্মণ ..	৪৪,৩৬৯	+ ৪২,১২৯	= ৮৬,৪৯৮
৯। ন্যানিমিত্তিক ..	৬১,৮৭৩	+ ৩৯,৮৯০	= ১,০১,৭৬৩
১০। অন্যান্য জাতি..	২৪,৯২৪	+ ১৭,৯১৬	= ৪২,৮৪০

এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যে যেভাবে এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গণনা-প্রণালী পরিচালিত

হয়, তাহা কম কৃতিত্বের নিদর্শন নহে । সমগ্র ভারতবর্ষ চৌদটি প্রদেশ বা বিভাগে এবং সতেরটি ষ্টেটে বা দেশীয় নৃপতিগণের শাসিত রাজ্যে বিভক্ত হয় । ভারতবর্ষের সেই চৌদটি বিভাগ—আসাম, বেলুচিস্তান, বঙ্গদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কর্ণাট, মধ্যপ্রদেশ (সেন্ট্রাল প্রভিন্স), আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, বিহার ও উড়িষ্যা, ত্রক্ষদেশ, পঞ্জাব, যুক্তরাজ্য (ইউনাইটেড প্রভিন্স), উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আজমীড় মাদোয়ার । দেশীয় নৃপতিগণের রাজ্য-সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় না । ইংরেজ-শাসিত এই চৌদটি বিভাগে ২১৫০টি সহর ও ৭২০,৩৪২টি গ্রাম নির্দিষ্ট হয় । বাহা হউক, এই চৌদটি বিভাগের এক একটা সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন ‘ব্লক’ বা চকে বিভক্ত হইয়া থাকে । ত্রিশটি হইতে পঞ্চাশটি পর্যন্ত পরিবার এক একটা চকের অন্তর্ভুক্ত হয় । এক এক জন ‘ইনিউমারেটর’ বা গণনাকারীর উপর এক এক চকের লোক-গণনার ভার হস্ত থাকে । চকের পরই ‘সার্কেল’ বা চক্র । দশটি হইতে পনেরটি চকে বা ব্লকে সংগঠিত এক একটা ‘সার্কেলের’ পরিদর্শনের ভার ‘সুপারভাইজার’ বা পরিদর্শকের প্রতি হস্ত থাকে । প্রায় পাঁচ শত পরিবার এইরূপ এক একটা ‘সার্কেলের’ অন্তর্ভুক্ত হয় । গণনাকারীর কার্যাবলীর জন্য পরিদর্শকগণ দায়ী থাকেন । নির্দিষ্ট-সংখ্যক সার্কেল বা চক্র লইয়া, দেশ-প্রচলিত শাসন-প্রথাযুযায়ী, এক একটা তহনীল বা তালুক প্রভৃতি সংগঠিত হয় । ‘সুপারিন্টেন্ডেন্ট’ নামধের কর্মচারী এক একটা তহনীলের বা তালুকের কার্য-পরিদর্শক । সর্বোপরি যে কর্মচারী নিযুক্ত হন—তিনি কমিশনার । এক এক বিভাগের বা প্রদেশের জন্য এইরূপ এক এক জন কমিশনার নিযুক্ত হইয়া থাকেন । ভারতবর্ষে অধুনা লোক-গণনার যেরূপ বিরাট আরোজনের আবশ্যক হয়, ইউরোপে সেরূপ আরোজনের আরোজন হয় না । ভারতীয় প্রথা হইতে ইউরোপীয় প্রথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । সেখানে প্রত্যেক পরিবারের প্রধান ব্যক্তি কর্তৃপক্ষগণের জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিয়া পাঠাইয়া থাকেন ।

বিসম্বাধিক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে যে এইরূপ লোক-গণনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, প্রাচীন গ্রন্থ-পত্রের আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে । মাসিডনাধিপতি মহাবীর আলেক-

জনসংখ্যা
নির্ধারণের
আবশ্যকতা।

জাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি সেলিউকাস নিকাটর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন । চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন । স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনীসকে দূতরূপে রাখিয়া যান । চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে অবস্থানকালে মেগাস্থিনীস ভারতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন । মেগাস্থিনীসের গ্রন্থ-পত্রে প্রকাশ,—সে সময়ে ভারতবর্ষে লোকগণনা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল । বিভিন্ন রাজকর্মচারী নিয়োগে অধুনা যেমন জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়, প্রাচীনকালে, খৃষ্ট-জন্মের তিন চারি শত বৎসর পূর্বে, সে প্রথা প্রচলিত ছিল । * চাণক্য-প্রণীত অর্থ-শাস্ত্রের আলোচনায়

* “The third body of superintendents consists of those who inquire when and how births and deaths occur, with the view not only of levying a tax but also in order that births and deaths among both high and low may not escape the cognizance of Government—Vide, Megasthenes, *Fragments*.”

মেগাস্থিনীসের উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। রাজ্য-মধ্যে কোথায় কোন্ জনপদ আছে, কোন্ জনপদে কি প্রকৃতির কত লোক বসতি করে, কোন্ প্রদেশের ঐশ্বর্য্য-সম্পৎ কিরূপ,— শাসন-শৃঙ্খলার সৌকর্য্য-সাধনে এ সকল বিষয় অবশ্য জ্ঞাতব্য। চাণক্যের জ্ঞান অসাধারণ শক্তিশালী সর্কশাস্ত্রবিদের দৃষ্টিতে এরূপ আবশ্যকীয় বিষয় উপেক্ষিত হইতে পারে না। তাই তিনি তাঁহার অর্থ-শাস্ত্রে লোক-গণনার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধুনা-প্রচলিত পদ্ধতির সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য না থাকিলেও, উহা যে সভ্য-সমুদয় রাজ্যের আদর্শ-প্রণালী, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

আধুনিক লোক-গণনা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগে সমাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত প্রাচীনকালে লোক-সংখ্যা-নিরূপণ অল্প একটা স্বতন্ত্র স্থায়ী রাজকীয় বিভাগ নির্দিষ্ট ছিল। কেবল জনসংখ্যা-নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব-সংগ্রহ, ^{প্রাচীন} ^{গণনা-পদ্ধতি।} হিসাব-পরিদর্শন, ভূমি-পরিমাণ-নির্ধারণ প্রভৃতি কার্যের ভারও এই বিভাগের কর্মচারীর উপর অল্প থাকিত। বিভাগীয় প্রধান কর্মচারী ‘সমাহর্ত্তা’ অভিধানে অভিহিত হইতেন। আধুনিক ‘কলেক্টর-জেনারেল’ উপাধির সহিত ঐ উপাধি সাদৃশ্য-সম্পন্ন। তাঁহাদের নির্দিষ্ট কার্যাবলীর মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। রাজ্যের এক নির্দিষ্ট অংশ বা বিভাগ তাঁহার কর্তৃত্বাধীন ছিল। সমাহর্ত্তার অধীনস্থ প্রদেশ চারি ভাগে বিভক্ত হইত; এক এক ভাগের অল্প এক এক জন কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। এই সকল বিভাগের উপর যিনি কর্তৃত্ব করিতেন, সেই কর্মচারী ‘স্থানিক’ সংজ্ঞার অভিহিত ছিলেন। নির্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি গ্রামের সমাবেশে ‘স্থানিক’-গণের তত্ত্বাবধানে এক একটা জেলা সংগঠিত হইত। এক এক জন স্থানিকের অধীনে আবার ‘গোপ’ নামধের কর্মচারী ছিলেন। এক একটা জেলাকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে বিভক্ত করিয়া, এক এক জন গোপকে দশটি বা পনেরটি নির্দিষ্ট গ্রামের তত্ত্বাবধান-ভার প্রদান করা হইত। গোপদিগের কার্যাবলী স্থানিকগণ পরিদর্শন করিতেন; আবার স্থানিকগণের কার্য-পরিদর্শনের ভার সমাহর্ত্তগণের উপর অল্প ছিল।* এ সম্বন্ধে অর্থ-শাস্ত্রের উক্তি; বলা,—

“সমাহর্ত্তা চতুর্থা জনপদঃ বিভজ্য জ্যেষ্ঠ-মধ্যম-কনিষ্ঠবিভাগেন গ্রামাঙ্গং পরিহারক-মাস্বধীরং ধান্তপশুহিরণ্যকুপ্যবিষ্টিকরপ্রতিকরমিদমেতাবদিত্তি নিবন্ধয়েৎ। তৎ-প্রদিত্তঃ পঞ্চগ্রামীং দশগ্রামীং বা গোপশ্চিস্তয়েৎ। এবং চ জনপদচতুর্ভাগং স্থানিকঃ চিস্তয়েৎ। গোপস্থানিকস্থানেষু প্রদেষ্টারঃ কার্য্যকরণং বলিপ্রগ্রহং চ কুর্য্যুঃ।”

এতাদিক ব্যবস্থাবন্দোবস্ত সঙ্গেও সকল কার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ হয় কিনা, তাহা দেখিবার অল্প ‘ইনস্পেক্টর’ বা ‘প্রদেষ্টা’ নিযুক্ত ছিলেন। স্থানিক ও গোপগণের কার্য্য পরিদর্শনই এই সকল কর্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ব্যবস্থাও বর্থেই বলিয়া নদে হইত না। ‘প্রদেষ্টা’-গণ ব্যতীত অপর এক শ্রেণীর কর্মচারীর উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

* এই অংশে বর্ণিত ‘সমাহর্ত্তা’ সম্ভব কর্মচারীকে আমরা ‘ডিভিশনাল কমিশনার’ এর সহিত তুলনা করিতে পারি। ডিষ্ট্রিক্ট মজিষ্ট্রেটের সহিত ‘স্থানিকের’ এবং সবডিভিশনাল কমিসারের সহিত ‘গোপ’ সম্ভব কর্মচারীর তুলনা করা যায়।

তাহারা ‘শুশ্রূষা’ আখ্যায় অভিহিত হইতেন। তাহারা রাজ্যমধ্যে বিভিন্ন বেশ বিচরণ করিয়া সমাহর্তা সমীপে গোপনে সংবাদ সরবরাহ করিতেন। * এইরূপে বিভিন্ন দারিদ্র-পূর্ণ রাজকর্মচারীর নিয়োগে বিবিধ জাতব্য বিষয়ের সংবাদ-সংগ্রহের ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। শুশ্রূষাগণের কার্যের বিষয়ে অর্থ-শাস্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে ; বথা,—

“সমাহর্তৃপ্রদীষ্টাঃ গৃহপতিকব্যঞ্জনানি যেষু গ্রামেষু প্রনিহিতান্তেষাং গ্রামাণাং ক্ষেত্র-
গৃহকুলাগ্রাং বিদ্যাঃ। মানসজ্ঞাতাত্যাং ক্ষেত্রাণি, ভোগপরিহারাত্যাং গৃহাণি, বর্ণকর্ম্মাভ্যাং
কুলাণি চ। তেষাং জজ্ঞ্যাগ্রং আরব্যায়ৌ চ বিদ্যাঃ।...প্রস্থিতাগতানাং চ প্রবাসাবাস-
কারণমনর্থ্যানাং চ জীপুরুষাণাং চারপ্রচারং চ বিদ্যাঃ। এবং সমাহর্তৃপ্রদীষ্টান্তাপ-
সবজ্ঞানাং কর্ম্মকগোরক্ষকবৈদেহকারণামধ্যক্ষাণাং চ শৌচাশৌচং বিদ্যাঃ।...পুরাণ-
চৌরবজ্ঞানাচ্চাসিনশৈলচৈতন্যচতুষ্পাশুশূদ্রাদানানদীনানীপানতীর্থারতনাপ্রমারণ্যশৈল-
বনগহনেযুক্তনামিত্রপ্রবীরপুরুষাণাং চ প্রবেশনস্থানগমনপ্রয়োজনানুপলভেরণ।”

অর্থাৎ,—জমীজমার জরীপ এবং রাজস্ব আদায় ভিন্ন শুশ্রূষাগণের আরও কতকগুলি কার্য নির্দিষ্ট ছিল। কোন্ গ্রামে কত লোক বাস করে, প্রতি গ্রামে কতগুলি গৃহস্থের অবস্থিতি এবং কত পরিবারের বাস, প্রতি গৃহস্থের জাতি ও পেশা, কোন্ পরিবার রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকে এবং কোন্ পরিবার রাজস্ব প্রদান করে না, প্রভৃতি নির্ধারণ শুশ্রূষাগণের কার্য-মধ্যে গণ্য। এতদ্ব্যতীত প্রতি গৃহস্থের আর-ব্যয়-নিরূপণ এবং তাহার গো-মেবাদির সংখ্যা-নির্দেশ প্রভৃতিও ইহাদের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। এতদ্ব্যতীত, শুশ্রূষাগণকে আরও কতকগুলি গোপনীয় কার্য সম্পাদন করিতে হইত। বৈদেশিকগণের আগমনের ও নির্গমনের কারণ অনুসন্ধান, লোক জনের গতয়াত পর্যবেক্ষণ, কুচরিত্র বা সন্দেহ-যুক্ত জী-পুরুষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি কার্য শুশ্রূষাগণকে গৃহস্থের বেশ ধারণ করিয়া (গৃহপতিকব্যঞ্জনঃ) সম্পন্ন করিতে হইত। সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া তাহারা কৃষকের, মেষপালকের, স্তম্ভাগরগণের এবং রাজকীয় পরিদর্শকগণের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। চোরের বেশ ধারণ করিয়া শুশ্রূষাগণ তাহাদের অশ্রুচরবর্গসহ তীর্থস্থান-সমূহে, স্থানালয়ে, জনশূন্য স্থানে, পর্বতে এবং পুরাতন ভগ্ন স্থানসমূহে চোর, শত্রু এবং অসচ্চরিত্র ব্যক্তির চাল-চলন পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন। * গোপগণের কর্তব্য বিষয়ে অর্থশাস্ত্রে নিম্নরূপ বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। কোটিল্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় কণ্ডে লিখিত আছে,—

“তেষু চৈতাবচ্চাতুর্কর্ণাণ্যেতাবচ্চঃ কর্ম্মকগোরক্ষকবৈদেহকাকর্ম্মকরদাসাশ্চৈতাবচ্চ-
বিপদচতুষ্পদমিদং চৈব হিরণ্যবিষ্টিগুহকদণ্ডসমুদ্ভিষ্টতীতি। গৃহাণাং চ করদাকরদস-
খ্যানেন।”...“কুলাণাং চ জীপুরুষাণাং বালবৃদ্ধকর্ম্মচরিত্রাজীবব্যয়পরিমাণং বিদ্যাৎ।”

অর্থাৎ,—গ্রাম্য কর্ম্মচারী গোপগণ প্রত্যেক গ্রামের লোক-সংখ্যা গণনা করিয়া, তদ্ব্যয় হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির লোক-সংখ্যা নিরূপণ করিবেন। প্রতি গ্রামে কত ব্রাহ্মণ, কত ক্ষত্রিয়, কত বৈশ্য ও কত শূদ্র বাস করেন, তাহা নির্ধারণ

* অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত এই শুশ্রূষাগণের কার্য এক হিসাবে অধুনা-প্রবর্তিত ‘সি-আই-ডি’ বিভাগের কর্ম্মচারী-
দ্বিগের কার্যাবলীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

করিয়া প্রত্যেক গ্রামের কৃষিক্রীড়া, গোপালক, বৈদেহক (ব্যবসায়ী), কালকর্ষক (শিল্পী), দাস (ক্রীতদাস) প্রভৃতির সংখ্যা-পরিমাণ জাহারা লিপিবদ্ধ করিবেন । প্রত্যেক গ্রামের বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তর সংখ্যা নিরূপণ, প্রতি গ্রামের হিরণ্য (স্বর্ণ), বিষ্টি (বেগার), শুক ও দণ্ড প্রভৃতির পরিমাণ নির্ধারণ প্রভৃতিও গোপগণের কর্তব্য মধ্যে গণ্য । এতদ্ব্যতীত, গ্রামের কোন্ পরিবার রাজসরকারে করপ্রদান করিয়া থাকেন এবং কোন্ পরিবার কর প্রদান করেন না,—ভিন্নরূপণও গোপগণের কার্য । প্রতি গ্রামের বালক বৃদ্ধ যুবা ক্রী পুরুষ প্রভৃতির সংখ্যা নির্ণয় করিয়া তাহাদের চরিত্র, আজীব (আর), ব্যয়, পেশা (কর্ম) প্রভৃতি নির্ধারণ করিবার ভারও গোপগণের উপর স্তৃত ছিল ।

প্রাদেশিক লোক-গণনা-পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করিয়া, অতঃপর অর্থশাস্ত্রকার নগরসমূহের ও রাজধানীর লোক-গণনা-পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । এ ব্যবস্থার ‘নাগরক’ *

সহরাদির অভিধেয় কর্মচারী, প্রাদেশিক গণনার প্রধান কর্মচারী ‘সমাহর্তার’ স্থান অধিকার করিয়া আছেন । প্রদেশাদির লোক-সংখ্যা গণনার যেকোন স্থানিক, গোপ প্রভৃতি রাজকর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে ; সহর ও রাজধানীর লোকগণনারও ঐ সকল কর্মচারী নিয়োগের বিষয় অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । প্রাদেশিক গণনার গোপগণের দ্বার, নগরাদির লোকসংখ্যা-নিরূপণে গোপ-গণের উপর অবস্থানভেদে দশটি, পনেরটি এবং কোনও কোনও স্থলে চল্লিশটি পরিবারের পর্যন্ত জনসংখ্যা-নিরূপণের ভার অর্পিত হয় । প্রতি গ্রহস্থের জাতি, গোত্র, পরিচয়, পেশা প্রভৃতি নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আর-ব্যয়-পরিমাণ নিরূপণও গোপগণের কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত ।† নাগরকগণের কার্য-সমূহের জটিলতা ও গুরুত্ব নিরাস করে এক বিশিষ্ট বিধান সে সময়ে প্রবর্তিত ছিল । ধর্ম্মালয়ের বা আভিধিশালায় অধ্যক্ষদিগের উপর “নাগরকের” কোনও কোনও কার্য-সম্পাদনের ভার স্তৃত থাকিত । তন্মধ্যে প্রধান করেকটি এই—“ধর্ম্মাবস্থিঃ পাবতি-পথিকানাভেদ্যাসয়েয়ু । প্রস্থিতাগভৌ চ নিবেদয়েৎ । অজ্ঞাং রাজদোষং ভজেৎ । ক্ষেমরাজিষু জিগণৎ দত্তাৎ ।” ধর্ম্মালয়ে বা আভিধিশালায় কোনও অপরিচিত আগন্তুক ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, অধ্যক্ষদিগকে স্থানিকের নিকট তাহাদের আগমন ও নির্গমন বার্তা জ্ঞাপন করিতে হইত । পরিবারের প্রধান ব্যক্তির উপরও কোনও আগন্তকের আগমনের ও প্রস্থানের সংবাদ রাজকর্মচারীদিগের নিকট বিজ্ঞাপিত করিবার আদেশ ছিল । নগরের নিয়ম অনুসারে প্রতি ব্যবসায়ীকে, প্রতি শিল্পীকে এবং প্রতি চিকিৎসককে নাগরকের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইত । কেহ বাহ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে কি না, কেহ ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়াছে কি না প্রভৃতি

* নাগরকের কার্যাবলীর বিষয় আলোচনার মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয় । আধুনিক সহর-নগরের ‘পুলিশ কমিশনার’-দিগের সহিত নাগরকের তুলনা হইতে পারে । উভয়ের কর্তব্যের মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না ।

† অর্থ-শাস্ত্রের “নাগরকপ্রণিধি” প্রকরণে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় ; বখা,—“সমাহর্তৃব্রাহ্মণকো নগরং চিত্তয়েৎ । দশকুলীং গোপা বিশেষিকুলীং চচারিংশং কুলীং বা । স তত্ত্বাং ক্রী-পুরুষাণাং জাতিগো-নামকর্ম্মভিঃ জ্ঞাপ্যগ্রমার্যো চ বিজ্ঞাৎ । এবং রূপচতুর্ভাগং স্থাপিকচিহ্নয়েৎ ।”

সংবাদ প্রদান করিবার ভার তাঁহাদিগের উপর হস্ত ছিল। কি ধর্ম্মালয়ের বা অতিথি-শালায় অধ্যক্ষ, কি পরিবারের প্রধান ব্যক্তি, কি চিকিৎসক, কি ব্যবসায়ী, কি শিল্পী—যদি কেহ ঐ সকল সংবাদ-সরবরাহে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইত। নগরের ও রাজধানীর শাসন-সংরক্ষণের সুব্যবহার জন্ত এইরূপ বিধি বিহিত ছিল।

জনসংখ্যা-নির্ধারণের ভার যে সকল কর্ম্মচারীর উপর হস্ত ছিল, জরিপাদি দ্বারা জমি-পরিমাণ নির্ধারণ তাঁহাদিগকেই করিতে হইত। কোন্ গ্রামে কি পরিমাণ জমি আছে, জরিপাদি দ্বারা তাহা নিরূপণ করিয়া কর্ম্মচারিগণ প্রতি গ্রামের নীমানা জরিপাদির বিষয়। নির্ধারণ করিয়া দিতেন। উত্তম-মধ্যম-অধম অনুসারে তাঁহারা প্রতি গ্রামের জমি সকল চিহ্নিত করিতেন। কোন্ জমী কোন্ ফসলের উপযোগী, কোন্ জমী উর্ব্বর ও কোন্ জমী অল্পর্ব্বর, কোন্ জমী উচ্চ, কোন্ জমী নিম্ন, জলকর, বনকর প্রভৃতি নির্ধারণ করা তাঁহাদেরই কর্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। উদ্ভান, বনভূমি, ধর্ম্মমন্দির, তীর্থস্থান, অতিথিশালা, অনাথ আশ্রম, সমাধিস্থল, চারণভূমি, রাজপথ প্রভৃতির সংখ্যা নির্দেশ করিয়া তৎসংক্রান্ত হিসাব-সংরক্ষণ প্রভৃতিও ঐ সকল কর্ম্মচারীর কর্তব্য বলিয়া অবধারিত হইত। যাহারা পরিদর্শক (ইনস্পেক্টর) ও গুপ্তচর এবং ওতারসিয়ার অভিধানে অভিহিত হইতেন, তাঁহারা এই বিভাগের জমিজমা, গৃহ ও পরিবার সংক্রান্ত হিসাব-পত্র পর্যালোচনা করিতেন মাত্র। এ বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের উক্তি,—

“সোমাবরোধেন গ্রামাণ্যং কৃষ্টাকৃষ্টস্থলকেদারারামবণ্ডবাটবনবাস্ত-চৈত্যাদেবগৃহ-

সেতুবন্ধাশ্রয়ানসত্রপ্রাপুণ্যস্থানবিবীতপথিসংখ্যানেন ক্ষেত্রাণ্যং। তেন সীমান্

ক্ষেত্রাণ্যং চ মর্যাদারণ্যপথিপ্রমাণ সম্প্রদান বিক্রমাজুগ্রহপরিহারনিবন্ধান্ কারয়েৎ।”

প্রাচীন ভারতে, খৃষ্ট-জন্মের প্রায় তিন শতাব্দিক বৎসর পূর্বে এইরূপে গণনা-ক্রিয়া সমাহিত হইত। রাজ্যের সকল সংবাদ পরিষ্কার হওয়া রাজপুরুষদিগের রাজ্য-শাসন-বিজ্ঞানে অশেষ উপকারী। অর্থ-বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলেও উহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। অধুনা যেমন সন্দেহ-বৃত্ত ব্যক্তির গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা আছে, আর তাহা যেমন রাজ্যরক্ষার পক্ষে এক বিশিষ্ট নীতি বলিয়া উক্ত হয়; প্রাচীন-কালের ঐরূপ ব্যবস্থাও রাজ্যরক্ষার পক্ষে অল্প সহায় ছিল না। রাজচক্রবর্তী চন্দ্রগুপ্তের বিস্তৃত বিশাল রাজ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, তৎকালে এইরূপ বিধি প্রবর্তনার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। তখন চারিদিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের সমাবেশ ছিল; বৈদেশিক গুপ্তচরের গমনাগমনের সম্ভাবনাও অল্প ছিল না। তাই বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণকল্পে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ ব্যবস্থার প্রবর্তনা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। উত্তম-মধ্যম-অধম অনুসারে গ্রাম-সমূহের বিভাগে এক দিকে যেমন সৈন্ত-সংগ্রহের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল; অধিবাসিবৃন্দের আর-ব্যয়-নির্ধারণে অল্পদিকে কর-বৃদ্ধির ও কর-সংগ্রহের উপায় তেমননি স্মরণ হইয়া আসিয়াছিল। কলতঃ, এই সকল বিধি-ব্যবস্থা যে আদর্শ-রাজ্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন, ভবিষ্যে সন্দেহ নাই।

প্রাচীনকালে ও আধুনিককালে ভারতবর্ষে যেরূপভাবে লোক-গণনা কার্য্য নির্বাহ হইত, পূর্বেকৃত পৃষ্ঠাসমূহে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। পৃথিবীর অপরাপর পৃথিবীর • দেশে ঐ প্রথা কিরূপভাবে প্রচলিত ছিল বা আছে, এক্ষেত্রে তাহার বিভিন্ন দেশের আলোচনা করিতেছি। বাইবেলের অন্তর্গত ‘ওল্ড টেস্টামেন্টের’ গণনা-পদ্ধতি। ‘এক্সোডাস’ অংশে লোক-গণনার একটু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেখানে সৈন্ত-সংখ্যা-নিরূপণ-কল্পে লোক-সংখ্যা-নির্ধারণে ইজরেল জাতির বিবিধ প্রশাসনের বিষয় উল্লিখিত আছে। তাঁহাদের প্রতি সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা নির্দিষ্ট করিবার জন্ত ‘ইনিউমারেটর’ বা গণনাকারী নিযুক্ত হইয়াছিল; আর কেবলমাত্র বিশ বৎসর হইতে তদুর্দ্ধ বয়স্করূপে ব্যক্তি গণনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে ‘লিভাইট’ সম্প্রদায় স্বতন্ত্ররূপে গণনার আমলে আসিয়াছিলেন। লিভাইটগণের মধ্যে বাঁহারা ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক ছিলেন, তাঁহাদিগকে গণনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। ইহার পর রাজা সলোমন জনসংখ্যা-নির্ধারণের প্রশাসন পান। ধর্ম্মাধিকরণের পুরোহিত নিয়োগ উপলক্ষে তাঁহার এই ব্যবস্থার পরিচয় পাই। অতঃপর জোরাব একবার জনসংখ্যা-নিরূপণের চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে তাঁহার ততটা মত ছিল না। কিন্তু ডেভিডের আদেশে তাঁহাকে লোক-গণনার আবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তখনও ইজরেল জাতির সৈনিক পুরুষগণ মাত্র গণনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। ইজরেল জাতি যে সময়ে বন্দী অবস্থায় বাবিলনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে সময়েও তাঁহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা নির্ধারণের ব্যবস্থা হয়। বন্ধনযুক্ত হইয়া, জেরুজিলামে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহারা ঐ তালিকা প্রকাশ করেন। পারস্ত-দেশে লোক-গণনা প্রথার প্রবর্তনার বিবিধ পরিচয় প্রাপ্ত হই। বিভিন্ন বিভাগের ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন নির্ধারণে করবুদ্ধি করা—উহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। চীনদেশে প্রাচীনকালে এ পদ্ধতি প্রবর্তনার পরিচয় পাওয়া যায়। পারস্তদেশে যেরূপ করবুদ্ধির জন্ত ঐশ্বর্য্য-সম্পদের হিসাব লওয়া হইত; চীনদেশেও সেইরূপ তাত্‌কালিক সৈন্তশক্তি নির্ধারণ-কল্পে এবং প্রাদেশিক কর-সংগ্রহের জন্ত ঐ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। মিশর-রাজ আমাসিসের রাজত্বকালে প্রতি ব্যক্তির পেশা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। অসহুপায়ে জীবিকানির্ব্বাহের পথ রুদ্ধ করাই—উহার উদ্দেশ্য। গ্রীক-ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের গ্রন্থপত্রে প্রকাশ,—প্রসিদ্ধ রাজনীতিক সোলন কর্তৃক এথেন্সে প্রথম গণনা-পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। তবে রোমই যে এই গণনা-প্রথা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। রোমে ‘সেন্সর’ অভিধানে এক শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। প্রথমতঃ দেশের জনসংখ্যা নির্ধারণ করা তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। দেশের লোক-সংখ্যা গণনা করিয়া তাঁহারা প্রথমে তাহাদের ঐশ্বর্য্য-সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করিতেন। রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং দেশবাসীর চরিত্রোন্নতির ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের ভার তাঁহাদেরই উপর হস্ত ছিল। ‘ভিলা পাবলিকা’ নামক অট্টালিকার ‘ক্যাম্পাস মার্টিয়াস’ অংশে ‘সেন্সর’-দিগের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ‘সেন্সর’ গ্রহণ বা লোক-সংখ্যা নিরূপণ জন্ত তাঁহাদিগের নাম ‘সেন্সর’ হয়। মার্টিয়াস টুলিয়াসের রাজত্বকালে

সোম-সাম্রাজ্যের প্রথম 'সেন্সাস' গ্রহণ করা হয়। তাঁহার রাজত্বের অন্তঃপর প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ঐরূপ লোক-গণনার নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল। তখন, লোকগণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পরিবারের বিষয়-সম্পত্তি, গো-মেবাদির এবং ক্রীতদাস প্রভৃতির হিসাব লগুয়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে গ্রেট-ব্রিটেনে এই প্রথা প্রবর্তিত হয়। গ্রেট-ব্রিটেনে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম লোক-সংখ্যা-নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছিল। সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত প্রতি দশ বৎসর অন্তর গ্রেট-ব্রিটেনের লোক-সংখ্যা গণনা করা হইয়া থাকে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে আয়ারল্যান্ডের অধিবাসীর সংখ্যা-নিরূপণের প্রয়াস দেখি। কিন্তু তখন সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আয়ারল্যান্ডের লোক-গণনার আয়োজন হয়। সে সময়ও প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যায় না। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে পুনঃপুনঃ চেষ্টা চলিতে থাকে। তিন চারি বার ব্যর্থ-উদ্ভবের পর আয়ারল্যান্ডের কৃষিসম্পদের একটা নির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহার পর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে 'রেকর্ডারী' প্রথা প্রবর্তিত হয়। প্রতি গৃহস্থকে 'সেন্সাস' কার্যালয়ে যাইয়া ঐ সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া আসিতে হইত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে স্কটলণ্ডে ঐ নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৮৬১ ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই নিয়ম হয়,—'সেন্সাস' কর্মচারীগণ প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে তাহাদের জ্ঞাতব্য-বিষয়-সম্বলিত মুদ্রিত তালিকা রাখিয়া বাইবেন। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি ঐ তালিকা পূর্ণ করিয়া 'সেন্সাস' কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। এই পদ্ধতি আজি পর্যন্ত গ্রেট-ব্রিটেনে প্রবর্তিত আছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের পর ইংলণ্ডে কোন্ কোন্ তারিখে লোক-গণনা হইয়াছিল, তাহার একটু আভাস পাওয়া যায়। তাহাতে জানিতে পারি, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে, ২রা এপ্রিল রবিবার রাজিতে লোকগণনা কার্য সমাহিত হইয়াছিল। পরিবার প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে একটি করিয়া তালিকা রাখিয়া আসার ব্যবস্থা হয়। ঐ তালিকা পূর্ণ করিয়া গৃহস্থের প্রধান ব্যক্তি উহা সোমবার ফিরাইয়া দেন। তালিকার নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট ছিল;—পরিবারের প্রত্যেকের নাম, স্ত্রী বা পুরুষ, প্রত্যেকের বয়স, পদবী, পেশা বা ব্যবসায়, অবস্থাদির পরিচয়, গৃহের প্রধান ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ, ঐ দিন রাজিতে বাহার সেই গৃহে রাজিবাগন করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের জন্মস্থান প্রভৃতি। পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তি অন্ধ, কালা, বোবা, উন্মাদ বা নপুংসক আছে কি না; ৬ বৎসর হইতে ১৩ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাগণ স্কুলে বা গৃহশিক্ষকের নিকট বিভাগশিক্ষা করে কিনা প্রভৃতি বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের বিষয়ও তালিকার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। আজি কালি সকল সুসভ্য জাতিই জনসংখ্যা-নির্ধারণের পক্ষপাতী। তাই এ বিষয়ে সকলেরই প্রয়াস দেখিতে পাই। ফরাসী-রাজ্য ফ্রান্সে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর লোক-গণনা হয়। বেলজিয়মে ও অষ্ট্রিয়ার প্রতি তিন বৎসর অন্তর এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রতি দশ বৎসর অন্তর লোক-সংখ্যা নির্ধারণের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জনপদে লোক-সংখ্যা নির্ধারণের প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার অধুনা পৃথিবীর জনসংখ্যার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। বিগত কয়েক বৎসর পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের যে লোকসংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়,

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ১৬২ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বাস করে। সে বিবরণ এই,—

১। ইউরোপ	...	...	৪০০,০০০,০০০
২। এশিয়া	...	...	২০০,০০০,০০০
৩। আফ্রিকা	...	...	১৭০,০০০,০০০
৪। উত্তর আমেরিকা	...	...	১১০,০০০,০০০
৫। দক্ষিণ আমেরিকা	...	...	৩৫,০০০,০০০
৬। ওশেনিয়া	...	...	৮,০০০,০০০

পৃথিবীর প্রায় সকল মহাদেশেই ইংরেজ-রাজ্যের প্রভাব বিস্তৃত। সমগ্র ইংরেজাধিকৃত রাজ্য-সমূহে ৪৩৫,০০০,০০০ লোক বাস করে। ইংরেজাধিকৃত রাজ্য-সমূহের এবং ইংরেজের সহিত সন্ধিবদ্ধ কোনও কোনও মহাদেশের লোক-সংখ্যা নিম্নরূপ নির্দিষ্ট হয়; যথা,—

১। গ্রেটব্রিটেন যুক্তরাজ্য	...	...	৪৫,৪০৭,০৩৭
২। ভারতবর্ষ	...	...	৩১৫,০০০,০০০
৩। চীনদেশ	...	...	৪০০,০০০,০০০
৪। রুশিয়া	...	...	১৭৩,৫০০,০০০
৫। জাপান	...	...	৫০,০০০,০০০
৬। আমেরিকার যুক্তরাজ্য	...	...	৯২,০০০,০০০
৭। যুক্ত-রাজ্যের অতিরিক্ত লোকসংখ্যা	...	...	১০,০০০,০০০
৮। ইংরেজের অধীনস্থ রাজ্যসমূহ	...	...	১৫,০০০,০০০

২। ব্যবহার-বিধানে আদর্শ।

[ব্যবহার-বিধানে ধর্মই মূল,—শাস্ত্রোক্ত বিধান-পরম্পরা; শাস্ত্র-গ্রন্থে ব্যবহারের পরিচয়,—অর্থশাস্ত্রে ব্যবহার বিধি;—ব্যবহার প্রকার,—বিবাদ-বিভাগ,—অষ্টাদশ বিবাদ;—বিচারালয় সংগঠন;—বিবিধ বিচারালয়—ধর্মহীন ও কণ্টকশোধন,—বিবিধ বিচারালয়ে বিচার্য বিভিন্ন বিবাদ;—পক্ষায়ত্তি প্রথা;—ব্যবহার-প্রণালী;—ধর্মশাস্ত্রোক্ত প্রণালীর সহিত সাদৃশ্য;—বিচার-বিষয়ে অবলম্বনীয় প্রণালী;—বাদী, প্রতিবাদী, পরোক্ত দোষ প্রভৃতি;—পক্ষবন্ধ প্রভৃতি জরিমানার বিষয়;—সাক্ষী প্রভৃতির ব্যবস্থা;—চুক্তিবিষয়ক ব্যবস্থা;—সম্মুখ-সম্মুখান-প্রকরণে অবলম্বনীয় বিধি;—নজরুত প্রভৃতি চুক্তির পর্যায়;—ঋণদান, বিক্রয়, নিক্ষেপ, উপনিধি প্রভৃতি চুক্তির পর্যায়;—নিলাম ও ক্রমাধিকার বিষয়ক ব্যবস্থা,—ঋণ-সংক্রান্ত বিধান;—গচ্ছিত সম্পর্কীয় ব্যবহার;—আধি, আদেশ, বিক্রয়, দান, দায় প্রভৃতি সংক্রান্ত ব্যবহার-প্রণালী;—যৌথ ব্যবহার বিষয়;—বিবিধ বিবাদ প্রতিকার;—ঋতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যবহার প্রণালীর উল্লেখে তাহার বিশেষ পরিচয়।]

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—“ঋতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্ত চ প্রিয়মাজ্ঞনঃ। সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্মমূলমিদং স্বতম্॥” অর্থাৎ,—ঋতি, স্মৃতি, পূর্ব-মহাজনগণের অমুষ্ঠিত আচার-পরম্পরা, আত্মপ্রীতি এবং সম্যক-সঙ্কল্প-জনিত শাস্ত্রানুমোদিত কামনা,—ইহাই ধর্মের বা ব্যবহার-জ্ঞানের মূল। ঋতি, স্মৃতি প্রভৃতি সম্যক্জ্ঞানের নিদর্শন। সম্যক্ জ্ঞান—ধর্মের মূল—ব্যবহারেরও মূল। সুতরাং ধর্মেরও বাহ্য আদি, ব্যবহারেরও তাহাই আদি। ধর্মের প্রমাণই ব্যবহারের

ব্যবহার-বিধানে
ধর্মই মূল।

প্রমাণ। অর্থাৎ-হিন্দুগণ চিরদিনই ধর্মপ্রাণ। ধর্মের প্রতিষ্ঠার চিরদিনই তাঁহারা বদ্ধ-পরিকর। ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্তই তাঁহাদের সর্ব-শাস্ত্রের পদ্ধিকল্পনা। তাই অতি প্রাচীন কাল হইতে ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেই ব্যবহার-শাস্ত্রের বীজ নিহিত দেখিতে পাই,—তাই হিন্দুর ব্যবহার-বিধির পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে ধর্ম-শাস্ত্রের আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। শাস্ত্রকার (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, প্রথম অধ্যায়, ৩—৫ শ্লোক) বলিয়াছেন,—

“পুরাণ-ভ্যাম নীমাংসা-ধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিজ্ঞানাং ধর্মস্ত চ চতুর্দশ ॥

মম্বত্রিবিম্বুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥

পরশরবাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ। শাতাতপ বসিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্র প্রবোজকাঃ ॥”

অর্থাৎ,—পুরাণ, ভ্যাম, নীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃৎ, জ্যোতিষ, ছন্দ, এই ষড়বেদাঙ্গ) এবং চারি বেদ—এই চৌদ্দটি পুরুষার্থ-সাধন জ্ঞান ও ধর্মপ্রবৃত্তির কারণ। মম্ব, অত্রি, বিম্বু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরশর, বাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ এবং বসিষ্ঠ,—ইহারা ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।’ প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-বিধির বিষয় সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এই সকল ধর্ম-শাস্ত্রের আলোড়ন আবশ্যক হইয়া পড়ে। পূর্বে বলিয়াছি,—ধর্ম ও ব্যবহার অভিন্ন; ধর্মের বাহা মূল,—ব্যবহারেরও তাহাই মূল। আমাদের, শাস্ত্রদর্শী হিন্দুগণের বিশ্বাস—পরব্রহ্ম সর্ব-জ্ঞানধার। তিনি সর্ববিধ জ্ঞানের সর্ববিধ ধর্মের এবং সর্ববিধ ব্যবহারের মূল হেতু। হিন্দু তাই—তনুখ-নিঃসৃত ধর্মকেই সর্ববিষয়ে প্রধান ও আদি বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ব্যবহার-শাস্ত্র তাঁহারই উদ্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ব্যবহার-শাস্ত্রের পরিচয় পাই। বেদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ পর্যন্ত সকল শাস্ত্র-গ্রন্থেই ব্যবহার-শাস্ত্রের বিষয় কিছু-

না-কিছু উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্র-গ্রন্থাদিকে হিন্দুগণ ভগবানের মুখ-
শাস্ত্র-গ্রন্থে পরিচয়। নিঃসৃত বলিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকেন। ব্যবহার-শাস্ত্র

সম্বন্ধেও তাঁহাদের সেই একই ধারণা। বিশ্ব-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট-

প্রাণিসমূহকে বিশেষ বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ করিবার আবশ্যক হয়। তাই শাস্ত্রাদির মধ্য দিয়া নানারূপ বিধি-ব্যবহার পরিকল্পনা। অধর্মজনিত পীড়া চিরকালই লোকে ভোগ করিয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তি সর্বকালেই ধর্মাদিকরণে অধর্মকৃত ক্রতির প্রতিকার পাইবার অধিকারী। ধর্মাদিকরণ যে নিয়ম অনুসারে ক্রতি-পূরণের ব্যবস্থা করিতেন, সেই সমুদায় নিয়মের সমষ্টি লইয়াই ব্যবহার-শাস্ত্র। অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাই, ব্যবহার-বিধানে রাজার বা সম্রাটের প্রধাত্র অতি অল্পই ছিল। ব্যবহার-শাস্ত্র ভগবানের উদ্ভাবিত বলিয়া স্বয়ং রাজাও তাহা মান্য করিতে বাধ্য হইতেন। এ হিসাবে প্রজা-সাধারণের অপরাধের বিচার-ব্যবস্থার আদিকালে রাজার কোনই কর্তৃত্ব ছিল না বলিয়া মনে হয়। স্বরস্বর মুখনিঃসৃত বিধিব্যবস্থার রাজা পরিচালিত হইতেন; তাই এক হিসাবে রাজাও সে ব্যবহারের অধীন ছিলেন। হিন্দুগণ সম্রাটকে ভগবানের প্রতিকল্প বলিয়া মান্য করিয়া

থাকেন। তাই পরবর্ত্তিকালে রাজবিধি-সমূহ শাস্ত্রবর্ণিত ব্যবহার-বিধির ভায় ভক্তি-সহকারে মান্ত হইতে থাকে। স্মরণাতীতকাল হইতে যে সকল আচার-ব্যবহার বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল, পরিশেষে তাহাও ক্রমশঃ ব্যবহার-বিধির অন্তর্ভুক্ত হয়। এইরূপে প্রাচীন-কালে হিন্দুদিগের যে ব্যবহার-বিধি প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত পরবর্ত্তিকালে দেশ-বিশেষের, জাতি-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার প্রভৃতি মিশিয়া যায়। আর সেই হইতে পূর্ব্ব-মহাজনগণে অহুষ্ঠিত স্মরণাতীতকাল-প্রচলিত রীতি-নীতি-সমূহ ব্যবহার-পদবাচ্য হয়।

প্রাচীন-ভারতের ব্যবহার-শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, পূর্ণ-পরিণতির কালেও ব্যবহার-শাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র হইতে পৃথক হয় নাই। প্রাচীন রোম প্রভৃতির ইতিহাস আলোচনার প্রতিপন্ন হয়, সেই সকল দেশে পরবর্ত্তিকালে ব্যবহার-শাস্ত্র

অর্থ-শাস্ত্রে
ব্যবহার-বিধি।

ক্রমশঃ ধর্ম হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, এবং স্বতন্ত্র-ভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ধর্মপ্রাণ হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রকে সকল কালেই

ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। তাই আমাদের ব্যবহার-শাস্ত্র ধর্ম-শাস্ত্রের একটি অঙ্গ এবং ধর্ম-শাস্ত্রের অঙ্গরূপেই উহা পরিপুষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। আধুনিক কালের ভায় ব্যবহার-প্রণালীর বিস্তারিত বিধির পরিচয় অতি প্রাচীনকালের বেদাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন সংহিতাদিতেও তাহার বিশেষ কোনও নিদর্শন নাই। তবে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায় ঐরূপ বিস্তৃত ব্যবহার-প্রণালীর কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। পূর্ব্ব বলিয়াছি, সম্যক জ্ঞান—ধর্মের বা ব্যবহারের মূল। জ্ঞান-প্রভাবে বাহ্যে গ্রাসমত বা ধর্ম-সম্মত বিবেচিত, তাহাই ব্যবহার মধ্যে পরিগণিত। সংহিতা-পুরাণাদি ভিন্ন পরবর্ত্তী অপর কোনও গ্রন্থে ব্যবহার-শাস্ত্রের কোনও নিদর্শন বর্ত্তমান আছে কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কোটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে ব্যবহার-বিধির বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, দেখিতে পাই। অনেকে বলেন,—‘কোটিল্য আপনার অর্থশাস্ত্রে কতকগুলি লৌকিক ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। সে সমুদায় ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।’ কিন্তু নিরপেক্ষ-ভাবে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র আলোচনা করিলে তাঁহাদের ঐ বুক্তি আদৌ ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। ভ্রাতৃত্ব নিরূপণ করিয়া সহজ-বুদ্ধিতে বিচার করিতে হইলে যেসকল পদ্ধতি অবলম্বন আবশ্যক, প্রাচীন ঋষিগণ তাহাই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সহজবুদ্ধিবিশিষ্ট কোনও পদ্ধতি প্রচলন করিবার প্রয়াস পান নাই। ধর্মশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র পর্যন্ত শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহের আলোচনার আমরা তাহাই বুঝিতে পারি। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আরও প্রতিপন্ন হয়,—ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত স্বতন্ত্র একটি রাজ-নীতিশাস্ত্র ছিল। লৌকিক ব্যবহার প্রভৃতি তাহার অন্তর্ভুক্ত হইত। কিন্তু সেগুলিও ধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অতি প্রাচীন-কালের বেদাদি শাস্ত্রবর্ণিত ব্যবহার-বিধির বিষয় ছাড়িয়া দিয়া, অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত খৃষ্টজন্মের তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বের ব্যবহার-শাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনার প্রতিপন্ন হয়, তৎকালে যে ব্যবহার-বিধি প্রচলিত ছিল,

তাহা সত্য-সমুন্নত সমাজের এক বিশিষ্ট আদর্শ । দ্বিসহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে ব্যবহার-শাস্ত্র যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল, অর্থশাস্ত্রের আলোচনার দ্বারাই বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

ব্যবহার শাস্ত্রের অর্থ-নির্ণয়ে পণ্ডিতগণ নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন । বর্তমানে আমরা যাহাকে ‘ল’ বা আইন বলি, পণ্ডিতগণের মতে, তাহা ব্যবহার পদবাচ্য নহে । শাস্ত্রকারগণ ব্যবহার শাস্ত্রের বৈকল্প লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে ব্যবহার শাস্ত্র ব্যবহার-প্রকার । ‘মকদ্দমা’ বুঝায়, উহাতে আইনের কোনও সম্পর্ক নাই । মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—‘আবেদন্যতি চেদ্রাজে ব্যবহারপদং হি তৎ ।’ অর্থাৎ,—স্থিতি

কিছা আচার-বিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শত্রু-কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া রাজার নিকট উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করিলে, তাহা ব্যবহারের বিষয় হইবে । তবেই বুঝা যাইতেছে, যাহা বিবাদ, তাহাই ব্যবহার-পদবাচ্য ; বিবাদই মকদ্দমা । সকল শাস্ত্রই রাজধর্ম-বর্ণন-ব্যাপদেশে ব্যবহার-ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন । রাজার ধর্ম-কর্মের মধ্যে প্রজাগণের অভাব-অভিযোগের জ্ঞান-বিচার অবশ্য কর্তব্য । সেই জ্ঞান-বিচারের প্রণালী-পরম্পরার উল্লেখ রাজধর্মের অন্তরূপে ব্যবহার-বিষয় সকল শাস্ত্রেই পরিবর্ণিত হইয়াছে । আর তদুপলক্ষে শাস্ত্রকারগণ বিবাদ-প্রকরণের বিস্তৃত একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন । সে বিবরণ ; যথা—

“প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ হেতুভিঃ । অষ্টাদশশ্চ মার্গেণ নিবন্ধানি পৃথক পৃথক ॥

তেষামাশ্রমণদানং নিক্ষেপোহস্বামিবিক্রয়ঃ । সমুদ্র চ সমুখানং দত্তপ্রদানপকর্ম চ ॥

বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ । ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদ স্বামিপালনয়োঃ ॥

সীমাবিবাদধর্মশ্চ পারুণ্যে দণ্ডবাচিকে । শ্বেয়ধ্ব সাহসশ্চৈব জ্ঞী সংগ্রহণমেব চ ॥

জ্ঞী-পুং ধর্মো বিভাগশ্চ দ্যুতমাস্বয় এব চ । পদাষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতিবিহ ॥”

তবেই বুঝা যাইতেছে,—রাজা শাস্ত্রসম্মত সাক্ষিলেখাদি দ্বারা দেশ, জাতি ও কুলচারগত হেতু অনুসারে অষ্টাদশ প্রকার বিবাদমূলক ব্যবহার-কার্য্য বিচার করিবেন । সেই অষ্টাদশ বিধ বিবাদ-বিষয়ের মধ্যে ঋণদান, নিক্ষেপ, অস্বামিবিক্রয়, সমুদ্রসমুখান, দত্তপ্রদানিক, বেতনদান, সংবিদব্যতিক্রম, ক্রয়বিক্রয়ানুশয়, স্বামিপাল-বিবাদ, সীমা-বিবাদ, বাক্পারুণ্য, শ্বেয়, সাহস, জ্ঞী-সংগ্রহণ, জ্ঞীপুরুষ-ধর্মবিভাগ, দ্যুত এবং আস্বয়—ব্যবহার বিষয়ে এই অষ্টাদশ পাদ উক্ত হইয়াছে । দণ্ডপারুণ্য, বাক্পারুণ্য, সাহস, শ্বেয় প্রভৃতির বিষয় আলোচনার বুঝা যায়, প্রাচীনকালে দণ্ডনীর অপরাধের অর্থাৎ ফৌজদারী প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক ছিল । তাহার আনুমানিকরূপে অপরাধের উদ্ভব পরবর্ত্তিকালে হইয়াছে । ঋণ-সংক্রান্ত বিস্তৃত বিধানের উল্লেখ মনে হয়, সে সময়ে ঋণ-গ্রহণ ও ঋণ-দান বিশেষ-ভাবে প্রচলিত ছিল এবং সেই ঋণ-পরিশোধ না করিতে পারিলে ঋণগ্রহণকারী গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন । যাহা হউক, অষ্টাদশ শাস্ত্রের তুলনায় অর্থশাস্ত্রে প্রাচীনকালের ব্যবহার-বিধির কি পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক । সে আলোচনার হই সহস্রাব্দিক বৎসর পূর্বের প্রাচীন ভারতের বিচার-পদ্ধতির কতকটা আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

অশাসন অশালন পক্ষে ব্যবহার-বিধি বিশেষ প্রয়োজনীয়, সকলেই তাহা স্বীকার করেন। প্রজা-সাধারণের হিত-সাধন-কল্পে তাই ভ্রম-বিচারের আবশ্যিকতা। নিরপরাধের দণ্ড এবং অপরাধীর মুক্তি ভ্রম-বিচারের লক্ষণ নহে। ইহা ধর্ম ও ব্যবহার বিকল্প। ইহাতে ধর্মের পীড়ন, অধর্মের প্রেয়স হয়। আর তাহাতে রাজ্য উৎসন্ন যায়। একাকী বিচার করিতে গেলে ভ্রম-প্রমাদ হওয়ার সম্ভাবনা, ভ্রম-বিচারের ব্যাঘাত হওয়াও বিচিত্র নহে। তাই শাস্ত্রকারগণ সপারিষদ রাজাকে ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন করিবার ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। অর্থ-শাস্ত্রেও সেইরূপ বিচারালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আছে। অর্থশাস্ত্রমতে তৎকালে দ্বিবিধ বিচারালয় সংগঠিত হইত। প্রথম—‘ধর্ম্মহীন’ দ্বিতীয়—‘কণ্টকশোধন’। উভয় বিচারালয়ের গঠন-পদ্ধতি বিভিন্ন; বিচার-প্রণালীও স্বতন্ত্র। বিভিন্ন শ্রেণীর মকদ্দমা এই দুই বিভিন্ন বিচারালয়ে মীমাংসা হইত। ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ তিন জন ব্রাহ্মণ এবং তিন জন রাজ-অমাত্য ‘ধর্ম্মহীন’ বিচারালয়ের বিচারকের আসনে সমাধীন ছিলেন।* কিন্তু ‘কণ্টকশোধন’ বিচারালয়ে কেবলমাত্র তিন জন অমাত্যের অথবা তিন জন ‘প্রদেষ্টার’ বিচারাসনে উপবেশনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। বিচারালয়ের গঠন-প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করিয়া অতঃপর অর্থ-শাস্ত্রকার এই সকল বিচারালয়ের বিচার-ক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত বিবাদের বা ব্যবহারের মীমাংসার ভার ‘ধর্ম্মহীন’ বিচারালয়ের উপর ব্রহ্ম ছিল। কিন্তু রাজা, রাজ্য বা সাধারণ সংক্রান্ত এবং হত্যাবিষয়ক বিবাদের বা ব্যবহারের মীমাংসা ‘কণ্টক-শোধন’ বিচারালয়ে নিষ্পন্ন হইত। প্রথমোক্ত বিচারালয়ের বিচারে সামান্য পরিমাণ অর্থদণ্ড প্রদত্ত হইলেই অপরাধী অব্যাহতি লাভ করিত; কিন্তু শেষোক্ত বিচারালয়ে অপরাধের ভারতম্য অনুসারে যেমন শাস্ত দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, তেমনি অপরাধীকে গুরুদণ্ডও ভোগ করিতে হইত। অবস্থা-বিশেষে ‘কণ্টক-শোধন’ বিচারালয় মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ দিবারও অধিকারী ছিলেন। এই দ্বিবিধ বিচার-

* আধুনিক দেওয়ানী বিচারালয়—এই ‘ধর্ম্মহীন’ বিচারালয়েরই কতকটা রূপান্তর। ‘কণ্টকশোধন’ বিচারালয়ের সহিত ফৌজদারী বিচারালয়ের অনেক বিষয়ে তুলনা হইতে পারে। সংহিতামতে বিচারালয়-গঠন সম্বন্ধে যে প্রণালী দৃষ্ট হয়, অর্থশাস্ত্র-বর্ণিত ‘ধর্ম্মহীন’ বিচারালয় সংগঠনের পদ্ধতি তাহার অনুরূপ। এ সম্বন্ধে মতুল্লিখিত,—

“সোহস্ত কাথ্যাণি সম্পশ্চেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভিবৃতঃ। সভামেব প্রবিজ্ঞাত্যামাসীনঃ স্থিত এষ বা।”

যন্মিন দেশে নিবীড়তি বিপ্রা বেদবিদব্রহ্মণঃ। রাজস্কাধিকৃতো বিধান ব্রহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ।”

অর্থাৎ,—‘বিধান ব্রাহ্মণ তিন জন সভ্যের সহিত ধর্ম্মাধিকরণ সভায় প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট বা উখিত ভাবে রাজ-কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন করিবেন। যে সভায় ঋক যজু ও সামবেদ বেত্তা ঐরূপ তিন জন সভ্য ব্রাহ্মণ এবং রাজপ্রতিনিধি অধিষ্ঠান করেন, সেই সভাকে ব্রহ্মসভা কহে।’ ব্রাহ্মবক্ষ্য-সংহিতায় এই সংখ্যার একটু আধিক্য দেখিতে পাই। ব্রাহ্মবক্ষ্য চারি জন বেদ-পরায়ণ ব্রাহ্মণের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মসভা-সংহিতায় বেদজ্ঞ ও ধর্ম্মজ পাঁচ, সাত বা তিন জন ব্রাহ্মণের অধিষ্ঠানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পরায়ণ সকল মতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন,—বেদজ্ঞ অগ্নিহোত্র তিন জন বা চারি জন ব্রাহ্মণ পরিষদের সভ্য হইবেন। যথা,—“চব্বারো বা ত্রয়োবাপি বেদবত্তোৎসিহোত্রিণঃ। ব্রাহ্মণানাং সমর্থ্য যে পরিষৎ সা বিধীয়তে।” কাভ্যায়ন-সংহিতায় বণিক সভ্যের বিষয় উল্লেখ আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যবহারাদির বিচার-কালে অভিজ্ঞ বণিক সভ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যায়।”

লয়ে যে সকল ব্যবহারের বা বিবাদের শীমাংসা হইত, নিয়ে তাহা প্রকটিত হইল; যথা,—

১। ধর্মস্থীর বিচারালয় নিম্নলিখিত বিবাদ শীমাংসার অধিকার প্রাপ্ত হইরাছিলেন,—(১) ব্যবহার-স্থাপনা (চুক্তির বা স্বীকার-পত্রের বাধ্য-নির্ণয়); (২) সমস্তস্থানপাক্ষ (কার্যের চুক্তি ভঙ্গ); (৩) সামাধিকার, ভূতকাধিকারঃ (চাকর ও মনীর এবং মজুর ও নিয়োগ-কর্তার সম্বন্ধ নির্ণয়); (৪) দাসকর্মঃ (ক্রীতদাস বিচার), (৫) ঋণাদান (ঋণ আদায়) (৬) উপনিধিকর্ম (গচ্ছিত ধন); (৭) বিক্রীতক্রীতানুশয় (নিলাম ও তদ্রহিত সংক্রান্ত বিষয়); (৮) দত্তস্থানপাক্ষ (দান-প্রত্যাহার); (৯) সাহসম্ (চৌধ্য ও দস্যুতা); (১০) দণ্ডপাক্ষম্ (দাঙ্গা, মারপিট প্রভৃতি); (১১) বাক্যপাক্ষম্ (মানহানি প্রভৃতি); (১২) দূতসমাহরণ (জুয়াখেলা); (১৩) অশ্বামিবিক্রয় (ভূস্বামী ব্যতীত অশ্ব কর্তৃক ভূমি বিক্রয় অর্থাৎ সম্বাদিকারী ভিন্ন একজনের জমী অশ্ব কর্তৃক বিক্রয়); (১৪) অশ্বামিসম্বন্ধ (শ্বামিদের সম্বাদির বিষয়), (১৫) সীমাবিবাদঃ, মর্যাদাস্থাপনম্ (জমীর সীমানা লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ প্রভৃতি); (১৬) বাস্তবকর্ম (গৃহনির্মাণ বিষয়ক বিবাদ); (১৭) বাস্তব-বিক্রয় (অস্থাবর ও স্থাবর সম্পর্কীয় বিবাদ); (১৮) বিবিতক্ষেত্রপথহিংসা (কৃষিকার্য, চারণ-ভূমি এবং রাজপথ সংক্রান্ত বিবাদ); (১৯) বাধা-বাধিকর্ম (বিবিধ বিষয়ক বাধা-বিপত্তি); (২০) বিবাহসংযুক্তম্, বিবাহধর্ম, জীধনকর্ম (স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য বিষয়ক বিবাদ, দায় প্রভৃতি); (২১) সমস্তসমুখান (বোধ-কারবার সংক্রান্ত বিবাদ); (২২) দায়বিভাগঃ, দায়কর্মঃ (উত্তরাধিকার বিষয়ক ব্যবহার); (২৩) প্রকীর্তনানি (বিভিন্ন জাতীয় ব্যবহার); (২৪) বিবাদ-পদ-নিবন্ধঃ (বিচার-প্রণালীর পদ্ধতি-সংক্রান্ত ব্যবহার) প্রভৃতি।

২। ‘কণ্টকশোধন’ বিচারালয়ের প্রতি নিম্নলিখিত বিবাদ-বিচারের ভার ছিল; যথা,—(১) কারকরক্ষণম্ (কারকর বা শিল্পিগণের রক্ষার ব্যবস্থা); (২) বৈদেহরক্ষণম্ (বৈদেহ বা পণ্য-ব্যবসায়ীদের রক্ষা-কল্পে ব্যবহার); (৩) উপনিপাত-প্রতিকারঃ (জাতীয় বিপদ নিবারণ-কল্পে উপায়-পরামর্শ উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিবাদ); (৪) গুটাজীবিনাং রক্ষা (অসচ্চরিত্রগণের দমন); (৫) সিদ্ধব্যঞ্জনৈর্মানবপ্রকাশনম্ (সন্ন্যাসীবল্লী ও পুণ্ডরিকগণ কর্তৃক অপরাধী ধৃতকরণ সম্পর্কীয় ব্যবহার); (৬) শঙ্করপক্ষাভিগ্রহঃ (সন্দেহ করিয়া অথবা বমাল দস্যু-তঙ্করাতির প্রেষার বিষয়ক বিবাদ); (৭) আশুযুক্তপরীক্ষা (পোটমটের বা মৃত ব্যক্তির শরীর ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা); (৮) বাক্যকর্মাব্যুৎসর্গঃ (জেরা প্রভৃতি); (৯) সর্বাধিকরণরক্ষণম্ (সরকারী কার্যালয়-সমূহে শিষ্টতা-সংরক্ষণ); (১০) একাদবধনিষ্করণঃ (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ছেদনের পরিবর্তে অর্ধদণ্ড প্রভৃতির ব্যবস্থা); (১১) দণ্ডক্ৰিয়াদিগণকর্মঃ (যজ্ঞপণ্য বা বিনা যজ্ঞপণ্য মৃত্যুদণ্ড); (১২) কল্যাণকর্ম (বাতিচার, অতৈবহ সহবাস প্রভৃতি); (১৩) অতিচারদণ্ড (বিভিন্ন অপরাধের দণ্ড বিষয়ক বিবাদ) ইত্যাদি।

ধর্মস্থীর এবং কণ্টকশোধন বিচারালয়ে যে সকল প্রকার অপরাধেরই অভিযোগ উপস্থিত হইত, তাহা নহে। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি এবং যোদ্ধাগণও কোনও কোনও বিবাদের শীমাংসা করিয়া দিতেন। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি—অর্থশাস্ত্রে ‘গ্রামিক’ সংজ্ঞার অধিষ্ঠিত হইরাছেন। তিনি সরাসরিতাবে কোনও কোনও অপরাধের শেষবিচার করিবার অধিকারী

ছিলেন। এমন কি, অবস্থা-বিশেষে তিনি চোর, ডাকাত ও বদমাইশদিগকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিতেও পারিতেন। শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে রাজা যে বিচারালয়ে সমাসীন হইতেন, সেই বিচারালয়ে সকল মকদ্দমার আপিল হইত। এইরূপে বিচারালয়াদির বিবরণ প্রদান করিয়া অর্থশাস্ত্রকার অতঃপর বিচারালয় স্থাপনের স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। গ্রাম-সমূহের মধ্যে প্রতি ‘সংগ্রহণ’, প্রতি ‘জোণমুখে’, প্রতি ‘জনপদসঙ্কিতে’ পূর্বোক্ত বিচারালয়-সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা ছিল।†

বিচারালয়াদি প্রতিষ্ঠার পর বিচার-প্রণালী নির্ণয় করা প্রয়োজন। কি প্রণালীতে বিচার-কার্য নিষ্পন্ন হইবে, বিবাদ-নীমাংসায় কি রীতি অবলম্বন আবশ্যক, অর্থশাস্ত্রকার অতঃপর তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। সে ব্যবস্থার চারিটা মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার উপদেশ অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অর্থশাস্ত্র-মতে ব্যবহার-শাস্ত্রের চারিটা পাদ ; প্রথম—ধর্ম অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র-বর্ণিত ব্যবহার-বিধি ; দ্বিতীয়—‘ব্যবহার’

ব্যবহার
প্রণালী।

অর্থাৎ পক্ষগণের পরস্পর চুক্তি বা অঙ্গীকার ; তৃতীয়—‘চরিত্র’ অর্থাৎ লৌকিক বা অরণ্যাতীত-কাল-প্রচলিত প্রথা ; এবং চতুর্থ—‘রাজশাসন’ অর্থাৎ রাজার প্রবর্তিত বিধি-বিধান। এই পাদ-চতুষ্টয় বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের ‘বিবাদপদনিবন্ধঃ’ অংশে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় ; যথা,—
“ধর্মশ্চ ব্যবহারশ্চ চরিত্রং রাজশাসনম্। বিবাদার্থং চতুষ্পাদঃ পশ্চিমঃ পূর্ববাধকঃ ॥

অত্র সত্যস্থিতো ধর্মো ব্যবহারস্ত সাক্ষিঃ। চরিত্রং সংগ্রহে পুংসাং রাজ্যমাজ্ঞা তু শাসনম্ ॥”
ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ব্যবহার সাক্ষি-সাপেক্ষ এবং রাজশাসন রাজ্যজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। যাহা লোকাচার বা অরণ্যাতীতকাল প্রচলিত প্রথা, তাহা জনসাধারণ কর্তৃক নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু অবস্থা-ভেদে এই মূল বিষয়-চতুষ্টয়ের মধ্যেও সময় সময় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। এইরূপ বিরোধস্থলে বিচার-বিভ্রাট হওয়া সম্ভবপর। ব্যবহার-পদ-চতুষ্টয়ের এই বিরোধ-ভ জন-ব্যাপদেশে তাই অর্থশাস্ত্রকার নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন,—

“অনুশাসিকি ধর্মোণ ব্যবহারেণ সংস্থয়া। জ্ঞানেন চ চতুর্থেন চতুরস্তাং মহীং জয়েৎ ॥

সংস্থয়া ধর্মশাস্ত্রেণ শাস্ত্রং বা ব্যবহারিকম্। যস্মিন্নথো বিক্রোধ্যত ধর্মোণাথো বিনিশ্চয়েৎ ॥

শাস্ত্রং বিপ্রতিপত্তেত ধর্মজ্ঞানেন কেনচিৎ। জ্ঞায়ন্তত্র প্রমাণং স্তান্তত্র পাঠো হি নশ্রুতি ॥”

ধর্ম ও ব্যবহারের বিরোধে অথবা চরিত্র ও রাজশাসনের বিতর্কায় পূর্ববর্তী প্রবল হইবে ;

* এই ব্যবস্থাকে পঞ্চায়তি ব্যবস্থা বলা যায়। যে সময় রাজার আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন পঞ্চায়তি বিচারালয়েই বিচার-কার্য নিষ্পন্ন হইত। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এ বিষয়ে নব দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। মেগাস্থেনিস রাজ-আদালতে মকদ্দমার সংখ্যা অল্প দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, ভারতবাসীরা তৎকালে মামলা-মকদ্দমা জানিত না। কিন্তু অধিকাংশ মকদ্দমা এইরূপ পঞ্চায়তি আদালতে বিচার হইত বলিয়া আদালতে তাহা ঘাইত না এবং সেই জন্যই মেগাস্থেনিস মকদ্দমার সংখ্যা অল্প দেখিতে পাইয়াছিলেন।

† আট শত গ্রামের মধ্যে যে কয়টা গ্রাম প্রধান নির্বাচিত হইত, তাহার এক একটি ‘স্থানীয়’ নামে অভিহিত হইত। এইরূপ, চারি শত গ্রামের মধ্যে যে কয়টা প্রধান, তাহা জোণমুখে ; এবং দশটা গ্রামের মধ্যে যে কয়টা প্রধান, তাহা ‘সংগ্রহণ’ অভিধানে অভিহিত হইয়াছিল। রাজ্যের দুইটা প্রদেশের সন্ধিলে যে স্থান অবস্থিত, তাহাই জনপদসঙ্কি। এই স্থান—সন্ধিলের কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থশাস্ত্রে ‘জনপদ-নিবেশ’ প্রদেশে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে।

অর্থাৎ, ধর্মের ও ব্যবহারের পরস্পর সম্বন্ধে ধর্মই মাত্র এবং চরিত্রের ও রাজশাসনের পরস্পর বিতণ্ডায় চরিত্রই বরণীয় হইবে। 'রাজানুশাসন—ধর্ম, ব্যবহার ও চরিত্র প্রভৃতির অনুবর্তী হওয়া প্রয়োজন। সংহার ও ব্যবহারিকের অর্থাৎ লোকাচার ও চুক্তির পরস্পর বিরোধস্থলে ধর্মের অনুশাসন অনুসারে বিচার-কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে। তবে রাজানুশাসনের এবং জ্ঞানের মধ্যে মতবৈধ উপস্থিত হইলে জ্ঞানই প্রামাণ্য। সেখানে রাজানুশাসন কার্য্যকরী হইবে না। * রাজ-সকাশে আবেদন করিলেই বিবাদ ব্যবহারবাচ্য হইয়া থাকে। বিচারপ্রার্থী আবেদন করিবার পর বিচার-কালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সর্ব্বাঙ্গে লিপিবদ্ধ করিতে হয়। যথা,—(১) বিবাদীর সম্মুখে বাদীকে আপনাবাদীর বিষয় বলিতে হয়; বিচারক তাহা লিখিয়া লন। এইরূপ লিখন-প্রণালী সংহিতা-শাস্ত্রে ভাষা নামে অভিহিত হইয়াছে। (২) নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে; অর্থাৎ—ঠিক যে দিন অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লিখিবে। সঙ্গে সঙ্গে বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ এবং দিন প্রভৃতিরও উল্লেখ করিতে হইবে। (৩) অপরাধের বা বিবাদের প্রকৃতি; অর্থাৎ কি বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। (৪) ঘটনার স্থান বা কোন্ স্থানে বিবাদ ঘটয়াছে। (৫) যদি ঋণ-সংক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ঋণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। (৬) বাদীর ও বিবাদীর বা অভিযোক্তার ও অভিযুক্ত ব্যক্তির বাসস্থান, গ্রাম, জাতি, গোত্র, নাম ও পেশা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার করিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই বিবাদের কোনও হেতু আছে কি না। (৭) উভয় পক্ষের জবানবন্দী অর্থাৎ বিবাদ-সংক্রান্ত উভয় পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষী প্রমাণাদি। এই সকল বিষয় যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া বিচারকগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার আলোচনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। †

‡ বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের উক্তি; যথা,—

“ঋতৈর্ধৈ যুতের্ধৈ হুলভেদ একরূপে। ঋতিস্মৃতি বিরোধে তু ঋতিরেষ গরীয়সী।”

“স্মৃত্যোর্বিরোধে জ্ঞানন্ত বালবান ব্যবহারতঃ।

অর্থশাস্ত্রাং তু বলবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রম্ ইতি স্থিতিঃ।”—বাস্তবকা, ২য় অধ্যায়, ২১ম শ্লোক।

“ঋতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধ যত্র দৃশ্যতে।

তত্র শ্রোতঃ প্রমাণস্ত তস্মৈর্ধৈ স্মৃতির্ধরা।”—বাস-সংহিতা।

“অধর্গাং লোকবিধিষ্টং ধর্ম্মম্ অপ্যাচরেন্ ন তু।”—মিতাকর।

† স্মৃতি-শাস্ত্রে বিবাদ-প্রণালী-বর্ণন-এসঙ্গে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। স্মৃতি অনুসারে এতদ্ব্যতীত আহ্বান ও আদেশ প্রভৃতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ‘আদেশ’ কতকটা আধুনিক ‘ইঞ্জাকশন’ (Injunction) বা নিষেধের মত। সবাদি স্মৃতিতে আহ্বান ও আদেশ বিষয়ে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নাই। কাত্যায়নের বচনে এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সে মতে অর্থ উপস্থিত হইবা মাত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে,—“কা বার্তা। কা চ তে পীড়া।” অতঃপর কে, কোন্ সময়, কি বিষয়ে পীড়া উপপাদন করিয়াছে, তাহা অবগত হইয়া রাজা পীড়া-প্রদান-কারীকে ‘আহ্বান’ করিবেন। ইত্যাদি। বিচার এড়াইবার জন্য অপরাধী যদি আহ্বানের পূর্বে বা আহ্বানের পর পলায়ন করিবার চেষ্টা পায়, তাহা হইলে তাহাকে ‘আদেশ’ বা নিষ্পত্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল। ‘আদেশ’ শব্দের অর্থ মিতাকরা বলিয়াছেন,—‘রাজাজ্ঞাবারোধঃ।’ রাজাদেশে নিবৃত্তি। আদেশ চতুর্বিধ; যথা—‘হানাসেধ, কালাসেধ, প্রবাসাসেধ ও কর্ম্মাসেধ। চতুর্বিধ ‘আদেশের’ ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে টীকাকার বলিয়াছেন,—“অস্মাৎ হানাসেধি বসন্ত গচ্ছতি তব রাজকীয়াজ্ঞা অস্ম হানাসেধ উচ্যতে; অস্মাৎ পতনাস ইরক্তকালঃ বাবদ্যবি গচ্ছতি

অতঃপর অর্থশাস্ত্রে ‘পরোক্ত’ দোষের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । অনবধানতা-বশতঃ পক্ষগণ আপনাদের বক্তব্য বিষয়ে বিরুদ্ধি, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি করিয়া থাকেন । সেই

জন্ত বিবাদ-বর্জন-কালে অর্থশাস্ত্রকার পক্ষগণকে এই কর্তী বিষয়ে ‘পরোক্ত’ দোষ । সাবধান হইবার উপদেশ দিয়াছেন ; যথা,—(১) বিচার্য্য বিষয় পরিত্যাগ

করিয়া পক্ষগণের বিষয়ান্তর গ্রহণ ; অর্থাৎ,—যে বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে, বিচারকালীন সেই বিরোধীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অবাস্তর বিষয় প্রমাণের চেষ্টা । (২) পূর্ব-প্রদত্ত বিবরণের সহিত পরবর্তী বিবরণের অসামঞ্জস্য ; (৩) পক্ষগণ ব্যতীত অপর ব্যক্তির মতামত গ্রহণের পক্ষে জিদ করণ । অর্থাৎ,—তাহার মতামতের কোনও আবশ্যকতা নাই, বিচারকালে তাহার মতের উপর নির্ভর করিবার জন্ত বিচারকের নিকট জিদ প্রকাশ । (৪) বিচার্য্য বিষয়ের বা প্রশ্ন-সমূহের উত্তর করিতে করিতে

অন্য কালকৃত আসেধ ; যত উচ্চলিতত্ত্ব যদি যান্ত্রীতি প্রবাসাদাসেধোহয়ম্ । অস্মিন্ কর্ণপি যদি লগিযাসি ইতি কর্ণন্ আসেধোহয়ম্ ।” অধুনা যেমন অপরাধীকে নির্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করিতে নিবেদন করা হয়, স্থানসেধ সেইরূপ । Internment সম্বন্ধে আজকাল এই বিধি অবলম্বিত । আজ কাল কোনও কোনও অপরাধীকে অগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্য্য বাইবার বিষয়ে রাজসরকার হইতে নিবেদনা প্রচারিত হয় । প্রবাসেধ তদনুরূপ । কালসেধ ও কর্ণসেধ যথাক্রমে—নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত কোনও কাজে নিবৃত্তি এবং কোনও নির্দিষ্ট কার্য্য হইতে বিরতি । হুতরাং বুঝা যাইতেছে, আধুনিক কালে প্রাচীন-কালের প্রথাই রূপান্তরে প্রবর্তিত । স্থতির মতে বিচার-প্রণালীর (Procedure) প্রথম অংশ ‘ভাষা’ নামে অভিহিত হইয়াছে । ইহাতে বাদীকে প্রথমে বিবাদীর সম্মুখে আপনাবাদীর পুনরুৎপন্ন করিতে হয় । বিচারক তাহা লিপিবদ্ধ করেন । এই লিখনের নাম—ভাষা । যাজ্ঞবল্ক্য এ বিষয়ে নিম্নত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন । তাহার মতে—

প্রত্যর্থিনোঃপ্রতো লেখ্যং যথাবেদিতমর্থিনা । সমামাসতদন্বাৎসর্গজাত্যাতি চিহ্নিতম্ ॥”

অর্থাৎ,—লেখ্যে বার, মাস, পক্ষ, তিথি, বারাদি ও বাদী প্রতিবাদীর নাম জাত্যাতি উল্লিখিত হইবে । মহর্ষি ব্যাসও তাহার সংহিতায় সে আভাষ প্রদান করিয়া গিয়াছেন । পরবর্তী ব্যবহার-গ্রন্থ প্রভৃতিতেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় । ‘ব্যবহারসমুখ’ গ্রন্থে এতৎসম্বন্ধে যে প্রণালীর বিবরণ উক্ত হইয়াছে, তাহা এই ; যথা,—

“দেশশৈব তথা স্থানং সন্নিবেশ স্তথৈব চ । জাতিঃ সংজ্ঞাবিশাঙ্গক প্রমাণং ক্ষেত্র নাম চ ॥

পিতৃ-পৈতামহর্ষৈব পূর্ব-রাজ্যস্বকীর্ণনম্ । স্থাবরেষু বিবাদেষু তলৈতানি প্রবেশয়েৎ ॥”

স্থাবর-সংক্রান্ত বিবাদে দশটি বিষয়ের অতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । যথা,—দেশ, স্থান, সন্নিবেশ, জাতি, সংজ্ঞা, বাসস্থান, প্রমাণ, ক্ষেত্র, নাম, পিতৃপিতামহ, পূর্ব-রাজ্যগণের বিবরণ প্রভৃতি । আরজী সংক্ষেপ হইবে, অথচ তাহাতে বাদীর সকল বক্তব্য থাকিবে । ইত্যাদি । মিতাক্ষরা-দ্রুত স্থতি-বচন প্রভৃতিতেও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় ।

“অর্থবদ্ধসংযুক্তম পরিপূর্ণমনাসুলম্ । সাধ্যাবধাচকপণং প্রকৃতার্থাসম্বন্ধী চ ॥

অসিদ্ধসবিরুদ্ধং চ নিশ্চিত সাধনে ক্ষমম্ । সংক্ষিপ্তঃ নিখিলার্থঃ চ দেশকালাবিরোধী চ ॥

বর্জ্যমাসপকাহা বেলাদেশপ্রদেশবৎ । স্থানাবসথসাধ্যাখা জাত্যাকারবদ্যমুভম্ ॥

সাধ্যপ্রমাণসংখ্যাবাদ্যপ্রত্যর্থিনামবৎ । পরান্তুপূর্বজানেক-রাজ্যনামতিরিক্তম্ ॥

ক্ষমালিঙ্গাঙ্গপীড়াবৎ কথিতাহর্জুনারকম্ । যদাবেদয়তি রাজো তদ্যাবোভাবীয়তে ॥”

ব্যবহার-শাস্ত্রোক্ত এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায়, প্রাচীনকালের বিচার-প্রণালী বেশ পৃথল্যবদ্ধ ছিল । বিত্ত অর্থ ও ধর্ম্ম-সংযুক্ত ভাষার আরজী বা আবেদন লিখিতে হইত । আরজী সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরিপূর্ণ-অর্থ-আপক এবং বৎসর, মাস, পক্ষ, বেল, দেশ, প্রদেশ, স্থান, গৃহ, সাধ্য বস্তুর নাম, বিবাদীর জাতি, আকার বয়স প্রভৃতির বধ্যবধ উল্লেখ করিতে হইত । এইরূপ আরও অনেক বিবরণ আরম্ভিতে উল্লেখ করিবার নিয়ম ছিল ।

নিরুত্তর হওয়া এবং বিচারক কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াও নিরুত্তর থাকা। (৫) পূর্ব-নির্দিষ্ট প্রশ্ন ভিন্ন নূতন প্রশ্নের উত্থাপন। (৬) নিজকৃত পূর্ব-বিবরণ প্রত্যাহার করা। (৭) নিজের সাক্ষীর বর্ণনা অস্বীকার করা। (৮) নিষিদ্ধ-স্থলে গোপনে সাক্ষীর সহিত কথাবার্তা বলা; অর্থাৎ—যেখানে সাক্ষীর সহিত পরামর্শ করা অবৈধ, সেরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষীর সহিত গোপনে কথোপকথন। এই অষ্টবিধ দোষ ‘পরোক্ত’ দোষ বলিয়া অর্থশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মহাদি সংহিতা-শাস্ত্রেও এ সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। মহু বলিয়াছেন,—

“আদেশঃ যশ্চ নিশ্চি নিদ্ধিষ্ঠাপকুতে চ যঃ। যশ্চাধরোত্তরানর্থান্ বিণীতান্ নাববুধ্যতে ॥

অপদিষ্ঠাপদেশঞ্চ পুনর্নবপদ্যাবতি। সম্যক্ প্রণিহিতঞ্চাণং পৃষ্টঃ সন্ন্যভিনন্দতি ॥

অসম্ভাষ্যে সাক্ষিভিঃ দেশে সম্ভাষতে মিথঃ। নিরুচ্যমানং প্রশ্নঞ্চ নচ্ছেদ্যশ্চাপি নিষ্পতেৎ ॥

ক্রহীতু্যক্তশ্চ নাক্রম্যহুতঞ্চ ন বিভাবয়েৎ। ন চ পূর্বাপরং বিজ্ঞাৎ তস্মাদর্থান্ স হীয়তে ॥”

অর্থাৎ,—‘যে সাক্ষী ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না, সেইরূপ সাক্ষী মাশ্র করিয়া যে বাদী পরে তাহা অস্বীকার করে; অথবা যে বাদী বিশৃঙ্খল ও পরস্পর-বিরোধী বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকে; যে বাদী তাহার আরজীতে মূল বিষয় প্রথমে একরূপ উল্লেখ করিয়া পরে তাহা হইতে স্বতন্ত্র বিষয়ের বর্ণন করে, অথবা সম্যক-স্বীকৃত পূর্ব বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া পরে তাহা স্বীকার করিতে চাহে না; যে বাদী অসম্ভাষ্য প্রদেশে লইয়া গিয়া সাক্ষীদিগের সহিত কথাবার্তা কহে অথবা রীতিমত জিজ্ঞাসা করিলে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহে না বা ধর্ম্মাধিকরণ হইতে স্থানান্তরে যায় না; ধর্ম্মাধিকরণ কোনও বিষয় বলিতে বলিলে, যে কথা কহে না অথবা যে আবেদিত বিষয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করে না; যে বাদী সাধ্য সাধন কিছুই জানে না;—এরূপ বাদী প্রার্থিত বিষয়ে নিরাশ হয় অর্থাৎ তাহার দাবী অগ্রাহ হইয়া থাকে।’ যাহা হউক, এই সকল ‘পরোক্ত দোষ’ ভিন্ন অর্থশাস্ত্রে আরও কতকগুলি ‘পরোক্ত’ দোষের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বিবাদী যখনই বিবাদীর বিষয়ে জবাব প্রদান করিবে অর্থাৎ আপনার দোষ অস্বীকার করিবে, বাদীকে সেই দিনই তাহার উত্তর দিতে হইবে। তিনি সেই দিনই সাক্ষ্যাদি মাশ্র করিয়া মকদ্দমা চালাইবার জন্ত প্রস্তুত হইবেন। কারণ, বিবাদী জবাব দিলেই বুঝা যায় যে, সে মকদ্দমা চালাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে। বাদী যদি আত্ম-পক্ষ-সমর্থনে অপারক হন, তাহা হইলে তাঁহাতে পরোক্ত দোষের উদ্ভব হয়। তবে বিবাদী যদি বিবাদ-প্রতিবাদে প্রস্তুত না থাকিত, তাহা হইলে জবাবের জন্ত তাহাকে সময় দিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল। এ ক্ষেত্রে তিন দিন বা সাত দিন সময় দিবার নিয়ম।* এইরূপ অবকাশ পাইয়াও বিবাদী যদি আত্মপক্ষ-সমর্থনে অপারক হইত, তাহা হইলে তাহার প্রতি

* সংহিতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে অবকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। মহর্ষি মনুর স্মৃতিতে অবকাশের বিষয় স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই। অর্থীর দণ্ডাদির বিষয় উল্লেখ ব্যপদেশে তিনি বলিয়াছেন,—“নচেৎ ত্রিপক্ষাৎ প্রক্রমাক্ষণং প্রতিপরাক্রিতা।” অর্থাৎ—‘ত্রিপক্ষের মধ্যে (অর্থী) যদি কিছু না বলে, তবে তাহাকে (রাজা) ধর্ম্মতঃ দোষী করিবেন।’ ইহাতে বুঝা যায়, জবাবের জন্ত ত্রিপক্ষ সময় দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মনুর সংহিতায় আর একটা বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সেটি তামাদি-সংক্রান্ত; ইংরাজীতে ইহা ‘লিমিটেশন

তিন পণ বা বার পণ অর্থ-দণ্ড প্রদান করিবার ব্যবস্থা ছিল। তিন পক্ষের মধ্যেও যদি বিবাদী প্রতিবাদে সমর্থ না হইত, তাহা হইলে সে ‘পরোক্ত’ দোষে দুষ্ট হইত। বাদী তখন তাঁহার দাবীকৃত বিষয় বিবাদীর নিকট আদায় লইবার অধিকারী হইতেন। কিন্তু বিবাদী যদি বাদীর নিকট চাকরী স্বীকার করিতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে বাদী ইচ্ছা করিলে বিবাদীয় বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। যে বিবাদী আদৌ আপনার পক্ষ সমর্থন জন্য উপস্থিত হইত না, তাহার পক্ষেও ঐরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। অত্রপক্ষে বাদী যদি আপনার দাবী সপ্রমাণ করিতে না পারিতেন, তাঁহার প্রতিও দণ্ডের আদেশ হইত। মৃতব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার দাবী অপ্রমাণিত হইলে, তিনি মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত কোনও কোন কার্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইতেন। পরোক্ত-দোষে অপরাধীর ‘পঞ্চবন্ধ’ বা ‘দশবন্ধ’ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।। * দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি ফৌজদারী বিবাদ ভিন্ন অন্য সময়ে প্রতিবাদী, পূর্ব-মকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, বাদীর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না। অথবা, একই অপরাধের জন্য কিংবা সদৃশ বিষয়ে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে একই সময়ে একাধিক অভিযোগ উপস্থিত করা বিধিবিরুদ্ধ ছিল। তবে ফৌজদারী (দণ্ড, পার্শ্ব, সাহস, স্তের) প্রভৃতি ব্যবহারে ইহার ব্যতিক্রম হইত।†

(Limitation) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যদি তিন বৎসরের মধ্যে আপনার প্রাপ্য বিষয়ের দাবী না করেন, তাহা হইলে ঐ সময়ের পর তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য হইবে—মহু তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন। (মহু-সংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ৩০শ ও ৩১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় অর্থীর বর্ণনা শুনিবামাত্রই এতাবধি জবাব দিতে হইত। সুতরাং অবকাশ দিবার কোনও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে অবকাশ প্রদানের বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। পার্শ্ব-সাহসাদি দাত্তী অস্থ স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য যথেষ্ট সময় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা বিচারকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যথা,—“বিবাদে যৎ সত্ত্ব এব কালোহন্তরেচ্ছয়া শ্রুতঃ।” বাকপার্ষ্বা, দণ্ডপার্ষ্বা, স্তের, ধন প্রভৃতি সংক্রান্ত বিবাদে মহর্ষি নারদ সত্ত্ব-নিচয়ের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু অন্তান্ত বিষয়ে এক দিন, তিন দিন বা সাত দিন অবকাশ দেওয়ার বিধি তাঁহার গ্রন্থে দৃষ্ট হয়; যথা—“যো লেখনঃ বা লভেত্রাহঃ সপ্তাহমেব বা।” কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি সংহিতায় বিবাদের শুরুত্বের তারতম্যানুসারে অজ্ঞ বা অধিক সময় দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন,—“কালঃ শক্তিঃ বিদিত্বা তু কাথ্যানাঞ্চ বলাবলম্ অজ্ঞঃ বা বহু বা কালঃ দত্ত্বাৎ প্রত্যাধিনে প্রভুঃ।” কাত্যায়ন-সংহিতার একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া জীমুতবাহু বলিয়াছেন,—অপরাধের শুরুত্ব অনুসারে অবস্থাবিশেষে পাঁচ দিন, তিন দিন, সপ্তাহ বা তিন পক্ষ পর্যন্ত সময় দেওয়া যাইতে পারে। অধুনা ইংরেজ-রাজপ্রবর্তিত বিচারালয়-সমূহে অবকাশ দেওয়ার ব্যবস্থা এরূপ আছে বটে; কিন্তু তাহার ঐধাবিধি কোনও নিয়ম নাই। বিচারক যদৃচ্ছা অবকাশ দিয়া থাকেন বাহা ইউক্ত, এই সকল বিষয়ের আলোচনার বুঝা যায়, অবকাশ দিবার প্রথা নূতন নহে। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের ব্যবহার-শাস্ত্রে প্রবর্তিত আছে।

* পঞ্চবন্ধ বা দশবন্ধ—দাবীর পরিমাণের পঞ্চমাংশ বা দশমাংশ।

† একই প্রতিপক্ষের উপর বিভিন্ন বিষয় এবং বহু বিষয় সংক্রান্ত বিবাদ চাপান প্রাচীন-কালের ব্যবস্থা শাস্ত্রে যেমন নিষিদ্ধ ছিল, তেমনি একই বিবাদীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন বাদীর মকদ্দমা উপস্থিত করা শাস্ত্র-বিগত বলিয়া উক্ত হইত। মহর্ষি কাত্যায়ন এ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

“ন চৈকস্মিন্ বিবাদে তু ক্রিয়ামাত্মাদিনোদ্যমঃ । ন চার্হসিদ্ধিকন্ডয়োঁ চৈকত্র ক্রিয়াধমঃ ।”

অর্থশাস্ত্রকার তাই বলিয়াছেন,—“অভিযুক্তো ন প্রত্যভিযুক্তি অন্তঃ কলহসাহসসার্থসমবাসেভ্য। ন চাভিযুক্তোহভিযোগোহতি।” সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে, একই বিষয়ে একাধিক বিবাদ, একসঙ্গে দুই অর্থীর স্বতন্ত্র বিবাদ এবং বহু-বিষয়-বহুবিধ বিবাদ একসঙ্গে উপস্থিত হইতে পারিত না। এতদ্ব্যতীত, স্বয়ং রাজা বা রাজকর্মচারী কোনও বিবাদ উপস্থিত করিবার অধিকারী ছিলেন না। মহাদি স্থিতিতেও তাহা নিবিদ্ধ হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন,—

“নোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্যং রাজা নাপ্যন্ত পুরুষঃ।

‘ন চ প্রাপিতমন্ত্ৰেন প্রসেদর্থং কথঞ্চন ॥’

অর্থাৎ,—ধনলোভে লোকের মধ্যে বিবাদ জন্মান বা অপরের প্রাপ্য অর্থে লোভ করা, রাজার বা রাজপুরুষের কর্তব্য নয়। কিন্তু পরে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রথমতঃ, রাজা স্বয়ং ব্যবহার-দ্রষ্টা ছিলেন না। তাই ব্যবহার-উৎপাদনে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ক্রমশঃ রাজার দায়িত্ব-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ঐ ক্ষমতা প্রদানের আবশ্যক হইয়া পড়ে। পণ্ডিতগণ তখন উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন যে, কোনও কোনও বিষয়ে রাজার প্রতি ব্যবহার-উৎপাদনের ক্ষমতা অর্পণ না করিলে রাজদ্রোহ প্রভৃতিতে তাঁহার রাজ্য-রক্ষা কঠিন হইয়া উঠিবে। তাই জীমূতবাহন, বীরমিত্রোদয়, বৃহস্পতি প্রভৃতি সংহিতাগ্রন্থে রাজার ও রাজপুরুষের ব্যবহার উৎপাদনের ক্ষমতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। স্তেয়, সাহস, দণ্ডপারুষ্য প্রভৃতি বিষয়ে রাজার ঐরূপ ব্যবহার উৎপাদনের বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ ব্যবহার উৎপাদন সম্বন্ধে জীমূতবাহন বলিয়াছেন,—

“অষ্টাদশপদো বান্দো বিচার্যো বিনিবেদিতঃ। সন্ত্যক্তানি পদান্তত্র তানি রাজা বিশেৎ স্বয়ম্ ॥”

ষড়ভাগহরণং শুদ্ধং সময়াতিক্রমো নিধিঃ। বধঃ সংহরণং স্তেয়মাসেধাজ্ঞাব্যতিক্রমঃ ॥”

ছল প্রভৃতি রাজদ্রোহ-বিষয়ক বিবাদ স্বয়ং রাজা বা রাজকর্মচারী উৎপাদন করিতে পারিবেন,—বীরমিত্রোদয়ে তাহার ব্যবস্থা আছে। *

যাজ্ঞবল্ক্যেও এইরূপ উক্ত দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন,—“অভিযোগমনতীর্থ্য নৈমন্ত প্রত্যভিযোগরেৎ। অভিযুক্তং মাশ্চেন নোক্ত বিপ্রকৃতং নয়েৎ ॥” অর্থাৎ—বিবাদীর বিরুদ্ধে একজন কর্তৃক আরোপিত দোষের বহু দিন পর্যন্ত মীমাংসা না হইবে, ততদিন অপর কেহ সে বিবাদীর বিরুদ্ধে পাষ্টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না। তবে কলহ, সাহস, স্তেয়, পারুষ্য প্রভৃতি বিষয়ে এ নিয়মের ব্যতিক্রমের বিষয় যাজ্ঞবল্ক্য উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে “কুর্গাৎ প্রত্যভিযোগক কলহে সাহসে চ।” আধুনিক-কাল-প্রচলিত আইনাদিতেও এ বিষয় নিবিদ্ধ হইয়াছে। আধুনিক Multifariousness এবং Misjoinder of Charges প্রভৃতি বাধার স্তার প্রাচীন কালেও উক্তরূপ বিবিধ বাধার বিষয় সংহিতা ও অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১২ ধারার আছে,—“Where a plaintiff is precluded... from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action. বিচারকও এরূপ ক্ষেত্রে এরূপ মকদ্দমার বিচার করিবেন না। যথা—(Sec. 10) “No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly or substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties.” ইত্যাদি।

* রাজদ্রোহ (সিভিশন), ‘ডিকেল’ ও অন্তঃসংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ সম্রাটের করিবার অধিকার এখনও আছে। ঐ সকল অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ বিশেষ বিধিও বিধিবিদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন কালের ব্যবহার সহিত কোনও কোনও বিষয়ে তাহার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সে সকল বিষয় পরে আলোচিত হইয়াছে।

বিবাদ-সম্পর্কীয় পরোক্ষাদি বিবিধ দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়া অতঃপর অর্থশাস্ত্রকার সাক্ষী বিষয়ক নিয়মাবলী বিবৃত করিয়াছেন। কোনও বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলেই

তদ্বীমাংশার্থ রাজার নিকট আবেদন করিতে হয়। প্রথম আবেদন, সাক্ষি-ব্যবস্থা দ্বিতীয় বিবাদীর বা প্রত্যর্থীর উত্তর, তৃতীয় সাক্ষ্যাদির দ্বারা প্রমাণ, চতুর্থ

সিদ্ধি—বিবাদ বিষয়ে প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্রের ইহাই ব্যবস্থা। * বিবাদ সপ্রমাণ করিতে হইলে সাক্ষীর প্রয়োজন। যদ্যপি স্মৃতি-শাস্ত্রে তাই সাক্ষী সংক্রান্ত বিস্তৃত বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সে সকল বিষয় পরবর্তী অংশে আলোচিত হইবে। প্রথমতঃ অর্থশাস্ত্রোক্ত সাক্ষী প্রকরণের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। স্মৃতিাদির ন্যায় অর্থশাস্ত্রেও গুপ্তচর-নিয়োগে বিবাদের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা আছে। গুপ্তচরগণ বিবাদের যথার্থ্য নির্ণয় জন্য নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিচারকগণের নিকট তাহা বিবৃত করিতেন। কোটিল্য প্রণীত অর্থ-শাস্ত্রের ‘বিবাদপদনিবন্ধে’ এ বিষয় নিম্নরূপ উক্ত হইয়াছে; যথা,—

“পূর্বোক্তরার্থব্যাপ্তিতে সাক্ষিবক্তব্য কারণে চারহস্তাচ্চ নিম্পাতে প্রদেষ্টব্যঃ পরাজয়ঃ।”

কিন্তু এই চারগণের প্রদত্ত বিবরণ গ্রহণের বা প্রত্যাখ্যানের বিষয় বিচারকগণ বিবেচনা পূর্বক নির্ধারণ করিতেন। যেখানে সাক্ষীদিগের বিবরণ পরস্পর-বিরোধী এবং সামঞ্জস্য-বিহীন—বাদীর বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ অনৈক্য; বিশেষতঃ যেখানে সাক্ষীর ও বাদীর বর্ণনার সহিত গুপ্তচরের বর্ণনার অমিল দৃষ্ট হইবে;—সেই সকল স্থলে বিচারকগণ বিশেষ বিবেচনার সহিত গুপ্তচরগণের সংগৃহীত তথ্য গ্রহণ করিবেন। বিচার-বিভাগে ঘটিলে বিচারকগণও দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। সেই জন্য গুপ্তচরগণের প্রদত্ত বিবরণ বিশেষ বিবেচনার সহিত বিচার করিবার ব্যবস্থা ছিল। তাই প্রথমতঃ গুপ্তচরগণের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনের বিষয় অর্থশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রথমে বিবাদ বিষয়ে তাহাদের প্রদত্ত বিবরণ অসত্য বলিয়া মনে করিয়া লওয়া হইত। পরে ক্রমে তাহার বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করা অর্থশাস্ত্রের বিধি ছিল। অর্থশাস্ত্র-মতে বাদী যদি তাহার অভিযোগ প্রমাণের জন্য সাক্ষী উপস্থিত

* যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্যবহারের এই চতুস্তম্ভ—ভাষা, পক্ষ, প্রতিপ্রমাণ এবং সিদ্ধি বা তদ্বিপরীত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,—

“প্রত্যর্থিনোৎপ্রতো লেখাং যথাবৈদিতমর্থিনা।

ঐত্যাংস্তোত্তরং লেখাং পূর্বাবৈদকসমিধো। ততোর্থী লেখয়েৎ সত্ত্বঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসামনস্।

তৎসিদ্ধৌ সিদ্ধিমাশ্চোতি বীপরীতমতোচ্ছত্থা। চতুস্তম্ভাবহারোহয়ং বিবাদেযুপদর্শিতঃ।”

‘অর্থী বাহা নিবেদন করিয়াছে, প্রত্যর্থীর সমক্ষে বিচারক ঠিক তাহাই লিখিবেন’—এইরূপে প্রথম ভাষাপাদ। ভাষার্থ গ্রহণ করিবার পর প্রতিবাদী বাহা বলিবে, বাদীর সমক্ষে তৎসমস্ত লেখাইতে হইবে। এইরূপে দ্বিতীয় উত্তর পাদ। বাদী তৎকণাৎ আত্মপক্ষের প্রমাণ লিখাইবে; এইরূপে তৃতীয়—ক্রিমাপাদ। প্রমাণ ঠিক হইলে, জয়লাভ অথবা তদ্বিপরীত ফল। ব্যবহারের এই চতুর্বিধ সাধ্যাসিদ্ধিগদ উক্ত হইয়াছে। অধুনা বিচারালয়-সমূহে এই পদ্ধতিই অনুসৃত হইয়া থাকে। ব্যবহারের চারি পাদ অধুনা আরজী (Plaint), জবাব (Written Statement), প্রমাণ (Proof), রায় কয়দালা (Judgment) নামে উক্ত হয়। বিবাদ প্রমাণ করিবার জন্য পূর্বক সাক্ষী প্রভৃতি গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল, এখনও আছে। যদ্যপি স্মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া আর সকল স্মৃতিতেই এই সাক্ষ্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

করিতে না পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার মকদ্দমা নষ্ট হইত না । তবে সে সকল মকদ্দমার প্রকারভেদ আছে । যে স্থলে মজুর কাজ করিয়া তাহার বেতন পাইত না, সেস্থলে যদি সেই দাস বা মজুরের কোনও সাক্ষী না থাকিত, তাহা হইলেও তাহার মকদ্দমায় সিদ্ধিলাভ হইত । * মনুসংহিতায় সাক্ষী বিষয়ক একটা বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে । বিচারালয়ে ক্রুরূপ

সংহিতা-মতে
সাক্ষিপ্রকরণ।

সাক্ষী প্রদান করিতে হইবে, সাক্ষী ক্রুরূপ প্রকৃতির হওয়া আবশ্যক,

সেখানে তাহার বিশেষ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে । সে মতে, অভি-

যোক্তাকে সাক্ষী, লেখ্য (দলিলাদি) বা অস্ত্র প্রমাণ বিচারালয়ে

উপস্থিত করিতে হইত । অপিচ, বিবাদী যদি দাবী অস্বীকার করে, তাহা হইলে তিন জন উত্তমর্ণ সাক্ষীর দ্বারা বাদী তাঁহার দাবীর বিষয় সপ্রমাণ করিবেন,—মনু তাহা বলিয়া গিয়াছেন । অর্থশাস্ত্রেও উভয় পক্ষের অনুমোদিত তিন জন সাক্ষীর বিষয় (অনুমতাঃ, প্রাত্যয়িকা ও শূচয়ঃ) উল্লিখিত হইয়াছে । অর্থশাস্ত্র-মতে ঋণ-বিষয়ে দুই জন সাক্ষীই যথেষ্ট । যথা,—“প্রাত্যয়িকাশূচয়োহনুমতা বা ত্রয়োহবরাথ্যাঃ পক্ষানুমতৌ বা দ্বৌ ঋণং প্রতি ন চেবৈকঃ ।” কিন্তু এক জন সাক্ষী সর্বত্র অগ্রাহ্য । সংহিতা-মতে কৃতদার, পুত্রবান এবং একদেশনিবাসী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র জাতীয় সাক্ষী মান্য করার বিধি । ঋণ-সংক্রান্ত বিবাদেই এইরূপ ব্যবস্থা । তবে অনাপৎকালে অর্থাৎ স্ত্রের দণ্ডাদি ফৌজদারী সংক্রান্ত ব্যবহারে যে কোনও সাক্ষী মান্য করার বিষয় মনু বলিয়া গিয়াছেন ; যথা,—

“পৃষ্ঠোহপব্যয়মানস্ত কৃতাবস্থৌ ধনৈষিণা । দ্রাবরৈঃ সাক্ষিভির্ভাব্যো নৃপ ব্রাহ্মণসমিধৌ ॥

যাদৃশী ধনিভিঃ কার্য্যা ব্যবহারেষু সাক্ষিণঃ । তাদৃশান্ সংপ্রবক্ষ্যামি যথা বাচ্যমৃতঞ্চ তৈঃ ॥

গৃহিণঃ পুত্রিণো মৌলাঃ ক্ষত্রবিশূদ্রযোনয়ঃ । অখ্যুক্তা সাক্ষ্যমর্হন্তি ন যে কেচিদনাপদি ॥”

সকল বর্ণের মধ্যেই যাহারা সত্যবাদী, যাহাদের কর্তব্য জ্ঞান আছে এবং যাহারা অলুপ্ত, তাহাদিগকে সাক্ষী মান্য করা যায় । কিন্তু ইহার বিপরীত-গুণাবলম্বী হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা মনু প্রদান করিয়াছেন । তাঁহার মতে, যাহাদেব সহিত অর্থদ্বন্দ্ব আছে, যাহারা মিত্র, যাহারা সাহায্যকারী ভৃত্যাদি, যাহারা ক্রুরস্বভাবসম্পন্ন, এবং যাহারা ব্যাধিগ্রস্ত ও অস্ত্র দোষ দুষ্ট;—তাহাদের সাক্ষী বিচারক গ্রহণ করিবেন না ।

রাজা, কারুজীবী, স্থপকার, নট, বহুবেদজ্ঞ, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী, দাস, দম্ভা, বৃদ্ধ, শিশু, নীচজাতি, অন্ধ-খণ্ডাদি বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তি, আর্ত, মত্ত, উন্মত্ত, ক্রুদ্ধ, তন্দুর, জীলোক প্রভৃতিও মনুর মতে সাক্ষ্য-প্রদানের অধিকারী নহেন । এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি ; যথা,—

“আপ্তাঃ সর্কেষু বর্ণেষু কুর্য্যাঃ কার্য্যেষু সাক্ষিণঃ । সর্কধর্মবিদোহলুকা বিপরীতাংশু বর্জয়েৎ ॥

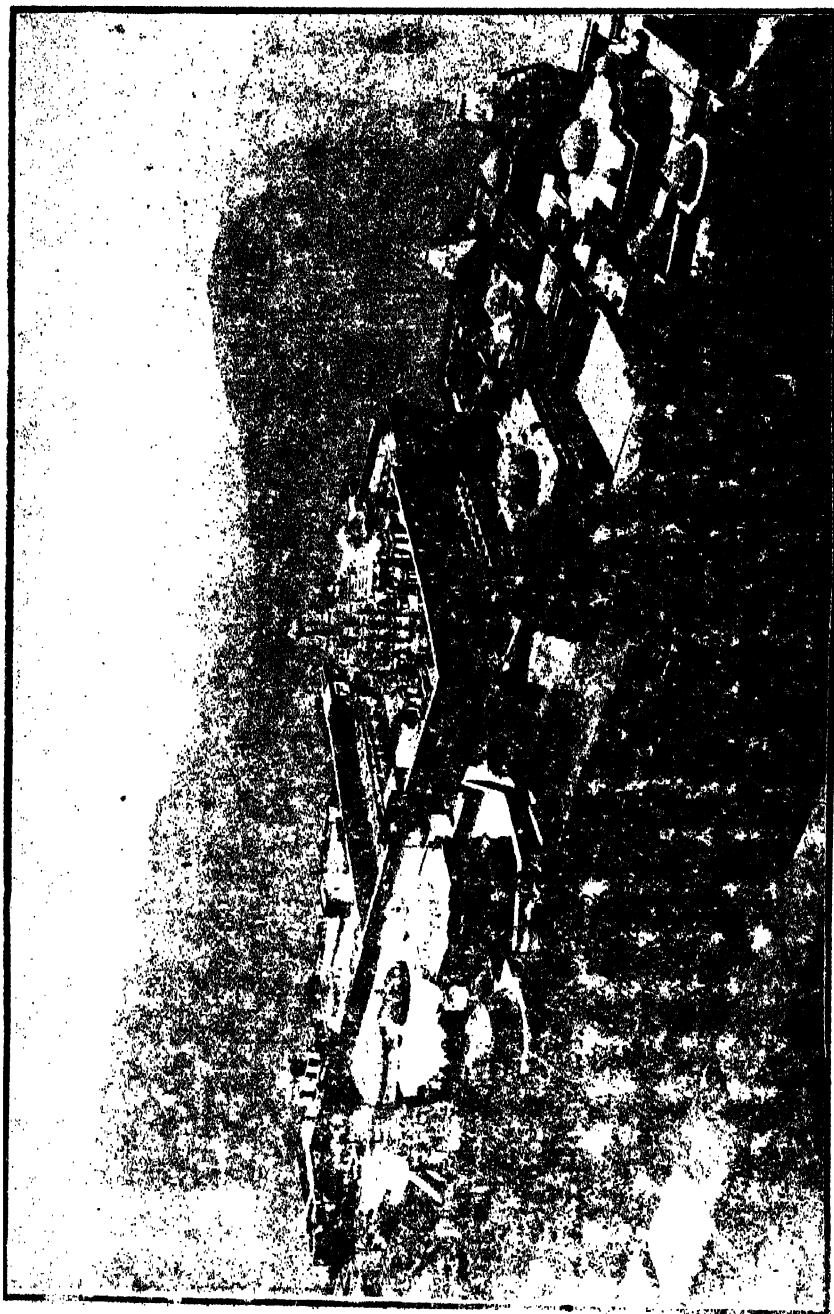
নার্ধদ্বন্ধিনো নাপ্তা ন সহায় ন বৈরিণঃ । ন দৃষ্টদোষাঃ কর্তব্য ন ব্যাখ্যাত্তা ন দূষিতাঃ ॥

ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্য্যা ন কারুককুশীলবৌ । ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙ্গস্থো ন সঙ্গতো বিনির্গতঃ ॥

নাবাধীনো ন বক্তব্যো ন দম্ভ্যন বিকর্ষকৃৎ । ন বুদ্ধো ন শিশুনৈকো নাস্ত্যো ন বিকলেন্দ্রিয়ঃ ॥

নাস্তো ন মন্তো নোন্মত্তো ন ক্ষুভৃক্ষোপপীড়িতঃ । ন প্রমার্ত্তো ন কামার্ত্তো ন ক্রুদ্ধো নাপি তন্দুরঃ ॥”

* এখনকার দিনে সাক্ষী ভিন্ন প্রায়ই মকদ্দমা চলে না । এমন কি, রেজিস্টারীকৃত দলিলাদিও সাক্ষীর দ্বারা সপ্রমাণ করাইতে হয় ।



গির্গরি-পর্বতের জৈন-মন্দির।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়ও অমুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। তিনিও তপঃনিষ্ঠ সৎশজাত সত্যবাদী পুত্রবান সম্পত্তিশালী তিন জন সাক্ষী বিবাদ-প্রমাণার্থ বিচারালয়ে উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার মতে, স্ত্রী, বালক, কিতব, সন্ন্যাসী, বিকলেন্দ্রিয় প্রভৃতির সাক্ষী ব্যবহার-প্রমাণে অগ্রাহ্য। নিম্নে ‘যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার’ (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬৯ম—৭৩ম শ্লোক) উক্তি উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

“তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ । ধর্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনাধিতাঃ ॥

দ্রাবরাঃ সাক্ষিণো জ্ঞেয়াঃ শ্রোতস্মার্তক্রিয়ারতাঃ । যথাজ্ঞাতি যথাবর্ণং সর্বে সর্বেষু বা স্মৃতাঃ ॥

শ্রোত্রিয়ান্তাপসা বৃদ্ধা যে চ প্রব্রজিতাদয়ঃ । অসাক্ষিণন্তে বচনান্নাজ্ঞ হেতুরুদাদাতঃ ॥

স্ত্রীবৃদ্ধবালকিতবমত্তোন্নতাভিশস্তকাঃ । রজাবতারিপাষণ্ডিকুটকুরিকলেন্দ্রিয়াঃ ॥”

পতিতাপ্তার্থসম্বন্ধিসহায়রিপুতস্করাঃ । সাহসী দৃষ্টদোষশ্চ নিকটাত্মাসাক্ষিণঃ ॥”

যাজ্ঞবল্ক্যে সর্বণ ও স্বজাতি সাক্ষীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে,—উদ্ধৃত শ্লোক কয়টা হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। স্বজাতি বা সর্বণ সাক্ষী না মিলিলে সকল বর্ণীয় ব্যক্তিই সকল জাতীয় ও সকল বর্ণীয় সাক্ষী মাত্র করিতে পারেন—যাজ্ঞবল্ক্য তাহার ব্যবস্থা দিয়াছেন। গোতম-সংহিতায় এ বিষয়ে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না। নিজ কর্মে অমান্দিত, রাজার বিশাস্ত, পক্ষপাতশূন্য ও দ্বেষ-বর্জিত শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই সাক্ষী হইতে পারে,—গোতম তাহার স্পষ্ট ব্যবস্থা দিয়াছেন। বহু সাক্ষীর বিষয়ও তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গোতমের উক্তি হইতে বুঝা যায়, শূদ্রদিগের উল্লিখিত গুণপরম্পরা না থাকিলে তাঁহারা সাক্ষী হইতে পারিতেন না। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, দ্বিজাতি-গণের সাক্ষ্যই প্রামাণ্য ছিল। তবে গোতমে সাক্ষি-বিষয়ে একটা বিশেষ ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। গোতমের মতে, যিনি কোনও পক্ষেরই মানিত সাক্ষী নহেন, তিনি যদি রাজা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হন, তাহা হইলে তিনিও সাক্ষি-মধ্যে গণ্য হইবেন। এতদ্ব্যতীত অমানিত অমুরূপ ব্যক্তিও, গোতমের মতে, সাক্ষী দিতে পারিতেন না। * মন্বাদির ত্রায় বিষ্ণু-সংহিতায় সাক্ষী ও অসাক্ষী সম্বন্ধে এ সুদীর্ঘ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। “অথ সাক্ষিণঃ”—এইরূপ আরম্ভ করিয়া, বিষ্ণু (বিষ্ণু-সংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ১ম—৩য় শ্লোক, দ্রষ্টব্য) বলিতেছেন,—

“ন রাজশ্রোত্রিয়প্রব্রজিতকিতবতস্করপরাদীনস্ত্রীবালসাহসিকাতিবৃদ্ধমত্তোন্নতাভিশ-

স্তপতিতক্ষুত্বার্তব্যসনিরাগাদ্ভাঃ ॥ ২ ॥ রিপুমিত্রার্থসম্বন্ধিবিকর্মদৃষ্টদোষসহায়শ্চ ॥”

গোতম অমানিত অজিজ্ঞাসিত সাক্ষীকেও সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ সাক্ষীকে অসাক্ষী পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বলিয়াছেন,—“অনিদৃষ্টস্ত সাক্ষিণে যশ্চাপেত্য ক্রমাৎ । একশ্চাসাক্ষী ॥” এতদ্ব্যতীত একজন সাক্ষীর বাক্যও অগ্রাহ্য। বিষ্ণুও গোতমের ত্রায় একাধিক বা বহু সাক্ষীর ব্যবস্থা দিলেন। বিষ্ণু-সংহিতা-মতে সৎশজাত, সচ্চরিত্র, ধনবান, যজ্ঞশীল, তপঃনিষ্ঠ, পুত্রবান, ধার্মিক, অদাতবেদ, সত্যবাদী ও ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধ

* আধুনিক বিচার-আমলে অমানিত সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালত গ্রাহ্য করেন না। উভয় পক্ষকেই এখন পূর্ব হইতে সাক্ষীদিগের নামধামাদি সম্বলিত দরখাস্ত বিচারকের নিকট দাখিল করিতে হয়। এতদ্বিত্ত উপস্থিত-ক্ষেত্রে কোনও অমানিত ব্যক্তি সাক্ষী দিতে পারেন না। তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সে বিষয় পরে উল্লিখিত হইবে।

(তর্কশাস্ত্র, স্বাক্ষরসামবেদ ও কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদি বিষয়ক শাস্ত্র—এই সকল বিষয়ে পারদর্শী) ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। এ বিষয়ে বিষ্ণুসংহিতার উক্তি; যথা,—

“অথ সাক্ষিণঃ ॥ ৭ ॥ কুলজা বৃত্তিবিরসম্পন্ন্য যজ্ঞানন্তপশ্বিনঃ পুত্রিণো ধর্মজ্ঞা অধীরাণাঃ

সত্যবস্ত্রৈবিত্তবৃদ্ধাশ্চ ॥ ৮ ॥ অভিহিতগুণসম্পন্ন উভয়ানুমত একোহপি ॥ ৯ ॥”

এইরূপ গুণসম্পন্ন উভয় পক্ষের মানিত এক ব্যক্তিও বিষ্ণু-সংহিতার মতে সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। ইহাই হইল সাধারণ বিধি। কিন্তু বাক্যপাক্ষ্য (গালি-গালাজ), দণ্ডপাক্ষ্য (আঘাতাদি মারপিট), চৌর্য্য, সাহস (দস্যুতা প্রভৃতি), সংগ্রহণ (পরদ্রোহরণ) প্রভৃতি ফৌজদারী-সংক্রান্ত ব্যবহারে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। বিষ্ণুর মতে, এই সকল বিচারে সাক্ষীর গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; অর্থাৎ—এই সকল বিষয়ে সকল জাতীয় ও সকল বর্ণীয় সাক্ষীই বিচারালয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যথা,—

“স্তেয়সাহসবাগদণ্ডপাক্ষ্যসংগ্রহণেষু সাক্ষিণো ন পরীক্ষ্যন্তাঃ।” উভয় পক্ষের মানিত এক সাক্ষীর বিষয়ে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য এক মত। ফৌজদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে সাক্ষীর গুণাগুণ পরীক্ষার অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও মনুতে ও যাজ্ঞবল্ক্যে একই উক্তি দৃষ্ট হয়। যথা,—“সাহসেযু চ সর্কেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ। বাগদণ্ডেযাশ্চ পাক্ষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ॥” মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সাক্ষীর অধিকার বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, অর্থশাস্ত্রে তাহার অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। কোন্ ব্যক্তি সাক্ষী দিবার অধিকারী, কোন্ ব্যক্তি অধিকারী নহে এবং কিরূপ সাক্ষীর প্রমাণ বিচারকের গ্রহণীয় হইবে, তৎসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে একটা বিস্তৃত বিবরণ বিধিবদ্ধ আছে। তাহাও স্বত্বাদির অনুরূপ। অর্থশাস্ত্র মতে, ‘বাহারা সহায়, বাহারা আবদ্ধ বা বন্দী, বাহারা খাতক অর্থাৎ ‘ধনী’, বাহারা অর্থসম্বন্ধে অর্থীর সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত, বাহারা বৈরী, বাহারা ব্রজ অর্থাৎ অন্নদাস, বাহারা ধৃতদণ্ড অর্থাৎ শাস্তিপ্রাপ্ত,—তাহারা সাক্ষী দিবার অধিকারী নহে। এতদ্ব্যতীত, রাজা, শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদপারগ, গ্রামভূত অর্থাৎ ভিকার-জীবী, কুটি ও ত্রীণী অর্থাৎ কুষ্ঠ ও ক্ষত-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি, পতিত অর্থাৎ সমাজ হইতে বিতারিত ব্যক্তি, চণ্ডাল, অহংবাদী, জীলোক, রাজপুরুষ বা রাজ-কর্মচারী, শূদ্র (শালক) বা স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তি—অর্থশাস্ত্র মতে, ইহারা কেহই বিচারালয়ে সাক্ষী দিবার অধিকারী নহেন। তবে, পাক্ষ্য, স্তেয় ও সংগ্রহণ প্রভৃতি ফৌজদারী-সংক্রান্ত বিবাদে দ্রো-সম্পর্কিত ব্যক্তি ও সহায় সকলেই সাক্ষ্য দিতে পারেন। ফৌজদারী সংক্রান্ত ব্যবহারে সাক্ষীর অনধিকার অধিকার বিচারের আবশ্যকতা নাই,—অর্থশাস্ত্রকার সে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। অপিচ, স্ত্রী হউন বা পুরুষ হউন, বাহারা বিবাদীয় বিষয় অবগত আছেন, উল্লিখিত স্তেয়-পাক্ষ্যাদি বিবাদে তাহারা সকলেই সাক্ষ্য দিবার অধিকারী। কেবল-মাত্র রাজা ও তাপস—এই নিয়মের বহির্ভূত। আধুনিক কালেও রাজা সাক্ষী-শ্রেণীভুক্ত হন না। তবে রাজকর্মচারিগণ এবং রাজ-ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ—আবশ্যক অনুসারে সকলেরই বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিবার ব্যবস্থা অধুনা প্রচলিত আছে। *

* ইংরেজ-রাজ-প্রবর্তিত বিধানের এ সকল বিষয় দৃষ্ট হয়। সাক্ষীর গুণাগুণ সম্বন্ধে ‘সাক্ষী বিষয়ক আইনে’ স্পষ্টতঃ লিখিত আছে,—“All persons shall be competent to testify unless the Court con-

বিচারালয়ে বিচারকের সম্মুখে দণ্ডারমান হইয়া সাক্ষ্য দিবার পদ্ধতি যেমন আধুনিক-কালে বিহিত আছে ; সে পদ্ধতি প্রাচীনকালেও সেইরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল । মরাদি সংহিতায় সে বিধি দৃষ্ট হয় । তার পর সাক্ষীদিগের সত্যপাঠের ব্যবস্থা । আধুনিক-কালে সত্য-পাঠ । এবং প্রাচীন-কালে একইরূপ বিধানের পরিচয় পাই । অর্থশাস্ত্রেও সে ব্যবস্থা আছে । বিচারকের সম্মুখে ‘কাঠগড়ার’ দাঁড়াইয়া এখন যেমন সাক্ষীদিগকে বলিতে হয়,—“আমি যাহা বলিব, সকলই সত্য হইবে ; সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না” ; প্রাচীন-কালের ব্যবহার-বিধানে শাস্ত্রাদিতে তদন্তরূপ বিধি বিধিবদ্ধ আছে । তবে অধুনা-প্রচলিত প্রথার সহিত তুলনায় প্রাচীনকালের পদ্ধতিতে একটু প্রকারভেদ দৃষ্ট হয় । এখন জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই একরূপ সত্যে আবদ্ধ করা হয় । কিন্তু প্রাচীনকালের পদ্ধতি সেরূপ নহে । তখন বিভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন সত্যে আবদ্ধ হইতে হইত । প্রথমে ব্রাহ্মণ, তৎপরে ক্ষত্রিয়, তাহার পর বৈশ্য এবং সর্বশেষে শূদ্র সত্যে আবদ্ধ হইতেন । এইরূপ ক্রমপর্যায়েরই সাক্ষ্য গৃহীত হইবার নিয়ম ছিল । অর্থশাস্ত্র-গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভেদে বিভিন্ন প্রকার সত্যপাঠের বিষয় উক্ত হইয়াছে । ব্রাহ্মণ, উদকুস্ত ও অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া সত্যপাঠ করিবেন,—এইরূপ ব্যবস্থা ছিল । ব্রাহ্মণ সাক্ষী হইলে তাঁহাকে বলা হইত,—‘আপনি সত্য বলুন ।’ ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যের সত্যপাঠ অন্ত্র, যথা,—‘বদি তোমার সাক্ষী মিথ্যা হয়, তাহা হইলে তোমার অর্জিত পুণ্য নষ্ট হইয়া যাইবে । নরকপাল-নির্মিত ভিক্ষাপাত্র হস্তে তোমাকে তোমার শত্রুর নিকট ভিক্ষা-প্রার্থনা করিতে হইবে ।’ শূদ্রকে বলা হইত,—‘মিথ্যা কথা বলিলে তোমার সকল ধর্ম নষ্ট হইবে ; তোমার মৃত্যুর পর রাজা তোমার অর্জিত সকল পুণ্যের ফলভাগী হইবেন ; রাজার পাণের ভাগ তুমি গ্রহণ করিবে । অদিকন্তু তোমার প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান হইবে ।’ এইরূপে সত্যাবদ্ধের পর বিরোধীয় বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষীদিগের বক্তব্য শ্রবণের ব্যবস্থা । উপস্থিত বিবাদ সম্বন্ধে সাক্ষীগণ কি দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার বিধান অর্থ-শাস্ত্রকার প্রদান করিয়া গিয়াছেন । এ বিষয়ে অর্থ-শাস্ত্রের উক্তি ; যথা,—

“ব্রাহ্মণোদকুস্তাগ্নিসকাশে সাক্ষিণঃ পরিগৃহীয়াৎ । তত্র ব্রাহ্মণং ক্রয়াৎ ‘সত্যং ক্রহীতি’ ; রাজত্বং বৈশ্যঃ বা ‘মা তবৈষ্টাপূর্তফলং কপালহস্তমশ্রবলং ভিক্ষার্থী গচ্ছে’রিতি । শূদ্রজন্ম ‘মরণান্তরে যদ্বঃ পুণ্যফলং তদ্রাজানং গচ্ছেৎ । রাজশ্চ কিঞ্চিৎ যুয্মান্ অত্রথাবাদে দণ্ডশ্চাস্তবদ্ধঃ । পশ্চাদপি জ্বায়েৎ যথাদৃষ্টপ্রতন ।”

siders that they are prevented from understanding the questions put to them or to give rational answers to those questions, by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind.” Vide, *Indian Evidence Act*, Section. 118. বাক্শক্তিবিহীন সাক্ষী এ বিধানে সাক্ষ্য দিবার উপযুক্ত । যুখে বলিবার ক্ষমতা না থাকিলে সে লিখিয়া সাক্ষ্য দিবার অধিকারী । ভারতীয় সাক্ষী বিধয়ক আইনে এ বিষয় বিধিবদ্ধ আছে ; যথা,—“A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing, or by sign ; but such writing must be written or the signs made, in open court. Evidence so given shall be deemed to be oral evidence.—Section 119.

এই সত্যপাঠ প্রসঙ্গে মহৎসংহিতায় নিম্নরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। মহু (অষ্টম অধ্যায়) বলিয়াছেন,—
 “দেবব্রাহ্মণগান্ধিযে সাক্ষ্যং পৃচ্ছেদ্বৃতং দ্বিজান্। উদযুথান্ প্রাযুথান্ বা পূর্ক্সাহ্নে বৈ শুচিঃ শুচীন্ ॥
 ক্রহীতি ব্রাহ্মণং পৃচ্ছেৎ সত্যং ক্রহীতি পাণিবম্। গোবীজকাক্ষননৈবৈশ্রং শূদ্রং সর্কৈস্ত পাতকৈঃ ॥
 ব্রহ্ময়ে যে স্তুতা লোক! যে চ জীবালবাতিনঃ। মিত্রক্রহঃ কৃতম্ভু তে তে স্ম্যক্রবতো মৃষা ॥
 জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যং ভদ্র ভয়া কৃতম্। তৎ তে সর্কঃ শুনো গচ্ছেদযদি ক্রয়াস্বমত্থা ॥”
 অর্থাৎ,—প্রাড়বিবাক শুচি হইয়া পূর্ক্সাহ্নকালে দেবতা-প্রতিমা-সন্নিধানে অথবা ব্রাহ্মণ-
 সমীপে শুচি দ্বিজগণকে সাক্ষ্য প্রদান জিজ্ঞাসা করিবেন। সেই সাক্ষীর সে সময়ে উত্তর বা
 পূর্ক্সদিকে মুখ করিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণগণকে ‘বল’, ক্ষত্রিয়কে ‘সত্য’ করিয়া বল’, বৈশ্যকে
 ‘গো বীজ ও শূবর্ণ দ্বারা শপথ করিয়া বল’ ও শূদ্রকে ‘সমুদয় পাতকের দ্বারা শপথ করিয়া
 বল’—বর্ণবিশেষে প্রাড়বিবাক সাক্ষীদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন। ব্রাহ্মণ-হস্তা, বালক-
 হস্তা, মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্নের যে যে লোক প্রাপ্তি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা
 বলিলে সেই সেই লোক প্রাপ্তি হয়। হে ভদ্র! জন্মাবধি তুমি যে কিছু পুণ্য অর্জন
 করিয়াছ, সে সমুদয় পুণ্য কুকুরে গমন করিবে, যদি তুমি সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বল। ইত্যাদি।
 মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও এইরূপ দিব্যের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দিব্য-
 প্রকরণে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বিষ্ণু-সংহিতায়ও (অষ্টম অধ্যায়) সাক্ষীদিগের
 দিব্য সম্বন্ধে অমুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সাক্ষীগণ যদি ধর্ম্মঘট করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে
 সত্য কথা ব্যক্ত না বলে, তাহা হইলে, অর্থশাস্ত্র মতে, সেই সকল সাক্ষীর বার পণ
 অর্গদণ্ড হইবে। অপিচ, তাহার। যদি এক পক্ষের মধ্যে বিচারালয়ে উপস্থিত না হয়,
 তাহা হইলে দাবীকৃত বিষয় সাক্ষীদিগের নিকট আদায় লইবার ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রকার
 প্রদান করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য এই দিন-পরিমাণের কিছু আধিক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু
 মনুতে এ বিষয়ের বিশেষ কোনও উল্লেখ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—যট্চত্বারিংশ
 দিবস মধ্যে যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান না করে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে
 স্তন্যসমেত দাবী আদায় করা বাইতে পারিবে।

কোন পক্ষের সাক্ষী প্রথম গ্রহণযোগ্য, প্রথমে কোন পক্ষকে বিবাদ সপ্রমাণ করিতে
 হইবে,—তাহা বিচার্য্য। ভাবার্থ শ্রবণের পর প্রতিবাদী বাহা বলিবে, তৎসমস্ত বাদীর

সম্মুখে লেখ্য। অনন্তর সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা বাদী আত্মপক্ষ স-প্রমাণ
 করিবেন। এস্থলে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে,—প্রতিবাদীর স-প্রমাণ

উত্তর লেখনের পর, বাদী আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে; না,—বাদীর
 ভাব্য ভায় কেবলমাত্র প্রতিবাদীর উত্তর-লেখনের পর, সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা বাদী আত্ম-
 পক্ষ সমর্থন করিবে? এই সন্দেহ-নিরসনার্থ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—“সাক্ষিবৃত্তয়তঃ
 সংস্র সাক্ষিণঃ পূর্ক্সবাদিনঃ। পূর্ক্সপক্ষেধরীভূতে ভবন্ত্যত্তরবাদিনঃ।” অর্থাৎ,—উভয় পক্ষের
 সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে, প্রথম বাদীর সাক্ষীগণকে জিজ্ঞাসা করিবে; কিন্তু বাদীর পক্ষ
 দুর্ব্বল হইলে, প্রতিবাদীর সাক্ষীগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে। বিষ্ণুও ঐরূপ ব্যবস্থা।
 তিনি বলিয়াছেন,—“বরোর্কিবদমানরোর্যস্য পূর্ক্সবাদন্তস্য সাক্ষিণঃ প্রেটব্যঃ। আধর্য্যঃ

কার্যবশাদ্বয় পূর্নপক্ষস্য ভবেৎ তত্রপ্রতিবাদিনোহপি ॥” বিবাদকারী দুই পক্ষের মধ্যে যাহার পূর্নবাদ অর্থাৎ যে বাদী, তাহার সাক্ষিগণকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে । আর কার্যবশতঃ যেখানে পূর্নপক্ষের হীনতা হয়, সেখানে প্রতিবাদীর সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিবে । মিতাক্ষরায়ও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় । মিতাক্ষরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝান হইয়াছে । সে মতে, উভয় পক্ষের সাক্ষিগণ উপস্থিত থাকিলে যিনি বলিতেছেন, ‘এতকাল পূর্বে আমাকে অমুকে ইহা দান করিয়াছে, এতদিন আমি ইহা ভোগ করিয়া আসিতেছি’—তাঁহার সাক্ষিগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে । আবার, অপর ব্যক্তি বা প্রতিপক্ষ যদি পূর্বেই বলিয়া থাকেন যে, ‘পূর্বে এ সম্পত্তি বিবাদীর ছিল, এক্ষণে এই কারণে আমার হইয়াছে ; তাহা হইলে এই ব্যক্তির সাক্ষিগণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে, অর্থাৎ পূর্ন-পক্ষ তাহার বক্তব্য প্রমাণ করিলে পর উত্তর-পক্ষের সাক্ষী লইবার নিয়ম । মহর্ষি নারদের মত এই সকল মতের সহিত অভিন্ন । তবে এ সকল বিষয়ে সংহিতামতে পক্ষাভাষ, নিহুব, প্রত্যবন্ধনন, প্রোক্ত্যয় প্রভৃতির বিচার করা আবশ্যিক । পক্ষাভাষের বিষয় একমাত্র যাজ্ঞবল্ক্যই দেখিতে পাওয়া যায় । যে সকল ভাষা (আরজী বা অভিযোগের বিষয়) ভাষাবৎ প্রতীয়মান হইলেও উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাষা নহে, তাহাই পক্ষাভাষ । যাজ্ঞবল্ক্য-মতে পক্ষাভাষ ছয় প্রকার ; যথা,—“অপ্রসিদ্ধং নিরাবাহং নিরর্থং নিপ্রয়োজনং । অসাধ্য বা বিরুদ্ধং বা পক্ষাভাসং বিবজ্জয়েৎ ॥” প্রথম—অপ্রসিদ্ধ পক্ষাভাষ ; যেমন, রাম আমার আকাশ কুসুম লইয়াছে, দিতেছে না । দ্বিতীয়—নিরাবাহ পক্ষাভাষ ; যেমন, আমার বরের দীপালোকে রাম কার্য করে । তৃতীয়—নিরর্থ পক্ষাভাষ, অর্থাৎ যাহার কোনও অর্থ হয় না ; যেমন, কডলুবচুনরিত, হরকরকম্ব ইত্যাদি । চতুর্থ—নিপ্রয়োজন পক্ষাভাষ ; যেমন, রাম আমার বাড়ীর নিকট অধ্যয়ন করে । পঞ্চম—অসাধ্য পক্ষাভাষ ; যেমন, শ্রাম আমাকে দেখিয়া হাসিয়াছিল । ষষ্ঠ—বিরুদ্ধ পক্ষাভাষ—যেমন, রাম আমাকে গালিগালাজ করিয়াছে । এই সকল পক্ষাভাষের বিষয় ব্যবহার আমলে আসিতে পারে না এবং ব্যবহারের বিষয় হয় না । সুতরাং বিচার-কালে বিচারক তৎপ্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিবেন । অন্তপক্ষে, প্রত্যর্থী যদি ‘নিহুব’ করে, অর্থাৎ অর্থীর দাবীকৃত সমস্ত বিষয় অস্বীকার করে, আর অর্থী যদি তাহার কিয়দংশ সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয় ; তাহা হইলে বিচারক অর্থীকে তাহার দাবীকৃত সমস্ত বিষয় প্রত্যর্থীকে দেওয়াইতে বাধ্য করিবেন । এ বিষয়ে বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়েই একমত । যাজ্ঞবল্ক্য (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭ম শ্লোক) যথা,—

“নিহুতে লিখিতং নৈকমেবদেশবিভাবিতঃ ।

দাপ্যঃ সর্বং নৃপেণার্থং ন গ্রাহস্বনিবেদিতঃ ॥”

অর্থাৎ,—‘প্রতিবাদী যদি বলে আমি কিছুই লই নাই, এমত স্থলে যদি অপলাপিত দ্রব্য সকলের মধ্যে অন্ততঃ একটা দ্রব্যও প্রতিবাদীর নিকট প্রাপ্য বলিয়া সপ্রমাণ হয় ; তাহা হইলে রাজা বাদীর লিখিত সকল বস্তুই প্রতিবাদীর নিকট হইতে দেওয়াইবেন । কিন্তু বাদী ভাষাকালে যে বস্তুর উল্লেখ করে নাই অথচ তৎপরে করিয়াছে, তাহা আর দেওয়া যাইবে না ।’ মহর্ষি বিষ্ণুও বলিয়াছেন,—“সর্বাংশাপ্যেক-

দেশবিত্তাভিত্তি সর্বং দত্তাৎ।” অর্থাৎ,—যে অধমর্গ সকল ঋণের অপলাপ করে, উত্তমর্গ তৎসমস্তের কিয়দংশের প্রমাণ করিলে, উত্তমর্গ-কথিত সমস্ত ঋণ অধমর্গ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবে।’ প্রত্যবন্ধনন সম্বন্ধে সংহিতা-শাস্ত্রে বিশেষ কিছু উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তবে প্রত্যবন্ধনন হইতে এই বুঝা যায় যে, দাবীকৃত বিষয় স্বীকার করিয়া, প্রত্যর্থী যুক্তিযুক্ত উত্তর দ্বারা আপনাকে দাবী হইতে মুক্ত করিতে পারে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। রামের পিতা শ্রামের নিকট হইতে ঋণ করিয়াছে। রামের পিতার মৃত্যু হওয়ায় শ্রাম, রামের নিকট হইতে পিতৃঋণ আদায়ের জন্ত নালিশ করিল। রাম যদি প্রমাণ করাইতে পারে যে, তাহার পিতা শ্রামের নিকট হইতে যে ঋণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত বটে; তবে উহা ‘মাস্কিক’ ঋণ বলিয়া রাম ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নয়; তাহা হইলে রামের এই উত্তর ‘প্রত্যবন্ধনন’ অভিধানে অঙ্গীকৃত হইতে পারে। কিন্তু রাম যদি তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে সে ঋণদায় হইতে মুক্ত হইবে না। অতঃপর ‘প্রাঙ্ন্যায়ের’ বিষয়। ইহা আধুনিক আইনের একটি বিশেষ বিধি। একবার যে বিরোধী বিষয় নিষ্পত্তি হইয়াছে, পুনরায় তদ্বিষয়ে বাদী আর বিবাদীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা উত্থাপন করিতে পারিবে না,—প্রাঙ্ন্যায়ের ইহাই তাৎপর্য। *

* প্রত্যবন্ধনন—ইংরেজী ভাষায় Admission and Avoidance বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রাঙ্ন্যায়—*Res Judicata* অর্থাৎ পূর্ব-মীমাংসিত বিষয়ে পুনরায় ব্যবহার-স্থাপনে নিষেধাদেশ। দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের (Civil Procedure Code) ১১শ ধারায় (Sec. ১১) আছে,—“No Court shall try any suit or issue in which the matter directly or substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finally decided by such Court.”

একবার বাহা মীমাংসিত হইয়াছে, পুনরায় সে সংক্রান্ত বিবাদ চলিবে না—প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারগণেরও ইহাই অভিমত। সে ব্যবস্থা-প্রসঙ্গে মহর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—

“নির্গীতে ব্যবহারে তু প্রমাণমফলা ভবেৎ। লিখিতং সাক্ষিগোবাপি পূর্বমাবেদিতং ন চেৎ।

যথা পক্ষে ধাত্তে নিক্ষল। প্রাবুযোত্তমাঃ। নির্গীতব্যবহারাণাং প্রমাণমফলা তথা।”

ব্যবহার একবার নির্গীত হইলে পুনরায় তৎসম্বন্ধে প্রমাণ-প্রয়োগ নিষ্ফল। সাক্ষি দ্বারা বা লেখ্য সাহায্যে পূর্ব-আবেদিত বিষয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা বার্থ হইয়া থাকে। যেমন বর্ধার জলবর্ষণ পক্ষ ধাত্তের কোনও উপকারে আসে না; ব্যবহার একবার নির্গীত হইয়া গেলে তৎসম্বন্ধে পুনরায় প্রমাণাদি প্রদানও সেইরূপ কলোপধায়ক হয় না। কিন্তু এ বিষয়ে একটি আপত্তির কথা উঠিতে পারে। সে আপত্তি—বিচারকালীন যে বিষয়ের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পক্ষগণের অনবধানতা-বশতঃ বিচারকালে তাহা উত্থাপিত হয় নাই; সে সকল বিষয়ে কি ব্যবস্থা বিহিত হইবে? শ্রাম রামের নিকট ৫০০ টাকা পাইত। কিন্তু সে যদি প্রথমে উহার আংশিক দাবী সম্বন্ধে ব্যবহার উপস্থিত করে, তাহা হইলে পরে সে তাহার অবশিষ্ট দাবী লইয়া মকদ্দমা স্থাপন করিতে পারিবে কি না। কিন্তু ব্যবহার-শাস্ত্র সকল কালেই সকল অবস্থায়ই বলিয়াছেন,—“ক্রিয়াঃ বলবতীঃ মুক্তাঃ দুর্জয়ঃ বোহবলবতে। স জয়েৎবধতে সৈভ্যঃ পুনস্তাং নানুস্তাং ক্রিয়াঃ।” অর্থাৎ,—কোনও অবস্থাতেই পূর্ব-মীমাংসিত বিষয়-সম্পর্কে পুনব্যবহার উপস্থিত হইতে পারিবে না। এই অনাধিকার বিষয়ে

অধীর ও প্রতারণার উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে উল্লিখিত বিষয় সকল বিচার করিবার বিধি-শাস্ত্রকারগণ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিচার-কালে উত্তরাদিরও দোষগুণ বিচার করা বিচারকগণের এক প্রধান কর্তব্য। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—‘অসন্ধিৎ, অনাকুল, অব্যাখ্যান, অগম্য প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইলে তাহা অসহৃত্তর মধ্যে পরিগণিত হইবে। এরূপ হইলে সে উত্তর গ্রহণীয় নহে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল। যথা,—

“পক্ষস্ত ব্যাপকং সারমসন্ধিমনাকুলম্। অব্যাখ্যানগম্যমেতত্তত্তরং তদ্বিদো বিহঃ॥

প্রস্ততাদন্নব্যাক্তং নূনাধিকমসঙ্গতং। অব্যাপ্যসারং সন্ধিৎ প্রতাপক্ষং ন লজ্বরেৎ ॥

সন্ধিমন্তং প্রকৃতাদন্নমিতি চ ভূরি চ। পক্ষৈকদেশব্যাপ্যেব তত্ত্ব নৈবোত্তরং ভবেৎ ॥

যদ্যস্তপদমব্যাপি নিগূঢ়ার্থং তথাহকুলম্। ব্যাখ্যাগম্যমসারঞ্চ নোত্তরং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥

পক্ষৈকদেশে যৎ সত্যমেকদেশে চ কারণং। মিথ্যাটেকদেশে স্ত্রাং সঙ্করাত্তদমুত্তরং ॥”

ভাষা সম্বন্ধে যেমন বিবিধ দোষ-গুণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, উত্তর সম্বন্ধেও তদনুরূপ

দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১১ ধারা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। ঐ ধারা বিষয়ে অপরাপর যে সকল মন্তব্য আছে। নিম্নে তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল। তাহাতে বিষয়টি বেশ বোধগম্য হইবে ; যথা—

Explanation I.—The expression ‘former suit’ shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto.

Explanation II.—The matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either decided or admitted expressly or impliedly by the other.

Explanation IV.—Any matter which might or ought to have been made ground of defence or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit.

Explanation V.—Any relief claimed in the plaint, which is not expressly granted by the decree, shall, for the purposes of this section, be deemed to have been refused.

কোনও কোনও বিষয়ে সংহিতা-শাস্ত্রে এ বিষয়ের ব্যতিক্রম দেখা যায়। গ্রামবৃদ্ধগণ বা কুলশ্রেণীকগণ যে বিচার করিতেন, সে সম্বন্ধে পুনর্কীর ব্যবহার উপস্থাপিত করিবার বিধি নারদ প্রদান করিয়াছেন। স্বয়ং রাজার বিচারেও এই ব্যবস্থা দেখা যায়। রাজার বিচার যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলে দাবীকৃত বিষয়ের দ্বিগুণ দণ্ড প্রদান করিবার অধীকারে পক্ষগণ মীমাংসিত বিষয়ে পুনরায় বিবাদ সংস্থাপন করিতে পারিতেন। আর একটী বিষয়ে পুনর্ব্যবহারের বিষয় শাস্ত্রাদিতে দৃষ্ট হয়। সেটী বিচারকের দোষে বা পক্ষপাতিতায় যদি কেহ পরাজিত হয়, আর পক্ষ যদি সেই দোষ সপ্রমাণ করে, তাহা হইলে সে বিষয় সম্পর্কে পুনর্বিচারের ব্যবস্থা শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়। তবে কোনও পক্ষ যদি আপনার দোষে পরাজিত হইত, তাহা হইলে তাহার উপস্থাপিত ব্যবহারের আর পুনর্বিচার চলিত না। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোক, মন্ত বা উন্নত, আর্জ, বাসনী, বালক প্রভৃতি কর্তৃক উপাদিত ব্যবহার বিচার আমলে আসা নিষিদ্ধ ছিল। এতদংশের উক্তি আপিল সত্রান্ত ব্যবহার স্ত্রায়। সাক্ষী প্রভৃতির দোষে কোনরূপ অবিচার হইয়াছে বলিয়া যদি পক্ষের মনে ধারণা হইত, আর পক্ষ যদি তাহা সপ্রমাণ করিতে পারিত, তাহা হইলেও পূর্বে নিষ্পন্ন বিষয়ের পুনর্বিচার হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বিবাদী বাদীর নামে প্রত্যভিযোগ (Cross case) উপস্থিত করিতে পারিত। সে বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অধুনা প্রচলিত ব্যবহার-শাস্ত্রেও তাহার বিধান আছে।

বিধি, শাস্ত্রকারগণ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা যেমন অর্থসংযুক্ত, পরিপূর্ণ, অনাকুল, স্পষ্ট, নিরলঙ্কার, অবিরুদ্ধ, অসম্বদ্ধ, নিশ্চিত ও প্রমাণযোগ্য হওয়া আবশ্যিক; উত্তরও সেইরূপ অর্থসংযুক্ত, প্রমাণযোগ্য, সঙ্গত ও অসন্দিগ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে নানাবিধ দোষসংযুক্ত উত্তর ধর্ম্মাধিকরণে গ্রহণীয় নহে। উত্তরে যে নানাবিধ দোষ সংক্রামিত হইতে পারে এবং তাহা দূরীকরণে অর্থীর ও প্রত্যর্থীর উভয়েরই যে চেষ্টা করা বিধেয়, শাস্ত্রকারগণ তাহা মুক্তকণ্ঠে কহিয়া গিয়াছেন। অতি প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ মন্বাদি সংহিতায় এ সকল বিষয়ে বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী সংহিতা প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। নারদাদি ঋষিগণের যে সকল বচন পরবর্ত্তী সংহিতা-সমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে ব্যবহার-শাস্ত্র-সম্পর্কীয় এ সকল বিষয় বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। সংহিতাকারগণ উত্তরের দোষ-প্রদর্শন-বাপদেশে বলিয়াছেন;—

“অত্ৰাথ মথহীনঞ্চ প্রমাণাগমবর্জিতম্। লেখ্যং হীনাধিকং ভ্রষ্টং ভাষাদোষাস্তদাহ্বত।

লক্ষ্যং যেন যদ্যস্ম্যং স তত্তস্মাদবাপ্নুয়াৎ। ন তু অত্ৰোক্তমথাহিতস্ম দিতাত্মার্থমিদং ত্রিধা ॥

মনসাপি ধ্যাতস্তন্মিত্রেণেহ শত্রুবাৎ। অতোহনয়া মহাক্ষান্তাত্মমিহাবৈদিতো ময়া ॥

দ্রব্যপ্রমাণহীনং যৎ পুলাকাশ্রয়বর্জিতম্। প্রমাণবর্জিতং নাম লেখ্যদোষং তমুশ্জয়েৎ ॥

আগমবর্জিতং দোষং পূর্ব্ববাদে বিসর্জয়েৎ।

বিন্দুমাত্রবিহীনা বা পদবর্ণবিহীনা বা। হীনাধিকা ভবেদ্বার্থা তং যত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥

ভ্রষ্টং তু দুঃখিতং যৎশ্রাজ্জলতৈলাদিভির্হিতম্। ভাষায়াং তদপি স্পষ্টং বিস্পষ্টার্থং বিসর্জয়েৎ ॥

সত্য ভাষা ন ভবতি যত্নপি স্যাৎ প্রতিষ্ঠিতা। বহিঃশব্দেভ্যঃ ধর্ম্মান্নিত্যাব্যবহারিকায়ং ॥

গন্ধমাদনসংস্থস্য মন্যাস্যাদাসীত্তদর্পিতম্। ব্যবহারিকধর্ম্মস্য বাহ্যমেতন্নসিধ্যতি ॥

অত্ৰাক্রনবিশেন অত্ৰাথ গমনেন চ। আকুলং চ ক্রিয়াদানং ক্রিয়া চৈবাকুলা ভবেৎ ॥”

পক্ষগণের বিবাদীয় বিষয় ভিন্ন উত্তরে অবাস্তব বিষয়ের সংযোজনা হইলে অথবা অর্থহীন বাক্যের সমাবেশ থাকিলে, সে উত্তর অপ্রমাণ্য—বিচারালয়ে গ্রহণযোগ্য নহে। প্রমাণযোগ্য বিষয়ের অসমাবেশেও উহা গ্রহণযোগ্য হয় না। দ্রব্যপরিমাণবিহীন অর্থ্যং দাবীকৃত বিষয়ের অসুস্পষ্ট, পুলাকাশ্রয়বর্জিত, প্রমাণবিরহিত লেখ্য পরিত্যজ্য। পরন্তু পূর্ব্ববাদে যদি শাস্ত্রবর্জিত দোষ-সমূহের সমাবেশ থাকে, তাহা হইলে তাহাও পরিত্যাগ করিবে। উত্তরকালীন যে সকল ভাষা প্রভৃতির ব্যবহার হয়, তাহা যদি বিন্দুমাত্রহীন, পদবর্ণবিহীন হয় এবং তাহাতে যদি হীনাধিক ও অর্থসংযুক্ত পদের ব্যবহার থাকে, তাহা হইলে তাহাও পরিবর্জ্যনীয়। জল-তৈলাদি হত, ভ্রষ্ট, বিস্পষ্টার্থ এবং অবিশুদ্ধভাষায়ুক্ত লেখ্যও অব্যবহার্য্য। উত্তর যদি এই সকল দোষে দুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। * তবে এ সকল নিয়মেরও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। পরে যখন এই

১ এই অংশকে এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ সমূহকে কেহ কেহ ‘দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের’ প্লিডিং (Pleading) সংক্রান্ত অধ্যায়ের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তাহাদের মতে, সংহিতোক্ত বচনসমূহ প্লিডিং স ক্রান্ত বাক্যের সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন। দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ঐ অংশ হইতে আমরা দুই একটা বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে বিষয়টা বেশ বুঝা যাইবে। যথা,—“Pleading

লকল বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক উঠে,—প্রাণ্ডুয়ার, প্রত্যাবস্থানন প্রভৃতি এবং দাবীকৃত বিষয়ের আংশিক স্বীকার বা অস্বীকার, একরূপ ব্যবহার বিধিসঙ্গত কি না ; তখন ক্রমশঃ পরিবর্তনের দ্বারা উপলব্ধি হয়। অর্থযুক্ত ও ধর্মসঙ্গত এবং পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ উত্তরই ব্যবস্থা-সঙ্গত। তবে যেখানে উত্তর সক্ষীর্ণ বা প্রভূতাত্ত্বজ্ঞাপক, সেখানে প্রধান বিষয়টাই প্রথম বিচার্য। এতদ্বাতিত উত্তরের যথাার্থ অযথাার্থ নির্ণয় করাও বিধি। কেবল-না ত্র সত্য নির্ণয় করাই প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ; আর সেই উদ্দেশ্য-সাধন-কল্পেই

shall mean plaint or written statement. (2) Every pleading shall contain, and contain only, a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim or defence, as the case may be,.....Dates, sums and numbers shall be expressed in figures. (7) No pleading shall, except by way of amendment, raise any new ground of claim or contain any allegation of facts inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same."

"(1) Every suit shall, as far as practicable, be framed so as to afford ground for final decision upon the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them. 2 (i) Every suit shall include the whole of the claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action ; but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court. (ii) Where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquishes, any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. (iii) A person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such reliefs ; but if he omits, except with the leave of the court, to sue for all such reliefs, he shall not afterwards sue for any relief so omitted."

"The plaint shall contain the following particulars:—(a) the name of the Court in which the suit is brought ; (b) the name, description and place of residence of the plaintiff ; (c) the name, description and place of residence of the defendant, so far as they can be ascertained ; (d) where the plaintiff or the defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect ; (e) the facts constituting the cause of action and when it rose ; (f) the fact showing that the court has jurisdiction ; (g) the relief the plaintiff claims, &c.

"The plaint shall be rejected in the following cases :—(a) Where it does not disclose a cause of action ; (b) Where the relief claimed is undervalued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped &c. ; (c) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by law." &c.

এতদ্বির আরও অনেক বিষয় দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের 'প্লিডিং'-সংক্রান্ত বিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক বিষয়ে প্রাচীন বিধি-বিধান-সমূহের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বাহুল্য ভরে এখানে তাহা উল্লিখিত হইল না।

শাস্ত্রকারগণের বত কিছু প্রয়াস । মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তদুদ্দেশ্য সাধন জন্য তাই বলিয়াছেন,—

“হুং নিরস্য ভূতেন ব্যবহারান্ নয়েম্‌ঃ ।

ভূতমপ্যহুপত্ত্বং হীয়তে ব্যবহারতঃ ॥”

অর্থাৎ,—‘বিচারক বাদী-প্রতিবাদীর প্রমাণাদি কথিত বিষয় নিরাকরণ পূর্বক ব্যবহার-কার্য্যকে উদ্ভাটিত সত্যের সহিত যোজিত করিবেন । কারণ, প্রকৃত সত্য বিষয়ও অল্প-পন্যস্ত থাকিলে ব্যবহারে হীন হইয়া থাকে ।’ তবে সকল স্থলেই যে একমাত্র শাস্ত্রবর্ণিত বিধি অনুসৃত হইবে, তাহা নহে; যুক্তি প্রভৃতিও কোনও কোনও স্থলে বিচার্য্য । বর্ণধর্ম্ম, জনপদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম এবং লোকাচার প্রভৃতিও বিবেচ্য । ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত যুক্তি প্রভৃতির সমন্বয়-সাধন করিয়া বিচার করাই বিধেয় । শাস্ত্রকার তাই বলিয়াছেন,—

“কেবলং শাস্ত্রমাপ্রিত্য ন কর্তব্যো বিনিশ্চয়ঃ ।

যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥”

সাক্ষী লেখাদি বিবিধ বিভিন্ন প্রমাণ গ্রহণান্তর বিচারকগণ সিদ্ধি বা জয়পত্র প্রদান করিবেন । বিচারকালে তাঁহাদিগকে পূর্বোক্তিত ভাষা, উত্তর প্রভৃতির দোষ-গুণ বিচার করা একান্ত প্রয়োজন । শাস্ত্রকারগণ সকলেই সে বিষয়ে উপদেশ দিচ্চি ।

দিয়াছেন । অর্থাৎ শাস্ত্রকারও বিচার-বিষয়ে বিবিধ দোষ-গুণ পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধি বা জয়পত্র দিবার বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার মতে যেখানে সাক্ষীদিগের উক্তি পরস্পর-বিরুদ্ধ, সেখানে অধিকাংশ ‘শুচয়ঃ’ ও ‘অনুমতাঃ’ সাক্ষীর উক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে । যাহারা পবিত্রচিত্ত এবং উভয় পক্ষের অনু-মোদিত সাক্ষী, এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষীদ্বৈধ স্থলে, বিচারকগণ তাঁহাদের কথার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জয়পত্র প্রদান করিবেন । কিন্তু সাক্ষীগণের বিরুদ্ধ উক্তির বিষয় আলোচনা করিয়া বিচারক যদি মধ্যপন্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা অনুভব করেন, তাহা হইলে সেই ভাবেই জয়পত্র দিবার বিধান অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় । যদি কোনরূপেই বিচারকগণ সাক্ষী-দিগের বিরুদ্ধ উক্তির সমালোচনা করিয়া তাহার সামঞ্জস্য-সাধনে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে বিবাদীর বিষয় রাজার প্রাপ্য হইবে । বাদীর দাবী যদি আংশিক সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট অংশ রাজার প্রাপ্য । পক্ষান্তরে যদি সাক্ষীগণের উক্তিতে বাদীর প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক দাবী সপ্রমাণ হয়, অর্থাৎ বাদী যে স্থলে ১০০ এক শত টাকা দাবী করিয়াছেন, সাক্ষীগণ যদি প্রমাণ দ্বারা ২০০ দুই শত টাকা সাবাস্ত করে; তাহা হইলে অতিরিক্ত অংশ রাজকোষে সঞ্চিত হইবে । নিকটবর্ত্তী সাক্ষীগণ অর্থাৎ যাহাদিগকে উপস্থিত করিতে বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না, সেইরূপ সাক্ষীদিগকে পক্ষগণ বিচারালয়ে উপস্থিত করিবেন । কিন্তু যাহারা দূরদেশে বাস করেন, সেক্ষণ সাক্ষী উপস্থিত করিতে হইলে, সাক্ষীগণের প্রতি ‘স্বামিবাক্য’ বা ‘সমন’ দিবার বিধি অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় । পরাজিত পক্ষ বিজিত পক্ষের সাক্ষীর সকল ব্যয়ভার বহন করিতে বাধ্য হইতেন । সাক্ষীর খোরাকি (পুষ্কবভূতি), পাথের প্রভৃতি সকল ব্যয়ভারই পরাজিত পক্ষ বহন করিবেন,— অর্থশাস্ত্রকার বিশেষ ভাবে তাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । এই সকল বিষয় সংহিতা-শাস্ত্রাদিতেও

আলোচিত হইয়াছে । মনু (অষ্টম অধ্যায়, ৭৩ম এবং ১১৬ম—১১৮ম শ্লোক) বলিয়াছেন,—
 “বহুত্বং পরিগৃহীয়াৎ সাক্ষির্দ্বৈধে নরাধিপঃ । সমেষু তু গুণোৎকৃষ্টান্ গুণির্দ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্ ॥”
 “যন্মিন্ যন্মিন্ বিবাদে তু কোটসাক্ষ্যং কৃতং ভবেৎ । তত্ত্বং কার্য্যং নিবর্ত্তেত কৃতকাপ্যকৃতং ভবেৎ ॥
 লোভান্মোহান্দ্ভয়ান্মৈত্র্যাং কাম্যাং ক্রোধাত্তথৈব চ । অজ্ঞানান্ধগভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথ্যমুচ্যতে ॥”
 অর্থাৎ,—‘সাক্ষির্দ্বৈধ স্থলে রাজা বহু সাক্ষীর প্রমাণ গ্রাহ্য করিবেন । কিন্তু সমান হইলে গুণোৎকৃষ্ট সাক্ষীদিগের বাক্যের দ্বারা সত্যনির্ণয় করিবেন । আবার গুণীর বৈধস্থলে বাহারা ক্রিয়াবান, তাহাদের সাক্ষ্যে সত্য নির্ণয় করিবেন ।...যে যে বিবাদে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রকাশ পাইবে, রাজা সেই সেই মকদ্দমার বিচার নিবর্ত্তিত করিবেন । মিথ্যা সাক্ষ্য বলে বিচার সম্বন্ধে যাচা কিছু কৃত হইয়াছে, তাহা অকৃতের তায় গণ্য হইবে । লোভ ভয়, মোহ, মৈত্র, কাম ও ক্রোধ হেতু যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে এবং অজ্ঞানে অমনো-
 যোগে যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, সেই সাক্ষ্য বিতথ্য স্মরণ্য অগ্রাহ্য ।’ বিষ্ণুসংহিতারও একইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় । বিষ্ণুসংহিতাক্ত শ্লোক-কয়টা (অষ্টম অধ্যায়, ৩৯ম ও ৪০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) মনুসংহিতার শ্লোকেরই অনুরূপ । প্রায় প্রতি বাক্যেই মিল দেখিতে পাওয়া যায় । মহর্ষি বিষ্ণুর মতেও ‘সাক্ষির্দ্বৈধ স্থলে এবং বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের সাক্ষি-
 গণই ‘কূটসাক্ষী’ বলিয়া প্রতিপন্ন না হইলে, বিচারক বহুত্ব গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ যে পক্ষে অধিক সাক্ষী, সেই পক্ষকে জয়পত্র দিবেন । সমান হইলে উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্ন সাক্ষীরাই গ্রাহ্য । সমানগুণসম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ সাক্ষিগণই প্রমাণ । কূটসাক্ষী যে যে বিবাদে মিথ্যা বলিবে, তত্ত্বং বিবাদ-ঘটিত কার্য্য নিবৃত্ত হইবে অর্থাৎ সেইখানেই কার্য্য শেষ করিতে হইবে, আর কৃতকার্য্যও অকৃতবৎ গণ্য হইবে ।’ যাজ্ঞবল্ক্যের মতে,—

“দ্বৈধে বহুনাং বচনং সমেষু গুণিনাস্থথা । গুণির্দ্বৈধে তু বচনং গ্রাহ্যং যে গুণবত্তমাঃ ॥
 যতোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাং স জয়ী ভবেৎ । অন্তথাবাদিনো যন্ত ঐবং তন্ত পরাজয়ঃ ॥
 উক্তেহপি সাক্ষিভিঃ সাক্ষ্যে যদন্তে গুণবত্তমাঃ । দ্বিগুণা বাগ্মথা ক্রুবুঃ কূটাঃ স্যুঃ পূর্বসাক্ষিণঃ ॥”
 অর্থাৎ,—‘দুই পক্ষ হইতে সাক্ষ্য প্রদান করিলে বহুলোক যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহ্য । দুই-
 পক্ষে সমান লোক থাকিলে গুণবান ব্যক্তিগণের এবং দুই পক্ষেই সমান গুণবান লোক থাকিলে, বাহারা অধিক গুণবান, তাহাদিগেরই কথা গ্রাহ্য । সাক্ষিগণ, বাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় ; এবং বাহার লিখিত প্রতিজ্ঞার অন্তরূপ বলে, তাহার পরাজয় নিশ্চিত । কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্ত পক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান ব্যক্তি কিবা বহু লোক অন্তরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে পূর্বসাক্ষিগণ কূটসাক্ষী হইবে ।’ স্মরণ্য তাহাদের সাক্ষ্য বিচার আমলে আসিবে না । বাহা হউক, এই সকল অতি প্রাচীনকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া খৃষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ববর্ত্তী অর্থশাস্ত্রোক্ত ব্যবহার-শাস্ত্রের আলোচনায় আমরা বৃত্তিতে পারি, সে সময়ও ভারতের ব্যবহার-শাস্ত্র পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাযিত ছিল এবং তৎকাল-প্রচলিত বিধান-সমূহ আধুনিক বিধি-নিয়মাদি হইতে কোনও অংশে হীন ছিল না । এখন বিচারক কর্ত্ত্বক কোনরূপ বিচার-বিজ্ঞাট ঘটিলে, বিচারক বিনামূল্যেই

অব্যাহতি পান ; কিন্তু সে সময়ে, সেই সুদূর অতীতকালে, বিচারকগণকেও ক্ষতকর্ণের কণভাগী হইতে হইত। অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, বিচারক নিরপেক্ষভাবে এবং

বিচারকের
দণ্ড ।

অমিত অধ্যবসায়ের সহিত বিচার-কার্য্য নিষ্পন্ন না করিলে, তাঁহার প্রতি গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। যদি বিচারক কোনও পক্ষকে ভয়প্রদর্শন করিতেন, ভিন্নস্বার করিতেন, অথবা বিচারালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার 'প্রথম সাহস দণ্ড' হইবার ব্যবস্থা ছিল। বিচারক যদি সাক্ষীকে অবাস্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনি যদি কোনও আবশ্যকীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় বিরত থাকিতেন, পক্ষের কোনও সহজতর লিপিবদ্ধ না করিতেন অথবা পক্ষকে তাহার পূর্ববর্ণনা প্রদান করিয়া তদ্বিষয়ে তাহাকে কোনও বিষয় শিক্ষা দিতেন ; তাহা হইলে তাঁহার 'মধ্যম সাহস' দণ্ড হইবার ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। পরন্তু বিচারক যদি কোনও অনাবশ্যকীয় বিষয়ের অহুসন্ধান উপলক্ষে বিচার-কার্য্য সমাধা করিতে অথবা বিলম্ব করিতেন, অকারণ কারণের অছিলায় মকদ্দমা মূলতবী রাখিয়া বিচারালয় ব্যতীত অপর স্থানে তিনি বিবাদীয় বিষয়ের মীমাংসা করিতেন, পক্ষদিগকে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট করিয়া বিপথে পরিচালিত করিবার প্রয়াস পাইতেন, অথবা সাক্ষীদিগকে সন্ধান বলিয়া দিয়া তাহাদিগের সাক্ষ্য-প্রদানে সহায়তা করিতেন ; তাহা হইলে সেই বিচারক 'উত্তম সাহস' দণ্ডে * দণ্ডিত

* অর্থদণ্ডের যে ত্রিবিধ প্রকার-ভেদ ছিল, তাহা 'সাহস' নামে উক্ত হইত। যথা,—প্রথম সাহস দণ্ড, মধ্যম সাহস দণ্ড, উত্তম সাহস দণ্ড। এই সাহস দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, সমু-সংহিতায় তাহার সংখ্যা নির্দিষ্ট হইয়াছে। মনু যেক্রমে সাহস দণ্ডের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা বুঝাইবার জন্ত, মনুসংহিতা হইতে নিম্নে কয়েকটি শ্লোক (অষ্টম অধ্যায়, ১০২ম—১০৮ম শ্লোক) উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

“আলাস্তুরগতে ভানৌ যং স্ত্রমঃ দৃশ্যতে রজঃ। প্রথমঃ তং অমাগানাং ত্রাসরেণুঃ প্রচক্ৰতে ॥

ত্রাসরেণুবোহন্তৌ বিজ্ঞেয়া লিষ্টকৈশ্চ পরিমাণতঃ। তা রাজসর্গপ্তিস্ত্রস্তে ত্রয়ো গৌরসর্গপঃ ॥

সর্বণাঃ বড়মবো মদ্যস্রিয়বস্ত্রেককৃষ্ণলম্। পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষন্তে স্ত্রবর্ণস্ত বোড়শ ॥

পলঃ স্ত্রবর্ণাচ্ছতারঃ পলানি বরণং দশ। ষ্ঠে কৃষ্ণলে সমধূতে বিজ্ঞেয়ো রৌপ্যমাসকঃ ॥

তে বোড়শ স্ত্রাক্ষরঃ পুরাণকৈব রাজতম্। কাষাপগন্ত বিজ্ঞেয়স্তাত্ত্রিকঃ কাষিকঃ পণঃ ॥

ধরণানি দশ জ্ঞেয়াঃ শতমানস্ত রাজতঃ। চতুঃসৌবর্ণিকো নিকো বিজ্ঞেয়স্ত্রয়মাণতঃ ॥

পণানাং ষ্ঠে শতে সার্কৌ প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ। মধ্যমঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রস্বেব চোত্তমঃ ॥”

অর্থাৎ,—‘সুখোর কিরণ পতিত হইলে গবাক্ষবিবর হইতে যে ধূলিসমূহ উড়িয়ায়মান হয়, উহার মতো ষ্ঠে শূলিকণা অতিশয় সূক্ষ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে ; পরিমাণ-গণনায় উহা প্রথম গণ্য। উহাকে ত্রাসরেণু বলে। ঐ ত্রাসরেণুর আট গুণে এক লিঙ্ক হয় ; তার তিন গুণে এক রাজসর্গপ এবং রাজসর্গপের চারি গুণে গৌরসর্গপ হয়। ত্রয় সর্গপে এক যবমধা ; তিন যবে এক কৃষ্ণল, পাঁচ কৃষ্ণলে এক মাষা এবং উহার বোড়শ গুণে এক স্ত্রবর্ণ হয়। চারি স্ত্রবর্ণে এক পল। দশ পলে এক ধরণ এবং দুই কৃষ্ণলে এক রৌপ্যময় মাষা হয়। বোড়শ রূপ্যমাষার এক রূপ্যবরণ বা পুরাণ হয়। এক কাষিক বা আশীরতি পরিমিত তাত্ত্রকে পণ বা কাষাপ বলে। পূর্বোক্ত দশ ধরণে এক রাজত শতমান এবং চারি স্ত্রবর্ণে এক নিক হয়। আড়াই শত পণে এক প্রথম সাহস, পাঁচ শত পণে এক মধ্যম সাহস এবং সহস্র পণে উত্তম সাহস।’ তাহা হইলে বুঝা বাইতেছে,—প্রথম সাহস দণ্ডে দুই হাজার রতি, মধ্যম সাহস দণ্ডে চারি হাজার রতি এবং উত্তম সাহস দণ্ডে আট হাজার রতি তাম্র দণ্ড দিতে হইত।

হইতেন। * প্রথম বার উপরোক্ত দোষ করিলে বিচারকের প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, দ্বিতীয় বারে তাহার প্রতি তাহার দ্বিগুণ দণ্ড প্রদান করা হইত। অত্যাধিকারকে কাহারও অর্থদণ্ড প্রদান করিলে, অপরাধের ভারতম্য অনুসারে, বিচারক ধর্ম্মস্থ বা প্রেদেষ্টা নির্দিষ্ট দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড ভোগ করিতেন। অবৈধ শারীরিক শাস্তির জন্য তাহাদের প্রতি তদনুরূপ শারীরিক দণ্ড প্রদান করা হইত, অথবা দণ্ডের পরিবর্তে তাহাদের প্রতি অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত ছিল। কিন্তু সে অর্থদণ্ড শারীরিক দণ্ডের অনুপাতে বিহিত হইত। অর্থাৎ,—যে অপরাধে যেরূপ শারীরিক দণ্ডের পরিবর্তে যেরূপ অর্থদণ্ডের বিধান রহিয়াছে, অপরাধী বিচারকে সে অপরাধে তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। পক্ষান্তরে যে বিচারক কোনও ত্রায়সিক ব্যবহারকে অমূলক সাব্যস্ত করিয়া মিথ্যা ব্যবহার উৎপাদনে সহায়তা করিতেন, তিনি সেই ব্যবহারোক্ত দাবীর আটগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। অর্থশাস্ত্র-মতে বিচারকের প্রতি দণ্ড-দানের এই বিধান। কিন্তু বিচারকগণের অপরাধের শাস্তিবিধান কে করিবেন, তৎসম্বন্ধে বিহিত কোনও আদেশ অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। বিচারকগণের প্রতি দণ্ডাদেশের যেরূপ বিধি, বিচারালয়ের কর্মচারীদের অপরাধে তাহাদের প্রতিও দণ্ডের সেইরূপ ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। পক্ষ-দিগের বর্ণনা যিনি লিপিবদ্ধ করিবেন, তাহার কার্যনিষ্ঠাখেলের বা অপব্যবহারের দণ্ডের ব্যবস্থা এইরূপ উক্ত হয়; যথা,—তিনি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক বর্ণিত বিষয় লিপিবদ্ধ না করেন; অবজ্ঞা-ব্যয় অর্থাৎ পক্ষগণ যাহা বলে নাই, তাহা লিখিয়া লন; অস্পষ্ট-ভাবে বর্ণিত বিষয় যদি তিনি লিপিবদ্ধ না করেন, অথবা অস্পষ্ট-ভাবে বর্ণিত বিষয় অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থযুক্ত করিয়া দেন; তাহা হইলে তাহার প্রতি ‘উত্তম সাহস’ দণ্ডের ব্যবস্থা। অপিচ, অপরাধের ভারতম্য অনুসারে অত্যাধিকার দণ্ডদানের বিষয়ও অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, বিচারালয় (ধর্ম্মস্থ) হইতে অপরাধী পলায়ন করিতে না পারে, ‘চারক’ (হাজত) ও ‘বন্ধনাগার’ (জেলখানা) প্রভৃতিতে অপরাধীদেরকে সুরক্ষিতভাবে আবদ্ধ রাখা হয়;—তদ্বিষয়েও বিবিধ বিধান অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে আপিলাদির বিষয় উল্লিখিত আছে। এখন যেমন মুন্সেক বা সবডিভিশনাল মাজিষ্ট্রেটের বিচারের আপিল জজের বা মাজিষ্ট্রেটের নিকট হয় এবং তাহা হইতে হাইকোর্ট ও হাইকোর্ট হইতে প্রিভি-কৌন্সিল পর্য্যন্ত আপিল হইবার ব্যবস্থা আছে; আর প্রিভি-কৌন্সিলের বিচারের আপিল যেমন হাইকোর্টে হয় না বা হাইকোর্টের বিচারের আপিল যেমন জজের নিকট আসিতে পারে না,—অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় ব্যবহার-শাস্ত্রেও আপিল-সংক্রান্ত সেই বিধি বিধিবদ্ধ ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। আপিল সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

* বিচারকের দণ্ড বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় লিখিত আছে,—“ব্রহ্মদ্বৈতং পুনর্দৃষ্টং। ব্যবহারান্ ক্রুণোতু। সত্যোঃ সজয়িনো দণ্ডাঃ বিবাদান্দ্বিগুণং দদম্।” ব্রহ্মদ্বৈত ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া রাজা সেই বিবাদে পরাজিতের যে দণ্ড হইয়াছে, বিচারক, সত্যপন ও জেতা—ইহাধর্ম্মের প্রত্যেক ব্যক্তির তাহার নিজের দণ্ড করিবেন।

—“নৃপোণাধিকৃত্যঃ পুণাঃ শ্রেণয়োহথ কুলানি চ। পূৰ্ব্বং পূৰ্ব্বং গুরু জ্ঞেয়ং ব্যবহারবিধৌ
নৃণাম ॥” অর্থাৎ,—‘রাজনিযুক্ত গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোক, নানা জাতীয় জনসমূহ
এবং নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধববর্গ—ব্যবহারার্থী মনুষ্যদিগের ব্যবহার-কার্য এই সকলের মধ্যে
পূর্ব পূর্ব উল্লিখিত ব্যক্তি পর পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।’ নারদ ও কাভ্যায়নের মতেও উহাই
বিধি। তাঁহারও বলিয়াছেন,—“কুলানি শ্রেণয়শ্চৈব গণাশ্চাধিকৃতো নৃপঃ। প্রতিষ্ঠা
ব্যবহারানাম পূর্বোভ্যন্তরোত্তরঃ ॥” অপর এক স্থতি গ্রন্থেও ঐরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়;
যথা,—“গ্রামে দৃষ্টঃ পুরে যাতি পুরে দৃষ্টস্ত রাজনি। রাজ্ঞা দৃষ্টঃ কুদৃষ্টো বা নাস্তি পৌনর্ভবো
বিধিঃ ॥” এখানেও সকলের সকল বিচারেরই আপিল উক্তন বিচারালয়ে হইবার বিধি।
কিন্তু রাজা যে বিচার করেন, অত্য়ায় অবৈধ হইলেও তাহার আর আপিল চলিবে না।
তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক। তাঁহার বিচারের আপিল কাহার নিকট হইবে? কিন্তু
কোনও কোনও স্থলে যে রাজার বিচারেও আপিল না হইত, তাহা নহে। সে ক্ষেত্রে
পক্ষগণকে দণ্ডের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইত। যাহা হউক, এ সকলের আলোচনায় বুঝা
যায়, প্রাচীনকালে বহু নগর-জনপদে বিবিধ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের প্রাচীন
কালের বিচারকের আয় ভ্রমণকারী ‘ইটিনারারি’ বিচারক নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা রাজ্যের
বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বিচার-কার্য নিষ্পন্ন করিতেন। তাঁহাদের বিচারের আপিলও
পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা ছিল। চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে বিচারক-
গণের দণ্ড-প্রসঙ্গে ইহার আভাষ পাওয়া যায়। উচ্চ বিচারালয়ে আপিল না হইলে,
বিচারকের দোষ-গুণ সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয়, অর্থশাস্ত্র
মতে, উচ্চ হইতে উচ্চতর, উচ্চতর হইতে উচ্চতম বিচারালয়ে পূর্ববিচারের আপিল হওয়ার
বিধি। স্বয়ং রাজা, মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে, যে বিচারালয়ে অধিষ্ঠিত হইতেন,
তাহাই ছিল—সর্বোচ্চ বিচারালয়। অর্থশাস্ত্রের ‘রাজপ্রণিধি’ প্রকরণে এ বিষয়ের বিধান দৃষ্ট
হয়। অর্থশাস্ত্রে চারিটা বিচারালয়ের উল্লেখ আছে। প্রতি সংগ্রহণে, প্রতি দ্রোণমুখে,
প্রতি স্থানীয়ে এবং প্রতি জনপদসন্ধিতে বিচারালয় প্রতিষ্ঠার বিধান অর্থশাস্ত্রকার প্রদান
করিয়াছেন। সে সময়ে প্রতি সংগ্রহণে স্থাপিত বিচারালয়-নিষ্পাদিত ব্যবহারের আপিল
দ্রোণমুখে প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে হইত; দ্রোণমুখ বিচারালয় হইতে স্থানীয় বিচারালয়ে
এবং স্থানীয় বিচারালয় হইতে জনপদসন্ধিতে প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে আপিলাদি হইবার
ব্যবস্থা ছিল;—এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রামিক ও গ্রামবৃদ্ধগণ যে বিচারাদি
সম্পন্ন করিতেন, তাহারও আপিল ঐরূপ ক্রমপর্যায় অনুসারে হইবার ব্যবস্থা ছিল।

আদর্শ-রাজ্যের আর এক আদর্শ চুক্তি-সংক্রান্ত ব্যবহার বিধানে। প্রাচীন ভারতে
এই ব্যবহার-বিধি কিরূপ ক্ষুদ্র লাভ করিয়াছিল এবং কি ভাবে পূর্ণ-পরিণতি প্রাপ্ত
হইয়াছিল, এতৎপ্রসঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদান করিতেছি।

চুক্তি
ও

প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-বিধির প্রধান উপাদান,—শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহ।
তৎপ্রকারভেদে। স্বত্বাদি বহুপ্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহে এবং খৃষ্টজন্মের প্রায় তিন শতাব্দিক
বৎসর পূর্বের বিবচিত অর্থশাস্ত্রে এতদ্বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে। এখানে অর্থ-

প্রাজ্ঞোক্ত চুক্তির বিষয় উল্লেখ-প্রসঙ্গে স্বত্বাদি বর্ণিত বিধি-বিধান-সমূহ বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছি। কোনও নির্দিষ্ট বিষয় সম্পাদন জন্ত কেহ কাহারও সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, ঐ প্রতিজ্ঞা চুক্তি মধ্যে গণ্য হয়। একরূপ প্রতিজ্ঞা হই বা বহু ব্যক্তির পরস্পরের মধ্যে হইতে পারে, সম্ভবপর বা বহু সম্ভব মধ্যে হইতে পারে। ব্যক্তিবিশেষ, সম্ভব-বিশেষের সহিত একরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে পারেন। এ হিসাবে চুক্তি বহুবিধ। বিবাহ, দায়, ঋণ, সমুদ্র-সমুখান, দাসকর, উপনিধি, ভূত্যাধিকার প্রভৃতি সকলই চুক্তিপরিণামভুক্ত। একরূপ প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি যেক্রমে নিষ্পন্ন হয়, তাহা এই;—যদি কেহ স্বেচ্ছাক্রমে কাহারও নিকট কোনও বিষয়ে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করেন, আর অপর ব্যক্তি যদি প্রস্তাবকারীর সে প্রস্তাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সম্মত হন; তাহা হইলে, দ্বিতীয় ব্যক্তির স্বীকারোক্তিতে প্রতিজ্ঞা নিষ্পন্ন হইয়া যায়। সেই প্রতিজ্ঞাই—চুক্তি। এইরূপ প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পক্ষ-সমূহের কোনও কার্যো রতি বা বিরতি ভাব উপলব্ধি হয়। চুক্তি দ্বিবিধ—সিদ্ধ ও অসিদ্ধ। যে চুক্তি বা অঙ্গীকৃত বিষয় সম্পাদনে প্রতিপক্ষকে আইনতঃ বাধ্য করা যায় না,—তাহা অসিদ্ধ-চুক্তি পরিণামভুক্ত। আর, যে চুক্তি-সম্পাদনে পক্ষগণ আইনতঃ বাধ্য এবং যাহার অসম্পাদনে পক্ষগণ আইনতঃ দণ্ডনীয় হন, তাহাই সিদ্ধ-চুক্তি মধ্যে পরিগণিত। চুক্তি সিদ্ধ হইলে, উহা সমভাবে সকল পক্ষের প্রতি প্রযুক্ত। তবে ঐ চুক্তি বা অঙ্গীকার পক্ষগণকে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সম্পন্ন করার বিশেষ বিধি শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহে পরিদৃষ্ট হয়। অর্থশাস্ত্র-মতে সিদ্ধ চুক্তিতে নিম্নোক্ত গুণ-সমূহ বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন; যথা—

“তস্মাৎ সাক্ষিমদচ্ছন্নং কুর্ধ্যাৎ সমাখ্যভাষিতম্। স্বে পরে বা জনে কার্যং দেশকালপ্র-
বর্ততঃ ॥” “স্বে স্বে তু বর্গে দেশে কালে চ স্বকরণকৃত্য সম্পূর্ণচারসুত্বদেশা দৃষ্টরূপ-
লক্ষণপ্রমাণগুণাসংসর্গব্যবহারাদি সিন্ধেয়ুঃ। পশ্চিমং ত্বেষাং করণমদেশাধিবর্জং শ্রেণেয়ুঃ ॥”

অর্থাৎ,—চুক্তি-পত্রে পক্ষগণের বক্তব্য সম্যাক্রূপে উল্লিখিত থাকিবে। আচ্ছন্ন-ভাবে অর্থাৎ গোপনে সম্পাদিত হইবে না, সাক্ষীর সমক্ষে উহা নিষ্পন্ন করিতে হইবে। চুক্তিপত্র—দেশ, কাল ৭ বর্গ (জাতি ও শ্রেণী) প্রভৃতি বিষয়ক নীতি-সমূহের অনুবর্তী হওয়া আবশ্যিক। চুক্তিতে পক্ষগণের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এবং রূপ অর্থাৎ যে অবস্থায় চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা, সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইবে। চুক্তি-সম্পাদনে কোনরূপ ‘অপগ্রহণ’ অর্থাৎ অবৈধ উপায় অবলম্বনের ভাব বর্তমান থাকিবে না। পরন্তু চুক্তিকারী পক্ষগণ ‘প্রমাণগুণযুক্ত’ অর্থাৎ চুক্তি-সম্পাদনে ঋণাতঃ উপযুক্ত হওয়া আবশ্যিক। স্থূলতঃ, ব্যবহারবিধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যে ‘সম্পূর্ণচার’ চুক্তি নিষ্পন্ন হয়, কোটিল্য-মতে, তাহাই সিদ্ধ। অর্থশাস্ত্রের উক্তি

হইতে বুঝা যায়, চুক্তি-সম্পাদন সময়ে সাক্ষী একান্ত আবশ্যিক এবং ঐ
অসিদ্ধ চুক্তি বিষয়ক দলিলাদি নিষ্পন্ন করিতে হইলে, সে সাক্ষী নিম্নপ্রয়োজনীয় কিছু
বিশেষ বিধি। মৌখিক চুক্তি-বিধানে কোনমতেই সাক্ষী পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে।

সে ক্ষেত্রে অসাক্ষিক মৌখিক চুক্তি অসিদ্ধ হয়। অর্থশাস্ত্র-মতে—তিরোহিত, নক্তকৃত, অন্তর-গারকৃত, অরণ্যকৃত, উপধিকৃত, উপহরকৃত চুক্তি অপ্রামাণ্য। একরূপ স্থলে পক্ষগণের ‘প্রথম সাহস’ দণ্ড-বিহিত। এ বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের ‘ব্যবহার-স্থাপনা’ অংশে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়,—

“তিরোহিতাস্তরগারনক্তারণোপধাপহরকৃতাংশ ব্যবহারান্ প্রতিবেদয়েয়ুঃ । কর্তৃ-
কারয়িতুশ্চ পূর্বসাহসদণ্ডঃ । শ্রোতৃণামৈককং প্রত্যাহদণ্ডাঃ । অদ্বৈতানাং তু ত্রীতীয়াপনয়নঃ ।”
ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম । কিন্তু অবস্থা-বিশেষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় । নক্তকৃত
বা রাত্রে নিম্নরূপ চুক্তি-ব্যবহার অপ্রামাণ্য অসিদ্ধ হইলেও যে স্থলে কোনও শাস্তিভঙ্গের আশঙ্কা
থাকিত, সে ক্ষেত্রে ইহা অসিদ্ধ হইত না । বিবাহ-বাপারে অথবা রাজানুমোদিত বিষয়েও
ইহার সার্থকতা দেখা যায় । যথা,—“সাহসান্নুপ্রবেশ কলহ বিবাহ রাজনিয়োগযুক্তাঃ পূর্বরাত্র-
ব্যবহারিণাং চ রাত্রিকৃতাস্সিদ্ধেয়ুঃ ।” যে ক্ষেত্রে জীলোক ‘অনিষ্কাষিণী’ অর্থাৎ অহুর্য়াম্পশ্যা
এবং রোগিণী, সে ক্ষেত্রে দায় প্রভৃতি বিষয়-বাপারে এবং বিবাহ-সম্পর্কে ‘অস্তরগার’ ব্যবহার
অসিদ্ধ হইত না ; যথা,—“দায়নিষ্কেপোপনিধি বিবাহযুক্তা জীণামনিষ্কামিনীনাং ব্যাধিতানাং
চামৃতসংজ্ঞানামস্তরগারকৃতাস্সিদ্ধেয়ুঃ ।” অর্থাৎ,—পর্দানদীন ও রোগিণী জীলোকগণের
পক্ষে এ বিধি অপ্রযোজ্য । তাঁহারা যদি প্রকৃতিস্থ থাকেন, তাহা হইলে দায় (বিষয়-
সম্পত্তি বিভাগ বিষয়ক বাপার), নিষ্কেপ, উপনিধি ও বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে অস্তরগার
ব্যবহার অসিদ্ধ হইবে না । সার্থ (বাবসামী), ব্রজাশ্রম (গোপালক), ব্যাধ, চার
(গুপ্তচর) ও মধ্যেষরণাচর (কার্য্যাপলক্ষে বাহাদিগকে প্রায়ই অরণো ভ্রমণ করিতে হয়)
প্রভৃতি কর্তৃক নিম্নরূপ ‘অরণাকৃত’ ব্যবহার অসিদ্ধ হয় না,—অর্থশাস্ত্রে সে ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় ।
যথা,—“সার্থব্রজাশ্রমব্যাধচারিণাং মধ্যেষরণাচরণামরণকৃতাস্সিদ্ধেয়ুঃ ।” উপহর ব্যবহার সকল
স্থলেই নিষিদ্ধ । অন্যর ও অরণা ভিন্ন অস্ত্র যে কোনও গোপনীয় স্থান—উপহর পর্যায়ভুক্ত ।
কিন্তু কেবলমাত্র যৌথ-বিষয়ে উপহর ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে—অর্থশাস্ত্রের ইহা ব্যবস্থা । এ
সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রকারের উক্তি,—“মিথসমবায়ো চোপহরকৃতাঃ সিদ্ধেয়ুঃ । অতোহত্থা ন
সিদ্ধেয়ুঃ ।” যৌথসংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কিত ভিন্ন অস্ত্র উপহর ব্যবহার অসিদ্ধ । তিরোহিত
ব্যবহার বিষয়েও বিশেষ বিধান আছে । দাসকল এবং কর্মকরকল ভিন্ন অস্ত্র তিরোহিত
ব্যবহার সিদ্ধ হয় না । ইহাও গোপনে অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির অজানিতভাবে সম্পাদিত হইয়া
থাকে । এ হিসাবে অস্তরগার, অরণ্য, উপহর সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত হয় । তিরোহিত
ব্যবহারে সাক্ষী অপ্রয়োজনীয় । যেমন, ভূত্যের বেতনাদি-সংক্রান্ত চুক্তি সাধারণো অপ্রকাশ্য
থাকে ; আর যেখানে ঋণকারীর সম্মানের লাঘব হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানেও তৎকর্তৃক
সম্পাদিত ব্যবহার প্রকাশ করা হয় না । সুতরাং বিচারকালে বিচারকে পক্ষদিগের উক্তির
উপর নির্ভর করিতে হয় অথবা প্রচলিত লৌকিক প্রথার উপর বিচারকগণ নির্ভর করিয়া
থাকেন । এইরূপে ব্যবহার অসিদ্ধ না হইলে, গুপ্তচর নিযুক্ত করা অথবা ‘কুশলাঃ’ বা
পারদর্শী ব্যক্তির অভিমত গ্রহণ করা বিধি । অর্থশাস্ত্রকার ‘তিরোহিত’ ব্যবহার বিষয়ে
একটি বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । যথা,—“পরোক্ষেণাধিকর্ণগ্রহণমবজ্ঞব্যকরা বা
তিরোহিতাস্সিদ্ধেয়ুঃ ।” “গূঢ়াজীবিশু চোপাধিকৃতাস্সিদ্ধেয়ুঃ ।” * পূর্বের স্থান ও কাল সম্বন্ধে যে

* চুক্তি-বিষয়ক আধুনিক ব্যবহার-শাস্ত্রে এ সকল বিষয় উল্লিখিত হয় নাই । এখন চুক্তির কালকাল সম্বন্ধে
কোনও বিচার নাই । এখন পক্ষগণের সম্মতি এবং উপযুক্ত সাক্ষী থাকিলে যে কোনও সময়ে চুক্তি নিষ্পাদিত
হইতে পারে । কিন্তু প্রাচীনকালের বিধানে যে তাহা নিষিদ্ধ ছিল, পূর্ববর্তী অংশ হইতে তাহা সপ্রমাণ হয় ।

বিশেষ বিধান উল্লিখিত হইয়াছে, চুক্তি-ব্যবহার সিদ্ধ কি অসিদ্ধ তাহা বিচার-করে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন । যে ক্ষেত্রে পক্ষগণের স্বহস্তাক্রিত দলিলাদি দ্বারা চুক্তি নিষ্পন্ন

হয়, সে ক্ষেত্রে সাক্ষীর আবশ্যকতা অনুভব হয় না । সংহিতা প্রভৃতিতে ও
সংহিতা-মতে
চুক্তির বিষয় । এ সম্বন্ধে অল্পরূপ বিধি পরিদৃষ্ট হয় । মনু বলিয়াছেন,—সাক্ষিলেখাদি

দ্বারা ব্যবহার সপ্ৰমাণ করিতে হইবে । আর সে লেখা ‘সকরণ’ বা
স্বৈচ্ছা-প্রণোদিত লেখা হওয়া আবশ্যক । অপিচ, অসামর্থ্য পক্ষে বা অবস্থা-বিশেষে সে ‘করণ’
বা লেখা পরিবর্তিত হওয়াও সম্ভবপর হইতে পারে । চুক্তি-বিষয়ে দেশ, রূপ, কাল প্রভৃতির
প্রতি লক্ষ্য রাখিবার বিষয় মনুও বলিয়া গিয়াছেন । মনুসংহিতা হইতে এতদ্বিষয়ক কয়েকটি
শ্লোক (অষ্টম অধ্যায়, ৪৫ম, ৫১—৫২ম ও ১৫৪ম শ্লোক প্রষ্টব্য) নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

“সতানুপঞ্চ সম্প্রদোদান্মনমথ সাক্ষিণঃ । দেশং রূপঞ্চ কালঞ্চ ব্যবহারবিধৌ স্থিতঃ ॥

অণেহপিবাগমানন্ত করণেন বিভাবিতম্ । দাপয়েদ্ধনিকস্তার্থং দণ্ডলেশঞ্চ শক্তিতঃ ॥

অগহবেহদমণস্য দেহীভুক্তস্য সংসদি । অভিযোক্তা দিশেদেধ্যং করণং বান্যহুদিশেং ॥

ঋণংদাতুমশক্তো যঃ কন্তু মিচ্ছেৎ পুনঃ ক্রিয়াম্ । স দত্তা নির্জিতাং বৃদ্ধিং করণং পরিবর্তয়েৎ ॥”

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা-মতেও স্বকরণ ব্যবহারে সাক্ষীর আবশ্যক হয় না । উভয় পক্ষ স্বৈচ্ছা-
পূর্বক যে চুক্তি-ব্যবহার নিষ্পন্ন করে, তাহা অসাক্ষিক হইলেও বিচারক তাহা সিদ্ধ বলিয়া
গণ্য করিবেন । সকরণ লেখাদি বা চুক্তি-ব্যবহার সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৮৬ম—
৯১ম শ্লোক) এক বিস্তৃত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন । নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

“যঃ কশ্চিদর্থো নিষ্কাতঃ স্বকচ্যা তু পরস্পরম্ । লেখান্ত সাক্ষিমং কার্যং তস্মিন্ ধনিকপূর্বকম্ ॥

সমাসাসতদন্ধাহনামজাতিস্বগোত্রকৈঃ । সর্বজ্ঞচারিকাঋয়পিতৃনামাদিচিহ্নিতম্ ॥

সমাপ্তেহর্থে ঋণী নাম স্বহস্তেন নিবেশয়েৎ । মতং মেহমকুপ্তস্ত যদ্রোপরিগোথিতম্ ॥

সাক্ষিগণ্ড স্বহস্তেন পিতৃনামকপূর্বকম্ । অত্রাহমমুকঃ সাক্ষী লিখেয়ুরিতি তে সমাঃ ॥

উভয়াভার্থিতেনৈতন্ময়া হমুকহনুনা । লিখিতং হমুকেনেতি লেখকোহস্তে ততো লিখেৎ ॥

বিনাপি সাক্ষিভিলেখ্যং স্বহস্তলিখিতম্ বৎ । তৎপ্রমাণং স্মৃতং লেখ্যং বলোপমিকৃতাদৃতে ॥”

অর্থাৎ,—উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ পরস্পর সম্মতিক্রমে বৃদ্ধি-সময়াদি বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবেন,
ভবিষ্যতে বিস্তৃত্যাদি নিবন্ধন তাহার বৈপরীত্য না ঘটে, এই জন্ত সেই সকল বিচারঘটিত
সাক্ষিবৃত্ত লেখাপত্র প্রস্তুত করিবে । তাহাতে প্রথমে ধনীর নাম লিখিত হইবে । সে লেখা —
বর্ষ, মান, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি, গোত্র, সর্বজ্ঞচারিক (মাধ্যন্দিন প্রভৃতি শাখাদায়নপ্রযুক্ত
সংক্রা বিশেষ, যেমন অমুক মাধ্যন্দিন, ইত্যাদি) এবং নিজ পিতৃনামাদি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া
আবশ্যক । অনন্তর তাহাতে ব্যবহৃত বিষয় লিখিত হইলে, আমি অমকের পুত্র অমুক, ইহার
উপরে বাধা লিখিত হইল, তাহা আমার সম্মত—এই কয়েকটি কথা অধমর্ণ স্বহস্তে সন্নিবেশিত
করিবেন । অতঃপর সেই লেখ্যে সাক্ষিগণ পিতৃনাম লেখন পূর্বক লিখিবে যে, আমি অমুক
এ বিষয়ে সাক্ষী রহিলাম । সাক্ষিগণ সংখ্যায় ও গুণে সমান হইবে । অনন্তর আমি অমকের
পুত্র, অমুক ঋণী ও ধনীর প্রার্থনানুসারে ইহা লিখিলাম—সর্বশেষে লেখক ইহা লিখিবে । সাক্ষী
ব্যতীতও স্বহস্ত-লিখিত লেখ্য প্রমাণ হইবে । কিন্তু বলৎকার বা লোভপ্রদর্শন অথবা ক্রোধাদি

প্রকাশ দ্বারা নিশ্চিত কৃত হইলে, তাহা প্রামাণ্য হইবে না।' যাজ্ঞবল্ক্যের মতে সাক্ষিযুক্ত লেখ্য প্রমাণ। তাঁহার মতে, সিদ্ধ-লেখ্য স্থলে করণ, লক্ষণ, স্থান, কাল প্রভৃতি বিবেচ্য এবং তাহা উভয় পক্ষের সম্মত হওয়া আবশ্যক। এ সকলের অহুল্লেখে লেখ্য—অপ্রমাণ। অপিচ স্বহস্তাক্রিত সাক্ষ্য লেখ্য অসাক্ষিক হইলেও তাহা প্রমাণ মধ্যে গণ্য। তবে অঐবধ অসমুপায়ে নিশ্চিত লেখ্য অগ্রাহ্য। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা মতেও অন্তরঙ্গার, অরণ্য প্রভৃতি স্থানে সম্পাদিত চুক্তি অপ্রামাণ্য। যে সকল স্থলে চুক্তি অসিদ্ধ, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার একটা তালিকা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩২শ—৩৩শ শ্লোক) মতে—

“বলোপধিবিবির্কৃতান্ ব্যবহারান্ নিবর্তয়েৎ। জীনক্ৰমস্তরাগারবহিঃশত্রুকৃতান্তথা ॥

মন্তোন্ন্যন্তাৰ্ভবাসনিবালভীতাদিযোজিতঃ। অগম্বন্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিধ্যতি ॥”

অর্থাৎ,—‘বল বা ভয়নিষ্পন্ন, জীলোককৃত, নিশাকালকৃত, গৃহাভ্যন্তরকৃত, গ্রামবহির্দেশকৃত এবং শত্রুকৃত ব্যবহার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্তৃক দৃষ্ট হইলেও পরিবর্তিত হইবে। মন্ত, উন্নত, পীড়িত, ব্যসনযুক্ত, বালক, ভীত, নগরাদি বিরুদ্ধ ও অনিযুক্ত সম্বন্ধশূন্য ব্যক্তি—এই সকল লোকে যে ব্যবহার উৎপাদিত করে, তাহা অসিদ্ধ।’ মনুরও সেই মত। তিনিও বলিয়াছেন,—“অন্তর্বেশ্মণ্যরণ্যে বা শরীরস্থাপি চাত্যয়ে।” বিষ্ণুসংহিতায় লেখ্য-প্রকরণে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুর মতেও স্বহস্তলিখিত অসাক্ষিক লেখ্য প্রমাণ, আর বল-পূর্বক নিষ্পন্ন লেখ্য অপ্রমাণ। তিনিও করণ, লক্ষণ, স্থান, কাল প্রভৃতি যথাযথ-রূপে সন্নিবিষ্ট লেখ্যকে প্রমাণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। কোন্ লেখ্য প্রমাণ এবং কোন্ লেখ্য অপ্রমাণ, সে সম্বন্ধে বিষ্ণু-সংহিতায় এক বিস্তৃত বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“অথ লেখ্যং ত্রিবিধম্। রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ ॥ রাজাধিকরণে তদ্বিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিতম্ রাজসাক্ষিকম্ ॥ যত্র কচন যেন কেনচিল্লিখিতং সাক্ষিতিঃ স্বহস্তচিত্রিতং সসাক্ষিকম্ ৷ স্বহস্তলিখিতমসাক্ষিকম্ ৷ তদ্বগাংকারিতমপ্রমাণম্ ৷ উপধিকৃতাশ্চ সৰ্ব্ব এব ৷ দুষিতকর্ষদৃষ্টসাক্ষ্যাক্ষিতং তৎ সসাক্ষিকমপি ৷ তাদৃশিধেন লিখিতঞ্চ। জীবালাস্বতন্ত্রমন্তোন্ন্যন্তভীত-তাড়িতকৃতঞ্চ ৷ দেশাচারবিরুদ্ধং ব্যক্তাধিকৃতলক্ষণমলুপ্তক্রমাক্ষরং প্রমাণম্ ॥”

অর্থাৎ,—‘লেখ্য ত্রিবিধ—রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক ও অসাক্ষিক। রাজবিচারালয়ে রাজ-নিযুক্ত মুহুরী দ্বারা লিখিত বিচারালয়াধ্যক্ষের হস্ত ইত্যাদি দ্বারা চিত্রিত লেখ্য—রাজ-সাক্ষিক।* যে কোনও স্থানে যে কোনও ব্যক্তির লিখিত সাক্ষিগণের হস্তচিত্রিত লেখ্য—সসাক্ষিক। আর স্বহস্তলিখিত লেখ্য—অসাক্ষিক। তাহা বলপূর্বক সাধিত হইলে অপ্রমাণ; আর ছলপূর্বক কৃত সকল দলিলই অপ্রমাণ। দুষিত-কর্ষদৃষ্ট সাক্ষিগণের অঙ্কিত লেখ্য সসাক্ষিক হইলেও তাহা প্রমাণ মধ্যে গণ্য নহে। জীলোক, বালক, পরাধীন, মন্ত, উন্নত, ভীত এবং তাড়িত ব্যক্তির কৃত লেখ্যাদি অপ্রমাণ। দেশাচারের অবিরুদ্ধ,

* আদালত প্রভৃতি হইতে আঞ্জিকালি সহি-মোহরাক্রিত যে দলিলাদি পাওয়া যায়, তাহা রাজসাক্ষিক লেখ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। রাজসাক্ষিক লেখ্যাদির লক্ষণ সম্বন্ধে সংহিতায় যে বিধান আছে, সহি-মোহরাক্রিত দলিলাদির সহিত তাহার তুলনায় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

সম্প্রতি হস্তচিহ্নে চিহ্নিত, অলুপ্তবর্ণমালাযুক্ত স্মরণ্য ব্যক্তির লেখ্যই প্রমাণ।' গৌতমাদি সংহিতায় এতৎসংক্রান্ত বিশেষ কোনও ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ সে সময়ে এই সকল বিধানের আবশ্যকতা ছিল না। নক্তকৃত, অস্তরগারকৃত, অরণ্যকৃত প্রভৃতি ব্যবহার বিষয়ে অর্থশাস্ত্রকার যে সকল বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, স্মৃতিশাস্ত্রে সে সকল বিশেষ বিধির উল্লেখ নাই। শাস্ত্রকারগণ কেবলমাত্র ঐরূপ ব্যবহার অসিদ্ধ বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, পরবর্ত্তিকালে, কোটিল্যানির সময়ে, ঐ সকল বিশেষ বিধানের আবশ্যক হইয়াছিল। হিন্দুর বিবাহাদি কার্য্য দিনমানের সম্পন্ন হয় না। সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি শেষ মধ্যেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যদি নক্তকৃত চুক্তিবিষয়ক বিধানের কঠোরতা সমভাবে অমুসৃত হয়, তাহা হইলে বিবাহাদি ব্যাপার একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। আর সেই জন্যই বোধ হয় পূর্ব্বরাত্ৰ্যব্যবহার অসিদ্ধ বলিয়া অর্থশাস্ত্রকার বিশেষ বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু 'অপররাত্ৰ্যকৃত' ব্যবহার সকল কালেই তিনি অসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবসায়ী, চর, ব্যাধ, যৌথ প্রভৃতি বিষয়ে অর্থশাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কারণ, বিশেষ বিধির অবতারণা না হইলে অনেক সময় প্রকৃতিপুঞ্জের বিবিধ ক্লেশদায়ক অবস্থা সংঘটিত হইতে পারিত। তাই তন্নিবারণার্থ ঐ সকল বিশেষ বিধি প্রবর্ত্তনার প্রয়োজনীয়তা অমুদৃত হইয়াছিল। স্মৃতিাদির সময় দিনমানের বিবাহাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হইত,—তাহা বলাও সম্ভব নহে। বিবাহাদি ভিন্ন অন্য বিষয়ে নক্তকৃত ব্যবহার নিষিদ্ধ, স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের সম্ভবতঃ ইহাই অভিমত। *

* ভারতীয় চুক্তি-বিষয়ক আইনে এই সকল বিষয় পৃথানুপৃথানুপে বিধিবদ্ধ আছে। কোন চুক্তি সিদ্ধ ও কোন চুক্তি অসিদ্ধ, তাহাজে সে বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই। সিদ্ধ ও অসিদ্ধ চুক্তি সন্ধক্ষে ঐ আইনে (Indian Contract Act) বাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে নিম্নে মাত্র কয়েকটি বিষয় উদ্ধৃত হইতেছে। তদ্বারা বুঝা যাইবে, স্বকরণকৃত বা বেচ্ছা-প্রণোদিত ব্যবহার সিদ্ধ; তন্নিবন্ধন উপায়ে সম্পাদিত চুক্তি অসিদ্ধ।

"All agreements are contracts if they are made by the *free consent* of parties *competent* to contract for a *lawful consideration* and with a *lawful object*, and are not hereby expressly declared to be void."

"Two or more persons are said to consent when they *agree upon the same thing* in the same sense."

"Consent is said to be *free* when it is not caused by (1) coercion, (2) undue influence, (3) fraud, (4) misrepresentation and (5) mistake."

"When consent to an agreement is caused by *coercion*, fraud, or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused."

"When consent to an agreement is caused by *undue influence*, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused."

"The consideration or object of an agreement is lawful unless (1) it is forbidden by law; or (2) is of such a nature that, if permitted, it would defeat the provisions of any law; or (3) is fraudulent; or (4) involves or implies injury to the person or

অতঃপর চুক্তির লক্ষ্য (উদ্দেশ্য) ও বেতন (দাবী) সম্পর্কে চুক্তি-ব্যবহারের অসিদ্ধতার বিষয়। অর্থশাস্ত্র মতে লক্ষ্য ও বেতন বিধিসঙ্গত হইবে। প্রচলিত বিধান অনুসারে এবং

আয়-যুক্তিতে তাহা বিচার আমলে আসিবার উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক।
 অসিদ্ধ চুক্তির বিষয়। কিন্তু যে স্থলে এক পক্ষ অপর পক্ষের প্রতি অযথা সুরোপ লইবার চেষ্টা করে, সে ক্ষেত্রে যে চুক্তি-ব্যবহার সম্পাদিত হয়, তাহা কদাচ

বিধিসঙ্গত নহে; সুতরাং বিচার আমলে উহা অসিদ্ধ হয়। * এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা একটা সুন্দর দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। কোনও ব্যক্তি নদী-গর্ভে নিমজ্জমান,—শ্রোতমুখে দূরদূরান্তে সংবাহিত হইতেছে; অথবা কোনও ব্যক্তি কোনও হিংস্র জন্তু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি কেহ তাহাকে উদ্ধার করিতে যায় এবং সে জন্ত তাহার বিপন্নাবস্থায়, সুরোপ বুঝিয়া উদ্ধার কর্ত্তা যদি তাহাকে তাহার

property of another or the court regards it as immoral or opposed to public policy. In each of these cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement, of which the object or consideration is unlawful, is void."

"If any part of a single consideration for one or more objects, or any one or any part of any one of several considerations for a single object, is unlawful, the agreement is void." "An agreement made without consideration is void."

"Agreements, the meaning of which is not certain or capable of being made certain, are void." "Agreements by way of wager are void and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager, or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made."

এতদ্বিধা পাত্র কাল প্রভৃতির সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় চুক্তি-বিষয়ক আইনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাহ্যিক ভয়ে এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল না। প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্রোক্ত নজরুত, অন্তরগারকৃত ব্যবহারাদির বিষয় ইহাতে বিশেষ কিছু উল্লিখিত হয় নাই। এখন ঐ সকল বিষয় বিচার আমলে আদে না।

* বর্তমানে এতদ্বিধে যে চুক্তি বিষয়ক আইন প্রচলিত আছে, তাহাতেও 'undue influence' বা অবৈধ সুরোপে নিষ্পন্ন চুক্তি অসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উক্ত আইনের ১৫শ ধারার মতে এইরূপে নিষ্পাদিত ব্যবহার অবৈধ। পরবর্ত্তী ধারায় এই অবৈধ সুরোপের বিষয় বুকান হইয়াছে; যথা,—*"A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other, and uses that position to obtain an unfair advantage over the other."*

এইরূপে যে ব্যবহার সম্পাদিত হয়, চুক্তিকারী ইচ্ছা করিলে সে চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারে। তাহাতে সে কোনরূপ অপরাধে অপরাধী হয় না। কেন-না, বিপন্ন অবস্থায় গড়িয়া তাহাকে এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহার কোনও সম্মতি ছিল না বা স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াও সে উহা সম্পাদন করে নাই। যথা,—*"When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused."*—*Indian Contract Act, Sec. 19A.*

মণাসর্বস্ব বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতি দান করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করেন অথবা বাধ্য হইয়া উদ্ধার-কর্ত্তরি নিকট সে যদি সপরিজন দাসত্ব-স্বীকারের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় ; তাহা হইলে সে চুক্তি বা অঙ্গীকার সিদ্ধ হইবে না। একরূপ চুক্তি নীতিবিরুদ্ধ, ত্রায়বিগর্হিত এবং ধর্ম্মপ্রতিবোধক। এই প্রকার চুক্তির অঙ্গীকৃত বিষয়, উদ্ধার-কর্ত্তা কোনরূপেই পাইবার যোগ্য নহেন। তবে শাস্ত্র-পারদর্শী ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্তে যদি তিনি কিছু পাইবার অধিকারী হন, বিচারক তাঁহাকে সেইরূপ দাবী প্রদান করিবেন ;—অর্থশাস্ত্রের ইহাই অভিমত। এ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের (দাসকল্প: কর্ম্মকরকল্প: দ্রষ্টব্য) উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ; যথা,—

“নদীবেগজালাস্তেনব্যালোপকৃৎ সর্বস্বপুল্লদারাদানেনানর্ত্তজাতারমাহুয়

নিষ্ঠীর্ণ: কুশলপ্রদিশ্চ বেতনং দত্তাৎ । তেন সর্বত্রাৰ্ত্তদানানুশ্রয়া ব্যাখ্যাতা: ॥”

বারাজনার প্ররোচনায় তৎপ্রণয়ী ব্যক্তি কর্ত্ত্বক সম্পাদিত অথবা প্রণয়ীর প্ররোচনায় বা ভীতি-প্রদর্শনে বারাজনা কর্ত্ত্বক নিষ্পন্ন যে অঙ্গীকার বা চুক্তি, তাহাও অসিদ্ধ। এইরূপ অবৈধ উপায়ে সম্পাদিত ব্যবহার বিচারে তিষ্ঠিতে পারে না। ছলকর্ত্ত্বক নিষ্পন্ন চুক্তিও সে হিসাবে অসিদ্ধ। * ‘উপাধিকৃত’ চুক্তি এই পর্যায়েই অন্তর্ভুক্ত। তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে ইহার প্রতিষেধের বিষয়ও দৃষ্ট হয়। এস্থলে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রাজ-নিযুক্ত গুপ্তচরের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল চর কর্ত্ত্বক ছলপূর্ব্বক নিষ্পন্ন চুক্তি অসিদ্ধ হয় না। সে সকল স্থলে এমন অবস্থা ঘটিতে হয় যে, ছলচাতুরী ভিন্ন কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভবনা নাই ; সে সকল স্থলে ঐরূপ পন্থাই অবশ্যজনীয় ;—অর্থশাস্ত্রের তাহা অভিমত। চোর চুরি করিয়াছে ; অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান মিলাতেছে না। এ ক্ষেত্রে চোরের সহিত সৌহার্দ্যস্থাপনে গুপ্তচর যদি মূল্য-প্রদানের অঙ্গীকারে তাহার সহিত চুক্তি-সর্ত্তে আবদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে যদি অপহৃত দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া চর চুক্তি-ভঙ্গ করে—দ্রব্যের মূল্য না দেয় ; তাহা হইলে চরগণের কোনও অপরাধ হইবে না। কারণ, তাহাদের নিষ্পাদিত ছলকর্ত্ত্বক সম্পন্ন চুক্তি অসিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রকার নির্দেশ করিয়াছেন। পরন্তু চৌর্য্যাপরাধে চোরের দণ্ড হইবে। ছলাধিকৃত চুক্তির জন্ত চরগণের প্রতি কোনও দণ্ডবিধান হইবে না। + চোরও চরগণের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবহার স্থাপন করিবার

* ছল-নিষ্পন্ন চুক্তি অসিদ্ধ—ভারতীয় চুক্তি-বিষয়ক আইনে তাহার বিধান আছে। আইনকর্ত্তা বলিয়াছেন,—“When consent to an agreement is caused by...fraud, misrepresentation &c. the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused.—The Indian Contract Act.

+ অধুনা ছল-নিষ্পন্ন সর্বপ্রকার ব্যবহার অসিদ্ধ বলিয়া ব্যবহার-শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই আইনের ঊনবিংশ ধারায় এতদ্বিষয় দৃষ্ট হয়। ছল অনেক প্রকারের হইতে পারে। কোনও অপ্রকৃত বিষয়কে প্রকৃত বলিয়া প্রদর্শন করিলে, তাহা ছল মধ্যে গণ্য। প্রকৃত বিষয় গোপন রাখিলেও ছল হয়। ছলতঃ, যদ্বারা কাহাকেও প্রভারিত করা যায়, তাহাই ছল। কার্য্যে হউক, বাক্যে হউক, ব্যবহারে হউক, প্রভারিতার চেষ্টা থাকিলেই তাহা ছল মধ্যে গণ্য হইবে। ছলের ব্যাখ্যা-ব্যাপদেশে ভারতীয় চুক্তিবিষয়ক আইনে নিম্নরূপ দৃষ্ট হয় ; যথা,—“Fraud means and includes any of the following acts committed by a party to a contract, or with his connivance, or by his agent, with intent to deceive another party thereto or his agent, or to induce him to enter into

অধিকারী নহে। শুণ্ডচর সম্বন্ধে মনুসংহিতায়ও ঐরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সেস্থলে নিক্ষেপাদি ব্যবহার-বিষয় প্রসঙ্গে শুণ্ডচরের উল্লেখ। নিক্ষেপকারী চাহিলে যদি গচ্ছিত ধন কেহ না দেয়, তাহা হইলে উক্ত ধন-নির্ণয়ার্থ প্রাভুবিবাক ছলনাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন, আর তাহাতে তাঁহার বা চরের কোনও অপরাধ হইত না। মনুসংহিতা হইতে এতৎ-সম্বন্ধে কয়েকটা শ্লোক (অষ্টম অধ্যায়, ১৮১ম—১৮৪ম শ্লোক) নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“যো নিক্ষেপং যাচ্যমানো নিক্ষেপ্তুর্নপ্রযচ্ছতি। স যাচ্যঃ প্রাভুবিবাকেন তন্নিক্ষেপ্তুরসম্মিধৌ ॥

সাক্ষাভাবে প্রণিধিভির্বয়োরূপসমম্বিতৈঃ। অপদৈশশ্চ সন্মাস্য হিরণ্যং তস্ত তৎকৃতঃ ॥

স যদি প্রতিপত্ত্বত যথাত্ত্বং যথাকৃতম্। ন তত্র বিত্ততে কিঞ্চিদ্বৎ পঠৈরভিযুক্তাতে ॥

তেষাং ন দত্তাদৃষদি তু তচ্ছিরণ্যং যথাবিধি। উভৌ নিগ্রহ দাপ্যাঃ স্তাদিতি ধর্ম্মস্তা ধারণা ॥”

অর্থাৎ,—‘নিক্ষেপকারী চাহিলে পর গচ্ছিত দ্রব্য যে না দেয়, নিক্ষেপকারীর অসাক্ষাতে প্রাভুবিবাক তাহার ঐরূপ বিচার করিবেন;—সাক্ষীর অভাবে বয়স্ক ও রূপবান চর দ্বারা প্রাভুবিবাক ছলক্রমে ঐ ব্যক্তির নিকট হিরণ্যাদি দ্রব্য গচ্ছিত করাইবেন। পরে নিক্ষেপকারী চর প্রার্থনা করিলে পর, সে যদি ঐ গচ্ছিত দ্রব্য যে রূপে ও যে ভাবে দেওয়া হইয়াছিল, সেইরূপে ও সেইভাবে প্রত্যর্পণ করে, তবে উহার প্রতি অপরের অভিযোগের কোনও কারণ নাই,—ইহা বুঝিতে হইবে। যদি ঐ চরদিগের নিক্ষেপদ্রব্য না দেয়, তবে উহাকে নিগ্রহ করিয়া রাজা উহা হইতে উভয় নিক্ষেপই দেওয়াইবেন।’ মনুসংহিতা ভিন্ন অন্য কোনও সংহিতাগ্রন্থে চর দ্বারা ব্যবহার-নির্ণয়ের বিষয় বিশেষভাবে উক্ত হয় নাই।

অর্থশাস্ত্র মতে যে সকল অসিদ্ধ চুক্তি স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে সিদ্ধ ও প্রামাণ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ‘তিরোহিত’ চুক্তি অন্ততম। ইহার বেশ একটু বিশেষত্ব আছে।

তিরোহিত শব্দে পরোক্ষ বুঝায়। অর্থ-শাস্ত্রের ইহাই অভিমত। মানব-চুক্তি। দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত বা সম্পাদিত বিষয় পরোক্ষ; সুতরাং সাধারণের

অজ্ঞানিত বা অজ্ঞাত। আবার যাহা অবক্তব্য, তাহাও তিরোহিত।

এ হিসাবে, অন্তরগারকৃত, অরণ্যকৃত, উপহ্বরকৃত, নক্তকৃত—সকল প্রকার চুক্তি বা অঙ্গীকার ‘তিরোহিত’ পর্যায়েই অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্তরগার ও অরণ্য প্রভৃতি স্থলে এবং

the contract :—(1) The suggestion, as a fact, of that which is not true by one who does not believe it to be true: (2) The active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. (3) A promise made without any intention of performing it. (4) Any other act fitted to deceive: (5) Any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.”

সকল প্রকার অঙ্গীকারেই স্বাধীন ইচ্ছার বা সম্মতির প্রয়োজন। যখন সম্মতি জ্ঞাপন বা বলিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াও পক্ষ-বিশেষ নির্বাক থাকে, সেখানে এ বিধি প্রযোজ্য নহে। ‘ভারতীয় কণ্ট্রাক্ট অ্যাক্ট’ প্রক্টেন আছে—“Mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstance of the case are such that, regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speech.”

রাজ্যিকালে যে সকল ব্যবহার নিষ্পাদিত হয়, তাহা প্রায়ই সাধারণের অবিদিত ; অন্তরাং তিরোহিত । রাজ্যিকালে সকল স্থানই অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয় ; আর সেই জন্ত যে কোনও স্থান মনুষ্য-দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারে । অতএব দেখা যাইতেছে, তিরোহিত শব্দে দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত বুঝায় এবং তাহা হইতে স্থান, অবস্থা ও কাল সম্বন্ধে একটা বিশিষ্ট ধারণা মনোমধ্যে উদয় হয় । সে সকল লুক্কায়িত স্থানে সম্পাদিত হইলে অঙ্গীকৃত বিষয় বা চুক্তি অসাম্প্রদায়িক হয় অর্থাৎ সাধারণের অবিদিত থাকে । সে সকল ব্যবহার অসিদ্ধ,—ইহাই সাধারণ নিয়ম । পূর্বে এ বিষয় উক্ত হইয়াছে । কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থলে যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে এবং সে সম্বন্ধে যে বিশেষ বিধি কোটিল্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পূর্বে (৩১২ পৃষ্ঠায়) লিপিবদ্ধ করিয়াছি । ‘তিরোহিত’ চুক্তি যে ক্ষেত্রে সিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করার কারণ বিশেষ বিধি উক্ত হইয়াছে, তাহা এই,—“পরোক্ষেণাধিকরণগ্রহণমবজ্ঞব্যাকরা ।” অর্থাৎ ঋণ গ্রহণ স্থলে এবং অবজ্ঞব্য বিষয়ে তিরোহিত চুক্তি সিদ্ধ প্রতিপন্ন হইতে পারে । বিষয়টী বিশদ করার জন্য একটা দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি । রাম একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি । তিনি দেশের প্রধান, সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র । অবস্থা-বিশেষে পড়িয়া তাঁহাকে অধিক পরিমাণ ঋণ করিতে হইল । এই ঋণগ্রহণের বিষয় সাধারণে প্রচারিত হইলে, তাঁহার সে উচ্চ-সম্মানের লাভ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । এ স্থলে তিনি যে ঋণপত্র লিখিয়া দিবেন, তাহা সাধারণে প্রচারিত না হইলেও এবং সাক্ষী প্রভৃতি না থাকিলেও তাহা অসিদ্ধ নহে । অতঃপর সকল অবস্থায় তিরোহিত চুক্তি ব্যর্থ হইবে; কিন্তু এ অবস্থায় উহা সিদ্ধ এবং প্রামাণ্য—অর্থশাস্ত্রের ইহাই অভিমত । অতঃপক্ষে ‘অব্যক্তকর’ তিরোহিত চুক্তিও উপেক্ষণীয় নহে । কারণ, সময় সময় এমন অবস্থা আসিয়া পড়ে যে, সে অবস্থায় বিষয় সাধারণে ব্যক্ত করা যায় না । সেরূপ অবস্থায় লোকে বাধ্য হইয়া যদি কাহারও সহিত কোনও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলেও সে অঙ্গীকার বা চুক্তি সিদ্ধ-পর্যায়ভুক্ত । দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অর্থশাস্ত্রকার বারামনার ও তৎপ্রণয়ী অঙ্গীকারাদির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । অসহপায়ে অথবা সুরোগ গ্রহণে যদি ঐ চুক্তি নিষ্পন্ন না হয়, তাহা হইলে, তিরোহিত পর্যায়ভুক্ত হইলেও, ঐরূপ চুক্তি অসিদ্ধ হইবে । কিন্তু তাহাতে যদি কোনও অবৈধ ক্ষমতা পরিচালনার বিষয় সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে সে চুক্তি সিদ্ধ হইবে না,—পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে । তিরোহিত চুক্তি কেবল রাজ্যিকালে নিষ্পন্ন হওয়ারই নিয়ম । কিন্তু অতঃপর চুক্তি সকল কালে সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় নিষ্পন্ন হইতে পারে । এ হিসাবে, অন্তরাগারকৃত প্রভৃতি চুক্তি-সমূহ হইতে ইহার একটু স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় । অন্তরাগারকৃত ব্যবহার—অন্দরমহলে সম্পন্ন হইবে ; তাহা দিনমানেও হইতে পারে, রাজ্যিকালেও হইতে পারে । অরণ্যকৃত ও উপহরকৃত ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐরূপ উক্তি প্রযোজ্য । আর এক পার্থক্য—অবজ্ঞব্য ও নির্জ্ঞনতা বিষয়ে । তিরোহিত চুক্তির ইহাই বিশেষত্ব । কিন্তু অন্তরাগারকৃত প্রভৃতি চুক্তি সম্বন্ধে এ বিশেষত্ব না থাকিতেও পারে । ঐরূপ বিশেষত্ব না থাকিলেও উহা তিরোহিত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত । অরণ্যকৃত, নক্তকৃত, উপহরকৃত সকল প্রকার চুক্তি, ঐ বিশেষত্ব বর্জিত হইলেও, তিরোহিত মধ্যে গণ্য ।

বর্ণ (জাতি, বর্ণ প্রভৃতি), লক্ষ্য (উদ্দেশ) ও বেতন (দাবী) • প্রভৃতি চুক্তি-ব্যবহারের একটি প্রধান অঙ্গ । ঐ সকলের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, বর্ণ প্রভৃতির বিষয় যথাযথ

উল্লিখিত না হইলে চুক্তি-ব্যবহার যুক্তির উপর তিষ্ঠিতে পারিত না ।

বর্ণ, লক্ষ্য

বেতন প্রভৃতি ।

বর্ণ-সম্বন্ধে কোটিল্য আপন উদ্দেশ্য বিশেষ-ভাবে ব্যক্ত করেন নাই ।

বর্ণ বলিতে চুক্তি-বিষয়ক কোন্ কোন্ বিষয় উহার অন্তর্ভুক্ত হয়, অর্থশাস্ত্রে তাহার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না । তবে উহা হইতে অনুমান হয়, সর্বণ ব্যক্তির সমক্ষে চুক্তি-ব্যবহার সম্পন্ন করাই কোটিল্যের অভিপত্য । ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের সাক্ষাতে, বৈশ্য বৈশ্যের সম্মুখে এবং শূদ্র শূদ্রের সমক্ষে চুক্তি-ব্যবহার সম্পাদন করিবেন,—বর্ণ শব্দের ব্যবহারে কোটিল্য সেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয় । আবার জীলোক জীলোকে সাক্ষাতে, পুরুষ পুরুষের সাক্ষাতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইবেন,—তাহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে । স্বজাতি সর্বণ ও সবৃত্তিজীবী ব্যক্তির সমক্ষে চুক্তি-ব্যবহার নিষ্পন্ন হইবার ইহাই সাধারণ নিয়ম । কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে ঐরূপ ব্যক্তির অভাব হয়, সে অবস্থায় স্বজাতি সর্বণ অথচ ভিন্ন-ব্যবসায়ী ব্যক্তিও সাক্ষী মধ্যে গণ্য হইতে পারে । তদভাবে বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির সমক্ষে ব্যবহার নিষ্পন্ন হওয়ার বিধি কোটিল্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । এ সম্বন্ধে সংহিতা-শাস্ত্রের উক্তি-সমূহ অপেক্ষাকৃত প্রাজ্ঞ । মহু (অষ্টম অধ্যায়, ৬৮ম শ্লোক) বলিয়াছেন,—

“জীবাং সাক্ষ্যং দ্বিগুণং কুৰ্যুর্দ্বিজানাং সদৃশা দ্বিজাঃ । শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণামন্ত্যানাং সন্ত্যাবোনয়ঃ ॥”

অর্থাৎ,—“জীদিগের সাক্ষী জীলোক হইবে, দ্বিজের সাক্ষী সদৃশ দ্বিজ হইবে ; শূদ্র শূদ্রের সাক্ষী এবং নীচ জাতির সাক্ষী নীচজাতিই হওয়া উচিত ।” কিন্তু অন্তরঙ্গার প্রভৃতি ব্যবহারে যে কোনও সাক্ষীর বিষয় মহু উল্লেখ করিয়াছেন । (অষ্টম অধ্যায়, ৬৯ম—৭০ম শ্লোক) যথা,—

“অনুভাবী তু যঃ কশ্চৎ কুৰ্য্যাৎ সাক্ষ্যং বিবাদিনাম্ । অন্তর্কেষ্মন্যরণ্যে বা শরীরস্থাপি চাত্যয়ে ॥

দ্বিরাপাসম্ভবে কার্য্যং বালেন স্থবিরেণ বা । শিষ্যেন বন্ধুনা বাপি দাসেন ভূতকেন বা ॥”

এ সকল স্থলে সাক্ষী বিচার করা নিষ্প্রয়োজন,—মহু বলিয়া গিয়াছেন । স্বজাতি সর্বণ ব্যক্তির সমক্ষে ব্যবহারাদি নিষ্পন্ন করিবার ব্যবস্থা বিষয়ে মহুর সহিত যাজ্ঞবল্ক্য একমত । কিন্তু বিষ্ণু বা গৌতম সংহিতায় এ সকল বিষয়ের বিশেষ কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না । অর্থশাস্ত্র মতে, চুক্তিকারী পক্ষগণ ‘প্রমাণগুণযুক্ত’ অর্থাৎ চুক্তি-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার যোগ্য ও অধিকারী কিনা, তাহা বিচার করা প্রয়োজন । উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন চুক্তি অসিদ্ধ—পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে । † দারিদ্র্যপীড়নে প্রণীড়িত আর্ন্তব্যক্তি; কোপনস্বভাব, নদোন্নত

* কোটিল্যোক্ত বেতন—ইংরাজী ভাষার Consideration এর সহিত তুলনা করা যায় । বেতন অর্থে যে বিষয়ের জন্য চুক্তি-ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় । ঞামের নিকট ১০,০০০ টাকা লইয়া রাম তাহার একখানি বাড়ী ঞামের নিকট বিক্রয় করিতে স্বীকার করিল । এস্থলে ঞামের ১০,০০০ টাকা দিবার অঙ্গীকার, রামের বাড়ী সম্বন্ধে ‘বেতন’ পর্যায়ভুক্ত ; আর রামের বাড়ী, ঞামের ১০,০০০ টাকা সম্পর্কে ‘বেতন’ মধ্যে গণ্য । এইরূপ-ভাবে বেতন নির্ধারণ ব্যবহার-শাস্ত্র-সম্মত ।

† চুক্তিবর্ধার যোগ্যতা সম্বন্ধে ভারতীয় চুক্তি-বিষয়ক বিধানে এইরূপ বিধি দৃষ্ট হয় ; যথা,—“Every person

দান্যাদি, উন্নাদগ্রন্থ এবং অপগৃহীত ব্যক্তি—ইহাদের সহিত ব্যবহার-বিধানের আবশ্য হওয়া কদাচ কৰ্ত্তব্য নহে। * যদ্যপি স্মৃতিগ্রন্থে এতদনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। আর্ন্ত প্রভৃতির নিষ্পাদিত ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলেও যদি তাহারা ঐরূপ ব্যবহার-বিধানের কোনও উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে ব্যবহার সিদ্ধ হয়,—অর্থশাস্ত্রের ‘দাসকর্মে’ এ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রের আর একটা বিশেষ বিধি—‘এজেন্ট বা প্রতিনিধির দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন। কে কাহার প্রতিনিধি রূপে এইরূপ ব্যবহারসম্পন্ন করিবার অধিকারী, তৎসম্বন্ধে কোটিল্য বাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; বর্থা,—

“অপাশ্রয়বত্তিষ্ঠ কৃত্যঃ, পিতৃমত্যা পুত্রেন, পিত্রা পুত্রবত্যা, নিম্নুলেন ভ্রাতা,
কনিষ্ঠেনাবিত্তক্যাংশেন, পতিমত্যা পুত্রবত্যা চ জিত্রা, দাসাহিতকাত্যাং” অপ্রাপ্তা-
তীতব্যবহারাত্যাং, অভিশস্তপ্রজিতব্যঙ্গব্যসনিষ্ঠাশ্চান্ননিষ্কৃতব্যবহারেভ্যঃ।”

অর্থাৎ,—আশ্রয়বত্তি বা আশ্রিত ব্যক্তিগণ, আশ্রয়দাতার অনুজ্ঞা অনুসারে তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ আশ্রয়দাতার পক্ষে চুক্তি-ব্যবহার সম্পন্ন করিতে পারে। পিতার প্রতিনিধিরূপে পুত্র, ভিন্ন-পরিবার-ভুক্ত জ্ঞাতি ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতিনিধি-স্বরূপ, একানবর্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিনিধি হইয়া ব্যবহার সম্পাদন করিবার অধিকারী। স্বামীর পক্ষে স্ত্রী, পুত্রের পক্ষে মাতা, প্রভুর পক্ষে কর্মচারী বা ক্রীতদাস, অপ্রাপ্তব্যবহার বা নাবালক সাবালকের পক্ষে প্রতিনিধি-স্বরূপ ব্যবহার-কার্য সম্পাদন করিলে সে ব্যবহার সিদ্ধ হইবে। এতদ্বির বাহারা ‘অতীত-ব্যবহার’ অর্থাৎ বাহারা নির্দিষ্ট বয়সকাল অতিক্রম করিয়াছেন, অভিশস্ত (শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি), প্রজিত (সন্ন্যাসী), ব্যঙ্গ (বিকলেজির ব্যক্তি) এবং ব্যসনী (ব্যসনাসক্ত ব্যক্তি) অল্প কৰ্ত্তৃক আদিষ্ট হইলে, তাঁহার পক্ষ হইয়া, চুক্তি-ব্যবহার সম্পন্ন করিতে পারেন। আর তাঁহাদের কৃত সে ব্যবহার অসিদ্ধ হয় না। মত, উন্নত, বৃদ্ধ, স্থবির প্রভৃতি ব্যবহার-স্থাপনায় বা ব্যবহার-সম্পাদনে অধিকারী নহে এবং তাহাদের নিষ্পাদিত ব্যবহার অসিদ্ধ,—মহু, বাঙ্গবন্ধা, বিষ্ণু, গৌতম প্রভৃতি সংহিতাকারের ইহা অভিমত। এতদ্বিবয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কোটিল্যের মতে, তাঁহারা অপর ব্যক্তি কৰ্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ ব্যবহার-

is competent to contract who is of age of majority according to law to which he is subject, and who is of sound mind, and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject....A person who is usually of unsound mind, but occasionally of sound mind, may make a contract when he is of sound mind. A person who is usually of sound mind, but occasionally of unsound mind, may not make a contract when he is of unsound mind.”

* উন্নাদগ্রন্থ কৰ্ত্তৃক সম্পাদিত ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়া সর্বত্র বিহিত হইয়াছে কিন্তু বাহারা সময় সময় উন্নাদগ্রন্থ হয় এবং সময় সময় প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহাদের প্রকৃতিস্থ থাক। সময়ে নিষ্পন্ন ব্যবহার অসিদ্ধ হয় না, ভারতীয় চুক্তি-বিষয়ক আইনে তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আবার প্রকৃতিস্থ অথচ রোগাক্রান্ত জন যখন রোগ-ব্রণায় প্রলাপ বকিতে থাকে, সে সময় তাহার নিষ্পাদিত ব্যবহার অসিদ্ধ নহে। *Vide, Indian Contract Act, Sec. 11.*

সম্পাদন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহারা স্বয়ং কোনও বিষয়ে চুক্তি-ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতে পারেন কিনা,—কোটীলা তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন নাই। সংহিতা গ্রন্থাদিতেও প্রতিনিধির দ্বারা ব্যবহার-স্থাপনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। নারদাদি ঋষির মতে, পিতা ভ্রাতা পুত্র বা অপর কোনও নিযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগকর্তার প্রতিনিধিরূপে ব্যবহার-সম্পাদনের অধিকারী। কিন্তু কেহ যদি অনিয়ুক্ত হইয়া কাহারও পক্ষে ব্যবহার উপস্থিত করেন, তিনি দ্বার্য্যতঃ দণ্ডনীয়। এইরূপ ব্যবহারে যদি ব্যবহার-উত্থাপনকর্তার পরাজয় হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার ক্ষতিপূরণ করিবেন। যাহার পক্ষে তিনি ব্যবহার উত্থাপন করিয়াছেন, তিনি সে ক্ষতি দায়ী হইবেন না; তিনি ক্ষতি-পূরণ করিতেও বাধ্য নহেন। বিষ্ণু-সংহিতায় প্রতিনিধি দ্বারা সাক্ষ্য দিবার ব্যবস্থা আছে। নির্দিষ্ট সাক্ষী মৃত বা দেশান্তরগত হইলে, যাহারা তাহার বক্তব্য অবগত থাকিবে, তাহারাই প্রমাণ—বিষ্ণুতে এ বিধান দেখিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন,—“উদ্দিষ্ট সাক্ষিণি মৃত্যে দেশান্তরগতে বা তদভি-হিতজ্ঞাতারঃ প্রমাণম্ ॥” এতদ্ব্যতীত সংহিতা-গ্রন্থে এমন সকল অবস্থার বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে, যেখানে পূর্ব-পক্ষ বা প্রতিনিধি দ্বারা ব্যবহার সম্পাদন সম্ভবপর ছিল না। অপ্ৰাপ্ত-ব্যবহার ও অতীতব্যবহার প্রভৃতি ব্যক্তির ব্যবহার-যোগ্যতা ছিল না,—সকল সংহিতায়ই তাহার উল্লেখ আছে। অভিশস্ত ও বহিস্কৃত ব্যক্তি যেমন কোটীলা মতে স্বয়ং ব্যবহার-সম্পাদনের অযোগ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সংহিতাদির মতেও তাঁহাদের সেই অযোগ্যতা নির্ণীত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৩ম শ্লোক) বলিয়াছেন,—

“মন্তোন্নতান্ত্যাসনিবালভীতাদিযোজিতঃ। অসম্বন্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারো ন সিদ্ধতি ॥”

অপর এক স্থতি-গ্রন্থে আছে,—“যশ রাজ্ঞা বিবর্জিত ভবেদ্বাদঃ ধর্ম্মবিত্তিকদাহত।” যাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত অথবা সমাজ-বহিস্কৃত, তাহার মৃত্যের মধ্যে গণ্য; আর সেই জন্ত তাহাদের সম্পাদিত ব্যবহার সকল কালেই অসিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাদের নিষ্পাদিত ব্যবহার সম্বন্ধে কোটীলা বিশেষ কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। অপরের প্রতিনিধি-স্বরূপ তাহার অপরের পক্ষে ব্যবহার সম্পাদন করিবার অধিকারী,—তিনি কেবলমাত্র ইহাই বলিয়াছেন। জ্ঞীলোকদিগের ব্যবহার-সম্পাদন-যোগ্যতা সম্বন্ধে কোটীলার অভিমত স্মৃতির অনুসারী। নিবিদ্ধ-স্থলে অপরের সহিত অর্থ-সম্বন্ধে যুক্ত হওয়া জ্ঞীলোকের পক্ষে জ্ঞান-বিগর্হিত,—কোটীলা সে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের ‘বিবাহ-সংযুক্তে—প্রতিষেধ’ অংশে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ আছে।

অসাক্ষিক ভিন্ন অল্প সকল প্রকার ব্যবহারেই সাক্ষীর প্রয়োজন; আর বিশেষ বিশেষ কাল ও স্থান ব্যতীত অসাক্ষিক ব্যবহার প্রমাণ মধ্যে গণ্য হয় না;—পূর্ববর্তী অংশ-

সাক্ষীর
প্রকার।

সমূহে এ সকল বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সে সাক্ষীরও প্রকারভেদ ছিল। সাক্ষী—সত্য ও মিথ্যা উভয়ই হইতে পারিত।

মিথ্যাসাক্ষী স্থলে নানারূপ দণ্ডের বিধান স্মৃতি-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

সে দণ্ড—ব্রাহ্মণের পক্ষে একরূপ বিহিত হইত; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একরূপ ব্যবস্থা ছিল।

বৈশ্যের পক্ষে একরূপ এবং শূদ্রের পক্ষে অল্পরূপ দণ্ডের বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

কাম-ক্রোধ-লোভ-অনবধানতা-অজ্ঞানতা প্রভৃতি ভেদে মিথ্যা সাক্ষ্য চারি ভাগে বিভক্ত । ক্রোধাধীন হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে তিন হাজার পণ, লোভাধীন মিথ্যা সাক্ষীর এক হাজার পণ, কামাধীন মিথ্যা সাক্ষীর আড়াই হাজার পণ, অজ্ঞানতাবশতঃ মিথ্যা সাক্ষী দিলে দুই শত পণ এবং অনবধানতাবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে এক শত পণ দণ্ডের বিষয়— যহু বিহিত করিয়াছেন । * যাজ্ঞবল্ক্য এবং বিষ্ণু এতদ্বিষয়ে অমুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । তবে যে স্থলে সত্য-কথা কহিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের প্রাণবধ হয়, সেস্থলে সত্য অপেক্ষা মিথ্যা-কথনই প্রশস্ত ; আর সে মিথ্যাকথনে কোনও দণ্ড হইবে না ;— স্বতিশাস্ত্রকারগণের ইহা অভিমত । যহুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, বিষ্ণু-সংহিতা, গৌতম-সংহিতা ও বসিষ্ঠ-সংহিতা হইতে এতদ্বিষয়ক শ্লোক-কয়টা যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ।

“শূদ্রবিট্ফল্লবিপ্রাণাং যজ্ঞস্তোক্তৌ ভবেদধমঃ ।

তত্র বক্তব্যমনুতঃ তচ্চি সত্যাদিশিষ্যাত ॥”—যহু ।

“বর্ণিনাস্ত বধো যত্র তত্র সাক্ষানুতং বদেৎ ।

তৎপাবনায় নিকীপ্যশ্চরঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ ॥”—যাজ্ঞবল্ক্য ।

“সাক্ষিগণশ্চ সত্যেন পূরন্তে । বর্ণিনাং যত্র বধস্তত্রানুত্তেন ॥”—বিষ্ণু ।

“নানুতবচনে দোষো জীবনক্ষেমদধীনঃ ॥”—গৌতম ।

“ঋত্বাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্কধনাপহারে ।

বিপ্রস্ত চার্থে অনুতং বদেয়ঃ পঞ্চানুতাত্তাহরপাতকানি ॥”—বসিষ্ঠ ।

* মিথ্যা-সাক্ষ্য দেওয়া ও মিথ্যা-ব্যবহার-স্থাপন—চিরকালই দৃশ্যীয় । প্রাচীন-কালের ব্যবহার-শাস্ত্রে এতদ্বিষয় যেমন দণ্ডণীয় বলিয়া বিহিত ; কোলদারী দণ্ডবিধি আইনের বিধান অনুসারেও উহা তেমনি দণ্ডার্য বলিয়া পরিকল্পিত । দণ্ডবিধি আইনের (Indian Penal Code) বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন-রূপ দণ্ডের বিধান আছে । এস্থলে সে সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খ উল্লেখ নিশ্চয়োজন । সাধারণ বিধি যাহা, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ; যথা,—“Whoever intentionally give false evidence in any stage of a judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine ; and whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.”—Sec. 193.

“Whoever with intent to cause injury to any person, institutes, or causes to be instituted, any criminal proceeding against that person, or falsely charges any person with having committed an offence, knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.”—Sec. 211.

এইরূপ, হুতাদণ্ডে দণ্ডিত হইবার উপযোগী মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে, অভিযোগকারীর দণ্ড বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের আদেশ হইতে পারে । এই প্রকার বকদান্য স্থলে মিথ্যা সাক্ষী দিলে, সাক্ষীর বাবজীবন কারাদণ্ড পর্য্যন্ত হইবার বিধি, দণ্ডবিধি আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে ।

অধুনা যেমন অর্থী, প্রত্যর্থী ও সাক্ষীদের উত্তরাদি লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা বর্তমান আছে ; প্রাচীন কালেও সে প্রথার বিস্তৃতিমানতার পরিচয় পাওয়া যায়। এখন যেমন উত্তর লিখিবার পর তাহা উত্তরকারীকে শুনাইবার ব্যবস্থা বিহিত আছে ; প্রাচীনকালেও সে প্রথা বর্তমান ছিল,—প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থাস্তর হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। কথিত হয়,—শ্লোকটি কাত্যায়ন কর্তৃক উক্ত হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক সংস্করণে শ্লোকটি দৃষ্ট হয় না। সে শ্লোকটি এই,—

“পূৰ্ণপক্ষং স্বভাবোক্তং প্রোড়্‌বিবাকোহভিলিখয়েৎ ।

পাণ্ডুলেখেন ফলকে ততঃ পত্রে বিশোধিতম ॥”

অর্থী, প্রত্যর্থী প্রভৃতির উত্তর এ হিসাবে প্রথমে পত্রে লেখা হইত না। প্রথমতঃ প্রোড়্‌বিবাক বা বিচারক মৃত্তিকা-ফলকে উহা লিখিয়া লইতেন। পরে উত্তরকারীকে উহা শুনাইতে হইত। উত্তরকারী যদি বিস্তৃত বলিয়া স্বীকার করিত, তাহা হইলে সে উত্তর পত্রে লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু প্রত্যর্থী কোনও উত্তর না দিলে, অর্থীর দাবী সপ্রমাণ হইয়া যাইত। অর্থী যদি তাহার ভাবার কোনও পরিবর্তন সাধন করিবার অভিলাষী হইতে, তাহা হইলে প্রত্যর্থীর উত্তর-দানের পূর্বে তাহার বর্ণিত ভাবার ইচ্ছামত পরিবর্তন সাধন করিতে পারিত। কিন্তু প্রত্যর্থীর উত্তর-দানের পর আর কোনও পরিবর্তন চলিত না।* ছলে, বলে বা শ্লোক-বাক্যে যে সকল ব্যবহার সম্পন্ন হইত, তাহা অসিদ্ধ—স্বতি-শাস্ত্রকার ও অর্থশাস্ত্রকার সকলেরই এই অভিমত। মনু বলিয়াছেন,—‘বলপূৰ্ণক বাহা কিছু দত্ত হয়, বলপূৰ্ণক বাহা কিছু ভুক্ত হয়, বলপূৰ্ণক বাহা কিছু লিখিত হয়,—বলপূৰ্ণক বাহা কিছু কৃত হয়,—তাহার সকলই অকৃত বা অসিদ্ধ।

“বলাদত্তং বলাভুক্তং বলাদ্বক্ষ্যাপি লেখিতম্ । সৰ্বান্‌ বলকৃতানর্থানকৃতান্‌ মনুরব্রवीৎ ॥”

এই সকল বিষয় সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রোড়্‌বিবাক স্বেচ্ছাক্রমে উভয় পক্ষেরই অমানিত তৃতীয় ব্যক্তিকে ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন। আর সেই ব্যক্তি যদি যথাদৃত ও যথাক্রম সত্য কথা বলিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সে উত্তর সমাদৃত হইত। ব্যবহার-সপ্রমাণে বিবিধ ক্রিমার বিষয় শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম—মাহুবী ; দ্বিতীয়—দৈবী। সাক্ষী লেখাদি দ্বারা যে ব্যবহার সপ্রমাণ করা হয়, সেই সাক্ষী-লেখাদি প্রমাণ মাহুবী। আর যেখানে সাক্ষী বা লেখা কিছুই নাই, সেখানে দিব্য বা শপথ দ্বারা

* বিচারদালতে আজিকালি যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়, প্রাচীন পদ্ধতি হইতে তাহা একটু স্বতন্ত্র। প্রত্যর্থীর উত্তর দিবার পূর্বে অর্থী তাহার আবশ্যকমত পরিবর্তন সাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু দেওয়ানী কার্যাবধি আইনের ‘প্লিডিং’ অংশে দেখা যায়, অর্থী ও প্রত্যর্থী যে কোনও সময়ে তাহার পরিবর্তন-সাধন করিতে পারেন। এ সবকে নিয়ে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল,—“The Court may at any stage of the proceeding allow either party to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms as may be just and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties.” প্রত্যর্থীর উত্তরের আবশ্যকানুরূপ পরিবর্তন-সাধনের বা সংশোধনের বিষয় স্বতি-শাস্ত্রাদিতে বিশেষ কিছু উল্লিখিত হয় নাই। কিন্তু এখনকার বিধান মতে অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয় পক্ষই তাহার ও উত্তরের আবশ্যক-মত পরিবর্তন-সাধন করিতে পারেন।

ব্যবহার নিষ্পন্নের ব্যবস্থা হয়;—তাহাই হইল দৈব্য । বিষয়টী স্মরণ ও সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত মনু-সংহিতা হইতে একটা শ্লোক (৮ম অধ্যায়, ১০৯ম শ্লোক) উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

“অসাক্ষিকেষু তর্পণেযু মিথো বিবদমানয়োঃ ।

ন বিন্দন্তস্ততঃ সত্যং শপথেনাপি লভয়েৎ ॥”

অসাক্ষিক সর্বপ্রকার বিবাদ-স্থলেই মনু দিবা-ধারণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন । কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান অতীত । তিনি বিশেষ বিশেষ স্থলে, রাজস্রোহ ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ সম্বন্ধে, দিবা-ধারণের ব্যবস্থা দিয়াছেন । এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি (২য় অধ্যায়),—

“মহাভিযোগেষু তানি শীর্ষকস্বেহক্ৰিয়াক্তারি ॥” ৯৭ ॥

“নৃপার্থেষু ভিযোগে চ বহেযুঃ শুচয়ঃ সদা ॥” ১০১ ॥

বিষ্ণুসংহিতার মতেও গুরুতর অভিযোগ ভিন্ন অত্র দিবা-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না । কিন্তু যে ক্ষেত্রে প্রত্যর্গীর নির্দেশমত অর্গী দণ্ড-গ্রহণে স্বীকার করিতেন, সে ক্ষেত্রে দিবা প্রমাণ প্রশস্ত ছিল । তবে, গুরুতর অভিযোগাদি বিষয়ে অর্গীর ঐক্য শপথের আবশ্যক হইত না । দিবা দ্বারা ব্যবহার-নির্ণয় সে ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম মধ্যে পরিগণিত ছিল । স্থল-দৃষ্টিতে দেখিলে, গুরুতর অভিযোগ ভিন্ন অত্র ক্ষেত্রে, সাক্ষী প্রভৃতি স্থলে, দিবা-প্রমাণের অনাবশ্যকতার বিষয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন । আর একটা কথা—চুক্তি-ব্যবহার-সংক্রান্ত । চুক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে শাস্ত্রকার যে বিধানের উল্লেখ করিয়াছেন, তদনুসারে সর্বপ্রকার করণই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় । অর্গশাস্ত্রে ও স্মৃতি-গ্রন্থাদিতে ঋণদান, বিক্রয়, নিষ্কেপ, উপনিধি, প্রতিভূ, সমুদ্র-সমুখান, দাসকল, কর্মকরকল প্রভৃতি চুক্তি-ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । দায় প্রভৃতিও এক হিসাবে চুক্তির অন্তর্গত । বন্ধকও চুক্তি-পর্গায়ভুক্ত ।

চুক্তি-নিষ্পাদিত ব্যবহার-বিশেষে প্রতিভূর আবশ্যকতা অস্বত্বত হয় । প্রাচীন সংহিতা-গ্রন্থে ঋণদান-সংক্রান্ত বিধানে প্রতিভূর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় । অবস্থা-ভেদে কোটীল্যও

প্রতিভূ বা জামিনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহাও ঋণ, প্রতিভূ
প্রদত্ত । দান-বিক্রয় প্রভৃতির প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে । প্রাচীন-কালে ঋণদান

ও ঋণ-গ্রহণ মুখ্য ব্যাপার ছিল । শাস্ত্রকারগণ তাই ঐ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ সমূহ প্রথমে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন;—ঋণ-প্রকরণের বাহুলা দৃষ্টে এই ধারণাই প্রবল হয় । প্রতিভূ তিন প্রকার—দর্শন-প্রতিভূ, প্রত্যয়-প্রতিভূ ও দান-প্রতিভূ । এতদ্ব্যতীত যে প্রতিভূ, তাহা ‘আধি’ নামে অভিহিত হইয়াছে । অপরাধী দ্বৃত হইয়াছে; যিনি তাহাকে আবশ্যক মত দেখাইয়া দিবার অঙ্গীকারে প্রতিভূ বা জামিন হন, তিনি—দর্শন-প্রতিভূ । ঋণদান স্থলে, ঋণদাতার অবিশ্বাস উৎপন্ন হইলে যিনি প্রতিভূ হইয়া বলেন,—‘এ ব্যক্তি ঠিকাইবে না, ইহাকে ঋণ দিতে পারেন, ইনি বিশ্বাসী;—তিনি প্রত্যয়-প্রতিভূ । আর ‘ঋণকারী ঋণ না দিলে, আমি তাহা দিব’—এইরূপ অঙ্গীকারে যিনি প্রতিভূ বা জামিন হন, তিনি দান-প্রতিভূ । এতদ্ব্যতীত সম্পত্তি, অলঙ্কার প্রভৃতি বন্ধক রাখিলে, ঐ সম্পত্তি বা অলঙ্কার ‘আধি’ নামক জামিন পর্যাধভুক্ত হয় । পূর্বোক্ত ত্রিবিধ প্রতিভূর দায়িত্ব-সম্বন্ধে সংহিতা-শাস্ত্র নানা বিধান বিহিত আছে । ঋণকারী যদি ঋণ-পরিশোধ না করে, তাহা হইলে প্রতিভূকর্তৃক

নিকট হইতে ঐ ঋণ আদায় হইবে। প্রতিভূগণের মৃত্যু হইলে, তাঁহাদিগের উত্তরাধি-
কারিগণ ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন। এ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন; যথা,—

“যো যশ্চ প্রতিভূতিষ্ঠেদর্শনারেহ মানবঃ। অদর্শয়ন স তৎ তশ্চ প্রযচ্চেৎ স্বধনাদৃগম্ ॥

দর্শনপ্রতিভাব্যো তু বিধিঃ স্তাৎ পূর্ব্বচোদিতঃ। দানপ্রতিভুবি প্রোতে দানাদানপি দাপয়েৎ ॥

অদাতরি পুনর্দাতা বিজ্ঞাতপ্রকৃতাবুগম্। পশ্চাৎপ্রতিভুবি প্রোতে পরীক্ষ্যেৎ কেন হেতুনা ॥

নিরাদিষ্টধনশ্চেৎ তু প্রতিভূঃ স্তাদলং ধনঃ। স্বধনাদেব তদন্ত্যগ্নিরাদিষ্ট ইতি স্থিতিঃ ॥”

অর্থাৎ,—যে যাহার দর্শন-প্রতিভু বা হাজির জামিন থাকিবে, সে যদি যথাকালে অধমর্গকে উপস্থিত করিয়া না দিতে পারে, তবে উত্তমর্গের ঋণ তাহাকে দিতে হইবে। দান-প্রতিভু সম্বন্ধে বিধান এই যে, পিতা মাল জামিন রাখিয়া মরিয়া গেলে পুত্রাদি দানাদগণকে ঐ ঋণ দিতে হইবে। যদি দর্শন-প্রতিভু বা প্রোত্য-প্রতিভু অধমর্গের নিকট হইতে ঋণ-শোধনের উপযোগী উচিত ধন গ্রহণ করিয়া প্রতিভু হইয়া মরিয়া যান, তাহা হইলে পুত্রগণকে অর্থ দ্বারা উত্তমর্গের ঋণ দিতে হইবে।’ এতৎ-সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য, মনুর সহিত একমত। তিনিও বলিয়াছেন,—দর্শন-প্রতিভু বা দান-প্রতিভু যদি আপনাদের কথা ঠিক না রাখেন, তাহা হইলে রাজা তাঁহাদের দ্বারা উত্তমর্গের অর্থ দেওয়াইবেন।’ কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে,—যদি ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে কিরূপ বিধান বিহিত হইবে? তদ্বত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—‘দানের প্রতিভুর অভাবে তৎপুত্র দ্বারা রাজা উত্তমর্গের প্রদত্ত ধন দেওয়াইবেন। এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি; যথা,—

“দর্শনে প্রোত্যে দানে প্রতিভাব্যং বিধীয়তে। আদৌ তু বিতথে দাপ্যাবিতরশ্চ স্তুতা অপি ॥

দর্শনপ্রতিভূর্ভুক্ত মৃতঃ প্রোত্যায়িকোহপি বা। ন তৎ পুত্রা ঋণং দহাদ্ধাদানায় যে স্থিতাঃ ॥”

বিষ্ণু-সংহিতায়ও সেই একই উক্তি দেখিতে পাই। বিষ্ণুও বলিয়াছেন,—দর্শনে, প্রোত্যে ও দানে প্রতিভু বিহিত হয়। কথা ঠিক না থাকিলে অর্থাৎ অধমর্গ উত্তমর্গের ঋণ না দিবে (রাজা উত্তমর্গের প্রদত্ত অর্থ) প্রথম দুই জনের নিকট হইতে দেওয়াইবেন।’ যথা,—“দর্শনে প্রোত্যে দানে প্রতিভাব্যং বিধীয়তে। আদৌ তু বিতথে দাপ্যাবিতরশ্চ স্তুতা অপি ॥” কিন্তু বহু ব্যক্তি যে স্থলে প্রতিভু গ্রহণ করেন, তখন তাহার বিধান অন্তরূপ। মনুতে এ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ বিধি দৃষ্ট হয় না। গৌতমাদিও কোনও বিশেষ বিধান বিধিদ্ধ করেন নাই। কেবল যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণু সংহিতাদ্বয়ে এতৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্ররূপ ব্যবহারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—“বহুবঃ স্যাবদি স্বাংশৈর্দাতাঃ প্রতিভুবো ধনম্। একচ্ছায়াশিতোষমু ধনিবস্তু যথা কৃতিঃ ॥” অর্থাৎ,—যদি অনেক ব্যক্তি অংশ নির্দেশ করিয়া একজনের প্রতিভু হয়, তাহা হইলে, যে যেরূপ অংশে প্রতিভু, সে সেইরূপ দিবে। আর যদি বিশেষ অংশ নির্দেশ না করিয়া সকলে মিলিয়া অধমর্গের সদৃশ হয়, তাহা হইলে উত্তমর্গের অভিপ্রায় অনুসারে প্রতিভুগণ অর্থ দিতে বাধ্য।’ যেখানে কোনও অংশ নির্দিষ্ট হয় নাই, সেখানে উত্তমর্গ ইচ্ছা করিলে কোনও এক ব্যক্তির নিকট হইতে সমস্ত ঋণ আদায় করিতে পারেন; অথবা, কাহারও নিকট অল্প, কাহারও নিকট অধিক,—এইরূপ হিসাবেও ঋণ গ্রহণের অধিকারী; আবার তুল্যাংশে আদায় করিতেও তিনি সম্পূর্ণ যোগ্য;—লভ্যবতঃ

সংহিতাকারের ইহাই অভিপ্রায় । বিষ্ণু-সংহিতায়ও ঐ অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে । এতৎসম্বন্ধে সংহিতার উক্তি ; যথা,—“বহবশ্চৎ প্রতিভুবো দদ্যান্তেহর্থং যথাকৃতম্ । অথৈবিশেষ্যতে তেষু ধনিকচ্ছন্দতঃ ক্রিয়াঃ ॥” অর্থাৎ,—বহু ব্যক্তি প্রতিভূ হইলে, যে যেরূপ অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিবে, সে সেইরূপ অর্থ প্রদান করিবে । আর অর্থ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উল্লেখ না থাকিলে, ধনীর অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য হইবে । ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম । কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রতিভূর উত্তরাধিকারিগণ পিতৃকৃত প্রাতিভাবা ঋণ-প্রদানে বাধ্য হন না । পূর্বে (৩০২ম পৃষ্ঠায়) যে ‘মাক্ষিক’ ঋণের বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে । * মনু এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—‘দর্শন-প্রতিভূ হেতু ধন দিতে হইলে, তত্ত্ব প্রভৃতিকে পরিহাস জ্ঞাত বৃথা দানে, দ্যাতক্ৰীড়া বা সুরাপান নিমিত্ত দেয়, দণ্ডনিমিত্ত দেয় এবং শুক্লের অবশেষ—পিতৃকৃত এই সকল দেয় পুত্রকে দিতে হইবে না ।’ মনুসংহিতা হইতে নিম্নে এতৎসংক্রান্ত একটা শ্লোক (অষ্টম অধ্যায়, ১৫৯ম শ্লোক) উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

“প্রাতিভাবাং বৃথাদানমাক্ষিকং সৌরিকঞ্চ যৎ ।

দণ্ডশুকাবশেষঞ্চ ন পুত্রো দাতুমর্হতি ॥”

যাজ্ঞবল্ক্যের মতেও এই সকল পিতৃঋণ উত্তরাধিকারিগণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নহেন । তিনিও বলিয়াছেন,—“সুরাকামদ্যাতকৃতং দণ্ডশুকাবশিষ্টকম্ । বৃথাদানং তথৈবেহ পুত্রো দত্ত্বাশ পৈতৃকম্ ॥” গৌতমের মতে উত্তরাধিকারী ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য তবে সে ঋণ যদি পিতার জামিনী জ্ঞাত হয়, অথবা পিতার বাণিজ্যের জ্ঞাত যদি কিছু রাজকর দেয় থাকে, কিম্বা মন্দের দোকানে বা দ্যাতকারীর নিকট পিতা যদি ঋণী হইয়া পরলোক গমন করেন, অথবা পিতার যদি কিছু রাজদণ্ড দেয় থাকে, তাহা হইলে পুত্র বা উত্তরাধিকারিগণ সে ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবে না । গৌতম বলিয়াছেন,—“ঋণকণ্ডাজি ঋণং প্রতিকুযাঃ । প্রাতিভাবাবণিকশুকমদ্যদ্যাতদণ্ডান পুত্রানধ্যাতবেষুঃ ॥” বসিষ্ঠেরও ঐরূপ আদেশ । তিনিও বলিয়াছেন,—“প্রাতিভাবাং বৃথাদানমাক্ষিকং সৌরিকঞ্চ যৎ । দণ্ডশুকাবশিষ্টেন ন পুত্রো দাতুমর্হতীতি ॥” অর্থাৎ,—‘পিতার প্রাতিভাবা বা দর্শন ও প্রত্যয় প্রাতিভূ-জনিত দেয় অর্থ, বৃথা দান, দ্যাত-ঋণ, সুরা-ঋণ, রাজদণ্ডের অবশিষ্ট দেয় এবং শুক্লের অবশিষ্ট দেয় আর পুত্র দিতে বাধ্য নহে ।’ বিষ্ণু-সংহিতায় ইহার কোনও উল্লেখ নাই । তাহাতে মনে হয়, সে সময় এ বিধানের কঠোরতা অনেকটা শিথিল হইয়াছিল । কিন্তু আজ-কালি যে প্রকার ঋণই হউক না কেন, উত্তরাধিকারিগণ তাহা দিতে বাধ্য । এখন পূর্ব-বিধি পরিবর্তিত হইয়াছে । ইহার পরিবর্তনের আবশ্যকতাও অন্বভূত হয় । আক্ষিক ঋণের বা বৃথা-দানের অজুহাতে সকল প্রকার ঋণই অনাদেয় হইতে পারে । প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারিলেই যখন ঋণমুক্ত হওয়ার পক্ষে কোনও সংশয় ছিল না ; তখন প্রমাণবলে যৌক্তিক ঋণকেও আক্ষিক, সুরাপান-জনিত বা বৃথাদান-জনিত ঋণ প্রভৃতির পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারিত । বোধ হয় এই সকল বিষয়ের সমাক্ষ আলোচনা করিয়াই

* এই গ্রন্থের ৩০২ পৃষ্ঠায় ‘মাক্ষিক’ শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে । ‘মাক্ষিক’ শব্দ ব্যবহার-শাস্ত্র-সম্মত নহে । ‘আক্ষিক’ শব্দ সুশাকর-প্রমাদে ‘মাক্ষিক’ রূপে মূত্রিত হইয়াছে ।

পরবর্ত্তিকালে ব্যবহার-শাস্ত্রকারগণ সৰ্ব্বপ্রকার ঋণে উত্তরাধিকারীর বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির দায়িত্বের বিষয় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রতিভূর অপর পর্যায়—আধি। প্রাচীন ব্যবহার-শাস্ত্রে আধি—বন্ধকীর দ্রব্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঋণাদান প্রভৃতি প্রসঙ্গেই প্রধানতঃ ইহার উল্লেখ। সংহিতা-শাস্ত্রকার ও অর্থশাস্ত্রকার ঋণ-প্রসঙ্গে আধির উপযোগিতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

কোটিলা-মতে
আধি।

স্বাবর-অস্বাবর ভেদে আধি দ্বিবিধ। আধি সম্বন্ধে কোটিলা স্বতন্ত্র-ভাবে

বিশেষ কোনও নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন নাই। তবে ঋণ এবং নিক্ষেপ ও

উপনিধি প্রসঙ্গে তিনি যে সকল বিধি-বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা হইতে ‘আধির’ বিধান সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ববর্ত্তী সংহিতাকারগণ ‘আধি’ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। আধি বা বন্ধকীর দ্রব্য যদি উত্তমর্ণ ব্যবহার করেন অথবা বিক্রয় করেন, অথবা বন্ধক দেন, অথবা হারাইয়া ফেলেন, কিংবা যদি তাঁহার নিকট হইতে ঐ দ্রব্য দস্যুতে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়; তাহা হইলে উত্তমর্ণ তাহার ক্রয় ক্ষতিপূরণ করিবেন এবং আধি প্রত্যর্পিত না হইলে অধমর্ণ ঋণ-পরিশোধে বাধ্য হইবে কি না;—কোটিলায় অর্থশাস্ত্রে তৎসংক্রান্ত কতকগুলি সাধারণ বিধি দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে তিনি যে কয়টা নিয়ম নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহা এই;—‘উত্তমর্ণ বন্ধকীর দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবেন—এরূপ সৰ্ত্ত্ব হইলে, বন্ধকদাতা অধমর্ণ যে কোনও সময়ে তাহা ফিরাইয়া লইতে পারিবেন; আর তৎকৃত সেই ঋণের অথ উত্তমর্ণকে কোনও সুদ দিতে হইবে না। কিন্তু পূৰ্ণোক্তরূপ বন্দোবস্তের অবিচ্ছিন্নে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধকীর দ্রব্য প্রত্যাগ্ৰহণ করিবার ব্যবস্থা। আর সেই নিদিষ্ট সময়ের যে বৃদ্ধি বা সুদ হইবে, উত্তমর্ণ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে অধমর্ণ যদি উহা ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনা করে, আর উত্তমর্ণ যদি তাহা ফিরাইয়া না দেন; তাহা হইলে কোটিলা তাঁহার বার পণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। উত্তমর্ণের বিদেশে থাকা সময়ে অধমর্ণ যদি তাঁহার বন্ধকীর দ্রব্য গ্রহণ করিতে যান, তাহা হইলে উত্তমর্ণের প্রাপ্য ঋণ, গ্রামবৃদ্ধগণের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া, তিনি তাঁহার আধি লইতে পারিবেন। অন্তপক্ষে, বন্ধকীর দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া, ঋণের পরিবর্ত্তে তাহা উত্তমর্ণকে বুঝাইয়া দিতে পারেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে পরে আর তাঁহাকে কোনও সুদ দিতে হইবে না। কালবশে বন্ধকীর দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা বুঝিলে, বিচারালয়ের অনুমতি লইয়া ‘আধিপাল’ বা বন্ধকপরিদর্শন-কারীর সমক্ষে উহা নিলাম-বিক্রয় হইতে পারিবে। এইরূপ বিক্রয় উত্তমর্ণের বা বিশিষ্ট রাজ-কৰ্ম্মচারীদিগের সমক্ষে হইবার বিধান, অর্থ-শাস্ত্রকার প্রদান করিয়াছেন। স্থূলতঃ, আধি বা বন্ধক সম্বন্ধে কোটিলায় ইহাই অভিমত ছিল। কোটিলায় মতে স্বাবর আধি—দ্বিবিধ। বিনা-পরিশ্রমে বাহ্য হইতে ভূস্বামীর কিছু সঞ্চয় হয়,—তাহা প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। আর পরিশ্রমের দ্বারা বাহ্য হইতে কিছু সঞ্চয় করা যায়, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এইরূপ দ্বিবিধ আধি বন্ধক দিয়া ঋণ-গ্রহণের ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রকার বিহিত করিয়াছেন। উৎপন্ন দ্রব্যো সুদ সমেত মূলধন পরিশোধ হইলে উত্তমর্ণ ঐ আধি অধমর্ণকে ফিরাইয়া

দিবেন। অধমর্গের সম্মতি ভিন্ন উত্তমর্গ যদি বন্ধকীয় দ্রব্য উপভোগ করেন; তাহা হইলে স্ত্রম সমেত মূলধন পরিশোধ হইবার পর ক্ষতিপূরণ সহ অধমর্গকে সে আধি প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। * ভূমি প্রভৃতি বন্ধক দেওয়া সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—
ভূস্বামী ভিন্ন অর্থাৎ যাহার জমিজমা আছে তিনি ভিন্ন, অপর কাহারও নিকট ভূমি প্রভৃতি আধিক্রমে প্রদান করিবে না। 'ব্রহ্মদেয়' বা ব্রহ্মোত্তর ভূমি ব্রহ্মোত্তরধারীর নিকটই বন্ধক দেওয়া বিধেয়।

সংহিতাদির বিধান কোটিল্যের বিধান হইতে কিছু ব্যাপক। মহুর মতে, আধি ভোগ করা বিধেয় নহে। তবে যদি অধমর্গ ভোগার্থ কোনও দ্রব্য উত্তমর্গের নিকট বন্ধক রাখিতে চায়, তাহা হইলে উত্তমর্গ সে আধি ভোগ করিবার অধিকারী। সে ক্ষেত্রে
সংহিতা-মতে আধি। উত্তমর্গ তাঁহার প্রদত্ত ঋণের জন্ত কোনও স্ত্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অপিচ, বহুকাল গত হইলেও উত্তমর্গ ঐ বন্ধকীয় দ্রব্য স্থানান্তরিত বা বিক্রয় করিবার অধিকারী নহেন। অধমর্গ যদি বলপূর্বক আধি ভোগ করেন, তাহা হইলে ঋণের স্ত্রম তো তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেই হইবে; অধিকন্তু তাঁহার ভোগ-হেতু যদি আধির অন্তথা হয়, তাহা হইলে অধমর্গকে উহার প্রকৃত মূল্য দিয়া সমুদ্র করিতে হইবে। চাহিবামাত্রই অধমর্গকে গচ্ছিত বস্তু প্রদান করা বিধেয়। উত্তমর্গ সে সম্বন্ধে কালবিলম্ব করিবেন না। এতদ্বিন্যয়ে মহু-সংহিতার উক্তি (অষ্টম অধ্যায়, ১৪৩ম—১৪৫ম শ্লোক); যথা,—

"ন ত্বেবোধৌ সোপকারে কৌসীদীঃ বৃদ্ধিমাশ্রুয়াৎ। নচাধঃকালসংরোধান্নিসর্গোহস্তি ন বিক্রমঃ॥

ন ভোক্তব্যো বলাদাধিভূঞ্জানো বৃদ্ধিসুংসৃজ্যৎ। মূল্যনতোষরৈচ্চৈনমাধিস্তেনোহন্তথা ভবেৎ॥

আধিশ্চোপনিধিস্চাত্তো ন কালাত্যয়মহঁতঃ। অপহার্যৌ ভবেতাং তৌ দীর্ঘকালমবস্থিতৌ॥"

বিষ্ণু-সংহিতায় অনেক স্থলে ইহার অমুরূপ উক্তি দৃষ্টি হয়। বিষ্ণু-সংহিতা মতে, স্থাবর আধির ব্যবস্থা অন্তরূপ। বিষ্ণু বলেন,—আধিকৃত ক্ষেত্রাদির আয়ে স্ত্রম পরিশোধ হইয়া যদি কিছু উদ্বর্ত থাকে; তাহা হইলে, অধমর্গের সহিত আধি পরিত্যাগের কোনও সর্ভ না থাকিলে, উত্তমর্গ উহা পরিত্যাগ করিবেন না। আর স্ত্রম পরিশোধ হইয়া উদ্বর্ত অংশে আসিলও পরিশোধ হইবে—অধমর্গের সহিত উত্তমর্গের যদি এইরূপ বন্দোবস্ত থাকে; তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধ হওয়ার পরই উত্তমর্গকে ঐ আধি পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে স্থাবর সম্পত্তি মাত্র স্ত্রম পরিশোধ হওয়ার জন্ত আধিক্রমে প্রদান করা হয়, স্ত্রম পরিশোধ হইয়া গেলেই সে আধি প্রত্যর্পণ করিবার বিধি বিষ্ণু-সংহিতায় বিধিবদ্ধ আছে। বলপূর্বক আধি-ভোগের বিষয়ে বিষ্ণুও নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। বন্ধকীয় দ্রব্য উপভোগ করিতে থাকিলে যে উত্তমর্গ স্ত্রম পাইবেন না,—বিষ্ণুরও তাহা অভিমত। দৈবোপদ্রবে বা রাজোপদ্রবে আধি নাশ হইলে অধমর্গ সে আধির দাবী করিতে পারিবে না। কিন্তু তত্ত্বিন্ন অস্ত্র কারণে উহা নষ্ট হইলে উত্তমর্গ তাহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। এ সম্বন্ধে বিষ্ণু-সংহিতার (ষষ্ঠোহধ্যায়, ৫ম—৯ম শ্লোক:) উক্তি মনে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

* রাজবন্দ্য-সংহিতার (ষষ্ঠীয় অধ্যায়, ৬৮ম শ্লোক) এতদমুরূপ উক্তি আছে। পরবর্তী অংশে তাহার আলোচনা জটিল।

“আধুপভোগে বুদ্ধ্যভাবঃ। দৈবরাজোপঘাতাদুভে বিনষ্টমাধিসুভরণে
দত্তাৎ ॥ অন্তবুদ্ধৌ প্রবিষ্টারামপি। ন স্বাবরমাধিসুভে বচনাৎ।

গৃহীতধনপ্রবেশার্থমেব যৎ স্বাবরং দত্তং তদগৃহীতধনপ্রবেশে দত্তাৎ।”

এ সম্বন্ধে বসিষ্ঠ বিশেষ কোনও অভিমত ব্যক্ত করেন নাই। গৌতমও অতি সংক্ষেপে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,—“সুভূতাদিনবর্জিতে দিৎসতোহব-
রুদ্ধস্ত চ চক্রকালবুদ্ধিঃ কারিতাকারিকাশিখাধিভোগাচ্চ কুসৌদং।” অর্থাৎ,—আসল পরিশোধ
করিয়া বন্ধকীয় বস্তু ছাড়াইলে আর ক্ষুদ্র বাড়িবে না। পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি
উত্তমর্ণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ উত্তমর্ণ যদি পরিশোধ করিয়া না লয়, তাহা হইলেও তাহার
ক্ষুদ্র বাড়িবে না। কালবশে চক্রবুদ্ধির ব্যবস্থা হইতে পারে। ঋণকর্তার শারীরিক পরিশ্রম বা
বন্ধকীয় বস্তুর ভোগ ক্ষুদ্রের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।’ এতদ্ভিন্ন গৌতমে আর অধিক উল্লেখ
দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা বহুব্যাপক। অর্থশাস্ত্রোক্ত সকল ব্যবস্থার বিধানই
তদ্ব্যভায়ে দৃষ্ট হয়। আধি সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫৯ম—৬৫ম শ্লোক) বলিয়াছেন,—

“আধিঃ প্রণশ্চেদ্বিগুণে ধনে যদি ন মোক্ষতে। কালকালকৃতং নশ্চেৎ ফলভোগো ন নশ্চতি ॥

গোপ্যাধিভোগে নো বুদ্ধিঃ সোপকারেহৎহাপিতে। নষ্টো দেয়ো বিনষ্টশ্চ দৈবরাজকৃতাদুভে ॥

আধেঃ স্বীকরণাৎ সিদ্ধী রক্ষ্যমানোহপ্যসারতাম্। যাতশ্চেন্দন্ত আধেয়ো ধনভাগ্ বা ধনী ভবেৎ ॥

চরিত্রবন্ধককৃতং সবুদ্ধ্যা দাপয়েদ্ধনম্। সত্যস্বারকৃতং দ্রব্যং দ্বিগুণং প্রতিদাগয়েৎ ॥

উপস্থিতস্ত মোক্ষব্য আধিস্তেনোহন্তথা ভবেৎ। প্রয়োজকেহসতি ধনং কুলেস্তস্তাধিমাপুরাৎ ॥

ভৎকালকৃতমূলো বা তত্র তিষ্ঠেদবুদ্ধিকঃ। বিনাধারণকারাপি বিক্রীণীত সসাক্ষিকম্ ॥

যদা তু দ্বিগুণীভূতমুণমাদৌ তদা ধনু। মোচ্য আধিস্তদ্রুৎপসে প্রবিষ্টে দ্বিগুণে ধনে ॥”

অর্থাৎ,—‘বুদ্ধি বা ক্ষুদ্র দ্বিগুণ বাড়িয়া গেলেও অধমর্ণ যদি’ আধি মোচন না করে, তাহা
হইলে সে বন্ধকীয় দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে অধমর্ণের আর কোনও স্বত্ব থাকে
না। যদি নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধক মোচন করিবার প্রতিশ্রুতি থাকে, আর যদি সেই নির্দিষ্ট
সময়ের মধ্যে আধি মোচন করা না হয়; তাহা হইলে নির্দিষ্ট সময় অন্তে সে আধিতে
আর পূর্বস্বামীর অধিকার থাকিবে না। যে আধির বা বন্ধকীয় দ্রব্যের ভোগ হয়,
তাহাতে অধমর্ণের স্বত্ব কদাচ নষ্ট হয় না। অপ্রকান্ত আধি ভোগ করিলে এবং প্রয়ো-
জনীয় আধি অব্যবহার্য্য করিয়া দিলে, সেই আধি প্রত্যর্পণের সময় পূর্ববৎ করিয়া দিতে
হইবে; অর্থাৎ অধমর্ণ যে অবস্থায় প্রদান করিয়াছিল, উত্তমর্ণকে সেই অবস্থায় তাহা ফিরিয়া
দিতে হইবে। একেবারে নষ্ট হইয়া গেলে অধমর্ণকে তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে।
কিন্তু দৈবকৃত বা রাজকৃত উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে, সে আধি আর ফিরাইয়া দিতে হইবে
না। উপভোগেই আধিগ্রহণ সম্ভব হইবে। আধি বস্তুপূর্বক রক্ষিত হইলেও যদি অসার
হইয়া পড়ে অর্থাৎ ক্ষুদ্র সমেত আসলের তুলনার মূল্য অল্প বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে
অল্প আধি বন্ধক রাখিলে অথবা উত্তমর্ণকে কিছু ধন দিতে হইবে। উত্তমর্ণকে নির্দল-
চরিত্র জানিয়া অধমর্ণ যদি অধিক মূল্যের দ্রব্য বন্ধক রাখে এবং ততুলনার কম ধন গ্রহণ
করে, তাহা হইলে দ্বিগুণ ক্ষুদ্র সমেত মূলধন দিয়া বন্ধক-দ্রব্য মোচন করিয়া লইতে পারিবে;

অর্থাৎ গৃহীত ঋণ-পরিমাণের দিগুণ সুদ হওয়া পর্যন্ত আদি উত্তমর্ণের নিকট থাকিতে পারিবে; আর তাহাতে সে আদি নষ্ট হইবে না। সে স্থলে উত্তমর্ণের সহিত সে সম্বন্ধে কোনও নির্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ না হইলেও চলিবে। আবার সত্য স্থলে অর্থাৎ যদি সর্ব হর দে, দিগুণ সুদ হইলেও অধমর্ণ তাহা প্রদান করিয়া আদি ফিরাইয়া লইবে, তাহার প্রদত্ত বন্ধক দ্রব্যের যেন কোনও অপলাপ না হয়; সে স্থলে সত্যমত দিগুণ দিয়া অধমর্ণ আদি মোচন করিতে পারিবে। সুদসমেত মূলধন লইয়া উপস্থিত হইলে উত্তমর্ণ বন্ধক বস্ত্র ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু যদি সে তাহা না ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে উত্তমর্ণ চোরের দ্বার দণ্ডনীয় হইবে। উত্তমর্ণ উপস্থিত না থাকিলে, উত্তমর্ণের বিশ্বস্ত লোকের নিকট ঐ ধন দিয়া অধমর্ণ তাহার আদি ফিরাইয়া লইবে। কিন্তু অধমর্ণ প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোক উপস্থিত না থাকিলে কিবা আদি বিক্রয়ের দ্বারা অধমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিবার ইচ্ছা করিলে, উত্তমর্ণের অমুপস্থিতি তেতু স্বতন্ত্র পক্ষ অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা ছিল। সেরূপ ক্ষেত্রে ঐ আদির মূল্য নির্ধারণ করিবার বিধান আছে। আদির উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করিয়া, উত্তমর্ণের প্রত্যাবর্তন কাল পর্যন্ত উহা পূর্ববৎ উত্তমর্ণের নিকট রাখিবার নিয়ম, আর সে অবস্থায় উত্তমর্ণের মূলধনের সুদ চলিবে না। 'মূলধন সুদে বৃদ্ধি পাইয়া দিগুণ হইলেও, দিগুণ বৃদ্ধি দিয়া আদি গ্রহণ করিব; কিন্তু আদি যেন নষ্ট না হয়'—ঋণগ্রহণ-কালে অধমর্ণ যদি এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়; আর দিগুণ বৃদ্ধির পরও যদি মার সুদ মূলধন প্রদান করিয়া আদি ফিরাইয়া না লয়; তাহা হইলে, অধমর্ণের অমুপস্থিতি-কালেও, উত্তমর্ণ সাক্ষী প্রমাণাদি রাখিয়া আদি বিক্রয় করিতে পারিবে। যখন বিনা-বন্ধক ঋণ বৃদ্ধি পাইয়া দিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে, তখন ক্ষেত্রাদি বন্ধক রাখিতে হইবে। তত্বেপন্ন দ্রব্য দ্বারা উত্তমর্ণের উক্ত ঋণ পরিশোধ হইবার পর উত্তমর্ণ ঐ আদি ছাড়িয়া দিবে। 'এই আদি হইতে অধিক উৎপন্ন হয় তোমার লাভ; আর উৎপন্ন হয়, তোমার ক্ষতি';—অধমর্ণ যদি এরূপ কিছু সর্ব না করিয়া থাকে, আর যদি সেই আদিতে দিগুণ ফল উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে ঋণ-শোধের পর উত্তমর্ণ ঐ আদি ছাড়িয়া দিবে।' অর্থশাস্ত্রের ও স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনার বন্ধকীয় দ্রব্য সম্বন্ধে যে করটা বিধানের আভাব পাই, তাহা অধুনাতন প্রচলিত ব্যবহার-শাস্ত্রের ভিত্তি-স্থানীয় বলা বাইতে পারে। আদি বা বন্ধক দ্রব্য ভোগ করিলে, ভোগের অমুপাতে উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ হইবে, এতদ্বিষয় যেমন প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছিল, তেমনই আধুনিক ব্যবহার-শাস্ত্রেও বিহিত আছে। বন্ধকীয় সম্পত্তি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা সুদ পরিশোধ হইয়া গেলে অবশিষ্ট উদ্বৃত্তাংশ হইতে মূলধন পরিশোধের ব্যবস্থা ব্যবহার-শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ-রাজ-প্রবর্তিত অধুনা প্রচলিত ব্যবহার-শাস্ত্রের বিধান সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলা বাইতে পারে।

বন্ধক সম্বন্ধে 'হস্তান্তর বিধক' আইনে (Transfer of Property Act) বিশেষ বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তদনুসারে বন্ধক বিবিধ; প্রথম—সামান্য (Simple) এবং দ্বিতীয়—কলভোগ্যধিকার (Usufructuary)। যেখানে বন্ধকীয় সম্পত্তি বন্ধকীকে প্রদান করেন না; অথচ তাহার সুবিধা

গচ্ছিত সৰ্বকে কোটিলোর বিধান কতকাংশে আধি-সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের অন্তর্গত। ঋণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে আধির উপযোগিতা। অজ্ঞাত বিশেষ বিশেষ স্থলেও উহার সার্থকতা অস্বত্ব

হয় বটে; কিন্তু ঋণ-সংক্রান্ত বা তৎসদৃশ ব্যাপার বিষয়ে আধির বা বন্ধকের কোটিল্য মতে প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। গচ্ছিত বিধি—

নিক্ষেপ ও উপনিধি। সেরূপ নহে। গচ্ছিত-ব্যবহারে ঋণের বা তৎসদৃশ বিষয়-ব্যাপারের উপ-যোগিতা পরিলক্ষিত হয় না। যে কোনও ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে আপনার বিখ্যস্ত ব্যক্তির নিকট মূল্যবান দ্রব্যাদি গচ্ছিত রাখিতে পারেন; আর সেজন্ত ঋণ-গ্রহণের বা ঋণ-দানের কোনও প্রয়োজনীয়তা অস্বত্ব হয় না। গচ্ছিত দ্রব্যের ও আধির ইহাই পার্থক্য। উত্তর ব্যাপার সম্পর্কে প্রায় একইরূপ বিধি। তবে স্থল-বিশেষে তাহার পার্থক্য আছে। কোটিলোর অর্থশাস্ত্রে এবং মহাদির সংহিতায় এতৎসবকে প্রায় অনুরূপ বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে গচ্ছিত দ্বিবিধ—নিক্ষেপ ও উপনিধি। * উপনিধির সংজ্ঞা-নির্দেশ-কল্পে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

“বাসনহুমনাখ্যায় হস্তেহস্তস্ত বদর্পিতম।

অথবা তদৌপনিধিকং প্রতিদেয়ং তথৈব তৎ ॥”

অর্থাৎ,—বিশেষ বিষয়গুণ না বলিয়া যে সকল বস্তু করণপেটিকাদির মধ্যে রাখিয়া অপরের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহার নাম—ওপনিধিক।* বাস্ত-সিন্দুকাদির মধ্যে বন্ধ করিয়া সহি-সাহায্যকৃত ভাবে যাহা কিছু প্রদান করা যায়—তাহাই উপনিধি-পর্যায়ভুক্ত। এরূপস্থলে গচ্ছিত গ্রহণ-কারী জানিতে পারেন না যে, ভ্রাসকারী তাঁহার হস্তে কি সামগ্রী জন্ত রাখিতেছেন। সুতরাং

এইরূপ চুক্তি-সর্ত্তে আবদ্ধ হন যে, যদি তিনি ঋণ পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে ঋণদাতা বন্ধকীয় দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া লইবেন; সে স্থলে এইরূপ বন্ধক ঋণ আধি সাধারণ বন্ধক পর্যায়ভুক্ত। আর, যেস্থলে বন্ধকীয় সম্পত্তির উপবস্তু দ্বারা হুদ ও ঋণ পরিশোধ হওয়ার সর্ত্ত সাব্যস্ত হয়, তাহা কলভোগাধিকার বন্ধক মধ্যে গণ্য। যথা,—“Where the mortgagor delivers possession of the mortgaged property to the mortgagee, and authorises him to retain such possession until payment of the mortgage-money, and to receive the rents and profits accruing from the property, and to appropriate them in lieu of interest, or in payment of the mortgage-money, or partly in lieu of interest, and partly in payment of the mortgage money, the transaction is called a usufructuary mortgage and the mortgagee a usufructuary mortgagee.”

“In the case of a usufructuary mortgage, the mortgagor has a right to recover possession of the property—(a) where the mortgagee is authorised to pay himself the mortgage-money from the rents and profits of the property—when such money is paid; (b) where the mortgagee is authorised to pay himself from such rents and profits the interest of the principal money—when the term (if any) prescribed for the payment of the mortgage-money has expired, and the mortgagor pays or tenders to the mortgagee the principal money, or deposits it in court as hereinafter provided.” এতদ্ব্যতীত অজ্ঞাত বিশেষ বিধান সম্পত্তি হস্তান্তর বিষয়ক আইনে উল্লিখ্য।

* নিক্ষেপ—Open deposit; উপনিধি—Sealed deposit.

ভবিষ্যে তাঁহার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। 'নিক্ষেপ'—উপনিধির বিপরীত। সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কোনও বস্তু কাহারও নিকট অর্পণ করিলে তাহা নিক্ষেপ পর্যায়ভুক্ত হয়। নিক্ষিপ্ত দ্রব্য নিক্ষেপকারীকে উপনিধির দ্বার কোনও প্রকার বাস্তব-সিন্দুকাদিতে আবদ্ধ করিয়া দিতে হয় না। নিক্ষেপ-গ্রহণকারী নিক্ষেপের আকার, প্রকৃতি, গুণ প্রভৃতি সকল বিষয়ই অবগত হন; আর স্বচক্ষে দেখিয়া তিনি উহা গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাই হইল—নিক্ষেপ ও উপনিধির সাধারণ সংজ্ঞা। উত্তরের পাঠ্য—উপনিধিক দ্রব্যের বিষয় গ্রহণকারী অনবগত এবং নিক্ষিপ্ত দ্রব্যের বিষয় তিনি অবগত হন। গচ্ছিত দ্রব্য মাত্রই বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষিত হওয়া বিধি। স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক ইহা সংরক্ষিত হইবার নিয়ম। এ বিষয়ে গ্রহণকারীর বাধ্য-বাধকতা কিছুই নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। গচ্ছিত দ্রব্য নষ্ট হইলে তিনি সে ক্ষতি দায়ী হইবেন। কোটিল্য এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—‘রক্ষাকারী গচ্ছিত দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না। তাঁহার ব্যবহারের দক্ষণ গচ্ছিত দ্রব্যের কোনও ক্ষতি হইলে, তিনি সে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য। অপিচ, সে ক্ষেত্রে তাঁহার বার পণ দণ্ড হইবে। গ্রহণকারীর অনবধানতার বা দ্রব্যের ব্যবহারে উহার মূল্য হ্রাস হইলে, গচ্ছিত-গ্রহণকারী সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন। সে ক্ষেত্রে দণ্ডের পরিমাণ দ্বিগুণ হইবে। গচ্ছিত-দ্রব্য বন্ধক দিলে অথবা বিক্রয় করিলে চতুঃপদ ‘পঞ্চবন্ধ’ দণ্ডের ব্যবস্থা। গচ্ছিত-দ্রব্য নষ্ট করিয়া কেলিলেও তৎসম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত বিধি বলবৎ হইবে। কিন্তু গ্রহণকারী যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উহা ফেলিয়া নষ্ট করেন, অথবা বিনিময়ে অন্য দ্রব্য গ্রহণ করেন; তাহা হইলে গচ্ছিত-দ্রব্যের যথা-নির্দিষ্ট মূল্য হ্রাসকারীকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। তবে “প্রেতবাসন গতং বা নোপনিধিমভ্যাভবেৎ।” বৈদেশিক আক্রমণকারী অথবা অন্য কোনও শত্রু কর্তৃক দেশ ধ্বংস হইলে, বস্তার জলদ্বাবনে দেশ ভাসিয়া গেলে কিংবা সমুদ্র-বাত্তা-কালে জলদ্বারা কর্তৃক অপহৃত হইলে, সে গচ্ছিতের জন্য গ্রহণকারী দায়ী হইবে না। হস্তকারী চাহিলামাত্র গচ্ছিত ফিরাইয়া দিবার বিধি। কিন্তু গচ্ছিত-রক্ষাকারী যদি সে বিষয় অস্বীকার করে, তাহা হইলে গচ্ছিত-নির্ণয়ের বিবিধ উপায় কোটিল্য নির্দেশ করিয়াছেন। গচ্ছিত-রক্ষাকারী গচ্ছিত বিষয় অস্বীকার করিলে, বিচারকের অহুমতি লইয়া হ্রাসকারী নিয়লিখিত পহ্লা-সমূহ অবলম্বন করিবেন। যথা,—নিরপেক্ষ কয়েক জন ব্যক্তিকে লইয়া ন্যাসকারী গ্রহীতার বাড়ীর চতুঃপার্শ্বে গোপনীয় স্থান-সমূহে অবস্থান করাইবেন। ন্যাসকারীর সহিত নিক্ষেপ-গ্রহীতার যে কথা-বার্তা হইবে, তাঁহার যেন সে কথাবার্তা শুনিতে পান—এমনই ভাবে তাঁহার অবস্থান করিবেন। অতঃপর ন্যাসকারী গ্রহীতার নিকট যাইয়া গচ্ছিত-সম্পর্কে কথাবার্তার প্রবৃত্ত হইবে। কথাবার্তার সময় সত্য কথা বাহির করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কথা-প্রসঙ্গে গ্রহীতা যদি এমন কোনও কথা বলিয়া কলে, যাহা ন্যাসকারীর প্রমাণ বিষয়ে সহায়তা করে; আর নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ যদি তাহা শুনিতে পান এবং সেই প্রমাণ সাক্ষ্য প্রদান করেন; তাহা হইলে বিচারক গ্রহণকারীর বস্তুবিধান করিয়া নিক্ষেপকারীকে ঐ গচ্ছিত দ্রব্য দিতে বাধ্য করাইবেন।’ গচ্ছিত-নির্ণয়ের অন্য ব্যবস্থা—ওক্তের নিম্নোক্ত।

উহা মন্থর ব্যবহার অন্তরূপ। বৃদ্ধ অরায়ুক্ত বণিকের বেশে চরগণ নিক্ষেপগ্রহণকারী নিকট উপস্থিত হইবে। পর্যটনে শ্রান্ত ক্লান্ত—এইরূপ ভাণ করিয়া, বিশিষ্ট-চিহ্নাক্রিত আপনার বাক্স-সিন্দুকাদি তাহার নিকট রাখিয়া আসিবে। কয়েক দিন বা কিছুক্ষণ পরে তাহার ভ্রাতা বা পুত্রকে সেই গচ্ছিত দ্রব্য ফিরাইয়া আনিতে পাঠাইবে। গচ্ছিত-রক্ষাকারী উহা সয়ল চিন্তে প্রদান করিলে, তাহাকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিবে। আর যদি সে উহা প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে তাহাকে উভয় বাপায়ে দোষী সাব্যস্ত করিয়া গচ্ছিত দ্রব্য দেওয়াইবে। পরন্তু চৌর্যের অপরাধে তাহার দণ্ড হইবে। তৃতীয় উপায়ও গুপ্তচর-বিষয়ক। এ ক্ষেত্রে গুপ্তচর বিশিষ্ট ভ্রলোকের পরিচ্ছদে উপস্থিত হইবেন। যেন তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এইরূপে রক্ষিত গচ্ছিত দ্রব্য যদি গ্রহণকারী চাহিবা মাত্র প্রদান না করে, তাহা হইলে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তৎপ্রতি উচিত দণ্ডের বিধান করিতে হইবে। বর্বর সাজিয়া গুপ্তচর রাজিকালে উপস্থিত হইবে। গভীর রাজ্যে গমনাগমনের অল্প শাস্ত্রিকের ভয়ে ভীত হইয়া গুপ্তচিহ্ন-সম্বিত নিক্ষেপ তাহার হস্তে ছুঁত করিতেছে—এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবে। পরিশেষে শাস্ত্রিকক কর্তৃক ধৃত হইয়া সে তাহার গচ্ছিত দ্রব্য ফিরিয়া চাহিবে। গ্রহণকারী যদি শর্তা-পূর্বক ঐ নিক্ষেপ প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে সে দণ্ডনীয় হইবে। গচ্ছিত দ্রব্য-বিষয়ে কোটিলোর ইহাই বিধান। ঋণ-সম্পর্কীয় বিধান-প্রসঙ্গে এতৎসংক্রান্ত অপরাধের বিধি বিধিবদ্ধ আছে। ঋণ-সম্পর্কে তদ্বিষয় আলোচিত হইবে। নিক্ষেপ ও উপনিধি প্রসঙ্গের আলোচনার একটা বিষয় মনে আসিতে পারে। কোটীলাও তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, যে কোনও প্রকার গচ্ছিত সাক্ষ্যাদির সমক্ষে রক্ষিত হওয়াই বিধেয়। তাহা না হইলে, অনেক সময় বিবিধ বিতর্ক-বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রবিপ্লব, জলপ্লাবন প্রভৃতি বাতীত অল্প অবস্থায় উহা নির্ণয়-পক্ষে অনেক বেগ পাইতে হয়। তাই সাক্ষ্যাদির সমক্ষে নিক্ষেপাদি সংরক্ষণের বিহিত আদেশ অর্থশাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

নিক্ষেপ ও উপনিধি সংক্রান্ত কোটিলোর বিধান—অনেকাংশে স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুসারী। স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ স্থলে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কোটীলা

বলিয়াছেন,—গচ্ছিত যে ভাবে গ্রহণ করিবে, ঠিক সেই ভাবেই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। সংহিতাকারগণেরও তাহাই অতিমত। মন্থ বলিয়া-
সংহিতা-প্রসঙ্গে
সংসংক্রান্ত
বিধি-নিয়মাদি।
ছেন,—‘দায় যেরূপ হইবে, গ্রহণও সেইরূপ হওয়া চাই। যে ব্যক্তি

যেরূপে যাহার হস্তে যে দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে, লইবার সময় উহাকে সেই দ্রব্য সেইরূপ ভাবেই দিতে হইবে।’ “যে যথা নিক্ষিপেদ্ধত্তে যমথং যস্য মানবঃ। স তথৈব গ্রহীতব্যো কখা দায়স্তথা গ্রহঃ॥” বাজবল্ক্যেরও তাহাই অতিমত,—“প্রতিদেয়ং তথৈবতৎ।” কোটীলা বলিয়াছেন,—রাষ্ট্রবিপ্লবে, দৈবদুর্ঘটনার, জলপ্লাবন প্রভৃতিতে উপনিধি নষ্ট হইলে উহা ক্ষয় দিতে হইবে না। মন্থ প্রভৃতিরও উহাই অতিমত। মন্থ বলিয়াছেন; যথা,—

“চৌরৈরুতং কলেনোচময়িনা দধ্মসেব বা। ন দত্তাদ্যদি তস্মাৎ স ন সংহরতি কিঞ্চন॥”

উপনিধির মধ্য হইতে যদি নিজেকে কিছু না লয়, তাহা হইলে চোরে চুরি করিলে, জল দ্বারা ধোত হইলে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে, গচ্ছিত দ্রব্য দিতে হয় না ।* যাজ্ঞবল্ক্যের উহাই অন্তিমত । * তিনিও বলিয়াছেন,—‘রাজা, দৈব বা তত্ত্বের উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে প্রত্যাৰ্পণ করিতে হইবে না । কিন্তু যদি ভ্রাসকারী উক্ত দ্রব্য প্রার্থনা করিলে না দেয় এবং তাহার পর রাজাদির উপদ্রবে উহা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার মূল্য দিতে হইবে এবং গ্রহণকারীকে রাজা তন্মূল্য-পরিমিত অর্থদণ্ড করিবেন ।’ (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬৭ম শ্লোক) ; যথা,—

“ন দাপ্যোহপহৃতং তত্ত্ব রাজদৈবিকতত্ত্বৈঃ ।

ভেষচেন্ন্যার্গিতেহদন্তে দাপ্যো দণ্ডঞ্চ তৎসমম্ ॥”

মহুতে বা কোটিল্যের বিধানে এ বিশেষ বিধির উল্লেখ নাই । নিক্ষেপ ও উপনিধি সম্বন্ধে মহুতে একটা বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । অন্যান্য স্মৃতি-গ্রন্থে বা কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে তাহা দৃষ্ট হয় না । মহুর মতে নিক্ষিপ্ত দ্রব্য নিক্ষেপকারী ভিন্ন অপর কাহাকেও দিতে নাই । এমন কি, নিক্ষেপকারীর জ্ঞী, পুত্র ও উত্তরাধিকারীর নিকট উহা প্রদান করিতে মহু নিষেধ করিয়াছেন । যদি নিক্ষেপাদি গ্রহণকারী চাহিবামাত্র গচ্ছিত দ্রব্য প্রদান না করে; অথবা সে তাহার অপলাপ করে;—তাহা হইলে তাহার রাজদ্বারে দণ্ড হইবার ব্যবস্থা যেমন কোটিল্যাদি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তেমন যাজ্ঞবল্ক্যও সে ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছেন । বাণিজ্য দ্বারা নিক্ষেপাদি বৃদ্ধি করিলে বা নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার দ্বারা অপলাপ করিলে, দণ্ডের ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা সংহিতাকারগণ সকলেই বিধিবিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । যাজ্ঞবল্ক্যের মতে নিক্ষেপাদি চারি প্রকার; যথা—(১) যাচিত অর্থাৎ বিবাহাদি উৎসবে পরিধান কারবার জন্ত অপরের নিকট হইতে যে সকল বস্ত্রালঙ্কারাদি চাহিয়া লওয়া যায় । (২) অস্বাহিত—গচ্ছিত অবস্থার রক্ষিত যে দ্রব্য অপরের নিকট গচ্ছিত রাখা হয় । (৩) ভ্রাস—প্রথমে গৃহস্থানীকে দেখাইয়া যাহা পরিবারের অপর ব্যক্তির নিকট দেওয়া যায় । (৪) নিক্ষেপ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও ব্যক্তির নিকট কোনও বস্তু অর্পণ করা । এই চতুর্বিধ নিক্ষেপ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য একই ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছেন ।

“সাজীবন্ শ্বেচ্ছয়া দণ্ডো দাপ্যন্তুত্কাপি সোদনম্ ।

যাচিতাং বাহিতভ্রাসনিক্ষেপাদিসমঃ বিধিঃ ॥”

নিক্ষিপ্ত দ্রব্য অপহরণ করিলে, উহা ফিরাইয়া পাইবার কোনও উপায় যাজ্ঞবল্ক্য নির্দ্ধারিত হয় নাই । অসাক্ষিক অর্থাৎ সাক্ষিশূন্য স্থলে, মহুমতে গুপ্তচর দ্বারা নিক্ষেপ-নির্ণয়ের ব্যবস্থা বিহিত আছে ।* চুক্তি-প্রসঙ্গে তদ্বিষয় পূর্বে উক্ত হইয়াছে । মহু আরও বলিয়াছেন,—নিক্ষেপকারী পরলোকগত হইলে যদি উপনিহিত দ্রব্য শ্বেচ্ছায় প্রত্যাৰ্পিত হয়, তাহা হইলে সেস্থলে আর অতিরিক্ত দাবী চলিবে না । যে ব্যক্তি গচ্ছিত রক্ষা করে, তৎকর্তৃক গচ্ছিত দ্রব্যের দান বা বিক্রয় ব্যবহার-স্থিতিতে সিদ্ধ হয় না । এরূপ দান-বিক্রয় ব্যবহার-শাস্ত্র-মতে দণ্ডনীয় । চোরের প্রতি যে দণ্ড, দান-বিক্রয়কারীর প্রতি সেই দণ্ডের বিধি ।

এই গ্রন্থের ৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । চর প্রকৃতি দ্বারা আধি ও নিক্ষেপ নির্ণয়ের ব্যবস্থা বিষয়ে মহুর মত দেখিলে উল্লিখিত হইয়াছে ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

—o—o—o—

ঋণাদান-বিধানে আদর্শ ।

[ঋণাদান প্রসঙ্গ,—ঋণ-সম্বন্ধে হিন্দুর ধারণা ;—ঋণ-সম্বন্ধে কোটিলোর বিধান.—হৃদের হার প্রভৃতি,—বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা ;—অর্থশাস্ত্র-মতে ঋণ-সংক্রান্ত দায়,—পুত্র ও উত্তরাধিকারী পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য,—স্বামীর ঋণ পরিশোধে স্ত্রী বাধ্য নহে,—ব্যাধ, শৈলুৰ প্রভৃতি জাতীয় স্ত্রী-সম্পর্কে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ;—সংহিতোক্ত ঋণাদান বিধি,—মহু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, গৌতম, বসিষ্ঠ প্রভৃতির মতের উল্লেখ,—কোটিলোর মত ঐ সকল মতের অনুসারী ;—সংহিতা-মতে ঋণ আদার বিধি ;—প্রতীচো কুশীদ-প্রসঙ্গ,—বাইবেলে মোজেস-প্রবর্তিত নীতিতে তাহার পরিচয় ;—প্রাচীন রোমে গ্রীসে ও মিশরে কুশীদের ব্যবস্থা,—তৎসংক্রান্ত ইতিবৃত্ত ;—ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আর্লণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে তৎসংক্রান্ত বিধান,—প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিবরণ,—সংহিতা-দিতে ও অর্থশাস্ত্রে ভোগ প্রমাণ,—তামাদি-সংক্রান্ত বিধানের উল্লেখ প্রভৃতি প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন ;—আধুনিকে প্রাচীনের অনুসরণ ;—পাক্ষাতো ঋণ-প্রসঙ্গ,—রাজকীয় ঋণাদির বিষয় ।]

প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-বিধানে ঋণাদানবিধি প্রথম ও প্রধান স্থানীয় : শ্রুতি-স্মৃতি-অর্থশাস্ত্র—সর্বত্রই ব্যবহার-প্রসঙ্গে ঋণাদানের বিষয় বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । সূত্র-গ্রন্থের

ঋণাদান
প্রসঙ্গ ।

প্রাচীনত্ব অবিসম্বাদিত । গৌতম-সূত্র—সূত্রগ্রন্থের অন্ততম । গৌতমের সূত্র-গ্রন্থে ব্যবহার-প্রসঙ্গে দেওয়ানী-সংক্রান্ত ব্যবহারের মধ্যে কেবল ঋণ-দানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । মহু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিও ব্যবহার-প্রসঙ্গে

ঋণাদানের বিষয় প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন । বিষ্ণু-সংহিতার আরম্ভ—দণ্ডনীতি ঋণ-সংক্রান্ত বিধান লইয়া । তন্মধ্যে ঋণ প্রধান-স্থানীয় । এইরূপ, শাস্ত্রগ্রন্থাদির আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, ঋণাদান ব্যাপার লইয়াই প্রাচীন ভারতের ব্যবহার-শাস্ত্রের আরম্ভ ও পরিণতি । আর, তাহারই আনুসঙ্গিকরূপে অপরাপর ব্যবহার-বিধির অবতারণা । প্রাচীন ভারতের আৰ্য্য-হিন্দুগণ ধর্মপ্রাণ ছিলেন ; তাঁহাদের সকল অনুষ্ঠান ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত । তাঁহাদের বিশ্বাস—ঋণ-গ্রহণ করিয়া প্রতাপর্ণ না করিলে পাণ হয় এবং পরলোকে কঠোর শাস্তি বিহিত হইয়া থাকে । সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তাঁহারা কতকগুলি অবশ্য-কর্তব্য অনুষ্ঠান ঋণ-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ; আর তাহাদের অননুষ্ঠান পাপজনক বলিয়া কীর্তন করিয়া গিয়াছেন । দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ—আনুষ্ঠানিক ঋণ-পর্যায়ভুক্ত । ত্রৈলোক্য অস্ত্রান্ত ঋণ—লৌকিক ঋণ । পূর্বোক্ত ত্রিবিধ ঋণ ব্যবহার-বহির্ভূত । সুতরাং বক্ষ্যমাণ-প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ নিম্নপ্রয়োজন । লৌকিক ঋণ—ব্যবহারের বিষয় । তৎসংক্রান্ত বিধি-বিধানের আলোচনায় এতদ্বিষয়ের অবতারণা । যে আৰ্য্যহিন্দুগণ বিহিত কার্যের অননুষ্ঠানে সর্বত্র পাপাশঙ্কা অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ব্যবহার-শাস্ত্রে যে ঋণ-সংক্রান্ত বিধান সর্বত্রই স্থানপ্রাপ্ত হইবে, তাহা আর বিচিহ্ন কি ? এ হিসাবে, ঋণাদান-বিধি অতি প্রাচীন এবং দেওয়ানী-সংক্রান্ত ব্যবহার মধ্যে ইহাই আদি ।

কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ঋণ-সংক্রান্ত ব্যবহার এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। কোটিল্যের মতে, ঋণ-বিষয়ক বিধানের উপর রাজ্যের অর্থ-নৈতিক উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে ঋণাদান-প্রকরণে ‘রাজত্বযোগক্ষেম’ শব্দের কোটিল্যের বিধান। প্রয়োগে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। কোটিল্যের মতে, দরিদ্র নিরীহ ব্যক্তি ঋণের পেঘণে ঋণদাতা কর্তৃক অবশ্য পিষ্ট না হয়,— এই জন্য রাজা ঋণের হ্রদ-পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিবেন। নির্ধারিত বিধির অন্যথায় রাজা রাজদণ্ড বিহিত করিবেন। কোটিলা শতকরা মাসিক সওয়া পণ কুশীদ লইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। সবন্ধক ঋণের সম্বন্ধে কোটিল্যের এই বিধান। কিন্তু বন্ধকহীন ঋণ-সম্বন্ধে তাঁহার বিধান অনাক্রপ। সে ক্ষেত্রে শতকরা পাঁচ পণ পর্য্যন্ত কুশীদ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সমুদ্র-গামী বণিকগণের এবং বনপ্রায়ণকারী কাঠ-ব্যবসায়ীর সম্বন্ধে যথাক্রমে শতকরা মাসিক ২০-পণ ও ১০ পণ হ্রদ লইবার ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। “দশপণা কান্তারকাণাং”—কোটিল্যের এই বিধান। অন্যান্য স্থলে ঋণদানের দায়িত্ব হিসাবে হ্রদের ব্যবস্থা হইয়াছে। নির্দিষ্ট হারের অধিক হ্রদ গ্রহণ করিলে, ঋণদাতা, ঋণসংগ্রহকর্তা এবং সাক্ষী—সকলেই রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবেন। “ততঃ পরং কর্তুঃ কারয়িতুশ্চ পূর্বস্নাহগদণ্ডঃ। শ্রোতৃণামৈককং প্রত্যর্দণ্ডঃ।” এতদ্ব্যতীত যে স্থলে ঋণগ্রহীত শস্ত্রের হ্রদ শস্ত্রে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তাহার বিধান ভিন্নরূপ। সে ক্ষেত্রে, প্রচুর শস্ত্র উৎপন্ন হইলে, শস্ত্রের দ্বারা যে হ্রদ পরিশোধ করা হইবে, সে শস্ত্রের মূল্য মূলধনের মূল্যের অর্দ্ধেক হইবে। অর্থাৎ,—৫০% মণ ধান্য ঋণ লইলে তাহার হ্রদ প্রচুর উৎপন্নের বৎসরে ২৫ মণ ধান্যের মূল্যের সমান হইবে,—অর্থ-শাস্ত্রকারের ইহাই অভিমত। যৌথ-ব্যবসায়ের যাহারা মূলধন প্রদান করে, তাহার হ্রদ সেই মূলধন হইতে বাহা আর হয়, তাহার অর্দ্ধেক হইবে। অর্থাৎ,—দশ জন ব্যবসায়ী প্রত্যেকে যদি ১০০% করিয়া টাকা দিয়া যৌথ-কারবার আরম্ভ করেন, তাহা হইলে প্রত্যেকের প্রদত্ত ঐ ১০০% টাকার বৎসরান্তে যাহা লাভ হইবে, তাহারই অর্দ্ধেক ঐ টাকার হ্রদ মধ্যে গণ্য। এইরূপ হ্রদ প্রতি বৎসর পরিশোধ করিবার নিয়ম। কিন্তু “চিরপ্রবাসং তন্তপ্রবিষ্টো বা মূল্যদ্বিগুণং দত্তাৎ।” অর্থাৎ,—যে অংশীদার বহুদিন অনুপস্থিত অথবা চিররোগী বলিয়া বিষয়-ব্যাপারে যোগদান করিতে অসমর্থ, তাহার প্রদত্ত মূলধনের দ্বিগুণ প্রদান করিলেই তাহার অংশ বিলুপ্ত হইবে। অতঃপর পূর্বোক্ত বিধির ব্যত্যয়ে দণ্ডের ব্যবস্থা। প্রাপ্য না হইলে যদি কুশীদে দাবী করা যায়, অথবা মূলধন ও কুশীদ একত্র করিয়া মূলধন হিসাবে তাহা দাবী করিলে, দাবীকৃত পরিমাণের চতুর্গুণ দণ্ড হইবে। মিথ্যা দাবীর দণ্ডও ঐরূপ। ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়েই যদি ঐগুনাদের প্রাপ্য ও দেয় ঋণ-পরিমাণের অপলাপ করে, তাহা হইলে ঋণদাতার অপেক্ষা ঋণ-গ্রহীতার তিন গুণ অধিক অর্থদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। ঋণদান ও ঋণ-প্রতিগ্রহণ বিষয়ে কোটিলা কয়েকটি বিশেষ বিধির অবতারণা করিয়াছেন। তদনুসারে ঋণদাতা যদি উপযুক্ত সময়ে তাঁহার প্রাপ্য গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার বার পণ অর্থ দণ্ড হইবে। সে অবস্থার অধমর্গ যদি তাহার দেয় মার হ্রদ সমস্ত টাকা গ্রামবৃদ্ধগণের নিকট আমানত-রূপে রাখা করে; তাহা

হইলে ঋণদাতা টাকা আদানের দিন হইতে আর স্তন পাইবেন না। দশ বৎসরের মধ্যে যদি প্রদত্ত ঋণ আদায় না করা যায়, তাহা হইলে কোটিল্যের মতে সে ঋণের দাবী লোপপ্রাপ্ত হয়। ঋণ-সংক্রান্ত ভীমাদি সম্বন্ধে কোটিল্যের ইহাই ব্যবস্থা। তবে ঋণকারী বা ঋণদাতা পীড়িত, ব্যাসনী, প্রবাসী, মৃত, অপ্রাপ্তব্যবহার, দেশভাগী অথবা রাজ-ব্যবস্থার অল্পপশু হইলে এ বিধি প্রযোজ্য নহে। সে স্থলে দশ বৎসরের পরও দাবী উপেক্ষিত হইবে না। কোটিল্যের মতে পরোপকার-তত্বধারী, বার্থভ্যাগী, বিজ্ঞার্জনে গুরুগৃহবাসী, অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি, ব্যাধিগ্রস্ত ও দরিদ্র ব্যক্তি কুশীদ-প্রদানে বাধ্য হইবেন না। এতদ্বিধয়ে অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে (৩য় অধ্যায়, ১৭৪ম পৃষ্ঠা) পরিব্যক্ত কোটিল্যের অন্তিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“সপাদপণা ধর্ম্মা মাসবৃদ্ধিঃ পণশতত্ৰ। পঞ্চপণা ব্যবহারিকী। দশপণা কান্তার-
কাণাঃ। বিংশতিপণা সামুদ্রাণাঃ। ততঃ পরং কর্ত্ত্বুঃ কারয়িতুশ্চ পূর্ব্বসমাহসদণ্ডঃ।
শ্রোতৃণামৈকৈকং প্রত্যর্ধদণ্ডঃ। রাজহুযোগক্ষেমবহে তু ধনিকধারণীকরোচ্চরিজম-
পক্ষেত। ধাত্তবৃদ্ধিস্ফলনিপ্পত্তাবুণার্ণাবরং মূল্যকৃত্য বর্দ্ধেত। প্রক্ষেপবৃদ্ধিরূপদাং
সন্নিধানসম্মা বার্ষিকী দেয়া চিরপ্রবাসং স্তম্ভপ্রবিষ্টো বা মূল্যহিগুণং দত্ত্বাৎ।
অকৃত্য বৃদ্ধিঃ সাধয়তো বা মূল্যং বা বৃদ্ধিমারোপ্য শ্রাবয়তো বদ্ধচতুশ্চণৈ দণ্ডঃ।
তুচ্ছচতুরশ্রাবণায়ামভূতচতুশ্চণঃ। তস্ত্র ত্রিভাগমাদাত্য দত্ত্বাৎ। শেষং প্রদাত্য।
দীর্ঘমজ্রব্যাদিগুরুকুলোপকরুৎ বালমসারং বা নর্ণমহুবর্ধেত। মুচ্যমানমৃগমপ্রতিগৃহুতো
দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। কারণাপদেশেন নিবৃত্তবৃদ্ধিকমত্ত্র তিষ্ঠেৎ। দশবর্ষো-
পেক্ষিতমৃগমপ্রতিগ্রাহমত্ত্রবালবৃদ্ধব্যাদিতব্যসনিপ্রোষিতদেশভ্যাগরাজ্যাবিলম্ভাঃ॥”

ঋণসংক্রান্ত ব্যবহার-কালে সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা ঋণ-সংগ্রামের যে বিধান কোটিল্য বিহিত
করিয়াছেন, তাহার আভাষ যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে কোটিল্যের উক্তি;—

“প্রাত্যহিকশ্চতরোহুযমতা বা ত্রয়োহবরার্থ্যাঃ। পঞ্চামুযমতো বা দ্বৌ ঋণং প্রতি
ন দ্বৈবেকঃ। প্রতিবিদ্ধাস্তালসহায়বদ্ধধনিকধারণিকবৈরিত্তজধুতদণ্ডাঃ। পূর্ব্ব
চাব্যবহার্যাঃ রাজশ্রোত্রিয়গ্রামভূতকৃষ্টিত্রিণিঃ পতিচণ্ডালকুৎসিতকর্ণ্যাণোহন্ধ-
বধিরমূকাহংবাদিনঃ ক্রীড়াজপুরুষাশ্চাত্ত্র স্ববর্গেভ্যাঃ। পার্শ্বাশ্রয়সঙ্গহণেবু তু
বৈরিত্তালসহায়বর্জাঃ। রহস্তব্যবহারেষেকা ক্রী পুরুষ উপশ্রোতা উপদ্রষ্টা বা সাক্ষী
স্তাৎ রাজতাপসবর্জম্। স্বামিনী ভৃত্যানামুদ্বিগাচার্য্যশিষ্যাণাং নাতাপিতরৌ
পুত্রাণাং চানিগ্রহণসাক্ষ্যং কুয়ু তেষামিতরে বা। পরস্পরাভিযোগে চৈষামুত্তম।
পরোক্তা দশবন্ধঃ দ্বারবীরাঃ পঞ্চবন্ধম্। * * * একমজ্রাস্ত্যামহুপহরতে-
হুপহরতাং সপ্তরাজাদুর্ধ্বং দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। ত্রিপঞ্চাদুর্ধ্বমভিযোগং দত্ত্বাঃ॥”

সাক্ষী প্রভৃতির বিধান উল্লেখ করিয়া ব্যবহার-বিচারে জয়পত্র প্রদান সম্বন্ধে কোটিল্য
যে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, অর্থশাস্ত্র হইতে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

“সাক্ষিভেদে যতো বহবঃ শুচরোহুযমতা বা ততো নিবচ্ছেয়ুঃ। মধ্যং বা গৃহীযুঃ।
তদ্বা দ্রব্যং রাজা হরেৎ। সাক্ষিগণশ্চেদভিযোগাদুনং ক্রয়ুরতিরিক্তভাতিযোক্তা
বদ্ধং দত্ত্বাৎ অতিরিক্তং বা ক্রয়ুততিরিক্তং রাজা হরেৎ। বালিশ্যাদতিযোক্ত বা

হুঃস্বতং হুলিখিতং প্রেতাভিনিবেশং বা সমীক্য সাক্ষিপ্ৰত্যয়মেব ত্যং। 'সাক্ষি-
বালিভ্বেষেব গ্রুৎগমুপযোগে দেশকালকার্য্যণাং পূৰ্ণমধ্যমোত্তমা দণ্ডাঃ' ইত্যোশনসাঃ।
'কুটসাক্ষিণো বমৰ্শমজুতং বা নাশরেয়ুস্তদশগুণং দণ্ডং দহ্যারিতি' মানবাঃ। 'বালিশ্যায়া
বিসংবাদয়তাং চিত্তো যাতঃ' ইতি বার্হস্পত্যাঃ। 'ন' ইতি কোটিল্যাঃ। এবং হি
সাক্ষিভিশ্চোতবাম্। অশ্বতাং চতুর্বিংশতি পণো দণ্ডঃ ততোহর্ধমগ্রবাণাম্। দেশ-
কালাবিদূরস্থান্ সাক্ষিণঃ প্রতাপাদয়েৎ। দূরস্থানপ্রসারায়। স্বামিবাক্যেন সাধয়েৎ।"

ঋণ-সংক্রান্ত দায় সম্বন্ধে কোটিল্যের বিধান স্মৃতিশাস্ত্রের অনুসারী। কোটিল্যের বিধান—
'প্রেতস্ত পুত্রাঃ কুসীদং দহ্যাঃ। দায়াদা বা রিক্খহরাসসহগ্রাহিণঃ প্রতিভূবো বা।' অর্থাৎ—

ঋণসংক্রান্ত
দায়।

ঋণকারীর মৃত্যুর পর তৎপুত্রগণ দায় মৃত পিতৃঋণ পরিশোধ করিবে।

পুত্রের অভাবে দায়াদ বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিগণ সে ঋণ পরিশোধ

করিতে বাধ্য। তদভাবে প্রতিভূগণ ঋণ পরিশোধ করিবেন। কতিপয়

ব্যক্তি একত্র হইয়া ঋণ করিলে কোনও এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্যান্য সকলকে সে
ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিভূ হইবে না। যে ক্ষেত্রে
প্রতিভূর বা জামিনের কালাকাল বা স্থানাদি নির্দিষ্ট না থাকিবে, সে স্থলে প্রতিভূর
পুত্র, পৌত্র বা উত্তরাধিকারিগণ ঋণ পরিশোধ করিবে। একই ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যক্তির
নিকট ঋণ করিলে, একাধিক ঋণদাতা এককালে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত
করিতে পারিবেন না,—অর্থশাস্ত্রে এইরূপ ব্যবস্থার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু
'প্রতিষ্ঠমান' অধমণের সম্বন্ধে এ বিধি প্রযুক্ত হইবে না। স্বামী স্ত্রী, পিতা-পুত্র এবং
একান্তবর্গী ভ্রাতৃগণ পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে যে ঋণগ্রহণ করিবেন, তদ্বিষয়ে
ব্যবহার-স্থাপন চলিবে না। কাজ করিবার সময়ের মধ্যে কৃষকগণ বা রাজকর্মচারিগণ
ঋণদায়ের দ্বিত হইবেন না। গোপালক এবং কৃষাগদিগের নিকট বেতন বাবদ যে ঋণ হইবে,
স্ত্রী তাহা পরিশোধ করিবেন। এতদ্ব্যতীত স্বামীর অপর কোনও ঋণ, স্ত্রী পরিশোধ করিতে
বাধ্য নহেন। অল্পপক্ষে স্ত্রীকৃত ঋণ, স্বামী পরিশোধ করিতে বাধ্য। স্ত্রী-কৃত ঋণ পরিশোধ
করিবার উপায় নির্ধারণ না করিয়াই যদি স্বামী পলায়ন করেন, তাহা হইলে তাহার
উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। ঋণের বিষয় অস্বীকার করিলে সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা সে ঋণ
সপ্রমাণ করিবার বিধি। স্বামীর ঋণগ্রহণের বিষয় অবগত থাকিলেও স্বামীর সে ঋণ স্ত্রী
পরিশোধে বাধ্য হন না। কিন্তু গোপালক, শৌণ্ডিক, রজক প্রভৃতির স্ত্রী অনেক
বিষয়-কার্য্যে স্বামীর সহায়তা করিয়া থাকে; সংসারের অনেক ব্যয়ভারও তাহারা বহন
করে। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের কৃত ঋণের ক্ষুদ্র তাহারা পরস্পর দায়ী। ঋণাদান
ও তৎসংক্রান্ত দায় সম্বন্ধে কোটিল্যের বিধান সংক্ষেপতঃ এইরূপ বিবৃত হইয়াছে; যথা,—

"প্রেতস্ত পুত্রাঃ কুসীদং দহ্যাঃ। দায়াদা বা রিক্খহরাসসহগ্রাহিণঃ প্রতিভূবো বা।

ন প্রাতিভাব্যমজ্ঞদসায়ং বালপ্রাতিভাব্যম্। অসম্প্রাতদেশকালং তু পুত্রাঃ পৌত্রাঃ

দায়াদা বা রিক্খং হরমাণা দহ্যাঃ। জীবিতবিবাহকুনিপ্রাতিভাব্যমসম্প্রাতদেশকালং

তু পুত্রাঃ পৌত্রাঃ বা বহেয়ুঃ। নানার্নসমবায়ৈ তু নৈকো যৌ দুগলদতিবদেদ্যাতাং

অন্তর প্রতিষ্ঠমানাং । তত্রাপি গৃহীতানুপূৰ্বা রাজশ্রোত্রায় ত্রযাং বা পূৰ্ণপ্রতি-
পাদয়েৎ । দংপত্যোঃ পিতাপুত্রয়োঃ ভ্রাতৃণাং চাবিকৃত্যনানং পরম্পরকৃতমুগমসাধাম্ ।
অগ্রাহাঃ কর্কশালেষু কর্কশা রাজপুরুষাশ্চ । জীবী বা প্রতিপ্রাবলী পতিকৃতঃ
ক্লগং অন্তর গোপালকাক্সদীতিকেভ্যঃ । পতিস্ত গ্রাহঃ স্বীকৃতঃ ক্লগমপ্রতিবিধায়
প্রোষিত ইতি সম্প্রতিপত্তাবৃতমঃ । অসম্প্রতিপত্তৌ তু সাক্ষিণঃ প্রমাণম্ ॥”

সংহিতোক্ত ঋণ সংক্রান্ত বিধি কোটিল্যের বিধানের ভিত্তিহানীর জন্য যাইতে পারে ।
আনুষ্ঠানিক ঋণাদি ব্যতীত ব্যবহার-বিষয়ক ঋণ-সংক্রান্ত বিধি সংহিতা-গ্রন্থে নানা ভাবে

আলোচিত হইয়াছে । মমুর মতে অধিক হারে সুদ লওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ ।
সংহিতোক্ত
ঋণাদি-বিধি। অশাস্ত্রীয় সুদ গ্রহণও তাঁহার মতে নিষিদ্ধ । মমু বলিয়াছেন,—‘চক্রবৃদ্ধি’

বা সুদের সুদ, ‘কাল বৃদ্ধি’ বা মূল্যের দ্বিগুণ অধিক বৃদ্ধি, ‘কারিতা’ বা
আপৎকালে স্বীকৃত বৃদ্ধি এবং কারিকাবৃদ্ধি বা পীড়নাদি দ্বারা বৃদ্ধি—এই চারি প্রকার
অশাস্ত্রীয় বৃদ্ধি গ্রহণ করা বিধেয় নহে । মাসিক বা দৈনিক হিসাবে সুদ লওয়ার বন্দোবস্ত
থাকিলে, ঐ সুদ মূলধনের অধিক হইবে না,—মমুর ইহাই অভিমত । তবে ধাতু প্রভৃতি
স্থলে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি লইবার বিধান মমুসংহিতায় দৃষ্ট হয় । অশাস্ত্রীয় বৃদ্ধি মমুসংহিতায় ‘কুলীদ-
পথ’ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ঐরূপ বৃদ্ধি শতকরা মাসিক পাঁচ পণের অধিক হইবে না ।
সবন্ধক ঋণস্থলে মমুর ব্যবস্থা অন্তরূপ । সেরূপ অবস্থায় শতকরা অশীতিভাগের এক-
ভাগ সুদের ব্যবস্থা । কিন্তু দুই পণের অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ মমুর মতে সর্বত্র নিষিদ্ধ ।

“বশিষ্ঠবিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেদ্বিত্তবিবর্জিনীম্ । অশীতিভাগং গৃহীদ্যন্নাসাদাক্ষুবিকঃ শতেঃ ॥

দ্বিকং শতং বা গৃহীয়াৎ শতাৎ ধর্মমমুস্মরন্ । দ্বিকং শতং হি গৃহ্মানো ন ভবত্যর্থকদ্বিধী ॥”

মমুর মতে, ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-ভেদে বৃদ্ধি-গ্রহণের একটা হার নির্দিষ্ট ছিল । সে
হিসাবে, ব্রাহ্মণ অধমর্ণের নিকট শতকরা দুই পণ, কত্রিয়ের নিকট তিন পণ, বৈশ্যের
নিকট চারি পণ এবং শূদ্রের নিকট শতকরা পাঁচ পণ সুদ লওয়ার ব্যবস্থা । বধা,—
“দ্বিকং দ্বিকং চতুষ্কঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং সমম্ । মাসস্ত বৃদ্ধিং গৃহীদ্যর্ষণানামনুপূর্বশঃ ॥” কিন্তু
বন্ধকীর দ্রব্য ভোগ করিলে উত্তমর্ণ সুদ পাইবার অধিকারী নহেন,—আধি-প্রসঙ্গে মমু
তাহা বিহিত করিয়াছেন । যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির বিধান এতদপেক্ষা প্রোক্তল । যাজ্ঞবল্ক্য
বলিয়াছেন,—‘সবন্ধক ঋণ স্থলে প্রতি মাসে শতকরা অশীতিভাগের এক ভাগ সুদ বা বৃদ্ধি
পাইবে । বন্ধকশূন্ত ঋণ হইলে ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভেদে বধাক্রমে শতকরা শত
ভাগের দুই ভাগ, তিন ভাগ, চারি ভাগ এবং পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি ।’ এরূপ স্থলে, বিষ্ণুর মতেও
শতকরা দুই ভাগ, তিন ভাগ, চারি ভাগ ও পাঁচ ভাগ বৃদ্ধি নির্দিষ্ট হইয়াছে । তবে
স্বর্ণাদি বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থা অন্তরূপ । তিনি (বঠ অধ্যায়, ১১ম—১৭ম) বলিয়াছেন,—

“হিরণ্যস্ত পরা বৃদ্ধির্দ্বিগুণা । ধাতুস্ত ত্রিগুণা । বস্ত্রস্য চতুঃশুণা । রসস্যাষ্টশুণা ।

সত্ততিঃ জীপত্তনাম্ । কিম্বকার্পাসস্ত্রচন্দ্রায়ুধেটকাক্সরাণামক্ষরা । অন্ততানানং দ্বিগুণা ॥”

অর্থাৎ,—‘স্বর্ণের চরম বৃদ্ধি দ্বিগুণ ; ধাতুর তিন গুণ ও বস্ত্রের চারি গুণ বৃদ্ধি । রসের অর্থাৎ
বুড়-তৈলাদির আট গুণ এবং জী-পত্তর বৎস্য পণ্যস্ত বৃদ্ধি বিহিত । কিম্ব, কার্পাস, সূত্র, চন্দ্র,

আয়ুধ, ইষ্টক এবং অঙ্গারের অক্ষর বুদ্ধি অর্থাৎ ইহাদের স্তম্ভ চিরকাল চলিবে। অমুক্ত ঋণের বুদ্ধি দ্বিগুণ।' যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিও এতদনুরূপ। তাঁহার এ ব্যবস্থা বহুকালস্থিত ঋণ-সম্পর্কীয়। উত্তমর্ণ যদি ইহার স্তম্ভ মধ্যে মধ্যে প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে ইচাই হইল—বুদ্ধির শেষ সীমা। যতকালই অতীত হউক না কেন, উত্তমর্ণ এতদতিরিক্ত বুদ্ধির দাবী করিতে পারিবেন না। মিতাক্ষরা-মতেও অনুরূপ বিধান বিদিত হইয়াছে। পোষণ জন্ত গাভী প্রভৃতি প্রদত্ত হইলে একটি বৎস সহ গাভী প্রত্যর্পণ করিলেই অধমর্ণের ঋণ পরিশোধ হইবে,—ইহা মিতাক্ষরা-সম্মত। গোতম বলিয়াছেন,—স্তম্ভ ত্রায়া মত বিংশতি ভাগের হিসাবে বাড়িতে পারে। কিন্তু ঋণ যদি এক বৎসরের অধিক কালের জন্ত না হয়, তাহা হইলে স্তম্ভ প্রতি মাসে পাঁচ মাষা হিসাবে বাড়িবে। কালবশে চক্রবৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতে পারে। ঋণকর্তার শারীরিক পরিশ্রম এবং বন্ধকী বস্তুর ভোগ স্তম্ভের মধ্যে গণ্য। পশু, উপল অর্থাৎ মূল্যবান প্রস্তর, লোম, ক্ষেত্র এবং শতবাহু বস্তুতে পাঁচ গুণের অধিক স্তম্ভ হইবে না।' এতদ্বিষয়ে গোতমের উক্তি (ত্রয়োদশ অধ্যায়, ১২ম সূত্র) ; যথা,—

“কুসীদ বুদ্ধিধর্ম্যা বিংশতিঃ পঞ্চমাষকী মাসং নাতিসাংবৎসরীমেকে চিরস্থানে
বৈগুণ্যং প্রয়োগস্য মুক্তাধিনবদ্ধিতে দিৎসতোহবরুদ্ধস্য চ চক্রকালবুদ্ধিঃ কারিতা-

কায়িকশিখাধিভোগাশ্চ কুসীদং পশুপজলোমক্ষেত্রশতবাহুসুনাতিপঞ্চগুণম্॥”

নারদের মত বসিষ্ঠের মতের অনুসারী। বসিষ্ঠ বলিয়াছেন,—‘উত্তমর্ণ মূলধন ব্যতীত প্রতি মাসে অগ্নী ভাগের এক ভাগ স্তম্ভ প্রাপ্ত হইবেন। বৃহস্পতিরও সেই অভিমত। সংহিতাদির আলোচনায় বুঝা যায়, স্তম্ভ-সম্বন্ধে সংহিতাকারগণ সকলেই এক অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ছই এক স্থলে সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও সকলেরই যে অভিপ্রায় একরূপ, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। কোটিল্যের মতে নূনকরে স্তম্ভের পরিমাণ শতকরা পাঁচ পণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—“সপাদপণা ধর্ম্যা মাসবুদ্ধিঃ পণশতম্” শাস্ত্রকারগণের অনেকেরই মতে সবন্ধক ঋণের স্তম্ভ-পরিমাণ সওয়া পণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কোটিল্যের দ্বায় সংহিতাশাস্ত্র-প্রণেতৃগণও কান্তার ও সমুদ্রগামী বাণিজ্যার্থীর স্তম্ভের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা দশ ও বিংশ পণ নির্ধারণ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৯শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ; যথা,—

“কান্তারগান্ত দশকং সামুদ্রা বিংশকং শতম্।

দহ্যর্কা বক্রতাং বুদ্ধিঃ সর্কো সর্কাসু জাতিবু॥”

মহাদির শাস্ত্রকারগণের বিধান অনুসারে স্থলপথ বা জলপথ গমনকুশল দেশকালানুসারে বণিকদিগের সম্বন্ধে স্তম্ভ-সংক্রান্ত এই বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

ঋণ-আদায় সম্বন্ধে অসমর্থ পক্ষে মহু পুনরায় লেখাদি প্রদানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। স্তম্ভ প্রদান করিয়া মূলধনের জন্ত অধমর্ণ পুনরায় লেখাপত্র দিতে পারেন। সমুদায় বুদ্ধি প্রদানে

ঋণ-আদায়
বিধি।

অসমর্থ হইলেও অবশিষ্ট বুদ্ধি ও মূলধন একত্র করিয়া লেখ্য-পত্র দিবার বিধান মহু প্রদান করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিরও সেই একই ব্যবস্থা।

তবে যাজ্ঞবল্ক্যাদির বক্তে, অধমর্ণ যে সময়ে যে ঋণ প্রদান করিবে, তাহা ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠদেশে লিখিয়া রাখা কর্তব্য। নিজ-হস্তাকরে উত্তমর্ণ লেখাপত্রে তাহার

প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন। সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া গেলে ঐ লেখ্য ছিঁড়িয়া কেলিবে। আর যদি ঋণ পরিশোধ না হয়, তাহা হইলে শুদ্ধির জন্ত ঐ লেখ্য-পত্র পরিবর্তন করিয়া দিবে।

“লেখ্যস্ত পৃষ্ঠেহভিলিখেদ্বা ধনং ঋণী। ধনী চোপগতং দত্তাৎ বহন্তপরিচিহ্নিতম্॥

দধৰ্ণং পাঠয়েজ্জ্যেষ্ঠাং শুক্লো বাস্তস্তু কারয়েৎ। সাক্ষিমচ্চ ভবেদ্বদ্বা তদাতব্যং সসাক্ষিকম্॥”

এতদ্ব্যতীত লোক-সমক্ষে যে ঋণ গ্রহণ করিবে, লোকসমক্ষেই তাহা পরিশোধ করিবার বিধি। “লিখিতার্থে এবিষ্টে লিখিতং পাটয়েৎ”—বিষ্ণুও এই অভিপ্রায়। এতদ্ব্যতীত, বিষ্ণু ও বাজবল্ক্যের মতে ঋণদাতা যে কোনও উপায়ে প্রদত্ত ঋণ আদায় করিতে পারেন। সে সম্বন্ধে উত্তমর্ণ রাজদ্বারে দণ্ডিত হইবেন না। যিনি ঋণপ্রদানে সমর্থ অথচ ঋণদায় হইতে মুক্ত হইবার জন্ত রাজদ্বারে আবেদন করেন, * রাজবিধান অনুসারে তিনি গৃহীত ধনের সমপরিমাণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। আর উত্তমর্ণ কর্তৃক আবেদিত হইয়া রাজা যদি সাক্ষী লেখ্যাদি প্রমাণ গ্রহণে ঋণ সাব্যস্ত করেন; তাহা হইলে অধমর্ণ তাঁহার গৃহীত ঋণের দশমাংশ এবং উত্তমর্ণ তাঁহার প্রদত্ত ধনের বিংশতি অংশ রাজকোষে দণ্ড-স্বরূপ প্রদান করিবেন। এ সম্বন্ধে নারদও অনুরূপ ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছেন। তাঁহারও মতে,—

“ঋণিকঃ সধনো যন্ত দৌরাত্ম্যায় প্রযচ্ছতি। রাজা দাপয়িতব্যঃ স্তাৎ গৃহীত্বাংশস্ত বিংশকম্॥”

স্বজাতীয় বা নিকট জাতীয় অধমর্ণ নিধন হইলে, তাহার শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ঋণদায়ের বিধান, মনু বিহিত করিয়াছেন। আর যদি অধমর্ণ উৎকৃষ্ট জাতি হন, তাহা হইলে তাঁহার আর অনুসারে ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা মনুতে দৃষ্ট হয়। অধমর্ণ নিধন হইলে, তাহার ঋণ শোধের ব্যবস্থা বাজবল্ক্য-সংহিতায় এইরূপ বিহিত হইয়াছে; যথা,—হীনজাতি বা সমজাতি নিধন হইলে তাহার ঋণ-পরিশোধনার্থ রাজা তাহার দ্বারা যথাযোগ্য উত্তমর্ণের কর্ম করাইয়া দিবেন এবং ব্রাহ্মণ নিধন হইলে তাঁহার আর অনুসারে ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধ করাইবার ব্যবস্থা করিবেন। (বাজবল্ক্য-সংহিতা, ২য় অধ্যায়, ৪৪ম শ্লোক); যথা,—

“হীনজাতিং পরিক্ষীণমুণাথং কর্ম কারয়েৎ।

ব্রাহ্মণস্ত পরিক্ষীণঃ শটেন্দ্রাপ্যো যথোদয়ম্॥”

এ সম্বন্ধে বৃহস্পতিও বলিয়াছেন,—“নিধনং ঋণিকং কর্ম গৃহমানীয় কারয়েৎ। শৌণ্ডিকাস্তং ব্রাহ্মণস্ত দাপনীয় শটৈঃ শটৈঃ॥” কিন্তু অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে আসিলে যদি উত্তমর্ণ স্তন-বৃদ্ধির জন্ত উহা গ্রহণ না করেন, এবং অধমর্ণ ঐ ধন মধ্যস্থের নিকট গচ্ছিত রাখেন, তাহা হইলে ঐ সময় হইতে আর স্তন দিতে হইবে না। আবার অনেক উত্তমর্ণ একযোগে একই অধমর্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবেন না। সেরূপ ক্ষেত্রে ঋণ-গ্রহণের পৌরীপাধ্য অনুসারে রাজা এক এক জন উত্তমর্ণের ঋণ-পরিশোধের ব্যবস্থা করাইবেন। বিভিন্ন বর্ণীয় অনেক উত্তমর্ণ একসঙ্গে অভিযোগ উপস্থিত করিলে অভিযোক্তৃগণের বর্ণানুসারে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা বিহিত হইবে। রাজা প্রথমে ব্রাহ্মণ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করাইবেন।

* একরূপ ক্রিয়া—আধুনিক দেউলিয়া (Insolvency) সংক্রান্ত ক্রিয়াদির সহিত উপমিত হইতে পারে। প্রাচীন-কালে দেউলিয়া হির না হইলে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইত। কিন্তু এখন রাজদণ্ডের বিধান নাই। দেউলিয়া সাব্যস্ত না হইলে ঋণদায়ের ব্যবস্থা আছে।

তার পর ক্ষত্রিয়, তার পর বৈশ্য এবং সর্বশেষে শূদ্র উত্তরণের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা । কোটিল্যের মতে পরোপকারী, দরিদ্র ও ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে কুণীদ বৃদ্ধি হইবে না । অপিচ, পীড়িত, বাসনী, প্রবাসী ও পলাতক ব্যক্তিগণ যদি দশ বৎসরের মধ্যে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা না করেন ; তাহা হইলেও তাঁহাদের প্রদত্ত ধন নষ্ট হইবে না । সংহিতা-গ্রন্থে কোটিল্য বর্ণিত এই সকল বিধান নাই । অস্তান্ত সকল বিষয়েই কোটিল্য স্মৃতি-শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়াছেন, অর্থশাস্ত্রের ও সংহিতাগ্রন্থের তুলনায় সমালোচনা করিলে তাহা উপলব্ধি হয় । কোটিল্য বলিয়াছেন, গচ্ছিত-গ্রহণকারী মরিয়া গেলে তদ্বিষয়ে ব্যবহার-স্থাপনা চলিবে না । হুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইলেও তাঁহার সেইরূপ ব্যবস্থা । কিন্তু এ বিষয়ে একটা আপত্তি উঠিতে পারে । গ্রহণকারীর পরলোকগমনে উত্তরাধিকার-হুজে পুত্রপৌত্রগণ অস্তান্ত সম্পত্তির সহিত গচ্ছিত দ্রব্যও প্রাপ্ত হন । সে অবস্থায় কোটিল্যের এ বিধান যুক্তিবদ্ধ বলিয়া মনে হয় না । কারণ, ঋণ-বিষয়ক দায়-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, পুত্র বা দায়াদগণ ঋণকারীর ঋণ পরিশোধ করিবেন । তাহা হইলে পুত্রগণ কেন সে ঋণ পরিশোধ করিবেন না বা গচ্ছিত ফিরাইয়া দিবেন না,—তাহা বুঝিতে পারা যায় না । হুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইলে গচ্ছিত প্রত্যর্পণ বিষয়ে কোনও বাধা জন্মিতে পারে না । তাঁহার স্থলাভি-
ষিক্ত অপরেও সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে । উপনিধি-বিধানে কোটিল্যের উক্তি ; যথা,—

“উপনিধিঃ স্মরণেন ব্যাখ্যাতঃ । পরচক্রাটবিকাভ্যাং হুর্গরাষ্ট্রবিলোপে বা, প্রতিরোধকৈর্বা গ্রামসাধুত্রজবিলোপে, চক্রযুক্তো নাশে বা, গ্রামমধ্যগ্রাম্যদুকাবধে বা কিঞ্চিদমোকশ-
মাণেকুপ্যামনির্হার্যবর্জমেকদেশমুক্তদ্রব্যে বা, জালাবেগোপকৃত্তে বা, নাবি নিমগ্নায়াঃ মুষিতায়াঃ স্বয়মুপকৃত্তো নোপনিধিমভ্যাভবেৎ । উপনিধিভোক্তা দেশকালানুরূপং ভোগবেতনং দত্ত্বাৎ । দ্বাদশপণং চ দণ্ডম্ । উপভোগনিমিত্তং নষ্টং বাহৃত্যভবেচ্চ-
তুর্বিংশতিপণশ্চ দণ্ডঃ । অস্তথা বা নিম্পতনে । প্রেতবাসনগতং বা নোপনিধিমভ্যা-
ভবেৎ । আধানবিক্রয়পায়নেনশ্চ চাত্ত চতুগুণপঞ্চবন্ধো দণ্ডঃ । পরিবর্তনে নিম্পাতনে
বা মূল্যসমঃ । তেন আধিপ্রণাশোপভোগবিক্রয়াদানাপহার্য ব্যাখ্যাতাঃ । নাধিস্-
সোপকারঃ সীদেন চাত্ত মূল্যং বধেত । নিরূপকারসদীদেন্মূল্যং চাত্ত বধেত । উপ-
স্থিতস্তাধিমপ্রযুক্তো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ । প্রয়োজকাসম্মিধানে বা গ্রামবৃদ্ধেব স্থাপনিত্বা
নিজস্বমাধিং প্রতিপত্তেত । নিবৃত্তবৃদ্ধিকা বাধ্যধিস্তৎকালকৃত্তমূল্যস্তদৈবাবতিষ্ঠেত ।
অনাশবিনাশকরণাধিস্তিত্তো বা ধারণসম্মিধানে বা বিনাশভয়াহুত্বাধং ধর্ম্মহানুজাতো
বিক্রীণীত । আধিপালপ্রত্যয়ো বা । স্থাবরস্ত প্রয়াসভোগাঃ ফলভোগ্যো বা প্রেক্ষপ-
বৃদ্ধিমূল্যস্তদ্ব্যজীবমমূল্যাক্ষরেণোপনয়েৎ ॥ অনিস্থটোপভোক্তা মূল্যস্তদ্ব্যজীবং বন্ধং
চ দত্ত্বাৎ । শেষমুপনিধিনা ব্যাখ্যাতম্ । এতেনাদেশোহধ্যধিস্চ ব্যাখ্যাতৌ । সাধে-
নাদ্যধিহস্তো বা প্রদিত্তাঃ ভূমিপ্রাপ্তশ্চৌরৈর্ভগ্নোৎসৃষ্টৌ বা নাদ্যধিমভ্যাভবেৎ ।
অস্তরে বা মৃতস্ত দায়াদোহপি নাত্যাভবেৎ । শেষমুপনিধিনা ব্যাখ্যাতম্ । বাচিতকম-
বজীতকং বা যথাবিধং গৃহীমুত্তথাবিধমেব অর্পয়েৎ ॥ স্ত্রোবোপনিপাতাভ্যাং দেশ-
কালোপরোধি দত্তং নষ্টং বিনষ্টং বা নাত্যাভবেৎ ॥ শেষমুপনিধিনা ব্যাখ্যাতম্ ।”

পাশ্চাত্য দেশে হুদ সৰ্ব্বদে প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়—মোজেস প্রবর্তিত নীতি-সমূহে ।
মোজেস হুদ-গ্রহণের ঘোর প্রতিবাদী ছিলেন । * হুদ-গ্রহণ বা তদনুরূপ কোলও অর্থ-

পাশ্চাত্যে
হুদ-প্রথা ।

গ্রহণ, তাঁহার মতে স্তার-বিগর্হিত ও ঈশ্বরের অননুমোদিত বলিয়া বিহিত
হইয়াছিল । মোজেসের বিধানে প্রতিভূ প্রভৃতির পরিচয়ও পাওয়া যায় ।

হুদ-সংক্রান্ত বাইবেলের ঐ অংশ-সমূহের আলোচনার অনেক মনে করেন,
সে সময় অত্যধিক পরিমাণে হুদ-গ্রহণের প্রথা প্রবর্তিত ছিল । হুদের পীড়নে প্রনীড়িত

* বাইবেলের অনেক স্থলে মোজেস-প্রবর্তিত নীতি-সমূহে হুদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । বাইবেলের
অন্তর্গত এক্সোডাস, ডিউটারনমি, সাম, প্রভাব, ইজিকিল, নেহেমিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে এতদ্বিষয়ক উক্তি দৃষ্ট হয় ।
যথা—“If thou lend money to any of my people with thee that is poor, thou shalt not be
to him as a creditor ; neither shall ye lay upon him usury....If thou at all take thy
neighbour's garment to pledge, thou shalt restore it upon him by that the sun
goeth down—*Exodus*, XXII, 25—26. “And if thy brother be waxen poor, and his
hand fail with thee ; then thou shalt uphold him : as a stranger and a sojourner shall
he live with thee....Take thou no usury of him or increase ; but fear thy God ; that
thy brother may live with thee...Thou shalt not give him thy money upon usury,
nor give him thy victuals for increase.”—*Leviticus*, XXV, 35—37. “And if thy brother
be waxen poor with thee, and sell himself unto thee ; thou shalt not make him
to serve as a bond servant : as an hired servant, and as a sojourner, he shall be
with thee” &c.—*Ibid*, 39—40. Thou shalt not lend upon usury to thy brother ; usury
of money, usury of victual, usury of anything that is lent upon usury : but unto
foreigner thou mayest lend upon usury : but unto thy brother thou shalt not lend
upon usury.”—*Deuteronomy*, XXIII, 19—20.” বাইবেলের আরও কয়েক স্থানে হুদের বিষয়
উল্লিখিত আছে ; যথা,—“Then I consulted with myself and contended with the nobles
and the rulers, and said unto them : Ye exact usury, every one of his brother ”—
Nehemiah, V. 6. “He that putteth not out his money to usury, Nor taketh reward
against the innocent.” *The Psalms*, XV, 5. “Take his garment that is surety for
a stranger, and hold him in pledge that is surety for strangers. The king by judg-
ment establisheth the land : But he that exacteth gifts overthroweth it.”—*The*
Proverbs, XX, 16 & XXIX, 4. “He that augmenteth his substance by usury and
increase, gathereth it from him that hath pity on the poor.”—*Ibid*, XXVIII, 8. “He
that hath not given forth upon usury, neither hath taken any increase, &c.”...“Hath
given forth upon usury and hath taken increase ; shall he then live ? he shall not
live ; he hath done all these abominations ; he shall surely die.”...“That hath
withdrawn his hand from the poor, that hath not received usury nor increase hath
executed my judgment &c.”—*Isaiah*, LVIII, 8, 13, 17. “In thee have they taken
bribes to shed bloods ; thou hast taken usury and increase and thou hast greedily
gained of thy neighbours by oppression &c.”—*Ezekiel*, XXII, 12.

হইয়া লোকে অশেষ ধৃষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করিত। সেই জন্য, নির্দম নির্ভর কুসীদজীবীগণের হস্ত হইতে দরিদ্রগণকে পরিত্যাগের জন্য, মোজেস তাঁহার নীতি-সমূহের মধ্যে সূদের নিষিদ্ধ-বাদ কীর্তন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, পাশ্চাত্যদেশে সূদ-গ্রহণের প্রথা যে বহু পূর্ববর্তী ও অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা যেমন আমাদের বেদকে ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকি; খৃষ্টানগণও তাঁহাদের 'বাইবেল' সম্বন্ধে সেইরূপ ধারণা সেইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, খৃষ্ট-জন্মের মাত্র কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সে হিসাবে সেই সময় হইতেই বাইবেলের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। সেই বাইবেলে যখন সূদের বিষয় উল্লিখিত আছে; তখন বুঝা যায়—প্রতীচ্যেও অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে সূদ-গ্রহণ-প্রথা প্রবর্তিত ছিল। প্রাচীন রোমের ও প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, মধ্যযুগে, খৃষ্টজন্মের ৫৯৪ বৎসর পূর্বে, সোলনের নীতিসমূহ প্রবর্তিত হইয়াছিল। সোলন সে সময় শতকরা বার্ষিক ষোল মুদ্রা হিসাবে সূদের হার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। পলুটার্ক এতদ্বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে কোরিন্থ নগরে এক নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হয়। তদনুসারে সবন্ধক ঋণে শতকরা চব্বিশ মুদ্রা সূদের হার নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সে সময় এথেন্স নগরে সাধারণতঃ তৎকাল-প্রচলিত মুদ্রার হিসাবে ১২ হইতে ১৮ মুদ্রা পর্য্যন্ত সূদ লওয়া হইত। ঐতিহাসিক গ্রোট এ বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই সকল বিবরণ হইতে বুঝা যায়, প্রাচীন গ্রীসে তৎকালে অত্যধিক পরিমাণে সূদ লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কুসীদজীবীগণের প্রীড়নে আর্ন্তগণ বিশেষ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। আর সেইজন্য সোলন প্রভৃতি রাজনীতিকগণ ঋণসংস্কারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই অনুভাবনার ফলে গ্রীসে কুসীদের হার নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন রোমেও ঐরূপ অত্যধিক কুসীদ-গ্রহণ-প্রথার বিস্তারিততার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ বলেন;—অত্যধিক পরিমাণে কুসীদ গ্রহণ জন্য জনসাধারণের কষ্টের ও যন্ত্রণার অবধি ছিল না। তাই সূদের হার নির্দিষ্ট করিবার জন্ত ব্যবস্থা-বিধানের আবশ্যক হয়। আর সেই উপলক্ষে ৪৫১-৪৫০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে রোমে 'টুয়েলভ টেবল' আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যায়। তদনুসারে মূলধনের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ কুসীদের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছিল,—ঐতিহাসিক টাসিটাস এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ৩৭৭ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে রোমে সূদের পরিমাণ শতকরা পঞ্চমুদ্রা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ৩৪২ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ হারে সূদগ্রহণও নিষিদ্ধ হইয়া যায়। এই হইতে প্রাচীন রোমে সূদ-গ্রহণ-প্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। এই ভাবে বহু-দিন অতীত হয়। কিন্তু সূদ-গ্রহণ সম্বন্ধে নিষেধাস্তার ফলে নানা অসুবিধা হইতে থাকে। এমন কি, রাজপ্রয়োজনেও ঋণ-গ্রহণের পথ বন্ধ হইয়া যায়। তখন আবশ্যকমত অর্থ-সংগ্রহে এবং তৎসরবরাহে অনেক বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধা উপলব্ধি হইতে লাগিল। অতঃপর কন্সল সুল্লা এবং রিউকাস পুনরায় সূদ-গ্রহণ-প্রথা প্রবর্তিত করিলেন। তাঁহাদের নির্দেশমত তৎকাল-প্রচলিত মুদ্রার হিসাবে শতকরা বার্ষিক দ্বাদশ মুদ্রা সূদের হার নির্দিষ্ট হইয়া গেল। তাহার অধিক কেহ কাহারও নিকট হইতে সূদ লইতে পারিবে না, সর্বত্র এই আদেশ প্রচারিত হইল। ৫০ পূর্ব-

খৃষ্টাব্দ হইতে সূদের ঐ হারই রোম-সাম্রাজ্যে প্রবর্তিত ছিল এবং রাজাদেশে উহা নির্দিষ্ট সূদের হার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। প্রাচীন মিশরের পুরাতত্ত্বে কুসীদ সম্বন্ধে যে বিধি বিহিত ছিল, রোমের ও গ্রীসের বিধান হইতে তাহা স্মৃত। খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ডিওডোরাস মিশর-ভ্রমণে গমন করেন। তাঁহার গ্রন্থে মিশরের সূদ-সংক্রান্ত বিধানের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। ডিওডোরাসের গ্রন্থে প্রকাশ—লেখ্য গ্রহণ করিয়া বাহারা ঋণ-দান করিতেন, তাঁহারা মূলধনের দ্বিগুণের অতিরিক্ত সূদ কোনও অবস্থায়ই গ্রহণ করিতে পারিতেন না। ঋণ অনাদায় হইলে অধমণের বিত্তাদি বিক্রয় করা হইত বটে; কিন্তু কায়িক পরিশ্রম দ্বারা ঋণ আদায়ের কোনও বিধি ছিল না। পরিশ্রম দ্বারা অধমণের স্বেপার্জিত বিত্ত অথবা তাঁহার নিজের প্রাপ্য সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় হইতে পারিত। কিন্তু নিজ সম্পত্তি ভিন্ন অত্র কোনও বিত্ত-সম্পত্তি সে ঋণদায়ে আবদ্ধ হইত না।

ইউরোপীয় অত্রাণ দেশের পুরাতত্ত্বের আলোচনায় কুসীদ-সংক্রান্ত বিধান সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ইংলণ্ডের প্রাচীন ইতিহাসে সূদের কঠোরতার বিষয় উল্লিখিত আছে; আর সেই কঠোরতা নিবারণ-কল্পে যে নানারূপ বিধি-বিধান বিভিন্ন দেশে প্রবর্তনার আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা উপলব্ধি হয়। অতি প্রাচীন কাল সূদের বিধান। হইতে অষ্টম হেনরীর রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত কুসীদ গ্রহণ ইংলণ্ডে বিশেষ দণ্ডার্থ এবং ঈশ্বরাদেশ-বিরুদ্ধ বলিয়া বিধোঘাত হইয়াছিল। কিন্তু যিহুদী ও বৈদেশিকগণের সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা প্রযোজ্য ছিল না। তাঁহারা যথেষ্ট সূদ গ্রহণ করিতেন, আর সেই জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া রাজকোষে বহু অর্থ প্রদান করিতে বাধ্য হইতেন। এইরূপ দণ্ডের বিধানে তাঁহাদের প্রতি রাজকর্মচারিগণের পীড়ন এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে কুসীদ-সংক্রান্ত বিধি বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। তখন হইতে ব্যবস্থা হইল—শতকরা বার্ষিক ১০ পাউণ্ড সূদ-গ্রহণ ন্যায়াভুমোদিত; উহার অতিরিক্ত সূদ-গ্রহণ রাজদ্বারে দণ্ডীয়। অতঃপর ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে, ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে, এই বিধি পরিবর্তিত হইল। তাঁহার আদেশে কুসীদগ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু এ ব্যবস্থায় পুনরায় ন্যায়বিগর্হিত অহুষ্ঠানের অবতারণা হইতে লাগিল। ফলে, কুসীদজীবগণ শতকরা ১৪ পাউণ্ড হিসাবে সূদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং পুনরায় এই বিধি পরিবর্তনের আবশ্যকতা অহুত্ব হইল। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে, রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে, এতৎসংক্রান্ত বিধি বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। * অষ্টম হেনরির প্রবর্তিত বিধানঅনুসারে ব্যবস্থাপকগণ বার্ষিক সূদের পরিমাণ শতকরা ১০ পাউণ্ড নির্দেশ করিয়া দিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে প্রসিদ্ধ সংস্কারক কলভিনের প্রাহুর্ভাব হইয়াছিল। তিনি ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের আদেশের অগারত্ব সপ্রমাণ করেন এবং তাঁহারই চেষ্টার ফলে সূদ-সংক্রান্ত

* 13 Elizabeth, cap. 8. এই আইনের মূখ্যপাঠে লিখিত আছে,—“That the prohibiting act of King Edward VI had not done so much good as was hoped for; but that rather the vice of usury hath much more exceedingly abounded, to the utter undoing of many gentlemen, merchants, occupiers and others and to the importable hurt of the Commonwealth.”

আইনের পরিবর্তন সাধিত হয়। বাহা হউক, রাণী এলিজাবেথের বিধি প্রবর্তিত হইলে অসিদ্ধ নীতিবিৎ ডক্টর জন উইলসন সে বিধির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। পার্লামেন্ট মহাসভায় বক্তৃতা-কালে তিনি বুঝাইলেন,—‘সুদগ্রহণই যে কেবল দোষাবহ এবং ঈশ্বরের নীতিবিরুদ্ধ তাহা নহে। অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, লাভের হিসাবে সুদগ্রহণ ও ঋণদান সর্বপ্রকারে ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয়। চৌধা নরহত্যা অপেক্ষা ইহা কোনও অংশে হীন নহে।’ উইলসনের উত্তেজনার ফলে তাৎকালিক ধর্মপ্রাণ পুরোহিতগণ (বিশপগণ) সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সকলে একবাক্যে ঘোষণা করিলেন,—‘সুদগ্রহণ ভগবানের আইনে নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয়।’ তখন দেশময় বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার ফলে, পরিশেষে বিশপ দিগের সন্তোষের জন্য, ব্যবস্থাপকগণ ঋণদান ও ঋণ-গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া একটা ধারা ঐ আইনে সন্নিবিষ্ট করিলেন। মাত্র পাঁচ বৎসরের জ্ঞাত কুসীদ বিষয়ক ঐ আইন প্রবর্তিত হইবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঐ ধারা পরিবর্তিত হইয়া উহা স্থায়ী আইন-রূপে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর প্রথম জেম্সের রাজত্বকালে সুদের হার আরও কমিয়া যায়। তিনি শতকরা ৮ পাউণ্ড সুদের হার-পরিমাণ নির্দেশ করিয়া দেন। কমনওয়েল্‌থের প্রভুত্বকালে, ক্রমওয়েলের প্রাজ্ঞতাবে, সুদের হার ছয় পাউণ্ড হইয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লস ঐ হারই প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। পরিশেষে রাণী ম্যানের রাজত্বকালে ঐ সুদের হার আরও কমিয়া যায় এবং শতকরা পাঁচ পাউণ্ড হিসাবে নির্দিষ্ট হয়। রাণী ম্যান আরও নিয়ম কবিতা দেন,—নির্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করিলে ঋণদাতাকে তাঁহার সমস্ত ঋণের তিন গুণ অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইবে।* ‘রিফরমেশন’ বা সংস্কারের পূর্বে স্কটলণ্ডে সুদ-গ্রহণের প্রথা ছিল না। ‘রিফরমেশন’ বা সংস্কার প্রবর্তনার পর স্কটলণ্ডের ধর্মবিষয়ক বাধ্য-বাধকতা কিছু শিথিল হইয়া পড়ে। তাহার ফলে, ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে, পার্লামেন্ট মহাসভায় এক আইন

* 12 Annie, Cap. 16—যুগবন্ধে আছে,—“Whereas the reducing interest to ten, and from thence to eight and thence to six, in the hundred, hath from time to time, by experience, been found very beneficial to the advancement of trade and the improvement of lands, it is become absolutely necessary to reduce the high rate of interest of six per cent. to a nearer proportion to the interest allowed for money in foreign states.” কিন্তু নির্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত সুদ গ্রহণের উল্লেখ থাকিলে সর্বপ্রকার লেখা বা চুক্তি প্রভৃতি অসিদ্ধ হইবে, এই আইনে তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দণ্ডের বিধানও বিহিত হইয়াছিল; যথা,—“That all persons who should after that time receive, by means of any corrupt bargain, loan, exchange, chevizance, or interest, of any wares, merchandise, or other thing whatever, or by any deceitful way or means, or by covin, engine, or deceitful conveyance for the forbearing or giving day of payment, for one whole year, for their money or other thing, above the sum of L.5 for L.100 for a year, should forfeit, for every such offence, the triple value of the monies or other things so lent, bargained &c.”

বিধিবদ্ধ হয়। তদনুসারে সূদের পরিমাণ শতকরা দশ পাউণ্ড নির্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রায় এক শত বৎসর ঐ হারে সূদ-গ্রহণের ব্যবস্থা চলিতে থাকে। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সূদের হার কিছু কমাইয়া দেওয়া হয়। তখন উগা আট পাউণ্ড হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে সূদের হার শতকরা ছয় পাউণ্ড হয়। পরিশেষে রাণী রানার রাজত্বকালে স্থায়ী সূদের হার পাঁচ পাউণ্ড নির্দিষ্ট হইয়া যায়। আরলওয়ের পুরানুস্তেও ঐ একই অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানেও ১৬৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পর্য্যন্ত কোনও সূদ লওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। ঐ খৃষ্টাব্দে দশ পাউণ্ড সূদ গ্রহণের বিধি প্রবর্তিত হইয়াছিল। অতঃপর সূদের হার ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে শতকরা আট পাউণ্ড, ১৭২২ খৃষ্টাব্দে সাত পাউণ্ড, ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ছয় পাউণ্ড সূদের হার নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ইংলণ্ডে এই সূদ সম্বন্ধে একটি বিশেষ মিশ্রম পরিদৃষ্ট হয়। সেখানে সূদ দেওয়া সম্বন্ধে কোনও বাধ্য-বাধকতা নাই। ইংলণ্ডের 'কমন ল' অনুসারে, সূদ দেওয়ার বিষয়ে অধমর্ণের স্বীকারোক্তি না থাকিলে, বিবাদস্থলে বিচারক ইচ্ছা করিলে অধমর্ণকে সূদ-প্রদানে বাধ্য না করিতেও পারেন। ঋণদাতা যদি বিচারপ্রার্থী হন, আর বিবাদী যদি বিচারকের নিকট সময় প্রার্থনা করে, তাহা হইলে ঋণদাতা সে সময়ের জন্যও সূদ পাইবার অধিকারী নহেন। তবে এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। সওদাগর বা ব্যবসায়ীদিগের ব্যবহার-বিচারে সূদের কথা স্পষ্ট উল্লিখিত না থাকিলেও, বিচারক জুরিগণ, প্রতাপক্ষকে সূদ দিতে বাধ্য করিতেন। এক্ষণ স্থলে সূদ দেওয়া বা না-দেওয়া জুরিদিগের বিবেচনাদীন ছিল। ঋণগ্রহণকালীন লেখা, প্রতিভূ প্রভৃতি সম্বন্ধে অস্বরূপ বিধি প্রযোজ্য। কুশীদের হার-পরিমাণ বিষয়ে ফরাসী রাজ্যে এবং লিভোনিয়া প্রভৃতি স্থানে একই অবস্থার বিষয় উল্লিখিত আছে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-রাজ্যে সূদের পরিমাণ শতকরা বার্ষিক পাঁচ ফ্রাঙ্ক নির্দিষ্ট ছিল। বিপ্লবের পূর্বে পর্য্যন্ত ঐ হিসাবেই ফরাসী-রাজ্যে সূদ গ্রহণ করা হইত। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-রাষ্ট্রনীতিবিৎ লাভার্ভি সূদের ঐ হার কমাইয়া চারি ফ্রাঙ্ক করেন। তাহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। বাজার দর না কমিয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং সময় ও অবস্থা বিশেষে শতকরা ছয় ফ্রাঙ্ক সূদ সাধারণে গৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। স্তত্রাং লাভার্ভি-বিহিত সূদ-সংক্রান্ত বিধি অচিরে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর সূদের পূর্বনির্দিষ্ট হার গ্রহণের বিধি বিধিবদ্ধ হয়। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লিভনিয়ায়ও সেইরূপ অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল। রাণী ক্যাথারিন ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সূদের হার কমাইয়া শতকরা ছয় মুদ্রা স্থলে পাঁচ মুদ্রা নির্দেশ করিয়াছিলেন। ফলে, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইয়াছিল। পূর্বে যাহারা শতকরা ছয় মুদ্রা সূদ দিয়া অব্যাহতি পাইত, ঐতিহাসিক ঠর্ক বলেন, রাণীর এই বিধানের ফলে, তাহারা প্রায়ই শতকরা সাত, আট মুদ্রা বা ততোধিক সূদ দিতে বাধ্য হইয়াছিল। * মধ্যযুগে সূদের হার বর্তমান কাল অপেক্ষা অধিক ছিল না। কিন্তু কুশীদজীবিগণের উপর এত অত্যাচার অবিচার হইত যে, বাধ্য হইয়া তাহারা অধিক হারে সূদ গ্রহণ করিত।† বাণিজ্যসংক্রান্ত ইতিবৃত্তে

* Vide, Storch, *Traite d'Economic Politique*.

† "But the clamour and persecution raised against those who took interest for

ম্যাক্ফারসন এইরূপ অত্যাচারের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । রাজপুরুষের অত্যাচারের ফলে শতকরা পঞ্চাশ এবং স্থলবিশেষে শত মুদ্রা পর্য্যন্ত সুদের কমে কুসীদজীবীগণ কাহাকেও ঋণদান করিত না । মধ্যযুগের ইতিহাসে ঐতিহাসিক হালাম তৎকাল-প্রচলিত কুসীদ-প্রথার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছেন । * তাঁহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায়,—১২২৮ খৃষ্টাব্দে শতকরা সাড়ে বার মুদ্রা হিসাবে ভেরোনায় সুদের পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল । খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে জেনোয়া রাজ্যে শতকরা সাত হইতে দশ মুদ্রা পর্য্যন্ত সুদ দিবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় । ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে সবন্ধক ঋণ সম্পর্কে বাসিলোনিয় শতকরা দশ মুদ্রা সুদের পরিমাণ বিহিত হইয়াছিল । এই সময় ইটালিতে ও ক্যাটালোনিয়ান সুদ-গ্রহণের বিধান ছিল । কিন্তু অন্যান্য দেশের সুদপরিমাণের তুলনায় ইংলণ্ডে ও ফরাসী-রাজ্যে অধিক পরিমাণে সুদ লওয়া হইত । ম্যাথু পারিস বলেন, সপ্তম ছেন্‌রির রাজত্বকালে প্রতি দুই মাস অন্তর অধমর্গকে শতকরা দশ মুদ্রা সুদ দিতে হইত । যাহা হউক, সুদ-সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিধানের আলোচনার প্রতিপন্ন হয়, অবिवেচক অর্থগুণ কুসীদজীবীর কবল হইতে জনসাধারণের পরিত্রাণের চেষ্টা অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে । বিবিধ রাজবিধির প্রবর্তনার সে বিষয়ে সাফল্য-লাভও ঘটয়াছে । দেশ ক্রমে যতই সভ্য-সমুন্নত হইয়া আসিয়াছে, এতদ্বিষয়ে চেষ্টাও তত অধিক হইয়াছে । পরিশেষে মুশিকার প্রভাবে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুদের একটা নির্দিষ্ট হার বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে । প্রাচীন ভারতের বিধি এ বিষয়ে আদর্শ-স্থানীয় ।

the use of money was so violent, that they were obliged to charge it much higher than the natural price, which, if it had been let alone, would have found its level, in order to compensate for the opprobrium, and frequently the plunder, which they suffered ; and hence the usual rate of interest was what we should now call most exorbitant and scandalous usury.”—*Vide*, Macpherson's *History of Commerce*, Vol. I, p. 400.

3 It is impossible to form any very accurate estimate of the rate of profit in the middle ages ; yet several striking facts may be adduced in support of the opinion advanced in the text. At Verona, in 1228, the interest of money was fixed by law at twelve and a half per cent. Towards the end of the fourteenth century, the republic of Genoa paid only from seven to ten per cent. to her creditors ; and the average discount on good bills at Barcelona, in 1435, is stated to have been about ten per cent. But whilst the rate of interest in Italy and Catalonia, where a considerable degree of freedom was allowed to the parties concerned in bargaining for a loan, was thus comparatively moderate, it was, in despite of its total prohibition, incomparably higher in France and England. Mathew Paris mentions that in the reign of Henry III. the debtor paid ten per cent. every two months ; and this, though absolutely impossible as a general practice, may not have been very far from the average interest charged on the few loans that were thus contracted for.”—*Vide* Hallam's *History of the Middle Ages*, Vol. III., p. 402.

অন্যান্য দেশের বহু পূর্বে যে ভারতবর্ষ সভ্যতার শীর্ষ-সোণানে আরোহণ করিয়াছিল, তত্তদদেশের কুসীদ-বিধানের সহিত ভারতীয় কুসীদ-ব্যবস্থার তুলনায় তাহা বেশ উপলব্ধি হয়।

ঋণ-সংক্রান্ত দায়-সম্বন্ধে কোর্টিলোর বিধান স্মৃতির অনুসারী। স্মৃতি-গ্রন্থের আলোচনায় প্রতীপন্ন হয়, পিতৃঋণ পরিশোধ করা পুত্রের অবশ্য কর্তব্য। তাহা না হইলে পুত্র ধর্ম্মে পতিত হন। পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত না হইলেও পিতৃঋণ পরিশোধ করা পুত্রের ধর্ম্ম। কিন্তু উত্তরাধিকারীর পক্ষে বিধান অগ্ররূপ। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইলে, এক পুত্র ভিন্ন, অন্য কেহ ঋণ

ঋণদায়
দায়োন্মতঃ।

পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। পুত্রের কর্তব্য পিতার মৃত্যুর পরই প্রকট হয়। এ হিসাবে, পুত্রের স্বত্ব বর্ত্তমান থাকিলেও, পিতার জীবিতকালে বা তাঁহার মৃত্যুর পর, উত্তমর্ণ পৈত্রিক সম্পত্তি দ্বারা ঋণ আদায় করিবার অধিকারী। কিন্তু হিন্দুর ব্যবহার-বিধানে উত্তরাধিকারী যাজ্ঞেই পূর্ব্বকৃত ঋণদায়ে দায়ী। যাজ্ঞবল্ক্য (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৫১ম শ্লোক) বলিয়াছেন,—

“পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যাসনাভিল্পুতেহৎবা। পুত্রোপৌত্রৈর্ঋণং দেয়ং নিহবে সাক্ষিতাবিতম্॥

ঋকৃৎগ্রাহ ঋণং দাপ্যো যোষিদ্গ্রাহন্তুঐব চ। পুত্রোহনশ্রাশ্রিতদ্রব্যম্ পুত্রহীনস্য ঋকৃথিনঃ ॥”

‘পিতৃপিতামহ কৃত ঋণ পুত্র-পৌত্রাদি পরিশোধ করিতে বাধ্য। তাহার পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হইলেও তাহারাই ঐ ঋণ প্রদান করিবে।’ পিতার মৃত্যু হইলে, দূরদেশে গমন করিলে, বিশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার সন্ধান না পাওয়া গেলে, অথবা দৃষ্টিচকিৎস রোগাদি বাসনে অভিভূত হইলে, ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব পুত্র-পৌত্রাদির উপর হস্ত হইবে। যাহারা উত্তরাধিকার হস্তে ঋকৃৎ বা সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহারাই ঋণ পরিশোধ করিবে। তবে পিতার অন্ত্যায়কৃত ঋণ কেহই পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবে না। মিতাক্ষরারও ইহাই অভিমত। ঋণাদান বিষয়ে হিন্দুর ব্যবহার-শাস্ত্রে ধর্ম্মপ্রাণতার অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুর বিশ্বাস, ঋণ পরিশোধ না হইলে ঋণকারীর আত্মার সঙ্গতি হয় না। মহর্ষি মনু (মনুসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ১৬৬ম—১৬৭ম শ্লোক) বলিয়াছেন,—

“এহীতা যদি নষ্টঃ শ্রাৎ কুটুম্বার্থে কৃতো ব্যয়ঃ। দাতব্যং বান্ধবৈবন্তং শ্রাৎপ্রবিভক্তৈরপি স্মৃতঃ ॥

কুটুম্বার্থে হি ধাণীনোহপি ব্যবহারং যমাচরেৎ। স্বদেশে বা বিদেশে বা তং জ্যায়ান বিচালয়েৎ ॥”

এ হিসাবে পুত্রগণ তো পিতৃঋণ পরিশোধ করিবেনই; তাহা ছাড়া অবিভক্ত বা বিভক্ত পরিবারের সকলেই ঐ ঋণ দিতে বাধ্য—যদি সে ঋণ সর্বসাধারণের উপকারার্থে গৃহীত হইয়া থাকে। এতদ্বিন্ন কুটুম্ব-ভরণ-পোষণের জন্ত যদি দাসও ঋণ করে, তাহাও ধনস্বামী পরিশোধ করিবেন। তিনি স্বদেশেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন, এরূপ ঋণ তিনি পরিশোধ করিতে বাধ্য। পিতার প্রাতিভাবা ঋণ বিষয়ে ঐ একই নিয়ম মনু বিধান করিয়াছেন। প্রতীভূ-প্রসঙ্গে তদ্বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ঋণ-সংক্রান্ত দায় বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা,—

“অবিভক্তঃ কুটুম্বার্থে যদৃণঞ্চ কৃতং ভবেৎ। দহ্যন্তদৃকৃথিনঃ প্রেতে প্রোষিতে বা কুটুম্বিনি ॥

ন যোষিৎ পতিপুত্রাভ্যাং ন পুত্রেন কৃতং পিতা। দত্তাদৃতে কুটুম্বার্থাৎ পতিঃ স্ত্রীকৃতং তথা ॥

গোপশৌণ্ডিকশৈলুষরজকব্যাধযোষিতম্। ঋণং দত্তাৎ পতিন্তেবাং যস্মাদবৃত্তিস্তদাপ্রয়া ॥

প্রতিপন্নং জিয়া দেয়ং পত্যা বা সহ বৎ কৃতম্। স্বয়ং কৃতং বা যদৃণং নাত্মং স্ত্রী দাতুমর্হতি ॥”

অর্থাৎ,—পরিবার-ভরণার্থে অবিকৃত অবস্থায় যে ঋণ-গ্রহণ করা যায়, তাহা অভিভাবক কর্তা পরিশোধ করিবেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে বা তিনি দীর্ঘপ্রবাসী হইলে, ঐ পরিবারের অন্তর্গত সকল অংশীদার উহা পরিশোধ করিবেন। পতিকৃত ঋণ জীকে, পুত্রকৃত ঋণ মাতা-পিতাকে এবং জীকৃত ঋণ পতিকে পরিশোধ করিতে হইবে না। * তবে যদি ঐ ঋণ পরিবার-প্রতিপালনার্থে হইয়া থাকে, তাহা দিতে হইবে। গোপ, শৌভিক, শৈলূষ, রজক ও ব্যাধ—এই সকল জাতির জী যে ঋণ করিবে, উহাদিগের পতি তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য। কেন-না, তাহাদের উপরও অনেকাংশে জীবিকার্জন নির্ভর করে। ঐ সকল জাতীয় জীলোকেরাও উপায়ক্ষম। অঙ্গীকৃত ঋণ, স্বামীর সহিত কৃত ঋণ এবং নিজকৃত ঋণ—জীলোক পরিশোধ করিতে বাধ্য। তাহাকে অশ্রু ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। কিন্তু কোটিল্যের মতে ব্যাধ, শৈলূষ প্রভৃতি জাতীয় জী ব্যতীত অপর কোনও জাতীয় জীই স্বামীর ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নহে। এতদ্ব্যতীত ঋক্থগ্রাহী, তদভাবে ভাষ্যগ্রাহী, তদভাবে অনত্মপ্রিতদ্রব্য পুত্র ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। উত্তমর্ণের নিকট ঋণ পরিশোধ করার নিয়ম। তাঁহার লোকান্তরে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির বা উত্তরাধিকারীর নিকট সে ঋণ পরিশোধ করিবে। ঋণ-সংক্রান্ত দায়-বিষয়ে সংক্ষেপে যাজ্ঞবল্ক্যের হইাই ব্যবস্থা। বিষ্ণুর ব্যবস্থাও প্রায় এতদনুরূপ। তবে ঋণ-পরিশোধ-ব্যাপার, দ্বাদশ বর্ষের পর উত্তরাধিকারীদিগের বা স্থলাভিষিক্তগণের ইচ্ছাধীন বলিয়া তিনি বিহিত করিয়াছেন। ঋণাদায় সম্বন্ধে তাঁহার ব্যবস্থা (বিষ্ণু-সংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, ১৭ম শ্লোক—৩৯ম শ্লোক); যথা,—

“ঋণগ্রাহিণি প্রেতে প্রব্রজিতে দ্বিদশসমাঃ প্রবসিতে বা তৎপুত্রপৌত্রৈর্ধনং দেয়ম্। নাতঃ পরমনীশ্রুতিঃ ॥ সপুত্রশ্চ বা পুত্রশ্চ বা ঋক্থগ্রাহী ঋণং দত্তাৎ। নির্দীনশ্চ জীগ্রাহী। ন জী পতিপুত্রকৃতম্। ন জীকৃতং পতিপুত্রৌ। ন পিতা পুত্রকৃতম্। অবিভক্কে: কৃতমৃগং যন্তিষ্ঠেৎ স দত্তাৎ। পৈতৃকমৃগমবিভক্তানাং ভ্রাতৃণাঞ্চ বিভক্তাশ্চ দায়ানুরূপমংশম্। গোপশৌভিকশৈলূষরজকব্যাধ জীণাং পতির্দত্তাৎ। বাক্প্রতিপন্নং কুটুম্বিনা দেয়ম্। কশ্চিৎ কুটুম্বার্থে কৃতঞ্চ ॥”

গৌতমের বিধি তেমন বিস্তৃত নহে। তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন,—“ঋক্থভাজি ঋণং প্রতিকুযা” ; অর্থাৎ,—উত্তরাধিকারীরা ঋণ পরিশোধ করিবে।

সংহিতাদি গ্রন্থে ঋণ-সংক্রান্ত দায়-বিষয়ে যে ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় কোটিল্যের বিধান-সমূহ আলোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয়—কোটিল্যের বিধান স্মৃতিশাস্ত্রের অনুরূপ। তাহা হইতে আরও বুঝা যায়, কোটিল্যের সকল ব্যবস্থাই সনাতন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোটিল্য বলিয়াছেন,—দশ বৎসরের মধ্যে আদায় না লইলে বা দখল না করিলে ধন বা বিত্ত সম্বন্ধে আর দাবী চলিবে না। সে হিসাবে কোটিল্যের মতে ঋণ-সম্বন্ধে দশ বৎসরই তামাদির শেষ

তামাদি ও
ভোগ-প্রসঙ্গ।

* কোটিল্য কিন্তু স্পষ্টই বলিয়াছেন,—জীকৃত ঋণ পতি পরিশোধ করিতে বাধ্য। স্বামী যদি ঋণ পরিশোধের উপায় নির্দেশ না করিয়া গলায়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অর্থদণ্ড হইবার ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ঋণাদান প্রসঙ্গে এতদ্বিষয় অষ্টম।

সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে । এতদ্ব্যতীত ‘স্বামিস্বত্ব’-প্রকরণে স্থাবরাদির তামাদি-কাল উল্লেখ-প্রসঙ্গে, কোটিল্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন ; যথা,—

“ভোগানুভবশ্চিহ্নদেশানাং যথাস্ব দ্রব্যাগাম্ । যৎ স্বং দ্রব্যমনৈভূজ্যমানং
দশ বর্ষাণ্যুপেক্ষত, হীয়েতাস্মি অজ্ঞাত্র বালবৃদ্ধব্যাদিতবাসনিপ্রোষিতদেশত্যাগ-
রাজবিলম্বেভ্যঃ । বিংশতিবর্ষোপেক্ষিতমহুবসিতং বাস্ত্ব নাহুযুক্তীত । জ্ঞাতয়-
শ্রোত্রিয়াঃ পামণ্ডা বা রাজ্ঞামসন্নিধৌ পরবাস্ত্ববু বিবসন্তো ন ভোগেন হরৈয়ু ।
উপনিধিমাদিং নিধিং নিক্ষেপং স্থিয়ং সীমানং রাজশ্রোত্রিয়দ্রব্যানি চ ।”

বাস্ত্ব ব্যতীত অজ্ঞাত্র দ্রব্য স্বামীর সম্বন্ধে দশ বৎসর উপভুক্ত হইলে, স্বামী যদি তাহাতে বাধা প্রদান না করেন, তাহা হইলে ভোগকর্তার তাহাতে স্বত্ব জন্মে । কিন্তু অপ্রাপ্ত-ব্যবহার, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, ব্যসনাভিভূত, দেশত্যাগী, প্রব্রজিত ও শ্রোত্রিয় ব্যক্তির প্রাপ্য এবং রাজপ্রাপ্য ধন দশ বৎসর উপেক্ষিত হইলেও তামাদি হইবে না । কিন্তু স্থাবর সম্পত্তির মেয়াদ বিংশ বর্ষ । বিশ বৎসর স্থাবর সম্পত্তি অজ্ঞাত্র কর্তৃক উপভুক্ত হইলে, ভূস্বামীর তাহাতে আর কোনও স্বত্ব থাকিবে না । কিন্তু স্বজাতি, কুলপুরোহিত এবং শ্রোত্রিয় কর্তৃক উহার অধিক কাল কোনও বাস্ত্ব উপভুক্ত হইলে তাহাতে বাস্ত্বস্বামীর স্বত্ব লোপ হইবে না । সংহিতা-শাস্ত্রে অবস্থা-ভেদে ব্যবস্থা-ভেদ পরিলক্ষিত হয় । সংহিতা-মতে, ভোগ, সাক্ষী ও দলিল প্রমাণ মধ্যে গণ্য । সে মতে নির্দিষ্ট ভোগকালের পর আর ধনস্বামীর তাহাতে স্বত্ব থাকে না । অজ্ঞাতস্বামিক ধনসম্পর্কে মমুর মতে তামাদির কাল তিন বৎসর নির্দিষ্ট হইয়াছে । ঐ সময়ের মধ্যে যদি ধনস্বামী প্রমাণাদি দ্বারা তাহাতে তাঁহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে সে ধন তাঁহাকে দেওয়া হইবে । ঐ সময় অতীত হইলে আর তাঁহার দাবী গ্রাহ্য হইবে না । অজ্ঞাতস্বামিক ধন সম্বন্ধে এই বিধি । ধনস্বামীর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যদি কেহ তাঁহার কোনও সম্পত্তি দশ বৎসরের অধিক কাল ভোগ করে, এবং তিনি সে ভোগ নিবৃত্ত না করেন ; তাহা হইলে দশ বৎসরের পর উক্ত দ্রব্যে তাঁহার স্বামিত্ব লোপপ্রাপ্ত হয় । কিন্তু পোগণ্ড, জড় প্রভৃতির বিত্ত-সম্পত্তি এইরূপে উপভুক্ত হইলেও তাহাতে তাহাদের স্বত্ব নষ্ট হইবে না । এতদ্ব্যতীত বন্ধকীয় দ্রব্য, ভূম্যাদির সীমা, উপনিধি, নিক্ষেপ, দাসদাসী প্রভৃতি, রাজধন ও বিদ্বান ব্রাহ্মণের ধন, বহুকাল উপভুক্ত হইলেও, তাহাতে ধনস্বামীর স্বত্ব থাকিবে । প্রীতি-বশতঃ, যদি কাহাকেও কিছু ভোগ করিতে দেওয়া যায়, তাহার স্বত্ব বহুকাল পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না । তামাদির কাল, গৌতমের মতেও, দশ বৎসর নির্দিষ্ট । তিনি বলিয়াছেন,—“জড়াপোগণ্ড-ধনং দশবর্ষভুক্তং পটৈঃ সন্নিধৌ ভোক্তুরশ্রোত্রিয়প্রব্রজিতরাজজ্ঞধর্মপুরুষৈঃ পশুভূমিত্তীণামনতি-ভোগ ।” অর্থাৎ,—জড় ও পোগণ্ডের ধন ব্যতীত অশ্রের ধন যদি ধনস্বামীর সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করে, তাহা হইলে ঐ ধনে ভোক্তার অধিকার জন্মিবে । কিন্তু শ্রোত্রিয়, প্রব্রজিত, রাজন্য এবং ধর্মনিরত পুরুষের ধন যদি কেহ ঐরূপ সম্মুখে দশ বৎসর ভোগ করিতে থাকে, তাহাতে ভোক্তার অধিকার হইবে না । পশু, ভূমি এবং দাসী প্রভৃতির অত্যন্ত ভোগ না হইলে আর উহাতে ভোক্তার অধিকার সিদ্ধ হয় না । গৌতমের অভিমত হইতেও বুঝা গেল, দশ বৎসর পরে স্বামিত্ব লোপপ্রাপ্ত হয় । বসিষ্ঠও দশ বৎসর তামাদির কাল

নির্দেশ করিয়াছেন। যথা,—“তত্রভুক্তে দশবর্ষমেবোদাহরন্তি।” নিক্ষেপ ও উপনিধি প্রভৃতির যথেষ্ট-ভোগ স্বামিত্বহানিকর নহে—এ অভিমত তিনিও ব্যক্ত করিয়াছেন। বিষ্ণুর বিধানের ভোগাদি-সংক্রান্ত তামাদির বিধি দৃষ্ট হয় না। তিনি এইমাত্র বলিয়াছেন যে, তিন পুরুষ-স্বথাবিধি ভোগ হইলে চতুর্থ পুরুষ তাহা প্রাপ্ত হইবে। সে সম্বন্ধে লিখিত দলিলের কোনও আবশ্যক হইবে না। ক্রয়প্রতিগ্রহাদি ক্রমে সাগমভোগ সহকারে ভূম্যাদি স্বাহার দখলে থাকিবে, অন্যের তাহাতে স্বত্ব হইবে না। (বিষ্ণু-সংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়) যথা,—

“সাগমেন চ ভোগেন ভুক্তং সমাগ্বেদা ভবেৎ। আহর্তা লভতে তত্র নাপহার্য্যস্ত তৎ কচিৎ ॥”

“ত্রিভিরেব চ বা ভুক্তা পুরুষৈবভূঁয়থাবিধি। লেখ্যাতাবেহপি তাং তত্র চতুর্থং সমবাগ্নুয়াৎ ॥”

তামাদির বা স্বত্বহানির কাল সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। মনু প্রভৃতির মতে, দশ বৎসর পরে ধনস্বামীর স্বত্বনাশের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য অবস্থাভেদে বিংশ ও দ্বাদশ বৎসর তামাদির কাল নির্দেশ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা হইতে এতৎসংক্রান্ত কয়েকটি শ্লোক (দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৪ম—৩০ম শ্লোক) উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

“পশুতো জীবতো ভূমের্হানিবিংশতিবার্ষিকী। পরেণ ভূজামান্য্য ধনস্ত দশবার্ষিকী ॥

আধিসীমোপনিষেপজড়বালধনৈবিনা। তথোপনিধিরাজস্বীশ্রোত্রিয়াণাং ধনৈরপি ॥

আধ্যাদীনাং বিহস্তীরাং ধনিনে দাপয়েদ্ধনম্। দণ্ডক তৎসমং রাজে শক্তাপেক্ষমথাপি বা।

আগমোহুতাদিকো ভোগাদিনা পূর্ক্ক্রমাগতাৎ। আগমোহপি বলং নৈব ভুক্তিস্তোকাপি যত্র নো ॥

আগমস্ত কৃতো যেন সোহভিযুক্তস্তমুদ্বরেৎ। ন তৎস্বতত্তৎস্বতো বা ভুক্তিস্তত্র গরীয়সী ॥

যোহভিযুক্তঃ পরেতঃ শ্রাতশ্চ রিক্ণী তমুদ্বরেৎ। ন তত্র কারণং ভুক্তিরাগমেন বিনাকৃত্য ॥

আগমেন বিগুদ্বেন ভোগো যাতি প্রমাণতাম্। অবিগুদ্বাগমো ভোগঃ প্রামাণ্যং নৈব গচ্ছতি ॥”

অর্থাৎ,—নিঃসম্পত্তীয় ব্যক্তি বিংশতি বর্ষভোগ করিলে সে উপভুক্ত সম্পত্তিতে স্বামীর স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে। অস্বাবর সম্পত্তিতে দশ বৎসর ভোগ হইলেও পূর্বস্বত্বাধিকারী তাহাতে আর দাবী করিতে পারিবে না। দশ বৎসর পরে তাঁহার সে দাবী অগ্রাহ্য হইবে। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মেরও আবার বিশেষ বিধি ছিল। বন্ধকীয় দ্রব্য, সীমাহীন, উপনিষেপ (সংখ্যানামাদি সংযুক্ত নিক্ষেপ দ্রব্য), জড় ও নাবালকের সম্পত্তি, উপনিধি, রাজস্ব, দাস্তাদি, শ্রোত্রিয়ের ধন প্রভৃতি অপর কর্তৃক বিংশ বৎসর বা দশ বৎসর উপভুক্ত হইলেও তাহাতে অধিস্বামিগণ নিঃস্বত্ব হইবেন না। এই সকল বিষয় অধিস্বামীর বিনা অনুমতিতে কেহ ভোগ করিতেছে দেখিলে বিচারক তাহা প্রতিনিবৃত্ত করিবেন। আর উপভোক্তাকে অর্থদণ্ড করিয়া, ধনস্বামীকে তাঁহার সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবেন। ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি দ্বারা সম্পত্তি-লাভ—ভোগের অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ। অর্থাৎ—দশ বৎসর বা বিংশ বৎসর সম্পত্তি ভোগের পর সম্পত্তি বিক্রীত হইলে, ভোগকর্তার স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে; ক্রয়কারী তাহাতে স্বত্ববান হইবেন। কিন্তু যে সম্পত্তিতে পিতাপ্রপিতামহাদি ক্রমে তিন পুরুষ ভোগ হয়, সে স্থলে ক্রয়াদি স্বত্ব অপেক্ষা ভোগ-স্বত্বই প্রামাণ্য। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, তৃতীয় পুরুষের পর চতুর্থ পুরুষ স্থলে ভোগের প্রমাণ বলবৎ। কিন্তু প্রথম পুরুষে অর্থাৎ পিতামহাদির পক্ষে আগম বা ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি-জনিত স্বত্ব প্রমাণ মধ্যে গণ্য। যেখানে আদৌ ভোগপ্রমাণ

নাই, অথচ আগম প্রমাণ আছে; সেখানে তুলনার স-ভোগ আগম প্রমাণই সিদ্ধ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষে এই নিয়ম। বিষয়টী বিশদ করিবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—ক্রম-প্রতিগ্রহাদি-জনিত স্বত্তে স্বত্ববান ব্যক্তি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে যদি তিনি ক্রম-প্রতিগ্রহাদি সপ্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ত্ব সিদ্ধ হইবে। কিন্তু তাঁহার পুত্র কি পৌত্রের সত্বন্ধে এ নিয়ম খাটিবে না। সে ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে আগম তো প্রমাণ করিতে হইবেই; সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি যে তাঁহাদের ভোগে আছে, তাহাও তাঁহাদের সপ্রমাণ করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে পুত্র-পৌত্রাদির সাগম ভোগ প্রমাণ মধ্যে গণ্য। অত্ৰপক্ষে ক্রম-প্রতিগ্রহাদিকারী পরলোকগত হইলে, তাঁহার উত্তরাধিকারী সে আগমাদি সপ্রমাণ করিবেন। সাকীর দ্বারা আগম সপ্রমাণ না হইলে সে স্থলে কেবল ভোগের প্রমাণ বলবৎ হইবে না। কিন্তু আগম যদি বিদ্যুৎ হয়, তাহা হইলে প্রমাণিত ভোগ প্রামাণ্য মধ্যে পরিগণিত হইবে। অন্যথায় কেবলমাত্র ভোগ-প্রমাণে স্বত্ত্ব সাব্যস্ত হইবে না। অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে তামাদির কাল, মনু, গোতম, যাজ্ঞবল্ক্য, বসিষ্ঠ প্রভৃতি দশ বৎসর নির্দেশ করিয়াছেন। দশ বৎসরের পর ধনস্বামীর সে ধনে আর স্বত্ত্ব থাকিবে না,—সকলেরই এই অভিমত। ঋণ-সম্পর্কে কোটিল্যের বিধান এতদনুসারী। তিনিও বলিয়াছেন, বিশেষ বিশেষ স্থল বাতীত অত্র দশ বৎসরের পর সর্বপ্রকার ঋণই তামাদির মধ্যে গণ্য হইবে। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত তামাদির কাল নির্দিষ্ট হইয়াছে। কোটিল্যের মতও এতদনুসারী। এ সম্বন্ধে অত্র কোনও সংহিতাকার কোনও অভিমত প্রকাশ করেন নাই। ভোগাধিকার সকলের মতেই প্রমাণ। বিষ্ণুর ও যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানে সভোগ ক্রম-প্রতিগ্রহাদি—কেবলমাত্র ভোগ অপেক্ষা অধিকতর বলবৎ বলিয়া বিধোষিত হইয়াছে। দ্রুত বা প্রাপ্ত সম্পত্তি সম্পর্কে মহর্ষি মনুর তিন বৎসর তামাদির কাল নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সে স্থলে এক বৎসরের অধিক কালের বিধান বিহিত করেন নাই। * স্থলবিশেষে সংহিতাকারগণের পরস্পর বিরুদ্ধ মতপরস্পরার আলোচনার

* আধুনিক বিধান অনুসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তামাদির কাল বিভিন্নরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় তামাদি স-ক্রান্ত আইনে সে পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গচ্ছিত-দ্রব্য কেহ বন্ধক দিলে সেই গচ্ছিত দ্রব্যের জন্য গচ্ছিতরক্ষাকারীর বিরুদ্ধে বার বৎসর মধ্যে মকদ্দমা স্থাপন করা বাইতে পারে। বার বৎসর পর আর জ্ঞানকারীর উহাতে স্বত্ত্ব থাকিবে না। সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণদাতা যে ঋণ প্রদান করেন, সেই বন্ধকীর সম্পত্তির জন্য ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ব্যবহার-স্থাপন বিধি। এইরূপ বৎসর গণনা হ্রদ বা আসল আংশিকরূপে দিবার শেষ দিন হইতে গণনা করিবার নিয়ম। বিশেষ বিশেষ স্থলে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ৬০ বৎসরের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির দাবী চলিতে পারে। একালবর্তী পরিবারের কেহ সম্পত্তির উত্তরাধিকারি হইতে বঞ্চিত হইলে, তিনি বার বৎসরের মধ্যে সম্পত্তির দাবী করিয়া ব্যবহার স্থাপন করিতে পারেন। ‘মালিকানা’ এবং ‘হুক’ প্রভৃতিও বার বৎসরের মধ্যে নষ্ট হয় না। হিন্দু রমণীর ভরণপোষণের দাবী বার বৎসর পরে নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত সামলা মকদ্দমাদি বিভিন্ন বিষয়ে অবস্থান্তরে তিন বৎসর, এক বৎসর, ছয় মাস, ত্রিশ দিন তামাদি-কালের সংখ্যা-পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে। Vide, *Indian Limitation Act and Schedules*. এইরূপ, বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্নরূপ তামাদির কাল ভারতীয় তামাদি-স-ক্রান্ত আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তবে সকলেরই মূল ভিত্তি যে আধ্যাত্মিকতার শ্রাটন ব্যবহার-শাস্ত্র, তাহা কোনও সন্দেহ নাই।

অনেকের মনে ভ্রম ধারণা জন্মবার সম্ভাবনা। কিন্তু দেশকালপাত্রভেদে ব্যবস্থা-ভেদ চির-কালই চলিয়া আসিতেছে। বিশেষ বিশেষ স্থলে সংহিতাশাস্ত্রোক্ত বিরুদ্ধ-মত সম্বন্ধে অনেকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

নীতিবিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সমাজের আদর্শ অসংস্কৃত অবস্থায় ঋণের পীড়ন অতি ভয়াবহ—অতি অমানুষিক। ক্রমে জাতি যত উন্নত শিক্ষিত হয়, যতই তাহার নৈতিক চরিত্র

প্রভীচো

ঋণ-গ্রহণ।

বিগঠিত হইতে থাকে; বর্ধিততা তত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, পীড়নাদির মাত্রাও

ততই কমিয়া আসে। পাশ্চাত্যদেশের ঋণ-সম্পর্কীয় ইতিবৃত্তের আলোচনার

তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন কালে ঋণদান ও ঋণগ্রহণ

বিষয় ভয়াবহ ছিল। ব্যবস্থা-প্রণালীও এত অপরিপক্ব ছিল যে, ঋণদাতা বা ঋণগ্রহীতা

কেহই আপন লাভালাভ বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহাদের বিত্ত-সম্পত্তিও তখন নিরাপদ ছিল

না। ঋণদাতার প্রভুত্ব-ক্ষমতা এত অধিক ছিল যে, তাঁহারা অবস্থা-বিশেষে ঋণগ্রহণকারীর

প্রাণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন। কখনও কখনও ঋণদান ও ভিক্ষাদান একই

পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের মনে হইত। কিন্তু তাহা হইলেও স্তন বা মূলধন আদায়ে

দরিদ্রের প্রতি অতি অমানুষিক অত্যাচার করিতে কুসীদজীবীগণ কুঠা বোধ করিতেন না।

ক্রমে ক্রমে ঋণদাতার অসীম প্রভুত্ব-ক্ষমতায় বাধা দিবার সুযোগ উপস্থিত হইল বটে; কিন্তু

সে বিষয়ে কিরূপ জ্ঞান্য পন্থা অবলম্বন করা বিধেয়, তাহা স্থির হইল না। তখন

বিষয় কঠোরতার সহিত ঋণ আদায়ের অভিনয় চলিতে লাগিল। দরিদ্র অধমর্ণের বিত্ত-

সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া ঋণদাতা ঋণ আদায় করিলেন। বিত্তহীন অধমর্ণ দাসরূপে উত্তমর্ণের সেবা

করিতে লাগিল। দাস-হইলেই প্রভু তাহার জীবন-মরণের কর্তা হন। দেহ করতলগত হইলে,

প্রাণও তাঁহার আরভাধীন হয়। আধুনিক কাল অপেক্ষা প্রাচীন যুগে পাশ্চাত্য-দেশে

পারিবারিক সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। সুতরাং পরিবারের প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার

স্ত্রী-পুত্রাদিও নিশ্চয় উত্তমর্ণের দাসদাসীরূপে পরিগণিত হইত। ঋণদাতা এইরূপে ঋণগ্রহণ-

কারীর ও তাহার পরিবারবর্গের জীবন-মরণের অধিকারী হইতেন। ইহাতে এক দিকে

যেমন ঋণদাতার দয়াপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া বাইত, অন্যপক্ষে তাঁহার ঈর্ষুরতার বিষয়ও

স্মরণ করাইয়া দিত। কঠোরতা-বিমিশ্র দয়ার দৃষ্টান্ত মোজেস-প্রবর্তিত নীতি-সমূহেই

প্রথম পাওয়া যায়। সে বিধানে দেখিতে পাই—ইজরেল-জাতির কেহ নিরস্ত্র দরিদ্র হইলে,

কর্তব্যানুরোধে অপরাপর ব্যক্তি তাহাকে ঋণ প্রদান করিতেন। সে ঋণের অঙ্ক কেহ তাঁহার

নিকট স্মরণ লইতেন না। কিন্তু বৈদেশিকগণের সম্বন্ধে তাঁহাদের বিধান অন্যরূপ ছিল।

বৈদেশিকগণের নিকট হইতে স্তন-গ্রহণ মোজেসের বিধানে অশাস্ত্রীয় বা নীতি-বিগর্হিত ছিল

না। সাত বৎসরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু সে সাত বৎসরের মধ্যে

যদি কেহ ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিত, ত্রিভুজ সপ্তম বর্ষে সে ঋণদার হইতে মুক্ত হইত।

তাহাকে পূর্ন-ঋণদায়ে আর দায়ী হইতে হইত না। স্বজাতীয়গণের মধ্যেই ইজরেলিগণের এই

বিধি ছিল। একবার ঋণ দিতে পারে নাই বলিয়া যে পুনরায় তাহাকে কেহ ঋণ দিবে না,

তাহা নহে; যত বার তাহার আবশ্যক হইবে, তত বার তাহাকে ঋণ দিবার বিধি ছিল।

স্বজাতি সম্পর্কে পুনরায় ঋণ না দেওয়া ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া মোজেস ঘোষণা করিয়াছিলেন। * মোজেসের বিধানে জামিন বা বন্ধকের ব্যবস্থাও বিহিত দেখি। শস্যপেষণ-বস্ত্রে উপরিভাগস্থ প্রস্তর সকলে পবিত্র বলিয়া জানিত। প্রতিভূ-স্বরূপ তাহা গ্রহণ ধর্মবিরুদ্ধ ছিল। কারণ, তাহা অধমর্ণের জীবিকানির্ভর। পোষাক-পরিচ্ছদ বন্ধক রাখিলে, সূর্যাস্তের পূর্বে তাহা ফিরাইয়া দিবার নিয়ম ছিল। কারণ, ঐ একমাত্র বস্তুর অভাবে বিনা-আচ্ছাদনে ঋণকারীর কষ্ট হইতে পারে। পতিহীনা রমণীর বস্ত্রাদি বন্ধক রাখা মোজেসের নীতির অন্তর্ভুক্ত নহে। যাহা হউক, এইরূপ সার্বজনীন নীতির প্রবর্তনা করিয়াও ঋণ-জন্ত ঋণকারীর ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত-হওয়ার বিষয়ে মোজেস উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার মতে, বিত্তশালী ব্যক্তি অধমর্ণকে দাসরূপে গ্রহণ করিবেন বটে; কিন্তু তাহার কার্যের জন্ত তাহাকে পারিশ্রমিক দিতে হইবে। মোজেস আরও বলিয়াছিলেন, ‘জুবিলি’ বৎসরে ক্রীতদাস-দিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। বিচারকের নিকট ঋণের বিচার-বিষয়ক ক্রম-পদ্ধতির উল্লেখ মোজেসের নীতি-সমূহে দৃষ্ট হয় না। তবে তিনি আপিল-সংক্রান্ত বিস্তৃত বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কোটিল্যার বিধানে যেমন সংগ্রহণ, দ্রোণমুখ, স্থানীয় প্রভৃতি বিচারালয়ের উল্লেখ আছে; মোজেসের নীতিতেও তেমনি দশগ্রামিক, পঞ্চদশ গ্রামিক, শতগ্রামিক ও সহস্র গ্রামিক প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। পৌরোপাধ্যায় অনুসারে আপিলের ব্যবস্থা। সর্বশেষ আপিল মোজেসের নিকট হইত। জুবিলি বৎসরে † ইজরেল জাতির প্রত্যেকেই আপনার পৈতৃক সম্পত্তি ফিরাইয়া পাইবার অধিকারী।

* At the end of every seven years thou shalt make a release. And this is the manner of the release : every creditor shall release that which he hath lent unto his neighbour ; he shall not exact it of his neighbour and his brother, because the Lord's release has been proclaimed. Of a foreigner thou mayest exact it : but whatsoever is with thy brother thine hand shall release....If there be with thee a poor man, one of thy brethren, within any of thy gates in thy land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not harden thine heart, nor shut thine hand from thy poor brother ; but thou shalt surely open thine hand unto him, and surely lend him sufficient for his need in that which he wanteth. Beware that there be not a base thought in thine heart, saying, The seventh year, the year of release is at hand and thine eye be evil against thy poor brother, and thy give him nought ; and he cry unto the Lord against thee and it be sin unto thee. Thou shalt surely give him, and thine heart shall not be grieved when thou givest unto him, because that for this thing the Lord thy God shall bless thee in all thy work, and in all that thou pullest thine hand unto. For the poor shall never cease out of the land ; therefore, I command thee, saying 'Thou shalt surely open thine hand unto thy brother, to thy needy, and to thy poor, in thy land.'—Vide, Deuteronomy. XV. 1-11.

† প্রতি সপ্তম বর্ষ—বাইবেলে ‘জুবিলি’ বৎসর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পরমেশ্বর বলিতেছেন—ছয় বৎসরের কর্ণণ ভূম্যাদি প্রসিদ্ধি হয়। হুতরাং এক বৎসর বিশ্রাম দেওয়া উচিত। সপ্তম বর্ষে ভূম্যাদি কর্ণিত হইত না এবং কসলাদি উৎপন্ন করিবারও আদেশ ছিল না। কেতাদির ঐ বিশ্রামের বৎসর—বাইবেলের মতে—জুবিলি

স্বতরাং বৃক্ষাদির ফল প্রভৃতি এবং দ্বিচত্বারিংশবিধ শস্যাদির দাবী ভিন্ন উত্তমর্ণ কাহারও পৈতৃক সম্পত্তির দাবী করিতে পারিতেন না। কিন্তু লিভাইট ব্যতীত অপরাপর সকলেরই গৃহাদি বিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ হইতে পারিত।* কখনও কখনও সন্তান-সন্ততি বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করা হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সন্তানগণ ঋণ-পরিশোধার্থ ক্রীতদাস মধ্য গণ্য হইতেন।† মিশর হইতে বন্ধনমোচনের পর ইজরেল জাতির দরিদ্র ব্যক্তিগণ ঋণের পেষণে অর্জরীভূত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের অসহনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা-দর্শনে নেহিমিয়ার হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি সর্বসাধারণের ঋণমুক্তির জন্ত জিদ করিতে থাকেন। ধনিগণকে একত্র সমবেত করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ করেন যে, অতঃপর আর কখনও তাঁহারা ঋণের জন্ত দরিদ্রগণের উপর অত্যাচার করিবেন না।‡ ঋণ-পরিশোধার্থ ক্রী-পুত্র-

বৎসর। এতৎসম্বন্ধে বাইবেলের উক্তি,—“And the Lord spake unto Moses in mount Sinai, saying, speak unto the children of Israel and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a sabbath unto the Lord. Six years thou shalt sow thy field, and six years thou shalt prune thy vineyard and gather in the fruits thereof; but in the seventh year shall be a sabbath of solemn rest for the land, and sabbath unto the Lord: thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard.”—*Leviticus*. XXV., 1—4.

* বাইবেলের ‘সেভিটিকাস’ অংশের পঞ্চবিংশ অধ্যায় এতদ্বিব্যক উপদেশে নিয়োজিত। বিক্রীত সম্পত্তি এক বৎসরের মধ্যে ফিরাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা সে স্থলে উক্ত হইয়াছে। যথা,—“And if a man sell a dwelling house in a walled city. then he may redeem it within a whole year after it is sold; for a full year shall have the right of redemption. And if it not be redeemed within the space of a full year, then the house that is in the walled city shall be made sure in perpetuity to him that bought it, throughout his generations: it shall not go out in the Jubilee”—*Leviticus*, XXV. 29—30. লিভাইটদিগের সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে। যথা,—“Nevertheless the cities of the Levites, the houses of the cities of their possession, may the Levites redeem at any time. And if one of the Levites redeem, then the house that was sold and the city of his possession. shall go out in the Jubilee,” &c.—*Ibid*, 32—33.

† “There are that pluck the fatherless from the breast, And take a pledge of the poor.”—*Job*, XXIV. 9. “Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead: and thou knowest that thy servant did fear the Lord: and the creditor is come to take unto him my two children to be bondmen”—*II Kings*, IV. 1.

‡ বাইবেলের অন্তর্গত নেহিমিয়া অংশের পঞ্চম অধ্যায়ে এতদ্বিব্যক লিপিবদ্ধ আছে। হুসীদজীবী দ্রিহদীপ ঋণের জন্ত দেশবাসীর ঋণশুল্যাদি এমন কি পুত্রকন্যাদিগকে বলপূর্বক লইয়া বাইত। এই অংশে তাহার বিবরণ আছে। দেশবাসীর কষ্ট্র ক্রন্দন এবং ঋণদাতার বিষম অত্যাচার প্রভৃতি নিবারণ-কল্পে নেহিমিয়ার চেষ্টার অংশে পরিচয় এই অংশে দেওয়া যায়। Vide, *Nehemiah*, Chap. V.

পরিজন ও ধন-সম্পত্তি সহ ঋণকারী বিক্রীত হইতেছে, বাইবেলের মাথু অংশে যীশুখ্রীষ্টের উক্তিতে তাহা উপলব্ধি হয়। * এইরূপ বিক্রয়-প্রথা যে কেবল ইজরেল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহা নহে; পাশ্চাত্য-দেশের সকল জাতির মধ্যেই অতি প্রাচীন-কাল হইতে এ প্রথা বিস্তারিতরূপে পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীস ও রোম সাম্রাজ্যের পুরাত্ত্ব আলোচনার প্রতিপন্ন হয়, সে সময়ে তত্ত্বক্ষেপে অধমর্ণের দেহের উপর ঋণদাতার আধিপত্য অতি প্রবল ছিল। অপিচ, তিনি অধমর্ণের দণ্ডমণ্ডের কর্তা ছিলেন। ইজরেল জাতির ঋণদাতাগণ অতি প্রাচীন-কালে যেমন ঋণদানে অধমর্ণের প্রাণ পর্যন্ত গ্রহণ করিবার অধিকারী ছিলেন; প্রাচীন রোমে ও প্রাচীন গ্রীসে সেইরূপ অত্যাচার-অবিচার সে সময়ে প্রচলিত ছিল। সোলনের আবির্ভাবের পূর্বে পর্যন্ত ঋণদাতার অত্যাচার এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার ফলে রোমের তাত্‌কালিক ‘প্লিবিয়ান’ ও ‘প্যাট্রিসিয়ান’ সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ঋণ-সংক্রান্ত ব্যভিচার-বিশৃঙ্খলার প্রাবল্যে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে দেখিয়া মহামনা রাজনৈতিক সোলন তদ্বিষয়ে বন্ধনপত্রিকর হন। ‘টুয়েলভ টেবল’ আইনের প্রবর্তনায় সোলন এক বিধি বিধিবদ্ধ করেন। ঋণকারী ঋণের বিষয় স্বীকার করিলে অথবা বিচারালয়ে ঋণ-ব্যবহার নিষ্পন্ন হইলে, ঋণ-পরিশোধের জন্ত অধমর্ণকে ত্রিশ দিন সময় দেওয়ার বিধি ঐ আইনে বিধিবদ্ধ হইয়া যায়। ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণকারী ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইলে তাহাকে ঋণদাতার হস্তে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা হয়। ঋণদাতা ষাট দিন কাল অধমর্ণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতেন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাহাকে সময় সময় রাজপথে বাহির করিয়া ঋণের বিষয় বাত্বাদি সহকারে ঘোষণা করিতেন। ষাট দিনের মধ্যে কেহ তাহার পরিজ্ঞানের জন্ত অগ্রসর না হইলে, ঋণদাতা তাহাকে ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করিতেন, অথবা তাহার প্রাণবধ করিতেন। একই ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ঋণ করিলে, ঋণের পরিমাণ অনুসারে তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করা হইত; আর ঋণদাতাগণ আপন আপন ঋণের পরিমাণ অনুসারে খণ্ডিত অংশ-সমূহ গ্রহণ করিতেন। ঋণের জন্ত ঋণকারীকে দাসরূপে গ্রহণ করাই সাধারণ বিধি ছিল। পিতার সঙ্গে সঙ্গে সন্তান-সন্ততিগণও দাসরূপে গৃহীত হইয়া উত্তমর্ণের আদেশানুসারে কার্য সম্পাদন করিত। ৩২৬ পূর্ব-খ্রীষ্টাব্দে ‘লেক্স পিটোলিয়া’ বিধানের প্রবর্তনায় রোমে এই অমানুষিক প্রথার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। তদনুসারে সরাসরিভাবে অধমর্ণকে কারারুদ্ধ করিবার প্রথা লোপ প্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কাও বিদূরিত হয়। সে সময় রোমে রাজকীয় বলিশালা ছিল না। উত্তমর্ণগণই অধমর্ণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আপন গৃহে রাখিয়া দিতেন। ক্রমশঃ সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়মের পরিবর্তন সাধিত হয়। নীতিশাস্ত্রবিদগণের অশেষ আয়াসের ফলে ঋণদাতার ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসে,

বাইবেলের নিউ-টেস্টামেন্টের অন্তর্গত ‘মাথু’ অংশে যীশুখ্রীষ্টের উক্তিতে এতদ্বিষয় পরিব্যক্ত। ‘পিটারের ঋণের উত্তরে যীশু বলিতেছেন.—“But forasmuch as he had not *wherewith* to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife and children and all that he had, and payment to be made.”—St. Mathew, XVIII, 25.

ঋণকারীর পরিচালনা হয় এবং সুদের হার কমিয়া যায়। মহামান্য সোলন ও লেসিনিয়াস প্রভৃতির ব্যবস্থার ফলে রোমে এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। ‘কিউডেল’ প্রথা প্রবর্তনার পূর্বে ইংলণ্ডে ঋণদানে ঋণকারী দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত। কিন্তু ঐ প্রথা প্রচলিত হইলে এ নিয়ম রহিত হয়। তখন অধমর্ণকে ঋণদানে কারাদন্ড করা অথবা দাসরূপে গ্রহণ করা একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে বাগিজ্য-সংক্রান্ত বিধান নিষিদ্ধ হয়। তদনুসারে ঋণকারী লর্ড মেয়রের নিকট আসিয়া ঋণের বিষয় স্বীকার করিত এবং ঋণ-পরিশোধের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া যাইত। লর্ড মেয়রের আদেশ অনুসারে স্বীকার-পত্র লেখা হইত এবং তাহাতে ঋণকারীর স্বাক্ষর করিত। পরে রাজকীয় মোহরাদি দ্বারা উহা চিহ্নিত করিবার বিধি ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ না করিলে ঋণদাতা ঐ দলিলের বলে ঋণকারীকে ধৃত করিয়া ‘টাওয়ার’ কারাগারে আবদ্ধ করিবার আবেদন করিতেন। এইরূপে, দেউলিয়া-সংক্রান্ত বিধি বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের কারাগার-সমূহ ঋণ-সংক্রান্ত বন্দীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে আট মাসের মধ্যে ইংলণ্ডের বিচারালয় সমূহ হইতে ঋণ-সংক্রান্ত ১০১০০০ ডিক্রী প্রচারিত হয়।

পাশ্চাত্যদেশের ঋণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ জাতীয় বা রাজকীয় ঋণের বিষয় উত্থাপন করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে রাজকীয় ঋণের পরিমাণ কত ছিল, সে আলোচনা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে গ্রেট-ব্রিটেন যুক্ত-সাম্রাজ্যের জাতীয় ঋণ সর্বাপেক্ষা অধিক

রাজকীয়
ঋণ।

ছিল। তখন ঐ ঋণের পরিমাণ—৭৩১০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ফরাসী

রাজ্যের জাতীয় ঋণ, ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। বিপ্লবের সময় ফরাসী-রাজ্য একরূপ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছিল। ‘এসাইনাত’ প্রভৃতির আলোচনার তাহা উপলব্ধি হয়। ‘কন্সটিটেট’ সভার শাসন সময় হইতে পুনরায় ফরাসী-রাজ্যে ঋণ-গ্রহণ-প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইহার পর ‘বুরবন’ বংশের রাজত্বকালে, ওয়াটালু সময়ের পূর্বে, ফরাসী-রাজ্যের জাতীয়-ঋণের একটা হিসাব প্রকাশ করা হয়। তাহাতে বুঝা যায়, ঐ সময় জাতীয় ঋণের পরিমাণ—১২৩০ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছিল। ‘ফ্রান্সো-জর্জ’ যুদ্ধের পূর্বে ফরাসী-রাজ্যের জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ৪৬০০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ১৮৭০-১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐ ঋণ-পরিমাণ ৭৪৯০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছিল। এ হিসাবে, ইটালিরাজ্যের ঋণ-পরিমাণে জাতীয় ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ঐ ঋণের পরিমাণ ৩৬১০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছিল। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের জাতীয় ঋণ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখের হিসাবে ৩১৮০ লক্ষ পাউণ্ড দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত ঐ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বৈদেশিক রাজ্য হইতে ১২০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই সকল ঋণ ব্যতীত আরও ২৭০ লক্ষ পাউণ্ড অষ্ট্রিয়ার অপ্রকাশিত ঋণ ছিল। ইউরোপের মধ্যে স্পেন-রাজ্য গুরুঋণভারাক্রান্ত। দেশের ঋণ-পরিমাণের তুলনায় ঋণ-পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে স্পেনের জাতীয় ঋণের পরিমাণ—২৬১০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ঐ বৎসর ‘বকেট’ উপলক্ষে বক্তৃতার সময় রাজস্ব-সচিব বলিয়াছিলেন,—‘আর অল্পকাল পরেই

স্পেনরাজ্য দেউলিয়া হইয়া বাইবে।' তুরস্ক-সাম্রাজ্যের জাতীয় ঋণের পরিমাণ—১৯৭০ লক্ষ পাউণ্ড। তন্মধ্যে ১৫৭০ লক্ষ পাউণ্ড বৈদেশিক রাজ্যের নিকট হইতে ধার লওয়া হইয়াছিল। রুশিয়ার জাতীয় ঋণ—১৩৩০ লক্ষ পাউণ্ড এবং হলণ্ডের জাতীয় ঋণ—১০০০ পাউণ্ড। কিন্তু হলণ্ডের স্ববন্দোবস্তে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উহা পরিশোধ হইয়া ৭৮০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া সাম্রাজ্যের জাতীয় ঋণ—৪৫০ লক্ষ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হয়। উহার তিন বৎসর পূর্বে সৈন্য-বিভাগের ও নৌ-বিভাগের উন্নতিবিধানে জরুরী সন্মতি ৩৫০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে ঋণ পরিশোধ হইয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের জাতীয় ঋণের পরিমাণ—২,২৩২,২৮৯,৫৩১ ডলার ছিল। ইংলণ্ডে পার্লামেন্টের প্রাধান্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের টিউডর ও ষ্টুয়ার্ট বংশের রাজত্বকালে রাজার ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক ছিল। সে সময় রাজা যদি স্থায়ী সৈন্যদল সংগঠনে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষমতার অবধি ছিল না। কিন্তু রাজা যাহাতে স্থায়ী সৈন্যদল সংগঠনে সমর্থ না হন, তৎপ্রতি জনসাধারণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। রাজশক্তি হ্রাস করিবার জন্য পার্লামেন্টের কমন্স-সভা সর্বদাই বন্ধপনিকর ছিলেন। রাজা যাহাতে জাতীয় ঋণ সংগ্রহ করিতে না পারেন এবং তদ্বারা স্থায়ী সৈন্যদল পোষণে সমর্থ না হন, কমন্স সভার সভাগণ তদ্বিষয়ে স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতেন। 'রিভলিউশন' বা বিপ্লবের পর পার্লামেন্টের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইংলণ্ডে জাতীয় ঋণের স্বেচ্ছাপাত হয়। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে এতৎসংক্রান্ত প্রথম ঋণ গৃহীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রধান ব্যাঙ্ক—'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড' প্রতিষ্ঠার ঐ ঋণ নিয়োজিত হয়। তখন উহার মূলধন—১,২০০,০০০ পাউণ্ড ছিল। উহাই তৎকালিক জাতীয় ঋণের পরিমাণ। অতঃপর যুদ্ধবিগ্রহাদি কারণে ঐ জাতীয় ঋণ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে 'রিসউইগ' সন্ধির পর ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ-পরিমাণ ২০০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক হইয়াছিল। ঐ ঋণ-পরিমাণ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ৫০০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ৭৫০০০০০ পাউণ্ড, ১৭৬৩ এবং ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৪০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। অতঃপর ফ্রান্স, স্পেন ও আমেরিকার সহিত যুদ্ধে ইংলণ্ডের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-বিপ্লবের প্রভাবে ইউরোপব্যাপী মহাসমর সংঘটিত হয়। তখন ইংলণ্ডের জাতীয় ঋণ অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এমিস্টের সন্ধির পর ঐ ঋণের পরিমাণ—৬২০০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ওয়াটার্লু যুদ্ধের অবসানে ভিয়েনা নগরীর সন্ধির পর ৮৮৫০ লক্ষ পাউণ্ড নির্দ্ধিষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৩১এ মার্চের হিসাব অনুসারে ঐ ঋণ-পরিমাণ—৭৩১,৪৪৬,৩০৭ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে। জাতীয় ঋণের পরিমাণ এত অধিক হইলেও রাজনীতিক ও অর্থনীতিকগণের মতে উহা উপেক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ টাকা ধার করা হয় না, অথবা কেহ উহা পাইবার অধিকারী নহে। কারণ, ঋণদানকারী শতকরা নির্দ্ধিষ্ট হারে সুদ গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হন; মূলধনের কখনও দাবী করেন না। ঋণ-পরিমাণের অনুপাতে মুদ্রা-পরিমাণ মুক্ত রাখা সম্বন্ধে তাঁহার সময় সময় জিদ করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহা কখনও সম্ভবপর হয় নাই। গ্রেট-ব্রিটেনের জাতীয় ঋণের সুদ শতকরা

পাঁচ টাকা করিয়া বাড়াইয়া দিলে প্রতি বৎসর চারি কোটি টাকা মুদ্র দিবার আবশ্যক হয়। শতকরা তিন পাউণ্ড ও সাড়ে তিন পাউণ্ড হিসাবে সে মুদ্রের পরিমাণ—২৮০-২৯০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়ায়। অর্থনীতিবিদগণের অনেকেই জাতীয় ঋণের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের কেহ কেহ জাতীয় ঋণ একেবারে উঠাইয়া দিবার প্রস্তাবও করিয়া থাকেন। কিন্তু কোনও কোনও অর্থনীতিবিৎ আবার তাঁহাদের এ যুক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করেন। জাতীয় ঋণ কেবল দেশের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হয় না। দেশের উন্নতিতে যে অংশ ব্যয় করা হয়, কোন-না-কোনও আকারে উহা ফিরিয়া আসে। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহাদির জন্য গোলাগুলি-বাকুদে বাহা ব্যয় করা হয়, তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং পুনরায় ঋণ-গ্রহণে তাহার স্থান পূরণ করিতে হয়। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, রাজস্ব ও উৎপন্ন শক্তি প্রভৃতির দ্বারা বাহা আর হয়, আবশ্যকীয় ব্যয়-সঙ্কুলানের পর, তাহাতে জাতীয় ঋণের সমস্ত পরিশোধ হওয়া সম্ভবপর নহে। তদ্বারা জাতীয় ঋণ পরিশোধ করিতে গেলে মূলধন অভাবে শিল্প-বাণিজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। তাই কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন,—দুইটা উপায়ে জাতীয় ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হইতে পারে ;—(১) মুদ্রের হার পরিবর্তন, (২) নূতন রাজকর সংস্থাপন। অত্যধিক কর গ্রহণে জনসাধারণের বিশেষ কষ্টের সম্ভাবনা। এদিকে আবার মুদ্রের হার কমাইয়া দিলে ধার পাওয়াও কঠিন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন,—জাতীয় ঋণ মহত্বপূর্ণ। ইহাতে একদিকে যেমন দেশরক্ষার পথ প্রশস্ত হয়, অত্ৰদিকে তেমনি শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে দেশের স্বাধীনতা সাধন করে। সাধারণ ঋণ সম্বন্ধে পূর্বে ঋণকারীর কারারুদ্ধ হওয়ার বিষয় গ্রহণ-পক্ষে পাওয়া যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঋণদায়ে ঋণকারীকে বন্দী করিবার প্রথা বর্তমান ছিল। কিন্তু একে একে সে নিয়ম পরি-বর্তিত হইয়াছে। ‘ডেটাস’ স্যাক্টর’ প্রবর্তনায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আরলও হইতে এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্টলও হইতে ঐ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজ্যে, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বেঞ্জিয়মে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নরওয়ে ও সুইডেনে এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইটালিতে বিশেষ বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হওয়ায় কারাদণ্ড প্রথা একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডে এখন মাত্র একুশ দিনের জন্য ঋণগ্রহণকারীর প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু তাহাতে তাহার ঋণ-পরিশোধের কোনও ব্যবস্থা হয় না। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিশেষ বিশেষ স্থলে, ঋণ জন্ম কারারুদ্ধ করিবার বিধি আজও প্রচলিত আছে। ঋণকারী যদি ঋণ অস্বীকার করিয়া তাহার বিষয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার বিধান ব্যবহারশাস্ত্রকারগণ বিহিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালে কারাদণ্ড-বিধানে ঘেরাপ কঠোরতা অবলম্বিত হইত, এখনকার বিধানে সে কঠোরতা দৃষ্ট হয় না। *

* বিলাতের আইনে ঋণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে—(১) Judgment debt, (২) speciality debt, (৩) simple contract debt. এতদ্ব্যতীত National Debt বা জাতীয় ঋণ আছে। প্রথমোক্ত ঋণ বিচারদালত কর্তৃক নিষ্পন্ন, দ্বিতীয় প্রকারের ঋণ বিশেষ বিশেষ দলিলাদি সংক্রান্ত এবং তৃতীয় প্রকারের ঋণ চুক্তি-বিষয়ক। এই সকল ঋণ-সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বিধি বিলাতের আইনে বিধিবদ্ধ আছে। তৎসমুদায়ের উল্লেখ এখানে নিম্নোক্ত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

ক্রয়বিক্রয়াদিকার-বিধানে আদর্শ ।

[শাস্ত্রে পূর্বক্রয়াদিকার প্রসঙ্গ,—মনুসংহিতায় তাহার আভাষ,—মিতাক্ষরার তর্কব্রহ্মক আলোচনা,—মহানির্বাণতন্ত্রে পূর্বক্রয়াদিকারের উল্লেখ ;—অর্থশাস্ত্রের বিধান,—কৌটিল্য প্রবর্তিত বিধিবিধান-সমূহ ;—কৌটিল্যের মতে অস্থাবর বিক্রয় বিধি,—পণ্যাদির প্রসঙ্গ,—পণ্যের ত্রিবিধ দোষ,—উপনিপাত, অাবিষহ প্রভৃতি দোষের পর্যায়,—পণ্যবিক্রয়-সংক্রান্ত নানা বিধি ;—প্রতিনিধি নিয়োগে পণ্যবিক্রয় ব্যবস্থা,—তৎসংক্রান্ত বিধান-সমূহ ;—অর্থশাস্ত্রে অস্থানি-বিক্রয়-সংক্রান্ত ব্যবস্থা-বিধান ;—সংহিতায় অস্থানিবিক্রয় প্রসঙ্গ,—কৌটিল্যের বিধান স্মৃতির অনুসারী,—সদোষ ত্রয়া, নিদোষ বলিয়া বিক্রয়ে দত্তের ব্যবস্থা ;—ভেজাল প্রসঙ্গ,—তৎসংক্রান্ত কৌটিল্যের ও স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধান-সমূহ,—আধুনিক বিধিতে প্রাচীরের আদর্শ-ধ্যাপন,—মিতাক্ষরাদি মতে পূর্বক্রয়াদিকার,—দায়ভাগ, বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতির অভিন্নত ;—কণ্ঠকরকর-সংক্রান্ত বিবিধ বিধান,—দাসকর, সমুদ্র-সমুখান প্রভৃতির প্রসঙ্গ ;—সংহিতাদিতে বিভিন্ন অবস্থায় তৎসংক্রান্ত বিভিন্নরূপ বিধি-বিধানের আলোচনা,—বিবিধ বিধানের উল্লেখ,—আদেশ ও অবাধি প্রভৃতির প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ আদেশের পরিচয়,—আধুনিকে প্রাচীরের অনুসরণ ।]

পূর্বক্রয়াদিকার—ব্যবহার-শাস্ত্রের এক বিশেষ বিধান । সংহিতা-শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন ব্যবহার-বিধিতে স্বতন্ত্ররূপে এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বিধি বিধিবদ্ধ হয় নাই । মনুর বিধানে কেবল ‘প্রথ্যাত’ *

শাস্ত্রে শব্দের উল্লেখ আছে । তাহাতে ঐ প্রথার বিস্তারিত বিধি মনে আসে ।
পূর্ব-ক্রয়াদিকার বটে ; কিন্তু তাহাও রাজত্ব-পক্ষে প্রযুক্ত । মনিয়ার উইলিয়ম্‌সের মতে
প্রসঙ্গ । সংহিতা-শাস্ত্রে উহা পূর্ব-ক্রয়াদিকারের আভাষ মাত্র । মিতাক্ষরা গ্রন্থে

এতৎসংক্রান্ত একটা বিধান আছে । স্থাবর সম্পত্তি যে উপায়-পরম্পরা অবলম্বনে হস্তান্তর করা যাইতে পারে, তাহাতে সেই বিষয় পরিবর্তিত । মিতাক্ষরার ঐ বিধানের আলোচনায় অনেকে মনে করেন, প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের ব্যবহার-শাস্ত্রে পূর্ব-ক্রয়াদিকার প্রথা প্রবর্তিত ছিল । প্রতিবাদী ব্যক্তিবৃন্দের বিশেষ সম্মতি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি-সংক্রান্ত দান-বিক্রয় কদাচ সিদ্ধ হইত না—মিতাক্ষরোক্ত বিধানে তাহা উপলব্ধি হয় । কিন্তু নিবন্ধকারগণ এতদ্বিষয়ে উপেক্ষা

* এতদ্বিষয়ে মনুসংহিতায় সেই উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ; যথা,—

“রাজ্যঃ প্রথ্যাত্তাভানি প্রতিবিধানি যানি চ । তানি নিরহরতো লোভাৎ সর্বহারঃ হরেন্নৃপঃ ॥”

এই শ্লোকের টীকার কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন,—“রাজ্যঃ সম্বন্ধিতয়া যানি বিক্রয়ে ত্রয়ানি প্রথ্যাতানি রাজ্যোপযোগীন হস্তাভ্যাদিনী তদেদেশোক্তয়ানি তথা যানি চ প্রতিবিধানি বথা হৃদিক্ষে ধাত্তং দেশান্তরং ন নেয়মিতি তানি লোভা-দেশান্তরং নয়তো বণিজঃ সর্ব্বহারঃ ন রাজ্য্য কুর্থাৎ ॥” হুতরায় বুঝা যাইতেছে, রাজ্যনিষেধে বাহা ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ, তাহা রক্ষা করা দণ্ডনীয় । যে সকল পণ্যে রাজ্যের প্রথম অধিকার, এতদ্বলে তাহার বিষয়ই বলা হইয়াছে । কিন্তু রাজ-সম্পর্কে বাহা প্রযোজ্য, সাধারণ সম্পর্কে সে বিধি চলে না । হুতরায় সাধারণের পূর্ব-ক্রয়াদিকারের বিষয় মনুসংহিতায় এতদ্বিধিতে সূচিত হয় না ;—কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । বাহা হটক, যে সম্বন্ধেই হটক, মনুর উক্তিতে যে পূর্ব-ক্রয়াদিকারের আভাষ বর্ত্তমান, তাহা উপলব্ধি হয় ।

প্রদর্শন করিয়া পূর্ব-ক্রয়াদিকার সম্বন্ধে কোনও অভিমত প্রকাশ করেন নাই। তাই কাহারও কাহারও মতে, প্রাচীনকালে এ প্রথা ব্যবহার-সম্মত ছিল না। একগরিবারভুক্ত এবং একঅঙ্গে প্রতিপালিত জাতি বা সমস্বত্বাধিকারীদিগের সম্মতি দান-বিক্রয়ে অবশ্য কর্তব্য। তাহা না হইলে, তাঁহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে, দান-বিক্রয় সিদ্ধ হয় না। কিন্তু মিতাক্ষরার নিবন্ধকার-গণ সেরূপ বিধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। বাহা হউক, নিবন্ধকারগণের টীকা-টিপ্পনীতে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলেও, পূর্ব-ক্রয়াদিকার-বিধি যে বহু প্রাচীন-কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, মনুসংহিতোক্ত ‘প্রথ্যাত’ শব্দের আলোচনায় তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। সংস্কৃত-ভাষায় ইহার কোনও সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু মিতাক্ষরাদ্বারা বৃহস্পতি প্রভৃতির অভিমত আলোচনায় পূর্ব-ক্রয়াদিকার প্রথার বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হইতে পারে। বৃহস্পতির মতে স্বাবর সম্পত্তি অবিক্রয়। অংশীদারগণের সম্মতি লইয়া উহা বন্ধক দেওয়া বাইতে পারে মাত্র। ভিন্ন-পরিবারভুক্ত অথবা একানবর্তী জাতিগণের অসম্মতিতে কোনও স্বাবর সম্পত্তি অপরকে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ, মহানির্বাণ তন্ত্রের দ্বাদশোক্তাসে তদ্বিষয় স্পষ্ট উল্লিখিত আছে;—

“স্বাবরং ধনমন্ত্যৈ স্থিতে সান্নিধ্যবর্তিনি। যোগ্যে ক্রেতারি বিক্রেতুং ন শক্তঃ স্বাবরাধিপঃ॥
সান্নিধ্যবর্তিনাং জাতিঃ সর্বণো বা বিশিষ্ঠতে। তয়োরাভাবে স্তব্ধদো বিক্রেত্বিচ্ছা গরীয়সী॥
নির্গীতমূল্যোহপ্যাজ্ঞেন স্বাবরস্ত ক্রয়োত্তমঃ। তন্মূল্যং চেৎসমীপস্থোরাতিক্রেতা ন চাপরঃ॥
মূল্যং দাতুমশক্তশ্চেৎ সম্মতো বিক্রেয়েৎপি বা। সন্নিধিস্থস্তদাত্ত্যৈ গৃহী শক্তোহতিবিক্রেয়ে॥
ক্রীতং চেৎ স্বাবরং দেবি পরোক্ষে প্রতিবাসিনঃ। প্রবণাদেব তন্মূল্যং দদ্যাসৌ প্রাপ্তুর্মহতি॥
ক্রেতা তত্র গৃহারামান্‌বিনিষ্ঠাতি তনুক্তি বা। মূল্যং দদ্যাপি নাপোতি স্বাবরং সন্নিধিস্থতঃ॥”

অর্থাৎ—‘নিকটে যোগ্য-ক্রেতা বর্তমান থাকিতে স্বাবর-স্বামী স্বাবর ধন অস্ত্র ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে পারিবেন না। নিকটস্থ ক্রেতাগণের মধ্যে জাতি অথবা সর্বণ প্রশস্ত; তদভাবে বন্ধ। বহু বন্ধ ক্রয়েচ্ছু থাকিলে, বিক্রেতার ইচ্ছাই গরীয়সী অর্থাৎ যাহাকে ইচ্ছা বিক্রয় করা বাইতে পারে। স্বাবর ধনের মূল্য নির্দেশ করিয়া অপর ব্যক্তি ক্রয় করিতে উত্তম হইলে, নিকটস্থ ব্যক্তি যদি সেই মূল্য দেয়, তাহা হইলে নিকটস্থ ব্যক্তিই ক্রেতা হইবে, অপর ব্যক্তি হইবে না। যদি নিকটস্থ ব্যক্তি মূল্যদানে অসমর্থ হইয়া অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে সম্মতি দেয়, তাহা হইলে গৃহস্থ অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে। হে দেবী! প্রতিবেশীর অজ্ঞাতসারে অপর যদি স্বাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহা হইলে ঐ প্রতিবেশী প্রবণ করিবা-মাত্র সেই মূল্য দিলে সেই স্বাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ক্রেতা যদি তাহাতে গৃহ বা উপবন নির্মাণ করে কিংবা ভগ্ন করে, তাহা হইলে নিকটস্থ ব্যক্তি মূল্য প্রদান করিলেও সে স্বাবর ধন প্রাপ্ত হইবে না।’ মহানির্বাণ-তন্ত্রের এই বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, জাতি প্রভৃতির স্বাবর কিনিবার প্রথম অধিকার, তৎপরে প্রতিবেশী প্রভৃতির। কিন্তু তাঁহারা যদি কেহ ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে সে সম্পত্তি অপরকে বিক্রয় করা বাইতে পারে। বাহা হউক, ব্যবহার-বিধিতে তদ্রমত কদাচ সমাদৃত নহে। তাই তত্রোক্ত ব্যবহার-বিধি ব্যবহার-শাস্ত্রে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। পণ্ডিতগণের অনেকে বলেন, মুসলমানদিগের সময়েই ঐ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল; আর মুসলমানদিগের প্রভাব-প্রভুত্ব সময়েই হিন্দুগণ ঐ

প্রথার অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই অন্য তৎপূর্ববর্তী স্বাভিলাসের নিবন্ধকারগণের বিধানে পূর্ব-ক্রমাদিকার বিধি একেবারে অগ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের এ উক্তি সদীচীন বলিয়া বোধ হয় না। স্বাভি-শাস্ত্রের ও কোটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় পণ্ডিতগণের ঐ উক্তি আদৌ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং তৎপ্রতি বলিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। মহাবীর আলেকজান্ডারের ভারত আগমন কাল হইতে পণ্ডিতগণ ভারতেতি-হাসের আরম্ভ বলিয়া ঘোষণা করেন। মহামতি কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র তাহারই সময়সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছিল। সুতরাং সংহিতাদির বিষয় ছাড়িয়া দিয়া অর্থশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিলেও বুঝা যায়, প্রথম-ক্রমাদিকার-প্রথা ভারতবর্ষে বহুকাল পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর অপরা-পর দেশ যখন আদিম অসংস্কৃত অবস্থায় অবস্থিত, ভারতবর্ষ তখন শিক্ষা-সমুন্নত—সভ্যতার উচ্চতম সোপানে সমাক্রান্ত। তখন হইতেই ভারতের ব্যবহার-বিধি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। তবে সময় সময় হয় তো অবস্থা-বিশেষের উপযোগী না হওয়ার বিষয় বিশেষ সাময়িকভাবে অগ্রচলিত হইয়াছিল। আবার শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহের প্রকৃত ব্যাখ্যার অভাবও অমুল্যবোধের একতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। তাহা না হইলে, আধুনিক ব্যবহার-শাস্ত্রের প্রায় সকল বিধানই যে ভারতবর্ষে কোন-না-কোনও আকারে অতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল, তাহা বিবরণে সন্দেহ নাই। আর সেই সকল বিধি-বিধান ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াই যে আধুনিক ব্যবহার-শাস্ত্রের সৃষ্টি-পরিপুষ্টি, তাহাও বলা যাইতে পারে।

মহামতি কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই ক্রমাদিকার বিষয়ে বিধি-ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়কালে, প্রথমে জ্ঞাতি, সামন্ত, ধনিক প্রভৃতির নিকট বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতে হইবে,—কোটিল্য তাহার বিধান দিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐরূপ ক্রম-পর্যায় অনুসারে বাস্তব-বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করিলে, সে বিক্রয় অসিদ্ধ হয়।

কোটিল্যের
বিধান।

জ্ঞাতিগণকে জিজ্ঞাসার পর, সামন্তদিগকে এবং সামন্তগণের পর ধনিক-দিগকে বাস্তব কিনিবার অস্ত্র অমুল্যবোধ করিতে হইবে। জ্ঞাতিগণকে জিজ্ঞাসা করিবার কারণ—সে বাস্তবতে তাঁহাদের অংশ থাকিতে পারে। সন্নিকর্ষ-হেতু সামন্ত বা প্রতিবেশীগণ অস্ত্র কর্তৃক ক্রয়ে আপত্তি করিতে পারেন; অস্ত্রজ বিক্রয় সন্মুখে ধনিকের বা ঋণদাতার আপত্তির কারণ—সে বাস্তব তাঁহার নিকট বন্ধক থাকিতে পারে, অথবা তিনি সে বাস্তব গ্রহণ করিয়া বাস্তব-স্বামীকে ঋণদান হইতে মুক্তি দিতে পারেন। এইরূপ পর্যায় অনুসারে কেহই যদি প্রস্তাবিত বাস্তব কিনিতে অগ্রসর না হন, তাহা হইলে বাস্তব-স্বামী বাহাকে ইচ্ছা সে বাস্তব বেচিতে পারিবেন। তাহাতে অস্ত্র কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না। এতৎসম্বন্ধে কোটিল্যের উক্তি; যথা,—

“জ্ঞাতিসামন্তধনিকাঃ ক্রমেণ ভূমিপরিগ্রহান্ ক্রেতুমভ্যাভবেয়ুঃ। ততোহন্যে

বাহ্যাস্গামন্তচক্ৰাংশংকুলা গৃহপ্রতিমুখে বেন্দ্র প্রাবয়েয়ুঃ। সামন্তগ্রাম-

বুদ্ধেয়ুঃ ক্ষেত্রমারামং সেতুবন্ধং তটাকমাধারং বা মর্যাদান্ন যথাসেতুভাগং

‘অনেনার্ষেণ কঃ ক্রেতা’ ইতি ত্রিরাবুভিতবীতমব্যাহতং ক্রেতা ক্রেতুং লভেত।”

কোটিল্যের মতে “গৃহং ক্ষেত্রমারামসেতুবন্ধতটাকমাধারো বা বাস্তবঃ;” এবং “কর্ণকীলার সপথকোহমৃগং সেতুঃ।” গৃহ, ক্ষেত্র, উদ্যান, তড়াগ প্রভৃতি বাস্তব পর্যায়ভুক্ত, আর সর্ক-

প্রকার অট্টালিকা সেতুবন্ধ বলিয়া অভিহিত। এইরূপ বাস্তবিক বিক্রয় কালে বিক্রয়ের বিষয় ঘোষণা করিবার নিয়ম ছিল। অন্ততঃ নিকটস্থ চল্লিশটা বসতি হইতে বহু লোক সমবেত হইলে বাস্তবিক বিক্রয়ের সংবাদ উচ্চৈঃস্বরে সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করিবার বিধি, কোটিল্য বিহিত করিয়াছেন। ‘এই নির্দিষ্ট মূল্যে কে ইহা খরিদ করিবে’—তিন বার এতদ্বাক্য বিধোষিত হইলে, যদি অপর কেহ বাস্তবিক বিক্রয়ে বাধা না জন্মাইত, তাহা হইলে ক্রেতা সে বাস্তবিক ক্রয় করিতে পারিতেন। কিন্তু “স্বর্ণবারোবা মূল্যবর্ধনে মূল্যবৃদ্ধিঃ সপ্তকা কোশং গচ্ছন্ত।” প্রতিযোগিতায় যদি তাহার মূল্য জ্ঞাত্য মূল্যের অধিক হইত, তাহা হইলে অতিরিক্ত অংশ রাজা গ্রহণ করিতেন। কোটিল্যের বিধানে আরও দেখা যায়, বাস্তবিক প্রভৃতি হস্তান্তর করিবার পূর্বে গ্রামবৃদ্ধদিগের দ্বারা উহার সীমানা নির্দেশ করিয়া লইতে হইত। নচেৎ সে বাস্তবিক বিক্রয় হইতে পারিত না। বিক্রয়ের সময় ‘প্রতিক্রোষ্টা’ তিন বার উচ্চৈঃস্বরে কয়েজুর নিকট বাস্তবিকামীর নিরূপিত মূল্যাদির বিষয় ঘোষণা করিতেন। * কোটিল্যের আর একটা বিধি—বিক্রয় দ্রব্যের উপর শুক-নির্ধারণ। এই শুক ব্যতীত নির্দিষ্ট মূল্যের অতিরিক্ত অংশ রাজার প্রাপ্য। অর্ধশাস্ত্রের দ্বিতীয় বিধি—প্রতিক্রোষ্টা বা ক্রেতা-আহ্বানকারীকে শুক সংগ্রহ করিয়া রাজকোষে অর্পণ করিতে হইত। “বিক্রয়প্রতিক্রোষ্টা শুকঃ দত্ত্যৎ।” অস্বামী বা স্বত্বাধিকারী ব্যতীত অপর ব্যক্তি কর্তৃক বাস্তবিক বিক্রীত হইলে তাহার চতুর্বিংশতি পণ অর্থদণ্ড হইবার ব্যবস্থা ছিল। বাস্তবিক বিক্রয় হইয়া গেলে সাত দিনের মধ্যে বাস্তবিকামী যদি উপস্থিত না হইতেন, তাহা হইলে ক্রেতাকে তাহাতে অধিকার প্রদান করা হইত। প্রকৃত ক্রেতা ভিন্ন অপরকে তাহার অধিকার প্রদান করিলে দুই শত পণ অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত ছিল।

“অস্বামিপ্রতিক্রোশে চতুর্বিংশতিপণো দণ্ডঃ। সপ্তরাজাদ্বন্দ্বমনতিসরতঃ প্রতিক্রোষ্টো

বিক্রীণীত। প্রতিক্রোষ্টাতিক্রমে বাস্তবিক দ্বিশতো দণ্ডঃ অন্ত্রা চতুর্বিংশতিপণো দণ্ডঃ।”

বাস্তবিক প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণতঃ এইরূপ বিধান বিহিত ছিল বটে; কিন্তু অন্ত্রা ভূমি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ স্থলে কোটিল্য বিশেষ বিশেষ বিধি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। শস্ত্র বণন কালে ক্রয়ক বা প্রতিবেশী অপরের ক্ষেত্র বলপূর্বক অধিকার করিয়া তাহাতে শস্ত্র বণন করিলে তিনি দণ্ডণীর হইতেন। এরূপ অবস্থায় ক্রয়কের বা প্রতিবেশীর স্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইত। কিন্তু এরূপ অন্যায় অধিকারের উপযুক্ত কারণ থাকিলে তাহার কোনও দণ্ড হইত না। এতদ্ব্যতীত ক্রয়কের জমি কেবলমাত্র ক্রয়কের নিকট বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা ছিল। অন্ত্রা কেহ সে জমি খরিদ করিলে তাহা ব্যবহার-বিধানে সিদ্ধ হইত না; পরন্তু ক্রেতা দণ্ড ভোগ করিতেন। ব্রাহ্মণের ভূমি, ব্রাহ্মণের নিকট, করদাতার ভূমি করদাতার

* আজিকালি নিলামের যে ব্যবস্থা বিহিত আছে, তদনুসারে তৃতীয় বার ডাকে নিলাম-বিক্রয় মজুর হয়। কিন্তু দাবীর অতিরিক্ত মূল্য রাজকোষে যায় না; উহা বিবাদী পাইয়া থাকে। অর্থাৎ,—দাবীর বাস্তবিক বিক্রীত হয়, মুদ্রার বা দাবীর অতিরিক্ত টাকা তাহারই প্রাপ্য। বিক্রয়ের জন্য যে বাস্তবিক অধুনা নিলামে উঠে, ইত্যাহারে তাহার সীমাপরিমাণাদি নির্দিষ্ট করিয়া দিব্যার নিয়ম, এখনকার বিধানও বিহিত আছে। এখন বিক্রয় দ্রব্যাদির উপর অন্ত হিসাবে শুদ্ধাধি কিছু নির্দিষ্ট নাই। তবে ‘কোর্টারি’ ও ‘নিলামী কি’ প্রভৃতি শুক-পর্ধ্যায়কৃত কি না, তাহা বিচার-সাপেক্ষ।

নিকট বিক্রয় করিবার বা বন্ধক দিবার বিধি। কাহারও পতিত নিষ্কর ভূমিতে অপর কেহ শতাদি উৎপন্ন করিয়া তাহা পাঁচ বৎসর ভোগ করিতে পারিত। ১০ পাঁচ বৎসর অতীত হইলে উহা ভূস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবার বিধি। তবে কর্ণাদির ক্ষত ভূমির উর্বরতা-বৃদ্ধি-হেতু ভূস্বামী পারিতোষিক দানে কৃষাণের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতেন। করদাতা কর্তৃক নিষ্কর ভূমি গ্রহণ, কোটিল্যের বিধানে দণ্ডনীয়। কোনও করদাতা অপর করদাতার বাস্তু প্রভৃতি ক্রয় করিলে বিক্রয়কারীর সকল সম্পত্তি ক্রেতার অধিকারে আসিত; কিন্তু তিনি গৃহাদি দখল করিতে পারিতেন না। অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত ‘বিবীতক্ষেত্রপথহিংসা, সময়স্যানপাকর্ম চ’ অংশ হইতে এতদ্বিষয়ক কোটিল্যের বিধান নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“ক্ষেত্রিকস্তাক্ষিপতঃ ক্ষেত্রমুপবাসস্ত বাতাতো বীজকালে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ

অন্তত্র দোষোপনিপাতাবিষেহতঃ ॥ করদাঃ করদেষাধানং বিক্রয়ং বা

কুয্যুঃ। ব্রহ্মদেয়িকা ব্রহ্মদেয়িকেষু অন্ত্রণা পূর্ব্বস্বসাহসদণ্ডঃ। করদস্য

বাহকরদগ্রামং প্রবিশতঃ ॥ করদং তু প্রবিশতঃ সর্ব্বদ্রব্যেযু প্রাক্রাম্যং স্যাৎ

অন্ত্রজাগারাৎ। তদপ্যত্মৈ দণ্ডাৎ ॥ অনাদেয়মকৃতবতোহন্তঃ পঞ্চবর্ষাণ্যাপ-

ভূজ্য প্রয়াসনিষ্ক্রেমেনদণ্ডাৎ। অকরদাঃ পরত্র বসন্তো ভোগমুপজীবয়েযু ॥”

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সম্বন্ধে কোটিল্যের বিধি-ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র। সে ক্ষেত্রে গ্রাম-বৃদ্ধগণ আহৃত হন না বা বিক্রয় দ্রব্যের মূল্যের বিষয় সাধারণে উঠে; স্বরে ঘোষণার আবশ্যক করে না। ধনস্বামীকে মূল্য প্রদান করিয়া বিক্রয় দ্রব্য গ্রহণ করিলেই

অস্থাবর

বিক্রয়-বিধি।

সে ক্রয় সিদ্ধ হয়। যে কোনও দ্রব্যের বিক্রয় বিষয়ে ক্রেতার সহিত

অস্বীকারবদ্ধ হইলে, বিক্রয়কারী তাঁহার নিকট সে দ্রব্য বেচিতে বাধ্য;

ক্রেতাও তাঁহার অস্বীকার অমুদারে সে দ্রব্য গ্রহণ করিতে বাধ্য। ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি এবং পণ্যাদি সংক্রান্ত দ্রব্য—উভয় সম্পর্কেই এ বিধি প্রযোজ্য। নির্দিষ্ট দ্রব্য কিনিবার বিষয়ে অস্বীকারবদ্ধ হইয়া ঐ দ্রব্য ক্রয় না করিলে, ক্রয়কারীর দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইত।

বিক্রয়কারী যদি তাঁহার সে দ্রব্য বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিও ঐরূপ দণ্ডের বিধান ছিল। যথা,—“বিক্রীয়পণ্যমপ্রযচ্ছতো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।” কিন্তু “অন্তত্র দোষোপনিপাতাবিষেহতঃ।” বিক্রয় দ্রব্যে যদি কোনও দোষ থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা চুক্তি সম্বন্ধে সে দ্রব্য গ্রহণ না করিতে পারেন। হত, গুণহীন পণ্য, উপনিপাতযুক্ত দ্রব্য প্রভৃতি খরদ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, ঐ সকল দোষবশতঃ ক্রেতা যদি তাহা গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার দণ্ড হইবে না;—“বিক্রীতক্রীতামুশয়ঃ” প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ আছে।—

“পণ্যাদোষো দোষঃ। রাজচৌরাধ্যাদকবাধ উপনিপাতঃ। বহুগুণহীনমাতকৃতং

বাহবিষম্। বৈদেহকানামেকরাজমুশয়ঃ। কর্ণকাণাং জিরাজম্। গোরক্ষকাণাং

পঞ্চরাজম্। ব্যামিশ্রাণাং উত্তমানাং চ বর্ণানাং বিবৃতিবিক্রেয়ং সপ্তরাজম্। আতিপাতি-

কানাং পণ্যানামন্ত্রজাবিক্রেয়মিত্যবিরোধেনামুশয়ো দেয়ঃ। তস্তাতিক্রমে চতুर्वিংশতি-

পণো দণ্ডঃ পণ্যদশজাগো বা। ক্রীড়া পণ্যমপ্রতিগৃহ্যতো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ, অন্তত্র

দোষোপনিপাতাবিষেহতঃ। সমানস্তামুশয়ঃ। রবিদোষমৌশল্যায়িকং দৃষ্ট। সিদ্ধমুপা-

বর্জনম্ । ন হেবাভিপ্রজাতয়োঃ । কস্তাদোষমৌপশ্যিকমনাখ্যায় প্রযজ্ঞতঃ বধ-
যতিদণ্ডঃ শুক্লদ্বীধনপ্রতিদানং চ । বরয়িতুর্বা বরদোষমনাখ্যায় বিন্দতো দ্বিগুণঃ
শুক্লদ্বীধননাশচ । দ্বিপদচতুস্পদানাং তু কুঠব্যাদিতানামশুচীনামুৎসাহস্বাস্থ্যশুচী-
নামাখ্যানে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ । আজিগক্ষাদিতি চতুস্পদানামুপাবর্জনম্ । আসংবৎসরা-
দিতি মহুয়ানাম্ । তাবতা হি কালেন শক্যঃ শোচাশোচো জ্ঞাতুমিতি । দাতাপ্রতি-
গ্রহীতা চ স্তাতাং নোপহতৌ যথা । দানে ক্রয়ে বাহুদশং তথা কুর্খ্যুদসভাসদঃ ॥”

বিক্রয়ের দ্রব্যে অনেক দোষ থাকিতে পারে । তন্মধ্যে প্রথম—সাধারণ দোষ । দ্বিতীয়
দোষ—উপনিপাত । জল দ্বারা সিক্ত বা অগ্নি কর্তৃক দগ্ধ, রাজাদেশে বাজেয়াপ্ত, চোর
কর্তৃক হৃত প্রভৃতি দ্রব্য উপনিপাত-দোষদ্রষ্ট । তৃতীয় দোষ—অবিষহ্য । যে সকল গুণের
উল্লেখ ক্রেতাকে প্রথম অঙ্গীকার-বদ্ধ করা হয়, বিক্রয়ের দ্রব্যে যদি সে সকল গুণ বর্তমান
না থাকে ; অথবা বৃদ্ধ পীড়িত ব্যক্তি কর্তৃক যদি উহা নির্মিত হইয়া থাকে ; তাহা হইলে
সে দ্রব্য অবিষহ্যদোষ দ্রষ্ট হয় । সেই সকল দোষ বর্তমান থাকিলে ক্রেতা প্রতিজ্ঞানিষ্মার
দ্রব্য গ্রহণ না করিতে পারেন । সে জন্ত তিনি দণ্ডগীর হইবেন না । অন্তর্গত চুক্তি-
বদ্ধ দ্রব্য ভঙ্গপ্রবণ হইলে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রেতা তাহা গ্রহণ না করিলে, বিক্রেতা
অন্তের নিকট সে দ্রব্য বিক্রয় করিবার অধিকারী । তাহাতে তাঁহার কোনও দোষ হইবে
না । বিক্রয় রহিত করিবার জন্ত সময় দিবার বিধি অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় । সে বিধানে
বৈদেহকগণ এক রাত্রি, কৃষকগণ তিন রাত্রি, গোরক্ষকগণ পঞ্চরাত্রি এবং বিবৃত্তবিক্রয়ে
বণিকগণ সপ্তরাত্রি সময় পাইবার অধিকারী । কিছুদিন যে পণ্য অবিক্রীত থাকিলে কোনও
ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, অথ পণ্য বিক্রয় জন্ত তাহার বিক্রয় কিছুকাল স্থগিত রাখা যাইতে
পারে । কিন্তু বেশী দিন রাখিলে যে পণ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা সত্তর বিক্রয় করিয়া
ফেলিবে । শেষোক্ত পণ্য বিক্রয় করিবার জন্ত যদি পূর্বোক্ত পণ্য-বিক্রয় বদ্ধ রাখিতে হয়,
তাহাও করা যাইতে পারিবে । কিন্তু প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে চতুর্বিংশতি
পণ অর্থদণ্ড হইবে ; অথবা দ্রব্য-মূল্যের দশমাংশ দণ্ডও বিহিত হইতে পারিবে । পূর্বোক্ত
কোনও দোষেই যদি বিক্রীত দ্রব্য দ্রষ্ট না হয়, আর সে দ্রব্য যদি ক্রয়কারী ফিরাইয়া দিতে
যান, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি দ্বাদশ পণ দণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত । কেবল পণ্যাদি বিষয়ে
নহে, বিবাহাদি ব্যাপারেও এ বিধি প্রযুক্ত হইবে । কুঠব্যাদিগ্রস্ত অথবা অব্যবহার্য্য দ্বিপদ
বা চতুস্পদ জন্তকে গৃহ সল ও ব্যবহারের উপযুক্ত বলিয়া বিক্রয় করা নিষিদ্ধ । এরূপ ক্ষেত্রে
প্রচলিত বিধির অন্তর্গত দ্বাদশ পণ দণ্ডের বিধান ৮ এরূপ ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহার করিবার
কাল—দ্বিপদের পক্ষে এক বৎসর এবং চতুস্পদের পক্ষে তিন পক্ষ নির্দিষ্ট হইয়াছে । ঐ কালের
মধ্যে বিক্রয় অঙ্গীকার সাব্যস্ত করিবার বিধি । কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে সে সম্বন্ধে কোনও
ব্যবহার-স্থাপনা চলিবে না । এবিধ সর্বপ্রকার দান ও ক্রয়-বিক্রয় রহিত ব্যাপার, কোটিল্যের
মতে, সভাসদগণ ভ্রায়তঃ মীমাংসা করিয়া দিবেন । বাহাতে কোনও পক্ষেরই ক্ষতি না
হয়, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি রাখিবেন । ‘বৈষ্যাবৃত্তবিক্রয়’-প্রসঙ্গে ‘এম্বেট’ বা প্রতিনিধির দ্বারা
বিক্রয়ের বিধি অর্থশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে । কোটিল্যের এ বিধান চুক্তি-পণ্যাদির অন্তর্ভুক্ত ।

উপনিধি-সংক্রান্ত বিধি-বিধান-সমূহ এতদ্বিধে প্রযুক্ত হইতে পারে। সত্ত্ববদ্ধ বণিকগণ পণ্য-বিক্রয় কালে বা চুক্তি-সম্পাদন সময়ে 'এজেন্ট' বা প্রতিনিধি-নিয়োগে তৎকার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এতাদৃশ 'এজেন্ট'-সংক্রান্ত বিধান কোটিল্য বলিয়াছেন,—

“বৈষ্যাবৃত্তকরা যথাদেশকালং বিক্রীণানাং পণ্যং যথাজাতমুলামুদয়ং চ দদ্যাৎ ॥ শেষ-মুপনিধিনা ব্যাখ্যাতম্। দেশকালান্তিপাতেন বা পরিহীণং সম্প্রদানকালিকেন অর্থেণ মোলামুদয়ং চ দদ্যাৎ। যথাসম্ভাবিতং বা বিক্রীণানা নোদয়মধিগচ্ছেয়ুঃ মূল্য-মেব দদ্যাৎ। অর্থপতনে বা পরিহীণং যথাপরিহীণমূল্যমুদয়ং দদ্যাৎ ॥ সাংব্যবহারিকেষু বা প্রাত্যরিকেষু রাজবাচ্যেষু ভ্রেষোপনিপাতাভ্যাং নষ্টং বিনষ্টং বা মূল্যমপি ন দদ্যাৎ। দেশকালান্তরিতানাং তু পণ্যানাং ক্ষয়ব্যয়শুদ্ধমূল্যমুদয়ং চ দদ্যাৎ। পণ্যসমবায়ানাং চ প্রত্যংশম্। শেষমুপনিধিনা ব্যাখ্যাতম্ ॥ তেন বৈষ্যাবৃত্তবিক্রয়ো ব্যাখ্যাতঃ ॥”

যাহারা পাইকারী ভিন্ন খুচরা বিক্রয় করেন না, তাঁহারা প্রারম্ভে এজেন্ট বা প্রতিনিধি দ্বারা পণ্যাদি বিক্রয় করাইয়া থাকেন। প্রতিনিধিগণ তৎকাল-প্রবর্তিত ও তৎস্থান-প্রচলিত হার-পরিমাণে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য ব্যবসায়ীর নিকট বুঝাইয়া দিতেন। বিক্রয়কারী প্রতিনিধি যদি ভ্রমবশতঃ বা অসাবধানতা-প্রযুক্ত প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করেন, তাহা হইলে পণ্যগ্রহণকালীন চুক্তি-সিদ্ধ মূল্য তাঁহাকে মহাজনের নিকট প্রদান করিতে হইত। কিন্তু ব্যবসায়ী মহাজন যদি স্বেচ্ছাক্রমে কম মূল্য লইতে স্বীকার করিতেন, বিক্রয়কারী তাহাই প্রদান করিতে পারিত। ভ্রেষোপনিপাত জ্ঞাত বিক্রয় দ্রব্য ছুট হইলে, উপনিপাত দোষে অর্থাৎ স্থলপথে বা জলপথে সংবাহিত হইবার সময় যদি উহা নষ্ট হইয়া যায় এবং সে বিষয় যদি রাজকীয় ঘোষণাদি দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা হইলে আর মহাজনকে সে পণ্যের মূল্য প্রদান করিতে হইবে না। সে পণ্য যদি কোনও সময়ে কোনও স্থানে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে আবশ্যিকমত তাহার ক্ষয়ব্যয় বাদ দিয়া অবশিষ্ট অংশ ধনী মহাজন প্রাপ্ত হইবেন। সত্ত্ব-প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িগণ প্রত্যেকে আপনাদের অংশ অনুসারে এইরূপ দ্রব্যের বিক্রীত মূল্যের লাভ-ক্ষতির অংশ প্রাপ্ত হইবেন।

অস্বামী বা অনধিকারী কর্তৃক বিত্ত-সম্পত্তি বিক্রয় সত্বে কোটিল্যের বিধান বহুব্যাপক। ভারতঃ যে বস্তুতে যাহার অধিকার নাই, তিনি সে বস্তু সম্পর্কে অস্বামিপদবাচ্য। অস্বামিবিক্রয় চৌরাদির ভার দণ্ডনীয়। এমন কি, কোনরূপে উহার সন্ধান পাইলে রাজ অস্বামিবিক্রয়। আদেশে তিনি ধৃতযোগ্য। স্থান-কাল-অবস্থা-ভেদে রাজ-আদেশ গ্রহণের সুবিধা না থাকিলে, অস্বামী স্বয়ং তাহাকে ধৃত করিতে পারিতেন। তাহাতে তিনি দণ্ডনীয় হইতেন না। অস্বামিবিক্রয় সত্বে কোটিল্য এক বিস্তৃত বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে, বঠ অধ্যায়ে, তদ্বিষয়ক উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—

“নষ্টাপহৃতমাসাত্ত স্বামী ধর্ম্মস্থেন গ্রাহয়েৎ। দেশকালান্তিপাতৌ বা স্বয়ং গৃহীত্বোপ-হরেৎ। ধর্ম্মহৃষ্ট স্বামিনমহুযুক্তীত—‘কৃতস্তে লক্ষ্মিতি।’ স চেদা চারক্রমং দর্শয়েত, ন বিক্রেতারং তস্ত দ্রব্যাস্যান্তিসর্গেণ সুচ্যোত। বিক্রেতা চেদৃশ্বেত, মূল্যং স্তেরদণ্ডং চ স চেনপসারমধিগচ্ছেৎপসরেদ্যাপসারক্ষয়াদিত্তি কয়ে মূল্যং স্তেরদণ্ডং চ দদ্যাৎ। নাষ্টিকং

চ স্বকরণং কৃত্বা নষ্টপ্রত্যাহৃতং লভেৎ। স্বকরণাভাবে পঞ্চবন্ধো দণ্ডঃ। তচ্চ দ্রব্যং রাজধর্ম্যং তাত্ নষ্টাপহৃতমনিবেদ্যোৎকর্ষতঃ স্বামিনঃ পূর্ব্বঃ সাহসদণ্ডঃ। শুদ্ধস্থানে নষ্টাপহৃতোৎপন্নস্তিষ্ঠেৎ। ত্রিপক্ষাদৃক্ষমনভিসারং রাজা হরেৎ, স্বামী বা। স্বকরণেন পঞ্চপণিকং দ্বিপদরূপস্ত নিষ্করং দণ্ডাৎ। চতুষ্পণিকমেকধুরস্ত; দ্বিপণিকং গোমহিষস্ত; পাদিকং ক্ষুদ্রপশুনাং; রত্নসারকঙ্কূপ্যানাং পঞ্চকং শতং দণ্ডাৎ। পরচক্রটবীভূতং তু প্রত্যানীর রাজা যথাস্বং প্রযচ্ছেৎ। চোরহৃতমবিজ্ঞমানং স্বদ্রব্যোভ্যাঃ প্রযচ্ছেৎ। প্রত্যানেতুমশক্তো বা স্বয়ংগ্রাহেণাহৃতং প্রত্যানীর তন্নিষ্করং বা প্রযচ্ছেৎ। পরাবেষণায়া বিক্রমেণানীতং যথা প্রদীষ্টং রাজা ভুক্তীতাভ্যর্থ্যপ্রাণেভ্যো দেবত্রাক্ষণতপশ্চিদ্রব্যোভ্যাশ্চ॥

অপহৃত সম্পত্তির সন্ধান পাইলে সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী বিচারকের আদেশ অনুসারে তাহাকে ধৃত করিবেন। স্থানকাল অনুসারে যদি বিচারকের আদেশ গ্রহণ সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে দ্রব্যস্বামী স্বয়ংই তাহাকে ধৃত করিতে পারিবেন এবং অপহৃত দ্রব্য-সম্পত্তি আদায় করিয়া লইবেন। 'কি উপায়ে সে ঐ দ্রব্য প্রাপ্ত হইল'—বিচারক তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। সে যদি প্রকৃত বিষয় বলিতে পারে, তাহা হইলে বিক্রয়কারীকে উপস্থিত করিতে না পারিলেও সে মুক্তিলাভ করিবে। কিন্তু বিত্তসম্পত্তি সে পাইবে না। অন্য পক্ষে যদি বিক্রয়কারী উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বিক্রেতা উহার মূল্য প্রদান করিবে; অধিকন্তু সে চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হইবে। কিন্তু সে যদি পলায়ন করিয়া অপহৃত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া ফেলে, সে অবস্থায়ও সে ঐ সম্পত্তির মূল্য প্রদান করিতে বাধ্য এবং চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডনীয়। সম্পত্তিস্বামী যদি তাহাতে তাঁহার স্ব স্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ হন, সে সম্পত্তি তাঁহার প্রাপ্য। অসামর্থ্য-পক্ষে তাঁহার প্রতি সম্পত্তির মূল্যের পাঁচ গুণ দণ্ডের বিধান। অধিকন্তু সে সম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবার বিধি। বিচারকের বিনা অনুমতিতে হৃত দ্রব্য গ্রহণ করিলে দ্রব্য-স্বামীর 'প্রথম সাহস' দণ্ডের বিধান বিহিত হইয়াছে। ধনস্বামী ভিন্ন অপর কেহ হৃত বা নষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে, প্রথমতঃ সে দ্রব্য শুদ্ধ-স্থানে আমানত রাখিবার বিধি। তিন পক্ষের মধ্যে কেহ দাবী না করিলে, রাজা সে দ্রব্য গ্রহণ করিবেন। অপহৃত দ্বিপদ জন্তুতে স্ব স্ব প্রমাণ করিলে ঐ জন্তু ফিরিয়া লইবার সময় গ্রহণকারীকে পাঁচ পণ 'নিষ্কর' বা শুদ্ধ প্রদান করিতে হইবে। অশ্বাদি একধুর জন্তু সষষ্কে চারি পণ, গোমহিষাদির দুই পণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুর সিকি পণ এবং মৃগ্যবান প্রস্তরাদি সম্পর্কে শতকরা পাঁচ পণ হিসাবে এইরূপ শুদ্ধ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

স্বতীশাস্ত্রের ক্রয়-বিক্রয় বিধান প্রধানতঃ পণ্য দ্রব্য সষষ্কে বিহিত। ব্যক্তিগত স্বাবর-অস্বাবর সষষ্কে সংহিতায় সেরূপ বিস্তৃত বিধি বিধিবদ্ধ হয় নাই। অস্বামিবিক্রয়-প্রসঙ্গে সংহিতা-
 সংহিতায় কারগণ যে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এক হিসাবে স্বাবর ও
 অস্বামিবিক্রয় অস্বাবর উভয় প্রকার বিত্ত-সম্পত্তি সষষ্কে প্রযুক্ত হইতে পারে। অস্বামি-
 প্রসঙ্গ। বিক্রয় প্রসঙ্গে মন্তু বলিয়াছেন,—অনধিকারীর দান-বিক্রয় ব্যবহারসিদ্ধ বা
 শাস্ত্রসম্মত নহে। তাঁহার বিধান হইতে বুঝা যায়, সমবেত বহু ব্যক্তির সমক্ষে দান-বিক্রয়
 প্রণত। সেরূপ দান বা বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না। "বিক্রয়াদ্যে ধনং কিঞ্চিদগ্নীনাং কুলসমিধৌ।

ক্রয়েন স বিপ্লবঃ হি জায়তো লভতে ধনম্ ॥” নতুবা, অস্বামিবিক্রয়-জনিত দোষ বর্জিত পাবে এবং রাজবিধানে দণ্ড হওয়াও সম্ভবপর। অপরাপর স্থিতি-গ্রহে স্বাবর-অস্বাবর বিক্রয় বিধি বিশেষ নীমাবদ্ধ। * অস্বামিবিক্রীত দ্রব্য সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বিভিন্ন বিধির উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহার অধিকাংশই অস্বাবর সম্বন্ধে প্রযুক্ত। বসিষ্ঠ ও গৌতম এতদ্বিধরে কোনও বিশেষ অভিযত প্রকাশ করেন নাই। এতৎসংক্রান্ত বিস্তার বিধি দণ্ডমূলক। অস্বামিবিক্রয় ব্যবহার কোটিল্য যে সকল বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ যাজ্ঞবল্ক্যের মতামুসারী। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

“স্বং লভতাভ্যবিক্রীতং ক্রেতুর্দোষোহপ্রকাশিতে। হীনাদ্রহো হীনমূল্যে বেলাহীনে চ তৎকরঃ ॥

নষ্টাপহৃতমাসাত্ত হর্তারং গ্রাহয়েন্নরম্। দেশকালতিপত্তৌ চ গৃহীত্বা স্বয়মর্পয়েৎ ॥

বিক্রেতুর্দর্শনাচ্ছুদ্ধিঃ স্বামী দ্রব্যং নৃপো দমম্। ক্রেতা মূল্যমবাপ্নোতি তন্মাদ্যন্তস্ত্র বিক্রয়ী ॥

আগমেনোপভোগেন নষ্টং ভাব্যমতোহন্তথা। পঞ্চবক্ষ্যো দমন্তস্ত্র রাজ্ঞে তেনাবিভাবিতে।

কৃতং প্রনষ্টং যো দ্রব্যং পরহস্তাদবাপ্নুয়াৎ। অনিবেত্ত্ব নৃপে দণ্ডাঃ স তু যল্পবতিং পণান্ ॥

শৌক্যৈঃ স্থানপাটৈর্কর্ষা নষ্টাপহৃতমাক্রতম্। অর্ক্যাক্ সংবৎসরাৎ স্বামী হয়তে পরতো নৃপঃ ॥

পণানেকশফে দত্ত্বাচ্ছতুরঃ পঞ্চ মাহুষে। মহিষোষ্ট্রগবাঃ ঘৌ ঘৌ পাদং পাদমজাবিকে ॥”

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, প্রকৃত ধনস্বামী আপনার নষ্ট বা ক্ষত দ্রব্য অস্ত্রের নিকট দেখিত পাইলেই তিনি তাহা উদ্ধার করিতে পারিতেন; আর বহুজনসমক্ষে ক্রয় বা বিক্রয় প্রাপ্ত ছিল। তাহা না হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই দোষী হইতে পারেন। কোটিল্যের বিধান দেখিয়াছি,—“বাহাগামস্ত চত্বারিংশকূল্যা গৃহপ্রতিমুখে বেষ্ম শ্রাবয়েয়ুঃ।” মন্ডুর বিধানও তাহাই উপলব্ধি হইয়াছে; আবার যাজ্ঞবল্ক্যও সেই একই বিধি বিহিত করিলেন। স্মরণ্যং বেশ বুঝা গেল, দশ জনের সম্মুখে যে দানবিক্রয় হয়, প্রাচীন কালে তাহাই প্রশস্ত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য আরও বিহিত করিয়াছেন,—যদি ক্ষত দ্রব্য সহপায়ে পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সে দ্রব্য গোপনে ক্রয় করিবে না। রাত্রিকালে, গোপনে, অল্পমূল্যে এতাদৃশ দ্রব্য ক্রয় করিলে ক্রেতা চোরপদবাচ্য হন। এরূপ স্থলে ক্রেতা যদি ক্ষত দ্রব্যের সন্ধান পান, তাহা হইলে তিনি বিক্রেতাকে ধরাইয়া দিবেন। এতদ্ব্যতীত, যদি বিক্রেতা কোনও অজ্ঞাতদেশে গিয়া থাকে বা মরিয়া যায়; তাহা হইলে ক্রেতা তাঁহার ক্রীত-দ্রব্য প্রকৃত ধনস্বামীর নিকট প্রদান করিবেন। কোটিল্য বলিয়াছেন,—“ন বিক্রেতারং তস্ত্র দ্রব্যাস্যাতিসর্গেণ মৃচ্যত। বিক্রেতা চেদৃশ্তেত, মূল্যং স্তের-দণ্ডং চ।” যাজ্ঞবল্ক্যও বিধান করিলেন,—বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলেই অপহৃত-দ্রব্যক্রেতা দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে; আর প্রকৃত দ্রব্যস্বামী তাঁহার দ্রব্য ফিরাইয়া পাইবেন; অপিচ, ক্রেতাকে বিক্রেতা মূল্য ফিরাইয়া দিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতা রাজদণ্ড ভোগ করিবেন।

* ভারতীয় চুক্তি-সংক্রান্ত আইনের সপ্তম অধ্যায়ে অস্বাবর বিক্রয়-সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ আছে। সে সকলের আলোচনার প্রতিপন্ন হয়, ঐ অধ্যায়ের অন্তর্গত বিধি-বিধান-সমূহ—প্রাচীন হিন্দুর ব্যবহার-শাস্ত্রের অনুসারী। পণ্য-দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের অধিকার এবং পদ্ধতি-সংক্রান্ত ঐ অংশ আজোচনা করিলে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়; আর বুঝা যায়,—চুক্তি বিধরক সূত্রাবির বিধান তাহার ভিত্তিহীন। বাহ্য-অংশে সে বিহিত বিধি এখানে উল্লিখিত হইল না। Vide, Indian Contract Act, Chap. VII.

অভ্যাজ্ঞ বিধান-প্রসঙ্গে বাজবন্দ্য বলিয়াছেন,—ক্রয় কিংবা উপভোগের প্রমাণ দিয়া দ্রব্যস্বামী নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্য নিজের বলিয়া সপ্রমাণ করিবেন। তিনি যদি এরূপ প্রমাণদানে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার দাবীকৃত দ্রব্যের একপঞ্চমাংশ অর্থদণ্ড হইবে। রাজাকে না জানাইয়া দ্রব্য কি প্রকারে দ্রব্য গ্রহণ করিলে ষোল পঞ্চদশের বিধি। বিষ্ণু-সংহিতায়ও এতদধিকার বিধান দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু বলিয়াছেন (পঞ্চম অধ্যায়, ১৫২ম—১৬১ম শ্লোক দ্রষ্টব্য),—“অজ্ঞানানঃ প্রকাশঃ যঃ পরদ্রব্যং ক্রীণীয়াৎ তত্র তত্তাদোষঃ ॥ স্বামী দ্রব্য-মাগ্নুয়াৎ ॥ সত্তপ্রকাশং হীনমূল্যঞ্চ ক্রীণীয়াৎ তদা ক্রেতা বিক্রেতা চ চোরবচ্ছাত্তে ॥” প্রকাশভাবে পরদ্রব্য ক্রয় করিলে, ক্রেতার কোনও দোষ হয় না। দ্রব্য নির্ণীত হইলে দ্রব্যস্বামী তাহা প্রাপ্ত হইবেন। অর্থাৎ,—এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির দ্রব্য অপহরণ করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিল। বিক্রেতা উপস্থিত হইলে বা চোর ধরা পড়িলে, ক্রেতা তৃতীয় ব্যক্তি দণ্ডগ্রস্ত হইবেন না। দ্রব্যস্বামী সে দ্রব্য ফিরিয়া পাইবেন, বিক্রেতা চোরের নিকট ক্রেতা টাকা ফিরাইয়া পাইবেন। কিন্তু যদি অপ্রকাশভাবে ও হীনমূল্যে ঐ অপহৃত দ্রব্য ক্রয় করা হয়, তাহা হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই দণ্ড হইবে। সে ক্ষেত্রে বিক্রেতা দ্রব্য হইলেও ক্রেতা মুক্তি পাইবেন না। * রাজনিয়োজিত শুদ্ধাধিকারী প্রভৃতি যদি অপহৃত বা নষ্ট দ্রব্য আহরণ করিয়া রাজ-ভাণ্ডারে স্থাপন করেন; তাহা হইলে ধনস্বামী উপযুক্ত প্রমাণাদি দিয়া এক বৎসরের মধ্যে উহা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু ঐ সময় অতীত হইলে সে দ্রব্যে তাঁহার কোনও অধিকার থাকিবে না। প্রনষ্ট বা দ্রব্য অস্বামিক দ্রব্য লাভ সম্বন্ধে গোতমও অমরুপ বিধান বিহিত করিয়াছেন।

* এতদংশে বর্ণিত বিধান-সমূহ চোরাই মাল গ্রহণের (Receiving stolen property) বিধানের অন্তর্গত। প্রাচীন বিধান অনুসারে চোরাই মাল গ্রহণকারী বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিতে পারিলেই মুক্তি লাভ করিতেন; তাঁহার প্রতি কোনও দণ্ডের আদেশ হইত না। কিন্তু আধুনিক দণ্ডবিধি আইনের (The Indian Penal Code) বিধানমতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই চৌধাপরাধে দণ্ডগ্রস্ত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এতৎ-সংক্রান্ত দণ্ডবিধি আইনের বিধান নিয়ে উদ্ধৃত হইল; যথা,—“Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine, or with both,” Sec. 411, “Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, the possession whereof he knows or has reason to believe to have been transferred by the commission of dacoity, or dishonestly receives from a person whom he knows or has reason to believe to belong or to have belonged to a gang of dacoits, property which he knows or has reason to believe to have been stolen, shall be punished with transportation for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.”—Sec. 412, এতদ্ব্যতীত দণ্ডবিধি আইনের ৪১৩ ও ৪১৪ ধারায় চোরাই মাল গ্রহণের এবং চোরাই মাল বিক্রয়ে সহায়তার দণ্ড দণ্ড বিহিত হইয়াছে।
 Vide, The Indian Penal Code.

অস্বামিক দ্রব্য পাইলে মমূর বিধানে সেই সংবাদ যেমন রাজসমীপে জ্ঞাপন করার বিধি বিহিত আছে, গৌতমের বিধানেও সে বিধি বিধিবদ্ধ হইরাছে। গৌতম বলিয়াছেন,—

প্রণষ্টমস্বামিকমধিগমো রাজো প্রক্ৰয়ুবিখ্যাপ্য সংবৎসরং রাজো রক্ষ্যমূর্ক-

মধিগন্তচতুর্থং রাজঃ শেবঃ স্বামী ঋকৃগজসংবিভাগ পরিগ্রহাধিগমেমু॥”

অর্থাৎ,—‘কোনও প্রকার অস্বামিক ধন লাভ করিবামাত্রই রাজাকে সংবাদ প্রদান করিবে, রাজাও রাজ্যমধ্যে ঐ ধন-প্রাপ্তির বিষয় ঘোষণা করিবেন এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত আপনার নিকট উহা রাখিবেন। যদি ঐ সময়ের মধ্যে ধনস্বামী স্থির না হয়, তাহা হইলে ঐ সময়ের পর যে ব্যক্তি প্রথমে ধন পাইরাছিল, তাহাকে চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অংশ রাজকোষে গৃহীত হইবে। উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ এবং ক্রয়, বিভাগ অথবা পরিগ্রহ দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তিতে সকলের সমান অধিকার। গৌতম আরও বলিয়াছেন,—চৌর্য্যাকার্য্যে যে সহায়তা করে বা জ্ঞানপূর্ব্বক অত্যায়ে গৃহীত বস্তু গ্রহণ করে, সে চৌরতুল্য দণ্ডীয়। অপরাধের নূনাধিক্য অনুসারে তাহার দণ্ডের বিধান হইবে, প্রণষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে তাহা রক্ষণের জন্য রাজাকে কিঞ্চিৎ শুদ্ধ প্রদান করিতে হইত। বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রূপ শুদ্ধির বিধান ছিল। যথা,—অশ্বাদি একশফ জন্তুতে চারি পণ, মনুষ্যে পাঁচ পণ, মহিষ উষ্ট্র ও গজতে দুই দুই পণ, ছাগ ও মেঘ সম্বন্ধে পণপাদ করিয়া শুদ্ধ প্রদানের বিধি বিধিবদ্ধ হইরাছিল। * কোটিল্যের বিধান অনুসারেও “স্বকরণেন পঞ্চপণিকং দ্বিপদরূপস্ত নিষ্ক্রয়ং দত্তাৎ। চতুষ্পণিকমেকক্ষুরস্ত ; দ্বিপণিকং গোমহিষস্ত ; পাদিকং ক্ষুদ্রপশুনাং ; রত্নসারকন্ত-কৃপানাং পঞ্চকং শতং দত্তাৎ।” ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া অমুতাপ উপস্থিত হইলে, ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহারের ব্যবস্থাও সংহিতাকারগণ বিধান করিয়াছেন। মমূ বলিয়াছেন ; যথা,—

“ক্রীতা বিক্রীয়া বা কিঞ্চিদ্বশ্তেহাশ্রয়শো ভবেৎ। সোহন্তর্দশাহাংতদ্রব্যং দদ্যাদৈবদদীত বা॥

পরেণ তু দশাহস্য ন দদ্যাদ্যপি দাপয়েৎ। আদদানো দদদৈব রাজাঃ দণ্ড্যঃ শতানি যট্।”

অর্থাৎ,—‘ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া যে পশ্চাৎ অমুতাপ করে, সে সেই দ্রব্য দশ দিনের মধ্যে ফিরিয়া দিবে বা ফিরাইয়া লইতে পারিবে। কিন্তু দশ দিন পরে ফিরাইয়া দিতে বা ফিরাইয়া লইতে পারিবে না। যদি কেহ বলপূর্ব্বক সে দ্রব্য ফিরাইয়া দেয় বা ফিরিয়া লয়, রাজা তাহাকে ছয় শত পণ অর্থদণ্ড করিবেন।’ যাজ্ঞবল্ক্যাদিও এইরূপ বিধি বিহিত করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত আরও কতকগুলি বিধান আছে। তাহাও কম কৃতিত্বের নিদর্শন নহে। বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলে ক্রেতা যদি ক্রীত দ্রব্য গ্রহণ না করে, আর রাজোপদ্রবে বা দৈবোপদ্রবে তাহা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে ক্রেতা তাহার ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী নহেন। পক্ষান্তরে, ক্রেতা ক্রীত দ্রব্য গ্রহণ করিতে চাহিলে বিক্রেতা যদি তাহা প্রদান না করে, আর রাজ বা দৈব উপদ্রবে তাহা নষ্ট হয় ; সে

শাস্ত্রোক্ত এ বিধান ষোড়শ-সম্পর্কীয় বিধির অনুরূপ। পশু হিসাবে শুদ্ধের হার নির্দিষ্ট আছে। গো-মহিষাদি পশু রাজকীয় ধোয়ারে (Pound) আবদ্ধ হইলে, তাহা ছাড়াইয়া লইবার সময় প্রকৃত স্বামীকে সেই শুদ্ধ ষোড়শরূপক প্রদান করিতে হয়। প্রাচীন কালের ব্যবহার বিধানই যে আধুনিক বিধি-ব্যবহার ভিত্তিস্বামী, কোটিল্যাদির ব্যবহার আলোচনার তাহা মনে হয়।

অল্প বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। ক্রেতা তাঁহার প্রদত্ত মূল্য ফিরিয়া পাইবেন। এতদ্ব্যতীত এক জনের নিকট বিক্রীত দ্রব্য বিক্রেতা যদি অপরের নিকট বিক্রয় করে এবং সদোষ দ্রব্য নির্দোষ বলিয়া দেয়, তাহা হইলে সে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের দ্বিগুণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। সাধারণ দোষ, উপনিপাত ও অবিষয়—কোটিস্যের মতে পণ্যদোষ এই তিন প্রকার। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য পণ্যের দোষ বিষয়ে কোনও প্রকার-ভেদ নির্দেশ করেন নাই। অস্ত্রাশ্রয় বিষয়ে সংহিতাদিতে যে ব্যবস্থা আছে, কোটিয়াও সেইরূপ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্যে বিক্রয়াদি সম্বন্ধে এক বহুবিস্তৃত বিধি বিধিবদ্ধ আছে। তাঁহার আলোচনার প্রাচীন-কালের ক্রয়-বিক্রয়াদি প্রণালী সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। বিক্রত দ্রব্য-বিক্রয়-প্রসঙ্গে শাস্ত্রকারগণ কঠোর বিধি-বিধান-সমূহ ব্যবস্থিত করিয়া-
ভেজাল বিক্রয়। ছেন। তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের সকলেরই এক অভিমত। বিক্রত দ্রব্য

বিক্রয় যে পরকালে পাপজনক এবং ইহকালে দণ্ডনীয়, সকলের উক্তিভেদেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। মহু বলিয়াছেন,—‘এক দ্রব্য অল্প দ্রব্যে মিশাইয়া বিক্রয় করিবে না। অসার দ্রব্যকে সার বলিয়া বিক্রয় করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যাহা দিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তাহার ন্যূন দিবে না। দূরে বা লুক্কায়িত অবস্থায় কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। “ন’শ্রদন্তেন সংস্কটরূপং বিক্রয়মর্থতি। ন চাসারং ন চ ন্যূনং ন দূরে ন তিরোহিতম্॥” এতৎসংক্রান্ত ব্যবস্থা বিধানে যাজ্ঞবল্ক্য দ্রব্যজাতের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—‘ঔষধ, স্তূত-তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য, লবণ, কুঙ্কমাদি গন্ধ, ধাতু, গুড় প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করিলে যোগ পণ দণ্ড হইবে।’ * যাজ্ঞবল্ক্যের মতে তাই—

“ভেষজ-স্নেহ-লবণ-গন্ধ-ধাতু-গুড়াদিষু।

পণ্যেষু প্রক্ৰিপনু হীনং পণানু দাপান্ত বোড়শঃ ॥’

বিষ্ণুর বিধানেও ভেজাল-বিক্রয় এবং পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি করা দণ্ডনীয়। তাঁহার মতে—যে তুলাদণ্ড বা স্রোণপ্রস্থাদি মানবস্ত্র নানাধিক করে এবং নকল জিনিষ আসল বলিয়া বিক্রয় করে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। অকুট দ্রব্য কুট বলিয়া উল্লেখ করিলে এবং কুট দ্রব্য অকুট বলিয়া বিক্রয় করিলেও সেইরূপ দণ্ডের বিধান।’ কোটিয়াও ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় করা সম্বন্ধে নিবেদাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারও মতে প্রতারণা সহকারে মন্দ দ্রব্য ভাল

* সংহিতোক্ত ভেজাল প্রভৃতির এসম্বন্ধে আলোচনার বুঝা যায়, প্রাচীন ভারত ব্যবহার-বিষয়ে কত উন্নত এবং তাহার অভিজ্ঞতা কত অধিক ছিল। ভেজাল নিবারণ করে তুলনার মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে ইংরেজ-রাজ ভেজাল-বিষয়ক বিধি প্রবর্তিত করিয়াছেন। কিন্তু সে বিধি ভারতবর্ষে বহু পূর্বে প্রচলিত ছিল, কোটিস্যের অর্থশাস্ত্র ও সংহিতাদি গ্রন্থের আলোচনার তাহা প্রতিপন্ন হয়। কম ওজন দেওয়া বা কম ওজনে বিক্রয় করা দণ্ডনীয়। এ বিধি ইংরেজ-রাজ আমলে প্রবর্তিত আছে বটে; কিন্তু প্রাচীন ভারতের বিধি তত্তুলনার বে বহু পূর্ববর্তী তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। পূর্ণ-পরিপাতি না ঘটিলে এত বিভিন্নস্বামী হস্ত-বিধানের প্রবর্তনা সম্ভবপর নহে। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-গবেষণা বিগত-প্রসারী এবং বহুমুখী ছিল, এতদ্যালোচনার তাহা প্রতিপন্ন হয়। ভেজাল বিষয়ক বিধান সম্বন্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৭২—২৭৫ ধারা প্রযুক্ত। Vide, Indian Penal Code, Sects. 272—275.

বলিয়া দ্রব্য ক্রয় করিয়া দণ্ডীয়া । এতদ্ব্যতীত অর্থশাস্ত্রে ও স্থতিগ্রন্থে আর একটি বিধি দৃষ্ট হয় । তাহা তুলাদণ্ডাদি-সংক্রান্ত । যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—তুলাদণ্ড, শাসনপত্র ও দ্রোণশ্রী প্রভৃতি মান এবং মুদ্রাচিহ্নিত নিকাদি যে ব্যক্তি কুট করে এবং যে ব্যক্তি ঐ সকল কুট দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহার উক্ত মহাস দণ্ড হইবে । ভেজাল প্রভৃতি সম্বন্ধে এবং পরিমাপের ভারতম্য বিষয়ে মহামতি কোটীলা যে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

“তুলামানাতামতিরিক্তাভ্যাং ক্রীড়া হীনাভ্যাং বিক্রীগানস্ত ত এব দ্বিগুণা দণ্ডাঃ ।
গণপণোদষ্টভাগং পণ্যমূলোদপহরতষ্মবল্লবতিদণ্ডঃ । কাষ্ঠলোহমণিময়ং রজ্জুচর্ম্মমুদ্রমং
স্বরস্করোমময়ং বা জাতামিত্যজাতাং বিক্রয়াদানং নয়তো মূল্যাষ্টগুণো দণ্ডঃ ।
সারভাগমিত্যসারভাগং, তজ্জাতমিত্যতজ্জাতং, রাধায়ুক্তমুপধিমুক্তং সমুৎপরিবর্ত্তিমং বা
বিক্রয়াদানং নয়তো হীনমূল্যং চতুষ্পঞ্চাশৎপণো দণ্ডঃ । পণমূল্যং দ্বিগুণো দ্বিপণমূল্যং
দ্বিশতঃ । তেনার্যবুদ্ধৌ দণ্ডবুদ্ধির্বাখ্যাতা । কাকশিল্লিনাং কর্ম্মগুণাপকর্ম্মমাজীবং বিক্রয়ং
ক্রয়োপধাতং বা সমুৎপন্নমুখাপন্নতাং সহস্রং দণ্ডঃ । বৈদেহকানাং বা সমুৎপন্নপণ্যমবরুদ্ধ-
তামনর্থেণ বিক্রীণতাং ক্রীণতাং বা সহস্রং দণ্ডঃ । তুলামানান্তরমর্ষবর্ণান্তরং বা ধরকস্ত
মাপকস্ত বা পণমূল্যাদষ্টভাগং হস্তদোষেণাচরতো দ্বিশতো দণ্ডঃ । তেন দ্বিশতোত্তরা দণ্ড-
বুদ্ধির্বাখ্যাতা । ধাতুস্নেহকারলবণগন্ধভৈষজ্যদ্রব্যানাং সমবর্ণোপধানে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ ।”

ক্রয়কালীন যে ব্যক্তি ওজনে অধিক পরিমাণ লইয়া বিক্রয় কালে কম ওজনে বিক্রয় করে, ক্রীত ও বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের দ্বিগুণ তাহার অর্থদণ্ড হইবে । গণপণ্য বা সাধারণ পণ্যের অষ্টম ভাগ অপহরণ করিলে, সে পণ্য মূল্য অপহৃত হইবে এবং বিক্রয়কারী ষষ্ঠবতি পণ অর্থদণ্ড প্রদান করিবে । হীনমূল্য কাষ্ঠ লোহ বা মণিময় দ্রব্য, রজ্জু চর্ম্ম বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্য, সূত্র বস্ত্র বা রোমময় পণ্য, অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্ত তাহার কৃত্রিম উৎকর্ষ সাধন করিলে, তত্ত্বং-দ্রব্যের মূল্যের আট গুণ অর্থদণ্ড হইবে । এতদ্ব্যতীত সার দ্রব্যকে অসার করিলে এবং অসার দ্রব্য সার বলিয়া বিক্রয় করিলে দ্রব্যমূল্যের দ্বিগুণ অর্থদণ্ডের বিধি । কৃত্রিম প্রস্তুত কস্তুরিকাদি সারভাগ অথবা পরিবর্ত্তিত মুদ্রিত পেটিকাদি বিক্রয় করিলে চতুঃপঞ্চাশৎ পণ দণ্ড এবং নিম্নলিখিত হারে তাহার দণ্ডনির্ণয় হইবে ; যথা,—এক পণের নূন মূল্যে বিক্রয়াদি করিলে পঞ্চাশৎ পণ, এক পণের মূল্যে উহা করিলে শত পণ, দুই পণ মূল্যে উহা বিক্রয় করিলে দ্বিশত পণ দণ্ড হইবে । ইহার অতিরিক্ত মূল্যে করিলে উক্ত রীতি অনুসারে দণ্ডেরও বৃদ্ধি হইবে । একদ্রব্য বণিকবৃন্দ রাজনিক্রপিত মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা কাক ও শিল্লিগণের কষ্ট প্রদান করিলে তাহাদের সহস্র পণ দণ্ড হইবে । কাককর ও শিল্লিকর অপকৃষ্ট দ্রব্য উৎকৃষ্ট করিয়া বিক্রয় করিলে, তাহাদেরও সহস্র পণ দণ্ড । দ্রব্য পরিমাপের সময় হস্তকোশলে ওজনের ভারতম্য সাধন করিলে পরি-
মাপিত এবং পরিমাপের দুই শত পণ হিসাবে দণ্ড হইবে । ধাতু, স্নেহ, কার, লবণ, ভৈষজ্য-
প্রভৃতি দ্রব্য ভেজাল মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিলে বিক্রয়কারীর দ্বাদশ পণ দণ্ডের বিষয় অর্থ-
শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে । ভেজাল প্রভৃতি সংক্রান্ত আলোচনার বুঝা যায়, প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-গবেষণা বহুব্যাপী ছিল । তাহা না হইলে এত বিভিন্ন বিষয়বিশী জ্ঞানের স্মৃতি কদাচ

সম্ভবপর হইত না। তৎকালীন প্রজা-সাধারণের স্বাধ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি রাজপুরুষগণের যে বিশেষ দৃষ্টি ছিল, এতদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। দেশে গণ-স্বৈর্যের মূল্য অথবা বৃদ্ধি হইলে, প্রকৃতিপুঞ্জের পীড়া জন্মিতে পারে—এই আশঙ্কার, প্রাচীন-কালে রাজা গণ্য-স্বৈর্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতেন। রাজনির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বর্দ্ধিত মূল্যে গণ্যাদি বিক্রয় করিলে গণ্যাব্যবসায়িগণ রাজদ্বারে দণ্ডণীয় হইতেন।* প্রজাসাধারণের স্বাধ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে এতাদৃশ প্রয়াস যে আদর্শ-রাজ্যের একতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারত জগৎ সমক্ষে সে মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; আর সেই আদর্শে অমুপ্রাণিত হইতে জগৎকে উপদেশ দিয়াছিল। তাই তাহার ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, জ্ঞান-গবেষণা, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির মহাবদর্শনে জগৎ আজি বিষয়-বিমুক্ত;—তাহার নিকট অবনত মস্তক।

* এতৎসম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যাদির অভিমত উল্লেখ-যোগ্য। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—“রাজা প্রত্যহ পরিদর্শন পূর্ব্বক যেকণ মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিবেন, প্রত্যহ তদনুসারে ক্রয়-বিক্রয় হইবে।...রাজা গণ্যের প্রকৃত মূল্য এবং আনয়নাদি ব্যয় হিসাব করিয়া এইরূপ মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিবেন, যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতি না হয়। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়, (দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৪ম ও ২৭৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) এতদ্বিধের নিম্নরূপ বর্ণনা-দৃষ্ট হয়; যথা,—

রাজনি স্থাপ্যন্ত যোষ্যঃ প্রত্যহং তেন বিক্রয়ঃ । ক্রয়ো বানিঃপ্রবত্তমাদিগিণাঃ লাভকুং শ্রুতঃ ॥

গণ্যস্তোপরি সংস্থাপ্য ব্যয়ঃ পণ্যমমুত্তবম্ । অযোঁৎসুগ্রহকুং কাব্যঃ ক্রেতৃর্কিজৈতুরেব চ ॥”

বিষ্ণু-সংহিতায়ও রাজা কর্তৃক গণ্য-মূল্য-নির্দেশের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। যদ্বৎ এতৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

“আগমং নির্গমং স্থানং তথা বৃদ্ধি ক্ষয়বুভৌ । বিচার্য্য সর্বপণ্যানাং কারয়েৎ ক্রয়বিক্রয়ো ॥

পক্ষরাশৌ পক্ষরাশৌ পক্ষে পক্ষেহথবা গতে । কুবীত চৈবাপ্রত্যক্ষমর্থসিংহাপনং মৃগঃ ॥

তুলামানঃ প্রতিমানঃ সর্বকি ত্রাং হুলক্ষিতম্ । ঘটং ঘটং চ মাসে পুনরেব পরীক্ষয়েৎ ॥

(যদুসংহিতা, অষ্টম অধ্যায়, ৪০১ম—৪০২ম শ্লোক) ।

মহুর উদ্ভিঙেও বুঝা যায়, গণ্যস্বৈর্যের মূল্য নির্ধারণ রাজা করিয়া দিবেন আর পাঁচ দিন বা এক পক্ষ অন্তে মূল্যোত্তরণের সমক্ষে উহার বাজার দর নির্ণয় করিবেন। তুলামান, প্রতিমান প্রভৃতি ওজনের ত্রব্য রাজা স্থির করিয়া দিবেন এবং প্রতি ছয় মাস অন্তর তাহা পরীক্ষা করিবেন। এতৎকালীন নিষিদ্ধ ত্রব্য বিক্রয় সাহিত্য-মতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ নিষিদ্ধ-ত্রব্য বিক্রয় করিলে ক্রয়কারীর সমস্ত ত্রব্য রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হইবে। যথা—“রাজবিনিষিদ্ধঃ বিক্রীণতন্তদপহারঃ ॥”

বিবাহাদি বিষয়ে এক কন্ডা দেখাইয়া অপর কন্ডা সম্প্রদান সে সময়ে দণ্ডণীয় ছিল। যদ্ব বলিয়াছেন,—

“যন্ত দোষবতীঃ কন্ডামনাথায় প্রযচ্ছতি । তন্ত কুর্য্যাম্নাপোদন্তং যমঃ বরংবতিঃ পণান্ ॥”

শাস্ত্রোক্ত এই সকল বিধানের আলোচনার পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, প্রাচীন-কালে ভেজাগাদি বিক্রয় অত্যধিক মাত্রায় প্রচলিত ছিল। আর প্রভারণ্য-প্রবন্ধনা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শাস্ত্রকারগণের বিধান-সমূহ হইতে তাহাদের দূরদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। ভবিষ্যকালে ধর্ম্মহানির আশঙ্কার তাহার পূর্ব্ব হইতেই বিধি-নিষেধ-সমূহের প্রবর্ত্তনার সে পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। মানুষের ধর্ম্মজ্ঞানভ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে নানা ক্রমচার বিক্ষোভেরের অমুঠান হওয়া সম্ভবপর। তদ্বিবারণকল্পে তাহাদের এই সকল বিধি-বিধান প্রযুক্তি হইয়াছিল। ত্রিকালদর্শী—তাহারা। কলিতে ধর্ম্মহানির বিষয় তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাহা উপলব্ধি করিয়াই তাহারা ধর্ম্মহানিকর অবস্থা-নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

সংহিতা-গ্রন্থে পূর্বক্রয়াদিকার-সংক্রান্ত বিধি ল্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয় না। ফৌটিল্য যেমন বলিয়াছেন—বাস্ত প্রভৃতি বিক্রয় কালে প্রথমে জ্ঞাতিকে, তার পর প্রতিবেশীকে, তার পর ধনিককে

পূর্ব-
ক্রয়াদিকার।

বাস্তক্রয় করিবার জন্ত অহুরোধ করিতে হইবে, মহাদির উক্তিতে সেরূপ

বিধানের উল্লেখ নাই। পরবর্তী ব্যবহারশাস্ত্রধৃত ব্যাস বলেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। ব্যাসের বিধান অনুসারে স্থাবর-সম্পত্তিতে সগোত্রের সমান-অধিকার। সেই জন্ত পরস্পরের সম্মতি না লইয়া সে সম্পত্তি দান-বিক্রয় করা বিধেয় নহে। পরিবার বিভক্তই হউক আর অবিভক্তই হউক, স্থাবর সম্পত্তিতে সপিণ্ডগণের পূর্ব-ক্রয়ের দাবী একইরূপ। দান ও বিক্রয়ে পূর্বক্রয়াদিকারের দাবী সকলেরই সমান। যথা,—

“ন চ স্থাবরশ্চ লঘুত্বশ্চ গোত্রসাধারণশ্চ চ। নৈকঃ কুর্য্যাৎ ক্রয়ং দানং পরস্পরমন্তং বিনা ॥

বিভক্তা অভিবক্তা বা সপিণ্ডাঃ স্থাবরে সমাঃ। একো হনীনঃ সর্বত্র দানাদধমনবিক্রয়ে ॥”

দায়ভাগ-প্রকরণে নিবন্ধকার ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—“একশ্চ দানবন্ধকবিক্রয়াদিকারঃ ইতি বাচ্যং যথেষ্টবিনিয়োগার্থরূপস্য স্বত্বশ্চ জব্যাস্তর ইবাভ্যাগ্যবিশেষাৎ বচনঞ্চস্বামিষ্মেন দ্রুর্ভূত-পুরুষ গোচরবিক্রয়াদিনা কুটুম্ববিরোধাদধর্মজ্ঞাপনার্থনিষেধরূপং ন তু বিক্রয়ান্তনিষ্পত্যর্থং।” এই অংশের টীকায় মিতাকরার নিবন্ধকার বিজ্ঞানেশ্বর বলিয়াছেন,—“স্থাবরে বিক্রয়ে নান্তি কুর্যাদাদিমহুস্তর। ইতি স্থাবরশ্চ কেবল বিক্রয়প্রতিবেদ্যং এবং ভূমি যঃ প্রতি-গৃহীতাত্মাদিবচনে দানপ্রশংসাদর্শনাচ্চ বিক্রয়েহপি কুর্ভব্যে সহিরণ্যমুদকং দত্তা দানরূপেণ স্থাবরবিক্রয়ঃ। প্রকৃতপক্ষে অভিবক্ত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিষিদ্ধ। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিক্রয় না করিলে চলে না, সে ক্ষেত্রে সে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য নাই। পূর্ব-পুরুষার্জিত নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধার করিলে, সে সম্পত্তি উদ্ধার-কর্ত্তার স্বোপার্জিত বলিয়া গণ্য হয়। পুত্রাদির অবর্ত্তমানে তাহা বিক্রয় হইতে পারে। কিন্তু পুত্রাদি বর্ত্তমান থাকিলে স্বোপার্জিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করাও মিতাকরার ব্যবহার মতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা,—

“স্থাবরং দ্বিপদৈকৈব যতপি স্বমমর্জিতম্।

অসম্ভ্রম স্ততান্ সর্বান্ ন দানং ন চ বিক্রম্ ॥”

একমাত্র স্থাবর সম্পত্তি কদাচ দান-বিক্রয় হইতে পারিবে না। কিন্তু আপৎকালে, কুটুম্ব পোষণ জন্ত এবং ধর্ম-সাধনের উদ্দেশ্যে এ বিধি লঙ্ঘন করা যাইতে পারিবে। যথা,—

একোহপি স্থাবরে কুর্যাদাদাদসনবিক্রয়ম্।

আপৎকালে কুটুম্বার্থে ধর্মার্থে চ বিশেষতঃ ॥”

ক্রয়-বিক্রয় আলোচনার সমুদ্র-সমুখান, কর্মকরকর, দাগকর, ভৃত্যকাদিকার প্রভৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। কর্মকর, দাগ, ভৃত্য প্রভৃতি তাহাদের পরিশ্রম-বিক্রয় করিয়া

কর্মকর প্রভৃতি
বিধান।

তাহার বিনিময়ে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। প্রভুর কার্য্য-সম্পাদনে

পরিশ্রম বিক্রয় এবং ভূমিনিময়ে প্রভুর নিকট পারিশ্রমিক গ্রহণ, প্রাচীন-

কালের ব্যবস্থাপকগণ ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাহাদের

এই শ্রেণিবিভাগ এক হিসাবে, ক্রয়বিক্রয় বিষয়ে বিশেষ উপযোগী বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়।

সমুদ্র সমুখান—যৌথ বাণিজ্য বিষয়ক। বণিক সম্প্রদায় কিরূপে একত্রবদ্ধ হইবেন এবং

পৃথিবীর ইতিহাস ।



শত্ৰুঞ্জয়-পর্বতের জৈন মন্দির ।

একত্রবদ্ধ হইয়া কি পদ্ধতি অনুসারে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন করিবেন ; অপিচ, স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্যের আমদানি-রপ্তানি দ্বারা কি প্রকারে স্বদেশের ও স্বজাতির অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি করিবেন ;—সম্ভ্রম-সমুখান প্রকরণে সেই বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কৃষকগণ ও ব্যবসায়ীগণ সকলেই এইরূপ সজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত করিয়া কার্য্য পর্যালোচনা করিতে পারেন। সজ্ঞ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা যে ভাবে কার্য্য-ব্যবস্থা করিবেন, অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। লাভ ও অংশ বিভাগ এবং কার্য্য-পরিচালন বিষয়ে কোটিল্য নিম্নরূপ বিধি নির্দেশ করিয়াছেন,—

“কর্ষকবৈদেহকা বা সমুপগ্যারন্তপর্য্যাবসানান্তরে সন্নস্ত যথাকৃতস্ত কৰ্ম্মণঃ প্রত্যংশং দদ্যুঃ। পুরুষোপস্থানে সমগ্রমংশং দদ্যুঃ। সংদিক্কে তু ধৃতপণ্যে সন্নস্ত তদানীমেব প্রত্যংশং দদ্যুঃ। সামাত্রা হি পথি সিদ্ধিস্চাসিদ্ধিস্চ॥ প্রক্রান্তে তু কৰ্ম্মণি স্বস্থস্থাপক্রমতো দাদশ-পণো দণ্ডঃ। ন চ প্রাকাম্যমক্রমেণ॥ চৌরং ত্তন্নপূর্বে কৰ্ম্মণঃ প্রত্যংশেন গ্রাহয়েদন্ত্যং প্রত্যংশমভয়ং চ। পুনস্তুস্তয়ে প্রবাসমন্ত্রয় গমনে চ। মহাপরাধে তু দ্বয়বদাচরেৎ॥”

সজ্ঞপ্রবিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতি-কার্য্যের লাভালাভ হিসাব করিয়া যে যেরূপ কার্য্য করিয়াছে, তদনুপাতে লাভালাভের অংশ গ্রহণ করিবে। প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিলেও ঐরূপ বিধি। পণ্যজাত বিক্রয় হইয়া গেলে, বিক্রয়লব্ধ অর্থের লভ্যাংশ বণিকগণ আপন আপন অংশ অনুসারে বিভাগ করিয়া লইবেন। আমদানি-রপ্তানি-কালে পণ্যের ক্ষতি হইলে প্রত্যেকে ১৫ ক্ষতির অংশভাগী হইবেন। প্রত্যেকেই সজ্ঞ-সংক্রান্ত যথানির্দিষ্ট আপন-আপন কার্য্য সম্পাদন করিবেন। কোনও অংশীদার সেই নিরূপিত কার্য্য সমাধা না করিয়া চলিয়া গেলে, তাহার প্রতি দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। অংশীদার-গণের কেহ চুরি করিলে তাহার প্রথম দোষের জন্ত সে ক্ষমার। কিন্তু দ্বিতীয় বার ঐরূপ করিলে তাহাকে আর ক্ষমা করা হইবে না। তাহাকে সে জন্য সজ্ঞ বা সমবায় হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবে। সজ্ঞ-সংক্রান্ত গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইলে সে দস্তা-তত্ত্বের মধ্যে পরিগণিত হইবে এবং সেই হিসাবে তাহার প্রতি দণ্ডদানের বিধি বিহিত হইয়াছে। কর্ম্মকরকর্ম্ম প্রভৃতির ব্যবস্থা-বিধানেন কোটিল্য নিম্নরূপ বিধি বিহিত করিয়াছেন ; যথা,—

“গৃহীত্বা বেতনং কর্ম্ম অকুর্ব্বতো ভূতকস্ত দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। সংরোধনচাকরণাৎ। অশক্তঃ কুৎসিতে কর্ম্মণি ব্যাধৌ ব্যাসনে বা অনুশয়ং লভেত। পরেণ বা কারয়িতুম্। তস্ত ব্যয়ং কর্ম্মণা লভেত। ‘ভর্ত্তা বা কারয়ন্তাত্তস্য কারয়িতব্যো মদা বা নাশস্ত কৰ্ত্তব্যাম্’ ইত্যপরে। ভর্ত্তুরকারয়তো ভূতকস্তাকুর্ব্বতো বা দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। কর্ম্মনিষ্ঠাপনে ভর্ত্তুরন্তত্র গৃহীতবেতনো নাসকামঃ কুর্য্যাৎ॥ ‘উপস্থিতমকারয়তঃ কৃতমেব বিদ্বাৎ’ ইত্যচাৰ্য্যাঃ॥ ‘ন’ ইতি কোটিল্যঃ। কৃতস্ত বেতনং, নাকৃতস্তান্তি। স চেদন্নমপি কার-মিহা ন কারয়েৎ। কৃতমেব অন্ত বিদ্বাৎ। দেশকালোতিপাতনেন কর্ম্মণামন্তথা করণে বা ন স কামঃ কৃতমন্তমন্যেত। সম্ভাবিতাদধিকক্রিয়ায়াং প্রয়াসান্মোহং কুর্য্যাৎ॥”

প্রভুর নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিয়া ভূত্য যদি কার্য্যে অবহেলা করে, তাহা হইলে তাহার দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। তবে অশক্ত, কুৎসিত কর্ম্মে নিযুক্ত, পীড়িত বা বিপদ-গ্রস্ত ভূত্যের সম্বন্ধে এ বিধি প্রযুক্ত হইবে না। কার্য্যের উপযুক্ত হইলে প্রভু তাহার দ্বারা

কার্য্য করাইয়া লইবেন। অন্যপক্ষে ভৃত্য যদি কাজ করিবার জন্য স্বীকার করিয়া সাময়িক অসামর্থ্য হেতু কিছু দিনের জন্য কার্য্য স্থগিত রাখিতে বলে; প্রভু তাহা স্থগিত রাখিবেন। সে কার্য্যের জন্য অন্য ভৃত্য নিযুক্ত করা বিধেয় নহে। ভৃত্যও সে কার্য্য সম্পাদন না করিয়া অপর স্থানে চাকুরী গ্রহণ করিতে পারিবে না। ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা কর্ম্ম না করাইলে প্রভুর দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে; আবার ভৃত্য যদি কাজ করিবে বলিয়া স্বীকার করে এবং পরে তৎসম্পাদনে অস্বীকার হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিও ঐরূপ দণ্ডের বিধান। বেতন গ্রহণের পর কার্য্য সমাধা না করিয়া ভৃত্য বা শ্রমজীবী অন্যত্র গমন করিতে পারিবে না। শ্রমজীবী কর্ম্ম করিবার জন্য প্রস্তুত আছে, কিন্তু প্রভু তাহার দ্বারা কর্ম্ম করাইবেন না; এ ক্ষেত্রে শ্রমজীবীর কর্ম্মকাল শেষ হইবে,—আচার্য্য এ বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু কোটীলা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন,—কর্ম্মের জন্যই যখন বেতন নির্দ্ধারিত, তখন কর্ম্ম না করিলে বেতন দেওয়া হইবে কেন? কর্ম্মকর যদি কর্ম্ম-সম্পাদন করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহার দ্বারা আংশিকরূপে কার্য্য করাইয়া প্রভু সে কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারেন— কারণ, দেশ-কাল-স্থান প্রভৃতির অবস্থা আলোচনা করিয়া এবং শ্রমজীবীর যোগ্যতা অযোগ্যতার বিষয় অনুধাবন করিয়া, তাহার কার্য্যে প্রভুর সঙ্কট না হওয়া বিচিত্র নহে; আবার শ্রমজীবী, নিরূপিত কার্য্যের নূনাদিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, প্রভুর ক্ষতি করিতে পারে। সজ্বভৃত্য সম্বন্ধে কোটিল্যের বিধান একটু স্বতন্ত্র। সজ্বভৃত্য বা সমবায়ে নিযুক্ত ভৃত্যগণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব-বর্ণিত বিধি-ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে। তদ্বিন্ন আরও কতকগুলি বিধি কোটীলা বিহিত করিয়াছেন।

“তেন সজ্বভৃত্য ব্যাখ্যাভাঃ। তেষামাধিসপ্তরাত্রমাসীৎ। ততোহনুমপ-
স্থাপয়েৎ। কর্ম্মনিপ্পাকং চ। ন চানিবেত্ত তত্সূসজ্বঃ কিঞ্চিৎপরিহরেৎ, অপ-
নয়েদ্বা। তস্মাত্তিক্রমে চতুর্কিংশতিপণো দণ্ডঃ। সজ্বেন পরিহৃতস্তাদর্শদণ্ডঃ॥

সজ্বভৃত্যাসম্বন্ধসমুখ্যাতারো বা যথাসম্ভাবিতং বেতনং সমং বা বিভজেরন॥”

সজ্বভৃত্যগণ নিরূপিত সময়ে কার্য্য-সম্পাদনে অসমর্থ হইলে, আরও সপ্ত রাত্রি তাহা-
দিগকে ঐ কার্য্য সম্পাদন জন্ত সময় দিবার নিয়ম। সপ্তরাত্রি সময় পাইয়াও যদি তাহার
সে সময়ের মধ্যে কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার অল্প লোক
নিযুক্ত করিয়া সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে। প্রভুর অনুমতি ব্যতীত তাহার
কর্ম্মস্থান হইতে কোনও দ্রব্য স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না, কিংবা কার্য্য অসম্পূর্ণ
রাখিয়া চলিয়া যাইবে না। শেষোক্ত বিধির অন্তর্গত তাহাদের প্রতি দ্বাদশ পণ এবং
পূর্ব্বোক্ত বিধির অন্তর্গত চতুর্কিংশতি পণ দণ্ডের বিধান বিহিত হইয়াছে। যেক্ষেপে কর্ম্মকরের
বেতনাদি নির্দেশ করিতে হইবে, তৎসংক্রান্ত কোটিল্যের বিধি নিয়ে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“কর্ম্মকরস্ত কর্ম্মসম্বন্ধমাসন্ন্য বিদ্যাঃ। যথাসম্ভাবিতং বেতনং লভেত। কর্ম্মকালানু-
রূপমসম্ভাবিতবেতনম্। কর্ম্মকসমুত্তানাং, গোপালকসূসর্পিণাং বৈদেহকঃ পণ্যা-
নামান্ননা ব্যবহৃতানাং, দশভাগমসম্ভাবিতবেতনো লভেত॥ সম্ভাবিতবেতনস্ত
যথাসম্ভাবিতম্॥ কার্শ্মশ্লিকুশীলবচিকিংসকবাগ্জীবনপরিচারকাদিরাশাকারিক-
বর্গস্ত যথাহস্তত্ববিধঃ কুর্ঘ্যাৎ, যথা বা কুশলাঃ কল্পয়েয়ুঃ তথা বেতনং লভেত

সাক্ষিপ্রত্যয়মেব স্তাৎ। সাক্ষিগামভাবে যতঃ কৰ্ম ততোহমুযুক্তীত ॥ বেতনা-

দানে দশবন্ধো দণ্ডঃ। ঘটপণো বা। অপব্যয়মানে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ পঞ্চবন্ধো বা ॥

ভূত্যের বেতনাদি নির্ধারণ-কালে প্রভু প্রতিবেশিগণকে আহ্বান করিবেন। প্রতিবেশিগণ বেতনাদি বিষয়ক চুক্তির বিষয় অবগত থাকিবেন। ভৃত্য নির্দিষ্ট বেতনের অতিরিক্ত বেতন পাইবে না। পরস্পর স্বীকার-নিষ্পত্তিতে যে বেতন ধার্য্য হইবে, ভৃত্য তদপেক্ষা অতিরিক্ত বেতনের দাবী করিলে দণ্ডণীয় হইবে। কিন্তু যেখানে বেতনাদি নির্দিষ্ট থাকিবে না, সে ক্ষেত্রে তৎকালপ্রচলিত হার-পরিমাণে কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব বুঝিয়া তাহার কার্য্যকালের বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে। অত্থায়, কৃষক তাহার উৎপাদিত শস্যের দশমাংশ গ্রহণ করিবে; গোপালক দুগ্ধোৎপন্ন স্তূত-মাখনাদির দশমাংশ এবং বণিকগণের প্রতিনিধি তাহাদের বিক্রীত পণ্যের দশমাংশ প্রাপ্ত হইবে। শিল্পী, বাগ্গকার, গায়ক, চিকিৎসক, পরিচারক প্রভৃতি তাহাদের সমব্যবসায়িদিগের দ্বায় কার্য্যানুরূপ বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবে। আর তাহাদের সহিত বেতন সম্বন্ধে কোনও চুক্তি না থাকিলে কুশলজ্ঞগণ যেরূপ বেতন নির্দেশ করিয়া দিবেন, তাহারা সেই নির্দিষ্ট বেতন পাইবার অধিকারী। কিন্তু বেতন সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিলে সাক্ষিগণের কথায় বিশ্বাস করিয়া বেতন নির্দিষ্ট করা বিধেয়। সাক্ষীর অভাবে, ভূত্যের কার্য্যের পরিমাণ অনুসারে তৎকাল-প্রচলিত এবং তৎকার্য্যোপযোগী বেতনের হার-পরিমাণে বেতন নির্দিষ্ট করিবে। বেতন প্রদান না করিলে প্রভুর দশ পণ কিংবা ছয় পণ অর্থদণ্ড হইতে পারে। শঠতা সহকারে বেতন অস্বীকার করিলে তাঁহার দ্বাদশ পণ বা পঞ্চবন্ধ দণ্ড হইবে। কৃষকগণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যদি সে কার্য্য-সম্পাদনে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে সে কৃষকের বেতনের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইবে। দূরদেশাগত কৃষকের সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে এইরূপ বিধি বিধিবদ্ধ আছে;—বেতনের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড ব্যতীত তাহার খাদ্য-পানীয়ের দ্বিগুণ মূল্য দণ্ড-স্বরূপ তাহাকে প্রদান করিতে হইবে। উৎসবাদি কার্য্যে নিযুক্ত এইরূপ ভৃত্য কার্য্য-সম্পাদনে পরাজুথ হইলে তাহার বেতনের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হয়; আর সে অর্থ অনহিতকর অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে কোটিল্যের উক্তি; যথা,—

“কৰ্ষকস্ত গ্রামমভ্যাপেত্যাকুৰ্ব্বতো গ্রাম এবাতায়ং হরেৎ। কৰ্ম্মাকরণে

কৰ্ম্মবেতনাদ্বিগুণং হিরণ্যদানং প্রত্যংশদ্বিগুণং ভক্ষ্যপেয়দানে চ

প্রহবণেয়ু দ্বিগুণমংশং দত্তাৎ। প্রেক্ষায়ামনংশদঃ স্ব-স্বজনো ন প্রেক্ষেত।

প্রচ্ছন্নশ্রবণেক্ষণে চ সৰ্বহিতে চ কৰ্ম্মণি নিগ্রহেণ দ্বিগুণমংশং দত্তাৎ।”

সমুদ্র-সমুখান, বেতনাদান, ভৃত্যাদিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে কোটিল্য যে সকল বিধি-বিধান প্রবর্তিত করিয়াছেন, স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধান প্রায়ই তদনুরূপ। সমুদ্র-সমুখান প্রকরণে

সংহিতার
মতে।

কোটিল্য যেমন সজ্বভুক্ত বণিকদলের লাভালাভ হিসাবে এবং পরিশ্রম

অনুসারে লাভালাভ ও পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, সংহিতা-

শাস্ত্রেও ততৎসংক্রান্ত বিধি প্রায় একইরূপঃদৃষ্ট হয়। সমুদ্র বিধান মতে

যে ভৃত্য অস্থ অবস্থায় অঙ্গীকৃত কার্য্য সম্পন্ন করে না, রাজা তাহাকে আট কঙ্কল দণ্ড করিবেন, আর সে কিছুমাত্র বেতন পাইবে না। এতৎসংক্রান্ত বিশেষ বিধির

উল্লেখ্য মন্ত বলিয়াছেন,—যদি সে ভৃত্য যথার্থ পীড়িত হয় এবং আরোগ্য লাভের পর অঙ্গীকৃত কার্য সমাধা করে; তাহা হইলে সে অনেক দিন পীড়িত অবস্থার থাকিলেও সে আরও কাল হইতে কার্য-সমাধা কাল পর্যন্ত সমস্ত সময়ের বেতন পাইবে। এতদ্ব্যতীত পীড়িত ও সুস্থ উভয় অবস্থায়ই যদি সে অপরের দ্বারা প্রভুর কার্য সম্পন্ন করাইয়া দেয়, তাহা হইলেও সে সম্পূর্ণ বেতন পাইবার অধিকারী। কিন্তু সে কার্যের যদি অল্পমাত্রাও অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আর তাহাকে বেতন দেওয়া হইবে না। এতদ্বিষয়ে মহাসংহিতার উক্তি,—

“ভৃত্যো নার্ত্তো ন কুর্যাদ্ভ্যো দৰ্পাৎ কৰ্ম্ম যথোদিতম্। স দত্তাঃ কৃষ্ণলাভ্যে ন দেয়ঞ্চাস্য বেতনম্॥

আন্তস্ত কুর্য্যাৎ স্বহঃ সন্ যথাভাবিতমাদিতঃ। স দীৰ্ঘদ্যাপি কালস্য তন্ত্রভেদৈব বেতনম্॥

বথোক্তমার্ত্তঃ স্বহো বা যন্তং কৰ্ম্ম ন কারয়েৎ। তস্য বেতনং দেয়মন্নানস্যাপি কৰ্ম্মণঃ॥”

বাস-সংহিতায় এবং যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি বিধি দৃষ্ট হয়। কোটিল্য বলিয়াছেন, বেতন নির্দ্ধারিত না করিয়া ভৃত্যের দ্বারা কার্য করাইলে তাহার কার্যের প্রকৃতি অনুসারে তৎকাল-প্রচলিত প্রথার অনুসরণে তাহার বেতন নির্দ্ধারিত হইবে। অপিচ, যে যে কার্যে নিযুক্ত থাকিবে, তাহার সেই কার্যের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ প্রদান করা বিধেয়। বাহারা বাণিজ্য বিষয়ে নিযুক্ত, তাহারা লভ্যাংশের দশমাংশ পাইবে; আর যাহারা কৰ্ষণ-কার্যে ব্রতী হইয়া থাকে, তাহারা উৎপন্ন শস্তের দশমাংশ লাভ করিবে। যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানও তদনুরূপ। তিনিও বলিয়াছেন,—“দাপ্যন্ত দশমং ভাগং বাণিজ্যপশুশযাতঃ। অনিশ্চিত্য ভূতিং যন্ত কারয়েৎ স মহীকৃতি।” কিন্তু পণ্যদ্রব্য-সংক্রান্ত ব্যবস্থার যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান একটু স্বতন্ত্র। তাহার মতে, দেশকাল-প্রচলিত মূল্যের অধিক মূল্যে পণ্য-দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ব্যয়বাহুল্যাদি দ্বারা ভৃত্য যদি লভ্যাংশ কमाইয়া ফেলে, তাহা হইলে ধনস্বামী ইচ্ছা করিলে তাহার বেতন দিতেও পারেন, না দিলেও তাহার অপরাধ হইবে না। অতঃপক্ষে, শ্রাব্য ব্যয়-বাহুল্যের পর ভৃত্য যদি অতিরিক্ত লাভ দেখাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে ভৃত্যকে বেতন অপেক্ষা অধিক অর্থ দিতে হইবে। কিন্তু রাজোপদ্রব বা দৈবোপদ্রব নিবন্ধন পণ্য-হানি ঘটিলে ভৃত্য সে ক্ষতি দায়ী হইবে না। এতদ্বিষয়ে বিষ্ণু কহিয়াছেন,—“তদোষণে যদ্বিনশ্চেৎ তৎ স্বামিনে। অতঃ দৈবোপঘাতাৎ॥” তাহার নিজের দোষে যাহা নষ্ট হইবে, সে তাহা ধনস্বামীকে প্রদান করিবে। কিন্তু দৈবোপদ্রবে নষ্ট হইলে, তাহা আর তাহাকে দিতে হইবে না। ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া নির্দিষ্ট-কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে ধনস্বামী যদি তাহাকে ছাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে ভৃত্যকে তিনি চুক্তিবদ্ধ সময়ের সম্পূর্ণ বেতন প্রদান করিবেন; পরন্তু তাহাকে এক শত পণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে। অতঃপক্ষে নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইতেই ভৃত্য কার্য পরিত্যাগ করিলে, তাহার নির্দ্ধারিত বেতন স্বামীকে ফিরাইয়া দিবে এবং শত পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। “স্বামী চেদভুক্তকমপূৰ্ণে কালে জহ্যাৎ তস্য সৰ্বং মূল্যং দত্তাৎ। পণশতঞ্চ রাজনি। অন্যত্র ভূতকদোষাৎ॥” যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায়ও এতদনুরূপ বিধি-বিধান আছে; কোটিল্যও সেইরূপ বিধান বিহিত করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ত্র দণ্ড বিষয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। উৎসবাদি ব্যাপারে নিযুক্ত ভৃত্যের সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা কোটিল্যের বিধানের

অনুরূপ । এরূপ স্থলে কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে, ভৃত্য তাহার বেতনের দ্বিগুণ অর্গ-দণ্ড প্রদান করিবে । অত্ৰা, স্বামী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কার্য্য না করাইলে, ভৃত্যের নিরূপিত বেতনের সপ্তমাংশ প্রদান করিবেন । সম্ভবত্বে ভৃত্যগণ কোনও কার্য্য সম্পন্ন করিলে, কার্য্যের অনুপাত অনুসারে তাহাদিগকে বেতন প্রদান করিবার বিধি, যাজ্ঞবল্ক্য বিহিত করিয়াছেন । “যো যাবৎ কুরুতে কর্ম্ম তাবত্তস্য তু বেতনম্ । উত্তরোরপ্যাসাধ্যাক্ষেৎ সাধ্যং কুর্যাদ্যথাশ্রুতম্ ॥” গৌতম-সংহিতায় এ সকল বিধি দৃষ্ট হয় না । কিন্তু তিনি একটি বিশেষ বিধির অবতারণা করিয়াছেন । ভৃত্য বৃদ্ধ হইয়া কর্ম্মে অক্ষম হইলে প্রভু তাহাকে তাহার বৃদ্ধাবস্থায় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না ; আবার তুর হীনাবস্থায় ভৃত্য তাঁহার ভরণপোষণ করিবে । সম্ভ্রম-সমুত্থান প্রকরণে সংহিতা-শাস্ত্রে বণিকসম্মত-সংক্রান্ত বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে । সে আলোচনায় বণিক-সম্মত সংগঠন সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায় । সম্মত-প্রতিষ্ঠা করিয়া বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্রতী হইলে, প্রত্যেকে তাহাদের প্রদত্ত অংশ অনুসারে লাভ-ক্ষতির অংশভাগী হইবে । কোম্পানীর অন্তর্গত কোনও ব্যক্তি সাধারণের নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া পণ্যের ক্ষতি করিলে, সে ক্ষতি তিনি পূরণ করিয়া দিবেন । অনবধানতা-বশতঃ ক্ষতি করিলেও তৎসম্বন্ধে ঐরূপ বিধি । কিন্তু বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে যিনি রক্ষা করিবেন, তিনি সাধারণ লভ্যাংশের দশমাংশ অতিরিক্ত প্রাপ্ত হইবেন । যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে রাজা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা বিক্রয় করিতে বসিলে রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন । এতৎসংক্রান্ত অত্ৰা বিধি সম্বন্ধে সংহিতাকার বলিয়াছেন,—

“মিথ্যা বদন্ পরীমাণং গুরুস্থানাদপাসরন্ । দাপ্যন্ত্বষ্টগুণং ষষ্ঠ সব্যাক্রয়বিক্রয়ী ॥

তরিকঃ স্থলজং গুরুং গৃহ্নন্ দাপ্য পণান্ দশ । ব্রাহ্মণপ্রতিবেশ্তানামেতদেবানিমন্ত্রণে ॥

দেশান্তরগতে প্রেতে দ্রব্যং দদ্যাদবাক্রবাঃ । জাতয়ো বা হরয়ুত্তদাগতান্তের্বিনা নৃপঃ ॥

জিক্ষং ত্যজ্যেযুর্গীর্ভামশক্যোহশ্বেন কারয়েৎ । অনেন বিধিরাখ্যাত ঋত্বিকর্ষককর্ম্মিণাম্ ॥”

অর্থাৎ,—যে বণিক গুরু-বঞ্চনার্থ পণ্য দ্রব্যের পরিমাণ বিষয়ে মিথ্যা কথা কহে, গুরু-গ্রহণ স্থান হইতে পার্শ্বকর্ত্তন করিয়া পলায়ন করে এবং বিবাদীয় দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করে, তাহাদিগের পণ্য-মূল্যের আট গুণ অর্থদণ্ড বিধেয় । নৌগুরু-গ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি স্থলপথে সংবাহিত পণ্যের গুরু গ্রহণ করেন, তাঁহার প্রতি দশগুণ দণ্ডের ব্যবস্থা ।... সম্ভ্রম বণিকগণের কেহ যদি দেশান্তরে প্রাণত্যাগ করে, সমবেত বাণিজ্যে তাহার যে মূলধন থাকিবে, তাহা তাহার পুত্রাদি, মাতুল, বন্ধু, জ্ঞাতি অথবা কোম্পানীর অপরাপর অঙ্গীদারগণ প্রাপ্ত হইবেন । এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে মূলধন বিভাগ না হইলে পরে রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন । কোম্পানীর অন্তর্গত কোনও ব্যক্তি বঞ্চনা করিলে তাহাকে বহিস্কৃত করিবার বিধি । * কোম্পানীর কেহই যদি ভাণ্ড (গুদাম) বা আর-ব্যয় পরিদর্শন করিতে সমর্থ

* সম্ভ্রম বণিকগণের এই বিধান-সমূহ ‘কোম্পানী-গঠন-সংক্রান্ত’ বিধানে দৃষ্ট হয় । (Indian Companies Act) বৃত্ত বণিকের মূলধন সম্বন্ধে সংহিতাকারগণ যে বিধি বিহিত করিয়াছেন, আজিকালিকার আইনে সে বিধির অনেকটা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । ভারতীয় চুক্তিবিষয়ক আইনে এতৎসংক্রান্ত বিধি বিধিবদ্ধ আছে । তাহা জিন্দাবার ও জিন্দাগ্রহণকারীর সম্বন্ধে প্রযুক্ত ।

না হন, তাহা হইলে অপরের দ্বারা সে কার্য্য সম্পাদনের বিধান, সংহিতাকারগণ বিহিত করিয়াছেন। পণ্যাদি ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে কোটিল্য তৎপ্রণীত অর্থশাস্ত্রের ‘পণ্যাধ্যক্ষ’ ও ‘শুদ্বাধ্যক্ষ’ প্রসঙ্গে বহুবিধ ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে কোটিল্য বলিয়াছেন,—

“শুদ্ধভয়াং পণ্যপ্রমাণং মূলং বা হীনং বৃত্ততত্ত্বতিরিক্তং রাজা হরেৎ। শুদ্ধ-
মষ্টগুণং বা দত্তাৎ। তদেব নিবিষ্টপণ্যস্য ভাণ্ডস্য হীনপ্রতিবর্ণকেনাধ্যাপকধৰ্মে সার-
ভাণ্ডস্য ফলভাণ্ডেন প্রতিচ্ছাদনে চ কুর্যাৎ। প্রতিক্রেতৃভয়া দ্বা পণমূল্যাছপরি মূল্যং
বধর্যতো মূল্যবৃদ্ধিং রাজা হরেৎ, দ্বিগুণং বা শুদ্ধং কুর্যাৎ। তদেবাষ্টগুণমধ্যক্ষস্য
ছাদয়তঃ। তস্মাদ্বিক্রয়ঃ পণ্যানাং ধৃতো মিতো গণিতো বা কার্য্যঃ তৰ্কঃ ফলভাণ্ডা-
নামানুগ্রহীহকাণাং চ। ধ্বজমূলমতিক্রমান্তানাং চাকৃতশুদ্ধানাং শুদ্ধাদষ্টগুণো দণ্ডঃ।”

সংহিতার ও কোটিল্যের বিধি একই প্রকার বলিতে হয়। বিষয়-বিশেষে সামান্য একটু
ইতর-বিশেষ দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ বিশেষ কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। শুদ্ধ প্রদান না করিয়া
শুদ্ধস্থান অতিক্রম করিলে, অথবা পণ্যের পরিমাণের ইতর-বিশেষ করিলে দণ্ডের বিধি উভয়ই
বিহিত হইয়াছে। আর সে দণ্ডের পরিমাণও অভিন্ন—অষ্ট পণ নির্দিষ্ট। শুদ্ধাধ্যক্ষ শুদ্ধাদির
বিষয় গোপন করিলে, তাঁহার প্রতিও দণ্ডের আদেশ হইয়াছে। অধিক সংখ্যক ক্রেতার সমাগম
হইলে বণিকগণ যদি পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দণ্ডের বিধান ছিল।
সে দণ্ডের কোনও পরিমাণ নির্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু রাজা ইচ্ছা করিলে সমুদায় পণ্য রাজকোষে
গ্রহণ করিতে পারিতেন। উৎকৃষ্ট পণ্যের উপরিভাগ নিকৃষ্ট পণ্যে আবৃত করিয়া শুদ্ধ-ব্রাহ্মণের
চোষ্টা করিলে তাহার দণ্ড হইত। বাহা হউক, এই সকল বিধি-বিধানের আলোচনার বেশ বুঝা
যায়, কোটিল্যের সময়ে এবং স্থতিশাস্ত্রাদির প্রবর্তনা-কালে জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি
রাজার এবং রাজপুরুষগণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বণিকগণ বা ব্যবসায়িবৃন্দ পণ্যের মূল্য
অথবা বৃদ্ধি করিয়া সাধারণের পীড়া না জন্মাইতে পারেন, দেশপতি সম্রাট তাহার
বিধান করিতেন। রাজা স্বয়ং পণ্যদ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মূল্যাদি উপযুক্ত
মত নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। নিরূপিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে পণ্যাদি বিক্রয়
করিলে রাজা পণ্য-বিক্রেতৃগণের দণ্ড-বিধান করিতেন। বিক্রয় দ্রব্যে প্রবঞ্চনা প্রতারণা
না হয়, তৎপ্রতিও রাজার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। যেরূপ ওজন ও যেরূপ পরিমাপ প্রচলিত
হইলে প্রজাসাধারণের অসুবিধা ও কষ্ট না হয়, রাজা তাহার বিধান করিয়া দিয়াছিলেন।
বিশেষজ্ঞগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি ওজন-পরিমাপাদির বিষয় নির্দ্ধারিত করিতেন।
কৃত্রিম দ্রব্যের সংমিশ্রণে অকৃত্রিম দ্রব্য বিকৃত হইয়া যায়; আর তাহাতে দেশের স্বাস্থ্য-
হানির সম্ভাবনা। সেই জন্য ভোজ্য-সংক্রান্ত নানা বিধি-নিষেধের প্রবর্তনা। কৃত্রিম
দ্রব্য অকৃত্রিম বলিয়া বিক্রয় এবং অকৃত্রিম দ্রব্য কৃত্রিম বলিয়া ঘোষণা করা, তাই রাজ-
বিধানে দণ্ডনীয় ছিল। দাসকর্ম, কর্ম্মকর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতির উল্লেখও জনহিতকর বিধি-
বিধানের অবতারণা। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের বিধি-নিষেধ-সমূহ
সর্বসাধারণের মঙ্গল-কামনায় এবং দেশের হিতসাধন-কল্পে প্রবর্তিত হইয়াছিল। আর,
বাণিজ্য-বিষয়ে ভারতবর্ষ যে প্রাচীনকালে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাও প্রতিপন্ন

হয়। অথ শাজ্জ হইতে বুঝা যায়, খৃষ্ট-জন্মের তিন শত বৎসর পূর্বেও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্যে ভারতবর্ষ বিশেষ লাভবান হইয়াছিল। স্বদেশীয় নানাবিধ শিল্প তৎকালে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অথ শাজ্জের অন্তর্গত ‘শুল্কধক্ষ’ ও ‘পণ্যধক্ষ’ প্রভৃতির আলোচনায় তাহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। উহা হইতে আরও বুঝা যায়, জলপথে ও স্থলপথে সংবাহিত পণ্যাদির ব্যবস্থা-বিধান জন্ত রাজনীরূপিত রাজকীয় বিভাগ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর বাণিজ্যের উৎকর্ষ-সাধনে রাজা নানারূপ বিধি-বিধান-সমূহ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। এইরূপ জন-হিতকর বিবিধ বিষয়ক বিধি-বিধান-সমূহ—প্রাচীনকালের ব্যবস্থাপকগণের অলোক-সামান্য জ্ঞান-গবেষণা ও বহুদর্শিতার পরিচায়ক। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ভারতের ঐশ্বর্য্য-সম্পদের পরিচয়ে তাই আজি বিস্ময়-বিমুক্ত। এমন কি, কোটিল্যের বিধি-বিধান-সমূহের আলোচনার তাঁহার ম্যাকিয়াভেলি ও বিসমার্ক হইতেও কোটিল্যকে উচ্চতর আসন প্রদান করিয়াছেন।

কোটিল্যোক্ত চুক্তি-পর্ধ্যায়ের মধ্যে আদেশ ও অস্বাধি উল্লেখযোগ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের সৌকর্য্য-বিধানে উহার প্রয়োজনীয়তা অবিসম্বাদিত। বিভিন্ন দেশে পণ্য বিক্রয়ে এবং পণ্যের মূল্য আদান-প্রদানে আদেশ ও অস্বাধি বিশেষ সহায়তা করে। *
আদেশ ও অস্বাধি।
বাণিজ্যাদির উৎকর্ষ-সাধনেও ইহা অল্প উপযোগী নহে। আদেশ—আধুনিক ‘বিল অব এক্সচেঞ্জ’ নামে অভিহিত হইতে পারে। এই ‘আদেশ’ সাহায্যে একদেশীয় বণিক ভিন্নদেশীয় বণিককে ক্রীত পণ্য-মূল্য প্রদান অতি সহজে এবং অতি অল্প সময়ে করিতে পারেন। ‘আদেশ’ অনুসারে ভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ ব্যবসায়ীকে তাঁহার

* কোটিল্যোক্ত ‘অস্বাধি’—Bailment for Delivery বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ভারতীয় চুক্তি-বিষয়ক আইনের (The Indian Contract Act) নবম পরিচ্ছেদে এতদ্বিষয়ক বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কোটিল্য, তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা পণ্যাদি সরবরাহের যে বিধান করিয়াছেন, চুক্তি-বিষয়ক ঐ আইনের বিধান-সমূহ আরই তদনুরূপ। তৃতীয় ব্যক্তি বা প্রতিনিধি উক্ত আইনে Bailee অভিধানে এবং ধনী মহাজন (যিনি তাহার জিন্মায় পণ্য প্রদান করিবেন) Bailor নামে অভিহিত আছেন। চুক্তি-বিষয়ক আইন অনুসারে ধনী ব্যবসায়ী প্রতিনিধির নিকট পণ্য-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার ব্যক্ত করিবেন। পণ্যে যদি কোনও দোষ থাকে, তৃতীয় ব্যক্তি ধনিকে তাহা প্রদর্শন করিয়া পণ্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ধনী যদি প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখিয়া সে পণ্য প্রদান করেন, আর পরে তাহাতে কোনও দোষ বাহির হয় এবং সে জন্ত তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা হইলে পণ্য-বাহক দায়ী হইবেন না। অস্ত্র পক্ষে জিহ্বা লইয়া তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। চুক্তি সম্বন্ধে বিশেষ বাধ্য-বাধকতা না থাকিলে গ্রহণকারী তাহার ক্ষয়বায়ের জন্ত দায়ী হন না। তিনি যদি আপন পণ্যের সহিত ধনী ব্যবসায়ীর পণ্য মিশ্রিত করেন, তাহা হইলে সে পণ্যের লাভ-ক্ষতি উভয়ে বিভাগ করিয়া লইবেন। পণ্যের গুণাগুণ অনুসারে এই লাভ ক্ষতির হিসাব হইবে। কিন্তু ব্যবসায়ীর অসম্মতিতে বা অজ্ঞাতসারে পণ্যগ্রহণ-কারী যদি গৃহীত পণ্যের সহিত আপনাব পণ্য-দ্রব্য এমনভাবে মিশ্রিত করেন যে, উভয় পণ্য পরস্পর পৃথক করা অসম্ভব; আর তিনি সে পণ্য ফিরাইয়া দেন; তাহা হইলে তৃতীয় ব্যক্তি তাহার ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন। কিন্তু স্বত্ত্ব করিবার সম্ভাবনা থাকিলে, স্বত্ত্ব করিবার ব্যয় মাত্র তাঁহাকে দিতে হইবে। জ্ঞাতকারীর আদেশ মত জন্ত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করা বা অপরকে দেওয়া বিধেয়। তিনি যেভাবে বাহাকে যে দ্রব্য দিতে বলিবেন, সে দ্রব্য সেইভাবে তাহাকে দিতে হইবে। অনেক ব্যক্তি একযোগে কোনও বস্তু জন্ত করিলে, গ্রহণকারী তাহা তাঁহাদের যে কোনও ব্যক্তির নিকট সে দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিতে পারেন। তাহাতে সকলের সম্মতি আবশ্যক করে না। যথা,—“If several joint owners of goods bail them, the bailee may deliver them

বিক্রীত পণ্যের মূল্য দেন ; আবার ব্যবসায়ীগণও ‘আদেশ’ প্রদর্শনে বৈদিশিক প্রতিনিধিগণের নিকট মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ—আদেশ হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে পণ্য আদান-প্রদানের সুবিধা হয়। ইহাও—অনেকাংশে আদেশের অনুরূপ। অর্থাৎ—অপর ব্যক্তির বা বণিকের সাহায্যে পণ্য-সবরাহ করিবার ব্যবস্থা বিষয়ক। এতদ্বিধানে কোটিল্য বলিয়াছেন,—

“সাধেনাঋষিহস্তো বা প্রদিতাং ভূমিমপ্রাপ্তশ্চৌরৈর্ভগ্নোৎসৃষ্টো বা নাঋষিমভ্যাভবেৎ ।

অন্তরে বা মৃতস্ত দানাদৌহপি নাভ্যাভবেৎ । শেষমুপনিধিনা ব্যাখ্যাতম্ ॥”

কোনও পণ্য নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া দিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হইলে, তৃতীয় ব্যক্তি বা সংবাহক যদি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত না হন ; কিম্বা পথিমধ্যে দস্যুগণ যদি তাহা লুণ্ঠন করিয়া লয় ; অথবা সংবাহক যদি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে কিংবা পথিমধ্যে পরিত্যাগ করে ; তাহা হইলে বণিকগণ সে জন্ত দায়ী হইবে না। সংবাহক তৃতীয় ব্যক্তি যদি পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলে তাহার জ্ঞাতীগণও সে জন্ত দায়ী নহেন। এতৎসংক্রান্ত অশ্রান্ত বিধি, উপনিধির বিধান-সমূহের অনুরূপ। অর্থাৎ বিষয়ে কোটিল্য আরও বলিয়াছেন,—

“যাচিতকমবক্রীতকং বা যথাবিধং গৃহীযুক্তাবিধমেব অপ্যেয়ুঃ ।...প্রকী-

র্ণকং তু যাচিতকাবক্রীতকাহিতকনিক্ষেপকাণাং যথাদেশকালমদানে যাম-

চ্ছায়া সমুপবেশসংস্থিতীনাং বা দেশকালান্তিপাতেন শুভ্রতরদেয়ং ব্রাহ্মণং

সাধয়তঃ প্রতিবেশানুপ্রবেশয়োরূপরি নিমজ্জণে চ দ্বাদশপণো দণ্ডঃ ।”

back to, or according to the directions of one joint owner without the consent of all, in the absence of any agreement to the contrary.” জ্ঞাসকারীর স্বত্ত্ব নাই—এমন কোনও দ্রব্য কাহারও নিকট জপ্ত করিলেন। গ্রহণকারী তাহার আপনার দ্রব্য জানিয়া বিবাসের সহিত তাহা লইলেন এবং জ্ঞাসকারীর উপদেশ-মত যথানির্দিষ্ট স্থানে প্রদান করিলেন। এ ক্ষেত্রে জপ্তকারী সে জন্ত দায়ী ; সরবরাহকারীর তাহাতে কোনও দোষ নাই। কিন্তু গ্রহণকারী যদি যথাস্থানে পণ্য পৌছাইয়া না দেন, অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা প্রত্যর্পণ না করেন, আর তাহার শৈথিল্যের জন্ত যদি সে পণ্য নষ্ট হয় ; তাহা হইলে তিনি সে জন্ত দায়ী হইবেন। পণ্যে লাভ হইলে এবং বিশেষ কোনও সর্জ না থাকিলে, লভ্যাংশ জ্ঞাসকারীর প্রাপ্য। এই সকল বিধি বিধান ভিন্ন, চুক্তি বিষয়ক আইনে ভাড়াটিয়া দ্রব্য, জামিনী বা বন্ধকী দ্রব্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা বিধি-বিধানের উল্লেখ আছে। তৎসমুদায়ও পূর্ববর্তী বিধি-সমূহের অনুরূপ। বাহ্যসভয়ে এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল না। যে দ্রব্য যাহাকে প্রদান করা যায়, প্রদানকারীকে দ্রব্য-সমূহের দেয়গুণ দেখাইয়া দেওয়া কর্তব্য। দোষগুণ দেখাইয়া না দিলে এবং পরে তাহা প্রকাশ পাইলে গ্রহণকারী সে জন্ত দায়ী হন না,—এ বিষয় পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। চুক্তি-সংক্রান্ত আইনের ১৫০ ধারায় এতদ্বিধয়ে যে বিধি আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ; যথা,—*The bailor is bound to disclose to the bailee faults in the goods bailed, of which the bailor is aware, and which materially interfere with the use of them, or expose the bailee to extraordinary risks ; and if he does not make such disclosure, he is responsible for damage arising in the bailee directly from such faults.*”

“If the goods are bailed for hire, the bailor is responsible for such damage whether he was or was not aware of the existence of such faults in the goods bailed, ed.”—Vide, *the Indian Contract Act*, Chapter IX and Sections.

যে দ্রব্য যে ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, সে দ্রব্য সেই ভাবে প্রদান করিবার বিধি। উহা 'ঘাচিক' বা ঋণ স্বরূপই লওয়া হউক, আর 'অবক্রীতক' ভাড়া স্বরূপই লওয়া হউক, লইবার সময় যে ভাবে যে অবস্থায় লওয়া হইয়াছিল, ফিরাইয়া দিবার সময়ও সেই ভাবে সেই অবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যিক। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাইয়া দিবার অঙ্গীকারে কোনও পণ্যাদি গ্রহণ করিয়া শৈথিল্য-প্রযুক্ত যদি কেহ তাহা না দেয়, তাহার প্রতি দ্বাদশ পণ অর্থ-দণ্ডের বিধি বিহিত হইয়াছে। কোটিল্যের এ বিধান হইতেও বুঝা যাইতেছে, পণ্য আদান-প্রদানে এবং মূল্যাদি সরবরাহে, বিবিধ উপায়ে সময়-সজ্জেকপের প্রয়োগ চলিয়াছিল। আর, তদ্বারা বাণিজ্যাদির বিবিধ উন্নতি সাধিত হওয়ার সে সাম্রাজ্য সুশেখর্যের উচ্চ-চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

জনহিতকর বিবিধ বিধি প্রবর্তনার সঙ্গে সঙ্গে অর্থশাস্ত্রে সাধারণের আমোদ-প্রমোদ ও হিতসাধন সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থাও বিহিত হইয়াছে। সে সকল চুক্তি-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণের আমোদ-প্রমোদ ব্যবহার অঙ্গীকারবদ্ধ হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি জনহিতকর
আরক্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া

সে অমুঠানে যোগদান না করেন, তাহা হইলে তিনি এবং তাহার অমুচরবর্গ সে আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিতে পারিবেন না। অধুনা ঐরূপ অমুঠানে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াও যদি কেহ প্রতিজ্ঞাপূরণে বিরত হন, তাহা হইলে তাহার কোনই অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু প্রাচীন কালের বিধি সেরূপ নহে। অঙ্গীকার-বদ্ধ হইলেই কার্য-সম্পাদনে বাধ্যবাধকতা জন্মে। সুতরাং তাহার অপূরণ চুক্তিভঙ্গ অপরাধের স্থায় দণ্ডীয়। সাধারণের হিতকর কোনও অমুঠানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাহাতে বিরত হইলেও দণ্ডভোগ করিতে হয়। অর্থশাস্ত্রের 'বিবীতকেক্রপথহিংসা' প্রকরণে এতৎসম্বন্ধে কোটিল্য যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“প্রেক্ষারামনংশদঃ স্ববজনো ন প্রেক্ষত। প্রচ্ছন্নপ্রবেশকণে চ সর্বহিতে চ কর্মণি নিগ্রহেণ

দ্বিগুণমংশং দত্তাৎ। সর্বহিতেনেকস্ত ক্রবতঃ কুর্য়ুরাজাম্। অকরণে দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।”

সাধারণের আমোদ-জনক কার্যে সহায়তার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া যদি কেহ তাহাতে সহায়তা করিতে বিরত হয়; তাহা হইলে সে ব্যক্তি বা তাহার স্বজনদ্বন্দ্ব সে আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে না। প্রচ্ছন্নভাবে উপভোগ করিলে দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। সাধারণের হিতকর কার্য-সম্বন্ধেও কোটিল্য ঐরূপ বিধি বিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার অঙ্গীকৃত কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, কোটিল্যের ব্যবহার রাজা তাহাদিগের হিতসাধন করিবেন।

“রাজা দেশহিতান্ সেতুন্ কুর্বতাং পথি সংক্রমাৎ।

গ্রামশোভাশ্চরক্ষাশ্চ তেষাং প্রিয়হিতং চরেৎ॥”

জনহিতকর অমুঠানে কোটিল্যের বিধান ইহতে বুঝা যায়, তাহার ঐ সকল কার্যে ব্রতী হইতেন, তাহার রাজ-সাহায্য লাভ করিতেন। জনহিতব্রতধারী ব্যক্তিগণ রাজ-সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া দেশহিতকর কার্য সম্পাদনে স্বদেশের বিবিধ উন্নতি সাধিত করিয়াছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

— ০ • ০ —

রাজপথাদির ব্যবস্থায় আদর্শ ।

[রাজপথাদি নির্ণয়ে আদর্শ,—পথাদির উপযোগিতা ;—অর্থশাস্ত্রে রাজপথাদির প্রসঙ্গ,—প্রাপ্ত পথসমূহ,—কোটিলায় মতে উত্তর অপেক্ষা দক্ষিণ শ্রেষ্ঠ ;—বিভিন্ন রাজপথ,—রাষ্ট্রপথ, পণ্ডপথ, মনুষ্যপথ, বিবীতপথ, সংযানপথ প্রভৃতি বিংশতি প্রকার পথের উল্লেখ ও তাহাদের আকৃতি পরিমাণাদি ;—রথপথ, মহাপণ্ডপথ, অনং-পথাদির বিবরণ ;—পথাবরোধে দণ্ডের বিধান ;—যান-বাহনাদির ব্যবস্থা ;—জলপথাদির প্রসঙ্গ ;—বিভিন্ন জলপথের উল্লেখ ;—জলযানাদির ব্যবস্থা ;—গভাগতির উৎকর্ষে বানিজ্যোৎকর্ষ সাধনে আদর্শ-স্থাপন ।]

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গতিবিধির ব্যবস্থা—আদর্শ-রাজ্যের অত্যন্তম আদর্শ । রাজ্য-রক্ষার সুবন্দোবস্তে সুশিক্ষিত সেনাদল যেমন প্রয়োজন, শাসনের সুশৃঙ্খলা-বিধানে আদর্শ শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠা যেমন একান্ত আবশ্যক, রাজ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থা-বিধানে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গতিবিধির সৌকর্য্য-সাধনও তেমনই প্রগাঢ় নীতিকুশলতার পরিচায়ক । রাজধানীর সহিত বিভিন্ন বিভাগের সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত না থাকিলে, সে রাজ্য কদাচ নিরাপদ নহে । শাসন-প্রণালীরও তাদৃশ সুশৃঙ্খলা বিধান সম্ভবপর হয় না । রাজ্যে রাজপথের ব্যবস্থা—শাসন শৃঙ্খলার এক প্রধান অঙ্গ । রাজ্য-মধ্যে গতিবিধির সুবিধার জন্ত তাই স্থল-পথ ও জল-পথ উভয়ই প্রয়োজন । তদ্বারা একদিকে যেমন হুর্ভিক্ষের প্রকোপ শাস্ত হইতে পারে, ব্যবসা-বাণিজ্যের যেমন বিবিধ উৎকর্ষ সাধিত হয়, অন্যদিকে শাসন-শৃঙ্খলাও তেমনি সরল ও সুগম হইয়া আসে । গতিবিধির সুবিধা না থাকিলে রাজ্যের কোনও অংশে হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণের সম্যক্ উপায় নির্দ্ধারিত হইতে পারে না ; আবার শত্রু কর্তৃক রাজ্যের কোনও অংশ আক্রান্ত হইলে, তাহা রক্ষার কোনও সহজ উপায় নির্দ্দেশ ও অসম্ভব হইয়া পড়ে ; দস্যু-তস্করাদির উপদ্রবেও সদা লশঙ্কিত থাকিতে হয় । নীতিবিদগণ তাই রাজ্য-মধ্যে গতিবিধির সৌকর্য্য-সাধনে সর্ব্বথা প্রয়াস পাইয়া থাকেন ।

স্থলপথ ও যানবাহনাদি ।

[জলপথ ও স্থলপথের প্রসঙ্গ,—এতদুভয়ের মধ্যে স্থলপথের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন,—দক্ষিণোত্তরপথেরোঃ দক্ষিণঃ শ্রেষ্ঠঃ ;—অর্থনীতি হিসাবে রাজপথের উপযোগিতা,—রাজপথাদির প্রসঙ্গ,—সেতুবনপথ প্রভৃতি এবং তাহাদের পরিমাণাদি ;—খরোষ্ট্র, চক্রপথ, অসংপথ প্রভৃতি ;—রথচর্য্যাসংকার, প্রতোলী, চার্ব্যা প্রভৃতি পথের নাম ;—পথাবরোধে দণ্ড,—বিভিন্ন পথ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধি ;—যানবাহনাদি,—দেবরথ, পুস্পরথ, সাংগ্ৰামিক প্রভৃতি,—শিবিকা, পীঠিকাদি মনুষ্য-বাহিত যান,—রাজপথ-সমূহে বৃক্ষাদি রোপণ ; পণ্যবীথিকা স্থাপন, জলাশয় খনন ও পথ-সংস্কারের ব্যবস্থা ।]

কোটিলায় অর্থশাস্ত্রে রাজপথ নির্মাণের অশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হই । কোটিলা যে রাজ্যের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে রাজ্য বঙ্গোপসাগর হইতে আরব-সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । এতাদৃশ

অর্থশাস্ত্রে
পথ-বিদ্যে ন ।

বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-সুশৃঙ্খলা-বিধানে সর্ব্বপ্রকার বিধি-ব্যবস্থাই কোটিলা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন । আর সেই সকল বিধি-বিধানের প্রবর্ত্তনার সে রাজ্য আদর্শ রাজ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । সুশিক্ষিত সৈন্তদল সংগঠিত হওয়ার সে রাজ্য একদিকে যেমন উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল, অন্যদিকে

তেমনি আদর্শ শাসন-প্রণালীর প্রতিষ্ঠায় এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের তথ্য-সংগ্রহের সুবন্দোবস্তে সে রাজ্য-শ্রেষ্ঠ-রাজনীতিকের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিতেছিল। সে রাজ্যে স্থলপথের যেমন বাহ্যিক, জলপথেরও তেমনি প্রাচুর্য্য। নৌ-যান, বাষ্পীয়যান প্রভৃতিতে কেবল যে জলপথে দেশের বিভিন্ন স্থানে গতিবিধির সুবিধা ছিল, তাহা নহে; তদ্বারা স্বদেশে ও বিদেশে সংবাদ আদান প্রদানের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। আর তাহাতে বাণিজ্যাদির প্রসার প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম ক্রমে রাজ্যের চতুর্দিকে বহু রাজপথ—স্থলপথ ও জলপথ বর্তমান ছিল। যাত্রীর বা পণ্য-সরবরাহের অল্পপাত অল্পসারে কোটিল্য বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন রাজপথ নির্দেশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উত্তর দিক অপেক্ষা দক্ষিণ দিকে অধিক সংখ্যক রাজপথ নির্মিত হইয়াছিল। কোটিল্য বুঝিয়াছিলেন, উত্তর দিক অপেক্ষা দক্ষিণ দিক হইতে গণ্যাদির প্রচুর আমদানী হইবে; আর তাহাতে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়া জনসাধারণ সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিবে। দক্ষিণ ভারতে সে সময়ে বহুসংখ্যক খনি বর্তমান ছিল; সেদিক হইতে বিভিন্ন প্রকারের বহু পণ্য রাজ্যমাধ্যে আমদানি হইত। সুতরাং সেই দিকে গতিবিধি সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যবস্থা বিহিত করা, কোটিল্য বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উত্তরে হিমালয় পর্বত। তৎপ্রদেশ হইতে কেবলমাত্র চর্ম্ম, ঘোটক, কঙ্কণ প্রভৃতি আমদানি হইত। কিন্তু দক্ষিণ ভারত হইতে হীরক ও অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তর, সুবর্ণ, মুদ্রা, ওজি, মুক্তা প্রভৃতি বণিকগণ বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিত। আর সেই সকল দ্রব্যে রাজ্যের আর অধিক ছিল। সুতরাং অবস্থা-বিচারে যে ব্যবস্থা-ভেদ হইবে, তাহা বিভিন্ন নহে। পূর্ব ও পশ্চিম প্রদেশেও এইরূপ বিভিন্ন রাজপথ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারও প্রাচুর্য্য গণ্যাদির এবং আর-বায়ের উপর নির্ভর করিত। কোটিল্য সেই আর পরিমাণাদির এবং সুবিধা-অসুবিধার বিষয় অল্পধাবন করিয়া ‘কর্ম্ম-দক্ষি’ প্রসঙ্গে জলপথ ও স্থলপথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

“তত্রাপি বারিহুলপথমোবারিপথঃ শ্রেয়ান্, অল্পব্যয়ব্যারামঃ প্রভূতপণ্যোদয়শ্চ ইত্য-
চার্য্যাঃ। ‘নেতি’ কোটিল্যঃ—সংরুদ্ধগতিরসার্বকালিকঃ প্রকৃষ্টভর্যোনিনিপ্রতিকারশ্চ
বারিপথঃ; বিপরীতস্থলপথঃ। বারিপথে তু কুলসংযানপথয়ো কুলপথঃ পণ্যপট্টণ-
বাহুল্যাচ্ছেন্নয়ান্নদীপথো বা সাতত্যাধিব্যবাহার্য্যাক। স্থলপথেহপি—‘ইহমবতো
দক্ষিণাপথাচ্ছেন্নয়ান্ হস্তাংগক্কদস্তাজিনরূপ্যাসুবর্ণপণ্যাস্ফারবস্তরাঃ—ইত্যচার্য্যাঃ।’
‘নেতি’ কোটিল্যঃ—কঙ্কলাজিনাশ্চপণ্যবর্জাঃ শস্যবজ্রমণিমুক্তাসুসুবর্ণপণ্যাস্চ প্রভূতভরা
দক্ষিণাপথে। দক্ষিণাপথেহপি বহুখনিস্ফারপণ্যঃ প্রসিদ্ধগতিরমব্যারামো বা বণিকপথঃ
শ্রেয়ান্। প্রভূতবিষয়ো বা কঙ্কপণ্যঃ। তেন পূর্বঃ পশ্চিমশ্চ বণিকপথো ব্যাখ্যাতঃ॥”

কোটিল্যের এতদুক্তি হইতে বুঝা যায়, লাভালাভের তারতম্য অল্পসারে রাজপথের সংখ্যা-
নিরূপিত হইয়াছিল। রাজ্যের যে অংশে অধিক আয়ের সম্ভাবনা, সেই অংশে রাস্তা-
পথের-বাহুল্যের বিষয় কোটিল্যের বিধির আলোচনার উপলব্ধি হয়। আর পূর্ব-পশ্চিম-
উত্তরদক্ষিণ চারি দিকে সীমান্ত পর্য্যন্ত সে রাজপথ বিস্তৃত থাকার তত্ত্বদেশে রাজশক্তি-
পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শত্রু কর্তৃক রাজ্য আক্রমণের আশঙ্কা বিদূষিত হইয়াছিল,
তাহাও বিশেষরূপে জদয়কম হয়।

বিভিন্ন উপযোগিতার মধ্যে রাজপথের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপযোগিতা অস্বতন। সুদূর সীমান্ত পর্য্যন্ত রাজশক্তি অহুত হইলে বহিঃশত্রুকর্তৃক রাজ্য-আক্রমণ আশঙ্ক্য অতি অল্পই উপলব্ধি হয়। কারণ, সেরূপ আশঙ্ক্য উপস্থিত হইলে ততৎস্থানে পথের বিবরণ। যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্র-শস্ত্র, দূত, হস্তী, অশ্ব, যানবাহনাদি এবং সৈন্যদল প্রভৃতি প্রেরণে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আর তাহাতে সহজেই শত্রুর আক্রমণ নিবারিত হইতে পারে। বণিকগণের গতিবিধির ও পণ্য-সরবরাহের পথ 'বণিকপথ' বলিয়া অভিহিত। সে পথে শত্রুর সন্ধান চলিত; আর অস্ত্র-শস্ত্র, বর্ম্ম যান বাহন প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করা যাইতে পারিত। এইরূপ বিভিন্ন পথ বিভিন্ন কার্যের জন্য নিয়োজিত ছিল। "হীনশক্তিপূরণম্" অংশে এতদ্বিষয় কোটিল্যের উক্তি; যথা,—

"জনপদসর্বকর্ম্মণাং যোনিঃ; ততঃ প্রভবঃ; তস্য স্থানমাশ্রয়শ্চ আগদি দুর্গম্ ॥

সেতুবন্ধসম্ভানাং যোনিঃ; নিত্যাসুযজ্ঞো হি বর্ষগুণলাভঃ সেতুবাণেশু ॥ বণিকপথঃ

পর্য্যাপ্তিসন্ধানস্য যোনিঃ; বণিকপথেন হি দণ্ডগুচপুরুষাভিনয়নং শস্ত্রাবরণযানবাহন-

ক্রয়শ্চ ক্রিয়তে। প্রবেশো নির্গমেন চ ॥ খনিসংগ্রামোপকরণানাং যোনিঃ ॥

দ্রব্যবনং দুর্গকর্ম্মণাং; যানরথয়োশ্চ ॥ হস্তিবনং হস্তিনাম্ ॥ গবাশ্বরথোষ্ট্রাণাং চ ব্রজঃ ॥"

এইরূপ রাজপথ-সমূহের শ্রেণি-বিভাগ ছিল এবং পর্য্যায় অনুসারে তাহাদের নামকরণ হইয়াছিল। মনুষ্য-চলাচল, যান-বাহনাদির গতিবিধি এবং ভারবাহী পশাদির গত্যন্ত বুঝিয়া রাজপথ-সমূহের একরূপ নামকরণ হইয়াছিল; আবার দৈর্ঘ্য-প্রস্থাদির হিসাবে তাহারা অত্ররূপ অভিধারে অভিহিত হইত। অর্থশাস্ত্রের 'আশ্বরক্ষিতকম্' প্রকরণে এইরূপ একটা রাজপথের উল্লেখ আছে। তাহা 'রাজমার্গ' রূপে বিশেষিত হইয়াছে। যথা,—“নির্ধাণেহভি-
যানে চ রাজমার্গমুভয়তঃ কৃতারক্ষং দণ্ডিভিরপাত্তশস্ত্রহস্তপ্রজিতবান্ গচ্ছেৎ। ন পুরুষ-
সম্বাদমবগাহেত। যাত্ৰাসমাজোঃসব প্রবহণানি চ দশবর্গিকাদিষ্টিতানি গচ্ছেৎ।” ‘দুর্গ-
নিবেশ’ প্রসঙ্গেও মহামতি কোটিল্য রাজপথ সম্বন্ধে এতদভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা,—

“অরঃ প্রাচীনা রাজমার্গাস্তর উদীচীনা ইতি বাস্তবভাগঃ। স দ্বাদশদ্বারো যুক্তোদক-

ভূমিচ্ছন্নপথঃ। চতুর্দণ্ডান্তরা রথ্যা রাজমার্গয়োঃসুখস্থানীররাষ্ট্রবিবীতপথাঃ। সযোনীরব্য-

শ্রণানগ্রামপথাস্টাদণ্ডাঃ। চতুর্দণ্ডসেতুবনপথঃ। বিন্ডো হস্তিক্কেত্রপথঃ। পকারত্বরো-

রথপথশ্চদ্বারঃ পশুপথঃ। ঘো কুদ্রপশুমনুষ্যপথঃ। প্রবীরে বাস্তনি রাজনিবেশাঃ।”

এইরূপ বিভিন্ন প্রকার পথ নির্দেশ করিয়া, দৈর্ঘ্যপ্রস্থ হিসাবে গতাগতি অনুসারে তাহাদের নাম-
করণ হইয়াছিল। রাজ্য যে পথে গমন করিতেন, তাহার নাম—রাজপথ। উহার প্রস্থ—চারি দণ্ড।
প্রতি দণ্ডের পরিমাণ—আট ফিট। সুতরাং রাজপথের বিস্তৃতি বত্রিশ ফিট ছিল। উৎসবাদি
ব্যাপারে শোভাযাত্রা করিয়া রাজা যখন সে পথে গমন করিতেন, তখন লোকচলাচল বন্ধ হইত
এবং সে পথের উভয় পার্শ্বে প্রহরী নিযুক্ত থাকিত। প্রতি নগরে এইরূপ রাজপথের সংখ্যা ছয়টি
করিয়া। এতদ্বির রথ্যা, (বিস্তৃতি পরিমাণ চারি দণ্ড বা বত্রিশ ফিট), বিবীতপথ, রাষ্ট্রপথ,
কুদ্রপশুপথ (দ্বি-দণ্ড বা দ্বোল ফিট প্রস্থ), হস্তিক্কেত্রপথ (প্রস্থ—দুই দণ্ড বা দ্বোল ফিট),
সেতুবনপথ (প্রত্যেকের বিস্তৃতি—চারি দণ্ড বা বত্রিশ ফিট), রথপথ (কুদ্র পথের জন্য

নির্দিষ্ট; বিস্তৃতি—পঞ্চারস্রী বা দশ ফিট), পশুপথ (বিস্তৃতি—চারি অরস্রী বা আট ফিট), মনুষ্যপথ (প্রস্থ—ছই অরস্রী বা চারি ফিট) প্রভৃতি বিভিন্ন পথের পরিচয় অর্থশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ‘বিবীতক্ষেত্রপথহিংসা’ প্রকরণে এই সকল পথের উল্লেখ আছে। সে স্থলে ঐ সকল পথ রোধ করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত। এতদ্বিষয়ে কোটিল্য বলিয়াছেন,—

“ক্ষুদ্রপশুমনুষ্যপথং রুদ্ধতো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। মহাপশুপথং চতুর্বিংশ-
শতিপণঃ। হস্তিক্ষেত্রপথং চতুস্পঞ্চাশৎপণঃ। সেতুবনপথং ষট্ছতঃ।
অশ্বানগ্রামপথং দ্বিশতঃ। জ্ঞোণমুখপথং পঞ্চাশতঃ। স্থানীয়রাষ্ট্রবিবীতপথং
সাহস্রঃ। অতিকর্ষণে চৈবাং দণ্ডচতুর্ধা দণ্ডাঃ। কর্ষণে পূর্বোক্তাঃ॥”

‘কর্ম্মসন্ধি’ প্রসঙ্গে কোটিল্য আরও কয়েকটি পথের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—
“তত্রাপি চক্রপাদপথরোক্তচক্রপথো বিপুলারক্তজাচ্ছন্নান্ দেশকালসম্ভাবনো বা খরোষ্ট্রপথঃ॥”
খরোষ্ট্র-সংজ্ঞক পথ উষ্ট্র ও গর্দভদিগের গত্যাত জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। এই সকল বিভিন্ন পথের আলোচনায় প্রতিপন্ন হয়, রাজ্য মধ্যে সে সময় বহু পথ নির্মিত হইয়াছিল এবং সর্বত্র সংবাদ আদান-প্রদানের এবং যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল।

দুর্গনিবেশ, কর্ম্মসন্ধি, আত্মরক্ষিতক, দূতপ্রণিধি, হীনশক্তিপূরণ প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে রাজপথ-সমূহের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইতে প্রতিপন্ন হয়, বিভিন্ন নাম-সংজ্ঞায় বিভিন্ন প্রকারের বহু রাজপথ সে সময়ে রাজ্য-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন পথ। হইয়াছিল। সেই সকল পথের নাম নিম্নরূপ নির্দিষ্ট হইতে পারে; যথা,—

(১) রাজমার্গ—প্রস্থে চারি দণ্ড বা বত্রিশ ফিট। (২) রথ্যা—বৃহৎ

রথের গতিবিধির জন্য নির্দিষ্ট, চারি দণ্ড বা বত্রিশ ফিট প্রশস্ত; (৩) রথপথ—ক্ষুদ্র রথের গতিবিধির নিয়োজিত এবং প্রস্থ পঞ্চারস্রী বা দশ ফিট; (৪) পশুপথ—সাধারণ পশুর গতিবিধি সম্পর্কিত, চারি অরস্রী বা আট ফিট প্রশস্ত; (৫) মহাপশুপথ—বৃহৎ পশুর যাতায়াত বিষয়ক এবং (৬) ক্ষুদ্রপশুপথ; উভয়েরই প্রস্থ ছই অরস্রী বা চারি ফিট হিসাবে।

(৭) খরোষ্ট্রপথ। এই সকল পথ এমনই সুকোশলে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, সকল কালে এবং সকল ঋতুতে তাহা ব্যবহৃত হইতে পারিত। তাহাতে কোনও অসুবিধা হইত না। এই সাত প্রকার পথ ব্যতীত আরও কতকগুলি পথ ছিল; যথা,—(৮) চক্রপথ—গো-বানাদি গমনাগমন জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। (৯) পাদপথ এবং (১০) মনুষ্যপথ; এতদ্ব্যতয়ের বিস্তৃতি ছই অরস্রী হিসাবে। জনসাধারণের গতিবিধির জন্ত নিয়োজিত। (১১) অসংপথ। এই সকল পথের মধ্যে চক্রপথ, পাদপথ, অসংপথ, খরোষ্ট্রপথ প্রভৃতি পণ্য সঞ্চয়ে বিহিত হইয়াছিল। বাণিজ্য বিষয়ে প্রশস্ত পথের প্রয়োজন। বাণিজ্যের উৎকর্ষসাধনে সেই জন্ত ঐ সকল প্রশস্ত রাজপথ নিয়োজিত ছিল। রাজনিয়োজিত এই সকল পথ ব্যতীত বিভিন্ন বিভাগে গমনাগমন জন্ত বিভিন্ন নামের আরও কতকগুলি পথের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ‘জনপদ-নিবেশ’ প্রসঙ্গে, সেই সকল পথের বিষয়ে অর্থশাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

“অষ্টশতগ্রাম্যা মধ্যে স্থানীয়ঃ, চতুশ্শতগ্রাম্যা জ্ঞোণমুখঃ,
দ্বিশতগ্রাম্যা দ্বাবটিকং দশগ্রামীসংগ্রহেণ সংগ্রহণং স্থাপয়েৎ॥”

আট শত গ্রামের মধ্যে স্থানীয়, চারি শত গ্রামের মধ্যে দ্রোণমুখ, দুই শত গ্রামের মধ্যে সাকটিক এবং দশ গ্রামের মধ্যে সংগ্রহণ স্থাপনের বিধি কোটীলা ব্যবস্থাপিত কীর্তি। দেশ-মধ্যে স্থানীয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তত্তৎস্থানে গতিবিধির জন্য বিভিন্ন পথ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। দ্রোণমুখে পৌছিবার পথ—(১২) দ্রোণমুখপথ; স্থানীয়-গমন-জন্ত যে পথ নির্দিষ্ট, তাহা (১৩) স্থানীয়-পথ; কর্ষণ-ক্ষেত্রে পৌছিবার পথ—(১৪) সন্নয়ন-পথ অভিধানে অভিহিত। সৈনিকাবাসে গমনের জন্ত যে পথ নির্দিষ্ট ছিল, তাহা (১৫) বৃহপথ। (১৬) শ্রাশনপথ—শ্রাশানে বা সমাধিস্থানে এবং (১৭) গ্রামপথ—গ্রামের সর্বত্র যাতায়াত জন্ত তদ্বিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছিল। এই চতুর্বিধ পথের বিস্তৃতি পরিমাণ—আট দণ্ড বা চৌষট্টি ফিট। বনান্তিমুখে গমনের জন্ত (১৮) বনপথ—চারি দণ্ড বা বত্রিশ ফিট বিস্তৃত; আর হস্তিবাসোপযোগী বনে যাতায়াতের পথ (১৯) হস্তিকোত্রপথ—দুই দণ্ড বা ষোড়শ ফিট আয়ত ছিল। (২০) সেতুবন্ধপথের প্রয়োজনীয়তা—সেতু ও বাঁধ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের জন্ত; ইহার বিস্তৃতি—চারি দণ্ড বা বত্রিশ ফিট। পূর্বোক্ত বিংশতি প্রকারের বিভিন্ন পথ ভিন্ন ভূগ-প্রকারাদিতে গমনাগমন জন্ত বহু পথ নির্দিষ্ট ছিল। ‘ভূগবিধান’ শ্রমক্ষে সেই সকল পথের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে,—

“রথচর্যাসংস্কারং তালমূলমুরজকৈঃ কপিলীষটিকশ্চাচিভাগ্রং পৃথুশিলাসহিতং বা শৈলং কারয়েৎ। ন ত্বেব কাষ্ঠময়ময়িবহিতো হি তস্মিন্ বসতি। বিকল্পচতুরশ্রমট্টালকমুৎসেধ-সমাবেশপসোপানং কারয়েৎ। ত্রিশদণ্ডস্তরং চ দ্বয়োরট্টালকস্নোমধ্যে সহস্রাদ্বিতলাং দ্বাদ্বাদ্যামাং প্রতোলীং কারয়েৎ। অট্টালক প্রতোলীমধ্যে ত্রিধামুক্ষাধিষ্ঠানং সাপধান-ক্ষিপ্রফলকসংহতমিতীশ্রকোশং কারয়েৎ। অন্তরেণু দ্বিহস্তবিক্ষণ্ডং পার্শ্বে চতুর্ভুগায়াম-মহুপ্রাকারমষ্টহস্তায়তং দেবপথং কারয়েৎ। দণ্ডান্তরা দ্বিদণ্ডান্তরা বা চার্যাঃ কারয়েৎ।”

অর্থশাস্ত্রের এই বর্ণনা হইতে আরও চারি প্রকার পথের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম—রথচর্যা-সংস্কার; তালমূল হইতে তক্তা প্রস্তুত করিয়া সেই তক্তা দ্বারা অথবা বংশ-থণ্ডে এই পথ নির্মিত। তৎসহ বৃহৎ প্রস্তর সন্নিবিষ্ট থাকিত। রথাদির যাতায়াত জন্ত ভূগস্থানে এইরূপ পথ নির্মিত হয়। দ্বিতীয়—প্রতোলী; বৃহৎ অট্টালিক-বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত পথ। ত্রিশ দণ্ড অন্তরে যে সকল অট্টালিকা অবস্থিত, এই পথ তাহারই মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। তৃতীয়—দেবপথ; দেবমন্দিরে গমনাগমন জন্ত নির্দিষ্ট। ইহার আয়তন—অষ্টহস্তপরিমিত। এক বা দুই দণ্ড পরিমিত প্রস্থবিশিষ্ট পথ—চার্যা অভিধানে অভিহিত। অন্যান্য ক্ষুদ্র পথের মধ্যে স্বক, উপাধ্ব ও বিশিখা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ‘বিশিখা’ সম্বন্ধে কোটীলা বলিয়াছেন,—“বিশিখমধ্যে সৌবর্ণিকং শিলবস্তমভিজাতং প্রোত্যয়িকং চ স্থাপয়েৎ।” এইরূপ রাজপথ যে কেবলমাত্র একটা ছিল, তাহা নহে; রাজ্যের বিভিন্ন নগরে, বিভিন্ন জনপদে এবং বিভিন্ন পণ্যস্থানে বহু-সংখ্যক রাজপথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তদ্বারা দেশমধ্যে দ্রিবিধ জনহিতকর বিধি-ব্যবহার প্রবর্তনার দোলের নানাবিধ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

* সহর, সহরভলী, নগর ও উপনগর-সমূহে এখন রাজ্যাদির নাম নির্দেশ করিবার অথবা বর্তমান আছে বটে; কিন্তু দৈর্ঘ্য-বিস্তৃতি-পরিমাণ সম্বন্ধে বাধাবিধি কোনও নিয়ম নাই। এখন ইচ্ছামত দৈর্ঘ্যবিস্তৃতি নির্ধারিত হইয়া থাকে। আটোনকালে দৈর্ঘ্য-বিস্তার সম্বন্ধে বাধাবিধি নিয়ম ছিল, রাজ্যাদির বর্ণনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

রাজপথে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত পথ-সমূহে বাহাতে সকলে অবাধে গতিবিধি করিতে পারে, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। বিনা-কারণে পথ অবরুদ্ধ করিয়া গমনাগমনে বিঘ্ন

উৎপাদন করিলে, বিঘ্নকারীর প্রতি রাজদণ্ড বিহিত হইত। পথ-সমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রপথ ও মনুষ্যপথ অবরুদ্ধ করিলে, বার পণ দণ্ড হইত।

মহাপথপথ অবরোধের জন্য চতুর্কিংশতি পণ, হস্তিক্ষেত্রপথে চতুঃপঞ্চাশৎ পণ, সেতুপথ ও বনপথে ছয় শত পণ, শ্রাণানপথ ও গ্রামপথ অবরোধে দুই শত পণ, দ্রোণমুখপথে পাঁচ শত পণ, স্থানীয়পথ রাষ্ট্রপথ বিবীতপথ প্রভৃতি অবরোধে সহস্র পণ দণ্ডের বিধান অর্থশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। ঐ সকল রাজপথে গর্ত খনন করিলেও ঐরূপ দণ্ডের বিধি। পথে গভীর গর্ত খননে কোটিল্য পূর্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড বিধান করিয়াছেন। “বিবীতক্ষেত্রপথহিংসা” প্রকরণে দণ্ডাদির উল্লেখে অর্থশাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

“ক্ষুদ্রপথমনুষ্যপথং বন্ধতো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। মহাপথপথং চতুর্কিংশতি-

পণঃ। হস্তিক্ষেত্রপথং চতুঃপঞ্চাশৎপণঃ। সেতুবনপথং ষট্ছতঃ। শ্রাণান-

গ্রামপথং দ্বিগতঃ। দ্রোণমুখপথং পঞ্চাশতঃ। স্থানীয়রাষ্ট্রবিবীতপথং

সাহস্রঃ। অতিকর্ষণে চৈবাং দণ্ডচতুর্থী দণ্ডাঃ। কৰ্ষণে পূর্বোক্তাঃ॥”

অর্থশাস্ত্রের বর্ণিত পথাদি এবং তদবরোধে দণ্ডাদির বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, সে সময় বাণিজ্যাদির বিশেষ প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল। যান-বাহনাদির গতাগতি স্তন্যময় পরিচালনার বিশেষ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। আরও অনুমান হয়, সেই অসংখ্য যান-বাহনাদির এবং মনুষ্য পথ প্রভৃতির নিরাপদ বিধানকল্পে পথ-সমূহে প্রহরীর বন্দোবস্ত ছিল। দণ্ডাদির কল্পনার প্রহরীর অনুমান এতদ্বিধে স্বাভাবিক। তদভাবে অবরোধকারী নিশ্চয় করা সম্ভবপর নহে। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, রাজ্যের সর্বত্র গতাগতির জন্ত এবং বাণিজ্যাদির সৌকর্য্য বিধান, বিভিন্ন স্থানে লোকজনের যাতায়াতের সুব্যবস্থার, আদর্শ বিধি-বিধান-সমূহ ব্যবস্থিত হইয়াছিল।

যান-বাহনাদি-সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থারও সে পরিচয় পাওয়া যায়। এখন যেমন স্থলপথে গতিবিধির জন্ত বিভিন্ন প্রকারের যান-বাহনাদি প্রচলিত আছে; প্রাচীন-কালে চাপকোয়

ব্যবস্থায়ও তদনুরূপ যান-বাহনাদি প্রবর্তনার আভাস পাওয়া যায়। অর্থ-যানবাহনাদি। শাস্ত্রের রথাধ্যক্ষ, নাবধ্যক্ষ, গোহধ্যক্ষ, বৃদ্ধভূময়ঃ, সন্ধিকর্ম, গণিকাধ্যক্ষ,

কোশাভিসংহরণ প্রভৃতিতে সে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। ঐ সকল অংশের আলোচনার বুঝা যায়, স্থলপথে ও জলপথে গমনাগমন জন্ত বহু যান-বাহন প্রস্তুত হইয়াছিল। স্থলবাহী যানের মধ্যে রথ সর্বপ্রধান। ইহার আকার পরিমাণাদি এবং প্রস্তুত-প্রণালী রথাধ্যক্ষ প্রকরণের লিপিবদ্ধ আছে। সে সময়ে যত প্রকার রথ ব্যবহৃত হইত, সে সকল প্রকারের রথই রথাধ্যক্ষগণের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইবার ব্যবস্থা ছিল। রথের নির্মাণ-প্রণালী ও আকারাদির বিষয়ে ‘রথাধ্যক্ষ’ প্রকরণে কোটিল্য বলিয়াছেন,—

“অধ্যাধ্যক্ষেন রথাধ্যক্ষো বাধ্যতঃ। স রথকর্ম্মান্তান্ কীরয়েৎ। দশপুরুষো

দ্বাদশান্তরো রথঃ। তস্মাদেকান্তরাবরা আষড়ন্তরাতিতি সপ্তরথাঃ। দেবরথ-

পুণ্ডরথসাংগ্রামিকপারিধানিকপরপুণ্ডরথানিকবৈনরিকং৮ রথান্ কীরয়েৎ।”

অবাধ্যতার কর্তব্য এবং রথাধাকের কর্তব্য একই প্রকার। রথনির্মাণ কার্য তত্ত্বাবধান করা রথাধাকের প্রধান কার্য। রথের মধ্যে উত্তম রথ প্রশস্ত। উহার উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য পরিমাণ দশ পুরুষ এবং বিস্তৃতি দ্বাদশ পুরুষ। এতদ্ব্যতীত আরও ছয় প্রকার রথের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাদেরও বিস্তৃতি ছয় পুরুষ হইতে দশ পুরুষ পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট। সেই সকল রথের নাম—দেবরথ, পুষ্পরথ, সাংগ্ৰামিক, পারিধানিক, পরপূরাতিধানিক, বৈনারিক। এই সকল রথের মধ্যে সাংগ্ৰামিক এবং পরপূরাতিধানিক রথ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত। অবরোধের সময় পরপূরাতিধানিক রথের আরোহণীয়তা উপলব্ধি হয়। বৈনারিক রথ—যুদ্ধবিভাগ শিক্ষার জন্য শিক্ষাকালে নিয়োজিত ছিল; আর পারিধানিক রথ—ভ্রমণকালে ব্যবহৃত হইত। উৎসবদিগের সময়ে পুষ্পরথ; এবং দেবমূর্তির জন্য দেবরথ নির্দিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত গো-যান, উষ্ট্রযান প্রভৃতি নানাবিধ যান ব্যবহৃত হইত। ‘নাবধ্যাক’ প্রসঙ্গে শুকাদির উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে ঐ সকল যানের বিবরণ নিম্নরূপ উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—

“কুজপশুমুদ্রাশ্চ সতারাঃ মাযকং দশাৎ। কীরোভারঃ কামভারো গবাংশ্চ

চ যৌ। উষ্ট্রমহিষং চতুরঃ। পঞ্চ লঘুযানম্। বড়গোলিঙ্গম্ সপ্তশকটম্।”

কোটিল্যের এতদুক্তি হইতে গো, মহিষ ও উষ্ট্র সংবাহিত যানাদি ব্যতীত আরও দ্বিবিধ যানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা—লঘুযান, গোলিঙ্গ ও শকট অভিধানে অভিহিত। ‘কোশাভি-সংহরণম্’ প্রেকরণেও শকটের উল্লেখ আছে। “ধাত্তরসলোহপণ্যাঃ শকটব্যবহারিণশ্চ ত্রিংশৎ-করা।” এখানে শকট বোঝাই করিয়া যাহারা ধাত্তাদি বহন করিত, তাহাদের শকট প্রতি যে কর গ্রহণ করা হইত, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। রথ, শকটাদি এবং অপরাপর যান-সমূহ উষ্ট্র অথবা গো-মহিষাদি দ্বারা সংবাহিত হইবার বিধি। গো-শকটাদি পরিচালক ‘চক্রচর’ নামে অভিহিত। হীনশক্তিপূরণম্, গোহধ্যাক, যুদ্ধভূময় প্রভৃতি প্রেকরণে উক্ত হইয়াছে,—

“গবাস্তরথোষ্ট্রাণা চ ত্রজঃ। যানরথদ্বোশ্চ।” (হীনশক্তিপূরণম্)। “কুর্ধ্যাদগবাস্থব্যায়োগং

রথেষ্বরহরো নৃপঃ।” (যুদ্ধভূময়ঃ)। ধরোষ্ট্রশকটানাং বা গৰ্ভমগ্নগজন্তথা ॥...বৎসা বৎস-

তরা দম্যা বাহিনী বৃষা উকাগশ্চ পুষ্কবাঃ যুগবাহনশকটবহা বৃষভাস্থনা মহিষা পৃষ্ঠদ্ব-

বাহিনশ্চ মহিষাঃ বৎসিকা বৎসতরো পঠৌহো গভিনী ধেদুশ্চাপ্রজাতা বক্যাশ্চ গাবো মহিষশ্চ-

মাসহিমাসজাতাসামুপজা বৎস্তা বৎসিকাশ্চ। মাসহিমাসজাতানকরং।” (গোহধ্যাক)

এতদ্বর্ণনার উষ্ট্র, অশ্ব, গজ, গো, মহিষ, গর্দভ প্রভৃতি সংবাহিত যানাদির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। “চক্রচরাণাং বা শকট বাটেরপগচ্ছৎ” (সন্ধিকর্ম্ম) চক্রচর বা শকটচালক সেই সকল যানাদি পরিচালন করিত। এতদ্ব্যতীত শিবিকা পীঠিকা প্রভৃতি মনুষ্য-সংবাহিত যান ছিল। ‘গণিকাধ্যাক’ প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রে তদ্বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; যথা,—“সোভাগ্যালঙ্কার-বুদ্ধয়া সহস্রৈশ্চ বায়ং কনিষ্ঠং মধ্যযুক্তমং বাহরারোপয়েৎ। ছত্রভূষণবাজনশিবিকা পীঠিকারথেন্ চ বিশেষার্থম্ ॥” এই সকল যানাদি ব্যতীত অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী, প্রভৃতিও বাহন রূপে ব্যবহৃত হইত। রাজার যানবাহনাদি সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা ছিল। হস্তি-পৃষ্ঠে গমনকালে রাজনিয়োজিত সম্বার্কক সম্বার্কিনী দ্বারা রাজপথ পরিষ্কার করিয়া দিত। হস্তীর বা অশ্বের পদতলে কিছু বিদ্ধ না হয়—এই জন্য সকলেই বিশেষ সতর্ক হইতেন। রাজার

অর্থ বা হস্তী কাহারও দোষে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তাহার প্রতি কঠোর দণ্ড বিহিত হইত। রাজদেহ নিরাপদ করিবার এইরূপ বিবিধ প্রয়াস কোটিলোর নীতি সমূহে পরিদৃষ্ট হয়।

“মৌলপুরুষাধিষ্ঠিতং যানবাহনমারোহেৎ । নাবং চান্তনাদিষ্টিতামষ্টৈ প্রতিবন্ধাং বাত-
বেগবশাং চ নোপরেৎ । উদকাস্থে সৈন্যমাশীৎ ।...নির্ধানেহভিবানে চ রাজমার্গ-
মুভয়তঃ কৃতারক্ষং দণ্ডিভিরপান্তশস্ত্রহস্তপ্রব্রজিতব্যজং গচ্ছেৎ । ন পুরুষমস্বাধমবগাহেৎ ॥”

—আত্মরক্ষিতকম্, ৪৪ম পৃষ্ঠাঃ ।

যান-বাহনাদির পরিচালনায় প্রাণিহিংসা না হয়, তৎপক্ষে রাজপুরুষগণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মনুষ্যপথ প্রভৃতিতে পদব্রজে গমনাগমনের বেক্রপ সূচক ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল; যানবাহনাদি পরিচালনের সূক্ষ্মাঙ্গায় তেমনি প্রাণিহিংসা নিবারণের বিশেষ বিধি প্রবর্তিত ছিল। ‘অতিচারদণ্ড’ বিধানে মহামতি চাণক্য সে পক্ষে দণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত করিয়া, যানাদি পরিচালনায় প্রাণিহিংসা-নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিধানে দেখা যায়,—

“ছিন্নশ্রমভগ্নযুগং তিৰ্য্যাক্ প্রতিমুখাগতং প্রত্যাসন্নদা চক্রযুক্তং যাতপশুমনুষ্যসম্বাদে
বা হিংসায়ামদণ্ডঃ, অথবা যথোক্তং মানুষ্যপ্রাণিহিংসায়াম দণ্ডমভ্যাভবেৎ । অমানুষ-
প্রাণিবধে প্রাণিদানং চ ॥ বালে যাতরি, যানস্থঃ স্বামী দণ্ডঃ ; অস্বামিনি যানস্থঃ
প্রাপ্তব্যবহারো বা যাতা । বাল্যাদিষ্ঠিতমপুরুষং বা যানং রাজা হরেৎ ॥ শৃঙ্গিণা
দংষ্ট্রিণা বা হিংস্তমানমোক্ষয়তস্বামিনঃ পূৰ্ব্বস্ফাচসদণ্ডঃ । অতিক্রান্তে দ্বিগুণঃ ।
শৃঙ্গিদংষ্ট্রিভ্যামছোত্বং যাতয়তশ্চ তাবচ্চ দণ্ডঃ । দেবপশুম্ভভূক্ষণং গোঁকুমারীং বা
বাহয়তঃ পঞ্চশতো দণ্ডঃ । প্রবাসয়ত উত্তমঃ । লোভদোহবাহনব্রজনোপকারিণাং
ক্ষুদ্রপশুনাশাদানে তচ্চ তাবচ্চ দণ্ডঃ ; প্রবাসেন চ অন্ত্রজ দেবপিতৃকার্যোভাঃ ॥”

—অতিচারদণ্ডঃ, ২৩৩ম পৃষ্ঠাঃ ।

শৈথিল্য-বশতঃ তিৰ্য্যাক্ভাবে, ছিন্ন ও ভগ্ন যুগ্ম সহকারে শকট-চালনায় মনুষ্যগতি রোধ করিলে অথবা প্রাণিহিংসা করিলে দণ্ডের বিধি বিহিত হইয়াছে। মানুষ ভিন্ন অথ প্রাণী বিনষ্ট হইলে অতীক্রম প্রাণী প্রদান করার বিধি। আরোহী বালক হইলে যানস্থ স্বামীর দণ্ড হইবে। অস্বামিক যান হইলে রাজা সে যান-বাহন দণ্ড স্বরূপ গ্রহণ করিবেন। শকটাদি অপহরণকারীর দণ্ডের ব্যবস্থাও অর্থশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে,—“চক্রযুক্তং নাবং ক্ষুদ্রপশুং বাহপহরত একপাদবধঃ ত্রিশতো বা দণ্ডঃ ॥” রাস্তাপথ মেরামত প্রভৃতির বিষয়েও কোটিল্য উপদেশ দিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত ‘জনপদনিবেশ’ এবং ‘মুদ্রাদাক্ষ’ প্রসঙ্গে রাজার কর্তব্য-নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এতদ্বিষয় বাক্ত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি ; যথা,—

“পরচক্রাটবীগ্রস্তং ব্যাধিজুর্ভিকপীড়িতম্ । দেশং পরিহরেদ্রাজা ব্যয়ক্রীড়াশ্চ বারয়েৎ ॥
দণ্ডবিষ্টিকরাবাতৈঃ রক্ষেত্পহতং ক্রমিৎ । স্তেনব্যালবিষগ্রাতৈঃ ব্যাধিভিষ্চ পশুব্রজান্ ॥
বল্লভৈঃ কার্মিকৈস্তেনরক্তপালৈশ্চ পীড়িতম্ । শোধয়েৎ পশুসজ্জৈশ্চ ক্রীয়মাণং বলিকৃপণম্ ॥
এবং দ্রব্যং দ্বিপবনং সেতুবন্ধমথাকরান্ । রক্ষেৎপূর্ব্বকৃতানাক্ষা নবাংশ্চাভিপ্রবর্তয়েৎ ॥”

—জনপদনিবেশঃ, ৪৮ম অধ্যায়ঃ ।

শত্রু ও অসন্তোষ জাতি কর্তৃক যে সকল স্থান সহজে আক্রান্ত হইতে পারে, যেখানে মহামারী

ও ত্রুড়িক প্রায়ই লাগিয়া আছে, সে সকল স্থান আক্রমণে রাজা বিরত থাকিবেন। যে ক্রীড়ায় বহু ব্যয়-বাহুল্য আবশ্যক, রাজা তাহা বারণ করিবেন। কুবিরক্ষাকল্পে রাজা দণ্ড, বৃষ্টি ও কর নিবারণের প্রয়াস পাইবেন। চোর, ব্যাঘ্র, সর্পাদি বিষাক্ত প্রাণী এবং পশুরোগ হইতে পশুপথ রক্ষা করিবেন। অন্তঃপাল সীমান্তরক্ষী, বল্লভ, কার্ষিক প্রভৃতি যাহাতে বণিকপথ অব্যবহার্য্য না করে, রাজা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং পশুসত্ত্ব কর্তৃক বণিকপথ বিনষ্ট হইলে, তাহা মেরামত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা-বিধানে দ্বিপদ, গৃহাদি ও খনি-সমূহ রক্ষা করিয়া রাজা নূতন নূতন দ্বিপদ, গৃহাদি ও খনি প্রভৃতি প্রবর্তিত করিবেন। অপিচ, “মধ্যমবরং বা হুর্গসেতুকম’বণিকপথশূন্যনিবেশখনিদ্রব্য-হস্তিবনকর্মোপকারিণং প্রত্যস্তমন্নপ্রাণ বা ন যাচেৎ” (কোষাভিসংহরণম্)। ‘মুদ্রাধ্যক্ষ’ ব্যবস্থায়ও পথাদি মেরামতের বিধান দৃষ্ট হয়; যথা,—“দ্রবাহস্তিবনাজীবং বর্তিনীং চৌররক্ষণম্।”

দেশের সর্বত্র যেরূপ রাজপথাদি নির্মিত হইয়াছিল, তেমনি শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকদিগের পথশ্রম নিবারণের জন্ত পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষসারি রোপিত হইয়াছিল, বিশ্রামাগারসমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং জলাশয় প্রভৃতি খননের বিধি-ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। শীতাতপে ক্লিষ্ট হইয়া পথিকগণের বিশেষ হৃদশা ও কষ্ট

পথিকগণের
বিধি।

হয়। খাত্ত-পানীয় অভাবে তাহাদের প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা। সুতরাং পথিকগণের সর্বপ্রকার ক্লেশ-নিবারণের জন্ত অর্থশাস্ত্রে রাজার বিশেষ প্রয়াস দেখিতে পাই। রাজ-আদেশ অনুসারে পথের উভয় পার্শ্বে পণ্যপত্তন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষাদি রোপণ, এবং জলাশয় প্রভৃতি খননের বিষয় ‘জনপদনিবেশ’ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

“আকরকর্ম্মাস্তদ্রবাহস্তিবনব্রজবণিকপথ প্রচারান্ বারিহ্লপথপণ্যপত্তনানি চ নিবে-
শয়েৎ। সহোদকমাহার্ষোদকং বা সেতুং বন্ধয়েৎ। অগ্নেবাং বা বল্লতাং ভূমি-
মার্গবৃক্ষোপকরণামুগ্রহং কুর্যাৎ। পুণ্যস্থানারামাণাং চ সন্তুয় সেতুবন্ধাদপ্রকা-
মতঃ কর্মকরবলীবর্দাঃ কর্মকুয়ুঃ। ব্যয়কর্ম্মণি চ ভাগী স্তাৎ ন চাংশং লভেত।”

—জনপদনিবেশঃ, ৪৭ম পৃষ্ঠাঃ।

পথিপার্শ্বে হোটেলাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তদ্বারা পথিকগণের খাত্তাদি সরবরাহ হইত, উপরোক্ত বিবরণ হইতে তাহা উপলব্ধি হয়। আর বুঝা যায়, জনপদ-সমূহে “পুষ্পফলবাটবণ্ড-কেদারমূলবাণাসসেতুঃ (সমাহর্তৃসমুদয়প্রস্থানম্)” প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পথসমূহে “তুল্যশীলপুংশলীপ্রাপাবিককথাবকাশভোজনদাতৃতি (বাক্যকর্ম্মামুযোগ)” স্থাপিত হইয়াছিল। ‘মুদ্রাধ্যক্ষ’ প্রকরণেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়; যথা,—“কুপসেতুবন্ধোৎসান্ স্থাপয়েৎ, পুষ্পফলবাটাংশ্চ।” কর্ষণ-ক্ষেত্রে গমনের জন্ত অর্থশাস্ত্রে সযোনীর পথের এবং হুর্গাদিতে গতিবিধির উদ্দেশ্যে ‘বৃহ-পথের’ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। রাজ্যমধ্যে কুবি-শিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং অসংখ্য হুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এতদ্বারা তাহা উপলব্ধি হয়। কোটিল্য-প্রবর্তিত নীতি-সমূহ জনহিতসাধনে বিশেষ সাহায্যতা করিয়াছিল। তাহার নিয়োজিত বিধি-ব্যবস্থা যে অশেষ বহুদর্শিতার ও হৃদদর্শিতার পরিচায়ক, বিবিধ বিধানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

জলপথ ও জলযানাদি ।

[জলপথের প্রসঙ্গ,—জলপথ ব্যবস্থায় সামরিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা ;—কূলপথ, নদীপথ প্রভৃতি ;—জলযানাদির ব্যবস্থা,—সংঘাতি, হিংস্রিকা, মহানাব, প্রবহণ, ক্ষয়িকা প্রভৃতি বিভিন্ন জলযান ;—কাঠসজ্জাত, বেগুনসজ্জাত, ছতি, প্রব প্রভৃতি জলযান ;—সেতু ও বান পরিচালকগণের উল্লেখ ;—নবধাকের কর্তব্য ;—শুল্ক-গ্রহণের ব্যবস্থা ।

স্থলপথে গতিবিধির সুব্যবস্থা যেমন বিবিধ উন্নতির পরিচায়ক, জলপথে গতাগতির সুবন্দোবস্তও তেমনি বিবিধ উৎকর্ষের পরিজ্ঞাপক । বিভিন্ন নামধেয় বহু রাজপথের সমাবেশে

রাজধানীর সহিত প্রান্তদেশ পর্য্যন্তের সম্বন্ধ যেমন সুদৃঢ় হইয়াছিল ; জল-
জলপথ । পথে বিভিন্ন যানবাহনাদির সুবন্দোবস্তে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্যের

তেমনই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । দেশের বিভিন্ন অংশের সহিত সম্বন্ধ রক্ষায় রাজনীতিশাস্ত্রে স্থলপথের প্রয়োজনীয়তা যেমন স্বতঃসিদ্ধ, জলপথের উপযোগিতাও তেমনি অবিসংবাদিত । ভারতবর্ষ—নদনদীবহুল । সুতরাং জলপথ ব্যতীত একমাত্র স্থল-পথে সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে । সর্বশাস্ত্রদর্শী মহামতি চাণক্য তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন ; আর তাহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি বিভিন্ন জলপথের এবং জলযানাদির ব্যবস্থা বিহিত করিয়াছিলেন । পরন্তু জলপথের ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের জন্ত তিনি স্বতন্ত্র একটা সামরিক বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন । জলপথে গমনাগমন ও পণ্য-সরবরাহ অপেক্ষাকৃত স্থলপথে হইতে পারিত । শুল্কাদির পরিমাণও কম ছিল । কিন্তু জলপথ অপেক্ষা স্থলপথ নিরাপদ বলিয়া কোটিল্য স্থলপথেরই প্রাধান্য খ্যাপন করিয়াছেন । যথা,—

“এতেন বণিকৃপথো ব্যাখ্যাভঃ । তত্রাপি—‘বারিহ্লপথয়োবারিপথঃ শ্রেয়ান্, অল্পব্যয়-
ব্যায়ামঃ প্রভূতপণ্যোদয়শ্চ’—ইত্যাচার্ঘ্যাঃ । নেতি কোটিল্যঃ—সংরুদ্ধগতিরসার্বকালিকঃ
প্রকৃষ্টভরযোনির্নিশ্চিতিকারশ্চ বারিপথঃ ; বিপরীতস্থলপথঃ । বারিপথে তু কূল-
সংযানপথয়োঃ কূলপথঃ পণ্যপট্টগবাহল্যাচ্ছেদ্যান্নদীপথো বা সাতত্যাধিবহাবাধস্বাচ্চ ।”

—কর্ণসঙ্কিঃ, ২৯৮ম পৃষ্ঠাঃ ।

এতদ্বারা বণিকৃপথের বিষয় বিবৃত হইতেছে । আচার্য্যের মতে বারিপথ ও স্থলপথ এতদ্ভয়ের মধ্যে বারিপথ শ্রেয়ঃ । কারণ, বারিপথে অল্পব্যয়ে প্রভূত পণ্য সংবাহিত হইতে পারে । কিন্তু কোটিল্য তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন,—বারিপথে নানা বিপদ-আপদের সম্ভাবনা । সকল ঋতুতে জলপথ সুগম নহে । সময় সময় জলগতি রুদ্ধ হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে এবং বিপদ-আপদের প্রতিকার হওয়াও সম্ভবপর নহে । কিন্তু স্থল-পথে সে সকল কোনও আশঙ্কাই নাই । বারিপথের মধ্যে কূলপথ ও সংযানপথ প্রশস্ত । এতদ্ভয়ের মধ্যে আবার কূলপথই শ্রেষ্ঠ । পণ্যপত্তন প্রভৃতির জন্ত নদীপথ অহুপযোগী নহে ।

“তত্রাপি স্থলমোদকং বেতিঃ ? মহতঃ স্থলাদন্নমোদকং শ্রেয়স্ সাতত্যাধিবহাবাহিতস্বাচ্চ

কলানাম্ ।...বারিহ্লপথভোগরোরনিত্যো বারিপথভোগো নিত্যস্থলপথভোগ ইতি ॥”

“অনবসিতসঙ্কিঃ” প্রকরণের উল্লিখিত বর্ণনায় বহু হইতে দ্বিবিধ জলপথের পরিচয় পাওয়া যায় । প্রথম—কূলপথ ; দ্বিতীয়—সংযানপথ । কূলপথ—ক্ষুদ্র নদী ও খনিজ নাল প্রভৃতি দ্বারা গমনাগমনের পথ । শুল্কাদির সুলভ হারের জন্ত পণ্যব্যবসারিগণ কূলপথই প্রধানতঃ ব্যবহার

করিতেন। সংযানপথ—মহাসমুদ্রাদি দ্বারা বিদেশে গমনাগমনের পথ। মহাসমুদ্র এবং সমুদ্র মধ্যে ‘সংযানপথ’ বিশেষরূপে চিহ্নিত ছিল। তাহা প্রাচীন ভারতের নৌ-বিভাগ-সংক্রান্ত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের পরিচায়ক।

অর্থশাস্ত্রকার কেবলমাত্র জলপথের উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। জলপথে গমনাগমনের জন্ত তিনি যান-বাহনাদির ব্যবস্থাও বিহিত করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—‘বারিপথ ভয়সঙ্কুল।’ তাই সে ভয় নিবারণের জন্ত তিনি বিবিধ উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। সেই উপায়-পরম্পরা নির্দেশেই জলযানাদির

জলযানাদির
ব্যবস্থা।

পরিকল্পনা। যানাদির মধ্যে জাহাজাদি বৃহৎ যান এবং তরণী প্রভৃতি ক্ষুদ্র যানের উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে আরও প্রতীপন্ন হয়, সে সময়ে অতিদুরন্তিত বিদেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত ‘অরুদ্ববৃত্তমবরুদ্ধে চ বৃত্তিঃ’ অংশে ‘সাথ্যবানপাত্রানি’ শব্দের আলোচনায় তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। “নাবধ্যক্ষ” ও “আত্মরক্ষিতকম্” পরিচ্ছেদদ্বয়ের আলোচনায় প্রতীপন্ন হয়, সে সময় অষ্টবিধ জলযানের প্রচলন ছিল। আর সেই সকল জলযানের এক একটি এক এক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইত। নাবধ্যক্ষ প্রভৃতি প্রকরণে জলযানাদি সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে এক বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তৎপ্রসঙ্গে মহামতি কোটিল্য বলিয়াছেন,—

“সংযাতীর্ণাবঃ ক্ষেত্রামুগতঃ শুক্লং যাচেত। হিংস্রিকা নির্ঘাতয়েৎ। অমিত্রবিষ-
যাতিগাঃ পণ্যপত্তনচারিত্রেপযাতিকান্শচ। শাসকনিয়ামকদাত্ররশ্মিগ্রাহকাৎ-
সেচকাধিষ্ঠিতাশ্চ মহানাবো হেমন্ত-গ্রীষ্মতর্ষাশ্চ মহানদীবু প্রযোজয়েৎ। ক্ষুদ্রকাঃ
ক্ষুদ্রিকামু বর্ষাশ্রাবণীশ্চ। বদ্ধতীর্থাশ্চৈতঃ কর্ষাঃ রাজদ্বিষ্টকারিণাঃ তরণভয়াৎ।
অকালেহতীর্থে চ তরতঃ পূর্নসূসাহসদণ্ডঃ কালে তীর্থে চ অনিসৃষ্টতারিণঃ পাদোন-
সপ্তবিশংতিপণঃ তরাত্যয়ঃ। কৈবর্তকাঠতৃণভারপুষ্পফলবাটমণ্ডগোপাল্কানামন-
তারসসম্ভাব্যদুতীশুপাতিনাং চ সেনাতাণ্ডপ্রচারপ্রয়োগানাং চ ; স্বতরনৈস্তরতাং ;
বীজভক্তদ্রব্যোপকরাংশ্চানুপগ্রামাণাং তারয়তাম্।...শাস্ত্রমুক্তাগ্রাহিণো নৌহাট-
কান্দহাঃ স্বনোভির্বা তরয়েয়ুঃ।”—নাবধ্যক্ষ, ১২৬ম পৃষ্ঠা ॥ “মৌলপুরুষাধিষ্ঠিতং
বানবাহনমারোহেৎ। নাবং চাপ্তনাবিকাধিষ্ঠিতামন্তনোপ্রতিবন্ধাঃ বাতবেগবশাং চ
নোপয়েৎ।”—আত্মরক্ষিতকম্, ৪৪ম পৃষ্ঠা ॥ প্রবহণনিমিত্তমেকোহমাত্যঃ সর্বান-
মাত্যানাবাহয়েৎ ; (প্রবহণ—‘সামুদ্রিকাঃ ব্যাপারিণঃ মহাসমুদ্রং প্রবহণৈস্তরন্তি’ ইতি
উত্তরাধ্যায়নসূত্রটীকায়াম্)”—উপধাভিশশৌচার্শৌচজ্ঞানমমাত্যানাম্, ১৭ম পৃষ্ঠাঃ ॥

উক্ত অংশ হইতে সাত প্রকার জলযানের পরিচয় পাওয়া যায় ; যথা—(১) সংযাতীর্ণাব ; মহাসমুদ্রে গমনাগমনের জলযান। বন্দরে ইহার শুক্ল গ্রহণ করা হইত। (২) হিংস্রিকা—জল-দস্যুগণের পোত বা তরণী। সমর-বিভাগ ইহাকে ধ্বংস করিবার আদেশ দিয়াছেন। দৃষ্টিমাত্র ইহার অনুসরণ করিয়া যেখানে সেখানে ধৃত করিতে হইবে। (৩) শক্র-দেশীয় পোতের নাম—অমিত্রবিষযাতিগ। পণ্যপত্তনের নিয়মাদি লঙ্ঘন করার জন্ত ইহাদের প্রতিও ঐরূপ দণ্ডের বিধান ছিল। (৪) মহানাব ;—বৃহৎ নদনদী-সমূহে যাতায়াত করিত। সারা বৎসর ইহাদের

গতিবিধি অব্যাহত থাকিত। (৫) ক্ষুদ্রকা নাব—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সমূহে বিচরণ করিত। প্রাণের বর্ষীয় ক্ষুদ্র নদনদী-সমূহ প্রাকৃতি হইলে ইহাদের চলাচল আরম্ভ হইত। রাজার বিশ্বাসী নাবিক পরিচালিত যে যানে রক্ষি-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা আরোহণ করিতেন, সে যান (৬) 'আপ্তনাবিকামিষ্টিত নৌ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছে। সম্রাটের নিরাপদ জন্ত অস্ত্র তরঙ্গীর সহিত উহা সজ্জা থাকিত। রাজা যে সময়ে জলযানে আরোহণ করিতেন, সে সময়ে তীরদেশে সৈন্য সুসজ্জিত থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। জলযায় কড়ুক বিনষ্ট যানে তিনি কখনও আরোহণ করিতেন না। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার নৌ-যানের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সমুদ্রগামী (৭) প্রবহণ এবং (৮) 'শঙ্খমুক্তাগ্রাহিণঃ নাবঃ' উল্লেখ করা যায়। শঙ্খ-মুক্তাগ্রাহিণঃ নাবঃ—সমুদ্র মধ্যে মুক্তা-শুষ্কি সংগ্রহের জন্ত নিযুক্ত থাকিত। 'নৌহাটক' বা যথারীতি কর প্রদান করিলে, উহা সাধারণের ব্যবহারের জন্তও প্রদান করা হইত।

নদী-পথে গমনাগমন জন্ত পূর্বোক্ত যানাদি ব্যতীত আরও কতকগুলি নৌ যান ব্যবহৃত হইত। সেগুলির আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। তাহার কতকগুলি ভেলা প্রভৃতি সদৃশ।

বিবিধ
জলযান।

বাস্পীয় পোতাধিতে যেমন জীবনরক্ষার উপযোগী পেটিকা সজ্জা থাকে, কতকগুলি জলযান সেইরূপ আকৃতি-প্রকৃতি-বিশিষ্ট। অর্থশাস্ত্রের 'উপ-

নিপাতপ্রতিকার' প্রকরণে সেই সকল জলযানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই সকল যানের নাম—কাঠগজ্বাত, বেণুগজ্বাত, অলাবু, চর্ম্মকরগু, ছত্তি, প্লব, গণ্ডিকা, বেণিকা প্রভৃতি। বিভিন্ন উপকরণে পূর্বোক্ত যান নির্মিত হইয়াছিল। কাঠসমষ্টি একত্রেবদ্ধ করিয়া ভেলার ভায় যে যান প্রস্তুত হইত, তাহার নাম—কাঠগজ্বাত; বংশখণ্ডের দ্বারা ঐরূপ প্রস্তুত যান—বেণু-সংযাত। অলাবু-নির্মিত জলযান—অলাবু আখায়, চর্ম্মপরিবেষ্টিত পেটিকাকার যান চর্ম্মকরগু নামে, কেবলমাত্র চর্ম্মনির্মিত যান চর্ম্মকরগু অভিধানে অভিহিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় ডোঙ্গা বা শালুতির আকৃতি-বিশিষ্ট জলযান—প্লব এবং গণ্ডার চর্ম্মে নির্মিত জলযান—গণ্ডিকা নামে অভিহিত হইত। বেত্র দ্বারা বুনাইয়া যে যান প্রস্তুত করা হইত, তাহার নাম—বেণুকা। বেণুকা, গণ্ডিকা, অলাবু, চর্ম্মকরগু প্রভৃতি জলযান অধুনা এতদ্রুপে দৃষ্ট হয় না। প্লব ও বেণুগজ্বাত—কোনও কোনও স্থানে প্রচলিত আছে। কাঠগজ্বাত—আধুনিক নৌকার আকারে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বাহা হউক, ঐ সকল জল-যান সম্বন্ধে কোটিল্য নিম্নবিধ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

“বর্ষারাত্রমল্পপগ্রামাঃ পূরবেলামুৎসজ্য বসেযুঃ। কাঠবেণুনাবশ্চাপগৃহীযুঃ। উহমান-
মলাবুদৃতিপ্লবগণ্ডিকাবেণিকাভিস্তারয়েযুঃ। অনতিসরতাং দ্বাদশপণো দণ্ডঃ অস্তত্র
প্লবহীনেভাঃ।”—উপনিপাতপ্রতীকারঃ, ২০৬ম পৃঃ ॥ “হস্তিস্তম্ভসংক্রমসেতুবন্ধনৈ-
কাঠবেণুগজ্বাতৈঃ, অলাবুচর্ম্মকরগুদৃতিপ্লবগণ্ডিকাবেণিকাভিস্চোদকানি ভারয়েৎ ॥”

জলযানাদি ভিন্ন অস্ত্র উপায়েও নদী প্রভৃতি উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তদ্রূপেই নদীর উপর সেতু নির্মিত হইয়াছিল, নৌ-সেতু ছিল এবং হস্তিদ্বারা সেতু প্রস্তুত করা হইত। যথা,—
নদীপর্ব্বতহ্রগীয়াভ্যাং নদীহ্রগীয়াভূমিলাভঃ প্রেরান্। নদীহ্রগং হি হস্তিস্তম্ভ-
সংক্রমসেতুবন্ধনৌভিস্ফাদ্যামনিত্যগাস্তীর্থ্যমপস্রাবদকং চ ॥—ভূমিসন্ধিঃ, ২৯২ম পৃষ্ঠাঃ।

“নিবিরমার্গসেতুকুপতীর্থশোধনকর্মমস্ত্রাযুধাবরণোপকরণগ্রাসবহনমায়োধানাচ্চ প্রহরণা-
বরণপ্রতিবিদ্ধাপানয়নমিতি বিষ্টিকর্ম্মাণি ।”—পথ্যচরখহস্তিকর্ম্মাণি চ, ৩৬৯ম পৃষ্ঠা: ॥

যানাদি-পরিচালনায় যে লোকজনের আবশ্যক হইত, তাহাদের কেহ শাসক, কেহ নিয়ামক, কেহ দাত্ররশ্মিগ্রাহক, কেহ উৎসেচক প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়াছে । * এই সকল কর্ম্মচারী যানাদির গতিবিধির নিয়ামক ছিলেন । ‘নাবধ্যক্ষ’ প্রকরণে এতৎসম্বন্ধে কৌটিল্য বলিয়াছেন,— “শাসকনিয়ামকদাত্ররশ্মিগ্রাহকোৎসেচকাদিষ্ঠিতাশ্চ ।” নোপথ এবং নৌযানাদির বিষয় আলোচনায়ও শ্রেষ্ঠ রাজনীতি বিষয়ে কৌটিল্যের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় । সুশিক্ষিত কর্ম্মচারিগণের দ্বারা জলযান পরিচালিত না হইলে, জলপথে নানা বিপদের সম্ভাবনা । সে বিপদ-নিবারণের অশেষ প্রয়াস অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় ।

‘নাবধ্যক্ষ’ প্রকরণে অধ্যক্ষের কর্তব্য নির্দেশ হইয়াছে । নাবধ্যক্ষকে নৌ-বিভাগ-সংক্রান্ত সকল শিক্ষায় বিশেষরূপে শিক্ষা লাভ করিতে হইত, ‘নাবধ্যক্ষ’ অধ্যায়ের আলোচনায় তাহা বেশ উপলব্ধি হয় । জলযান-নির্মাণ-কার্য্য পরিদর্শন ব্যতীত, তাঁহার আরও নাবধ্যক্ষের কর্তব্য । শুষ্ক-সংগ্রহ, টোল আদায়, জাহাজ ও নৌক প্রভৃতি বিভিন্ন জলযানের সংস্কার, বৈদেশিকগণের গমনাগমন লক্ষ্য করা এবং সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিগণকে ধৃত করা প্রভৃতিও তাঁহার কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল । এ সকল কার্য্যের জন্য ‘শুকাধ্যক্ষ’ প্রভৃতি স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন বটে ; কিন্তু তথাপি এরূপ ব্যবস্থার বুঝা যায়, রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত সকল কার্য্যের দায়িত্ব-ভার প্রায় সকল কর্ম্মচারী-কেই বহন করিতে হইত । সুতরাং বিশৃঙ্খলা-ব্যভিচার প্রশ্রয় পাইত না । নাবধ্যক্ষের কর্তব্য বিষয়ে অর্থশাস্ত্রকার যে আদেশ বিহিত করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

“নাবধ্যক্ষস্বয়মুদ্রসংযাননদীমুখতরপ্রচারান্ দেবসরোবিসরোনদীতরাংশ্চ স্থানীয়াদিষবে-
ক্ষেত । তদ্বেলাকুলগ্রামাঃ কৰ্কেপুং দদ্যাঃ । মৎস্যবন্ধকা নৌকহাটকং বড়ভাগং
দদ্যাঃ । পত্তনামুত্তং শুষ্কভাগং বাণিজ্যো দদ্যাঃ । যাত্রাবেতনং রাজনোভিস্থ-
প্পতস্তঃ । মুক্তাগ্রাহিণো নৌহাটকান্দদ্যাঃ স্বনোভির্বা তরেযুঃ । অধ্যক্ষশ্চবাং খল্যক্লেপ
ব্যাখাতঃ । শজপত্তনাদ্যক্ষনিবন্ধং পণ্যপত্তনচারিৎ নাবধ্যক্ষঃ পালয়েৎ । মুচবাতা-
হতাং তাং পিতবাহুগৃহীয়াৎ । উদকপ্রাপ্ত পণ্যমশুকর্ম্মশুকং বা কুর্ধ্যাৎ । তথা
নির্দিষ্টাশ্চৈতঃ পণ্যপত্তনযাত্রাকালেযু প্রেযয়েৎ । সংযাতীর্নাবঃ ক্ষেত্রান্নগতাঃ শুষ্কং
যাচেত । ০০০ ত্রাঙ্কণপ্রজিতবালবৃদ্ধব্যাধিতশাসনহরণগর্ভিণ্যো নাবাধ্যক্ষমুদ্রাভিষ্ঠরেযুঃ ।

কৃতপ্রবেশাঃ পারবিঘ্নিকাঃ সার্থপ্রমাণা বা বিশেষুঃ ।”—নাবধ্যক্ষ, ১২৬ম পৃষ্ঠা: ॥

নাবধ্যক্ষের কর্তব্য বিষয়ে এইরূপ আরও বিধান অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় । প্রসঙ্গক্রমে তাহার অধিকাংশ পূর্ব পূর্ব বিষয়ের আলোচনার প্রদত্ত হইয়াছে । ফলতঃ, পণ্যাধ্যক্ষ,

* আধুনিক ব্যবহার সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায়,—শাসক ‘সারেক’ পদবাচ্য । নিয়ামক—হাল-চালনাকারী এবং পরিচালক । দাত্ররশ্মিগ্রাহক—রশ্মি দ্বারা যাহারা পোত আবদ্ধ করে ; উৎসেচক—গুথানি প্রভৃতি । কর্তব্য উত্তম এক ছিল কি না, তাহা বলা যায় না । তবে শব্দ-সমূহের আলোচনায় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ।

শুকাধ্যক্ষ প্রভৃতির কতকগুলি কর্তব্য কার্য্য নাবধ্যাক্ষকে সম্পন্ন করিতে হইত। যাহা হউক, উপরিউক্ত ‘কৃতপ্রবেশাঃ পারবিষয়িকাঃ সার্থপ্রমাণো বা বিশেষ্যুঃ’ বাক্য হইতে বুঝা যায়, যে সকল বৈদেশিক বণিক বহু বার পণ্যপত্তনে আগমন করিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে শুক গ্রহণ সম্বন্ধে কোটিল্য নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যে ভারতীয় বাণিজ্য-প্রবাহে তৎকালে প্রাবিত হইয়াছিল এবং ভারতের বাণিজ্য-প্রসার যে অতি দূর-দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এতদ্বারা তাহা উপলব্ধি হয়। অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বিধি-নিষেধাদির উল্লেখ দৃষ্টে সে ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়। তৎকালে সুদূর চীনদেশে ভারতের বাণিজ্য-প্রসার বিস্তৃত হইয়াছিল। * ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও প্রাচীন ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। ফলতঃ, কোটিল্যের সমসময়ে প্রাচীন ভারত সর্ব-বিষয়েই উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল।

শুকাদির বিষয় আলোচনা করিলেও বাণিজ্য-প্রসারের পরিচয় পাওয়া যায়। জলপথে এবং স্থলপথে গতিবিধির সুব্যবস্থা সম্বন্ধেও তাহা বিশেষ উৎকর্ষের নিদর্শন। স্থলপথ ও জলপথ উভয় পথে রাজ্য-মধ্যে যে সকল প্রকার পণ্য আমদানি রপ্তানি হইত, শুক-
 শুক
 নিক্ষেপণ। ব্যবহার প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ আছে। আমদানি ও রপ্তানি উভয় কালে শুক-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্যের শুক-পরিমাণ বিভিন্নরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং জলপথে যে পণ্য সংবাহিত হইত, তাহার মাণ্ডলও অল্প ছিল। প্রতারণা পূর্বক শুক-বঞ্চনার চেষ্টা করিলে দণ্ড হইত। কোন্ জিনিষে কি পরিমাণ শুক প্রদান করিতে হইবে, তাহার বিধি-ব্যবস্থায় কোটিল্য বলিয়াছেন,—

“শুকব্যবহারঃ বাহুমভ্যন্তরং চাতিথ্যম্। নিষ্ক্রাম্যং প্রবেশ্যং চ শুকম্। প্রবেশ্যানাং মূল্যপঞ্চভাগঃ। পুষ্পফলশাকমূলকন্দপল্লিকাবীজশুকমংস্ত্রমাংসানাং ষড়্ভাগং গুল্মীয়াং শঙ্খব্রজমণিমুক্তাপ্রবালহারানাং তজ্জাতপুরুষৈঃ কারয়েৎ কৃতকর্মপ্রমাণকালবেতনফল-নিষ্পত্তিভিঃ। ক্ষৌমহুঙ্কলক্রিমিতানকঙ্কটহরিতালমনশশিলাহিস্থলুকলোহবর্ণধাতুনাং চন্দনাগুরুকটুকিধাবরণানাং সুরাদস্তাজিনক্ষৌমহুঙ্কলনিকরাস্তরগপ্রাবরণক্রিমিজাতা-নামৈজল্লকস্ত চ দশভাগঃ, পঞ্চদশোভাগো বা। বস্ত্রচতুষ্পদদ্বিপদসূত্রকার্পাসগজ্জৈবজ্য-কাঠবেণুবকলচর্মমৃদানাং ধান্যস্নেহক্ষারলবণমজ্জাপকান্নাদীনাং চ বিংশতিভাগঃ পঞ্চবিংশতিভাগো বা। দ্বারাদেয়ং শুকপঞ্চভাগ আয়ুগ্রাহিকং বা যথাদেশোপকারং স্থাপয়েৎ।”

প্রদেশজাত বাহিক এবং নগরভ্যন্তর জাত আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক—এই ত্রিবিধ পণ্যে শুক গ্রহণ করিবে। আমদানি ও রপ্তানি উভয় কালেই শুক গ্রহণ বিহিত। যে সকল পণ্য আমদানি হইবে, তাহার শুক-পরিমাণ—মূল্যের একপঞ্চমাংশ। পুষ্প, ফল, শাক, মূল, কন্দ, পল্লিক, বীজ, শুক মংস্ত্র ও মাংস প্রভৃতিতে যষ্ঠাংশ শুক-গ্রহণের ব্যবস্থা বিহিত ছিল। শঙ্খ, মণি ও মুক্তা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। ঐ সকল দ্রব্য আহরণ করিতে যে সময়ের

* প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত উপনিধিকম্, ণ্যাদানম্, পণ্যাধ্যক্ষ, নাবধ্যক্ষ, মুদ্রাধ্যক্ষ, একাক্ষবধিনিক্ষেপঃ, অববৃদ্ধবৃত্তমববৃদ্ধে চ বৃত্তিঃ, বৈদেহকরকণম্, কর্ণদক্ষিঃ, কোণ-প্রবেশরত্নপরীক্ষাঃ, দুর্গনিবেশ প্রভৃতি অংশ উল্লেখ্য।

আবশ্যক হইয়াছে, যে ব্যয় পড়িয়াছে এবং যে বেতন দিতে হইয়াছে—তাহা হিসাব করিয়া, অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহার শুদ্ধ নির্ধারণ করিতেন। ক্ষোম, ছুকুল, ক্রিমিতান, কঙ্কট, হরিতাল, মনশিলা, হিজুল, লৌহবর্ণ ধাতু, চন্দন, অগুরু, কটুক, কিথ, আবরণ, মস্ত, হস্তি-দন্ত, অজিন, ক্ষোম, আস্তরণ, প্রাবরণ এবং ক্রিমিজাত অপরাপর দ্রব্যের মূল্যের ষোড়শাংশ শুদ্ধ গ্রহণের বিধি। কীটজাত দ্রব্য, মেঘজাত পশম এবং তদ্বিধ অপরাপর দ্রব্যে দশমাংশ হইতে পঞ্চদশাংশ শুদ্ধ গ্রহণ করা যাইতে পারিত। এতদ্ব্যতীত, বস্ত্র, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তু, সূত্র, কার্পাস, গন্ধ, ঔষধ, বেণু, বন্ধল, চর্ম্ম, মৃৎপাত্র, শস্ত্র, তৈলাদি স্নেহ-দ্রব্য, ফার, লবণ, মস্ত ও পক্ষ্ম প্রভৃতি দ্রব্যজাতে বিংশাংশ হইতে পঞ্চবিংশাংশ পর্য্যন্ত শুদ্ধ লইবার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। দ্বারদেশে গৃহীত পণ্যের শুদ্ধ অত্যাশ্র পণ্যের শুদ্ধ অপেক্ষা এক-পঞ্চমাংশ কম। এই সকল ব্যবস্থা ব্যতীত, উৎপত্তি-স্থানে পণ্যাদি ক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল। রাজ্যদেশে লঙ্ঘন করিলে অর্থদণ্ড হইত। পণ্যাদির শুদ্ধ ব্যতীত রাজকীয় পারাপারের স্থানে শুদ্ধ দিবার ব্যবস্থা ছিল। ‘নাবধ্যক্ষ’ প্রকরণে তদ্বিষয় উল্লিখিত আছে। সংহিতাদিতেও এইরূপ শুদ্ধাদির গ্রহণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন,—

“পণং যানং তরে দাপ্যং পৌরুষার্দ্ধপণং তরে। পাদং পশুশ্চ বোষিচপাদার্দ্ধং রিক্তকঃ পুমান্॥
 ভাণ্ডপূর্ণানি যানানি তীর্থং দাপ্যানি সারতঃ। রিক্তভাণ্ডাণি যৎকিঞ্চিৎ পুমাংসশ্চাপরিচ্ছেদাঃ॥
 দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ। নদীতীরেষু বহিষ্ঠাং সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্॥
 গর্ভিণী তু দ্বিমাসাদিস্থতা প্রব্রজিতো মূনিঃ। ব্রাহ্মণ্য লিঙ্গিনশ্চৈব নদাপ্যাস্তারিকং তরে॥”

শকটাদি পার করিতে হইলে পারের মাণ্ডল এক পণ লাগিবে। একজন পুরুষের বহনযোগ্য ভারে তাহার অর্দ্ধ পণ শুদ্ধ নাবিককে দিতে হইবে; পশু এবং জীলোক পারে চতুর্থাংশ পণ এবং ভারশূন্য মনুষ্য পারে পণের অষ্টম ভাগ শুদ্ধ প্রদানের বিধি। দ্রব্যরহিতগুণ ডোল, চাক প্রভৃতি খালিভারে যৎকিঞ্চিৎ মাণ্ডল লাগিবে। নদীমার্গে দূরাদূর বাতায়ত করিতে হইলে নদীর প্রবলতা ও স্থিরতা এবং ঐশ্বর্য্যাদি কাল বিবেচনায় তরমূল্য নির্ধারণ করিবে। সমুদ্র সমুদ্রে সম্ভবমত শুদ্ধগ্রহণের ব্যবস্থা। গর্ভিণী জীলোক, পরিব্রাজক, বাণপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণের পারাপারে তরপণ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। দ্রব্য-পরিপূর্ণ যান সকল পার করিতে হইলে, দ্রব্যের সারাদার অমুসারে শুদ্ধ গ্রহণ করিবে। অত্যাশ্র সংহিতা-গ্রন্থে পণ্য বা শুদ্ধ পরিমাণ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই। তবে শুদ্ধাদি গ্রহণের ব্যবস্থা বিহিত ছিল, তাহা সকল সংহিতায়ই দৃষ্ট হয়। যাজ্ঞবল্ক্য এবং বিষ্ণু শুদ্ধ-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নৌ-শুদ্ধাধ্যক্ষ স্থলজ শুদ্ধ গ্রহণ করিলে দণ্ডীয় হইবেন—এইরূপ বিধি মাত্র বিহিত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে সকল প্রকার পণ্য-দ্রব্য উৎপন্ন হইত—বস্ত্র কার্পাস প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কার্পাস হইতে সূত্র প্রস্তুত হইত, তদ্বারা শিল্পিগণ বিবিধ সূত্র ও বহুমূল্য বস্ত্র বয়ন করিতেন, এতদালোচনায় তাহা উপলব্ধি হয়। শিল্পাদি বিষয়ে এবং বাণিজ্যাদিতে প্রাচীন ভারত যে বিশেষ উন্নত ছিল, পৃথিবীর ইতিহাসের পূর্ববর্ত্তী খণ্ড সমূহে তদ্বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে তাহার পুনরালোচনা নিস্ত্রয়োজন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

জনহিতকর বিবিধ বিধানে আদর্শ ।

[জনহিতকর বিবিধ বিধানে রাজ্যের আদর্শ খাপন,—স্বাস্থ্যরক্ষার আদর্শ,—তথ্যবিধানে চিকিৎসার ব্যবস্থা,—ভেষজাগার, তৃতীয়া-চিকিৎসা, গর্ভব্যাধিসংস্থা প্রভৃতি ;—আত্মবৃত্তকগরীক্ষা,—সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের বন্দোবস্ত,—মিতাচারিতা সম্পর্কীয় বিবিধ বিধান,—রাজ্য-মধ্যে জনসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষা-কল্পে বিবিধ প্রয়াস ;—বিষ-পরীক্ষা,—সর্পবিষ প্রতিকার ;—জলাদির ব্যবস্থা, জারগিদারাদি-সংক্রান্ত বিধি-বিধান ;—খনি-সংক্রান্ত বিবিধ বিধি,—খনিজ খাদু-সমূহের উল্লেখ,—তাহাদের আকৃতি বর্ণ প্রভৃতি ;—জল-সরবরাহের ব্যবস্থা ;—বায়ুবিজ্ঞান, পরিমাণ-বিজ্ঞানাদি বিবিধ ব্যবহার এবং ক্রিমি নদী নাল প্রভৃতি ধমনে দেশের বিভিন্ন স্থানে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা ;—জনহিতকর বিবিধ বিধানে সে রাজ্যের আদর্শ খাপন ।]

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনেকে এ বিষয়ে সন্নিহান। তাঁহারা গ্রীসকে চিকিৎসা বিষয়ে আদিভূত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কোনও কোনও পাশ্চাত্য প্রস্তুতত্ববিৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অগাঢ় পারদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছেন। গ্রীসের পুরাতত্ত্বের আলোচনার প্রতিপন্ন হয়, চিকিৎসা-শাস্ত্রে গ্রীসের অভিজ্ঞতার মূল—এই ভারতবর্ষ। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—‘পীড়িত গ্রীকগণ পীড়া শাস্তির জন্য ব্রাহ্মণদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণগণ অমাহুবিদ্ধ কোশলে পীড়া শাস্ত করিয়া দিতেন। গ্রীসদেশীয় প্রসিদ্ধ তৈষজ্যতত্ত্ববিৎ ডিওস্কোরাইডস খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মৌলিকত্বদর্শনে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিশারদ ডাক্তার রয়েল ও ওয়াইজ এবং প্রসিদ্ধ প্রস্তুতত্ববিৎ ওয়েবার, এইচ এইচ উইলসন, স্যার উইলিয়ম হাণ্টার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুজাতির চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনার প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব খাপন করিয়া গিয়াছেন। ‘কিংস ইনষ্টিটিউট অব প্রিভেণ্টিভ মেডিসিন’ নামক বিজ্ঞান্য প্রতিষ্ঠা-কালে, অতি অল্প-দিন পূর্বে, মাজাজের ভূতপূর্ব গবর্ণর লর্ড এম্পথিল’ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের যে যশঃগৌরব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—তাহাতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রাচীন ভারতের মৌলিকত্ব বিষয়ে সকল সন্দেহ বিদূরিত হয়। • প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম—সকলেই চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন ভারতের নিকট গণী। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বাগদাদের কালিক হাকুন-অল-রসিদ হিন্দু তৈষজ্য-

* পৃথিবীর ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ডে, ‘প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানজ্ঞা’ প্রসঙ্গে এ সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই অংশের আলোচনার চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের অশেষ পারদর্শিতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে। সে প্রসঙ্গে মাজাজের ভূতপূর্ব গবর্ণর লর্ড এম্পথিলের বক্তৃতার কিয়দংশ উল্লিখিত আছে। পৃথিবীর ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ডের ২০০ পৃষ্ঠা ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি হইবে।

গণের বিশেষ সমাদর করিতেন। আরবী ভাষার লিখিত সরকারী কাগজ পত্রে দেখা যায়,—হাক্কল-অল-রসিদের রাজধানীতে দুই জন হিন্দু ভিষক প্রধান চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হইরাছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, তাঁহাদের নাম—মানাক ও সালে। তাঁহারা হাক্কল-অল-রসিদের নীড়া শাস্ত করিয়া বিশেষ যশস্বী হন এবং কালিক তাঁহাদিগকে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপ, আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হয়, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রাচীন হিন্দুগণই আদি এবং পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশ তদ্বিষয়ে প্রাচীন ভারতের নিকট ঋণী।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, শাস্ত্রগ্রন্থাদির আলোচনার তাহা সপ্রমাণ হয়। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সংহিতা, পুরাণ, হিন্দু-শাস্ত্রে বিজ্ঞমান। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইয়া গেলে, কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

তাঁহার স্থান পূরণ করা হইত, ঋগ্বেদে তদ্বিষয় উল্লিখিত আছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে কৌশল পান্দর্শিতা লাভ করিলে, এইরূপ গুরু দায়িত্বপূর্ণ অস্ত্র-চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করা বাইতে পারে, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ষোড়শাধিক শততম সূক্তের পঞ্চদশ ঋকে এই ব্যবচ্ছেদ প্রণালীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নিম্নে সেই ঋক উদ্ধৃত হইল,—

“চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণম্ আজা খেলস্ত পরিতব্ভ্যাম্ ॥

সদ্যো জংজ্বামায়সীং বিশপলাটৈ ধনে হিতে সর্ভবে প্রত্যাধত্তম্ ॥”

ঋকের টীকার টীকাকার সায়ণাচার্য্য যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল; যথা,—

‘অগস্ত্য পুরোহিতঃ খেলো নাম রাজা তস্ত সধক্সিনী বিশপলানামস্ত্রী, সংগ্রামে শত্রুভিঃ ছিন্নপদা আনীৎ। পুরোহিতেন অগস্তেন স্ত্রুতৌ অশ্বিনৌ রাজৌ আগত্য আরোময়ং পাদং সমংস্তাম্। তদেতদাহ ‘আজা’—আজৌ, সংগ্রামে, অগস্ত্য পুরোহিতস্ত—খেলস্ত রাজতঃ সধক্সিতাঃ বিশপলাথারা, ‘চরিত্রং’—চরণং, ‘বেরিব’—বেঃ পক্ষিণঃ, ‘পর্ণং’ পতন্তম্ ইব, ‘অচ্ছেদি হি’—পুরা ছিন্নমভুৎ খলু। হে অশ্বিনৌ! যুবাং অগস্ত্যেন স্ত্রুতৌ সস্তৌ, ‘পরিতব্ভ্যাম্’—রাজৌ, আগত্য, ‘সভঃ’—তদানী-মেব, ‘সর্ভবে’—সর্ভুঃ গন্তুম্ ইত্যর্থঃ, বিশপলাটৈ ‘আয়সীং’—লোহময়ীম্, ‘জংজ্বা’—জঙ্ঘীপলকিতং পাদম্, ‘প্রত্যাধত্তম্’—সন্ধানম্ একীকরণমিত্যর্থঃ কৃতবন্তৌ ॥”

মহাভারতের আদিপর্বে পরীক্ষিতের সর্পদংশনের বিষয় উল্লিখিত আছে। সর্পদংশন নিবারণ জন্ত সেখানে চিকিৎসা-বিজ্ঞাবিশারদ ভিষকগণের পরিচয় পাওয়া যায়। * আবার ভীষ্মপর্বে দেখিতে পাই,—ভীষ্ম এক সময় যুদ্ধে আহত হইরাছিলেন। অস্ত্রবিজ্ঞা-বিশারদ চিকিৎসকের

* পরীক্ষিতের তক্ষক-দংশন কাহিনী বিশেষ প্রসিদ্ধ। তক্ষক-দংশন-নিবারণে অশ্বৈর্য্য প্রায়শঃ অনেকের পরিজ্ঞাত। তখন বিব-চিকিৎসার পারদর্শী ভিষকগণ সর্বদা রাজসভাধানে বর্তমান ছিলেন। মহাভারতের ঐ অংশের বর্ণনার দেখা যায়, বিবদংশোধক সর্বপ্রকার ঔষধ পরীক্ষিতের জীবনরক্ষার সংগৃহীত হইরাছিল।

“সংস্রা যজ্ঞিষ্ঠৈব স তথা মন্ত্রতত্ত্ববিৎ। প্রাসাদঃ কারয়ামাস একস্তম্ভঃ হরকিতঃ।

রক্ষক বিন্দে তত্র ভিষকৌবদানি চ। ব্রাহ্মণ্যস্তুসিদ্ধান্ত সর্বতো বৈজ্ঞানিকম্ ॥”

—মহাভারত, আদিপর্ব, ৪২শ অধ্যায় ৩৫৮।

বারা তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। * মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে অস্ত্র-চিকিৎসার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। + মহানীলতন্ত্র, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতেও হিন্দুগণের চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিষয়ে পারদর্শিতার অশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। স্মৃতি-শাস্ত্রাদিতে ভেদজাদির উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রাতিপন্ন হয়, প্রাচীনকালে হিন্দুগণ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ও তৈবজ্য-তত্ত্বে অশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বাহা হউক, ঐতি-স্মৃতি-পুরাণাদিতে বর্ণিত অতি প্রাচীনকালের বিষয়-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ-যুগের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি, সে-সময়েও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষ লীর্ঘমান অধিকার করিয়া ছিল। বৌদ্ধ-গ্রন্থাদিতে ভারতবর্ষে দুইটি বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি তক্ষশীলার ও অপরটি কাশীর বা বারানসীর ধামে অবস্থিত ছিল। ঐ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র-শাস্ত্র আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-শাস্ত্রের আলোচনা বিশেষভাবে চলিয়াছিল। ‘মহাবঙ্গ’ নামক বৌদ্ধ-গ্রন্থে প্রকাশ—বুদ্ধদেবের অচ্যুতর জীবক চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি মন্তকের খুলি-সংক্রান্ত অস্ত্র-চিকিৎসার বশঃ-খ্যাতি লাভ করেন। ‘মালবিকাগ্নিমিত্রে’ ‘বিষট্টকেষর’ বিশেষ প্রশংসা পরিকীর্ণিত আছে। ‡ বুদ্ধদেবের সমসময়ে বা তাঁহার কিছু কাল পূর্বে আত্রের তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। কথিত হয়, জীবক তাঁহার নিকট চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বুদ্ধদেব—খৃষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং ঐ সময়েও ভারতবর্ষ যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান অতি উচ্চ আসন লাভ করিয়া ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুশ্রুত-সংহিতা—চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রধান অঙ্গস্থানীর। কথিত হয়, কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাশীরাজ শিক্ষার্থীদিগকে মুশ্রুত শিক্ষা দিতেন। বৌদ্ধ-

পরশুশাস্ত্রী ভীষ্মের ক্ষত-চিকিৎসার ব্যবস্থা বিষয়ে, মহাভারতের ভীষ্মপর্বে, ১২১ম অধ্যায়ে আছে,—

“উপাতিষ্ঠন্নথো বৈজ্ঞান্যঃ শল্যোদ্ধরণকোবিদাঃ। সর্কোপকরণৈশু ক্ৰান্তাঃ কুশলৈঃ সাধু শিক্ষিতাঃ।

তান্ দৃষ্ট্বা জাহ্নবীপুত্রঃ প্রোবাচ তন্নয়ঃ তব। ধনং দত্ত্বা বিস্কৃত্যস্তাঃ পুঞ্জয়িত্বা চিবিৎসকাঃ।

এবং গতে মরেনানীঃ বৈজ্ঞান্যঃ কার্যমিহাতি কিং। ক্ষতধর্মো প্রশস্তাঃ হি প্রাপ্তোহস্মি পরমঃ গতিঃ।

নৈব ধর্মো মহীপালাঃ পরভগ্নগতস্ত মে। এতৈরেব শরৈশ্চাহং দক্ষবোধ্যসি নরাধিপাঃ।

তত্রস্তা বচনং তস্ত পুত্রো দুর্বোধনস্তব। বৈজ্ঞান্য বিস্কৃত্যাসান পুঞ্জয়িত্বা বধ্যত্বর্হতঃ।

অর্ধ-চিকিৎসা ও স্মৃতি-ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে মনুসংহিতার নিষেধাংশে বিহিত হইয়াছে। মনু-সংহিতার, তৃতীয় অধ্যায়ে (১৫২ম শ্লোক) এবং চতুর্থ অধ্যায়ে (২১২ম শ্লোক) এতদ্বিষয় উল্লিখিত আছে,—

“চিকিৎসকান্মেবলকান্যাসবিক্রিয়ন্তথা। বিপণেন চ জীবন্তী বর্জ্যঃ হার্বাকব্যারোঃ।”

“চিকিৎসকস্ত মৃগয়োঃ ক্রুরস্তোচ্ছিষ্টভোজিনাঃ। উগ্রাঃ স্ত্রীকারঃ চ পর্ষ্যচাত্তমনির্দলম্।”

অস্ত্র-চিকিৎসা নিষেধীয় হইলেও সে সময়ে যে বিবিধ যন্ত্রাদির সাহায্যে ব্যবচ্ছেদাদি চিকিৎসা প্রচলিত ছিল, এতদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়।

‡ ‘মালবিকাগ্নিমিত্রে’ এতৎসম্বন্ধে নিম্নরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; বখা,—

“সহি —দেবীএ ইবঃ সিন্ধিসআসারী আণীদগাগমুদালগাহঃ অকুলীঅজঃ নিপিন্ধঃ শিভালঅন্তী তুহ উবালকো গড়িন্ধি।”—প্রথম অধ্যায়।

“জর —জেরু জেরু জটী। ধুমিস্তী বিপবেদী। উদকুভবিধাণেণ সগমুদিসা করিমকী। তা অবেদীঅরুহি

“ধারি।—এবং সগমুদঅজ অকুলীঅজম্। পজ্জা সহ হথৈ পম্।”—চতুর্থ অধ্যায়।

দিগের বিনয়শিষ্টিকাদি গ্রন্থেও হিন্দু জাতির চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-সমূহ বর্তমান রহিয়াছে। চরক, সুশ্রুত, অষ্টাঙ্গহৃদয়, বাগভট প্রভৃতি চিকিৎসা-গ্রন্থ আজও চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

বেদাদিতে অতি আদিকালের চিকিৎসাদির বিষয় পরিবর্ণিত। তৎপরবর্ত্তি সূত্র-সংহিতাদির দৃষ্টান্তও অতি প্রাচীন-কালের গৌরব ঘোষণা করে। সে সকল বিষয়ের বিচারে প্রবর্ত্তিত না

হইয়া বীজবৃষ্টের জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, তখনও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে হিন্দুগণ পূর্ণ-চিকিৎসা-ব্যবস্থা।

গৌরব অক্ষুর রাখিয়াছিলেন। অষ্টাঙ্গ প্রাচীন গ্রন্থের সহিত চাণক্যের অর্ধশাস্ত্রের আলোচনার এতদ্বিষয়ে দৃঢ় ধারণা বঙ্গবল হয়। ঐতিহাসিক আরিয়ান বলিয়াছেন,—আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার সহিত তিব্বতগণ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্পবিষচিকিৎসার তাঁহারা কেহই পারদর্শী ছিলেন না। পঞ্জাব প্রদেশ সর্পবহুল। আলেকজান্ডারের সৈনিকগণের মধ্যে সর্পদংশনে প্রায়ই মৃত্যু সংঘটিত হইত। সুতরাং বাধা হইয়া তাঁহাকে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নির্যাকীসের বর্ণনার প্রকাশ,—বৈজ্ঞানিকগণের অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে সর্পবিষ-শিক্ষার জন্য আলেকজান্ডার গ্রীক-দেশীয় চিকিৎসকগণের প্রতি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনীসের বর্ণনার প্রকাশ,—মহামতি চাণক্যের বিধানে তৎকালে বৈদেশিকগণের চিকিৎসাদির বিশেষ ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ছিল। এমন কি, তাঁহাদের কাহারও মৃত্যু ঘটিলে এদেশীয়গণই তাঁহাদের সংকার করিতেন। বিদেশীয়গণের প্রতি সে সময় হিন্দুগণ বিশেষ করুণা প্রদর্শন করিতেন, তাঁহাদের চিকিৎসাদির ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এ সকল বিধান প্রাচীন ভারতের মহত্বের নিদর্শন, সন্দেহ নাই। বাহা হউক, সর্পবিষ প্রতিকারে প্রাচীন ভারত অদ্বিতীয় ছিল, নির্যাকীসের বর্ণনা হইতে তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। বিশাল রাজ্যের স্বাস্থ্যবিধান উদ্দেশ্যে মহামতি কোটিল্য যে সকল বিধি-ব্যবস্থা নিরূপিত করিয়াছিলেন, অর্ধশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। প্রথমতঃ, তিব্বক বা চিকিৎসকের বিষয়। অর্ধশাস্ত্রে প্রথমতঃ তিব্বক, চিকিৎসক, জালনীবিৎ, গর্ভব্যাদি-সংস্থা বা স্তৃতিকাগারচিকিৎসক, পুত্ৰচিকিৎসক—এই কয় প্রকার চিকিৎসকের পরিচয় পাই। নাগরক-প্রণিধি, নিশাক্তপ্রণিধি, আত্মরক্ষিতক প্রভৃতি অধ্যায়ে চিকিৎসকগণের পরিচয়াদি লিপিবদ্ধ আছে। সে পরিচয়-প্রসঙ্গে অর্ধশাস্ত্রের উক্তি নিয়ে প্রদত্ত হইল; যথা,—

“স্তুতিকচিকিৎসকপ্রোক্তপ্রদীপারমনাগরকতুর্ব্যাপ্রেকারিনিমিত্তস্ত্রুত্বেতিচাগ্রাহা।”

—নাগরকপ্রণিধি, ১৪৩ম পৃষ্ঠাঃ। “দ্বীনিবেশা গর্ভব্যাদিসংস্থাভ্যঃ। ন

চৈনাঃ কুল্যাঃ পশ্চাদ্ভুতস্তত্র গর্ভব্যাদিসংস্থাভ্যঃ।”—নিশাক্তপ্রণিধি, ৪১ম পৃষ্ঠাঃ।

“তদ্যদস্ত জালনীবিদো তিব্বজ্ঞানসমাস্ত্রাঃ।”—আত্মরক্ষিতকম্, ৪৩ম পৃষ্ঠাঃ।

স্তৃতিকচিকিৎসক—খাদ্যবিদ্যাবিশারদ; পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েই এ বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। তিব্বক ও চিকিৎসক—সাধারণ চিকিৎসক এবং জালনীবিৎ বিষপত্রীকার পারদর্শী ছিলেন। কথুনা যেমন বিশেষ বিশেষ চিকিৎসার পারদর্শী চিকিৎসকগণ বিশেষ বিশেষ অস্তিধায়ে

অভিহিত হন, সে সময়েও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী চিকিৎসকগণ বিশেষ বিশেষ মাংস-সংজ্ঞার সংজ্ঞিত হইতেন। ‘আত্মরক্ষিতকম্’ প্রকরণে যে ‘জাজলীবিৎ’ চিকিৎসকের উল্লেখ আছে, বিষপরীক্ষা ও বিষপ্রতিকার সম্বন্ধে পারদর্শিতা-লাভের জন্য তাঁহারাই ঐ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বিষ-পরীক্ষার বিবিধ সঙ্কেত ছিল। জাজলীবিৎ চিকিৎসকগণ সে সকল অবগত ছিলেন। রাজার খাণ্ডাদির সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া কেহ তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা না করে, সেই জন্য জাজলীবিৎ চিকিৎসকগণ সর্বদা রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। বিষ-পরীক্ষার সঙ্কেতাদি সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে নিম্নরূপ প্রক্রিয়ার বিষয় উল্লিখিত আছে; যথা,—

“অগ্নেজ্বালাধূমনীলতা শব্দক্ষেপটনং চ বিষযুক্তশ্চ,—বয়সাং বিপত্তিশ্চ,—অন্নস্তোম্মা ময়ূরগ্রীবাভঃ শৈত্যং, আশুক্লিষ্টশ্চৈব বৈবর্ণ্যং সোদকভ্রমক্লিন্নভং চ,—বাজ্ঞানানামান্ত্রিকভং চ কাণশ্রোত্রেণপটলবিচ্ছিন্নভাবো গন্ধস্পর্শসবধশ্চ,—দ্রবোযু চীনাতিরিক্তছায়াদর্শনং কেনপটলসীমান্তোদ্ধারাজীদর্শনং চ,—রসশ্চ মধো নীলা রাজী,—পরিসস্তাভা,—মত্তোত্তোরয়ো কালী,—দগ্ধশ্চামা চ,—মধুশ্চৈব,—দ্রবাণামাত্রীণামান্ত্রপ্রমুলাভমুৎপক্ভাবঃ কাণনীলশ্রাবতা চ,—স্তম্ভাণামান্ত্রশাতনং বৈবর্ণ্যং চ,—কঠিনানাং মূহুতং মূহনাং কঠিণভং চ,—ভদভ্যাশে ক্ষুদ্রসত্ত্ববধশ্চ,—আন্তরণশ্রাবরাণানাং শ্রামমণ্ডলতা তন্তুরোমপক্ষশাতনং চ,—লোহমণিময়ানাং শাকলোপদেহতা স্নেহ-রাগগৌরবপ্রভাববর্ণস্পর্শবধশ্চেতি বিষযুক্তলিঙ্গানি।”—আত্মরক্ষিতকম্, ৪৩ম পৃষ্ঠাঃ।

রাজার খাণ্ড দ্রব্য প্রস্তুত হইলে প্রথমে সে খাণ্ড অগ্নি-মধ্যে নিক্ষেপ করিবার নিয়ম। তার পর পশু ও পক্ষিগণকে দিয়া রাজা তাহা আহাৰ করিবেন। যদি তাহাতে বিষ-সংযোগ থাকে, তাহা হইলে পক্ষিগণ উহা আহাৰ করিবার পরই মরিয়া যাইবে, আর অগ্নির বর্ণ-বৈচিত্র্য ঘটিবে। বিষ-পরীক্ষা সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, বিষ-সংযুক্ত দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, অগ্নি ও ধূম নীলবর্ণ ধারণ করিবে, আর তাহা হইতে শব্দ উথিত হইবে। অগ্নে বিষ মিশ্রিত থাকিলে সত্ত্ব-প্রস্তুত অগ্নের ধূম ও ময়ূর-কণ্ঠের জ্বালা নীলবর্ণ দেখা যায়, আর সে ধূমে শৈত্য অনুভব হয়। বাজ্ঞানাদি অস্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে, জলীয় বস্তু শক্ত এবং চর্টায় শুষ্ক হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হয়। তখন অন্নবাজ্ঞানাদি গন্ধহীন ও স্বাদহীন হইয়া পড়ে এবং স্পর্শ দ্বারা তাহা অনুভূত হয় না। বিষ থাকিলে পাকপাত্রের ঔজ্জ্বল্যহানি ঘটে অথবা অধিক ঔজ্জ্বল্য-সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। বিষ-মিশ্রিত অন্নবাজ্ঞানাদি পরীক্ষা সম্বন্ধে এই বিধি। কিন্তু রসাদি বিষসংযুক্ত হইলে, তাহার পরীক্ষা-প্রণালী অন্য প্রকার। বিষ-মিশ্রিত হইলে রসাদি নীলবর্ণ এবং মত্ত ও জল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। দধিতে বিষ মিশাইলে উহা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং মধু ক্ষেতবর্ণ ধারণ করে। জলীয় খাণ্ড-সমূহে বিষ থাকিলে তাহা অধিকতর সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি করে। শুষ্ক খাণ্ড যখন নরম এবং নরম খাণ্ড যখন শুষ্ক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখনই বুদ্ধিতে হইবে, উহা বিষ-মিশ্রিত। খাণ্ডপূর্ণ পাত্রের সরিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত কীবাণু দেখিলে এবং আত্মের ও প্রজ্ঞার গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ দাগ থাকিলে, উহা বিষ-সংস্পৃষ্ট বলিয়া বুদ্ধিতে হইবে। বিষের সন্দেশে মণিময় ও লৌহ পাত্র কলঙ্কিত ও দাগযুক্ত হয়। পাত্রের বর্ণ, পালিশ ও ঘোষাতিঃ হীন

হইয়া পড়ে। স্পর্শ করিলে পাত্র অধিকতর কঠিন বলিয়া বোধ হয়। প্রাসাদ অভ্যন্তরে চিকিৎসা-ব্যবহার জন্ত খাজীবিজ্ঞা-বিশারদ চিকিৎসক ও খাজীসমূহ নিযুক্ত ছিল, আল-বালসমূহে ভেদ্যাদি রোপিত হইয়াছিল, সর্পভয় নিবারণ জন্ত প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে নানাবিধ সর্পৌষধি উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রাসাদ-মধ্যে বিব-পরীক্ষার জন্ত ভিব্‌ক্‌গণ পূরোক্ত প্রাণালী-সমূহ অবলম্বন করিতেন। তদ্বাতিত বিভিন্ন জাতীয় পক্ষী ও জন্তু থাকিত। তাহার সর্পের বা বিবের সংস্পর্শে বিভিন্ন সঙ্কেত জ্ঞাপন করিত। সেই সকল পক্ষীর মধ্যে মার্জার, ময়ূর, * ময়না, পারাবত, নকুল, হরিণ, বক, কোকিল, তিতির পক্ষী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ময়না ও পারাবত প্রভৃতি পক্ষী সর্প দেখিলেই উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠে। বিব সংস্পর্শে বক মুচ্ছা যায়, কোকিল মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এবং বিবের গন্ধে তিতির পক্ষীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। 'নিশাস্তপ্রণিধি' প্রকরণে অন্তঃপুরের কর্তব্য-বিষয়ে কোটিল্য যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা হইতে এতদ্বিষয় অবগত হওয়া যায়। যথা,—

‘জীবন্তীখেতামুকপুণ্যবন্দ্যাকতিরক্ষীণে জাতস্তাখ্যস্ত প্রতানেন বা শুণ্ডং সর্পা
বিষাণি বা ন প্রসহন্তে। মার্জারময়ূরনকুলপূরতোৎসর্গসর্পান্ ভক্ষয়তি (গাস্‌সর্পান্
ভক্ষয়তি)। শুকশ্শারিক ভক্ষরাজো বা সর্পবিষমহারং ক্রোশতি। ক্রৌঞ্চো বিষা-
ভ্যাশে মাভতি। মায়তি জীবজীবকঃ। ত্রিরতে মন্তকোকিলঃ। চকোরস্তাক্ষিণো
বিরজ্যতে। ইত্যেবং অগ্নিবিষসর্পেভ্যঃ প্রতিকূর্বাতি।’—নিশাস্তপ্রণিধিঃ, ৪০ম পৃষ্ঠাঃ ॥

সর্পবিষ নিবারণের বিবিধ উপায়-পরম্পরা নির্ধারণ এবং বিষপরীক্ষার প্রাণালীসমূহ নির্দেশ
যে বিশেষ বহুদর্শিতার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এবং
পশুচরিত্র-অধ্যয়নে পারদর্শিতা লাভ না করিলে, এতদ্বিষয়ে সম্যকরূপে জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়া
সম্ভবপর নহে। মহামতি কোটিল্যের বিহিত পূরোক্ত বিধান-সমূহ এবং উপদেশ-পরম্পরা
তাঁহার প্রগাঢ় শাস্ত্রোত্তার এবং সর্কশাস্ত্রদর্শিতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। তাঁহার নীতি-সমূহের
আলোচনার প্রতিপন্ন হয়, খৃষ্ট-জন্মের প্রায় তিন শত পূর্বেও চিকিৎসা-বিদ্যার সকল
অঙ্গে প্রাচীন ভারত-শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন ছিল। তখনও সর্ক-বিষয়ে তাহার মহীয়সী
মহিমা লক্ষ্য করিয়া জগৎ বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইত।

রোগ-চিকিৎসার জন্ত চিকিৎসালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; ভেষজ-উদ্যান-প্রভৃতি নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল; আর তৎসমুদায় আবশ্যকীয় ভেষজাদিতে সর্বদা

পরিপূর্ণ থাকিত;—অর্থশাস্ত্রের আলোচনার তাহা প্রতিপন্ন হয়।
এতকালে এতদ্বাতিত সৈনিক বিভাগে স্বতন্ত্র চিকিৎসক ও স্বতন্ত্র খাজী প্রভৃতির
ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল,—অর্থশাস্ত্র হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া

যায়। অত্র-চিকিৎসার চিকিৎসকগণ সে সময় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, অর্থশাস্ত্রোক্ত
‘অজ্ঞানির নাম দৃষ্টে তাহা উপলব্ধি হয়।’ অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত দুর্গনিবেশঃ, আশ্রয়কিতকম্,
কুটুম্বিককরাঃ, সীতাম্যাক্ প্রভৃতি অংশে চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিবিধ উৎকর্ষের পরিচয় দেদীপ্যমান

কাল্পনিক নীতিমারে আছে,—‘অমৃদপূর্বভোৎসর্গে ন ভবন্তি ভুজয়ান।’ ময়ূরের বিজ্ঞানভা হুথিলে,
সর্প দূরে পালন করে...

সহিয়াছে । দুর্গের কোন্ অংশে কোন্ জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই সেই অংশে কিরূপ স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা বিহিত হওরা আবশ্যিক, তদালোচনার ‘দুর্গনিবেশ’ অংশে ভৈষজ্যাগার প্রতিষ্ঠার পরিচয় আছে । তদ্বিবরে কোটিল্য বলিয়াছেন,—“উত্তরপশ্চিমাং ভাগং পণ্য-ভৈষজ্যাগৃহম্”; অর্থাৎ,—দুর্গের উত্তর-পশ্চিম অংশ পণ্যাগার ও ভৈষজ্যাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে । সেই সকল ভৈষজ্যাগার ও পণ্যাগার প্রতিষ্ঠা কর-বার অনুসারে নব নব ভৈষজ্য ও নব নব পণ্যসম্পদে পরিপূর্ণ করিবে । ফলতঃ, একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেলে অভাব-অমুভব করিতে না হয়, কোটিল্যের তাহাই অভিপ্রায় । ‘দুর্গনিবেশ’ প্রসঙ্গে অন্তান্ত ব্যবস্থা বিহিত করিয়া এতৎসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল,—

“ভেষু পুষ্কলবাটবগুকেদারানু ধাতুপণ্যানিচ্চর্যাংচ অমুজ্জাতাঃ কুর্গুঃ । দশকুলীবাটং কুপস্থানং সর্পস্নেহধাতুকারলবণভৈষজ্যাস্তক্ষণাক্ষবসবস্ত্ররত্নগণাঠলোহচর্মাদারনাম্যু-বিষবিষাণবেণুবকলসারদারাক্রহরণাবরণাশ্মনিচর্যানেকবর্ষাপভোগসহানু কারয়েৎ । নবনানবং শোধয়েৎ ॥”—দুর্গনিবেশঃ, ৫৬ম পৃষ্ঠাঃ ॥ “ভিষগভৈষজ্যাগারাদান্বাদ-বিস্তৃকমৌষধং গৃহীত্ব পাচকপোষকাত্যামান্বনা চ প্রতিস্থাত্ত রাজ্ঞে প্রযচ্ছেৎ ॥”

—আত্মরক্ষিতকম্, ৪৪ম পৃষ্ঠাঃ ॥

আয়ুর্বেদজ্ঞ সীতাধ্যক্ষ কর্তৃক অথবা ভৈষজ্যবিজ্ঞার পারদর্শী ব্যক্তিগণের সাহায্যে ভৈষজ্য বপনের বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে । যে ভূমি উত্তমরূপে অনেক বার কর্ষিত হইয়াছে, সেই ভূমি ভৈষজ্যাদি বপনের উপযোগী । “গন্ধভৈষজ্যোশীরহীরকৈরপিণ্ডালুকাদীনাং যথাস্বং ভূমিষু চ স্থাল্যাশ্চ অনুপ্যাশ্চৌষধীসুস্থাপয়েৎ ॥” ভৈষজ্য বপনের পক্ষে স্থলভূমি প্রশস্ত । যেখানে রৌদ্রকৃষ্টি সমভাবে বর্ষিত হয়, ভৈষজ্য-বপনে সেই ভূমি বিশেষ উপযোগী । এতদ্ব্যতীত রাজকীয় ভূমিতে ভৈষজ্যাদি বপনের ব্যবস্থা ছিল । “কুটুম্বকবিকল্পাঃ” অংশে অত্রচিকিৎসার এবং সামরিক চিকিৎসকের ও ধাত্রী প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায় । চিকিৎসকগণ শস্ত্র বস্ত্র, দ্বৈহ, অগদ, বস্ত্র প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং ধাত্রীগণ অন্ন-পানীয় প্রভৃতি সহ তাঁহাদের অনুগামী হইতেন । * “চিকিৎসকাঃ শস্ত্রযন্ত্রাগদস্নেহবস্ত্রহস্তাঃ স্ত্রিয়স্ত্রাণপানরক্ষিপুরুষাণামুদ্ধর্ষণীয়া পৃষ্ঠতন্তিষ্ঠেয়ুঃ ॥”—(কুটুম্বকবিকল্পাঃ, ৩৬৭ম পৃষ্ঠাঃ ॥) রাজার চিকিৎসার ব্যবস্থা অত্ররূপ । রাজা যে ঔষধ সেবন করিতেন, ভিষক প্রথমতঃ তাহা পরীক্ষা করিয়া সিতেন । তৎপরে পাচক তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতেন । তাহার পর ‘পোষক’ তাহা আন্বাদন করিতেন । এইরূপে ঔষধের বিস্তৃকতা সপ্রমাণ হইলে সে ঔষধ রাজার সেবনের বিধি ছিল । মনুষ্যাদির চিকিৎসা বিষয়ে যেরূপ বিবিধ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল, পশুাদির চিকিৎসা এবং ব্যাধি-নির্ণয়েরও বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল । ফলতঃ, প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের রোগ-নিবারণ-কল্পে সে সময়ে যে বিশেষ আয়োজন চলিয়াছিল, তদ্বিবরে কোনও সন্দেহ নাই ।

এতদংশে বর্ণিত শস্ত্র ও বস্ত্র—অত্রাচিকিৎসার ছুরিকা প্রভৃতির দ্বারা । অগদ, স্নেহ প্রভৃতি মালিঙ্গ প্রভৃতি এবং বস্ত্র ব্যাণ্ডেজ । চিকিৎসক ও ধাত্রীগণ এই সকল সরঞ্জাম লইয়া সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধকালে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন । সৈন্যগণের চিকিৎসাদির জন্য তাহার। যুদ্ধক্ষেত্রে বাইতেন, তাহার। সামরিক চিকিৎসক (Army Surgeon) বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন ।

রাজ্যের বাহ্যোন্নতির এবং প্রজা-সাধারণের রোগ-নিবারণ-কল্পে বিবিধ সুব্যবস্থা আদর্শ রাজ্যের এক শ্রেষ্ঠ আদর্শ। চিকিৎসকের চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিবিধ বিধির প্রবর্তনারূপে আদর্শ

পূর্ণ প্রকটিত। রোগ-প্রতিকারে অবহেলা করিলে সে সময় চিকিৎসকের
চিকিৎসকের
দণ্ড-ব্যবস্থা। দণ্ড হইত। অচিকিৎসার বা কুচিকিৎসার প্রাণহানি ঘটিলে চিকিৎসক

তাহার জবাবদিহি করিতেন। সংক্রামক ব্যাধির বিষয় রাজ্যের পোচর করিবার বিধি ছিল। সে বিধির অবহেলার চিকিৎসকগণ বিবিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। প্রাণ-নাশে বহুদর্শিতা-লাভ সে সুদূর অতীতকালে বিশেষ দণ্ডণীর অপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইত। চিকিৎসকগণও তাই রোগ-চিকিৎসার কোনও শৈথিল্য বা অবহেলা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সে সময়ে চিকিৎসা-বিভাগ—রাজকীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রাজবিধি অনুসারে ঐ বিভাগের কার্য-প্রণালী তত্ত্বাবধান করা হইত। সে সময়ে রোগের পরিচর, চিকিৎসার বিবরণ এবং রোগীর নাম-ধাম-সম্বলিত তালিকা রাজকীয় কার্যালয়ে রাখিল করিবার নিয়ম ছিল। সুতরাং চিকিৎসা-সংক্রান্ত সকল ক্রটির বিষয় রাজা জানিতে পারিতেন এবং অপরাধের ভারতম্য অনুসারে ক্রটি-বিচ্যুতির দণ্ড বিধান করিতেন।

“ভিবজঃ প্রাণাবাধিকমনাথ্যারোপক্রমমানস্ত বিপত্তৌ পূর্বসুসাহসদণ্ডঃ। কর্মাপরোধেন বিপত্তৌ মধ্যমঃ কর্মবধবৈশ্বগ্যকরণে দণ্ডপাক্ষ্যং বিভ্রাৎ।”—কারককরণম, ২০২ম পৃষ্ঠাঃ।

“চিকিৎসকঃ প্রচ্ছন্নপ্রজ্ঞা কীর্ত্তনিতাপরমপথ্যকারিণঃ চ গৃহস্থানী চ নিবেত্ত গোপস্থা নিবেত্ত গোপস্থানিকরোরুচ্যোত্তাখ্যা তুণ্যাদোষসূচ্যং।”—নাগরকপ্রণিধি, ১৪৪ম পৃষ্ঠাঃ।

চিকিৎসা-শৈথিল্যে রোগীর রোগ বৃদ্ধি হইলেও চিকিৎসকের দণ্ড হইত। * ভেষজাদিতে ভেজাল মিশ্রিত করিলে যে দণ্ডের বিধান ছিল,—ভেজাল-প্রসঙ্গে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে, “বৈদেহকরক্ষণং” প্রসঙ্গে, কোটিল্য সে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বহু জনা-কীর্ণ নগরাদিতে স্বাস্থ্য-রক্ষার যে সকল প্রয়াসের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও কম কৃতিত্বের নিদর্শন নহে। মহামারী নিবারণের উপায়-পরম্পরা নির্ধারণ-প্রণালীও বিশেষ প্রশংসনীয়। নগর-সহরাদির রাজপথে জল জমিলে, কর্মচারীদিগের দণ্ড হইত। মন্দির, প্রাসাদ, ভীর্থস্থান, জলাশয় প্রভৃতিতে স্বাস্থ্যহানিকর কোনও কার্য করিলে দণ্ডের বিধান ছিল। নগরের মধ্যে মৃতদেহ বা অস্ত্র কোনও প্রাণীর অস্থি-কঙ্কালাদি পতিত থাকিলে, রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিতেন। মৃতদেহ সংবাহিত হইবার নির্দিষ্ট

চিকিৎসকের শৈথিল্য-বশতঃ রোগীর গীড়া বৃদ্ধি হইলে অথবা তাহার মৃত্যু হইলে চিকিৎসকগণ দণ্ডভর অপরাধে অপরাধী হইতেন। সাহিত্য-শাস্ত্রে ভবিষ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এতৎপ্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন,—

“চিকিৎসকানাং সর্কেবাং মিথ্যাপ্রচরতাং দমঃ। অমানুবেষু প্রেমনো মানুবেষু তু মধ্যমঃ।

চিকিৎসকেরা মিথ্যা চিকিৎসা করিলে পশুচিকিৎসা সম্বন্ধে ওহার ‘প্রথম সাহস’ এবং মনুবা-চিকিৎসা বিষয়ে ‘মধ্যম সাহস’ দণ্ডের বিধি মনু বিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিকের মতেও এই দণ্ডের বিধান বিহিত। তিনি বলিয়াছেন,—চিকিৎসক পশুদিগকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে প্রথম সাহস, মনুব্যকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে মধ্যম সাহস এবং রাজপুরুষকে মিথ্যা চিকিৎসা করিলে উত্তম সাহস দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। যথা,—

“ভিবজমিথ্যচরন্ দাপ্যতিথ্যাকু প্রথমঃ দমন্। মাজ্জেন মধ্যমঃ রাজমঃস্থবেষু তমঃ দমন্।”

‘আশানপথ’ ছিল। তদ্ব্যতীত অল্প রাস্তা দিয়া উহা লইবার বিধি ছিল না। আশানপথ ভিন্ন অল্প পথে মৃতদেহ সংবাহিত হইলে, দণ্ড ভোগ করিতে হইত; আর, নির্দিষ্ট সমাধি-স্থান অতিক্রম করিয়া অল্প স্থানে মৃতদেহ সমাধিস্থ করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-ভঙ্গের অপরাধে রাজা দণ্ড-বিধান করিতেন। মহামারী উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিকার বিধানে বিবিধ প্রয়াস চলিত। চিকিৎসকগণ তৎপ্রদেশে ঔষধ বিতরণের জন্য নিযুক্ত হইতেন, আর পুরোহিতগণ দেবদেবীর আরাধনায় নিরত থাকিতেন। অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত ‘নাগরক-প্রণিধি’ ও ‘উপনিপাতপ্রতিকার’ অংশদ্বয় হইতে এতদ্বিষয়ক নীতি-সমূহ উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“পাংমুখ্যাসে রথ্যাম্মাষ্টভাগো দণ্ডঃ। পক্ষোদকসন্নিরোধে পাদাঃ। রাজমার্গে দ্বিগুণঃ। পুণ্যস্থানোদকস্থানদেবগৃহরাজপরিগ্রাহেষুপণোত্তরাবিষ্টাদণ্ডাঃ। মুদ্রেষধদণ্ডাঃ। ভৈষজ্যব্যাধিভয়নিমিত্তমদণ্ডাঃ। মার্জারখনকুলসর্পশ্রেতানানং নগরস্যান্তরুৎসর্গে ত্রিপণো দণ্ডঃ। ধরোষ্ট্রাখতরাশ্বপশুশ্রেতানানং যটপণঃ। মমুদ্রাশ্রেতানানং পঞ্চাশৎপণঃ। মার্গ-বিপর্যাসে শবদ্বারাজনয়তশ্শবনির্ণয়নে পূর্কস্‌সাহসদণ্ডঃ। দ্বাহানাং দ্বিশতম্। আশা-নাদন্যত্র ন্যাসে দহনে চ দ্বাদশপণো দণ্ডঃ।”—নাগরকপ্রণিধিঃ, ১৪৫ম পৃষ্ঠাঃ।

“ব্যাধিভয়মোপনিষদিতৈকঃ প্রতীকটৈরঃ প্রতিকুযুঃ। ঔষধৈশ্চিকিৎসকাঃ, শাস্তিপ্রার-শ্চিত্তৈর্বা সিদ্ধতাপসাঃ। তেন মরকো ব্যাখ্যাতঃ। তীর্থভিষেচনং মহাকচ্ছবধনং গবাং আশানাবদোহনং কবন্ধদহনং দেবরাত্রিং চ কারয়েৎ। পশুব্যাদিমরকে স্থানান্তর-নীরাজনং স্বদৈবতপূজনং চ কারয়েৎ। হুর্ভিক্ষে রাজা বীজভক্তোপগৃহং কৃদ্বাহু-গ্রহং কুর্ধ্যাৎ। দুর্গতকর্ম বা ভক্তানুগ্রহেণ ভক্তসংবিভাগং বা দ্রুশনিক্ষেপং বা।”

—উপনিপাতপ্রতিকারঃ, ২০৬ম—২০৭ম পৃষ্ঠাঃ ॥

সহর-সংক্রান্ত অর্থশাস্ত্রের এই সকল বিধান কতকাংশে আধুনিক মিউনিসিপাল ব্যবস্থার অনুরূপ বলিয়া বুঝা যায়। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যত প্রকার উপায় অবলম্বন আবশ্যক, সে সময়ে তাহার সকলই উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত হইয়াছিল। হুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি সহজে ও অল্প সময়ে নিবারিত হওয়ার লোকে শাস্তিমুখে কালযাপন করিত।

মৃতপরীক্ষা, শব-ব্যবচ্ছেদ—চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ। অর্থশাস্ত্রের আলোচনার প্রতিপন্ন হয়,—প্রাচীন ভারতে শবব্যবচ্ছেদের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তদ্বৎসর সাধনে

বিবিধ অস্ত্র-যন্ত্রাদির পরিচয় অর্থশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। অর্থশাস্ত্রের মৃত-পরীক্ষা। ‘কুটযুক্তবিক্রমাঃ’ অংশে যে শস্ত্রের ও যন্ত্রের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে,

শবব্যবচ্ছেদে এবং অস্ত্র-চিকিৎসায় সেই সকল শস্ত্র ও যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। ‘আশুতকপরীক্ষা’—শবব্যবচ্ছেদ এবং মৃতপরীক্ষা সম্বন্ধে নিয়োজিত হইয়াছে। ঐ অংশের আলোচনার বুঝা যায়, তৎকালে মৃতপরীক্ষার ও শবব্যবচ্ছেদের জন্য ‘ময়গ’ বা মৃতপরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজ্যের প্রতি নগরে উহা নির্মিত হইয়াছিল। সন্দেহজনক মৃত্যুজনিত শব সেখানে পরীক্ষা করা হইত। উৎকর্ষে প্রাণত্যাগ করিলে বা জলে ডুবিয়া মরিলে সে শব ব্যবচ্ছেদাগারে সংবাহিত হইবার বিধি ছিল; আশ-প্রার্থন-রোধে যত প্রকার মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে, সকল স্থলেই শবদেহ পরীক্ষার

জন্ত পরীক্ষাগারে আনি হইত। পচনাদি নিবারণ জন্ত শবদেহ তৈলে বা তৈলময় পদার্থে সিক্ত করিবার বিধি অর্থশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে। বিষতক্ষণে যাহারা প্রাণত্যাগ করিত, এবং যাহারা আত্মহত্যা করিয়া মরিত, তাহাদের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদাগারে আনিবার বিধি ছিল। শবদেহ উপস্থিত হইলেই চিকিৎসকগণ তাহা পরীক্ষা করিতেন। বিভিন্ন প্রকার মৃত্যুর বিভিন্নরূপ লক্ষণ-সমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহারা মৃত্যুর কারণ নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাইতেন। শবপরীক্ষায় অবৈধউপায়-জনিত মৃত্যুর বিষয় সপ্রমাণ হইলে, তাহা বিচার আমলে আসিত। শবপরীক্ষা বিষয়ক এবং মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ সংক্রান্ত কোটিল্যের বিধি, অর্থশাস্ত্রের ‘আত্মমৃতকপরীক্ষা’ প্রকরণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

“তৈলাভ্যক্তমাণুমৃতকং পরীক্ষেত—নিষ্কীর্ণমূত্রপূরীষং বাতপূর্ণকোষ্ঠত্বকং শূণ্যপাদপাণি-
-মুদ্রীলিতাকং সবাজ্ঞনকণ্ঠং পীড়নানরুদ্ধোচ্ছ্বাসহতং বিভ্রাৎ ॥ তমেব সঙ্কুচিতবাহুগন্ধ-
-মুদ্রকহতং বিভ্রাৎ ॥ শূন্যপাণিপাদোদরমপগতাক্ষমুদ্রুস্তনাভিমবরোপিতং বিভ্রাৎ ॥
-নিস্তক্ণুদাক্ষং সন্দষ্টজিহ্ববাখ্যাতোদরমুদ্রকহতং বিভ্রাৎ ॥ শোণিতাভিসিক্তং ভগ্নভিন্নগাজং
-কাঠৈ রক্ষাভির্বা হতং বিভ্রাৎ ॥ সন্ধ্যম্মুটিতগাজং বিক্ষিপ্তং বিভ্রাৎ ॥ শ্রাবপাণিপাদ-
-দণ্ডনখং শিথিলমাংসরোমচর্মণং ফেনোপদিগ্ধমুখং বিষহতং বিভ্রাৎ ॥ তমেব সশো-
-ণিতদংশং সর্পকৌটহতং বিভ্রাৎ ॥ বিক্ষিপ্তাঙ্গগাত্রমতিবাতবিরিক্তং মদনযোগহতং
-বিভ্রাৎ ॥ অতোহত্মতমেন কারণেন হতং হৃদা বা দণ্ডভয়াদুদ্বন্ধনিবৃত্তকণ্ঠং বিভ্রাৎ ॥
-বিষহতস্য ভোজনশেষং পয়োভিঃ পরীক্ষেত। হৃদয়াহুকৃত্যামৌ প্রাক্ষিপ্তং চিটচিটায়-
-দিক্রমদুর্বণং বা শ্লিষযুক্তং বিভ্রাৎ ॥ দধন্ত হৃদয়মদগ্ধং দৃষ্ট্বা বা তন্ত পরিচারকজনং বা
-দণ্ডাপারদ্যাদতিমার্গেত ॥ হৃৎখোপহতমন্যপ্রসক্তং বা জীজনং দায়নিবৃত্তিজীজনাভি-
-মজ্জারং বা বন্ধুন্। তদেব হতোদ্বন্ধস্ত পরীক্ষেত। স্বয়মুদ্বন্ধস্ত বা বিপ্রকারমযুক্তং মার্গেত।
-সর্বথাং বা জীদায়াদ্যদোষঃ, কর্মস্পর্ধা প্রতিপক্ষদ্বেষঃ পণ্যসংস্থা সমবায়ো বা বিবাদ-
-পদানামত্মতমদ্বা রোষস্থানং; রোষনিমিত্তো বাতঃ ॥ স্বয়মাদিষ্টপুরুষৈর্বা চোটৈরথনিমিত্তং
-সাদৃশ্যাদন্তবৈরিভির্বা হতস্ত বাতমাসন্নভাঃ পরীক্ষেত যেনাহুতস্পৃহস্থিতঃ প্রস্থিতো হত-
-কুমিমানীতো বা, তমমুযুজীত। যে চান্ত হতভূমাবাসন্নচরাত্তানৈককশঃ পৃচ্ছেৎ ‘কেনা-
-হ্মিহানীতো বা কস্মদগ্নঃ সঙ্কুহমানঃ উদ্বিগ্নো বা বৃশাভির্দৃষ্টঃ ইতি তে যথা ক্রযুক্তথা-
-হ্মুযুজীত ॥”—চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম অধ্যায়, আত্মমৃতকপরীক্ষাঃ, ২১৫ম—২১৭ম পৃষ্ঠাঃ।

রোগ-নিবারণ-কল্পে স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থার যে প্রকৃষ্ট আদেশের পরিচয় পাই, হৃর্তিক ও
যজ্ঞাদি নিবারণ কল্পে বিবিধ বিধির প্রবর্তনারও সে আদেশ দেদীপ্যমান। হৃর্তিক
দূরীকরণে রাজপুরুষদিগের বৈরূপ কতকগুলি কর্তব্য নির্দিষ্ট ছিল, রাজার
হৃর্তিক
নিবারণে। প্রতিও তেমনি কর্তব্যগুলি কর্তব্য-সম্পাদনের আদেশ বিহিত হইরাছিল।
রাজকীয় কোষাগারে রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার শস্ত সঞ্চিত
হইত। কোটীলা বিহিত করিরাছিলেন যে, সেই সকল শস্তের অর্দ্ধাংশ হৃর্তিক-নিবারণ
কল্পে ব্যরিত হইবে। রাজকোষে অর্থসকলও ঐরূপ ব্যবস্থা বিহিত হইরাছিল। হৃর্তিকের
লম্ব শস্তাদির বীজ পর্যন্ত মিলিত না। প্রচুর শস্তোৎপাদন জন্ত রাজা আপন কোষাগার

হইতে শস্তবীজ সরবরাহ করিতেন। কোনও প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, তৎপ্রদেশে রাজ-আদেশে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যের ব্যবস্থা হইত। পীড়িতগণের কেহ মজুরাদির কার্যে নিযুক্ত হইত, কাহাকেও বা বিনা-পরিশ্রমে সাহায্য দিবার ব্যবস্থা ছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণকে কখনও কখনও ভিন্নদেশে লইয়া যাইবারও ব্যবস্থা হইত। অবস্থা-বিশেষে রাজা মিত্ররাজগণের সাহায্য গ্রহণ করিতেন, সম্পন্ন গৃহস্থগণের নিকট হইতেও সাহায্য লওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত সমুদ্র বা নদী তীরে নূতন বসতি স্থাপন করাইয়া রাজা তথায় শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন; কিংবা বহুশস্ত্রপূর্ণ জনপদে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে স্থানান্তরিত করা হইত। দুর্ভিক্ষ নিবারণ-কালে যেক্রম বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইত, জলপ্রাবন হইতে জনসাধারণের রক্ষণোপযোগী সেইরূপ উপায়-পরামর্শ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। নদীতীরে যাহারা বাস করিত, জলপ্রাবনের সম্ভাবনা বুঝিয়া তাহাদিগকে পূর্বে হইতে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত। রাজ্যদেশে তাহারা জলপ্রাবনের পূর্বেই নদী-তীর পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। যাহাদের নৌ-যানাদি ছিল, আকস্মিক বিপদে সহায়তার জন্য রাজা তাহাদের প্রতি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত ‘কোষ্ঠাগারাদ্যক্ষ’ এবং ‘উপনিপাতপ্রতিকার’ প্রসঙ্গে কোটিল্য সে সকল বিধি বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাহার কতকগুলি প্রদান করা হইল; যথা,—

“বিক্ষেপব্যাদিতাস্তরারম্ভশেষং চ ব্যয়প্রত্যায়ঃ।”—কোষ্ঠাগারাদ্যক্ষঃ, ৯৬ম পৃষ্ঠাঃ ॥

“দুর্ভিক্ষে রাজা বীজভক্ষোপগৃহং কৃত্বাহুগৃহং কুর্ধ্যাৎ। দুর্গতকর্ম বা ভক্ষাহুগ্রহেণ ভক্ষসংবিভাগং বা দেশনিক্ষেপং বা। মিত্রাণি বা ব্যপাশ্রয়েৎ। কর্শনং বমনং বা কুর্ধ্যাৎ। সিম্প্রসমস্তমজ্জবিষয়ং বা সম্ভজনপদে যাতাৎ। সমুদ্রসরন্তটাকানি বা সং-শ্রয়েৎ। ধাত্তশাকমূলফলাবাপান্ সেতুমু কুর্বাৎ। যুগপত্তপক্ষিব্যালমৎস্তারস্তান্ বা।”—উপনিপাতপ্রতিকারঃ, ২০৭ম পৃষ্ঠা।...“বর্ষারাত্রমরুপগ্রামাঃ পূরবেলামুৎ-স্থজ্যঃ বসেয়ুঃ। কাষ্ঠবেণুনাবশ্চাপগৃহীযুঃ।”—উপনিপাতপ্রতিকারঃ, ২০৬ম পৃষ্ঠাঃ ॥

কীটপতঙ্গমূষিকাদির উপদ্রব নিবারণেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। মূষিকের উপদ্রব নিবারণে মার্জার ও নকুল রক্ষার বিধি—“মূষিকভয়ে মার্জারনকুলোৎসর্জঃ”—(উপনিপাতপ্রতিকারঃ, ২০৭ম পৃষ্ঠা)। মূষিকাদির উপদ্রব নিবারণে যে ব্যবস্থা বিহিত, কীট-পতঙ্গাদি সম্বন্ধেও সেই বিধি বিধিবদ্ধ আছে। ব্যাঘ্র-ভয়-নিবারণে বিঘ প্রয়োগের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে; যথা,—“লুক্কাঃ খগণিনো বা কুটঞ্জরাবপাটৈশ্চরেয়ুঃ। আবরণিনঃ শস্ত্রপাণরোব্যালানভিহৃষ্যুঃ। অনভিসতুর্দাঁদশপণো দণ্ডঃ। স এষ লাভো ব্যালঘাতিনঃ।”—(উপনিপাতপ্রতিকারঃ, ২০৭ম পৃষ্ঠাঃ ॥) জনহিতকর এবিধি বিবিধ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিভয়নিবারণের বিবিধ প্রয়াসও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময়ে কাষ্ঠ-দ্বারা গৃহ-নির্মাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। সে গৃহ সহজেই অগ্নিদগ্ধ হইতে পারিত। অগ্নি-ভয় নিবারণের জন্য এবং গৃহাদির নিরাপদ-কালে অর্থশাস্ত্রে তাই বিবিধ প্রয়াস দেখিতে পাই। অগ্নি-প্রতিকার সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের ‘নাগ-রক্ষপ্রণিধি’ অংশে বিশেষ বিশেষ নিয়মের উল্লেখ আছে। তাহার কয়েকটি এই,—

“অগ্নিপ্রতিকারং চ প্রীয়ে। মধ্যমরোরম্ভচ্চতুর্ভাগয়োঃ অষ্টভাগোহগ্নিদগ্ধঃ। বহিরধি-

শ্রমণং বা কুয়ুঃ। পাদঃ পঞ্চঘটীনাং কুস্ত্রোণীনিশ্রেণীপরশুশূর্ণাকুশকচগ্রহীদ্বীনাং চ অকরণে। তৃণকটচ্ছন্নান্যনয়ং। অগ্নিজীবিন একস্থান্ বাসয়েৎ। শৃগুহপ্রহারেযু গৃহ-
স্বামিনো বসেযুঃ। অসংপাতিনো রাজৌ রথাস্ত্র কটব্রজাস্হস্রং তিষ্ঠেযুঃ। চতুস্পথ-
হারে রাজপরিগ্রহেযু চ। প্রদীপ্তমনভিধাবতো গৃহস্বামিনো দ্বাদশপণো দণ্ডঃ। ঘট-
পণো বিক্রয়িণঃ। প্রমাদাদীপ্তেযু চতুস্পথশংপণো দণ্ডঃ। প্রদীপিকোহগ্নিনা বধ্যঃ।
পাংসুনাংসে রথারামষ্টভাগো দণ্ডঃ।—নাগরকপ্রণিধিঃ, ১৪৫ম পৃষ্ঠা: ১০০—“ত্রীয়ে বহি-
রধিশ্রমণঃ গ্রামাঃ কুয়ুঃ। দশমূলীসংগ্রহেণাধিষ্ঠিতা বা। নাগরিকপ্রণিধাবগ্নি প্রতিষেধো
ব্যাখ্যাতঃ। নিশাস্ত্র প্রণিধৌ রাজপরিগ্রহে চ।”—উপনিপাতপ্রতীকারঃ, ২০৫ম পৃষ্ঠা:॥

গ্রীষ্মকালে অগ্নির আশঙ্কা অধিক। অগ্নির উপদ্রব সেই সময়েই প্রবল হয়। সেই জন্ত
দিনমানকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার মধ্যবর্তী দুই ভাগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা
কৌটিল্য নিষেধ করিয়াছেন। সে আদেশ অপালনে এক পণের অষ্টমাংশ দণ্ড বিহিত
হইয়াছে। অগ্নিতর-নিবারণ-কল্পে প্রতি গৃহস্থকে পাঁচটা কলসী বা জলপাত্র, কুস্ত্র, দ্রোণ,
আরোহণী, পরশু, শূর্ণ, অকুশ, কচ ও গ্রহণী এবং চর্ম্মের খলি রাখিতে হইত।* যে
গৃহস্থের গৃহে অগ্নি-নিরূপণোপযোগী ঐ সকল সরঞ্জাম না থাকিত, তিনি এক পণের চতুর্থাংশ
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। যিনি ঐ সকল দ্রব্য সংরক্ষণে অসমর্থ, তিনি খড়্গতৃণাদি
দ্বারা গৃহ নির্মাণ করিতে পারিতেন না। বৃহৎ রাজপথে, চৌমাথায় এবং প্রাসাদ ও
রাজকীয় কার্যালয় সম্মুখে শ্রেণিবদ্ধভাবে বহু কলসী সংরক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থা ছিল।
কাহারও গৃহ অগ্নি-সংযুক্ত হইলে, সমবেত চেষ্টায় তাহা নিরূপিত করিতে হইত।
অগ্নি-নিরূপণে সহায়তা না করিলে, দ্বাদশ পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবার বিধি। অসাবধানতা
বশতঃ কাহারও গৃহে অগ্নি-সংযোগ করিলে, চতুঃপঞ্চাশং পণ অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইত।
ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ অগ্নি প্রদান করিলে তাহাকে অগ্নি-মধ্যে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা ছিল।
যিনি গৃহস্বামী, তাঁহাকে গৃহের দ্বার-সামিথ্যে রাজিযাপন করিবার বিধি ছিল। সহর-

* অগ্নিতর-নিবারণে ‘দশমূলী সংগ্রহ’ অর্থাৎ কলসী প্রভৃতি সংরক্ষা প্রতি গৃহস্থের একান্ত কর্তব্য বলিয়া
নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঘট ও কুস্ত্র জলসেচন জন্ত রক্ষিত হওয়ার বিধি। দ্রোণী—কাষ্ঠ-নির্ম্মিত জলাধার; গৃহ-
হারে উহা সংরক্ষিত হইত। নিঃশ্রেণী—গৃহলীর্ধে গমন করিবার সিঁড়ি বা মই। পরশু—কুঠার; গৃহের কড়ি
প্রভৃতি ছেদন জন্ত ব্যবহৃত হইত। অকুশ—সাঁড়শীর দ্বারা যন্ত্রনিষেধ। অগ্নিদমক কাষ্ঠাদি স্থানান্তরিত করিবার
জন্ত এবং নিরে অন্ননোদেহে ব্যবহৃত হইত। শূর্ণ—ধূম-নিসারণ জন্ত ফুৎকার দিবার যন্ত্র। কর্তব্যকার ও স্বর্ণকার
প্রভৃতি অগ্নি প্রজ্জ্বলন জন্ত যে ফুৎকার দিবার যন্ত্র ব্যবহার করে, শূর্ণ অনেকাংশে সেই প্রকার। কচ—দড়ি
প্রভৃতি। গ্রহণী—ইহার আকার ঝড়ি প্রভৃতির মত। ভাঁড়ার হইতে দ্রব্যজাত স্থানান্তরিত করিবার পাত্র-বিশেষ।
ছত্তি—চামড়ার ব্যাগের মত। উহাও দ্রব্যজাত স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। আজি-কালি
প্রতি গৃহস্থের বাড়িতেই ‘দশমূলীর’ অধিকাংশ দ্রব্য সংরক্ষিত হয়। প্রাচীন কালে যেমন দশমূলী সংগ্রহ প্রতি
গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল, আর সে কর্তব্য অপালনে দণ্ড ভোগ করিতে হইত; এখন সে
সম্বন্ধ সেরূপ কঠোর বিধি অবস্থিত নাই। দশমূলীর অন্তর্গত কুঠারাদি পাড়ারগায়ের প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়িতেই
সংরক্ষিত হয়; গই, কলসী, ঝড়ি প্রভৃতিও সকলেই রাখিয়া থাকেন। অধুনা সহর নগরাদিতে স্থলবিশেষে
দশমূলীর অধিকাংশ দ্রব্য সংগ্রহের প্রথা আছে।

নগরাদিতে চালাবার প্রভৃতি নির্মাণের আদেশ ছিল না। দহনশীল যে সকল বস্তু সচক্ষে অগ্নিসংযুক্ত হয়, সেসকল উপাদানে সহর-মধ্যে গৃহাদি নির্মাণ অর্থশাস্ত্রের বিধান মতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

জনহিতকর বিধান প্রসঙ্গে মিতাচার, জায়গীর ও ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি দান, বন্দীর মুক্তি প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে বন্দাদি মাদক দ্রব্য

সরবরাহের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এদিকে মাদক-দ্রব্য-সেবনে দণ্ডের জনহিতকর বিবিধ বিধান। ব্যবস্থাও বিহিত দেখিতে পাই। সওয়া কাচ্চা বা এক প্রস্থের অধিক

মদ্য এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবার বিধি ছিল না। পাশাপাশি ভাবে এক সঙ্গে কতকগুলি মদের দোকান রাজ্যের কুজাপি দৃষ্ট হইত না। মাদক দ্রব্য বিক্রয়ে অর্থশাস্ত্রের ‘সুরাধ্যক্ষঃ’ এবং ‘বাক্যকর্ম্মাভ্যুযোগঃ’ প্রসঙ্গে যে সকল বিধি বিধিবদ্ধ আছে, তাহা লঙ্ঘন করিলে দণ্ডের বিধান ছিল। ‘সুরাধ্যক্ষ’ প্রসঙ্গে (১১৯ম পৃষ্ঠাঃ) অর্থশাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—“একমুখমনেকমুখং বা বিক্রয়ক্রয়বশেন বা ঘটতমতায়মন্তজ কতুক্রৈত্বিক্রেতুণাং স্থাপয়েৎ, গ্রামাদনির্গয়নমসম্পাতং চ।” অর্থশাস্ত্রের সুরাধ্যক্ষ ব্যবস্থায় কোটিল্যের শেষে কৃতিত্বের পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও তপস্বীগণকে ব্রহ্মোত্তর দানে পরিতুষ্ট করা হইত, আর রাজকর্ম্মচারী জায়গীর লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন,—অর্থ-শাস্ত্রের ‘ভূমিছিদ্রবিধান’ এবং ‘ভূভাতরণীর’ অংশদ্বয়ে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়; যথা—

“প্রদিত্তাভয়স্বাবরজ্জমানি চ ব্রাহ্মণেভ্যো ব্রহ্মসোমারণ্যানি তপোবনানি চ,

তপস্বিত্যা গোত্র(ত)পরাণি প্রযচ্ছৎ।”—ভূমিছিদ্রবিধানম্, ৪৯ম পৃষ্ঠাঃ ॥

কর্তব্য-সম্পাদন-কালে কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রপরিজনদের ভরণপোষণার্থ রাজা তাঁহাদিগকে বৃত্তি প্রদান করিতেন। মৃত ব্যক্তির পরিবার মধ্যে কেহ পীড়িত থাকিলে তাহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত হইত। অর্থাভাবে রাজার নিকট আবেদন করিলে, রাজা কর্ম্মচারীদিগের সাহায্য করিতেন, অবস্থা-বিশেষে তাঁহারা বন উপবন গৃহপালিত পশু বা জমীজমা পারিতোষিকরূপে প্রাপ্ত হইতেন। পর্দানসীন স্ত্রীলোকদিগের অভাব অভিযোগ জানিবার জন্য স্ত্রীলোকগণ দূতরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা অন্তরে অন্তরে ঘুরিয়া রাজার নিকট সকল তথ্য বিবৃত করিতেন। অর্থশাস্ত্রের ‘ভূভাতরণীর’ প্রকরণ (২৪৫ম পৃষ্ঠাঃ) এই সকল বিধি-বিধানের নিম্নোক্ত। ঐ পরিচ্ছেদের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল; যথা,—

“ঋত্বিগাচার্য্যমন্ত্রিপুরোহিতসেনাপতিবুযরাজরাজমাতৃরাজমহিষ্যোহষ্টচত্বারিংশং-

সাহস্রা। এতাবতা ভরণেনানাস্বদ্যত্মকোপকং চৈবাং ভবতি। দৈবারি-

কাত্ত্বংশিকপ্রশাস্তসমাহর্ষসমিধাতারশ্চতুর্বিংশতিসাহস্রাঃ। এতাবতা কর্ম্মণা

ভবতি। কুমারকুমারমাতৃনারকাপোরব্যবহারিককার্মাস্তিকমন্ত্রিপরিষজ্যোদ্ধাত-

পালান্তপালাশ্চ দ্বাদশসাহস্রাঃ। স্বামিপরিবন্ধবল সহারা হেতাবতা ভবতি।

শ্রেণীমুখ্যা হস্ত্যশ্বরথমুখ্যাঃ প্রদেষ্টারশ্চ অষ্টসাহস্রাঃ। স্ববর্ণানুকর্ষিণী হেতাবতা

ভবতি। ১০০ কর্ম্মসু মৃতানাং পুত্রদারা ভক্তবেতনং লভেয়ম্। বালবৃদ্ধব্যাধিতা-

শ্চৈবামগ্রাণা। প্রেতব্যাধিতমৃতিকাকৃত্যেযু চৈবামর্থমানকর্ম্ম কুর্বাৎ।

রাজার জন্মদিন উপলক্ষে বন্দীগণকে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল। কখনও কখনও বালক, পীড়িত এবং বৃদ্ধ বন্দীগণকে ত্যাগীদের দণ্ডকাল শেষ হইবার পূর্বেই মুক্তি দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত বন্দিশালায় বাহারা নির্মূল চরিত্রের পরিচয় দিতে পারিত, তাহারাও মুক্তীলাভ করিত। রাজার জন্মদিন ভিন্ন যুবরাজ-নির্বাচন-কালে এবং রাজপুত্রাদির জন্মোৎসব উপলক্ষে এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে কোটিল্যের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“বন্ধনাগারে চ বালবৃদ্ধব্যাধিতানাথানাং চ জাতনক্ষত্রপোর্ণ-

মাসীষু বিসর্গঃ। পুণ্যশীলাসুসময়াহুবজ্জা বা দোষনিব্রুং দহ্মাঃ।

দিবসে পঞ্চরত্নে বা বন্ধনস্থানু বিশোধয়েৎ। কর্মণা কারদণ্ডেন হিরণ্যামুগ্রাহেণ বা ॥

অপূর্বদেশাধিগমে যুবরাজাভিষেচনে। পুত্রজন্মনি বা মোক্ষো বন্ধনস্ত বিধীয়তে ॥”

—অর্থশাস্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, (নাগরকপ্রণিধিঃ, ১৪৬ম—১৪৭ম পৃষ্ঠাঃ ॥)

নুতন দেশ জয় হইলেও বন্দিদিগের মুক্তির ব্যবস্থা হইত,—অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় এইরূপ প্রাপন্ন হয়। জনহিতকর বিবিধ অহুষ্ঠানে রাজ্যের সুখৈখর্য্য বর্দ্ধন করা রাজার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। যেমন তাঁহার দণ্ডের ব্যবস্থা, তেমনি তাঁহার পুরস্কারের বিধান। গ্রাম-সমূহে অসহায় বালক-বালিকাগণের রক্ষার ভার রাজা গ্রামবৃদ্ধগণের প্রতি হস্ত করিয়াছিলেন, বিভিন্ন জনপদের জনসমূহের সুখস্বাস্থ্যের বিধানে তাহাদের শ্রীতিশ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ফলতঃ, জনহিতকর বিবিধ বিধানের প্রবর্তনায় এবং সুশাসন-সুপালনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠায়, সে রাজ্য গৌরবের তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিল।

হিন্দুগণ সর্বাধিকার বিশারদ ছিলেন। কিবা চিকিৎসা-বিদ্যা, কিবা ব্যবহার-বিধান, কিবা কলা-বিদ্যা, কিবা খনিজ-বিদ্যা, কিবা জ্যোতির্বিজ্ঞান—সর্ব বিষয়ে সর্বত্র তাহাদের অসামান্য জ্ঞান-গবেষণার পরিচয় দেদীপমান। খনিজ-বিদ্যায় তাহার বায়ুবিজ্ঞান।
(Meteorology) যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, ‘পৃথিবীর ইতিহাসের’ তৃতীয় খণ্ডে তাহা বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। খৃষ্টজন্মের তিন শতাব্দিক বৎসর পূর্ববর্তী অর্থশাস্ত্রেও সে পরিচয় পূর্ণ-প্রকটিত রহিয়াছে। গণকর্ষা-বিভাগের সূক্ষ্মতা-বিধানে কোটিল্য বিবিধ বিধির প্রবর্তনা করিয়াছেন। খনিজ-বিদ্যায় হিন্দুগণ সে সময়ে যেমন কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; পরঃপ্রণালী প্রভৃতি খননে দেশের সর্বত্র জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া তেমনি দেশ-হিতৈষিণীর প্রকৃত পরিচয় দিয়াছিলেন। কোটিল্যের সুব্যবস্থার বাকুণ-ভূমি, বাণিজ্যপথ, পরঃপ্রণালী প্রভৃতি খনন করা হইয়াছিল। চিকিৎসাদির সুব্যবস্থার এবং কলকারাখানাদি স্থাপনে সে রাজ্যের গৌরব-প্রতিষ্ঠা অশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হিন্দুগণ যে বায়ুবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অর্থশাস্ত্র হইতে তদ্বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ‘সীতাক্ষক’ প্রকরণে এই সকল বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কোন্ মেঘে কিরূপ বর্ষণ হয়, কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ বারি পতিত হইয়া থাকে, অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত ‘তাক্ষক’ অধ্যায়ে তদ্বিষয় পরিবর্ণিত আছে। নিম্নে তাহার কতকংশ উদ্ধার করা হইল,—

“বোকণদ্রোণং জাক্সালানাং বর্ষপ্রমাণমধ্যমানুপানাং দেশবাপানামধ্যত্রয়োদশান্দ্রকানাং
জয়োবিশ্ণুতিরবক্খীনামমিতমপরাস্তানাং হৈমন্যানাং চ কুল্যাবাপানাং চ কালতঃ। বর্ষ-

ত্রিভাগঃ পূৰ্ণপশ্চিমমাসয়োঃ, বৌ ত্রিভাগৌ মধ্যময়োঃ সুবমারূপম্। তন্ত্রোপলক্ষিবৃহ-
স্পতেঃস্থানগমনগর্ভাধানেভ্যঃ শুক্রোদয়াস্ত ময়চায়েভ্যঃ সূর্যাস্ত প্রকৃতিবৈকৃত্যতঃ।
সূর্য্যাদ্বিজসিদ্ধিঃ। বৃহস্পতেঃসম্যানাং স্তম্বকরিতা। শুক্রাদ্যুষ্টিরিতি। ত্রয়সপ্তা-
হিকা মেঘা অলীতিঃ কণলীকরাঃ। ষষ্টিরাতপমেঘানাম্ এষা বৃষ্টিসূমাহিতা ॥ বাত-
মাতপযোগঃ চ বিভজ্যত্ব বর্ষতি। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

—সীতাধ্যক্ষঃ, ১১৫ম—১১৬ম পৃষ্ঠাঃ ॥

জাভাল-দেশে ঘোড়শ দ্রোণ বৃষ্টি পতিত হয়। আনুপদেশে তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ। মহা-
রাষ্ট্রদেশে সাড়ে তের দ্রোণ, অবন্তী প্রদেশে তেইশ দ্রোণ বৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে
পশ্চিম প্রদেশে এবং হিমালয় অঞ্চলে ‘কুল্যাব’ বা নালা-প্রণালী খনিত হওয়ার ঐ দেশে বারি-
পাতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। বর্ষার প্রারম্ভে এবং বর্ষার শেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম
ঘটে। সে সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ বারিপতনের একতৃতীয়াংশ বারিপাত ঘটে। মধ্য-ভাগে বারি-
পাতের পরিমাণ—দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র। কিন্তু বারিপাত অপেক্ষাকৃত কম হইলেও সে সময়ে
বারিপতনের ঐরূপ পরিমাণই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে। অর্থাৎ—শ্রাবণ এবং কাষ্ঠিক
মাসে সাড়ে তের দ্রোণ বারিপাত হয়, আর আশ্বিন ও ভাদ্র মাসে ছাব্বিশ দ্রোণ জলবর্ষণ
হইয়া থাকে। বৃহস্পতির অবস্থিতি ও গমন, শুক্র উদয়াস্ত এবং সূর্য্যকিরণের প্রকৃতি-পরিমাণ
হইতে বৃষ্টিপাতের আরম্ভ গণনা করা যাইতে পারে। যৌত্রের প্রকৃতি হইতে বীজের অঙ্কুরোদগম
অনুমান করা যায়। বৃহস্পতির অবস্থিতি-স্থান-নির্ণয়ে বীজের গঠন এবং শুক্রের গতি-নির্ধারণে
বারিপাতের সূচনা প্রতীক্ষমান হইতে পারে। মেঘ—তিন প্রকার। সেই তিন প্রকার মেঘ
হইতে বারি পতন হয়। সেই তিন প্রকার মেঘ হইতে সাত দিন সাত রাত্রি অনবরত বৃষ্টি
পতন হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত স্বল্পবারিসম্বিত অলীতি প্রকার মেঘ আছে। সে সকল মেঘ
হইতে ক্ষুদ্র-বিন্দুসম্বিত বৃষ্টিপাত হয়। সূর্য্যকিরণের সহিত ষাট প্রকার মেঘ বিদ্যমান
থাকে। যে মেঘের সহিত বায়ু প্রবাহিত হয় না এবং যদ্বারা সূর্য্যকিরণ ঘনাকারে
আবরিত হয়, সেই মেঘে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। আর তাহাতে তিন বার
কর্ষণ কার্য্য সমাহিত হইতে পারে। এক্ষণ হইলে প্রচুর শস্তোৎপাদনের সম্ভাবনা। বারি পতন
লক্ষ্য করিয়া সীতাধ্যক্ষ বীজ-রোপণের ব্যবস্থা করিবেন। কোন্ সময়ে কোন্ শস্ত উৎপন্ন হয়
এবং কোন্ সময়ে কোন্ শস্তের বীজ বপন করা প্রয়োজন, সীতাধ্যক্ষ তাহারও উল্লেখ দৃষ্ট হয়।
উৎপন্ন শস্তে কর-প্রদানের প্রসঙ্গও সেস্থলে উত্থাপিত হইয়াছে। বৃষ্টির পরিমাণ নির্ধারণ জন্ত
সে সময় এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। ‘সন্নিধাতৃচেষ্টকম’ প্রকরণে (৫৮ম পৃষ্ঠাঃ) তাহার
উল্লেখ আছে,—“কোঠাগারে বর্ষমানমরক্রিষ্ণং কুণ্ডং স্থাপয়েৎ ॥” বারিপাত পরীক্ষার জন্ত
কোঠাগারের সম্মুখভাগে অরুদ্রিমাত্র প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট কুণ্ড স্থাপন করিবে। খুঁটজন্মের তিন
শতাধিক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে হে বায়ুবিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিল, কোটিল্যের এই
সকল উক্তি হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। গণনা-পদ্ধতি তখন এত বিস্তৃত ছিল যে, শস্তাদি
বপনে জনসাধারণ সে গণনার নির্ভর করিতে পারিতেন; আর তদনুসারে শস্তাদি রোপণ
ও আহরণ করিয়া তাহার বিশেষ লাভবান হইতেন।

যেমন বায়ুবিজ্ঞানে তেমনি খনিজ-বিদ্যায় কোটিল্যের অসাধারণ পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময় খনিজ-পণ্যে রাজকোষে বহু অর্থ সঞ্চিত হইত, মেগাস্থিনীসের বর্ণনায় এবং অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। ভারতের ভূগর্ভে তখন যে অসংখ্য খনি ছিল এবং সেই সকল খনি হইতে বিবিধ প্রকারের ধাতু উত্তোলিত হইত। মেগাস্থিনীস তাহা সুক্ক-কণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—“স্থল-প্রদেশে যেমন প্রচুর পরিমাণে শস্ত উৎপন্ন হইত, ভূগর্ভে তেমনি নানাবিধ ধাতুর আকর ছিল। সেই সকল আকর হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, লৌহ, টিন প্রভৃতি সর্বপ্রকার ধাতু আহরিত হইত। আকর-সমূহে তদ্ব্যতীত আরও বহু ধাতুর সমাবেশ ছিল। * দেশে তখন বিবিধ ধাতুর বহু খনি বিস্তারিত ছিল এবং প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থের আমদানি ও রপ্তানি হইত। সেই সকল ধাতু উত্তোলনের নিমিত্ত বিবিধ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। চাণ্যক তাঁহার অর্থশাস্ত্রে সে সকল প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারি, সে সময়ে স্থলে ও জলে উভয় প্রদেশেই খনি বিস্তারিত ছিল। খনি-সমূহের তত্ত্বাবধান জন্ত তত্ত্বাবধায়কগণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্বাবধায়কগণের দুইটা প্রধান কর্তব্য ছিল। প্রথমতঃ তাহাদিগকে নূতন নূতন খনি আবিষ্কার করিতে হইত; দ্বিতীয়তঃ, কোনও খনি একেবারে নিঃশেষ হইয়াছে কি না, ভস্মাদি বিবিধ সঙ্কেত পরীক্ষায় তাহা নির্ণয় করিতে হইত। সুতরাং রসায়ন-বিজ্ঞানে এবং ধাতুবিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন অল্প কেহ একঠোর দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনে সমর্থ হইতেন না। খনির অধ্যক্ষ—‘আকরাধ্যক্ষ’ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। রাজ্যের কোনও স্থানে নূতন খনি আবিষ্কৃত হইলে, সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজার নিকট জ্ঞাপন করিতে হইত। সে খনি খননের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত না হইলে, রাজা তাহা ব্যক্তি-বিশেষকে বা সম্প্রদায়-বিশেষকে বিলি করিতেন। যে খনির খনন-কার্য্যে অধিক ব্যয়-বাহুল্যের সম্ভাবনা, সেই খনি সঞ্চক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা বিহিত ছিল। রাজকীয় খনি-বিভাগে অভিজ্ঞ আরও বহু কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারও ঐ সকল কার্য্যে তত্ত্বাবধায়কের সহায়তা করিতেন। অধিকন্তু খনি-খননোপযোগী বিবিধ অস্ত্র-যন্ত্রাদি সংরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা ছিল এবং খননকার্য্যের জন্ত শ্রমজীবীগণ নিযুক্ত হইয়াছিল। বিভিন্ন ধাতু কিরূপে পরীক্ষা করা হইত, অধ্যক্ষগণ মিশ্রিত ধাতুর উপাদান-সমূহ কি ভাবে স্বতন্ত্র করিতেন,—অর্থশাস্ত্রের “আকরকর্ম্মাস্ত্রপ্রবর্তনম্” অংশে (৮২ম—৮৫ম পৃষ্ঠায়) তাহা পরিবর্ণিত আছে। ভূ-পৃষ্ঠের লক্ষণাদি দৃষ্টে খনির বিস্তারিততা অনুমান করিতে হইত। যে সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে যেরূপ খনি অনুমান

* And while the soil bears on its surface all kinds of fruits which are known to cultivation, it has also underground numerous veins of all sorts of metals, for it contains much gold and silver, and copper and iron in no small quantity, and even tin and other metals which are employed in making articles of use and ornament as well as the implements and accoutrements of war.”—*Fragments*, Bk I.

করিবার বিধি ছিল, অর্থাৎ তাহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সে বর্ণনায় বুঝা যায়, খনি ও খনিজ-পদার্থ সম্বন্ধে কোটিল্যের গবেষণা এবং তাঁহার বহুদর্শিতা কত বহুব্যাপী ছিল।

“পর্বতানামভিজ্ঞাতোদেশানাং বিলঙ্গহোপত্যাকাহলয়নিগূঢ়খাতেষুতঃপ্রসান্দিনো
অমুচুততালফলপঙ্কহরিদ্রাতেনহরিতালকোজহিঙ্গুলুকপুণ্ডরীকশুকময়ূরগজবর্ণাসুসবর্ণো-
দকৌষধীপর্যাস্তাশ্চিকণা বিশদা ভারিকাস্চ রসাঃ কাঞ্চনিকাঃ। অঙ্গু নির্জঘৃতা-
শ্চৈলবহিস্পিণঃ পঙ্কমলগ্রাহিণশ্চ তাত্ত্রপায়োশ্চতাহুপরিবেষ্কারঃ। তৎপ্রতিকল্পক-
মুগ্রগন্ধরসং শিলাজতু বিদ্যাৎ।”—আকারকর্ম্মান্তপ্রবর্তনম্, ৮১ম—৮২ম পৃষ্ঠাঃ ॥

এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয়, সমতল ভূমির বা পর্বতের সামুদ্রেশের অস্বাভাবিক বর্ণ ও গন্ধ দ্বারা খনির বিস্তারিততা অনুমান করা হইত। সে ক্ষেত্রে ভূমি ও সামুদ্রেশ অধ্যয়ন বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। সুবর্ণের আকর নিম্নবিধ সঙ্কেত দ্বারা অনুমান করা যাইত। ধাতু-সমূহের আকর-স্থান হইতে এক প্রকার গলিত পদার্থ নির্গত হয়। গলিত পদার্থের গুণ-ধর্ম্ম অনুসারে বিভিন্ন ধাতু পরিকল্পিত হইত। সুবর্ণের খনি হইলে, ঐ গলিত পদার্থ লঘু বা আশ্র ফলের দ্বারা বর্ণবিশিষ্ট হয়; আর তাহা তৈলের দ্বারা পিচ্ছিল হইয়া থাকে। কখনও তাহার বর্ণ পঙ্ক হরিদ্রার মত, কখনও বা হরিতাল খদির ও সিন্দূর প্রভৃতির দ্বারা। গলিত পদার্থের উজ্জল্য পদ্মের মত, শুক বা ময়ূর পক্ষীর দ্বারা হইলে স্বর্ণখনি অনুমান হয়। যে স্থান হইতে উক্তবিধ গলিত পদার্থ নির্গত হয়, সেই স্থানে যদি গুল্ম-লতা বর্ত্তমান থাকে, আর তাহাদের রসের সহিত যদি গলিত পদার্থের বর্ণের কোনও পার্থক্য উপলব্ধি না হয়; তাহা হইলে সে গলিত পদার্থকে উৎকৃষ্ট স্বর্ণের অংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে। স্বর্ণের গলিত অংশ জলে নিষ্ক্ষেপ করিলে উহা তৈলের দ্বারা বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কদম্ব ও ময়লা দ্বারা পুষ্ট হয় এবং লৌহ, তাম্র ও রৌপ্যের সহিত মিশিয়া যায়। শিলাজতুর গুণধর্ম্ম ও স্বর্ণের গুণধর্ম্মের অনুরূপ। শিলাজতুর পক্ষ অধিকতর উগ্র এবং উহা রসযুক্ত। স্বর্ণপরীক্ষার আরও কতকগুলি সঙ্কেতের বিষয় অর্থাৎ বিবৃত হইয়াছে। সেই সকল সঙ্কেত নিম্নরূপ নির্দিষ্ট করা যায়,—

“পীতকান্তাত্ত্রকান্তাপীতকা বা ভূমিপ্রস্তরখাতবো ভিন্না নীলরাজীবস্তো মুদগামাধকসর-
বর্ণা বা দধিবিন্দুপিণ্ডচিত্রা হরিদ্রা হরিতকীপদ্মপত্রশৈবলযুক্তংপ্রীহামবস্তবর্ণা ভিন্নাশ্চু-
বালুকালেখাবিন্দুস্বস্তিকবস্তঃ সুগুলিকা অর্চিস্তস্তাপ্যমানা ন ভিষ্মন্তে বহুকেনধূমাশ্চ
সুবর্ণধাতবঃ প্রতীবাগাণীস্তাত্ত্ররূপাবেধনাঃ।”—আকারকর্ম্মান্তপ্রবর্তনম্, ৮২ম পৃষ্ঠাঃ ॥

আকরোখিত সুবর্ণ, তাম্রের দ্বারা পীত বা রক্তবর্ণ; অথবা মিশ্রিত উভয় বর্ণবিশিষ্ট। যে ধাতুতে বহু নীল রেখার সমাবেশ থাকে, কিন্তু দেখিতে মাঘ মুগ বা তিলের মত; এবং বাহাতে দধি-বিন্দুর দ্বারা চিহ্ন বিস্তারিত; শৈবাল প্রীহা যুক্ত, হরিদ্রা বা পদ্মের দ্বারা বর্ণ-বিশিষ্ট হয়;—তাহা উত্তম স্বর্ণ। উহার অভ্যন্তরে স্বস্তিক বা ক্রুদ্র ক্রুদ্র গুলিকণা বর্ত্তমান থাকে। স্বর্ণ উত্তম হইলে ফাটিয়া যায় না। কিন্তু ফেণ ও ধূম উল্লীর্ণ করে এবং তাম্র ও রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত হয়। বাহারা ধাতু-সমূহের এই সকল গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন ধাতু নির্বাচন করিতে পারিতেন, তাঁহারা অল্প শিক্ষণীয় ছিলেন না। অতীত বিবিধ ধাতু পরীক্ষা সম্বন্ধে অর্থাৎ বিভিন্ন পদ্ধতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

সে সকল ধাতুর কি গুণধর্ম, কিরূপ লক্ষণযুক্ত হইলে কোন্ ধাতু অমুমান করিতে হয়, অথ-
নাত্রে তৎসমুদায় বিবৃত আছে । তৎসম্বন্ধে কোটিল্যের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

“শব্দকর্পূরাক্টিকনবনীতকপোতপারাবতবিমলকময়ূরগ্রীবাবর্ণাঃ সম্যকগোমেদকণ্ড-
ংস্তাণ্ডিকা বর্ণাঃ কোবিদারপদ্মপাটলীকলারক্ষোমাতসীপুষ্পবর্ণাসীসীসঃ সাজনাঃ
বিস্রা ভিন্নাঃ শ্বেতাভাঃ কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণাভাঃ শ্বেতাঃ সর্বে বা লেখাবিন্দুচিহ্না যদবো ধার-
মানা ন ক্ষুটন্তি বহুফেনধূমাশ্চ রূপাধাতবঃ ।”—আকরকর্ম্মান্তপ্রবর্তনম্, ৮২ম পৃষ্ঠাঃ ॥

এস্থলে রোপ্য পরীক্ষার বিষয় বলা হইতেছে । শব্দ, কর্পূর, ক্ষটিক কিংবা নবনীত সূক্ষ্ম অথবা
পারাবত, কপোত, বিমলক কিংবা ময়ূর প্রভৃতির কণ্ঠের ভ্রায় বর্ণবিশিষ্ট আকর—রোপ্যের
আকর । যাহার দানা—শস্ত্র, মণি, শুভ্র বা শর্করার দানার মত, তাহা রোপ্যের আকর ।
যাহার বর্ণ কোবিদার, পদ্ম, পাটলি, কলার, ক্ষোম এবং আভনী পুষ্পের ভ্রায় ; পরন্তু যাহা
সীসক ও লৌহের সহিত অতি সহজে মিশিয়া যায়, তাহাই রোপ্যের আকর-বিশ্বমানতা প্রাপন
করে । আকরস্থিত রোপ্যের গন্ধ—মাংসের গন্ধের ভ্রায় । তাহা ধূসর অথবা শ্বেতাভ কৃষ্ণ-
বর্ণবিশিষ্ট । লেখাবিন্দু ও চিহ্নসম্বিত ধাতু—রজত বলিয়া বুঝিতে হইবে । উক্তপু
হইলে রোপ্য বিদীর্ণ হয় না, অথচ ফেণ ও ধূম উদ্গীরণ করে । তাম্র ও সীসক প্রভৃতি
পরীক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ বিধি দৃষ্ট হয় । তাম্র ও সীসক পরীক্ষা সম্বন্ধে কোটিল্য বলিয়াছেন,—

“ভারিকস্নিগ্ধো মুহুশ্চ প্রস্তরধাতুভূমিভাগো বা পিজলো হরিতঃ পাটলো লোহিতো
বা তাম্রধাতুঃ ।...কাকমেচকঃ কপোতরোচনাবর্ণঃ শ্বেতারাজিনন্ধো বা বিশ্বেসীসধাতুঃ ।

...কাণ্ডভূজপত্রবর্ণো বা বৈকুণ্ঠকধাতুঃ ।”—আকরকর্ম্মান্তপ্রবর্তনম্, ৮৩ম পৃষ্ঠাঃ ॥

আকরস্থ তাম্র গুরু, তৈলাক্ত ও স্নিগ্ধ ; পিজল, সবুজ, হরিত, পাটল বা লোহিত বর্ণ-বিশিষ্ট ।
যে স্থানের গলিত পদার্থে এই সকল গুণধর্ম বর্তমান, সে স্থানে তাম্রখনির বিশ্বমানতা অমুমান
করিতে হইবে । আকরস্থিত সীসকের গন্ধও কাঁচা মাংসের মত । উহার বর্ণ—কাক-
মেচক, পারাবত ও গোপিতের বর্ণের ভ্রায় । উহাতেও শ্বেতবর্ণ রেখা-সমূহ সন্নিবিষ্ট
থাকে । এই সকল গুণধর্ম অমুমান করিয়া সীসকের খনি নির্দেশ করিতে হয় । টিন,
লৌহ প্রভৃতি ধাতুর আকর-নিরূপণেরও এইরূপ নানাবিধ প্রক্রিয়ার বিষয় উল্লিখিত আছে ।

“উষরকবুর পক্ষ লোষ্ট্রবর্ণো বা ত্রপুধাতুঃ । কুরুষঃ পাণ্ডুরোহিতস্ সিন্দুবারপুষ্প-

বর্ণো বা তীক্ষ্ণধাতুঃ । অচ্ছস্নিগ্ধঃ সপ্রভো ঘোষবান্ নীততীত্রস্তমুরাগশ্চ মণিধাতুঃ ।”

ধাতুর আকরাদি নির্ণয়ে এই সকল ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে । আকর হইতে যে সকল
ধাতু উত্তোলিত হয়, তাহার সহিত নানা দ্রব্য মিশ্রিত থাকে । সেই সকল মিশ্রিত
দ্রব্য ধাতু হইতে পৃথক করিতে না পারিলে উহা বিশুদ্ধ হয় না ; ধাতু বিশুদ্ধ না
হইলে সে সকল ধাতু কোনও উপকারে আসে না । ধাতু উত্তোলনের সকল উদ্দেশ্য
ব্যর্থ হইয়া যায় । মহামতি কোটিল্য তাই ধাতু-সমূহ বিশুদ্ধ করিবার উপায়-পরম্পরা অর্থশাস্ত্রে
নিবদ্ধ করিয়াছেন । তাহার উদ্ভাবিত সেই সকল উপায়ের কতকগুলি প্রদত্ত হইল ; যথা,—

“সর্বধাতুনাং গৌরববৃদ্ধৌ সম্ববুদ্ভিঃ—তেষামশুদ্ধা মৃদগর্ভা বা তীক্ষ্ণমূত্রকারভাবিতা রাজ-

বৃক্ষবটসীপুশোণিস্তরোচনা সহিষথরকরটমূত্রলণ্ডপিণ্ডবদ্ধান্তপ্রতীবাশান্তদ্বলেপা বা

বিশুদ্ধাসুস্রবতি। স্ববমাসতিলপলাশপীলুক্ষাঐর্গোক্ষীরাঙ্গক্ষীঐর্বা কদলীবজ্জকন্দপ্রতী-
বাপোমাদ্বিকরঃ। মধুমধুকমজাপরঃ সট্টলং স্রুতশুভকিঞ্চুতং সকন্দলীকং—বদপি শত-
সহস্রধা বিভিন্নং ভবতি মুহু ত্রিভিরেব তন্নিষেঠেকঃ। গোদন্তশুদ্ধপ্রতীবাপো মুহুত্তত্ত্বনঃ।”

—আকরকক্ষ্যাস্তপ্রবর্তনম্, ৮২ম—৮৩ম পৃষ্ঠাঃ ॥

বিবিধ প্রক্রিয়ার ধাতু বিশুদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল। প্রথমতঃ—অস্ত্রাশ্র কতকগুলি জব্যোহ-
সহিত মিশাইয়া, দ্বিতীয়তঃ—অস্ত্র জব্যোর সংমিশ্রণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা, ধাতু
বিশুদ্ধ করা হইত। পূর্বেপ্রকার প্রক্রিয়া-বিধানে তীক্ষ্ণ, মুক্ত ও ক্ষার দ্বারা ‘ভাবনা’ দিতে
হইত। তদ্ব্যতীত রাজবৃক্ষ, বট, পিপুল, গোপিত্ত, রোচনা এবং মহিষ, গর্দভ ও হস্তীর
সূত্র ও পিত্তের সহিত মিশাইয়া বা লেপ দিয়া আকরোথিত অপরিষ্কৃত ধাতু পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ
করিবার বিধান অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। শেষোক্ত বিধি—রসায়ন-শাস্ত্রের বিধির অঙ্গরূপ।*
এতদনুসারে, স্বব, মাস, তিল, পলাশ, পীলু, ক্ষার, গোক্ষার, অজক্ষার, কদলী, বজ্জ, কন্দ
প্রভৃতির সহিত অবিশুদ্ধ ধাতু সিদ্ধ করিতে হইত। ধাতু বিশুদ্ধ হইলে বিভিন্ন বিভাগের
অধ্যক্ষগণ তাহার সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিতেন। আকর হইতে যে সকল ধাতু
উত্তোলন করা হইত, সেই সকল ধাতুর অস্ত্র রাজকর প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। রাজ-
করের উল্লেখ প্রসঙ্গে, ‘আকরকক্ষ্যাস্তপ্রবর্তনম্’ অংশের উপসংহারে, কোটিল্য বলিয়াছেন,—
“এবং মূল্যং বিভাগং চ ব্যাজীং পরিষমত্যয়ম্। শুদ্ধং বৈধর্যং দণ্ডং রূপং রূপিকমেব চ ॥
খনিভ্যো দ্বাদশবিধং ধাতুং পণ্যং চ সংহরৎ। এবং সর্কেষু পণ্যেযু স্থাপয়েদুথসংগ্রহম্ ॥
আকরপ্রভবঃ কোশঃ কোশাদণ্ডঃ প্রজায়তে। পৃথিবী কোশদণ্ডাত্যাং প্রাপ্যতে কোশভূষণা ॥”
আকর হইতে যে সকল পণ্যজাত উৎপন্ন হইত, সেই সকল পণ্যে রাজা দশ প্রকার
রাজকর গ্রহণ করিতেন; যথা,—মূল্য, বিভাগ, ব্যাজী, পরিষ, অত্যয়, শুদ্ধ, বৈধর্য, দণ্ড,
রূপ এবং রূপিক। এই সকল বিষয়ে রাজার একাধিপত্য ছিল। খনি হইতে দ্বাদশ-
বিধ ধাতু উৎপন্ন হইত। সে সকল ধাতুর উপরই এইরূপ কর-গ্রহণের বিধি বিহিত
হইয়াছিল। খনি নিঃশেষ হইল কি না, তাহা নির্ণয় করিবার অস্ত্র অধ্যক্ষ ভূমাদি পরীক্ষা
করিতেন। তাহাও অধ্যক্ষগণের বিশেষ পারদর্শিতার নিদর্শন। এতৎপ্রসঙ্গে কোটিল্য
বলিয়াছেন,—“কিটুভূষাঙ্গারভঙ্গলিঙ্গং বাহাকরং ভূতপূর্কমভূতপূর্কং বা ভূমিপ্রস্তররসধাতু-
মত্যর্থবর্ণগোরবমুজ্জগন্ধরসং পরীক্ষেৎ ॥” কিটু, কয়লা, ভগ্ন প্রভৃতি দ্বারা অনুমান করিতে
হইত,—পূর্বে সে খনিতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল কি না। অধ্যক্ষগণ এ সকল বিষয়ে
পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞান-গবেষণা ও বহুদর্শিতা কত গভীর ছিল, তাঁহাদের
কার্য্যাবলী আলোচনায় তাহা প্রতীত হয়। সমুদ্রগর্ভে ও নদীগর্ভে মুক্তা, শুভ্র, প্রবাল,
শঙ্খ প্রভৃতির আকর। সেখান হইতে মুক্তা, শুভ্র, প্রবাল, শঙ্খ আহরিত হইত। সামুদ্রিক

* ধাতু-বিশোধনের এ সকল প্রক্রিয়া আধুনিক ধাতুবিজ্ঞান-বিশারদগণের নিকট অতি অভিনব বলিয়া
প্রতীয়মান হইতে পারে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার এখন নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবলম্বন
করিয়া থাকেন। কিন্তু ধাতু-সংশোধন-সংক্রান্ত কোটিল্যের এ বিধান সে সময়ে যে অশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল,
তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

খনিজ-জ্ঞান সে সময়ে কত অগাধ ছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। আরও বুঝা যায়, সে সময়ে নৌ-বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল এবং নৌ-যানাদি নির্মাণে সমুদ্র-পথে গতিবিধির উৎকর্ষ-সাধনে বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল;— প্রভূত ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে রাজ্যের ক্রীড়ি সাধিত হইয়াছিল।

আকর-ব্যবহার দ্বারা জল-সরবরাহের বন্দোবস্তও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কোটিল্যের সময়ে দেশমধ্যে জলসরবরাহের বহু বিশদ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল,

অর্থশাস্ত্রের আলোচনার তাহা প্রতিপন্ন হয়। গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস
জলসেচন
ব্যবস্থা। এতদ্বিষয় নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায়

অবস্থিতি-কালে তিনি তাত্‌কালিক শাসন-প্রণালীর এক বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে প্রকাশ,—রাজ্যমধ্যে বহুল পরিমাণে নদী-নালা-পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি খনিত হইয়াছিল এবং তাহাতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি হওয়ায় দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্ত উৎপন্ন হইত। পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি তত্ত্বাবধানের জন্য রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। দেশের সর্বত্র সমভাবে জলসরবরাহ হয়, তৎপ্রতি তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। চতুর্বিধ উপায় অবলম্বনে দেশে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। (১) হস্তপ্রাবর্ত্তিম্—হস্ত দ্বারা জলসেচন; (২) স্বকপ্রাবর্ত্তিম্—ভার বা কলসী প্রভৃতির সাহায্যে স্বক্রে করিয়া জলসংবাহন; (৩) শ্রোতোযন্ত্রপ্রাবর্ত্তিম্—যন্ত্র-কলাদির সাহায্যে জলসেচন ও জলপ্রদান; এবং (৪) নদীসরস্বটাকক্ষুপীজ্বাটম্—নদী, হ্রদ, তড়াগ, পুষ্করীণী হইতে জল উত্তোলন এবং জলসরবরাহ। এতদ্ব্যতীত গো-মহিষাদির সাহায্যে জলসরবরাহের ব্যবস্থা ছিল; বাতপ্রাবর্ত্তিম্ বা বায়ু শক্তি সাহায্যে নল প্রভৃতির দ্বারা জল-উত্তোলনের ও জলসরবরাহের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত চতুর্বিধ উপায়ে জলসরবরাহ করিতে শুক বা কর প্রদান করিতে হইত। সেই করের হার যথাক্রমে উৎপন্ন শস্তের এক-পঞ্চমাংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-চতুর্থাংশ। এতৎসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের উক্তি; যথা,—

“হস্তপ্রাবর্ত্তিমুদকভাগং পঞ্চমং দদ্যাৎ। স্বকপ্রাবর্ত্তিমং চতুর্থম্। শ্রোতোযন্ত্রপ্রাবর্ত্তিমং

চ তৃতীয়ম্। চতুর্থং নদীসরস্বটাক কৃপোদ্বাটম্॥”—সীতাধ্যক্ষঃ, ১১৭ম পৃষ্ঠাঃ ॥

নূতন নূতন নালা ও পয়ঃপ্রণালী খনন-কালে অথবা পুরাতনের সংস্কার-সময়ে রাজকর-গ্রহণের নিয়ম ছিল না। ‘বাস্তবিকর’ প্রসঙ্গে সে বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সেখানে ‘বাতপ্রাবর্ত্তিম্’ ত্রায়ুযন্ত্র-সাহায্যে ‘পম্প’ করিয়া জল উত্তোলনের ও জল-সরবরাহের ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এতৎপ্রণালীর ব্যবহার-বিধানে কোটিল্যের উক্তি নিয়ে প্রদান করা গেল; যথা,—

“বাতপ্রাবর্ত্তিমনন্নিবিবন্ধারতনতটাককেদারারামঘণ্ডাপানানং সস্তপর্ণ্যভাগোত্তরিক-
মন্ত্বেভ্যা বা যথোপকারং দদ্যাৎ। প্রক্রমাবক্রমবিভাগভোগনিম্‌ষ্টোপস্তোক্তারৈশ্চবাং
প্রতিকুর্ভূঃ। অপ্রতিকারে হীনদ্বিগুণো দণ্ডঃ। সেতুভ্যা মুকুতস্তোত্রমপারে ষটপণো
দমঃ ॥ পারে বা ভোরমন্ত্বেবাং প্রমাদে নোপকরুতঃ ॥”—বাস্তবিকরঃ, ১৭০ম পৃষ্ঠাঃ ॥

উপরি-উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যায়, ক্যানাল বা নালা-সমূহে দরজা ছিল। সেই দরজার সাহায্যে জল আনয়ন ও নিঃসারণ কার্য সম্পন্ন করা যাইত। সেই কপাট খুলিয়া দিয়া অতিরিক্ত

জল আনিয়া অপরের অনিষ্ট করিলে অথবা কপাট বন্ধ করিয়া জলপথ রুদ্ধ করিলে দণ্ডের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। ‘নীতাধ্যক্ষ’ ব্যবস্থায় কোটিল্য কৃত্রিম খনিত নালার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বৃষ্টিপাতের অনুপাত নির্দেশে তিনি বলিয়াছেন,—“অপরাস্তানাং হৈমন্তানাং চ কুল্যাবাপাণাং চ কালতঃ।” * যেখানে জলসরবরাহের জন্ত নদী নালা খনিত হয়, সেখানে বারিপাতের পরিমাণ অধিক। অপরাস্ত অর্থাৎ পশ্চিম-প্রদেশে এবং হিমবস্ত অর্থাৎ হিমালয় প্রদেশে বহু নদী-নালা খনিত হইয়াছিল। সুতরাং তত্তৎপ্রদেশে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইত,—কোটিস্যের এই অভিমত। জলসরবরাহের জন্ত যেমন নদী নালা খনন করা হইয়াছিল, জীর্ণ-সংস্কারেরও তেমন ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত ছিল। “অপ্রতীকারে হীনদ্বিগুণো দণ্ডঃ।”—যাহারা এ কার্যে শৈথিল্য করিত, তাহাদের প্রতি গুরুদণ্ড বিহিত হইত। এতদংশের আলোচনায়ও কোটিস্যের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। খনি-নিষ্কা বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, বায়ুবিজ্ঞানে এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান-গবেষণা অমাহুযিক ছিল, মিউনিসিপাল সংক্রান্ত ব্যবস্থায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল,—এ প্রসঙ্গের আলোচনায় তাহা উপলব্ধি হয়। আর বুঝা যায়, তিনি যে রাজ্যের কর্ণধাররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সে রাজ্য সর্ববিষয়ে উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল এবং তাঁহার বিধি-ব্যবস্থায় সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

* অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত ‘নীতাধ্যক্ষ’ ব্যবস্থায় যে ‘কুল্যাব’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কৃত্রিম নদী-নালা খননের বিষয় মনে হয়। পশ্চিম প্রদেশে এবং হিমালয় অঞ্চলে ‘কুল্যাব’ প্রস্তুত হইত। এবং কৃষির উৎকর্ষ সাধন জন্ত তদ্বারা জলসরবরাহ করিবার ব্যবস্থা ছিল, ঐ অংশে কোটিলা সেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হিমালয়-প্রদেশ ও পশ্চিমাঞ্চল পর্বতবহুল। সে সকল স্থানে স্বাভাবিক নদী-নালার অপ্রাচুর্য্য আজিও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সেখানে কৃত্রিম নদী-নালার সাহায্যে জলসরবরাহের ব্যবস্থা আধুনিক কালের জায় প্রাচীন কালেও বিহিত হইয়াছিল। অপরাস্ত এবং হিমবস্ত দেশে সেই জন্ত বহুল পরিমাণে কৃত্রিম নদী-নালা প্রভৃতি খননের ব্যবস্থা কোটিলা বিহিত করিয়াছিলেন। সেই সকল নদী-নালায় দরজা সংযোজিত হইয়াছিল এবং আবশ্যকানুসারে জল সরবরাহ করা যাইতে পারিত,—বাস্তবিক অংশের ‘সেতুভোঃ’ শব্দে তাহা সপ্রমাণ হয়। অধুনা ‘ক্যানাল’ বা কৃত্রিম নালা প্রভৃতিতে সে ‘স্লুইস্-গেট’ (Sluice Gate) দরজা থাকে, প্রাচীন কালের ‘কুল্যাব’ বা ক্যানাল সমূহের ‘সেতু’ তদনুরূপ বলিয়া অনুমান করা যায়। ‘বাতপ্রবৃত্তি’—বায়ু-বস্ত্র সাহায্যে জল উত্তোলন করা। আজিকালি ষ্টিম (Steam) বা বাষ্প-শক্তি দ্বারা যেমন জল উত্তোলন ও জলসরবরাহ করিবার ব্যবস্থা আছে, প্রাচীনকালে বায়বীয় শক্তির সাহায্যে সে কার্য সমাহিত হইত। বিজ্ঞান বিষয়ে কতদূর উন্নত হইলে এই সকল বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বেগাভিনীস বলিয়াছেন,—“Some superintend the rivers, measure the land as is done in Egypt, and inspect the sluices by which water is let out from the main canals into other branches, so that every one may have an equal supply of it.”—Fragments XXXIV, Bk. III. সুতরাং আধুনিক যে ব্যবস্থায় এতদ্রূপে বৃষ্টিপাত করি না কেন, সে সকল ব্যবস্থাই প্রাচীনের অনুযায়ী বলিয়া উপলব্ধি হয়; আর তাহাতে পূর্বকীর্তির নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া জলর আনন্দ-রসে আপ্ত হইয়া উঠে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—○●○—

পশুপালন ব্যবস্থায় আদর্শ।

[ভারতে পশুপালন,—পশাদির বাহ্যো ঐশ্বর্য-বাহ্য ;—পশুপালন বিষয়ে ব্যবস্থা-বিধান,—গোম্বাৎক, অম্বাৎক, হস্তাৎক, বিবীতাৎক, স্ননাৎক প্রভৃতি পশু-বিভাগের বিভিন্ন কর্ত্তারী ;—কর্ণচারিগণের কর্ত্তব্য ;—গোপালক,—বেতনানুসারে গোপালকের শ্রেণিবিভাগ,—বেতনোপগ্রাহিক, করপ্রতিকর, ভোগ্যেস্থটক, ভাগাভূ-প্রবিষ্টক প্রভৃতি,—পশুপাল-সংগঠন-প্রণালী ;—পশাদির সংখ্যানিরূপণ এবং তালিকা-সংগ্রহ,—তাহাদের ঘোড়শ-বিধ শ্রেণীর উল্লেখ ;—পশাদির খাত্ত ব্যবস্থা,—খাত্তাদির পরিমাণ,—দোহন সংক্রান্ত নিয়মাদি,—আহার পরিমাণে দুগ্ধ পরিমাণ,—চিকিৎসা-ব্যবস্থা ;—স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে অশেষ প্রয়াস,—চারণ ভূমির ব্যবস্থা,—চারণভূমি-রক্ষণ-প্রণালী,—স্বহা-বিষয়ক স্তম্ভা ব্যবস্থা ;—অশুপালনে অম্বাৎকের কর্ত্তব্য,—আকৃতি প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের তিনটি বিভাগ,—ভীক, ভদ্র ও মন্দ,—অশাদির আহাৰ্য্য-ব্যবস্থা,—অশু-পরীক্ষা,—অশের শিক্ষা-প্রণালী,—গতি প্রভৃতির পরিচয়,—অশশালার ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যবিধানের পরিচয়,—চিকিৎসার অবহেলায় চিকিৎসকের দণ্ড ;—হস্তিপালন ব্যবস্থা,—ভদ্রদেহে হস্তাৎক প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ত্তারী নিয়োগ,—তাহাদের কর্ত্তব্য ও কাৰ্য্য-পরিচয়,—হস্তী দৃত করিবার পদ্ধতি,—হস্তীর শিক্ষা বিধান,—উশুখল হস্তীর শাস্তির উল্লেখ,—হস্তীর স্বাস্থ্য-বিধানে বিবিধ প্রয়াস,—গৃহ-নিৰ্ম্মাণের নিয়মাবলি,—খাত্তাদির ও স্নানের ব্যবস্থা,—চিকিৎসার বন্দোবস্ত,—নদীজ ও পার্বত্যীয় হস্তী,—পক্ষী সংরক্ষণ ;—শিক্ষা-বিধানে ও শিক্ষাপ্রচারে উৎকর্ষের পরিচয় ;—সর্ববিষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ ধ্যান,—প্রাচীন হিন্দু জাতির গৌরব-প্রতিষ্ঠা।]

পশুপালন ব্যবস্থায়—কোটিলোর কৃতিত্বের আর এক নিদর্শন প্রকটিত। পশুপালনের সুবন্দোবস্ত আদর্শ-রাজ্যের আর এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষ—কৃষিপ্রধান। বেদাদি হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতি-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের আলোচনায় ভারতে পশুপালন। প্রতিপন্ন হয়, ভারতের অপরাপর শিল্পের মধ্যে কৃষিশিল্প প্রধান স্থান অধিকার করিয়া ছিল ; আর কৃষিশিল্পের উন্নতির জন্য বিবিধ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। কৃষির উন্নতি-কল্পে গৃহপালিত পশু যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে অণুমান সংশয় থাকিতে পারে না। আজিও ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যের জন্ত পাশ্চাত্য-দেশের জায় কল-যন্ত্রাদি প্রবর্তিত হয় নাই। কর্ষণ জন্ত আজিও ভারতবর্ষে গো-মহিষাদি পশু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের উপকারিতা সন্দেহ কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমি উর্বরতার জন্ত চিরপ্রসিদ্ধি-সম্পন্ন। কর্ষণযোগ্য ভূমিও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। কিন্তু প্রাচীন কালের জায় সেক্ষণ প্রচুর পশু এখন আর উৎপন্ন হয় না। উপযুক্ত পশাদির অভাবই তাহার একতম কারণ বলিয়া কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়া থাকেন। পশুপালনে চারণভূমি এবং উপযুক্ত খাত্ত-সরবরাহ বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু অধুনা ভারতে চারণভূমির একান্ত অভাব। খাত্তাদি সরবরাহ সন্দেহে কোনও বিশেষ ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। কর্ষণ-সমর্থ পশাদি এখন প্রায়ই লোপ পাইতে বসিয়াছে হর্ষণ কয় হইয়া কালক্রমে পতিত হইতেছে। কিন্তু প্রাচীনকালে ইহার বিপরীত

কোটিস্যের অর্থশাস্ত্রে পশুপালন-সংক্রান্ত বিধি-ব্যবহার অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পশু-
সংস্করণ উদ্দেশ্যে তিনি রাজকীয় স্বতন্ত্র একটা বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আর বিভাগীয়
বিভিন্ন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্ত বিভিন্ন নামধের কর্মচারী নিযুক্ত হইয়া-
ছিলেন। বহুসংখ্যক চরণভূমির এবং প্রচুর আহাৰ্য্যের ব্যবস্থা বিহিত
হওয়ায় পশু-সংরক্ষণে ও পশুপালনে দেশের বিবিধ উন্নতি সাধিত হইয়া-

“গোপালকপিণ্ডারকদোহকমহুকলুককা: শতং শতং ধেনুনাং হিরণ্যভূতা: পাণদ্রেয়।

কীর্ত্তভূতা হি বৎসানুশহস্যারিতি বেতনোপগ্রাহিকম্ ।—গোহৃধ্যাকঃ, ১২৮ম পৃষ্ঠাঃ ॥

কৰ্মচাৰিগণের কেহ দোহক, কেহ মছক এবং কেহ লুক্ক নামে অভিহিত। তাঁহাদের
প্রত্যেকের উপর এক শত হিসাবে গো-পালনের ব্যবস্থা ছিল। কৰ্মচাৰিগণের কাহাকেও
বেতনোপগ্রাহিক, কাহাকেও করপ্রতিকর, কাহাকেও ভোগোন্মুক্তক, কাহাকেও ভাগাছ-
প্রবিষ্টক—এইরূপ বন্মোবন্তে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। গোপালনে কৰ্মচাৰিদেগের নিয়োগ-
প্রথা সম্বন্ধে অৰ্থশাস্ত্রে যে বিধি বিহিত হইয়াছে, নিয়ে তাহা প্রদত্ত হইল; যথা,—

“গোহাফােলা বেতনোপগ্রাহিকং করপ্রতিকরং ভোগোৎসষ্টকং ভাগানুপ্রবিষ্টকং
ব্রজপর্যাগ্রং নষ্টং বিনষ্টং ক্ষীরদ্ব্যুতসঙ্গীতং চোপলভেত ।...অরদ্ব্যুতসঙ্গীতপাটৌহী-
বৎসতরীণং সমবিভাগং রূপশতমেকং পালয়েৎ । দ্ব্যুতসঙ্গীতৌ বারকান্ পণিকং
পুচ্ছং অক্ষচর্ম বার্ষিকং দদ্যাদিতি করপ্রতিকরঃ । ব্যাধিতান্ত্রকানভদোহীহ্রদোহা-
পুত্রস্রীণাং চ সমবিভাগং রূপশতং পালয়ন্তুজ্জাতিকং ভাগং দদ্যাদিতি ভোগোৎ-

সৃষ্টকর্ম। পরচক্রাটবীভয়াদমুপ্রবিষ্টানাং পশুনাং পালনধর্ম্মেণ দশভাগং দদ্যুরিতি
ভাগ্যুপ্রবিষ্টকম্ ॥—দ্বিতীয় খণ্ডঃ, ২১ম অধ্যায়, গোহধ্যায়ঃ, ১২৮ম—১২৯ম পৃষ্ঠাঃ।

গাভী-পালকগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। বেতনোপগ্রাহিক, করপ্রতিকর, ভগ্নোৎ-
সৃষ্টক এবং ভাগ্যুপ্রবিষ্টক। বেতন অনুসারে তাহাদের ঐক্য শ্রেণিবিভাগ হইরাছিল।
নির্দিষ্ট বেতন লইয়া যাহারা গোপালনে নিযুক্ত হইত, তাহারা বেতনোপগ্রাহিক। দ্বিতীয়
শ্রেণীর গোপালককে এক শত পশু প্রদান করা হইত। অরদুগ্ধ, দুগ্ধবতী গাভী, গর্ভিণী,
পটৌহী, বৎসতরী—এই পঞ্চ প্রকারের গাভী সমসংখ্যায় তাহাদের নিকট প্রতিপালনার্থ
প্রদান করা হইত। তাহারা প্রতি বৎসর প্রত্যেক আট ভার ঘৃত এবং মৃত পশুর পুচ্ছ-চর্ম্মাদি
প্রদান করিত। এই শ্রেণীর পালক—‘করপ্রতিকর’ আখ্যায় অভিহিত। তৃতীয় শ্রেণীর
গোপালক—‘ভগ্নোৎসৃষ্টক’। চারি শ্রেণীর সমান সংখ্যক গবাদি তাহাদিগকে প্রদান
করা হইত। ব্যাধিগ্রস্ত, অদোহ, দুর্দোহ এবং পুত্রহী প্রভৃতি গাভী তাহাকে দিবার নিয়ম
ছিল। তাহারা ব্যাধিগ্রস্ত পশুর চিকিৎসাদি করাইয়া সুস্থ ও সবল করিত;—সন্তাননষ্টকারী
পশুকে বশে আনিত;—আর দুগ্ধহীন বা দুর্দোহ গাভীর দুগ্ধ-দোহনের ব্যবস্থা করিত।
পূর্বোক্ত চারি শ্রেণীর পশুপালন বিশেষ আয়াসসাধ্য। সেই জন্য দুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্যের নির্দিষ্ট
অংশ তাহারা গ্রহণ করিত। আর যাহারা নিজ নিজ গবাদির প্রতিপালনে অসমর্থ হইত,
অথবা দম্বা-তক্ষরের ভয়ে রাজকীয় গোশালায় তাহা প্রদান করিত, কর-স্বরূপ তাহা-
দিগকে উৎপন্ন-দ্রব্যের দশমাংশ রাজসরকারে প্রদান করিতে হইত। তাহারা ‘ভাগ্যু-
প্রবিষ্টক’ সংজ্ঞায় অভিহিত। পশ্বাদির দল-সংগঠন সম্বন্ধেও বিশেষ বিধি ছিল। গর্দভ
ও মথুর এক দলে এক শতের অধিক প্রায়ই দৃষ্ট হইত না; আর তাহাদের মধ্যে
মাত্র পাঁচটা পুং-জাতীর পশু থাকিত। ছাগমেবাদির দলে ঐক্য দশটী এবং গাভী,
মহিষ ও উষ্ট্র প্রভৃতির দলে মাত্র চারিটা পুং-জাতীর পশু সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। যথা,—

“পঞ্চবর্ত্তং থরাখানামজাবীনাং দশবর্ত্তম্।

শকাং গোমহিবোষ্ট্রাণাং যুথং কুর্য্যাচ্চতুর্ব্বম্ ॥”

গো-মেঘ-মহিষাদির সংখ্যা নিরূপণ করিয়া তাহার হিসাব-সংরক্ষণের ব্যবস্থা অর্থশাস্ত্রে
দৃষ্ট হয়। রাজকীয় গো-শালায় জী ও পুং জাতীর যে সকল পশু থাকিত, তাহাদের
তালিকা প্রস্তুত করিয়া অধ্যক্ষ রাজচিহ্ন দ্বারা পশুসমূহ চিহ্নিত করিতেন।

সংখ্যা-নিরূপণ। হৃত, মৃত, নষ্ট, বিনষ্ট সর্ব্বপ্রকার পশুর বিবরণ সেই তালিকায় সন্নিবিষ্ট
করিবার বিধি ছিল। প্রকৃতির নিয়মামুসারে রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চ

লাভ করিলে, অথবা বার্কিকের পীড়নে কিংবা কোনও অস্বাভাবিক উপায়ে পশুগণ মৃত্যুমুখে
পতিত হইলে, কিংবা অন্য কোনও কারণে তাহাদের মৃত্যু ঘটিলে, তালিকায় অধ্যক্ষগণ সে
সকল বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিতেন। পুং, জী, যুবা ও বৃদ্ধ হিসাবে পশ্বাদির শ্রেণিবিভাগ হইত।
তদনুসারে পশ্বাদির বহু শ্রেণীর পরিচয় অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। সে পরিচয়; যথা,—

বৎসা বৎসতরী দম্বা বহিনী যুবা উকাগশ্চ পুজবাঃ যুগবাহনশকটবহা যুবতাস্থনা

মহিষাঃ পৃষ্ঠবন্ধবাহিনশ্চ মহিষাঃ বৎসিকা বৎসতরী পটৌহী গর্ভিণী ধেমুশ্চাপ্রজাতা

বক্ষ্যাস্ত গাবো মহিষাস্ত মাসদ্বিমাসজাতান্তাসামুপজা বৎসা বৎসিকাশ্চ। মাসদ্বিমাস-
জাতানকয়েৎ। মাসদ্বিমাসপশুযুযিতমকয়েৎ। অকং চিহ্নং বর্ণং শৃঙ্গান্তরং চ লক্ষণ-
মেবমুপজা নিবন্ধরেদিতি ব্রহ্মপর্যাগ্রম্। চোরহৃতমস্তৃণপ্রবিষ্টমবলীনং বা নষ্টম্।
পঞ্চবিষমব্যাধিজরাতোরাধারাবসন্নং বৃক্ষতটকাষ্ঠশিলাভিতমীশানব্যালসপগ্রাহদাবাঘি-
বিপন্নং বিনষ্টং প্রোদাদানভ্যাভবেযুঃ।*—গোহৃধ্যাক্ষঃ, ২১ম অধ্যায়, ১২৯ম পৃষ্ঠাঃ।

তালিকার উল্লিখিত ষোড়শ প্রকার পশুর নাম—বৎস, বৎসতরী, দম্যা, বহিনী, বুঘ, উক্ষণঃ, পুঙ্গব, যুগবাহন বুঘভ, শকটবহ বুঘভ, স্থনা, মহিষ, পৃষ্ঠস্কন্ধবাহিন মহিষ, বৎসিকা, বৎসতরী, পট্টোহী, গভীণী, ধেনু, অপ্রজাতা, বক্ষ্যা, মাসদ্বিমাসজাতান্তাসামুপজা বৎস ও বৎসিকা। * রাজ-পশুশালাহু এই সকল পশুর সহিত অস্বামিক পশুর গাজে রাজচিহ্ন-সমূহ প্রদান করিবার বিধি ছিল। শৃঙ্গবয়ের দূরত্ব পরিমাণে, স্বাভাবিক চিহ্ন দ্বারা এবং বর্ণ অনুসারে চিহ্নিত পশুদিগের শ্রেণিবিভাগ হইত। গোহৃধ্যাক্ষ স্বয়ং এই সকল কার্য সম্পন্ন করিতেন। ভারবাহী পশুর নাসারন্ধ্রে ছিদ্র করিয়া রশ্মি-সংযোজনের প্রথাও অর্থশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। 'নস্ত' নামে উহা অভিহিত হইয়া থাকে।

পশুদির স্বাস্থ্যোন্নতি-কল্পে খাদ্য-সরবরাহের এবং চিকিৎসাদির ব্যবস্থায়ও বিশেষ কৃতি-
ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নস্যযুক্ত ভারবাহী পশু এবং অস্ত্রান্ত পশুর খাদ্যাদি সম্বন্ধে
খাদ্য অর্থশাস্ত্রে এক বিস্তৃত তালিকা লিপিবদ্ধ আছে। তদনুসারে ঐ সকল
ও পশুকে নিম্নলিখিত পদ্ধতি-ক্রমে ওজন-পরিমাণে খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা
বাহ্য-ব্যবহার। ছিল। অর্দ্ধ ভার বৎস, এক ভার তৃণ, এক তুলা খোল, দশ আটক কণকুণ্ডক

বা ভূষি, পাঁচ পল লবণ, এক প্রস্থ পানীয়, এক তুলা মাংস, যব বা মাস এক দ্রোণ, এক
আটক দধি, এক আটক হৃদ্ধ বা ক্ষীর, এক আটক সুরা, এক প্রস্থ তৈলাদি স্নেহ-পদার্থ,
দশ পল ক্ষার বা শুভ্র, এক পল শৃঙ্গিবের (আটক জাতীয় দ্রব্য) এবং নাসারন্ধ্রে মর্দন
করিবার জন্য এক কুড়ু ব তৈল। অন্যান্য পশুকেও পূর্বেোক্ত দ্রব্য-সমূহ আহার্য্য স্বরূপ প্রদান
করা হইত। কিন্তু তাহার হার-পরিমাণে তারতম্য ছিল। অশ্বতর, গাভী এবং গদভ
প্রভৃতিকে পূর্বেোক্ত দ্রব্য-সমূহের পরিমাণের এক সিকি কম খাদ্য প্রদান করা হইত। মহিষ
ও উষ্ট্রের পক্ষে দ্বিগুণ আহার্য্য প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। তৃণোদক পশুদির প্রধান খাদ্য। সময়
সময় অবস্থা-বিশেষে পূর্বেবিধি খাদ্য-পানীয় প্রদানের বন্দোবস্ত হইত। গোহৃধ্যাক্ষে, যথা,—

বলীবদর্নাং নস্তাশ্বভজগতিবাহিনাং যবসস্তার্দভারঃ তৃণস্ত দ্বিগুণং; তুলা বাণপিণ্যাকস্ত;
দশাটকং কণকুণ্ডকস্ত; পঞ্চপলিকং মুখলবণং; তৈলকুড়ুখো নস্যং; প্রস্থঃ পানং;
মাংসতুলা; দশশ্চাটকং; যবদ্রোণং, মাসানাং বা পুলাকঃ; ক্ষীরদ্রোণমষ্টাটকং বা

* দম্যা ও বহিনী বুঘ—পোষমানান ও ভারবাহী বুঘ; উক্ষণঃ ও পুঙ্গবঃ—গর্ভাধান জন্য রক্ষিত বুঘ;
যুগবাহন ও শকটবহ বুঘভ—যুগ্ম-বন্ধনে বে. বুঘ দ্বারা শকটচালনা করা হয়; স্থনা—বাহাদের মাংস স্বাস্থ্যরূপে
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৎসিকা—বক্সা বাছুর; বৎসতরী—কিশোরপ্রাপ্ত গাভী; পট্টোহী—যুবতী গাভী;
ধেনু—দুগ্ধবতী গাভী; অপ্রজাতা—বাহাদের সন্তান হয় নাই; মাসদ্বিমাসজাতান্তাসামুপজা বৎসাবৎসিকাশ্চ—
এক মাস বা দুই মাস বয়স্ক বাছুর।

জ্বরাসঃ; দেহশ্রুঃ; কার্যশপলঃ; শৃঙ্গিবেরপলঃ ৫ প্রতিপানম্ । পানোদনমখতরগো-
খরাণাং দ্বিগুণং মহিবোষ্ট্রীনাং কর্ণকরবলীবর্দানাং পাননার্থানাং ৫ । ধেনুনাং কর্ম-
কালতঃ ফলতঃ ৮ বিধানানম্ । সর্বেষাং তৃণোদকপ্রকাম্যামিতি গোমণ্ডলং ব্যাখ্যাতম্ ।

পঞ্চমস্তং খরাখানামজাবীনাং দশমস্তম্ । শকাং গোমহিবোষ্ট্রীনাং যুগং কুর্ধ্যাচ্চতুর্বষম্ ॥”

হৃদ্ধদোহনাদি সম্বন্ধেও বিবিধ নিয়ম ছিল । বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত কালে প্রাতে ও সন্ধ্যায়
হৃদ্ধ-দোহনের ব্যবস্থা ছিল । শীত ঋতুতে এবং বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কেবলমাত্র প্রাতে হৃদ্ধ
দোহন করা হইত । স্বাস্থ্য-বিষয়ে এ ব্যবস্থাও কম উপযোগী নহে । এতদ্ব্যতীত কি পরিমাণ
হৃদ্ধে কি পরিমাণ ঘৃতাদি উৎপন্ন হয়, তাহাও কোটিল্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন । এক
জ্রেণ গো-দুগ্ধে এক প্রস্থ ঘৃত হয় । ঐ পরিমাণ মহিমের হৃদ্ধে উহার অপেক্ষা অধিক এক-
পঞ্চমাংশ অতিরিক্ত ঘৃত উৎপন্ন হইবে । ঐ পরিমাণ ছাগ-দুগ্ধে উহার দেড় গুণ ঘৃত উৎপন্ন
হইতে পারে । খাদ্য পানীয়ের উপর হৃদ্ধাদির পরিমাণ নির্ভর করে । অধিক পরিমাণে
আহার্য প্রদান করিলে অধিক পরিমাণে হৃদ্ধ-ঘৃতাদি উৎপন্ন হয় । আর খাদ্যাদির হ্রাস-
বৃদ্ধি অনুসারে হৃদ্ধাদিরও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে । এতৎসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে নিম্নরূপ বিধি দৃষ্ট হয়,—

“বর্ষাশরদ্ধেমস্তাত্তরতঃ কালং হৃৎযুঃ । শিশিরবসন্তগ্রীষ্মানেককালম্ । দ্বিতীয়কালদোদ্ধু বৃদ্ধ-
চ্ছেদো দণ্ডঃ । দোহকালমতিক্রমতস্তৎফলহানং দণ্ডঃ । এতেন নস্তদম্যযুগ বজনবর্ন্তন-
কালো ব্যাখ্যাতাঃ । ক্ষীরজ্রেণে গবাং ঘৃতপ্রস্থঃ; পঞ্চভাগাধিকো মহিবৌগাং; দ্বিভাগাধি-
কোহজাবীনাং; মহো বা সর্বেষাং প্রমাণং ভূমিতৃণোদকবিশেষাচ্চ ক্ষীরঘৃতবৃদ্ধির্ভবতি ।”

যুত গো-মহিবাদি পালিত পশুর চর্ম, রোম, খুর, লাজুল প্রভৃতি হইতেও রাজকোষে অর্থাগম
হইত । পশ্বাদির মৃত্যু হইলে অধ্যক্ষ ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতেন । কোটিল্যের উক্তি,—

“কারণমৃতস্যাকচর্ম গোমহিবস্য কর্ণলক্ষণমজাবিকানাং পুচ্ছমকচর্ম চান্থখরোষ্ট্রীনাং
বালচর্মবস্তিপিত্ত্বান্নাদস্তখুরশৃঙ্গাহীনি চাহরেয়ুঃ ।...অজাদীনাং বাস্মাবিকীর্ণাং গ্রাহ-
রেৎ । তেনান্থখরোষ্ট্রবরাহব্রজা ব্যাখ্যাতাঃ ।”—গোহধ্যাকঃ, ১৩০ম ও ১৩১ম পৃষ্ঠাঃ ৯

পশ্বাদির স্বাস্থ্যবিধানের পূর্বোক্ত নিয়মাবলী ভিন্ন চিকিৎসাদির বিবিধ ব্যবস্থা বিহিত হইয়া-
ছিল । পশুপালকগণ ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিতেন । ঔষধের গুণহীনতার জন্য অথবা
পালকের অসাবধানতা হেতু পশুর পীড়া বৃদ্ধি হইলে, চিকিৎসার ব্যয়ভারের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড হইত ।
এতদ্ব্যতীত পশ্বাদির গায়ে আঘাত করিলে দণ্ডের বিধান ছিল । আঘাতের ভারতম্য ও প্রকৃতি
অনুসারে রাজা শাস্তি প্রদান করিতেন । দণ্ডাবাতে পশুকে কষ্ট দিলে এক বা দুই পণ, পশুর
গায়ে হইতে শোণিতপাত করিলে দ্বিগুণ দণ্ড প্রদান করিতে হইত । ক্ষুদ্রপশু সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা
বিহিত ছিল । বৃহৎ পশুর পক্ষে পূর্বোক্ত হারের দ্বিগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইত । অর্থ-
শাস্ত্রের অন্তর্গত গোহধ্যাক, অশ্বাধ্যাক ও দণ্ডপাক্ষ্য অংশত্রে এতবিষয়ের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় ।
অর্থশাস্ত্র (১৯৭ম পৃষ্ঠাঃ) হইতে এতবিষয়ক কোটিল্যের নীতি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

“বালবৃদ্ধব্যাধিতানাং গোপালকাঃ প্রতিকূর্যাঃ ।”—গোহধ্যাকঃ, ১২৯ম পৃষ্ঠাঃ ।...অশ্বানাং
চিকিৎসকাঃ শরীরহ্রাসবৃদ্ধিপ্রতীকারমুভূবিভক্তং চাহারম্ ।...ক্রিরাটৈবজ্যাসজেন ব্যাধি-
বৃদ্ধৌ প্রতীকারদ্বিগুণো দণ্ডঃ । ওদধরোদধেন বৈলোম্যো পত্রমূল্যং দণ্ডঃ । তেন গোহৃগুণং

খরোষ্ট্রমহিবমজাবিকঃ চ ব্যাখ্যাতম্ ।—অধ্যায়কঃ, ১৩৪ম—১৩৫পৃষ্ঠাঃ ৪...“পশু
ব্যাধিকর্মমজরাহতিতপ্তানাং চিকিৎসকাঃ প্রতিকূষাঃ ।”—হস্তিপ্রচারঃ, ১৩৯ম পৃষ্ঠাঃ ৪

“কুত্ৰপশুনাং কাষ্ঠাদিতিহুখোৎপাদনে পশো দ্বিগুণো বা দণ্ডঃ । শোণিতোৎপাদনে
দ্বিগুণঃ । মহাপশুনাংমেতেষবহানেষু দ্বিগুণো দণ্ডঃ, সমুখান্ভ্যায়শ্চ ।”—দণ্ডপারুয়ম্ ॥

চারণ-ভূমির ব্যবস্থা বিধান কৃতিত্বের আর এক নিদর্শন। পশুসংরক্ষণ বিষয়ে এবং তাহাদেয়
স্বাস্থ্য-বিধানে :চারণ-ভূমি একান্ত প্রয়োজনীয়। পশাদির আহার্য্য-সরবরাহেও উহা অল্প
উপযোগী নহে। আবদ্ধ অবস্থায় প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে মাছবের যেমন স্বাস্থ্যহানি
ঘটে, আবদ্ধ অবস্থায় পশাদিরও সেইরূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। চরিয়া বেড়াইবার সুবিধা
না পাইলে দেহপুষ্টি সম্ভব নহে। দেহপুষ্টিতে স্বাস্থ্যরক্ষা না হইলে অতি অল্পকাল মধ্যেই
তাহারা কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। সেই জন্য পশুতত্ত্বগণ পশুসংরক্ষণের জন্য
চারণভূমির প্রয়োজনীয়তা যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধুনা চারণ-ভূমির বিশেষ
অভাব হওয়ার পশাদির সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আর সেই জন্য কর্ণপো-
যোগী পশুর অভাবে ভারতের শস্ত্র-পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারতে
চারণ-ভূমি সম্বন্ধে কিরূপ বিধান বিহিত হইয়াছিল, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে তৎপ্রদর্শনের প্রয়াস
পাইব। কোটিল্যের নীতির আলোচনার প্রতিপন্ন হয়, সে সময়ে দেশের সর্বত্র বহু চারণ-
ভূমি ছিল। চারণভূমি নির্মাণের, তাহা সংরক্ষণের এবং তাহার উন্নতিবিধানের বিবিধ বিধি
কোটিল্য বিহিত করিয়াছিলেন। সে বিধি-ব্যবস্থার স্বতন্ত্র এক তত্ত্বাবধায়ক বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত
হইয়াছিলেন। তিনি ‘বিবীতাদ্যক্ষ’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। চারণভূমি পর্য্যবেক্ষণ করা
এবং তৎসংক্রান্ত বিধি বিধান প্রয়োগ, তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল। কোন্ স্থানে কিরূপ
ভাবে পশুচারণ করা বাইতে পারে, তদ্বিষয়ে কিরূপ সুবিধা-অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা,
তদ্বিকল্পণ তাহার প্রধান কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। বিবীতাদ্যক্ষ এক এক ঋতুতে
এক এক চারণভূমিতে পশুচারণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে দেখা যায়,
সে সময় দেশের-সর্বত্র বহু চারণভূমি সংরক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে
একতীর পর অপরটি হিসাবে পশুচারণের ব্যবস্থা ছিল। প্রতি পক্ষীতে এবং প্রতি জন-
পদে বহুসংখ্যক চারণভূমি সে সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পালকগণ নিজ নিজ সুবিধা
অসুবিধা অনুসারে চারণ-ভূমি নির্ধারিত করিতেন। প্রধানতঃ, তাহার দুইটি বিষয়ে
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। প্রথম—পশুপালের শারীরিক সামর্থ্য; দ্বিতীয়—বিপদ-
আপদের ভারতম্য। যেখানে বিপদের সম্ভাবনা অল্প; পরন্তু যে স্থান অপেক্ষাকৃত
অধিক নিরাপদ;—পালকগণ সাধারণতঃ সেই সকল স্থানের চারণভূমিই পশুচারণ জন্য
নির্ধারিত করিতেন। বস্ত্র-প্রদেহে, অহুর্কর ক্ষেত্রে, বস্ত্রাধারিতস্থল স্থানের মধ্যেই চারণ-
ভূমি নির্ধারনের প্রথা ছিল। তাহাতে একদিকে যেমন পশাদির স্বাস্থ্যরক্ষার সুবিধা
হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি পশুতত্ত্ব অহুর্কর ক্ষেত্রও ক্রমশঃ শোণিতোৎপাদনোপযোগী হইয়া
আসিয়াছিল। অর্থশাস্ত্র হইতে এতৎসংক্রান্ত বিধি-বিধান নিয়ে উল্লেখ করা হইল; বলা,—

“লুক্কগণিতিরপাশ্বতেনব্যালপরবোধতরমুতুবিভক্তসরণ্য চারণেষুঃ ।”—গোবধ্যাকঃ,

১০০ম পৃষ্ঠা: ॥...অকৃত্যায়ঃ ভূমৌ পশুভ্যো বিবীতানি প্রযচ্ছেৎ।—ভূমিচ্ছিদ্র-
বিধানম্, ৪৯ম পৃষ্ঠা: ॥...ভরাস্তরেষু চ বিবীতং স্থাপয়েৎ।—বিবীতাদ্যাকঃ,
১৪১ম পৃষ্ঠা: ॥...ঋতুভিত্তমরগাম্ চারয়েয়ু।...উপনিবেশদিধিভাগে গো-
প্রচারান্ বলায়ত্তে বা গবাং রক্ষাসামর্থ্যচ্চ।—গোহধ্যাকঃ, ১৩১ম পৃষ্ঠা: ॥

চারণ-ভূমিতে সৰ্ব্বপ্রকার গৃহপালিত পশু চরিতে পারিত। তৎকালে সৰ্ব্বপ্রকারের পশু রাজার ঐশ্বর্য্য-সম্পদের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। পশাদির স্বাস্থ্যের উপর দেশের পণ্যশস্যের প্রাচুর্য্য, উৎপত্তি এবং রাজশক্তি নির্ভর করিত। সুতরাং তৎসম্পর্কীয় ব্যবস্থা-বিধানে সৰ্ব্বদা রাজার খরদৃষ্টি ছিল। চারণক্ষেত্রে হিংস্রজন্তুর উপদ্রব এবং পশুহানি নিবারণ জন্ত শিকারী নিযুক্ত হইয়াছিল। পশুচারণকালে তাহারা শব্দ ও কুকুর সমভিব্যাহারে চারণক্ষেত্র-সাম্রিধি উপস্থিত থাকিত। সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর উপস্থিতি অমুভব করিলে বিবিধ সঙ্কেতে তাহারা সাবধানতা পরিজ্ঞাপক ধ্বনি করিত। শব্দ ও দামামা ধ্বনিতে চোর ও ব্যাঘ্রের আগমন-বার্তা বিজ্ঞাপিত হইত। অসভ্য বৈদেশিক জাতির উপস্থিতি-সংবাদ তাহারা রাজ-মুদ্রাক্রিত পারাবত সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করিত; অথবা জনবরত অগ্নি প্রজ্জালিত করিবার বিধি ছিল। বিপদ-বার্তা রাজার গোচরীভূত করিবার এইরূপ বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইত। এতদ্ব্যতীত পশুপালকগণ বিবিধ উপায়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। তাঁহারা গোমহিষাদির গলদেশে বণ্টা বাঁধিয়া দিতেন। তাহাতে একদিকে বণ্টাধ্বনিতে যেমন সর্পাদি হিংস্র জন্তু দূরে পলাইত, তেমনি পলায়িত পশু সন্ধানেও সুবিধা হইত। নান করাইবার আবশ্রুক হইলে কর্দম ও কুস্তীর পরিশুদ্ধ জলাশয়ে তাহাদিগকে নান করাইবার ব্যবস্থা ছিল।

“তক্ষরানিত্যভাগমে শব্দব্রহ্মভিশকমপ্রাছাঃ কুর্ধ্যুঃ। শৈলবৃক্ষবিরুচা বা, নীজবাহনা
বা অমিরাতটবীসকারণঃ চ রাজ্ঞো গৃহকপোটৈর্মুদ্রায়ুক্তৈর্হারয়েয়ুঃ ধুম্রান্নিপরংপরমা বা।
দ্রব্যাবত্তিবনাজীবঃ বর্জ্জিনীঃ চোররক্ষণম্। সার্থাতিবাহঃ গোরক্ষ্যং ব্যবহারং চ কার-
য়েৎ।—বিবীতাদ্যাকঃ, ১৪১ম পৃষ্ঠা: ॥...সর্পব্যালভ্রাসনার্থং গোচরানুপাতজ্ঞানার্থং চ
ভ্রমুনঃ বণ্টাকুর্ধ্যুঃ চ বন্ধীযুঃ। সমবুঢ়তীর্থমকন্দমগ্রাহমুদকমবতারেয়ুঃ পালয়েয়ুশ্চ।”

—গোহধ্যাকঃ, ১৩০ম পৃষ্ঠা: ॥

চরাইবার সময় বর্ণানুসারে পশুগণের দল বিভক্ত করিতে হইত। ইহাতে অনেক বিষয়ে সুবিধা ছিল। বিভিন্ন দল এক সঙ্গে মিশিয়া গেলেও পালকগণ আগনার পশুদল সহজেই বাছিয়া লইতে পারিতেন।

গবাদির ভার হস্তাখাদি পালনে একই নীতি অমুসৃত হইত। অখপরিদর্শনের জন্ত অখাদ্যক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অখাদির রীতি-প্রকৃতি নির্বাচনে তাঁহার প্রতি কতকগুলি

শ্রুতকার্যের ভার ন্যস্ত ছিল। অখসমূহের তালিকা সংরক্ষণ; জন্ম, অখ-ব্যবস্থা। . রক্ষণ, বর্ণ ও চিহ্ন অনুসারে তাহাদিগের শ্রেণিবিভাগ; আত্মাবল সংক্রান্ত

নিয়মাদি প্রতিপালন; অখের খাদ্য-পরিমাণ নির্ধারণ; অখগণের উপযুক্ত শিকা দান; তাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসা-বিধান; অন্যান্য বিবিধ উপায়ে অখগণের যত্ন-তত্ত্বাবধা করা;—অখাদ্যকগণের প্রধান কর্তব্য ছিল। অখগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইত।

জন্মস্থান-হিসাবে তাহাদের একরূপ বিভাগ নির্দিষ্ট ছিল, আবার আকৃতি-প্রকৃতি অনুসারে তাহাদের বিভাগ অল্পরূপ নির্ণীত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের উক্তি; যথা,—

“তেবাং তীক্ষ্ণভদ্রমন্দবশেন সান্নাহমোপবাহকং বা কর্ম প্রযোজয়েৎ ॥...১০০

প্রয়োগানামুত্তমাঃ কান্ডোজকসৈন্ধবারট্টজবানায়ুজাঃ । মধ্যমাবাহ্লীকপাপের-
কসৌবীরকতৈতলাঃ । শেবাঃ প্রত্যবরাঃ ।”—অখ্যায়কঃ, ১০৩ম পৃষ্ঠাঃ ।

আকৃতি-প্রকৃতি অনুসারে অশ্বের যে বিভাগ হইত, তাহার মধ্যে আবার তিনটা উপবিভাগ দৃষ্ট হয়,—তীক্ষ্ণ, ভদ্র এবং মন্দ । জন্মস্থান হিসাবে সে বিভাগ অষ্ট প্রকার,—কান্ডোজক, সৈন্ধব, আরট্টজ, বানায়ুজ, বাহ্লীক, সৌবীরক, পাপেরক এবং তৈতল । এতদ্ব্যতীত প্রথম চারি স্থানের অশ্ব সর্বশ্রেষ্ঠ । অষ্টম স্থানের অশ্ব দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত । বিবিধ উপায়ে যে সকল অশ্ব সংগৃহীত হইতে পারিত । সেই সকল উপায়ের কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

“অখ্যায়কঃ পণ্যাগারিকঃ ক্রয়োপাগতমাহবলকুমাজাতং সাহায্যকা-
গতকং পণস্থিতং যাবৎকালিকং বাহর্ষপর্যন্তং কুলবয়োবর্ণচিহ্নবর্গাগমৈল-
থয়েৎ । অশ্রশস্তত্তজব্যধিতাংস্তাবাদয়েৎ ।”—অখ্যায়কঃ, ১০২ম পৃষ্ঠাঃ ॥

গোমহিষাদির যেমন বিবিধ আহাৰ্য্য দেওয়া হইত, অশ্বাদি সম্বন্ধেও সেই একইরূপ বিধানের পরিচয় পাওয়া যায় । প্রত্যেক উৎকৃষ্ট অশ্বকে নিম্নরূপ হার-পরিমাণে আহাৰ্য্য প্রদান করা হইত,—

“উত্তমশস্ত্র দ্বিজোং শালিব্রীহিবপ্রিয়ঙ্গুগামধগুক্রমধসিদ্ধং বা মুদগমাযাগং বা পুলাকঃ ।
স্নেহপ্রস্থচ পঞ্চপলঃ লবণশ্চ মাংসং পঞ্চাশৎপলিকং রসস্যাঢ়কং দ্বিগুণং বা দমঃ পিণ্ড-
ক্রেদনার্থঃ ক্ষারঃ পঞ্চপলিকঃ সুরারাঃ প্রস্থঃ পয়সো বা দ্বিগুণঃ প্রতাপানং ; দীর্ঘ-
পথভারক্লান্তানাং চ স্বাদনার্থঃ স্নেহপ্রস্থোহম্বাসনং কুড়ুষো নশ্তকর্মণঃ যবসম্যাধ-
ভারঃ তৃণস্য দ্বিগুণঃ ষড়রত্নৈঃ পরিক্ষেপঃ পুঞ্জীলগ্রাহো বা ।”—অখ্যায়কঃ, ১০৩ম পৃষ্ঠাঃ ॥

চাউল, যব, প্রিয়ঙ্গু, মুগ বা মাষ ইহার যে কোনও একটি সর্বোৎকৃষ্ট অশ্বকে দুই দ্রোণ হিসাবে দেওয়া হইত । তদ্ব্যতীত এক প্রস্থ তৈলাদি স্নেহ-পদার্থ, পাঁচ পল লবণ ও ক্ষার, এক প্রস্থ সুরা, দুই প্রস্থ পয়স ক্ষীর বা দধি প্রভৃতি প্রদান করিবার নিয়ম ছিল । যে সকল অশ্ব অধিক দূর গমনাগমন করিত, অথবা ভারবহনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে পূর্বোক্ত খাত্তের সঙ্গে এক প্রস্থ ঘৃত, এক কুড়ুষ তৈল বা ঘৃত, অর্দ্ধ ভার যবস বা টাটকা ঘাস প্রদান করিবার বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল । তাহাদের শয্যারচনার জন্য এক ভাগ খড় দেওয়া হইত । শয্যার পরিমাণ—ছয় অরন্তি বা ষাটশ ফিট । মধ্যম বা ক্ষুদ্রাকার অশ্বের

(১) পণ্যাগারিক—Those that are kept in sale-house for sale. (২) ক্রয়োপাগত—Those that are received by purchase. (৩) আহবলক—Those that have been captured in wars. (৪) অজাত—Those that are of local breed. (৫) সাহায্যকাগত—Those that are sent for help by the Allies. (৬) পণস্থিত—Those that are mortgaged or those that are fresh from the forest. (৭) যাবৎকালিক—Those that are in stable only for a short while.” ‘পণস্থিত’ হলে ‘অন্যক’ পাঠও হইত হয়। উহার অর্থ—Wild and fresh from the forest.

আহার্য পরিমাণও ঐরূপ ছিল। তবে তাহার পূর্কোক্ত পরিমাণের এক চতুর্থাংশ কম আহার পাইত। 'বড়বা' এবং 'পারশমানা' অখের আহার্য পূর্কোক্ত পরিমাণের অপেক্ষা এক পাদ পরিমাণ অল্প নির্দিষ্ট হইয়াছিল। "পাদাবরমেতমধ্যমাবরয়োঃ। উত্তমসমো রথো বৃষচ্চ মধ্যমঃ। মধ্যমসমচ্চাবরঃ। পাদহীনং বড়বানাং পারশমানাং চ।" অখাদির খাদ্য-সমূহ বিপাচক, হৃৎগ্রাহক ও চিকিৎসক প্রভৃতি আশ্রয়ন করিতেন। রাজপুরীতে যেমন বিপণরীক্ষার নিয়ম ছিল এবং সর্পভয় নিবারণ জন্ত যেমন বিভিন্ন জাতীর প্রাণী রক্ষিত হইত, অখশালার কর্মচারিগণ সে সকল বিষয়ে তজ্ঞপ নিয়ম প্রতিপালন করিতেন। তদ্ব্যতীত অখ-পরীক্ষারও নানারূপ প্রক্রিয়া ছিল। সে পরীক্ষা-প্রণালী—উৎকৃষ্ট অখের মুখের পরিমাণ বক্রিণ অঙ্গুলি। দৈর্ঘ্য—মুখ-পরিমাণের পাঁচ গুণ। জজ্বাহি—বিংশাঙ্গুলি। উচ্চতা—জজ্বাহির চতুর্গুণ। তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার অখের অঙ্গাদির পরিমাণ, উৎকৃষ্ট অখের পরিমাণাদি অপেক্ষা পঞ্চাঙ্গুলি হিসাবে কম। সর্কোৎকৃষ্ট যে অখ, তাহার দেহ-পরিমাণ শতাঙ্গুলি হিসাবে।

"দ্বাত্রিংশদঙ্গুলং মুখমুত্ৰমাখ্যস্য, পঞ্চমুখাভ্যায়ামঃ, বিংশত্যাঙ্গুলা জজ্বা, চতুর্জজ্বাঃ উৎসেধঃ, ত্র্যাঙ্গুলাবয়ং মধ্যমাবরয়োঃ, শতাঙ্গুলঃ পরিণাহঃ, পঞ্চভাগাবয়ং মধ্যমাবরয়োঃ।" ১৩২ম পৃষ্ঠাঃ ॥

অখশালা ও অখের শিক্ষাবিধান-সংক্রান্ত ব্যবস্থা—পারদর্শিতার নিদর্শন। কোটিল্য বলিয়াছেন,—প্রত্যেক অখের গৃহ, অখ অপেক্ষা চারি গুণ দীর্ঘ এবং চারি গুণ বিস্তৃত হইবে। কাঠ-ফলকে বা তক্তা দ্বারা গৃহভূমি আবৃত করিবে। মৃত্র এবং পুরীষ নির্গমনের অখের স্বাস্থ্য ও স্বতন্ত্র পথ রাখা প্রয়োজন। সে গৃহে খাদ্যাদি থাকিবে না। পূর্ব বা পশ্চিমা-প্রাণালী। উত্তরাভিমুখী দরজা রাখিবে। বিভিন্ন প্রকারের অখ বিভিন্ন স্থানে থাকিবে।

কলতঃ, গৃহাদিতে আবর্জনা জমিয়া অখের স্বাস্থ্য-হানি না হয়, অখশালা-নির্মাণে স্বাস্থ্য-রক্ষা-বিষয়ক সে সকল ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল। হৃৎগ্রাহক, বন্ধনকারী, পাচক, পালক, কেশকারক এবং জাঙ্গুলীবিৎ চিকিৎসক—সকলেই অখের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। "হৃৎগ্রাহকঃ স্ববন্ধকযাবসিকাবিধাপাচকস্থানপালকেশকারজাঙ্গুলীবিদশ্চ স্বকর্ম-ভিরস্থানারাম্যেয়ঃ।" অখশালার এই সকল ব্যবস্থা বিধানে কোটিল্য বলিয়াছেন; যথা,—

"অখারামচতুরশ্রঙ্গকলকান্তারং সখাদনকোঠকং সমুজপূরীষোৎসর্গমেটেক-

কলঃ প্রোঙ্খমুখমুদং মুখং বা স্থানং নিবেশয়েৎ। শালাবশেন বা দিঘিভাগং

কল্পয়েৎ। বড়বাবৃষকিশোরাণাং একান্তেহু।" —অখাধ্যক্ষঃ, ১৩২ম পৃষ্ঠাঃ।

এইরূপ অখাদির শিক্ষা বিষয়েও বিবিধ বিধান বিহিত হইয়াছে। অখগণের শিক্ষা-কোশল সকল সময়েই উপযোগী। বিশেষতঃ যুদ্ধকালে সুশিক্ষিত অখ ভিন্ন কার্য্যসিদ্ধি স্ফুটন হইয়া পড়ে। তাই অখের শিক্ষা-বিধান প্রথা চিরদিনই বর্তমান আছে। অখের গতি দ্বিবিধ,—ঔপবাহক এবং সার্য্যাহু। ঔপবাহক গতি আবার পাঁচটা প্রধান অংশে বিভক্ত,—বল্লন, নীটচর্গত, লজ্বন, ধোরণ এবং নারোষ্ট্র। এই পঞ্চ বিভাগের মধ্যে আবার নানা উপবিভাগ আছে। বল্লন বা বৃত্তাকার গতি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়। যথা,—(১) উপবেগুক বা এক হস্ত পরিমিত ব্যাসযুক্ত বৃত্তের মধ্যে চক্রাকারে ভ্রমণ, (২) বর্জমানক বা বৃত্তাকারমার্গে অগ্রসর হওয়া, (৩) বমক বা পরস্পর-সংযুক্ত বলয়াকার পথে ঘুরিয়া কিরিয়া অগ্রসর হওয়া; (৪) আলীঢ়প্লুত বা শরীরের সমুখ-

ভাগের গতি, এবং (৫) ভূবচালী বা শরীরের পাশ্চাত্যভাগের গতি । এইরূপ নীচৈর্গতি আবার ষোড়শ ভাগে বিভক্ত,—(১) প্রকীর্ণক, (২) প্রকীর্ণোত্তর, (৩) নিষগ্ন, (৪) পার্শ্বাহুভূত, (৫) উর্দ্ধিমার্গ, (৬) শরভকীড়িত, (৭) শরভপ্লুত, (৮) ত্রিতালী, (৯) বাহ্যাহুভূত, (১০) পঞ্চাপাণি, (১১) সিংহারত, (১২) স্বাধূত, (১৩) ক্লিষ্ট, (১৪) স্লাঘিত, (১৫) বৃংহিত এবং (১৬) পুষ্পাভিকীর্ণ । লজ্বন শব্দেই গতির বিষয় উপলব্ধি হয় । উল্লক্ষনে গমনের নাম—লজ্বন । লজ্বন গতি সাত প্রকার,—কপিপ্লুত, ভেকপ্লুত, একপ্লুত একপাদপ্লুত এবং কোকিলসঞ্চারি, উরস্যা ও বকচারী । অখদিগকে কপি ও ভেক প্রভৃতির জ্ঞান লক্ষ-প্রদান শিক্ষা দেওয়া হইত । আকস্মিক ঝ্প, একপাদ ঝ্প, কোকিলের জ্ঞান গমন, ভূমি-সংলগ্ন হইয়া দৌড়ান এবং বকের জ্ঞান ঝ্প-প্রদান শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল । কাক, বারিকাক, ময়ূর, অর্জুময়ূর, নকুল, অর্জুনকুল, বরাহ, অর্জবরাহ প্রভৃতি ‘ধোরণ’ গতির অন্তর্ভুক্ত । আর সঙ্কেত-ময়ূরারী গতি—নারোষ্ট্র । আরোহীর সঙ্কেত বুঝিয়া তদনুসারে গমন—এই ‘নারোষ্ট্র’ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত । প্রধান এই পঞ্চপ্রকার শিক্ষা ব্যতীত আরও কয়েক প্রকারের গতি শিক্ষা দিবার বিধি ছিল । তাহা মার্গ ও ধারা পর্য্যায়ের অন্তর্গত । এ সকলও আবার নানা উপবিভাগে বিভক্ত । এই সকল শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে যুদ্ধের লজ্জ অখদিগকে শিক্ষাদান করা হইত । অখপাঞ্জ হইতে নিম্নে এতদ্বিষয়ক কোটিল্যের মন্তব্য প্রদান করা হইল; যথা,—

তেথাং তীক্ষ্ণতদ্রমন্দবশেন সান্নাহমোপবাহকং বা কৰ্ম্ম প্রযোজয়েৎ । চতুরশ্রং কৰ্ম্মা-
খস্য সান্নাহম্ । বজ্রেনো নীচৈর্গতো লজ্বনো ধোরণো নারোষ্ট্রশ্চোপবাহাঃ । তত্রোপ-
বেগুকে বধমানকে যমক আলীঢ়প্লুত পৃথগত্বচালী চ বজ্রনঃ । স এব শিরঃ-
কর্ণবিভক্তো নীচৈর্গতঃ, ষোড়শমার্গো বা—প্রকীর্ণকঃ প্রকীর্ণোত্তরো নিষগ্নঃ পার্শ্বাহুভূত
উর্দ্ধিমার্গঃ শরভকীড়িতশ্শরভপ্লুতঃ ত্রিতালো বাহ্যাহুভূতঃ পঞ্চাপাণিসিংহারতস্বা-
ধূতঃ ক্লিষ্টঃ স্লাঘিতো বৃংহিতঃ পুষ্পাভিকীর্ণশ্চৈতি নীচৈর্গতমার্গাঃ । কপিপ্লুতো ভেক-
প্লুত একপ্লুত একপাদপ্লুতঃ কোকিলসংচ্যুরস্যো বকচারী চ লজ্বনঃ । কাকো বারি-
কাকো ময়ূরোহধময়ূরো নাকুলোহধনাকুলো বারাহোহধবারাহশ্চৈতি ধোরণঃ । সংজ্ঞা-
প্রতিকারো নারোষ্ট্র ইতি । বজ্রব দ্বাদশেতি যোজনাত্তথা রথানাং পঞ্চযোজনাত্তথাষ্ট-
মানি দশেতি পৃষ্ঠবাহানামস্থানামধ্বা । বিক্রমো তত্রাখ্যাসো ভায়বাহ ইতি মার্গাঃ
বিক্রমো বজ্রিতমুপকৰ্ণমুপজবো জবশ্চ ধারাঃ ।—অখাধ্যাকঃ, ১৩৩ম—১৩৪ম পৃষ্ঠাঃ ।

অখগণের চিকিৎসাদির বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । যেমন মাতৃষের পক্ষে তেমনি পখাদির পক্ষে,—চিকিৎসার বিধান সর্বত্র অভিন্ন । চিকিৎসকগণ চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দৈহিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন । অচিকিৎসার বা কুচিকিৎসার পীড়া বৃদ্ধি হইলে, এ ক্ষেত্রেও দণ্ড প্রদানের বিধি বিহিত হইয়াছিল । চিকিৎসার দোষে অখাদি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে চিকিৎসকগণকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইত । এইরূপ দণ্ডের বিধি বিধিবদ্ধ হওয়ার চিকিৎসকগণ বা পালকগণ সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য-সম্পাদনে সর্বদা প্রযত্নপর থাকিতেন । অখাদির মঙ্গলকামনার সঁজ্ঞারোধনা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল । কোটিল্যের বিধানশুণে সে প্রাচীন-কালে পশুপালী কীটপতঙ্গও সুখ-স্বচ্ছন্দে কাগরপাল

করিতে পারিত ;—তাহাদের সুখ-স্বাস্থ্য-বিধানে এমনই সুনীতি-সমূহ কোটিল্য বিহিত করিয়াছিলেন! ফলতঃ, সর্বপ্রকার হিতকর বিধানে সে রাজ্য যে অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ আদর্শের অবতারণা করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ।

যেমন অশ্বপালন সম্বন্ধে তেমনি হস্তিপালন বিষয়ে সুব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধের বিবিধ সরঞ্জামের জায়, হস্তী তৎকালে যুদ্ধের এক প্রধান উপকরণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তির উপযোগিতা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি সৰ্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। সে সময় যঁাহার যত অধিক পরিমাণ যুদ্ধ-হস্তী ছিল, তিনি

হস্তিপালন
ব্যবস্থা।

তত অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। সেইজন্য হস্তিসংরক্ষণ ও হস্তিপালন তখন এক প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। কেহ হস্তী হত্যা করিলে তাই সে সময় তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে হস্তিপালন ও হস্তিসংরক্ষণ বিষয়ে যে উপদেশ-পরম্পরা বিহিত হইয়াছে, তাহা হইতে এতদ্বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। সে সময় হস্তিপালন ও হস্তিসংরক্ষণ জন্ত স্বতন্ত্র একটা রাজকীয় বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ছিল। হস্ত্যধ্যক্ষ ছিলেন—সেই বিভাগের সর্কোচ্চ কর্মচারী। তাঁহার অধীনে, কার্যের প্রকৃতি-পর্যায়-অনুসারে, নাগবনপাল, নাগবনাধ্যক্ষ, হস্তিতক, পাদপাশিক, সৌমিক, পারিকর্ষিক, বনচরক ও অনীকস্থ প্রভৃতি বিভিন্ন নামধেয় উচ্চ নীচ বহু কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অর্থশাস্ত্রের মতে হস্ত্যধ্যক্ষের কার্য নিম্নরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে,—

“হস্ত্যধ্যক্ষো হস্তিবনরক্ষাং দম্যকর্ম্মক্ষান্তানাং হস্তিহস্তিলীকলভানাং শালাস্থানশয্যা-
কর্ম্মবিধায়বসপ্রমাণং কর্ম্মস্বাযোগং বন্ধনোপকরণং সাংগ্রামিকমলকারং চিকিৎস-
কানীকহোপকস্থায়ুকবর্গং চামুতিষ্ঠেৎ ।”—দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ, হস্ত্যধ্যক্ষঃ, ১৩৫ম পৃষ্ঠাঃ ॥

হস্ত্যধ্যক্ষের কার্য—হস্তিবনরক্ষার ব্যবস্থা-বিধান; হস্তিশয্যা বিহিত করা, তাহাদের দৈনিক আহারাদি প্রদানের বন্দোবস্ত করা; অলঙ্কার, শিক্ষা, যুদ্ধসজ্জা প্রভৃতি সরবরাহ করা; চিকিৎসক, শিক্ষক ও পরিচারকগণের কার্য্য তত্ত্বাবধান। বিভাগীয় উপরোক্ত কর্ম-চারিগণ ব্যতীত হস্তিশালার জন্ত আরও একাদশবিধ কর্মচারীর পরিচয় অর্থশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা আপন আপন কার্য্য অনুসারে যথাক্রমে চিকিৎসক, অনীকস্থ, আরোহক আধোরণ, হস্তিপক, উপচারিক, বিধাপাচক, পাদপাশিক, কুটীরক্ষ এবং উপশায়িক নামে অভিহিত হইয়াছেন; যথা,—“চিকিৎসকানীকস্থারোহকাধোরণ হস্তিপকোপচারিক-বিধাপাচকযাবসিকপাদপাশিককুটীরক্ষকোপশায়িকাদিরোপশায়িকবর্গঃ ॥”

কর্মচারিগণের কর্তব্য বিষয়ে বিবিধ বিধানের পরিচয় অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। নাগ-বনপালগণ—হস্তিবন (যে বনে হস্তি বাস করে) রক্ষা করিতেন। নাগবন-রক্ষা-কল্পে যে কিছু

কর্মচারীর
কর্তব্য।

উপায় অবলম্বন আবশ্যক, তাহা উদ্ভাবন করা তাঁহাদের কর্তব্য ছিল।

উপযুক্ত-রূপে বনসমূহ সুরক্ষিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে কি না, তাহা

পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা অধ্যক্ষের নিকট বিজ্ঞাপিত করিতেন। এই

সকল কার্য্য স্চাক্ষররূপে নির্দ্ধারিত জন্ত তাঁহার অধীনে আবার ‘নাগবনাধ্যক্ষ’ নামধেয় কতকগুলি কর্মচারী ছিলেন। তাঁহারা হস্তিবন-সমূহের সীমা-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতেন।

হস্তী সংগ্রহ করিবার ভার তাঁহাদের উপর তুল্য ছিল। মাহতগণ—‘হস্তিতক’ নামে এবং বন্ধনকারী—পাদপাশিক অভিধানে অভিহিত হইয়াছেন। অনীকহু কৰ্মচারিগণ হস্তি-বিভাগ-বিশারদ ছিলেন। কোন্ হস্তী ধরিবার উপযুক্ত এবং কোন্ হস্তী ধরিবার অমুপযুক্ত, দৃষ্টিমাত্র তাঁহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। মূঢ়, ব্যাধিত, গর্ভিণী, ধেমুকা, মংকুণ, বিক প্রভৃতি হস্তী ধৃত করা নিষিদ্ধ ছিল। “বিকো মূঢ়ো মংকুণো ব্যাধিতো গর্ভিণী ধেমুকা হস্তনী চাগ্রাহাঃ।” হস্তী ধৃত করিবার জন্ত গ্রীষ্মকালই প্রশস্ত। গ্রীষ্মকালে ‘অনীকহু’ নামধের কৰ্মচারী পাচটি বা সাতটি ‘হস্তিবন্ধকী’ বা হস্তিনী সহ হস্তিবনে প্রবেশ করিয়া বস্ত্র হস্তী ধৃত করিতেন। মূত্র, পুরীষ, পদচিহ্ন, শয্যাস্থান প্রভৃতি চিহ্ন দ্বারা হস্তিযুগ সন্ধান করিয়া হস্তী ধরিবার আয়োজন চলিত। “গ্রীষ্ম গ্রহণকালঃ। বিংশতিবর্ষো গ্রাহঃ।” বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের হস্তী ধৃত করিবার নিয়ম ছিল। হস্তী ধৃত করিবার প্রণালী-পরম্পরা অতি কৌতূহলপ্রদ। ‘অনীকহু’ কৰ্মচারী হস্তি-সংগ্রহের জন্ত এক সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা হস্তিবন-পার্শ্বে তৃণবৃক্ষাদি পরিশূন্য বিস্তৃত সমতল ভূমি নির্ধাচন করিয়া তাহার চারি দিকে বৃত্তাকারে পরিখা খনন করাইতেন। পরিখার বিস্তৃতি প্রায় দুই শত গজের অধিক হইত। গভীরতাও তদনুরূপ ছিল। তাঁহারা পরিখার উপরিভাগে কাষ্ঠ-নির্মিত স্বল্প-পরিসর সেতু নির্মিত করিতেন। এই বেটনীর অন্তর্গত সমতল ক্ষেত্রে অতি সুশিক্ষিত তিন চারিটি হস্তিনী রাখা হইত। দিবাভাগে বস্ত্রহস্তী সেই বেটনীর সন্নিকটে আগমন করিত না। রাত্রিকালে হস্তিযুগ একে একে বেটনীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, সেতু স্থানান্তরিত করা হইত। অতঃপর তাঁহারা যুদ্ধ-কৌশল-পারদর্শী বলবান হস্তী ছাড়িয়া দিতেন। বৃদ্ধযুগে বস্ত্রহস্তিযুগ পরাভূত হইত। আহাৰ্য্য্যভাবেও তাহারা ক্ষীণবল হইয়া আসিত। বস্ত্রহস্তিসমূহ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, মাহত-গণ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অতি সতর্কতার সহিত অবতরণ করিয়া আপন আপন হস্তীর উদরের নিয়মদে উপস্থিত হইতেন। সেখান হইতে তাঁহারা বস্ত্রহস্তীর উদরের তলদেশে গমন করিয়া পালিত হস্তী পদের সহিত বস্ত্রহস্তিগণের পদ-সমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিতেন। এইরূপে হস্তী ধৃত করিবার প্রথা সে সময়ে বর্তমান ছিল।

হস্তিগণের শিক্ষাদান-প্রণালীও কম কৃতিত্বের নিদর্শন নহে। শিক্ষাহুসারে হস্তি-সমূহ দম্য, সাম্রাঘ, ঔপবাহ, ব্যাল—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইত। পালিত হস্তীর সংসর্গে বস্ত্রহস্তীর

হস্তী
পিকা বিধান। হিংস্র-স্বভাব দূর হইলে তাহাদের শিক্ষা দান আরম্ভ হইত। হস্তিগণের পূর্বোক্ত চারি শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন উপবিভাগ বর্তমান ছিল।

তাহাদের সেই সকল বিভাগ ও উপবিভাগ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রকার যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, (‘হস্ত্যধ্যাক্’ ১৩৭—১৩৮ম পৃষ্ঠাঃ) নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

“কৰ্ম্মবন্ধাঃ চত্বারঃ দম্যসাম্রাঘ ঔপবাহ্যো ব্যালশ্চ। তত্র দম্য পঞ্চবিধঃ—স্বকগতঃ

স্বস্তগতো বারিগতোহপপাতগতো যুগতশ্চেতি। তন্তোপবিচারো বিককর্ম। সাম্রা-

হস্-সপ্তক্রিপাথঃ—উপস্থানং সংবর্তনং সংযানং বধাবধো হস্তিযুদ্ধং নাগসারগং সাং-
গ্রামিকং চ। তন্তোপবিচারঃ। কক্ষ্যাকর্ম ত্রৈবেদ্যকর্ম যুদ্ধকর্ম চ। ঔপবাহ্যোহষ্ট-

বিধঃ—আচরণঃ, কুঞ্জরোপবাহ্যঃ, ধোরণঃ, আধানগতিকঃ, যষ্ট্যুপবাহ্যঃ, ভোজ্যোপ-
বাহ্যঃ, শুদ্ধোপবাহ্যঃ মার্গায়ুকশ্চেতি। তন্ত্রোপবিচারঃ শারদকর্ম হীনকর্ম আরোহ-
কর্ম চ। ব্যাল একক্রিয়াপথঃ। তন্ত্রোপবিচার আযম্যেকরক্ষঃ কর্মশক্তিতোবক্ষ্যে
বিষয়ঃ প্রভিন্নঃ প্রভিন্নবিনিশ্চয়ো মদহেতুবিনিশ্চয়শ্চ। ক্রিয়াবিপন্নো ব্যালঃ।”

—হস্তিপ্রচারঃ, ১৩৮ম পৃষ্ঠাঃ।

হস্তিগণকে প্রথমতঃ যুগ্মগত করিবার নিয়ম। দলের সহিত একত্র থাকিতে অভ্যস্ত হইলে, শিক্ষা-দানের সুবিধা হয়। অতঃপর স্বক্কারোহণ অভ্যাস করিবার বিধি। বিনা-আপত্তিতে যখন তাহারা স্বক্কে চড়িতে দেয় এবং তাহাদিগকে স্তম্ভে আবদ্ধ করিতে পারা যায়, তখনই তাহাদের পোষমানান কার্য্য শেষ হইয়া থাকে। যুদ্ধের জন্ত শিক্ষাদান-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। শুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদিগকে উপহান অর্থাৎ উত্থান, উল্লম্বন ও দোলন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। সংবর্তন—গতিপরিবর্তন, সংযান—অগ্রসর হওন, দলন—শত্রু-পদদলিত করা, অপর হস্তীর সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার বিধি। বেঠনী দ্বারা স্তম্ভে আবদ্ধ করা, গ্রীবাবন্ধন এবং অপরাপর হস্তীর সহিত কার্য্যভ্যাস—ইহাই হইল শিক্ষার প্রথম স্তর; দ্বিতীয় স্তর—পৃষ্ঠে আরোহণ, গতি-সংযমন, বিবিধ প্রকার অঙ্গচালনা শিক্ষা দেওয়া, যষ্টি বা অক্ষুণ্ণ আঘাতে সন্ধেত দ্বারা পরিচালিত করা। এইরূপ নানা ভাবে হস্তিগণের শিক্ষার বিষয় অর্থশাস্ত্রে পরিবাস্ত হইয়াছে। যে সকল মন্ত হস্তী সহজে পোষ মানিত না, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল। কখনও তাহাদিগকে কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করা হইত, কখনও বা তাহাদিগকে কিছু দিনের জন্ত বনমধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে বাঁধিয়া রাখিবার নিয়ম ছিল। অবাধ্য বা মদমত্ত হস্তী ত্রিবিধ;—“শুদ্ধসুত্রতো বিষয়ঃ সর্বদোষপ্রদুষ্টশ্চ”—শুদ্ধ, সুত্রত ও বিষয়। এই ত্রিবিধ হস্তীই বিশেষ অনিষ্টকারী। ইহাদিগকে দমনে রাখিবার জন্ত আলান, দ্বিবিধ শৃঙ্গল, বন্ধনী ও বজ্র প্রভৃতি প্রস্তুত। অক্ষুণ্ণ, বংশদণ্ড এবং যন্ত্র প্রভৃতিও এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

“তেষাং বন্ধনোপকরণমনীকস্বপ্রমাণং আলানগ্রৈবেয়কক্ষ্যাপারায়ণপরিক্ষেপোত্তরা-

দিকং বন্ধনং; অক্ষুণ্ণবেণুযজ্ঞাদিকমুপকরণঃ।”—হস্তিপ্রচারঃ, ১৩৮ম পৃষ্ঠাঃ।

হস্তিপরীক্ষা সম্বন্ধেও বিশেষ নিয়ম ছিল। হস্ত্যধ্যক্ষের উহা একটা প্রধান কর্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আয়তন এবং উচ্চতা অনুসারে হস্তী উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বলিয়া

নির্দিষ্ট হইত। কোটিল্য বলিয়াছেন,—যে হস্তী উচ্চে সাত অরতি, দৈর্ঘ্যে

পরীক্ষা ও
আত্মাতির বিধান। নয় অরতি এবং যাহার দেহ-পরিধি দশ অরতি, সেই হস্তী শ্রেষ্ঠ। আবার

সেইরূপ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমবিশিষ্ট হস্তী সর্বোৎকৃষ্ট। ত্রিশ বৎসর বয়স্ক

হস্তী মধ্যম এবং পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়স্ক হস্তী নিকৃষ্ট পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। “সপ্তাৱত্তিকংসেধো নবাৱমো দশ পরিণাহঃ। প্রমাণতশ্চত্বরিংশদ্বর্ষো ভবতাত্তমঃ। ত্রিংশদ্বর্ষো মধ্যমঃ। পঞ্চ-
বিংশতি বর্ষোহবরঃ। তয়ো পাদাবরো বিধাবিধিঃ।” জন্মস্থান হিসাবেও হস্তিপরীক্ষা হইত। অর্থশাস্ত্রের ‘ভূমিবিভাগ’ প্রকরণে এতদ্বিষয় পরিবর্ণিত হইয়াছে। সেখানে যুদ্ধের সময় হস্তীর উপযোগিতার বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হস্তিবননিবেশে হস্তীর গতাগতি নিরূপণ করিয়া হস্তিবন-নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা। হস্তির মলমূত্র দেখিয়া ভ্রমতকী

বৃক্কের ভগ্ন শাখা-প্রশাখা লক্ষ্য করিয়া নদনদীর তীরে ভগ্ন মৃত্তিকাদি প্রভৃতি পরীক্ষার হস্তগতগণ হস্তির অবস্থিতি নির্ণয় করিতেন। জন্মস্থান হিসাবে যে হস্তির শ্রেণিবিভাগ হইত, তৎসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের ‘ভূমিছিদ্রবিধানম্’ প্রকরণে নিম্নরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়; যথা,—

“কগিদাকগজাঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাচ্যাস্চেতি ককশজাঃ। দশার্ণাশ্চাপরাস্তাশ্চ দ্বিপানাঃ মধ্যমা মতাঃ॥

সৌরাষ্ট্রিকাঃ পাঞ্চজনাঃ তেবাং প্রত্যবরাস্থতাঃ। সর্বেষাং কর্মণা বীৰ্যং জবন্তেজশ্চ বধতে॥”

কলিজ, অঙ্গ, ককশ এবং বঙ্গদেশীয় হস্তী উত্তম; পশ্চিম দেশীয় হস্তী মধ্যম এবং সৌরাষ্ট্র ও পাঞ্চজন্ত দেশীয় হস্তী অধম বা নিকৃষ্ট। জন্মস্থান হিসাবে এইরূপে পরীক্ষা করিয়া হস্তিগণের শ্রেণিবিভাগ হইত। শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট অনুসারে হস্তিগণের খাত্তের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের খাত্তের বিধানে দেখিতে পাই,—এক দ্রোণ তণ্ডুল, অর্দ্ধ ছটাক তৈল, তিন প্রস্থ ঘৃত, দশ পল লবণ, পঞ্চাশ পল মাংস, এক আটক রস বা দ্বিগুণ পরিমাণ দধি, দশ পল ক্ষার, এক আটক মজ্জা অথবা দ্বিগুণ পরিমাণ দুগ্ধ, দুই ভার উত্তম তৃণ, সওয়া দুই ভার শম্পা, ষষ্ঠাংশ ভার শুষ্ক তৃণ এবং প্রচুর পরিমাণ কড়করবৃত্ত প্রত্যেক হস্তীকে আহাৰ্য্যরূপে প্রদান করিবার নিয়ম ছিল। তদ্ব্যতীত হস্তীর গাত্রে মর্দন করিবার জন্ত এক প্রস্থ তৈল দিতে হইত। হস্তিশালায় প্রদীপ জালিবার জন্ত যে তৈল দিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহার পরিমাণ—এক প্রস্থের অষ্টমাংশ। যাহাদের উচ্চতা আট অরস্তি, তাহাদিগকেও এই হিসাবে খাত্ত প্রদান করিতে হইত। কিন্তু যাহাদের উচ্চতা তদপেক্ষা অল্প, তাহাদের আকৃতি পরিমাণ অনুসারে আহাৰ্য্য-পরিমাণ নির্দিষ্ট হইত। যথা,—

“অরস্তৌ তণ্ডুলদ্রোণঃ, অর্ধাটকং তৈলম্, সর্পিষস্তরঃ প্রস্থ্যাঃ, দশপলং লবণম্, মাংসং পঞ্চাশৎপলিকং, রসস্তাটকং, দ্বিগুণং বা দধিঃ পিণ্ডচ্ছদনার্থং ক্ষারং দশপলিকং মজ্জাস্তাটকং দ্বিগুণং বা পরসঃ প্রতিপানং গাত্রাবসেকটন্তলপ্রস্থঃ শিরসোহষ্টভাগঃ প্রাদীপিকশ্চ, যবদস্ত দ্বৌ ভারৌ সপাদৌ শম্পস্য শুকস্যাধৃত্তীয়ৌ ভারঃ কড়করস্যা-নিয়মঃ। সপ্তারস্তিনা তুলাভ্যোজেনোহষ্টারস্তিস্ত্যাবালঃ। যথাহস্তমবশেষঃ ষড়রস্তি পঞ্চা-রস্তিশ্চ। কীরযাবসিকৌ বিকঃ ক্রীড়ার্থং গ্রাহঃ।”—হস্ত্যধ্যক্ষঃ, ১৩৬ম—১৩৭ম পৃষ্ঠাঃ।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও কর্মচারিগণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। স্নানবিধির আলোচনায় এবং গৃহাদি নির্মাণের সুব্যবস্থায় তাহা প্রতিপন্ন হয়। দিনমানকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়া মহামতি কোটিল্য তাহার প্রথম ও শেষ ভাগে হস্তীর স্নান-কাল নির্দেশ করিয়াছিলেন। দুই বার আহার প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। স্নানের পর ঐ আহার প্রদান করিতে হইত। পূর্বাঙ্ক ব্যায়ামের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল, আর অপরাহ্নে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা হইত। রাজ্য-কালের আট ভাগের মধ্যে দুই ভাগ নিদ্রায় অতিবাহিত হইত। অবশিষ্ট জাগরণে কাটিত।

“প্রথমসপ্তমাবষ্টমভাগাবহুস্নানকালৌ, তদনন্তরং, বিধারাঃ, পূর্বাঙ্কে ব্যায়াম-কালঃ, পশ্চাৎকঃ প্রতিপানকালঃ। রাজ্যভাগৌ দ্বৌ স্বপ্নকালৌ, জিত্রাগস্-

সংবেশনৌহানিকঃ, গ্রীষ্মে গ্রহণকালঃ।”—হস্ত্যধ্যক্ষঃ, ১৩৬ম পৃষ্ঠাঃ॥

হস্তির বাসোপযোগী গৃহ-ব্যবস্থারও স্বাস্থ্য-বিধি-সমূহ অল্পমূল্য। কোটিল্য বলিয়াছেন,—
হস্তিশালায় উচ্চতা হস্তীর উচ্চতার দ্বিগুণ এবং প্রস্থ তাহার অর্দ্ধেক হইবে। হস্তিনী-

গণের জন্ম স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন। দ্বার-সমূহ উত্তর বা পূর্বাভিমুখী হওয়াই বিধেয়। প্রবেশ-দ্বারে সপ্রগ্রীবা এবং অভ্যন্তরে কুমারি বা বন্ধনকাঠ রাখিতে হইবে। বাহ্যার পৃষ্ঠালাবদ্ধ থাকিবে, তাহাদের সম্মুখে দৈর্ঘ্যের অক্ষবাস্তী সমচতুর্কোণ স্থান রাখা বিধেয়। আর সেখানে মল মূত্র নিঃসারণ জন্ত সছিদ্র কাঠখণ্ডসমূহ স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত। হস্তীর শয়ন-স্থানের দৈর্ঘ্য তাহার দৈর্ঘ্যের অধিক হওয়া আবশ্যিক। তাহা হইলে তাহার সহজে শয়ন করিতে পারিবে। তাহাঙ্গিরের হেলান দিবার জন্ত শয়ন স্থানে কাঠমঞ্চ নির্মাণ করিবার বিধি বিহিত হইয়াছিল। এতৎসংক্রান্ত বিধানে কোটিল্য বলিয়াছেন,—

“হস্ত্যায়াম দ্বিগুণোৎসেধবিকস্তায়ামাং হস্তিনীস্থানাধিকাং সপ্রগ্রীবাঃ কুমারীসং-

গ্রহাং প্রাঙমুখীমুদঙ্মুখীঃ বা শালাং নিবেশয়েৎ। হস্ত্যায়ামচতুরশ্রক্কালানন্তস্ত-

কলকান্তরকং মূত্রপূরীষোৎসর্গস্থানং নিবেশয়েৎ।”—হস্ত্যায়াক্, ১৩৬ম পৃষ্ঠাঃ ॥

তাহাদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থারও স্বাস্থ্য-রক্ষার বিবিধ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। গো-মহিষাদির চিকিৎসা বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থার বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হস্তিচিকিৎসার বিধিও তদনুরূপ। অচিকিৎসার বা কুচিকিৎসার মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, চিকিৎসক দণ্ড-ভোগ করিতেন। হস্তিশালায় অধিক ধূলা জমিলে, শয্যারচনার উপযুক্ত পরিমাণ তৃণাদি না দিলে, অসময়ে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, শক্ত বা অমুপযুক্ত স্থানে শয়ন করাইলে, রক্ষকের দণ্ড হইত। ফলতঃ, পশুদি প্রতিপালনে স্বাস্থ্য-রক্ষা ও শরীরপালন সংক্রান্ত সকল বিধি অদ্বৈত হইবার ব্যবস্থা ছিল। হস্তীর সাজসজ্জা এবং তাহার নানাবিধ অলঙ্কার সে সময়ে প্রচলিত ছিল,—অর্থশাস্ত্রে সে সকলের উল্লেখ আছে।

“স্থানস্তাণ্ডিক্দিব্ব সস্যাগ্রহণঃ স্থলে শায়নমভাগে বাতঃ পরারোহণমকালে-

বানমভূমাবতীর্ণেহবতারণং তরুণ্ড ইত্যত্যয়স্থানানি। তমেবাং ভক্তবেত-

নাদাদদীৎ...ঐবজ্রস্তীকুরপ্রমালান্তরগকুখাদিকং ভূষণং। বর্মতোমরশারা-

বাপবস্ত্রাদিকসৃঙ্গগ্রামিকালঙ্কারঃ।”—হস্তিপ্রচারঃ, ১৩৮ম ও ১৩৯ম পৃষ্ঠাঃ।

হস্তীর দস্তাচ্ছেদন প্রদগ্ধে পার্শ্বতীর ও নদীজ হস্তীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে জল-হস্তীর কথা মনে আসে। সে সময়ে জলহস্তী-সমূহ ধৃত করা হইত, আর তাহাদের শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা ছিল,—কোটিল্যের উক্তি হইতে তাহা বুঝা যায়। যথা,—“দন্তমূলপরীণাহ-দ্বিগুণং প্রোৎস্ত কল্পয়েৎ। অঙ্গে দ্বার্ধে নদীজানাং পঞ্চাঙ্গে পর্কতৌকসাম্ ॥” নদীজ হস্তীর বা জলহস্তীর দন্ত আড়াই বৎসর পরে এবং পার্শ্বতীর হস্তীর দন্ত পাঁচ বৎসর পরে কর্তন করিবার নিয়ম। নদীহস্তীর দন্ত অল্প সময়ে অধিক বৃদ্ধি পায়, সেই জন্যই এ ব্যবস্থা।

যেমন পশু বিষয়ে তেমনি পক্ষী সম্বন্ধে বিবিধ বিধি প্রবর্তিত হইয়াছিল। ‘হৃনাধ্যক্ষ’ প্রকরণে সে পরিচয় প্রাপ্ত হই। ঐ অংশের আলোচনার প্রতিপন্ন হয়, সে বিধানে বিশেষ

বিশেষ পশুপক্ষী ধৃত করা দণ্ডনীয় ছিল। রাজা তাহাদের রক্ষার জন্ত

পক্ষি-সংরক্ষণ। অংশের প্রেরাস পাইতেন। যে সকল পশু বা পক্ষী দ্বারা মানুষের

প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা ছিল না, যে সকল পশুপক্ষী বিশেষ বস্ত্রের

সহিত সংরক্ষিত হইত। সারস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, শুক, সারী, কোকিল, চাতক, চকোর

প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় পক্ষী এইরূপে রাজসহায়তা লাভে সুখে বিচরণ করিত। সে সময় রাজীকৃত অরণ্য ছিল। রাজা সেই অরণ্যে শিকার-কোতূহল চরিতার্থ করিতেন। সাধারণের শিকারের জন্তও স্বতন্ত্র বনভূমি নির্দিষ্ট ছিল। নির্দিষ্ট বনভূমি ব্যতীত অন্যত্র শিকার করিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইত। অপরাধের ভারতম্য অনুসারে সে দণ্ডের বিধান ছিল। ফলতঃ, সে প্রাচীনকালে মহুয়া হইতে ক্ষুদ্র জীব-জন্তুর সুখ-বিধানের প্রতিও রাজার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এতদ্বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

সামুদ্রহস্ত্যশ্বপুরুষবৃষগর্ভভাকৃতয়ো মৎস্তাঃ সারস।
নাদেয়াস্তটাককুলোদ্ভবাঃবা। ক্রৌঞ্চোংক্রোশকদাতৃ-
হংসচক্রবাকজীবজীবকভৃঙ্গরাজচকোরমত্তকোকিলময়ূর-
শুকমদনশারিকাঃ বিহারপক্ষিণো মঙ্গল্যাম্ভানোপি
প্রাণিনঃ পক্ষিমৃগা হিংসাবাধেভ্যো রক্ষাঃ। রক্ষাতি-
ক্রমে পূর্নস্ সাহসদণ্ডঃ।—স্বনাধ্যক্ষঃ, ১২২ম পৃষ্ঠাঃ।

জনসাধারণের শিকার ব্যবস্থায়ও আদর্শ নীতির পরিচয় পাই। প্রাচীন আৰ্য্য মনীষি-
গণ বুঝিয়াছিলেন,—অন্যতঃ সম্যক জ্ঞান লাভ শিকার চরম উদ্দেশ্য; আর আত্মার অ'ত্ম-
শিকার সম্মিলন সে শিকার চরম পরিণতি। ভারতীয় শিকার ইহাই আদর্শ;
আদর্শ—ধর্ম। ধর্ম সে শিকার প্রাণস্থানীয়। সেই শিকার সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত
বলিয়া, তাহার রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি—কালের কঠোর কশা-
ঘাত সহ্য করিয়া—বিপ্লবের শত ঝড়বাতের মধ্যেও আজি পর্য্যন্ত পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে
সমর্থ হইয়াছে। সর্ববিষয়ে ধর্মকে আদর্শরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই আজিও
ভারত গর্কোন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান। আৰ্য্য মনীষিগণ সংসার-জীবন দুঃখময় মনে করিতেন না।
তীহাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানোন্নতি তৎপক্ষে তীহাদের সহায় ছিল। জ্ঞানোন্নতিতে চরিত্রোন্নতি
সাধন করিয়া তীহারা ইহলোকেই সনাতন জীবন যাপন করিতেন। ধর্ম তীহাদের শিকার
আদর্শ; সেই আদর্শের অনুসরণে তীহারা দেশবাসীর শিকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালের শিক্ষা-পদ্ধতির পরিচয় সকল শাস্ত্রগ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ,
আরণ্যক, উপনিষৎ, সূত্র সাহিত্য, সংহিতা, দর্শন, পুরাণ, উপপুরাণ সর্বত্র সেই শিকার মাহাত্ম্য
পরিকীর্ণিত। শিকার সে মাহাত্ম্য-কীর্ণনে ধর্মের মাহাত্ম্য বিধোবিত।
কোটিল্যের বিধান তদনুসারী। শাস্ত্রগ্রন্থের সেই সনাতন শিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণ কোটিল্যের শিক্ষা-
বিধানে সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত। বিস্তার উদ্দেশ্য-ব্যাখ্যানে তাই অর্থশাস্ত্রে প্রথমেই
বেদ-বিস্তার মাহাত্ম্য পরিকীর্ণিত দেখি। কোটিল্য বলিয়াছেন,—শাস্ত্র চতুর্বিধ;—আত্মীক্ষিকী,
জরী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি। মাহুয এই চারি শাস্ত্র হইতে ধর্ম ও অর্থ শিক্ষা করিতে পারে।
'আত্মীক্ষিকী জরী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ ১০০তাদিধর্মার্থে যযিত্যভ্যুদিতানাং বিদ্যাম্।'।
এই চতুর্বিধ ধর্মের সাহায্যে সংসারে সকল জ্ঞান লাভ করা যায়। জরী বা বেদজিত্তর
হইতে ধর্মার্থ, বার্তা হইতে অর্থ ও অনর্থ, দণ্ডনীতি হইতে ভ্রাতৃত্ব এবং
আত্মীক্ষিকী হইতে সাংখ্যযোগ বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। আত্মীক্ষিকী সর্ববিস্তার প্রদীপ-

স্বরূপ। আর্থিকী সকল কার্যের উপায় এবং সকল ধর্মের আধার ও আধার।

“সাম্রাজ্য যোগে লোকায়ত্তং চৈত্যাধীকী। ধর্মার্থো জ্ঞানম্। অর্থানর্থো বার্তাম্।

নয়ানমৌ দণ্ডনীত্যাং বলাবলে চৈতাসাং হেতুভিরধীকমাণা লোকস্বোপকরোতি,

ব্যাসনেহভূদরে চ বুদ্ধিমবস্থাপয়তি, প্রজ্ঞাবাক্যক্রিয়াবৈশারদ্যং চ করোতি—

প্রদীপসূর্যবিজ্ঞানায়ুপায়সূর্যকর্মণাম্। আশ্রয়সূর্যধর্মণাং শতদাধীকী মতা ॥”

বিজ্ঞা-চতুর্থেই কতি পরিমার্জিত হয়, চরিত্রের উন্নতি ঘটে, ইহলোকে মুক্তি এবং পরলোকে শান্তি লাভ হয়। সেই চতুর্ধিক ধর্ম শিক্ষা দেওয়াই কোটিল্যের উদ্দেশ্য ছিল। আর সে পক্ষে তিনি বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

বিজ্ঞাতিগণের কর্তব্য-নিরূপণ প্রসঙ্গে কোটিল্যের বিজ্ঞানে বিজ্ঞাশিক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিজ্ঞাশিক্ষা বিজ্ঞাতিগণের প্রধান কর্তব্য ছিল। কোটিল্য বলিয়াছেন,—

শিক্ষার
উদ্দেশ্য।

কর্তব্য-সম্পাদনে অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত সুখের অধিকারী হওয়া যায়।

তাহার অসম্পাদনে নিরয়গামী হইতে হয়। এখানেও কোটিল্য সেই ধর্মের

প্রাধান্য কীর্জন করিয়াছেন। জনসাধারণ এ কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট না হয়,

শিক্ষালাভে শৈথিল্য না করে, তদ্বিষয় রাজা লক্ষ্য রাখিতেন। ধর্মপ্রাণ—তিনি। পাছে

কর্তব্যের অননুষ্ঠানে ধর্ম-হানি ঘটে, আর তাহাতে পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হয়,—সেই আশঙ্কায়

সর্বদাই তিনি শঙ্কিত থাকিতেন। জনসাধারণেরও বিশ্বাস ছিল—জাতি ধর্ম অমুসারে

অধিপ্রবর্তিত নিয়ম প্রতিপালনে জীবনাতিপাত করিতে পারিলে উভয় জন্মেই পরম সুখ

লাভ হয়। ত্রিবেদাম্বুসারী কার্যে সংসারের সকলেই যদি তৎপর, হন, তাহা হইলে

পৃথিবী কোনও কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না; পরন্তু উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে;—

এই ধর্ম-বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই সে সময়ে সকলে নিজ নিজ কর্তব্য পালনে নিরত

ছিলেন। বিজ্ঞাতিগণের কর্তব্য-নির্দেশে কোটিল্য তাই বলিয়াছেন,—

“স্বধর্মো ব্রাহ্মণস্তাধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি।

কজ্রিয়স্তাধ্যয়নং যজনং দানং শত্ৰুজীবো ভূতরক্ষণং চ। বৈশস্তাধ্যয়নং যজনং

দানং কৃষিপাণ্ডপাল্যে বণিজ্যে চ। শূদ্রস্ত বিজাতি গুপ্তায়া বার্তা কাককুশীলব-

কর্ম চ।...স্বধর্মস্বর্গায়াননতায় চ। তস্তাভিক্রমে লোকসুসঙ্করাহুচ্ছিত—

তন্ম্যংস্বধর্মং ভূতানাং রাজা ন ব্যভিচারয়েৎ। স্বধর্মং সংদধানো হি প্রোভ্য চেহ চ নন্দতি ॥

ব্যবস্থিতার্থবর্ধনঃ কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ। জ্ঞান্য হি রক্ষিতো লোকঃ প্রসীদতি ন সীদতি ॥”

বিজ্ঞাতির প্রধান কর্তব্য—বিজ্ঞা শিক্ষা করা, এস্থলে কোটিল্য তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া

দিলেন। ছাত্রের কর্তব্য-নির্দেশেও শিক্ষার প্রাধান্য সমর্থিত হইয়াছে। চূড়াকরণের পর

ছাত্রের লিপি, গণিতশাস্ত্র, বার্তা এবং দণ্ডনীতি শিক্ষার বিষয় অর্থশাস্ত্রে বিহিত রহিয়াছে।

যাহারা পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট সে সময় বিজ্ঞাশিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

“বৃত্তচৌলকর্মী লিপিং সম্ভ্যানং চোপযুক্তীত। বৃত্তোপনয়নজরীমাবী-

ককীং চ শিষ্টেভ্যঃ, বার্তামধ্যাক্তেভ্যঃ, দণ্ডনীতিং বক্তৃপ্রোভোক্তভ্যঃ।”

বিজ্ঞার বিনয় অধিগত হয়,—চিক-দ্বৈধ্য আনয়ন করে এবং ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রত্যাহা

শাস্ত্র-চতুষ্টয় অধিগত হইলে প্রজ্ঞা জন্মে ; প্রজ্ঞার যোগ এবং যোগবলে আত্ম-তত্ত্ব লাভ হয় । “শ্রুত্যাদি প্রজ্ঞোপজায়তে প্রজ্ঞয়া যোগো যোগাদাত্মবত্তেতি বিজ্ঞাসামর্থম্ ।” যে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য আত্মতত্ত্ব-লাভ—আত্মায় আত্ম-সম্মিলন, সে শিক্ষার সে আদর্শ কেত মহান, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয় । কোটিল্যের বিধানের রাজা যেমন শিক্ষার দ্বারা বিনয় অধিগত করিয়া চরিত্রোন্নতি সাধন করিবেন, প্রজাগণের চরিত্রোন্নতি-বিধানের তিনি তেমনি বিবিধ ব্যবস্থা বিহিত করিয়া তৎপক্ষে সহায় হইবেন । রাজা সুমার্জিত-কুচি এবং উন্নত-চরিত্র না হইলে প্রজাগণেরও চরিত্রহানি ঘটে । রাজা যদি প্রৈতিক হন, প্রজাগণও প্রৈতিক হয় । শিক্ষা-প্রভাবে বিনয়-সাহায্যে কুচি মার্জিত এবং চরিত্র বিগঠিত না হইলে, নানা অনর্থ ঘটে । দৃষ্টান্তস্বরূপ কোটিল্য রাবণ, দুর্যোধান, জনমেজয়, তালকজ্য প্রভৃতির উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন । শিক্ষা-প্রভাবে চরিত্র বিগঠিত না হওয়ায়, বিনয়-সাহায্যে ইঞ্জিয়-দমন করিতে না পারায়, তাঁহারা সকলেই রাজ্য ও স্বজন সহ বিনষ্ট হইয়াছিলেন । সুতরাং রাজা নিজে যেমন বিনয়ী, শিক্ষিত ও প্রৈতিক হইবেন, প্রজাসাধারণের শিক্ষা-বিধানে তাহাদিগকেও তেমনি বিনয়ী, শিক্ষিত ও প্রৈতিক হইতে শিক্ষা দিবেন । তাহা করিতে পারিলে, ধর্ম ও অর্থ উভয়ই তাঁহার অধিগত হইবে । কোটিল্য তাই বলিয়াছেন,—

“বিজ্ঞাবিনীতো রাজা হি প্রজানাং বিনয়ে রতঃ ।

অনন্তাং পৃথিবীং ভুক্তে সর্বভূতেহিতে রতঃ ॥”

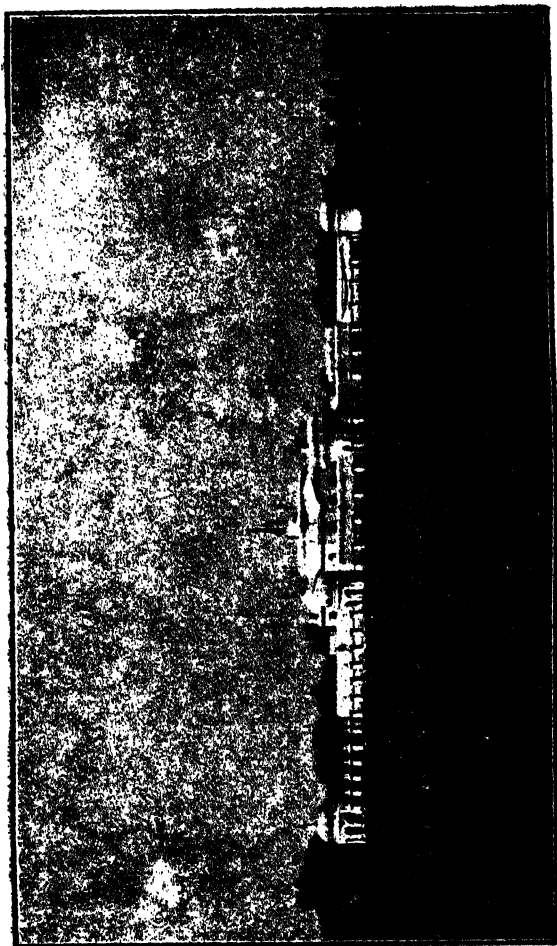
প্রজা-সাধারণের শিক্ষোন্নতি-বিধানের কোটিল্যের বিশেষ প্রয়াস ছিল, তাঁহার নীতি-সমূহ হইতে তাহা স্পষ্ট সপ্রমাণ হয় । রাজার কর্তব্য নির্ধারণে এবং দ্বিজাতির কর্তব্য-নির্দেশে সে বিষয়ে কোটিল্যের প্রয়াস পূর্ণ প্রকটিত । শিক্ষার আদর্শ—ধর্ম । ধর্ম-শিক্ষা—সেকালের শিক্ষার চরম লক্ষ্য ছিল । প্রাচীন ভারত অনন্তাসক্ত হইয়া সেই লক্ষ্য-পথে ছুটিয়াছিল—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল । তাই আজিও তাহার সে গৌরব—সে গরিমা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ; তাই আজিও আধুনিক সকল অমুষ্ঠানেই সেই প্রাচীনের অনুসরণ প্রত্যক্ষ করিয়া গৌরব অনুভব করি ।

প্রাচীন ভারতের আদর্শ সভ্যতার বিষয়ে আজিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই সন্দিহান রহিয়াছেন । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যাহারা প্রাচীন হিন্দুগণের মহীরসী মহিমা

সর্ববিষয়ে	দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ভারতের গৌরব-গরিমার বিষয় মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা
ভারতের	করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহাদের সে সিদ্ধান্তও অনেকের নিকট আজি পর্যন্ত
শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাপন ।	আদরনীয় নহে । কিন্তু একমাত্র ‘অর্থশাস্ত্রের’ আলোচনায় তাঁহাদের সে

ভ্রম-ধারণা দূর হইতে পারে । তাঁহারা দিব্য-চক্ষে দেখিতে পান, খৃষ্ট-জন্মের তিনশতাব্দিক বৎসর পূর্বেও হিন্দুগণ কিরূপ গৌরবমণ্ডিত ছিলেন । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সময় হইতে ভারতেতিহাসের আরম্ভ গণনা করিয়া থাকেন, অর্থশাস্ত্র সেই সময়ের গ্রন্থ । সর্ব-শাস্ত্রদর্শী মহামতি চাণক্য সেই সময়েই আবির্ভূত হইয়াছিলেন । সুতরাং তাঁহাদের হিসাবেও অর্থশাস্ত্রের ঐতিহাসিকত্ব বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না । অর্থশাস্ত্র, কোটিল্যের উক্তি-পরম্পরা, তাত্‌কালিক হিন্দুজাতির জ্ঞান-গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শন । সে সময়ে, সেই

অদূর অতীতকালে, ভারত জগৎ-সমক্ষে যে আদর্শ প্রকটিত করিয়াছিল, আজিও অনেক আধুনিক স্মৃতি জাতি তাহার কণামাত্র প্রকটনে সমর্থ হন নাই। হিন্দু-জাতির শিক্ষা-দীক্ষা কিরূপ উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, অর্থশাস্ত্রে সে নিদর্শন জগৎ-সমক্ষে প্রকটিত করিতেছে। রাজ্য-রক্ষার ও রাজ্যশাসন-প্রণালীর যে বিভাগের প্রতিই দৃষ্টিপাত করি না কেন, সকল দিকে—সকল বিভাগেই হিন্দু-জাতির অমাহুষিক জ্ঞান-গবেষণা, অভাবনীয় উৎকর্ষের পরিচয়-সমূহ দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। একদিকে যেমন কল্লনার পরাকাষ্ঠা প্রত্যক্ষ করি, অত্ৰদিকে তেমনি পরিণতির চরম দৃষ্টান্ত নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হয়। একদিকে যেমন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের চরম স্ফুর্তি দেখিতে পাই, অত্ৰদিকে তেমনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের—বস্তুতত্ত্বের চরম পরিণতি নয়নপথে প্রতিভাত হয়। কিবা দর্শন-বিজ্ঞান, কিবা রাজনীতি ধর্মনীতি, কিবা গণনীতি সমাজ-নীতি—সর্ববিধ নীতিশাস্ত্রেই প্রাচীন হিন্দুগণ কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অর্থশাস্ত্রে নীতি-বিজ্ঞানের যে আদর্শ প্রকটিত দেখি, সে আদর্শ বুঝি কোনও দেশ কোনও কালে প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন না। কৃষিবিজ্ঞানের যে পারগতি লক্ষ্য করিয়াছি, শিল্প-বিজ্ঞানের যে উন্নতি প্রকটিত হইয়াছে, লোকগণনার সুশাসন-সুপালনে এবং জনহিতকর বিবিধ অমুষ্ঠানে প্রাচীন ভারত জগৎসমক্ষে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, মনে হয়, পৃথিবীর কোনও জাতি কোনও কালে সে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে না। আজিও অনেক স্মৃতি জাতি সমাজের যে সকল জটিল সমস্যা-নিরসনে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছেন, আজিও বাহার সম্যক নীমাংসার তাহার সমর্থ হইতেছেন না ; প্রাচীন ভারত বহু পূর্ব হইতেই সে সকল সমস্যা নিরসন করিয়া জনসাধারণের সুখের প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। অনেকের নিকট এ সকল বিষয় উপহাস্যাপদ বলিয়া উপেক্ষণীয় হইতে পারে ; কিন্তু বিচার-নীমাংসার প্রতিপন্ন হয়, কোটিল্যের অসাধারণ বী-শক্তি বলে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল। তাই আজি শিক্ষিত সমাজ তাঁহাকে পাশ্চাত্য রাজনীতিক ম্যাকেন্সডেল ও বিসমার্ক অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করিতেছেন ; আর ভক্তিতরে তাঁহার চরণে নতশির হইতেছেন। এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমে একদিন সকলই ছিল। দর্শন ছিল, বিজ্ঞান ছিল, রাজনীতি ছিল, সমাজনীতি ছিল ; কাকশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধনৈশ্বর্য—সকলই ছিল। ভারতের শিক্ষা সনাতন ধর্ম্মাহারী। ধর্ম্মশিক্ষাই—তাহার সকল শিক্ষার মূলীভূত। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান—আত্মতত্ত্বে সম্যক জ্ঞানলাভ—সে শিক্ষার প্রাণহানীর। কালবশে ধর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হওয়ার ভারত এখন সে শিক্ষা হারাইয়াছে। কিন্তু সে আবার যখন প্রাচীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণে ধর্ম্ম-প্রাণতার গা ঢালিয়া দিতে শিখিবে, মহাজনগণ প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া প্রাচীন গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার স্পর্শ করিতে পারিবে, আর ধর্ম্মসাধনে তৎপর হইয়া আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-সাধনে ধর্ম্মের অমুপ্রাণনার জগৎ প্রাবিত করিবে ; তখনই তাহার পূর্বধোরব পূর্বগরিমা আবার ফিরিয়া আসিবে ; আদর্শ-রাজ্যের আদর্শ বিধি-বিধানে যে দৃষ্টান্ত প্রকটিত হইয়াছে, সে আদর্শ জগৎ-সমক্ষে পুনরায় প্রকটন করিতে সমর্থ হইবে।



পাওয়া-পুরীর জলমন্দির (বিহার) ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

জৈন-স্থাপত্য ।

[অৰ্ধশাস্ত্রে চাণক্যের কৃতিত্ব,—তাহাতে চন্দ্রগুপ্তের শাসন-প্রণালীর উল্লেখ ;—চন্দ্রগুপ্তের শাসন-প্রণালীতে কোটিল্যের উক্তি সমর্থিত ;—জৈন-স্থাপত্য,—বিভিন্ন স্থানে তাহার নিদর্শন ;—জৈন-প্রাধিক্তে স্থাপত্যের চরমোন্নতি ;—চিত্র-কলায় জৈনগণের অবিভীত্ব,—চীনের প্রসঙ্গ,—তাহাতে ভারতের অনুসরণ ;—উপসংহার ।]

অৰ্ধশাস্ত্র—চাণক্যের অদ্বিতীয় কীৰ্ত্তি । চাণক্য যে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অসাধারণ যৌক্তিকশালী এবং অমানুষিক জ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন, অৰ্ধশাস্ত্রের আলোচনায় তাহা

সপ্রমাণ হয় । চাণক্য যে সময়ে ভারতভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে
অৰ্ধশাস্ত্রে সময় একদিকে বৈদেশিক আক্রমণের বিভীষিকার এবং অত্রদিকে
চাণক্যের কৃতিত্ব । আত্মদ্রোহের বিষম বাতায়, ভারত-সিংহাসন টলটলায়মান হইয়াছিল ।

চন্দ্রগুপ্ত-রূপ অজ্ঞ অবলম্বনে মহামতি কোটিল্য সে সময় যে মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, জগতে তাহার তুলনা নাই । চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতের বিচ্ছিন্ন রাজশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিবার প্রয়াস—‘পৃথিবীর ইতিহাসে’ চাণক্যের মহিমা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে । তাহার মন্ত্রি-প্রভাবে তৎকালে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজ্য-নৈতিক অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল । কিরূপ ঐকান্তিকতার সহিত কি ভাবে তিনি সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, মহাসমুদ্রবন্দে তরঙ্গভঞ্জে বিচালিত ভারত-সরসীর কিরূপে তিনি উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন, কিরূপে এবং কি ঐশীশক্তি প্রভাবে তৎকর্তৃক রাজ্যের শৃঙ্খলা এবং জনহিতকর বিধি-বিধান-সমূহ প্রবর্তিত হইয়াছিল,—অৰ্ধশাস্ত্রে তাহার পরিচয় দেদীপমান রহিয়াছে ।

চাণক্যের প্রভাবে চন্দ্রগুপ্ত-প্রতিভা প্রস্ফুটিত হইয়াছিল । ইন্দ্র-সংযোগ না হইলে যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না, চাণক্যরূপ ইন্দ্র-সংযোগ না হইলে চন্দ্রগুপ্ত-রূপ অগ্নি-চন্দ্রগুপ্তের স্ফুলিঙ্গেও ভেমনি দিগ্দাহী অনলের সৃষ্টি হইত না । চাণক্য প্রধান শাসন-বর্ণনা—মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত না হইলে, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে আদর্শ সৃষ্টি অসম্ভব অৰ্ধশাস্ত্রের উদ্দেশ্য । হইত । উপযুক্ত সময়ে জলসেচন না পাইলে প্রভিত্তা-বীজ অল্পেই শুকাইয়া যায় । একদিকে চাণক্যের অসাধারণ যৌ-শক্তি, অত্রদিকে জৈনধর্মের নবীন উদ্দীপনা ;—চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় এতদুভয়ের অপরিণীত প্রভাব ইতিহাসে জাজ্জল্যমান রহিয়াছে । কি অবস্থায় কি শক্তি প্রভাবে চন্দ্রগুপ্ত বিশাল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সমর্থ হইয়াছিলেন, তদালোচনা এতৎপ্রসঙ্গের উদ্দেশ্য নহে । তাহার রাজ্যের আদর্শ-প্রকটন, এতদালোচনার প্রধান লক্ষ্য । তদুদ্দেশ্য সাধনে চাণক্য প্রণীত ‘অৰ্ধশাস্ত্র’ আমাদের প্রধান অবলম্বন । অৰ্ধশাস্ত্র—দণ্ডমূলক । আত্মাধিকারী, ত্রয়ী, বার্তা এবং দণ্ডনীতি—এই ধর্মচতুষ্টয়ের

বাখ্যা-ব্যাপদেশে মহামতি চাণক্য যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে বুঝা যায়, সেই চারি শাস্ত্র বর্ণিত সকল বিষয়েই চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। কোটিল্য বলিয়াছেন—বার্তা ত্রিবিধ;—কৃষি, পশুচারণ এবং বাণিজ্য। বার্তা প্রভাবে রাজকীয় কোষাগার পূর্ণ হয়, সৈন্ত-সাহায্যে রাজ্যরক্ষা বিহিত হইয়া থাকে; আর দণ্ডনীতির সাহায্যে রাজ্যবৃদ্ধি, রাজ্যরক্ষা এবং রাজ্যোন্নতি সাধিত হয়। দণ্ডনীতির উপর পৃথিবীর উন্নতি, আত্মকীর্ষী, বেদজ্ঞিতর এবং বার্তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সুতরাং পৃথিবীর এবং রাজ্যের উন্নতি কামনা করিলে রাজা দণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। যথা,—

কৃষিপাশুপাল্যে বাণিজ্যে চ বার্তা; যাত্তহিরণ্যপশুকৃপাবিষ্টিপ্রদানাদৌ-
পকারিকী। তরা সপক্ষং পরপক্ষং চ বশীকরোতি কোশদণ্ডাভ্যাম্।
আত্মকীর্ষীজয়ীবার্তানাং যোগক্ষেমসাধনো দণ্ডঃ। তস্ত নীতির্দণ্ডনীতিঃ;
অলক্ষ্যলাভার্থা, লক্ষ্যপরিরক্ষণী, রক্ষিতবিবর্ধনী, বৃদ্ধস্ত তীথেষু প্রতিপাদনী
তস্তামায়ত্তা লোকযাত্রা। তস্মাল্লোকযাত্রাণী নিত্যমুত্ততদণ্ডস্তাৎ।

চতুর্বার্ণাশ্রমো লোকো রাজ্ঞা দণ্ডেন পালিতঃ।

অর্থশ্রম্যভিরতো বর্ততে শ্বেনু বজ্রশ্রম্।*

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বে, কোটিল্যের বিধানে, এ নীতি বর্ণে বর্ণে অমূল্য হইয়াছিল,—অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় তাহা সপ্রমাণ হয়। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; প্রজাসাধারণের সুশিক্ষা বিধানে রাজা বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন; পয়ঃপ্রণালী খননে জগৎসরবরাহের ব্যবস্থায় দেশবাসীর জলকষ্ট বিদূরিত হইয়াছিল। স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থায়, গতাগতির সুবন্দোবস্তে চন্দ্রগুপ্তের রাজা উন্নতির উচ্চ-চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। কিবা খনিজ-বিজ্ঞায়, কিবা পশুপালন-ব্যবস্থায় কিবা স্থপতি-বিজ্ঞায়—সে রাজ্যের বংশঃগৌরব দিগ্দিগন্তে বিস্তৃত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের কারুশিল্প চিরপ্রসিদ্ধ। ভারতের স্থাপত্যে আজিও অনেক বিস্ময়-স্বিত। জৈনধর্মের চরমোন্নতি সময়ে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, ভারতের স্থাপত্য ও কারু-

শিল্প যে বিশেষরূপ উন্নত ছিল; অর্থশাস্ত্রের অন্তর্গত “কারুকেররক্ষণম্”

জৈন-স্থাপত্য। ব্যবস্থায় তাহা সপ্রমাণ হয়। খৃষ্টজন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে হইতেই

যে, স্থাপত্যে জৈনগণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। ভারতের স্থাপত্য এবং শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁহাদের গবেষণায় অবধি নাই। জৈনগণের শিল্পোন্নতির বিষয় আলোচনা করিয়া তাঁহারা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছেন। রাজস্থানের ইতিহাস-লেখক কর্ণেল টড বলিয়াছেন,—“নান্দোলে মহাবীর স্বামী মন্দিরে যে স্থাপত্যের এবং শিল্পচতুর্যের নিদর্শন বর্তমান, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যম্বিত হইতে হয়। তাহার সহিত তুলনায় প্রাচীন রোমের স্থাপত্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীতি জন্মে। তেমনি কারু-সৌন্দর্য্য বুঝি বা জগতে কুজাপি দৃষ্ট হয় না।”

* নান্দোলে মহাবীর স্বামী মন্দিরের কারুকাব্যে মুগ্ধ হইয়া রাজস্থানের ইতিহাস-লেখক কর্ণেল টড বলিয়াছেন,—“The temple of Mahavira at Nandole, the last of their twenty-four apos-

মথুরার সন্নিকটে ‘কঙ্কলী টিল্লায়’ জৈনগণের এক স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন,—‘খৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে ঐ স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল। সে স্তূপ—ভারতের অতি প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন।’ * জৈন-স্থাপত্যের বিশেষত্ব—তাহার আভাবিকত্ব। আবু-পর্বতস্থিত জৈনমন্দির-সমূহ শিল্পচাতুর্য্যে অতুলনীয়। শ্বেত মন্দির-প্রস্তর-বিনির্মিত সেই মন্দির-সমূহ আজিও অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। গম্বুজের অভ্যন্তর বিচিত্র-কারুণ্যচিত্র চিত্রাদিতে বিভূষিত। প্রস্তর-গাত্র খোদিত করিয়া একরূপ সুন্দর চিত্র নির্মাণ—অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতে জৈন ভাস্কর্য্যের বহু নিদর্শন বিদ্যমান। পণ্ডিতগণ বলেন—সে সকল জৈনগণের অশেষ কীৰ্ত্তি বিবোধিত করিতেছে। প্রস্তর-গাত্রে এত সুচিকিণ, এত জাঁকজমকবিশিষ্ট, এত সুন্দর চিত্রাদি অঙ্কন—কোনও দেশে পরিদৃষ্ট হয় না। ভারতের প্রায় সর্বত্রই জৈন ভাস্কর্য্যের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ইলোরার গিরিগুহা এবং উড়িষ্যার উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, নীলগিরি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কাণিবাড়ের অন্তর্গত পালিতানার নিকটবর্তী শত্ৰুঞ্জয় পর্বতের জৈন-মন্দির সর্বাঙ্গোচ্চা চিত্তাকর্ষক। সে মন্দিরের ভাস্কর্য্যের এবং চিত্রশিল্পের সৌন্দর্য্য-গাভীরা দর্শনে সকলেই বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া থাকেন। লতাপাতা-পুষ্প-পত্র-সমন্বিত শিল্পভূষণের সৌন্দর্য্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক। প্রাচীন ভারতের শিল্পকলায় স্থপতিগণ যে সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহারা ভাস্করবিদ্যার যে উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেরূপ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি—সেরূপ উৎকর্ষ-সাধন, অধুনা অতি বিরল বলিলেও অতুক্তি হয় না।

জৈনগণের এবং বৌদ্ধগণের ভাস্কর্য্য-প্রণালী একরূপ অভিন্ন বলিলেও অতুক্তি হয় না। জৈনতীর্থঙ্করগণের এবং বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি-সমূহের নির্মাণ-প্রণালী অভিন্ন। তাই

সময় সময় বৌদ্ধ ও জৈন স্থাপত্যের পার্থক্য-বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত।
জৈনস্থাপত্যের নিদর্শন। হয় ;—একটাকে অপরাটা হইতে বাছিয়া লওয়া কঠিন হইয়া উঠে।

বুদ্ধদেবের এবং তীর্থঙ্করগণের মূর্ত্তি-সমূহ প্রায়ই পদ্মাসনে উপবিষ্ট। জৈন বা বৌদ্ধ প্রতিকল্পক সম্প্রদায়গত পার্থক্যের নিদর্শন বর্ত্তমান না থাকিলে, উভয় মূর্ত্তির প্রভেদ-পরিকল্পনা সম্ভবপর নহে। সেই জন্য সময় সময় অনেক বৌদ্ধমথ্যাবলম্বীকে জৈনমূর্ত্তির এবং জৈনগণকে বৌদ্ধ-মূর্ত্তির উপাসনা করিতে দেখা যায়। জৈনতীর্থঙ্করগণের প্রতিমূর্ত্তি-সমূহ প্রায়ই পদ্মাসনে বা অর্দ্ধপদ্মাসনে উপবিষ্ট-অবস্থায় নির্মিত হইয়া থাকে ; কখনও বা ‘কারোৎসর্গ’ অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখা যায়। যেতদ্বয় সম্প্রদায়ের তীর্থঙ্করগণের ধাতুগঠিত প্রতিমূর্ত্তি-সমূহ “পঞ্চভৌতী” (অর্থাৎ একই ধাতুকলকে পাঁচ জন জৈনতীর্থঙ্করের মূর্ত্তি) হিসাবে নির্মিত হইয়া থাকে। চতুর্ধ্বংশিত তীর্থঙ্করের এক জনের প্রতিমূর্ত্তি তাহার মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ties, is a very fine piece of Architecture. Its vaulted roof is a perfect model of the most ancient style of dome in the East probably invented anterior to the Romans.*

* “Hindu Art including Jain and Buddhist, in the comprehensive term, is the real Indian Art.” V. A. Smith, *History of Fine Arts in India and Ceylon*.

তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট। মধ্যবর্তী তীর্থস্থরের উভয় পার্শ্বের দুইটি মূর্তি ‘কারোৎসর্গ’ অবস্থায় দণ্ডায়মান; আর দুইটি মূর্তি, দণ্ডায়মান মূর্তি দুইটির পার্শ্বে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে পদ্মাসনে স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত দেবদেবীর মূর্তি, এবং তাহার চতুর্পার্শ্বে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট অবস্থায় চারণ গায়ক প্রভৃতির মূর্তি-সমূহ এবং চিত্তিমূর্তি বিশেষ কোতুললপ্রদ। ভাস্কর্যের জ্ঞান জৈনগণের চিত্রশিল্পও বিশেষ চিত্তাকর্ষক। সূচিকণ রেখাপাত—চিত্রশিল্পের প্রাণস্থানীয়। চিত্ররেখার সৌন্দর্য—আলঙ্কারিক চিত্রশিল্পের বিশেষত্ব। চিত্রকলার জৈনগণের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন সর্বত্র পরিস্ফুট। আলঙ্কারিক চিত্রকলার চীনাগণের শ্রেষ্ঠত্ব অনেকই খ্যাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু চীনাগণ সে বিষয়ে ভারতের নিকট স্বীকী,—এ কথা সকলেই এখন স্বীকার করিতেছেন। পৌরাণিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জৈনগণ চিত্রসাহায্যে প্রকটিত করিতেন। চীনাগণের চিত্রশিল্পে তাঁহাদের অঙ্করণ পরিস্ফুট, পণ্ডিতগণের ইহা অভিমত। যাহা হউক, ভাস্কর্য্যে এবং চিত্রশিল্পে জৈনগণ যে অদ্বিতীয় ছিলেন, গুহা-মন্দির প্রভৃতি হইতে তাহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হয়। ভাস্কর্য্য—ইতিহাসের একতম স্তর বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। অশ্রাব্য উপাদানের মধ্যে প্রাচীন-কালের ভাস্কর্য্য এবং চিত্রশিল্প ইতিহাসের অন্ততম উপাদান। জাতীয় ইতিহাসের আলোচনার ভাস্কর্য্যের ইতিহাস তাই আলোচনার বিষয়। জৈনগণ যেমন অধ্যাত্ম বজ্ঞানে তেমনি ভাস্কর্য্য-বিষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভন করিয়াছিলেন,—প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনার তাহা প্রতিপন্ন হয়।

জৈনধর্ম্ম-সম্বন্ধে এবং চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্য বিষয়ে বলিতে গেলে, আরও অনেক কথা বলিতে হয়। বলিতে হয়,—পাশ্চাত্য-মতে ভারতের ইতিহাসের যে আরম্ভ, তাহা ঐ তিনের

সম্বন্ধেই সংস্কৃতি হইয়াছিল! বলিতে হয়,—ভারতের ‘প্রাগ্-ঐতি-

উপসংহার। হাসিক কাল’ বলিয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ যে সময়টিকে নির্দেশ

করিয়া গিয়াছেন, সেই সময়ের নিয়ন্তা-রূপে ঐ তিনের প্রাধান্যই পরি-দৃষ্টমান দেখি! বলিতে হয়,—ভারতের অধুনিক ধারাবাহিক ইতিহাসের যে ভিত্তিভূমি, ঐ তিনের সংযোগেই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! আরও বলিতে হয়,—খৃষ্ট-জন্মের প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে, অধুনা-সমুখিত সভ্য-সমুন্নত জাতি-সমূহের অস্তিত্বের অঙ্কুর বখন উল্লগত হয় নাই—তখনও, ভারতে সকল কলা, সকল বিজ্ঞা, সকল বিজ্ঞান যে ক্ষুণ্ণ-লাভ করিয়াছিল; তাহার নিদর্শন—জৈনধর্ম্মে, চন্দ্রগুপ্তে-চাণক্যে, আগম-সূত্রে ও অর্থ-শাস্ত্রে, কেমন অক্ষর সূত্রে সংপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে! মহাভারতে কুরু-পাণ্ডবের মহাসমরে ভারতের ইতিহাসের একটা পরিচ্ছেদ যেমন শেষ হইয়াছে, জৈনধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার—চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের অভ্যুদয়ে, তদুপ আর একটা নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের বিজ্ঞান, জ্ঞানের, সভ্যতার, গৌরবের—এ এক অভিনব স্তর।

নির্ঘণ্ট ।

অ ।

অকম্পিত ১২৩
অক্রিয়াবাদ ৫৫, ৫৬
অগন্ধন ১২৩
অগ্নিদত্ত ১২৫
অগ্নিভর—নিবারণ-ব্যবস্থা প্রাচীন
ভারতে ৪১১—৪১২
অগ্নিতত্ত্ব ১২৩
অগ্রপূজা ৯০
অঙ্গ ৪০, ৪১, ৪৮
অঙ্গপূজা ৯০
অঙ্গুষ্ঠরনিকায়—জৈনধর্ম বিষয়ে
অভয়ের কথা-প্রসঙ্গে ৩২
অচলভ্রাতৃ ১২৩
অচেলক ৫৮, ৫৯
অজাতশত্রু ১০১—১০২
অজিৎ ১৭৫
অজিতকেশকবলী ৫৪
অজিতনাথ ১১৬
অজীব ৭৮, ৮৪, ৯০, ১০৬, ২২৪
অজীবক ৫৮, ৫৯
অজ্ঞানতা—তাহার কারণ-
পক্ষ ১৬৪
অজ্ঞানী ১৫৫, ১৬৪
অজ্ঞানবাদ ৫৬, ৫৮
অগোজা ১০০—১০১
অতিচারদণ্ড ২৮৮
অধর্ম—জৈন-দর্শনে ২০৪
অনন্তনাথ ১১৬
অনন্তবীৰ্য্য ৭৮
অনাসক্ত—তদ্বৃষ্টান্ত ১৬৬
অদ্বাধি ৩৮৩—৩৮৪
অপবিত্রা—স্বরূপ ১৫৫
অক্রেষ্ট (থিয়োডোর)—জৈনধর্ম-
সংক্রান্ত আলোচনায় ৬৫
অদ্বৈতিক ৩৮৫

অবসর্পিনী ২৫, ১১৫—১১৬
অবকাশ—বিচারাদি প্রসঙ্গে
২২২—২২৩
অভয় ৩২
অভয়দো ৫১
অভিনন্দ ১১৬
অধাপালী ১১১
অয় ১৭৪—১৭৫
অরনাথ ১১৬
অরিষ্টেনেস ৩৫, ৪৭, ১১৫;
পুরাণ ১০২
অর্থশাস্ত্র—আবিষ্কার প্রসঙ্গে ও
প্রণেতৃ-বিষয়ে ২৫২—
২৫৯, ২৬১, ২৬৩, ২৭২;
প্রাচীন ভারতে লোক-
গণনা বিষয়ে ২৭৬—২৮০;
জরিপ-প্রথা-বিষয়ে ২৮০;
ব্যবহার-বিধি সম্বন্ধে ২৮৫;
বিচারালয়—সংগঠন বিষয়ে
২৮৭—২৮৯; ব্যবহার-
প্রণালী বিষয়ে ২৮৯—
২৯০; সাক্ষি-ব্যবস্থা বিষয়ে
২৯৫, ২৯৬, ২৯৮; সাক্ষীর
সত্য-পাঠ-বিষয়ে ২৯৯;
আপিলের ব্যবস্থা বিষয়ে
৩১০; বিচারকের দণ্ড
বিষয়ে ৩০৯; চুক্তি বিষয়ে-
৩১১, ৩১২, ৩১৭—৩১৯;
পরোক্ত দোষ বিষয়ে ২৯১;
বর্গ, লক্ষ্য, বেতন প্রভৃতি
বিষয়ে ৩২০; ব্যবহার
সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে ৩২১,
৩২৫; আধি বিষয়ে ৩৩১;
উপনিধি (গচ্ছিত) বিষয়ে
৩৩২; ঋণ-বিষয়ে ৩৩৭,
৩৩৮; কৃষীদ বিষয়ে ৩৪৩;
ক্রয়-বিক্রয়-প্রসঙ্গে ৩৬৪—

৩৬৮; তুল্যদণ্ড বিষয়ে ৩৭৪;
কৃষক ও ব্যবসায়ীগণের
সম্বৎ প্রভিষ্ঠা বিষয়ে ৩৭৭;
কৃষকের বেতনাদি সম্বন্ধে
৩৭৯; বৈদেশিক বাণিজ্য
বিষয়ে ৩৮৩; রাজপথাদি-
বিষয়ে ৩৮৬, ৩৮৮—৩৯১;
যানাদি-প্রসঙ্গে ৩৯২; জন-
হিতকর বিধান ৩৮৫;
পথ-প্রসঙ্গে রাজ-কর্তব্য
৩০৩—৩০৪; বৈদেশিক
বাণিজ্য ও জলযান বিষয়ে
৩০৬—৩০৯; চিবিৎসার-
ব্যবস্থা বিষয়ে ৪০৪, ৪০৬;
বিষপরীক্ষা বিষয়ে ৪০৫;
ভেজাল ও চিকিৎসকের
দণ্ড বিষয়ে ৪০৮; মহামারী
নিবারণে ৪০৯; শব-ব্যব-
চ্ছেদে ৪১০; দুর্ভিক্ষ দমনে
ও অগ্নিভর নিবারণে ৪১১—
৪১২; বায়ুবিজ্ঞানে ৪১৪;
খনিজ বিজ্ঞানে ৪১৬; বিবিধ
জনহিতকর বিধান ৪১৩;
জুলক্ষণে খনির বিস্তারিততা
স্থির ৪১৭; ধাতুর গুণধর্ম
নির্ণয় ৪১৮; ধাতু বিস্তার
করিবার প্রথা ৪১৯; জল-
সেচন ব্যবস্থার ৪২০—
৪২১; পান্যাদির খাত ও আদ্য-
ব্যবস্থার ৪২৫-৪২৬; চারণ-
ভূমি বিষয়ে ৪২৭; অশ্বের
পোষণ ও বিভাগাদি ৪২৯—
৪৩২; পশুপালন-ব্যবস্থার
৪২১—৪৩৭; হস্তি-পালন
ব্যবস্থার ৪৩২; জনসাধা-
রণের শিক্ষা-ব্যবস্থার ৪৩৭
—৪৩৯; কোটিকা দ্রষ্টব্য ।

অর্হৎ ১০, ৩২, ৭২, ৯৮ ; মহা-
বীর হইলেন ১০৭ ; পাখ
হইলেন ১১৪
অর্হৎদত্ত (অরিহাদত্ত) ১২৬
অশোক (বর্দ্ধন) ২৩ ; রাজ-
চক্রবর্তী ১২৬ ; তাঁহার
অমুশাসনে উপাধি-বিষয়ে
২৫৯, ২৬০
অশোক—চক্র ২৫০
অশ্ব—তাঁহাদের পালন, বিভাগ
ও শিক্ষা প্রভৃতি ৪২২ ;
তাঁহাদের রক্ষণ, বিভাগ,
স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ৪২৮—৪৩১
অশ্বসেন ১১৪, ১৭৫
অশ্বাধ্যক্ষ ৪২৩, ৪২৮—৪৩১
অষ্টমারা ৮২
অষ্টাদশী ২৫, ২৬
অষ্ট্রিয়া—লোকগণনা ২৮২ ;
জাতীয় ঋণ ৩৫৯ ;
অগ্ন্য—দর্শন-মতে ২৪০, ২৪১
অগ্রচিকিৎসা—প্রাচীন ভারতে
৪০২—৪০৩, ৪০৬, ৪০৯
অস্থাবর—বিক্রয়-বিধি ৩৬৬
অস্থিক (অস্থি অস্তি) গ্রাম ১০৭
অস্বমিবিক্রয় ২৮৮, ৩৬৮—৩৭০
অহিংসা—বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু-
দর্শ্যে ২৫—২৭ ; জৈনধর্মের
সাদৃশ্য ৯১ ; যাজ্ঞবল্ক্যের
উক্তিতে ৯২ ; শব্দের অর্থ
১৫১

আ ।

আইন—তামাদি ৩৫৪, চুক্তি
ব্যবহার দ্রষ্টব্য ।
আইগিস ১৯
আকর-কর্ম, আকরাদ্যক্ষ ৪১৬ ;
তৎসংক্রান্ত বিবিধ জাতব্য
তত্ত্ব ৪১৬—৪১৯
আকাশ—জৈনদর্শন মতে ২২৪
আগম ৩৮, ৫২

আচার্য—সূত্র ৪১, ৪৩—৪৫ ;
কল্পসূত্রের তুলনায় ৪৭ ;
ক্রিয়াবাদ-বিষয়ে ৩৩ ; বিবিধ
প্রসঙ্গে ৪৯, ৬৩, ১১১, ১১৮
—১১৯, ১২১—১১২, ১৩৯,
১৪১—১৪২, ১৯৪
আজগর—ব্রত ১১৮
আড়া ২৫
আত্রেয় ৪০৩
আদর্শ রাজ্য—তাঁহার লক্ষণ
২৭৩
আদান-সমিতি ৮৩
আদি-পদার্থ ৬১
আদেশ ৩৮৩—৩৮৪
আদি ৩২৫, ৩২৮—৩২৯
আপত্ত্ব—সূত্র-রচনা-কাল ৩১
আপিল—তাঁহার ব্যবস্থা, প্রাচীন
ভারতে ৩০৯
আফ্রিকা—লোকসংখ্যা ২৮৩
আমদানী রপ্তানী ৩৯৯ ; বাণিজ্য
দ্রষ্টব্য ।
আমাসিস্ (মিশর রাজ)—
লোক-গণনা প্রসঙ্গে ২৮১
আমেরিকা-যুক্তরাজ্য —লোক-
গণনা বিষয়ে ২৮২—২৮৩ ;
জাতীয় ঋণ ৩৬০ ; ঋণ
জনিত শাস্তি ৩৬১ ;—উত্তর
ও দক্ষিণ লোকসংখ্যা ২৮৩
আয়রলণ্ড—লোক-গণনা প্রসঙ্গে
২৮২ ; সূদ-গ্রহণ-বিষয়ে
৩৪৮ ; ঋণকারীর দণ্ড
বিষয়ে ৩৬১
আরম্ভবাদ ২০৫—২০৯
আরিয়াদিন (আর্ঘ্যদত্ত) ১১৫
আরিয়ান—ভিষক বিষয়ে ৪০৪
আর্য্যাবিপালিতা ১২৬
আর্য্যকুবেয় ১২৬
আর্য্যবোধ ১১৫
আর্য্যভাগস ১২৬
আর্য্যদত্ত ১২৬
আর্য্যপদমাল ১২৬

আর্য্যাপদ ১২৬
আর্য্যবজ্ঞ ১২৬
আর্য্যব্যক্ত ১২৩
আর্য্যব্যক্তিণী ১১৫
আর্য্যবথ ১২৬
আর্য্যব্রজিত সূরি ৫১
আর্য্যব্রহ্মণ ১২৫
আর্য্যব্রহ্মণ ১১৩
আর্য্যসেনিক ১২৬
আলেকজান্ডার — ভারতগমন
বিষয়ে ২৪৩, ২৪৮ ২৬৪,
২৬৯, ২৭১—২৭২, ২৭৬,
৩৬৪, ৪০৪
আশুভূতকপটীকা ২৮৮, ৪১০
আশ্রব (আশ্রব) ৭৮, ৯২, ২২৪
আসক্ত—জন ১৬৬
আসক্তি—ভাগ বিষয়ে ১৯৪
আসেধ ২০০

ই ।

ইংলণ্ড—লোক-গণনায় ২৮২ ;
সূদ-গ্রহণ বিষয়ে ৩৪৬—
৩৪৯, ৩৫৯ ; জাতীয় ঋণ
৩৬০ ; ঋণ কারাদণ্ড
বিষয়ে ৩৬১
ইউরোপ—লোকগণনায় ২৭৬,
২৮২—২৮৩ ; ঋণকারীর
কারাদণ্ড বিষয়ে ৩৬১
ইউল—উদয়ন-সম্বন্ধে ২৭১
ইজরেল (জাতি)—লোক
গণনা বিষয়ে ২৮১ ; ঋণ-
বিধি-সম্বন্ধে ৩৫৬—৩৫৮
ইজিকেল—সূদ-গ্রহণে মোজেষের
নীতি বিষয়ে ৩৪৪
ইটালী—জাতীয় ঋণ ৩৫৯ ;
ঋণ কারাদণ্ড বিষয়ে ৩৬১
ইন্দ্রদত্ত (ইন্দ্রদিস) ১২২, ১২৬
ইন্দ্রদেব—মহাবীরের পরীক্ষা ও
দীক্ষা প্রসঙ্গে ১০২, ১০৪ ;
ভূষণ-ভাগ প্রসঙ্গে ১৬০—
১৬২ ; শক্রদেব দ্রষ্টব্য ।

ইঙ্গুভূতি ৪২, ৪৩, ১০৮, ১২৩
ইঙ্গু সংঘম—সার উপদেশ ১৪৮
—১৪৯
ইয়া ১৮
ইয়ুল—চাপক গ্রাম সম্বন্ধে ২৫৪
ইত্তকার ১৬৮

ঈ ।

ঈর্গা সমিতি ৮২
ঈর্গা-সমিতি ৮২, ৮৩

উ ।

উইলসন ৩৪৭ ; এটচ এইচ—
ভারতের চিকিৎসা-বিজ্ঞান
বিষয়ে ৪০১
উইলিয়মস্ (মনিয়র)—ক্রয়-
বিক্রয় বিষয়ে ৩৬২
উচ্চার-সমিতি ৮৩
উত্পাদন-দোষ ৮২, ৮৩
উৎসর্গিনী ২৫
উত্তর ১২৫, ৩০০
উত্তরাধারন-সূত্র—উহার সংক্ষিপ্ত
পরিচয় ৪৬—৪৭ ; মুক্তি-
বিষয়ে ৩২-৩৩ ; ইংরাজী
অভিবাদ ৬৩ ; তিন বণিকের
বিষয়ে ১৫৮ ; সঞ্জয় উপা-
খ্যানে ১৭৪ ; ব্রাহ্মণ বিষয়ে
১৮ ; দ্রঃশনাশ-বিষয়ে ১৮৮ ;
রমণী-সঙ্গ পরিহার বিষয়ে
১৮৯ ; বিবিধ প্রসঙ্গে ৮৯,
১০৯, ১২৪
উদয়ন—রাজ্য ২৭০—২৭১,
রাজা ১৭৪—১৭৫
উদায়িন (উদায়ী) ১০১, ২৫০
উদয়ন-দোষ ৮২
উদ্ভিদ—ভাহাদের জীবন ও
সংজ্ঞা বিষয়ে ১৩২
উপনিধি—২৮৮, ৩১১, ৩৩২—
৩৩৩, ৩৩৫, ৩৬৮, ৩৮৪

উপনিপাত-প্রতিকার ২৮৮
উপাঙ্গ ৪১
উপানন্দ ১২৪
উপালী ৩৩—৩৪
উমাস্বামী ৪৯, ৫১
উলুক ৬৩
উম্মার ১৬৮

ঊ ।

ঊষেদ—চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অস্ত্র-
চিকিৎসা বিষয়ে ৪০২
ঊজুমতি ১২৪
ঊর্ণ—চুক্তি বিষয়ে ৩১১ ; তৎ-
সংক্রান্ত প্রাচীন ও আধুনিক
বিবিধ-বিধান ৩৩৬—৩৬১
ঊর্ণাদানম্ ২৮৮, ৩৩৬
ঊষভদন্ত ২৫, ৯৭
ঊষভদেব—তাহার পূজা ৯০, ৯৭
. আদি তীর্থঙ্কর ৯৩, ১১৫-
১১৬ ; তাহার জীবনী ১১৬
—১১৭ ; শ্রীমদ্ভাগবতে
ঊষভদেব প্রসঙ্গ ১১৭—১২১,
তাহার শত পুত্র ১৩৪ ;
বিবিধ প্রসঙ্গে ১৩২—১৩৩,
১৭৪
ঊষভসেন ১১৭
ঊষিগুপ্ত কাকন্দক ১২৬
ঊষদন্ত ১২৬

এ ।

একাজবধনিজ্জয় ২৮৮
এক্সোডাস—লোক-গণনা বিষয়ে
২৮১ ; সূদ-গ্রহণ বিষয়ে
নীতি ৩৪৪
এড্‌ওয়ার্ড (যর্ক) সূদ-গ্রহণ
সংক্রান্ত বিধি ৩৪৬
এজেন্ট—তদ্বারা কার্য সম্পাদন
প্রাচীন ভারতে ৩২১, ৩৬৮
প্রতিনিধি দ্রষ্টব্য ।

এথেন্স—প্রথম লোক গণনা-
পদ্ধতি ২৮১ ; সূদ গ্রহণ-
বিষয়ে ৩৪৫
এপিকিউরাস—মত ১২
এমিল-সন্ধি ৩৬০
এম্পথিল (লর্ড)—ভারতে
চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে
তাহার মন্তব্য ৪০১
এলিজাবেথ—সূদগ্রহণ-সংক্রান্ত
বিধি ৩৪৬
এসিয়া—লোকসংখ্যা ২৮৩

ও ।

ওরাইজ—ভারতের চিকিৎসা-
বিজ্ঞান বিষয়ে ৪০১
ওয়াটার্লু যুদ্ধ ৩৬০
ওয়েবার — জৈনধর্ম সংক্রান্ত
আলোচনায় ৬০, ৬৩—৬৪ ;
জৈনধর্ম হইতে বৌদ্ধ-ধর্মের
উৎপত্তি বিষয়ে ১১০ ;
চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে ৪০১
ওয়েটারগার্ড—চক্ষুগুপ্ত সম্বন্ধে ৫৯
ওল্ড টেষ্টামেন্ট—লোকগণনা-
বিষয়ে ২৮১
ওসিরিস ১২
ওসেনিয়া—লোকসংখ্যা ২৮৩

ক ।

কগাদ ৬২—৬৩ ; পরমাণুবাদ
দ্রষ্টব্য ।
কণ্টক-শোধন—তৎসহ কোজ-
দারী বিচারালয়ের সাদৃশ্য
২৮৭ ; উচ্চাতে যে সকল
বিষয়ের বিচার হইত ২৮৮
কঙ্কাপ্রকর্ষ ২৮৮
কপিল ১৯৭ ; সাংখ্যমত দ্রষ্টব্য ।
কপিলবাস্ত ১০৯
কবির—বকন ও নির্বকন বিষয়ে
মত ২৪৪

কমনওয়েলথ ৩৪৭
কমন ল ৩৪৮
কমলাবতী ১৬৮
কর্ম—অষ্টবিধ ৭৫, ৯২; ত্রিবিধ
বিভাগ ৯২
কর্মসূচী—৩৮৭—৩৮৯
কলকণ্ডু ১৭৪
কলাবিজ্ঞা ১৩৩
কলশাস্ত্র ৫২
কলসূত্র—জৈনধর্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ
চওরা বিষয়ে ৩৮; উহার
স্থল পরিচয় ৪৭—৪৮; ইউ-
রোপে উহা প্রকাশ ৬৩;
মহাবীর শ্রমীর জীবনী-
বিষয়ে ৯৩—৯৬ ১০৩;
স্ববিরগণের নাম-পরিচয়
১২৭; বিবিধ-প্রসঙ্গে ৫১,
৪৯, ৫০, ১১৬, ১১৮, ১২৩;
রাজসভা, রাজ অট্টালিকা
প্রভৃতির বর্ণনা ১২৯—১৩২
কল্যাণক ৪৭
কলু-কভট ৩৬২
কার্ডাক্সলেট ৩৫৯
কাত্যায়ন—ব্যবহার-বিধি প্রসঙ্গে
২৩৯, ৩২৪
কাকন্দক ১২৬
কাম (কামনা)—জয়-বিষয়ে
১৯২—১৯৩
কামন্দক—২৫৫—২৫৬; তাঁহার
নীতিসারে চাণক্যের বন্দনা
২৫৫
কামর্জি (কামিজি) ১২৫
কায়গুপ্তি ৮৩
কারুকররক্ষণ ২৮৮, ৪৪৪
কার্ণ—চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে ৩৯
কার্ণগ-শরীর ৯২
কাল ২২৪
কালক ১২৭
কালিকচাৰ্য্য ৪৯
কালিদাস—বিবিধ প্রসঙ্গে ২৫০,
২৫২, ২৫৬, ২৫৮, ২৬২

কাশীরাজ ১৭৪, ৪০৩
কুকুৎস্থ ১৭৫
কুণিক ১০১, ১১২, ২৫০
কুঘু ১৭৪—১৭৫
কুম্ভগ্রাম (পুর) ৯৫, ৯৯, ১০৪
১০৯—১১১
কুম্ভা—তৎসাদৃশ্য বাইবেলে ১৮
কুমারপাল ৫২
কুল—জৈনধর্মাবলম্বিগণের ১২৩
—১২৪
কুলাব ৪২১
কুলীনগর ১১০
কুসৌদ—তৎসংক্রান্ত প্রাচীন ও
আধুনিক বিধি-বিধান ৩৩৭,
৩৪৩, ৩৪৫, ৩৫০; স্মৃদ
দ্রষ্টব্য ।
কুপাধাক্ষ ৪২৩
কৃষ্ণ-হরি ৪৩
কেবল ৪২, ৬৭, ১০৯
কেবলী ৪২, ৪৯, ৫০, ৬৭;—মহা-
বীর হইলেন ১০০; নিগ্রহ
সম্বন্ধে উক্তি ১৪৪—১৪৮
কৈবল্য ২৪০
কেশব ১৯২
কেশী ১৮১—১৮৬
কোড়ি (কোড়িস) ১২৬
কোড়গুপ্ত ৩৪
কোল্পানী—গঠন-প্রাচীন ভারতে
৩৮১; সম্ভূত-সমুখান দ্রষ্টব্য ।
কোশাভিসংহরণ ৩৯১
কেশালী ১১৬
কৌটিল্য—তাঁহার পরিচয় ২৫৪
—২৬০, ২৭২; চুক্তি আইন
প্রসঙ্গে ৩১৯—৩২২; আধি-
বিষয়ে ৩২৪; ঋণ-প্রসঙ্গে
৩৩৭—৩৪০; নিক্ষেপ ও
উপনিধি-বিধানে ৩৩৪—
৩৪৫, ৩৪৩; ঋণাদান,
তামাদি প্রভৃতি বিষয়ে
৩৫১; মোজেসের বিধানে
তাঁহার সাদৃশ্য ৩৫৬; রাজার

নিরাপদ বিষয়ে ৩৯৬; জন-
হিতসাধনে ৩৯৪; স্থলপথের
প্রাধিকার বিষয়ে ৩৯৫; জল-
যানাদি প্রসঙ্গে ৩৯৬—
৩৯৭; শুদ্ধ-নির্দারণে ৩৯৯;
বিষপরীক্ষার ও ভৈষজ্য-
বিষয়ে ৪০৬—৪০৭; শব-
ব্যবচ্ছেদে ৪১০; দ্রুতক
নিবারণে ৪১১; বায়ুবিজ্ঞানে
৪১৫; খনিজ-বিজ্ঞান ৪১৬;
বিবিধ জনহিতকর বিধানে
৪১৪; ক্রয়-বিক্রয়-বিষয়ে
৩৬৪—৩৬৮, ৩৭০—৩৭২;
পণ্যদোষ বিষয়ে ৩৭৩;
ভোজ্য বিষয়ে ৩৭৪; বাস্ত
বিক্রয় বিষয়ে ৩৭৬;
সজব-প্রসঙ্গে ৩৭৭—৩৭৮;
ভূত্যা-প্রসঙ্গে ৩৭৯—৮০;
বাণিজ্য প্রসঙ্গে ৩৮২—
৩৮৪; জনহিতকর বিধানে
৩৮৫; রাজপথাদি বিষয়ে
৩৮৬—৩৯১; যানবাহনাদি
বিষয়ে ৩৯১—৩৯২; খনি
বিষয়ে ৪১৭; খাত্ত বিস্তৃতি-
করণে ও কর নির্দারণে
৪১৮—৪১৯; জলসেচন
ব্যবহার ৪২০—৪২১; পশু
পালন প্রসঙ্গে ৪২৩; পশু-
ক্লেশ দামে দণ্ড বিষয়ে ৪
চারণ-ভূমি সম্বন্ধে ৪২৬—
৪২৭; অশ্বের শিক্ষা ও
চিকিৎসা বিষয়ে ৪৩০—
৪৩১; হস্তিপালন বিষয়ে
৩৩২; পক্ষি-সংরক্ষণ বিষয়ে
৪৪৬; জনসাধারণের শিক্ষা
বিধানে ৪৩৬—৪৩৯; অর্থ-
শাস্ত্র ও চাণক্য দ্রষ্টব্য ।
কৌতুক ১২৬
ক্যাটালোগস ক্যাটালোগোরম
৬৫
ক্যাথারিন—স্মৃদ প্রসঙ্গে ৩৪৮

ক্রমওয়েল—অন্যসঙ্গে ৩৪৭
ক্রিষ্টাব্দ ৩৩, ৫৫, ৫৬
ক্রীতদাস—ঋণ-সম্বন্ধে ৩৫৬-৮
ক্রাউট—জৈন-ধর্ম্মালোচনায় ৬৩—
৬৪
কণিকবাদ ৭৯, ২১৫
কমপ্রমণ দেবর্জি ১২৭
কেশমা ৫৮

খ।

খনি—ভূ-পরীক্ষায় নির্ধারণ ৪১৭,
৫২০
খনিজ-বিজ্ঞান ৪১৬—৪১৭
খরতরগচ্ছ (বৃহৎ) ৫০—৫১
খুট ১৮, ৩৫৮; বীতখুট দ্রষ্টব্য।
খোমা (ফোমা) ৫৮
খোয়াড়—প্রাচীন ও আধুনিক
বিধি ৩৭০

গ।

গঙ্গারাজী ২৭২
গঙ্গারিদে দেশ ২৭১—২৭২
গচ্ছ ৫০, ৬৪, ১২৩
গচ্ছিত—তৎসংক্রান্ত প্রাচীন ও
আধুনিক বিধি ৩৩২-৫
গণ—তৎপরিচয় ১২২—১২৮;
পার্শ্বদেবের ১১৫; অরিস্টে-
নেমির ১১৫; ঋষভদেবের
১১৭
গণধর—তৎপরিচয় ১২২—
১২৮; পার্শ্বদেবের ১১৫;
অরিস্টেনেমীর ১১৫; ঋষভ-
দেবের ১১৭
গণিকাধ্যক্ষ ৩৯১—৩৯৩
গন্ধ—তাহাতে বীতস্পৃহা ১৯১
গন্ধন ১৯৩
গন্ধভিল ২৪৯
গর্ভব্যায়িসংস্থা ৪০৪
গাথা—তাহার মধুনা ১১৯,
১২৮; প্রাচীন ১০৩, ১০৬

৬৪—৫৭

গাভী—তাহাদের প্রতিপালন
ব্যবস্থা ৪২৪
গায়ত্রী—জৈনদের ৯০
গুণ ৬১
গুপ্তচর—তাহাদিগের নিয়োগ-
প্রথা ২৭৮, ২৯৬
গুপ্তবংশ—তাহার আদি বিষয়ে
আলোচনা ২৭২
গুপ্তি ৭৩, ৮২—৮৩, ১০৫, ১৬০
গুরু—সৎ ও অসৎ ১৫১—১৫২
গুটাজীবিনাং রক্ষা ২৮৮
গোহধ্যক্ষ ৩৯১—৩৯২, ৪২৩,
৪২৫—৪২৮
গোপগণ ২৭৭—২৭৯
গোবিন্দ-ভাষ্য—সাংখ্যাদির মত
খণ্ডনে ১৮৬—২৩৮
গোবিন্দ—টীকাকার ৩০
গোদাস—১২৫
গোসাল (মক্ষলি) ৫৬, ৫৮—
৬০, ১১০
গৌতম—বুদ্ধ ১৫ (বুদ্ধদেব
দ্রষ্টব্য); মহাবীরের শিষ্য
৪২, ৪৯, ৫০; তৎপ্রতি
মহাবীরের উপদেশ ১৬২—
১৬৪; কেশী গৌতম প্রসঙ্গে
১৮১—১৮৬; সাক্ষি-বিষয়ে
২৯৭; সংহিতাকার ৩২১;
সূত্র-সত্য-মিথ্যা প্রসঙ্গে
৩২৩; ব্যবহার বিষয়ে ৩১৭;
আধিবিষয়ে ৩৩০; ঋণ
বিষয়ে ৩৩৭, ৩৪১; দান-
বিষয়ে ৩৫১; তামাদি বিষয়ে
৩৫২; স্নান গ্রহণ বিষয়ে
৩৪৫—৩৪৬; গৌতম-সূত্রের
সহিত জৈন-বিধির সাদৃশ্য
২৭—২৮; সূত্র রচনা-কাল
৩১; বিবিধ প্রসঙ্গ ৩৭০,
৩৭২, ৩৮০
গ্রীস—স্নান-গ্রহণ বিষয়ে ৩৪৫—
৩৪৬; অধমর্গে আধিপত্য
বিষয়ে ৩৫৮; চাক্ষুণ্য-

বিজ্ঞান ভারতের নিকট ঋণী
৪০১

গ্রেটব্রুটেন—লোক-গণনা-প্রসঙ্গে
২৮২—২৮৩; জাতীয় ঋণ
৩৫৯—৩৬০; ইংলণ্ড দ্রষ্টব্য।
গ্রোট—স্নানগ্রহণ প্রসঙ্গে ৩৪৫

ঘ।

ঘাণেশ্বর—তাহার সার্বিকতা
১৪৯

চ।

চন্দেব ৫১
চতুরাশ্রয় ১৫, ৩৫
চন্দনা ১০৮
চন্দ্রগুপ্ত—জৈন মূর্তি ২৩;
তাহার সিংহাসন আরোহণ
বিষয়ে ৩৯; রাজচক্রবর্তী
২৪৩, ২৬৯, ২৭০; জৈন-
গণের সহায়তা-প্রাপ্তির
বিষয়ে ২৪৪; তিনি কোন্
ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ২৪৫;
তাহার রাজত্ব-কালে হ্রাভিক্ষ
২৪৬; তিনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী
২৪৭; তাহার অভ্যুদয়-কাল
২৪৭—২৫০; তাহার অম-
রত্বে চাণক্য ২৫০—২৫২;
চাণক্যের সহিত তাহার
মিলন ২৬০—২৬৩; তাহার
শাসন-প্রণালীর নিদর্শন ২৬৩
—২৬৪; তাহার বংশ-পরিচয়
২৬৪; তাহার সম্বন্ধে বিবিধ
কাহিনী ২৬৫—২৭০; তিনি
বাল্যলীকিত ২৭০—২৭২;
লোক-গণনা প্রসঙ্গে ২৭৬;
তাহার রাজত্বে অরিশের
বিষয় ২৮০; বিবিধ প্রসঙ্গে
৪২০; অশ্বশাস্ত্র, চাণক্য,
ব্যবহার-বিধি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

চন্দ্র প্রভ ১১৬
 চন্দ্রমেশ ২৭১
 চন্দ্রহরি ৫১
 চন্দ্রা ২৫০
 চাঁচল ৫১
 চাঁপক (চানক) ১৫৪, ২৫৮—
 ২৫৯
 চাঁপক—চন্দ্রশুপ্তের প্রতিষ্ঠায়
 ২৫০—২৫২; তাঁহার অসা-
 ধারণত্ব ২৫২—২৫৬; তাঁহার
 কোটিল্য নাম ২৫৪, ২৫৬;
 তিনি অর্থশাস্ত্রের প্রণেতা
 ২৫৬—২৫৭; তিনি বাঙ্গালী
 কিনা ২৫৮—২৬০; চন্দ্র-
 শুপ্তের সহিত তাঁহার মিলন
 ২৬০—২৬৩; তাঁহার কৃতি-
 ত্বের নিদর্শন ২৬৩; তিনি
 চন্দ্রশুপ্তের দক্ষিণহস্তস্থানীয়
 ২৭২; তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ
 কিংবদন্তী ২৬১, ২৬২, ২৬৭;
 তাঁহার বিভিন্ন নাম ২৫৩—
 ২৫৪, জনসংখ্যা নির্ধারণ
 ২৭৬; বিচারকের দণ্ড
 বিষয়ে ৩১০; যান-বাহন
 প্রসঙ্গে ৩৯১—৩৯৩;
 চিকিৎসা-ব্যবস্থায় ৪০৪;
 হস্তীর শিক্ষা-বিধান, প্রতি-
 পালন প্রভৃতি বিষয়ে ৪৪৩
 ৪৩৬; সর্কজীবের স্ব-
 বিধানে ৭ বিভাগবিষয়ে ৪৩৭;
 হস্তিপালন বিষয়ে ৪৩৫—
 ৪৩৭; শিক্ষা-বিষয়ে ৪৩৭—
 ৪৩৯; সর্ক বিষয়ে ভারতের
 শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে ৪৩০—৪৪০;
 আর্যিকী শাস্ত্র-চতুষ্টয়
 প্রসঙ্গে ৪৩৭—৪৩৮;
 কোটিল্য, অর্থশাস্ত্র, ব্যব-
 হার-বিধান, ঋণদান
 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।
 চার্লসভূমি ৪২২, ৪২৭—৪২৮
 চাকাক—মত ১২, ১৩

চালস (বিত্তীয়)—সুদের হার
 বিষয়ে ৩৪৭
 চিকিৎসা-বিজ্ঞান—প্রাচীন ভারতে
 ৪০১—৪০৮
 চিত্তবৈর্য—তাহার স্বরূপ ১৪০
 চিত্র ১৬৬—১৬৮
 চীন—লোক-সংখ্যা ২৮১, ২৮৩;
 ঋষভদেবের আধিপত্য ১৩৪
 চুক্তি—প্রকার-ভেদ ৩১০—
 ৩১২; সংহিতা মতে চুক্তির
 বিষয় ৩১৩; ভারতীয় বর্ত-
 মান চুক্তি আইনের সহিত
 প্রাচীন ভারতের চুক্তি-বিধির
 সাদৃশ্য ৩১৫—৩১৮; তিরো-
 হিত চুক্তি ৩১৮; কোম্পানী
 গঠন বিষয়ে ৩৮১; জন-
 হিত-সাধনে ৩৮৫; বিবিধ
 প্রসঙ্গে ৩২০—৩২১; চুক্তি
 বিষয়ক ঋণ ৩৬১; আইনে
 কোটিল্যের আদর্শ ৩৮৩—
 ৩৮৪; বিক্রয় বিষয়ে ৩৬৬
 চটক ১০১, ১১২
 চেল্লনা ১০১
 চোরাই মাল—তৎসংক্রান্ত প্রাচীন
 ও আধুনিক বিধি ৩৭২

ছ।

ছদ্মহ (ছদ্মস্ব) ৬৯, ১০৮
 ছন্দ—প্রাচীনত্ব-বিষয়ে ৩৮;
 গাথা দ্রষ্টব্য।
 ছল—প্রাচীন ও আধুনিক
 আইনে ৩১৭
 ছালুক যোহগুপ্ত ১২৫
 ছেদ-সূত্র ৪১

জ।

জগজ্ঞান সূরি ৫১
 জনদত্ত ১২৫
 জমদগ্নি ২৮৯

জনসংখ্যা-নির্ধারণ ২৭৪; লোক-
 গণনা দ্রষ্টব্য।
 জন্ম—তাহার কারণ ১৮৮
 জব চার্ণক ২৫৪
 জঘু ১২৪, ১২৭
 জঘুলামন ১২৪
 জঘুয়ামী ৪২, ৫০; ১২৪
 জয় ১৭৪—১৭৫
 জয়ন্ত ১২৪, ১২৬
 জয়প—প্রাচীন ভারতে তৎ-
 প্রথা ২৮০
 জলপথ ৩৮৭, ৩৯১, ৩৯৫—৩৯৯
 জল-প্লাবন—সংকটতা ১২৭
 জলযান—বিভিন্ন জলপথে ৩৯৫;
 অষ্টবিধ ৩৯৬; বিবিধ ৩৯৭;
 নির্মাণ-ব্যবস্থা ৩৯৮
 জলসেচন ব্যবস্থা ৪২০
 জাঙ্গলীবৎ ৪০৪—৪০৫
 জাতীয় ঋণ—পরিশোধ বিষয়ে
 ৩৬১; বিভিন্ন দেশের ৩৫৯
 —৩৬৫
 জাপান—লোকসংখ্যা ২৮৩
 জামালী ১০২, ১১০
 জাষ্টিনাস—চন্দ্রশুপ্তের বংশ-
 বিষয়ে ২৬৪; তৎপ্রতি
 আলেকজান্ডারের আদেশ
 বিষয়ে ২৬৯
 জিন—১০, ২১; তাঁহাদের
 জীবনচরিত—কল্পসূত্রে ৪৭;
 শব্দার্থ ৬৭; তাঁহাদের পুত্র
 ২০; তাঁহাদের পরিচয়
 ১১৪—১১৬
 জিনকলিক ৫৯
 জিনদত্ত (সূরি) ৫১, ৭৮, ১৫০
 জিনপ্রবোধ ৫১
 জিনবহলব ৫১
 জিনহংস সূরি ৪৫
 জিনচন্দ্র ৫১
 জিনেন্দ্র—পুত্র ২০; বাক্য
 ১০২
 জীব—৭৯, ৮৪—৯০, ১০৬,
 ২২৪, ২২৮

জীবক—মন্তকের খুলি-সংক্রান্ত
অস্ত্র-চিকিৎসা ৪০৩

জীববাদ ৬০

জাম্বুত্বাহন ২৯৪

জুবিলি—বাইবেলে ৩৫৬; পঞ্চ-
বিংশতি-বিধি বিষয়ে ২৭৮

জেকবি (জ্যাকোবি)—ব্রাহ্মণ্য-

ধর্মের আদর্শ বুদ্ধ জৈন-

ধর্মের পরিকল্পনা বিষয়ে

২৫; পঞ্চবিংশতি বিধি

বিষয়ে ২৭—২৮; উত্তরা-

ধ্যয়ন সম্বন্ধে ৪৭; জৈনমত

ও বৈশেষিক মত বিষয়ে

৬২; কল্পসূত্রের অনুবাদে

৬৩—৬৫; নিগ্রহ-বিষয়ে

৬৯; কন্দন গ্রাম সম্বন্ধে

১১১; গণাদি সম্বন্ধে ১২৮;

তিন বণিকের গল্প বিষয়ে

১৫৮; জৈনগ্রন্থে বিষ্ণুর

বলির উপাখ্যান রূপান্তরে

১৭৫; অর্ঘশাস্ত্র বিষয়ে ২৫৬

জৈমসু—সুদের হার বিষয়ে ৩৪৭

জৈমিল ১২৭

জৈন গ্রন্থকারগণ ৪৮—৫২

জৈনদর্শন ৬৬—৯২; তৎসহ

বেদান্ত, সাংখ্য বৈশেষিক

প্রভৃতির সাদৃশ্য ৬১—৬২;

দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৭৭; কর্ম-বিভাগ বিষয়ে

বেদান্তদর্শনের সহিত উহার

সাদৃশ্য ৯২; জৈন-দর্শনের

স্থূল মর্ম্ম এবং বেদান্ত-সূত্রের

বাখ্যায় সে মত খণ্ডন ২২৩-

২২৮; বাদ-প্রতিবাদ

২৩৪—২৩৮; জৈনদর্শনে ও

অত্যানা দর্শনে সামঞ্জস্য-সাধন

২৩৯—২৪২; আদ্বাদ ও

সমুত্তজিত্য প্রভৃতি।

জৈনধর্ম্ম—উহা হিন্দুধর্ম্মের

অঙ্গীভূত ১০; উহার সহিত

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের সাদৃশ্য

১১; ২০, ২৩, ২৪, ২৭—

৩২; উহার উৎপত্তি বৌদ্ধ

ধর্ম্মের পূর্বে ৩২; বৌদ্ধধর্ম্মে

ও জৈন-ধর্ম্মে ঐক্য ও

অনৈক্য ৩৪; উহার

আদিস্তর ৫৩—৬০; উহার

প্রতিষ্ঠাকালে বিভিন্ন দার্শ-

নিক মত ৫৪—৫৫; উহাতে

পূজা-মন্ত্র ৯০; ব্রাহ্মণ্য-

ধর্ম্মের সহিত উহার সাদৃশ্য

ও অসাদৃশ্য ৯১; জৈন-

বৌদ্ধ অগ্রজ-অনুজ ১১০;

জৈন-ধর্ম্ম সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার

সহায় ২৪৪; জৈনদর্শন ও

জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্র দ্রষ্টব্য।

জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্র ৩৭—৫২; উহা

লিপিবদ্ধ হওয়ার বিবরণ

৩৮; উহার ভাষা ৩৯;

উহার উচ্চার ৬৩; ভাষান্তরে

উহার প্রচার ৬৩—৬৫;

স্রীগণ সম্বন্ধে ১২১, ১৫৪,

১৮৯; জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রের ও

ক্রীমস্তাগবতের বর্ণনার

সাদৃশ্য ১২১—১২২;

জৈন-মত—(জৈন-ধর্ম্ম ও জৈন-

দর্শন দ্রষ্টব্য) ২২৩—২২৫

জৈন-যতি—লক্ষণ ৯১; তাঁহা-

দের পঞ্চবিধ তপস্তা ৯০;

নিগ্রহ, ভিক্ষু, প্রমণ প্রভৃতি

দ্রষ্টব্য।

জৈনাচার্যগণ ৪৮—৫২; স্ববির-

গণ দ্রষ্টব্য।

জোরাব — লোক-গণনা-গ্রন্থে

২৮১

জোরওয়ারীদান — শাসন-গ্রন্থ

২৪৫

জাতক ১০৪, ১১১

জান—লাভে প্রথম আবশ্যক

১৪৮

জানী—শাস্ত্র-যত ১৩৫; ১৩৭;

১৫৫, ১৬৫

ঞ।

ঞাতপুস্ত ৩২, ৩৩

ঞাতিক ১১১, ১১২

ট।

টাওয়ার ৩৫৯

টাসিটস—সুদ-গ্রন্থে গ্রন্থে

৩৪৫

টিউডর—রাজবংশের কথিত

৩৬০

টুরেল্ড টেবল ৩৪৫, ৪৫৮

টুলিয়াস ২৮১

ড।

ডিউটারনমি—অর্ণদান ও সুদ-

গ্রন্থ বিষয়ে ৩৪৪

ডিওডোরাস (ডিয়োডোরস)—

গাঙ্গা-প্রদেশের রাজা সম্বন্ধে

২৬৪; গঙ্গারিদে দেশ বিষয়ে

২৭১; কুসীদ বিষয়ে ৩৪৬

ডিওস্কোরাইডস্ — ভারতের

চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে

৪০১

ডেটার্স স্যাক্ট ৩৬১

ডেভিড — লোক-গণনা-গ্রন্থে

২৮১

ণ।

ণাতিক ১১১

ত।

তক্ষক—বিষ-চিকিৎসা-গ্রন্থে

৪০২

তাপস ১৮৮, ২২৪

তামাদি—তৎসংক্রান্ত প্রাচীন ও

আধুনিক বিধি-বিধানসম্বন্ধে

সাদৃশ্য ৩৫০—৩৫৫

তিশ্যুভদ্র ১২৪

ভীষণ—ভীষণের সংখ্যা, নাম
 ও বিশেষণ ১০, ২৩;
 ভীষণের মর্ত্যে অবতরণ
 ২৩; ভীষণের পর্যায় ও
 ও পরিচয় ১১৪—১১৬
 ভূত—জাতীয় ঋণ ৩৬০
 ভূত—ভাগে মুক্তি ১৫২;
 ভূতের আদর্শ ১৬০;
 ভূতের উৎপত্তি ১৮৮
 ত্রয় (Trinity) ১৮
 ত্রিগুণ ১৬০; গুণি ত্রৈব্যা।
 ত্রিরস—জৈন মতে ২২
 ত্রিশূল ১৬
 ত্রিশূল—৩৪, ৬৫, ২৪, ২৮, ১০০
 ১০১, ১১১, ১১২, ১১৬

দ ।

দণ্ড—কর্ম শব্দের পরিবর্তে ৩৩
 —৩৪; শাস্ত্রমতে ত্রিবিধ
 ৩৭৮ (সাহস ত্রৈব্যা); বিচার
 ত্রৈব ৩৭৮—৩২; চিকিৎসা
 শব্দের ৪০৮; পরিমাণ-
 বিশেষ ৩৮৮; পথাবরোধে
 ৩২১
 দণ্ডপাক্ষ্যাম্ ২৮৮
 দণ্ডবিধি আইন—তৎসহ প্রাচীন
 বিধি-বিধানের সাদৃশ্য ৩২৩
 দণ্ডী ২৫১, ২৫৬
 দণ্ড (দণ্ডি) ১২৪
 দণ্ডস্থানপাক্ষ্য ২৮৮
 দণ্ডমূলী-সংগ্রহ ৪১২
 দণ্ডমূল—বৌদ্ধ মতে ও মনু
 মতে সাদৃশ্য ১৬; জৈন ও
 বৌদ্ধ মতে সাদৃশ্য ২৫
 দর্শন-ভদ্র ১৭৪—১৭৫
 দর্শন—জৈন ৬৬—২২; বিভিন্ন
 দর্শনিক সম্প্রদায়ের বাদ-
 বিতণ্ডা ১২৫—২৩২
 দর্শন-প্রতিভা ৩২৫
 দায়—ঋণ-সম্বন্ধে ৩৫০; চুক্তি-
 প্রসঙ্গে ৩১১

দায়ক্রম (দায় বিভাগ) ২৮৮
 দাসক্রম ২৮৮, ৩১১ ৩৭৬, ৩৮২
 দিগম্বর—সম্প্রদায় উৎপত্তি ২৪৬
 —২৪৭; মহাবীরের জন্ম
 সম্বন্ধে ৩৪; বিবিধ বিষয়ে
 ৩২, ৪২, ৪৮, ৭৮
 দীর্ঘমাস ১২৪
 টঃসমা—সুসমা ২৫, ১১৫
 তুর্গ-বিধান (নিবেশ)—রাজ্য-
 রক্ষার ৩৮২, ৭৩২০, ৪০৭
 তুর্ভিক—প্রাচীন ভারতে নিবা-
 রণ-ব্যবস্থা ৩১০
 দূতসমাহ্বয় ২৮৮
 দেওয়ানী কার্যবিধি—তৎসহ
 প্রাচীন বিধি-বিধানের সাদৃশ্য
 ৩০৪—৩০৫

দেব-পর্যায় ৮২

দেবর্জি (দেবজি) ৩৮, ৪৭,
 ১২৬, ১২৭
 দেবানন্দা ৩৪, ৩৫, ২৪—২৮
 'দেবানাং প্রিয়'—বাক্যের বিপ-
 রীত অর্থ ২৫২
 দেবীচন্দ্র ৪৮
 দেবেশ্বর হুরি ৫২
 দৈববাদ ৫৬, ৫৮
 দোষ—বিক্রেয় দ্রব্যে ত্রিবিধ
 দোষ ৩৬৭
 দ্বিমুখ ১৭৪
 দ্রব্য—দর্শন মতে ৬১
 দ্রোণমুখ ২৮২, ৩২০

ধ ।

ধনগিরি ১২৬—১২৭
 ধননন্দ ২৬৬, ২৬৮
 ধনাদি (ধণাড্) ১২৫
 ধর্ম—ত্রিবিধ কারণে একের
 সহিত অজ্ঞের সাদৃশ্য ১১;
 উহার লক্ষণ ও বিভাগ ১২;
 গৃহস্থদিগের প্রতিপাল্য
 ১৫১; জৈনদর্শন মতে

২২৪;—হুরি-জিহ্বর ১২৭
 ভারতের শিক্ষার আদর্শ—
 ধর্মপালন ৪৩৭—৪৩৮
 ধর্মঘোষ হুরি ৫২
 ধর্মনাথ ১১৬
 ধর্মশক্তি—রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা
 করে ২৪৩
 ধর্মস্বীয়—তৎসম্বন্ধে মনুর উক্তি
 ও উহার সহিত দেওয়ানী
 বিচারালয়ের সাদৃশ্য ২৮৭;
 উহাতে যে সকল বিষয়ের
 বিচার হইত ২৮৮
 ধাতু-পরীক্ষা ও বিস্তৃত করিবার
 উপায় ৪১৭—৪১৬
 ধাতুবিজ্ঞা—প্রাচীন ভারতে
 ৪০৪

ন ।

নক্ষত্র ১২৭
 নগজিৎ ১৭৪
 নন্দ—মহাবীরের ভ্রাতা ১০৯;
 রাজা ২৬৫, ২৬৯; গণধর
 ১১৫; রাজগণ ২৪২, ২৫০
 নন্দন ১৭৫
 নন্দনভদ্র ১২৪
 নন্দিত ১২৭
 নন্দিবর্দ্ধন—মহাবীরের অগ্রজ
 ১০০, ১০১, ১০৪, ১০৯;
 —পক্ষ ১০৭
 নবমঙ্গলী ১০৮
 নবলিঙ্গবী ১০৮; লিঙ্গবী ত্রৈব্যা
 নমি (নমিনাথ) ১১৬
 নমী (রাজা) ১৬০—১৬৩, ১৭৪
 নমুচি ১৭৫
 নরওয়ে—ঋণে কারাদণ্ড লোণ
 বিষয়ে ৩৬১
 নলবাহন (নলবাহণ) ২৪২
 নস্ত ৪২৫
 নাগ ১২৫, ১২৭
 নাগপুত্র ১২৫

নাগবনাধ্যক্ষ ৪৩২

নাগরক ২৭৯

নাগরাজ ২৭১

নাগরিক ২৬৩

নাগিল ১২৪

নাবধ্যক্ষ ৩৯১—৩৯২, ৩৯৬,
৩৯৮, ৪০০

নাভি ১১৬

নারদ—ব্যবহার প্রসঙ্গে ২৯৩ ;

সাক্ষী প্রসঙ্গে ৩০১ ;

মীমাংসিত বিষয় সম্বন্ধে

৩০২ ; অমাণ-বিষয়ে ৩০৪ ;

সুদ গ্রহণ বিষয়ে ৩৪১

নিঃশ্রেয়স ২৪০ ; সাংখ্য ও মুক্তি
প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।

নিয়াকাস—ভারতে গ্রীকগণের
সর্পবিদ্ভা শিক্ষা-বিষয়ে ৪০৪

নিক্ষেপ ৩৩২, ৩৩৫

নিগ্রহ—তাহাদের প্রতিপাল্য

বিধি ৩১—৩৪, ৫৯ ;

তাহাদের উৎপত্তি ১২৩ ;

তাহাদের গ্রহীতব্য পঞ্চ

মহাব্রত ১৪৪—১৪৮ ;

তাহাদের আচার-লক্ষণ

১৭২—১৭৪ ; ভিক্ষু, সম্মান্যী,

যাতি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।

নির্জর ৭৮, ২২৪

নিরাক—বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য

ধর্ম মতে ৩৫ ; মহাবীরের

১০৯ ; বিবিধ প্রসঙ্গে ২৪০ ;

মুক্তি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।

নিলাম—প্রাচীন ও আধুনিক

প্রথা ৩৬৫

নিষ্কাম কর্ম—জৈন-দর্শনে ৯২ ;

নিষ্কাম ও সাকাম সমানার্ণ-

বোধক ২৪৪ ; ইন্দ্রিয় সংযম

দ্রষ্টব্য ।

নেত্র—তাহার সাধকতা ১৮৪

নেমিনাথ ১১৫

নেহিমিয়া—সুদ গ্রহণ বিষয়ে

৩৪৪, ৩৫৭

‘নৈকস্মিন্ ন সম্ভবাৎ’—সূত্রের

অর্থ ২২৬, ২৩৪, ২৪১—

২৪২

নৌগটক ৩৯৭

ন্যায়-দর্শন—জৈন-দর্শনে তাহার

সাদৃশ্য ৭৯

ন্যাসকারী—স্বয়ং বিষয়ে ৩৮৪ ;

গচ্ছিত বিষয়ে ৩৩৩

প ।

পক্ষাভাষ ৩০১

পক্ষী—তাহাদের পোষণ প্রতি-

পালন সংরক্ষণ ৪২৮

পঞ্চমহাব্রত ১৪৪—১৪৭, ১৫১

পঞ্চমুনা ১৫১

পঞ্চমুদ্রিত ৯১

পঞ্চায়তি ২৮৯

পট্টধর ৩৯, ৪২, ৪৮, ৪৯, ৫১

পট্টাচার্য ৪৮, ৪৯

পণ্যাদায—ত্রিবিধ ৩৭৩

পণ্যাদাক্ষ ৩৮২—৩৮৩, ২৬৩

পণ—স্থলপণ ও জলপণ, প্রাচীন

ভারতে ৩৮৬—৩৯১

পথ-চতুষ্টয় (মুক্তির) ৬৬—৬৭

পদার্থ—জৈন-দর্শনে ২২৪

পদ্মপ্রভ ১১৬

পবিত্রতা—তাহার স্বরূপ ১৫৫

পম্প—তদ্বারা জল উত্তোলন

৪২০

পয়স ৪১

পরমতত্ত্বচর্চায় ১১৪

পরমাধুবাণ—তাহার প্রতিপাদ্য

ও তাহার খণ্ডন ২০৫—২১০

পরিত্রাণ—তাহার উপায় ১৫৯

পরিসহ (পরীসহ) ৭০—৭১,

১৫৩—১৫৪

পরোক্ত দোষ ২৯১—২৯৩

পর্কত—রাজকুমার ২৬৭

পর্যায়—জৈন-দর্শনে ৬১

পশু—তাহাদের ব্যবহারিতি ও

চিকিৎসা-ব্যবস্থা ৪২৫—

৪৩২

পশুচিকিৎসক—প্রাচীন ভারতে

৪০৪

পশুপালন-ব্যবস্থার আদর্শ ৪২২

—৪৩৬

পাক্ষ কচ্চায়ন ৫৫

পাটলিপুত্র—বিবিধ প্রসঙ্গে ৩৯,

৪০, ৫১, ২৪৫, ২৫০, ২৬৪,

২৬৮, ২৬৯, ২৭২

পাণ্ডুভদ্র ১২৪

পাদ—ব্যবহার শাস্ত্রে ২৮৯

পাপ-ক্ষালন প্রথা—বৌদ্ধদের

মমুর সহিত সাদৃশ্য ১৭

পাপা-নগরী ১০৭, ১১০

পারস্ত—লোক গণনা-প্রণা ২৮১

পারিল (মাথু)—সুদ বিষয়ে

৩৪৯

পার্শ্বক্ষেত্র ৪৫—৪৬

পার্শ্বদেব ৫৯

পার্শ্বনাথ ১১৪ ; মহাব্রত বিষয়ে

১৮১—১৮২ ;

পাপপত মত—তাহার সূত্র মর্ম

ও বোদ্ধ-ব্যাখ্যা তত্ত্বের

খণ্ডন ২২৯—২৩২

পাবণ—শব্দের বিপরীত অর্থ

২৬০

পাহিনী ৫১

পিটক ৩৯

পিটার—তাহার প্রসঙ্গে কুট্টর

উত্তর ৩৫৮

পুণ্যভদ্র ১২৪

পুদগল ২২৪

পুরণকল্প ৫৪

পুরাণ—বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, তাগবত,

মৎস্ত—কোটিলা প্রসঙ্গে ২৫৪

পুলক ২৪৯

পুল্টার্ক—সুদ-গ্রহণ প্রসঙ্গে

৩০৫ ; চন্দ্র-গণ সম্বন্ধে ২৬৪,

২৬৯

পুশকুলা ১১৫

পুস্তক ১১৬

পুস্তক ২৪০

পুস্তক ১২৭

পুস্তক ৪০

জাকীর্নিকানি ২৮৮

প্রাচীন ৩৬২—৩৬৩

প্রতিনিধি—ভাষার কার্য-সম্পা-

দনে ৩২১, ৩৬৮, ৩৭৭

প্রতিবন্ধক—চতুর্বিধ ১০৬

প্রতিভা (আমিন) ৩২৫, ৩৩০

প্রতিবন্ধন ৩০২, ৩০৫

প্রতিভাযোগ ৩০২

প্রত্যয়-প্রতিভা ৩২৫

প্রোদগা ২৭৭

প্রভা ৫০

প্রভাব ১২৪

প্রভাব (বাইবেল)—হুদ গ্রন্থ

বিষয়ে ৩৪৪

প্রভাস ১২৩

প্রসেনজিৎ (প্রসেনদি) ৫৮,

২৫০, ২৭০

প্রাকৃত ভাষা—ভাষার নমুনা

১৫, ১১৯, ১২৯; গাথা

দ্রষ্টব্য।

প্রাগ্ ঐতিহাসিক কাল ২৪৩

প্রাকৃতিক ৩০২, ৩০৫

প্রিয়গন্ধ ১২৬

প্রিয়দর্শনা ১০০, ১০২

প্রাচীন ৩৫৮

প্রিড—প্রাচীন ও আধুনিক

পদ্ধতি ৩০৪, ৩২৪

প্রিয়দর্শন ৩৫৮

ফ।

ফারসী রাজ্য (ফার্স)—লোক

গণনার ২৮২; হুদ গ্রন্থ

বিষয়ে ৩৪৮—৩৪৯; জাতীয়

গণ ৩৫৯

ফার্সি ১২৭

ফার্সি—মোরীয় নগর সম্বন্ধে

২৭০—২৭১

ফিউডেল-প্রথা ১২৭

ব।

বঙ্গ—ঋতুপুত্র ১৩৪

বঙ্গ ১২৪

ব্রজেন ১২৪, ১২৬

বণিক-সভ্য—কোম্পানী গঠনাদি

৩৭৬, ৩৮৯

বণিক-পথ ৩৮৮

বন্তগামিনী ৩৯

বন্দনা—স্থবিরগণের ১২৮

বন্ধ ৭৮, ২২৪

বন্ধক—তৎসংক্রান্ত আইনে

প্রাচীনের সাদৃশ্য ৩২৮—

৩৩১; আদি দ্রষ্টব্য।

বরদত্ত ১১৫

বর্গ ৩২০

বর্জমান—২৩, ৩২, ৫৯; তাঁহার

পূজা-মন্ত্র ৯০; নামের হেতু

১০০; তাঁহার পাণ্ডিত্য

১০২; গ্রাম ১০৭; তাঁহার

উপদেশ ১০৮;

বল ১৭৫

বলদেব বিজ্ঞানভূষণ—বেদান্ত ভাষ্য-

প্রসঙ্গে ১৯৬, ২৩৪, ২৪১

বলদত্ত ১৭৫

বলজী—তাঁহার উপাখ্যান ১৭৪

—১৭৮

বলিঙ্গ ১২৫

বলিষ্ট—গণধর ১১৫; সংহিতার

ব্যবহার বিষয়ে ৩২৩; হুদ-

গ্রন্থ-বিষয়ে ৩৪১, তামাদি

বিষয়ে ৩৫২; সম্রাট

বিষয়ে ৩৫

বাইবেল—তাঁহার বর্ণনা জীকৃষ্ণ

চরিত্রে ১৮; জৈনশাস্ত্রোক্ত

বণিকের প্রসঙ্গে ১৫৮;

লোক গণনা প্রসঙ্গে ২৮২;

ভদ্রসংগত গ্রন্থে হুদ-গ্রন্থ-

বিষয়ে ৩৪৪; জুবিলী বৎ-

সর বিষয়ে ৩৫৫; জগৎ

বিষয়ে ৩৫৭

বাক্যকর্ম্মাভিযোগ ২৮৮

বাক্যপাক্ষ্যাম্ ২৮৮

বাগ্মুক্তি ৮৩

বাল্যলী—তাঁহার প্রাচীন

১৩৪

বাগ্মজ্ঞা—স্বদেশে ও বিদেশে

২৬৩, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৮৯,

৩৯৯, ৪০০

বিজয় ৪২, ১৭৪, ১৭৫

বিজ্ঞান—ঐতিহ্য, ঋতুদেবে

সময়ে ১১৭, ১৩৩

বিজ্ঞানেশ্বর ৩৭৩

বিদেহদত্ত (বিদেহী) ১১২

বিজ্ঞান গোপাল ১২৬

বিনয় ৭২, ৮০, ৮১, ১৫২,

১৫৩, ১৭৭

বিনয়-পটক—চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে

২৬৬

বিন্দুসার ২৪৬

বাস্তব—বিজয় ও বন্ধক সম্বন্ধে

প্রাচীন ও আধুনিক বিধি

২৮৮, ৩৬৪—৩৬৫; বিজয়

প্রসঙ্গে ৪২০

বাস্তবকর্ম্ম ২৮৮

বাহরিসাধু ৪৫

বিক্রমাদিত্য—বিবিধ প্রসঙ্গে

৪৯, ২৫১, ২৬২

বিক্রীতক্রীতাসুখ ২৮৮

বিচারালয়-সংগঠন — প্রাচীন

ভারতে ২৮৭—২৮৮

বাৎসর্য্য ২৫৩

বাধা-বাধিকর্ম্ম ২৮৮

বায়ুবিজ্ঞান ৪১৪

বায়ুভূতি ১২৩

বায়ুজ্ঞ—বাতপ্রবৃত্তি ৪২০—

৪২১

বারিপাত—তৎসংক্রান্ত জ্ঞান

৪১৫

ধারণা—জৈনধর্ম-বিষয়ক আলো-
চনায় ৬৪—৬৫

বালমিত্র ২৪২

বাশিষ্ঠী ১৬৯

বাসুদেব ১৭৫, ১৯২

বাসুপুত্র ১১৬

বিবাদপদনিবন্ধ ২৮৮

বিবাহসংযুক্তম্ ২৮৮, ৩১১,
(বিবাহ)

বিবর্তক্ষেত্রপথহিংসা ২৮৮

বিমল ১৭৫

বিমলনাথ ১১৬

বিমুক্ত জন—স্বরূপ-তত্ত্ব ১৪২—
১৪৩; মুক্তি, মোক্ষ দ্রষ্টব্য।

বিবিসার (বাস্তাসার) ২৫০

বিরুদ্ধক ২৭০

বিল (ডক্টর)—চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে
অভিমত ২৬৫; উদয়ন
বিষয়ে ২৭২

বিশ্ববিদ্যালয়—প্রাচীন ভারতে
৪০৩

বিষ-চিকিৎসা ও পরীক্ষা ৪০৪—
৪০৬

বিষ্ণু—হৃবির ১২৭

বিষ্ণু—পুরাণ, নন্দরাজ সম্বন্ধে ও
চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে ২৬৫;
সংহিতা, ব্যবহার-বিধির
ধর্মমূলকত্ব সম্বন্ধে ২৬৪;
সাকী প্রেরণ সম্বন্ধে ২৯৭
—২৯৮, ৩০০—৩০১; চুক্তি-
বিষয়ে ৩১৪; সাক্ষি-দ্বৈধ
স্থলে ৩০৭; আধি-বিষয়ে
৩২৯; ঋণ-বিষয়ে ৩৩৭,
৩৪০, ৩৪২; দায়-বিষয়ে
৩৫১; কামাদি-বিষয়ে ৩৫২;
ক্রয়-বিক্রয় প্রসঙ্গে ৩৭০—
৩৭১; ভোজ্য প্রসঙ্গে
৩৭৩; পণ্যমূল্য-নির্দেশে
৩৭৫; ভূতা-প্রসঙ্গে ৩৮০;
তুচ্ছ বিষয়ে ৪০০

বিষ্ণু হুমার ১৭৫

বিষ্ণুগুপ্ত ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬

বিসমার্ক (বিষমার্ক)—কৌটি-
লোর প্রসঙ্গে ২৫১, ৩৮৩

বীর—জৈন-শাস্ত্র মতে ১৩৭

বীরভক্ত ১১৫

বীরমিত্রোদয় ২৯৪

বুদ্ধঘোষ ৫৯

বুদ্ধদেব—তৎসহ মহাবীরের সম্বন্ধ
ও সংখ্যা ১০; তিনি

নিবৃত্তিমাগাবলম্বী ১৩—১৫;
তৎকর্তৃক (ঈশ্বর) সৃষ্টি-
কর্ত্তা স্বীকার ২২; ব্রাহ্মণ
সম্বন্ধে তাঁহার মত ২২;
প্রতিমূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ বিষয়ে
২৪; মহাবীরের সহিত
তাঁহার জীবনের সম্বন্ধ-
বিষয়ে ১০৯; বিবিধ বিষয়ে
৯, ২০, ৩১—৩৭, ৫৩—৫৪,
৫৭—৫৮, ৬০, ৬৩, ১০৯,
১১১, ২৭০, ৪০৩; বুদ্ধমুনি
২১০; বৌদ্ধধর্ম দ্রষ্টব্য।

বুলার—জৈন-ধর্মসংক্রান্ত আলো-
চনায় ৬৪, ৬৫; আপস্তম্ব
সম্বন্ধে ও ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গে
৩১, ৩২

বুদ্ধ ১২৭

বৃহৎ খরতরগচ্ছ ৪৫, ৫১

বৃহৎগচ্ছ ৫১

বৃহস্পতি—ব্যবহার প্রসঙ্গে
২৩৯; রাজদ্রোহ-প্রসঙ্গে
২৯৪; ঋণ-প্রসঙ্গে ৩৪২;
স্বাবর-সম্পত্তির অবিক্রয়ত্ব
বিষয়ে ৩৬৩

বেণী ১২৪

বেতন—প্রাচীন ও আধুনিক
তুলনা ৩২০

বেদান্ত—দর্শন, জৈন মতে ৫৫;
তৎসাদৃশ্যে ৬১; 'সং'
প্রসঙ্গে ৭৯; কর্ম-বিভাগে
জৈন-দর্শনে সাদৃশ্য ৯২;
তদ্বাখ্যায় সাক্ষ্য, বৈশেষিক,

বৌদ্ধ ও জৈনাদি মত খণ্ডন
১৯৬—২৩৭

বেলজিয়ম—ঋণে কার্যাদি ও-
লোপ বিষয়ে ৩৬১; লোক
গণনায় ২৮২

বৈদেহকরক্ষণম্ ২৮৮

বৈনায়িক বাদ ৫৬

বৈভাবিক ২১০

বৈশাণিক ১১১

বৈশেষিক দর্শন—জৈন-দর্শনের
সাদৃশ্য ৬১, ৬২; তদ্ব্যতীত
স্থল মর্ম ও তাহার খণ্ডন
২০৫—২১০

বৌদ্ধধর্ম—ব্রাহ্মণ্য ধর্মের
বিরোধী নহে ১১; তৎসহ
ব্রাহ্মণ্যধর্মের সম্বন্ধ ১২;
ঐ ধর্ম নিবৃত্তি-মূলক ১৩;
হিন্দুধর্মের সহিত সাদৃশ্য—
আচার অনুষ্ঠানে ঐক্য ১৬;
নীতি ও উপদেশে সাদৃশ্য
২০; জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম
বিষয়ে বিবিধ স্তাভাব্য বিষয়
২২—৩৬; জৈনধর্ম বৌদ্ধ-
ধর্মের পূর্বে ৩২; উহার
স্তর বিষয়ে ৫৩; ব্রাহ্মণ্য-
ধর্মের সহিত উহার সাদৃশ্য
অসাদৃশ্য ৯১; জৈন ও
বৌদ্ধ ধর্ম অগ্রজ ও অনুজ
১০৯—১১০; বৌদ্ধধর্মের
স্থল মর্ম ও তাহাতে দোষ-
প্রদর্শন ২১০—২২৩; বুদ্ধ-
দেব দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধপিটক সাহিত্য ৩৯

বোধায়ন সূত্র—জৈন ও বৌদ্ধ
ধর্মের মূল্যমূল্যানে ২৫,
২৭; সূত্রে জৈনবিধির
সাদৃশ্য ২৮—৩০; সূত্র-
রচনা-কাল ৩১

ব্যবহার—বিধি ২৮৩—৩০৪;
উচ্চ ধর্মমূলক ২৮৪; শাস্ত্র-
গ্রন্থে উহার পরিচয় ২৮৩

—২৮৪;—প্রকার ২৮৬;
—প্রণালী ২৮৯;—ক্রম
৩০০;—শাস্ত্র ২৮৯, ৩৬১,
৩৬৩;—চতুর্নাদি প্রাচীন
কালের সহিত আধুনিকের
সাদৃশ্য তত্ত্ব ২৯৫

দাব্যদার-স্থাপনা ২৮৮

ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ৩৬০

ব্যাস—স্বাবর-সম্পত্তি বিষয়ে
৩৭৫; ভৃত্য সম্বন্ধে ৩৮০

ব্রহ্মচারী ১১৫

ব্রহ্মদত্ত ১৬৭

ব্রহ্মরাজ ১৭৫

ব্রহ্মোত্তর (ব্রহ্মদেব)—তৎ-
সংক্রান্ত বিধি ৩২৯, ৩৬৪,
৪১৩—৪২৪

ব্রাহ্মণ—মহু মতে ২০; অথার্ণ
শাস্ত্র মতে ২১; বৃহদেবের
মতে ২২; শব্দ গোরব-
বাচক ৩১; জৈন মতে
১৪৩; ব্রাহ্মণ কাহাকে
কহে ১৮৬—১৮৮; সাক্ষ্য
দান প্রসঙ্গে ২৯৯—৩০০;
গ্রীসে চিকিৎসা-বিজ্ঞা-
প্রচারে ৪০১

ব্রাহ্মণাধর্ম—তৎসহ বৌদ্ধ ও
জৈন-ধর্মের সাদৃশ্য ১১—
৩৬, ৬১; ঐ সাদৃশ্য ও
অসাদৃশ্য ৯১; মহাব্রত
বিষয়ে ২৬; মন্ত্র ও শাস্ত্রাদি
দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মীলিপ্য ১১৭

ভ ।

ভগবতাক্ষ ৫২

ভদ্র ১২৭

ভদ্রবাহু (ভদ্রবহু) ৩৯, ৪২,
৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৬৩,
৯৩, ১২৩—১২৫, ২৪৫—
২৪৬, ২৪৯

ভদ্রবংশ ১২৫

ভদ্রা ১৭৫

ভবতৃষ্ণা ১৮৮

ভবভূতি—ভাঁহার ও কালি-
দালের রচনার পার্থক্যের
কথা ২৫৮

ভরত ১৩৩—১৩৪, ১৭৪

ভর্তৃহরি ১৪০

ভাস্কর ২৪৯

ভাবনা-পঞ্চক ১৪৪—১৪৮

ভাবপূজা ৯০

ভারগু ১০৬

ভারতবর্ষ—নাম-বিষয়ে ১৩৪;
লোক-গণনা ও লোক-
সংখ্যা ২৭৪—২৪৬, ২৮৩

ভাষা-সমিতি ৮২

ভিক্ষু (ভিক্ষু) ১৫—১৬;
তাঁহাদের প্রতিপাল্য বিধি
২৮—৩৯, ১৪৩; প্রকৃত
ভিক্ষু ১৪৮—১৪৯; তাঁহা-
দের দোষ গুণ ১৬৫; প্রকৃত
ভিক্ষু কে ১৭১—১৭২;
জীবন কষ্টগ্রস্ত ১৭৭

ভিন্সেন্ট স্মিথ—জৈনধর্মের
আলোচনায় ৬৫; চন্দ্র-
গুপ্তের বিষয়ে ২৬৪, ২৬৯

ভীষ্ম—ভাঁহার অন্ত চিকিৎসা
বিষয়ে ৪০২—৩

ভূতদত্তা ১২৪

ভূতদিগা ১২৪

ভূতা ১২৪

ভূতকামিকার ২৮৮, (ভূত্যা-
ধিকার) ৩৯১, ৪১৩

ভৃগু ১৬৮—১৬৯

ভেজাল—তৎসংক্রান্ত প্রাচীন
ও আধুনিক বিধান ৩৭৩,
৩৭৫—৩৫৭, ৩৮২; ভেজলে
৪০৮

ভেজল উদ্ভাদ, ভেজলাগার ৪০৬

ম।

মহাবন ১৭৪—১৭৫

মহামনিকার—উপাসনা প্রসঙ্গে
৩৪

মণিভদ্র ১২৪

মণ্ডিকপুত্র ১২৩

মধ্য-এসিয়া—ঋগ্বেদদেবের আদি-
পত্য প্রসঙ্গে ১৩৪

মহু—সংহিতায় বৌদ্ধদিগের

দশশীল ও খৃষ্টধর্মের দশ
আজ্ঞা ১৬; সে মতে পাপ-
ক্ষালন প্রথা ১৭; ব্রহ্মণ-
সম্বন্ধে মহুর উক্তি ২০;

ব্যবহার শাস্ত্রের ধর্মমূলক-
বিষয়ে ২৮৪; পরোক্ষ দোষ
সম্বন্ধে ২৯২, ২৯৪; সাক্ষী

প্রকরণ বিষয়ে ২৯৬, ৩০০,
৩১৭; বিচারকের দণ্ড

সম্বন্ধে ৩০৮; চুক্তি-সম্বন্ধে
৩১৩, ৩১৮; সাক্ষী বিচারে

বর্গ, লক্ষ্য প্রভৃতি বিচার
৩২০; ব্যবহার সংক্রান্ত

বিবিধ বিষয়ে ৩২১, ৩২৩—
৩২৫; প্রতিভূ-প্রসঙ্গে ৩২৬

—৩২৭; 'আদি' বিষয়ে
৩২৯; গচ্ছিত দ্রব্য প্রসঙ্গে

৩৩৪—৩৩৫; ঋণ-প্রসঙ্গে,
৩৩৭, ৩৪০—৩৪২; দায়-

বিষয়ে ৩৫০; ক্রম-বিক্রয়
প্রসঙ্গে ৩৬২—৩৬৩, ৩৬৯,

৩৭০; ভেজাল বিষয়ে ৩৭২,
৩৭৫; ভূত্যা প্রসঙ্গে ৩৭৯—
৩৮০; জলপথে গুপ্ত গ্রহণ

বিষয়ে ৪০০; অন্ত-চিকিৎসা-
বিষয়ে ৪০৩; চিকিৎসকের

দণ্ড বিষয়ে ৪০৮

মহু-পর্ষায় ৪৮

মনোপুস্তি ৮৩

মর্যাদাস্থাপন ২৮৮

মহুৎ, মহুরী, মৌরী ২৭০

মহা—সকাম ও অসকাম ১৫৬

মহাদেবী ১৬৪

মহাভা ১১৬

মহানাত ১১৬

মহৌ ২৪৭

মহাগিরি ১২৪—১২৫

মহাচীন—ঋষভদেবের আদি-
পত্নী প্রসঙ্গে ১৩৪

মহানাম ২৫৫, ২৬২

মহানন্দ ২৬২

মহানির্বাণ ১৫৬

মহানির্বাণ তন্ত্র—স্বাবর-সম্পত্তি
বিক্রয় প্রসঙ্গে ৫৬৩

মহাপদ্ম ১৭৭—১৭৫

মহাপদ্ম-নন্দ ২৬৬

মহাবংশ—চন্দ্রগুপ্ত সঙ্ক্ষে ২৬৬
২৬৮

মহাবংশ—জৈনমত সঙ্ক্ষে ৩৩;
অষ্টাচিকৎসা বিষয়ে ৪০৩

মহাবল ১৭৪

মহাবীর স্বামী—তৎসহ বুদ্ধ-
দেবের সঙ্ক্ষে ১০, ২৩;
প্রোতমুর্তি নির্মাণ-বিষয়ে
২৪; মহাত্ম্য বিষয়ে ২৭;
শেষ জৈন তীর্থঙ্কর ৩২;
ভাচার জীবনচরিত কল্প-
স্থলে ৩৮; ভাচার শিষ্য-
প্রসঙ্গে ৪২; ভাচার জন্ম-
কাহিনী ৯২—৯৯; ভাচার
জীবন-কথা — পিতামাতা
আত্মীয় প্রভৃতি ১০০—
১২৩; ভাচার গুণ ও স্তব
১০৩; গৌতম প্রসঙ্গে
১৫৩, ১৬২, ১৬৪; বিবিধ
প্রসঙ্গে ৬৭, ৪৩, ৪৫, ৬৮
—৫০, ৫৩, ৫৭—৬০, ৬৩,
১১৪, ১১৬—১১৭, ১২৩,
২২৬, ১২৯, ১৪০, ১৪৪—
১৪৭, ১৭৫, ১৮১—১৮২,
১৯৪; ভাচার নির্বাণ-কাল
২৪৮—২৫০

মহাত্ম্য ২৫; জৈনমতের মহা-

ত্রতে ত্রাশ্রম্য-ধর্মের সাধারণ
২৭; উহার স্বরূপ ১৪৪—

১৪৭, ১৫১; উহা গ্রহণ
কঠিন ১৭৭; চতুষ্টয় পঞ্চ-

মূলে এক ১৮২

মহাভারত—সর্পদংশন ও অস্ত্র-
চিকিৎসা-বিষয়ে ৪০২

মহামারী—নিবারণ-ব্যবস্থা ৪০৮
—৪০৯

মহাসূত্র ১১৫

মহাহরি ১৭৫

মাধ্যমিক ২১০, ২২১

মানভূষণ হরি ৫১

মানদেব ৫১

মানিক ৪২

মারা ৭৯

মার্যাবাদী ২২৮

মালাবকাগ্নিমাত্র — বিষবৈদ্যা
প্রসঙ্গে ৪০৩

মিতাক্ষরা—রাজবিধি বিষয়ে
২৯০—২৯১; সাক্ষী প্রসঙ্গে
৩০১; ঋণ-প্রসঙ্গে ৩৪১;
দান বিষয়ে ৩৫০; স্বাবর-
সম্পত্তি বিক্রয়-বিষয়ে ৩৬২
—৩৬৩, ৩৭৬

মিশর—সুদ গ্রহণ সঙ্ক্ষে ৩৪৬,
৩৫৭

মুক্ত—জৈন ও বৌদ্ধ মতে ২৪;
—পুরুষ ১৭৪

মুক্তি—ভাচার পথ ৬৭—৭০;
পথে বাধা-বিপত্তি ৮১—
৮২; ভগ্নের নাই ১৫৭;
ভৃগু-ভ্যাগে ১৫৯; উহার
অধিকারী ১৮৮; জৈনান্দি-
মত মুক্তিতে দোষ-প্রদর্শন
২২৮; তৎসঙ্ক্ষে দার্শনিক-
গণের বিভক্তা ১৯৫—২৪২;
নির্বাণ, নিঃশ্রেয়শ, কৈবল্য
প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

মুদ্রাধ্যক্ষ ৩৯৩—৩৯৪

মুদ্রারাক্ষস ২৫১, ২৫৫, ২৬২

মুনী—জৈন-মতে ১৩৫—৭, ১৫৯,
১৮৮

মুনিচন্দ্র হরি ৫১

মুনিসূত্র ১১৬

মুরা ২৫০, ২৬৪—২৬৫, ২৭০

মূলস্থ ৪২

মুগা ১৭৫

মৃত-পরীক্ষা ৪০৯, ৪১৩; শব-
বাবচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

মেকজি—মুরা সঙ্ক্ষে ২৬৫

মেগাস্থিনীস—ভাচার ভাষাতে
অবস্থিতি ২৪৮, ২৫০—২৫২
তিনি ভারতের লোক-সংগনা
বিষয়ে ২৭৩; ভারতে
মামলা-মকদ্দমা বিষয়ে ২৮৭;
ভারতে বৈদেশিকগণের
চিকিৎসা ৪০৪; ভারতে
খনিজ বিত্তা ৪১৬; পদ্ম-
প্রাণী দ্বারা জমীর উর্বরতা
সাধন বিষয়ে ৪২০—৪২১

মেঘ—তৎসংক্রান্ত জ্ঞান ১৪৫

মেতর্বা ১২৩

মেঘর (লর্ড)—ঋণ প্রসঙ্গে ৩৫৯

মোক্ষ ৭৮, ২২৪০, ২৪০; মুক্তি
দ্রষ্টব্য।

মোগগলায়ন ৫৮

মোজেনস—তৎপ্রবর্তিত নীতি,
সুদ গ্রহণ বিষয়ে ৩৪৪, ৩৫৫

মোরাদাক ১৮

মোরায়নগর ২৬৬, ২৭০—২৭১

মোর্যাপুত্র ১২৩

মোর্যরাজগণ—ভাচারের রাজত্ব-
কাল ২৪৩

ম্যাক্ফার্সন—সুদের অত্যাচার
বিষয়ে ৩৪৩

ম্যাকিনাভেল ১৫১, ৩৮৩

ম্যাক্সমুলাস—চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-
কাল ও বৌদ্ধ-মত সঙ্ক্ষে
৩৯; জৈনধর্ম সংক্রান্ত
আলোচনায় ৬৩; ত্রাশ্রম
প্রসঙ্গে ৩২

ম্যাপু—ঋণকারী বিক্রীত হই-
তেছে, এ সম্বন্ধে বীতশ্রুতের
উক্তি ৩৫৮; জৈনশাস্ত্রোক্ত
বণিকের প্রসঙ্গ ১৫৮

য।

যক্ষদত্তা (যক্ষদিয়া) ১২৪

যক্ষা ১২৪

যজুর্বেদ—অহিংসা ধর্ম বিষয়ে
২৫

যজ্ঞ—জুই প্রকার ১২

যশ ৩৪, ১১৫

যশবিজয় ৪৮

যশা ১৬৮

যশোদা ১০০—১০১, ১০২

যশোধরা ১০২

যশোবতী ১০১

যশোভদ্র ৪২, ১২৪

যাচিত্তক ৩৮৫

যান-বাহনাদি—প্রাচীন ভারতে
৩২১—৩২৩

যাজ্ঞবল্ক্য—অহিংসা বিষয়ে ৯২;

ব্যবহার মূল সম্বন্ধে ২৮৩—

২৮৪, ২৮৬; বিচারে অব-

কাশ প্রদান বিষয়ে ২২৩;

ব্যবহার পাদ বিষয়ে ২২৫;

সাক্ষী প্রকরণ বিষয়ে ২৯৭,

৩০০, ৩০৭; পক্ষান্তাধ বিষয়ে

৩০১; ব্যবহার-ক্রম বিষয়ে

৩০০—৩০৬; আপিল সম্বন্ধে

৩০৯; চুক্তি ব্যবহার সম্বন্ধে

৩১৩—৩১৪; বিচারাদি

বিষয়ে ২৯০—২৯১, ৩২১—

৩২৩; প্রাত্যহিক প্রসঙ্গে ৩২৬

—৩২৭; আধ-বিষয়ে ৩২৯

—৩৩০; গচ্ছিত বিষয়ে

৩৩২—৩৩৫; ঋণ-বিষয়ে

৩৩৬, ৩৪০—৩৪২;

ভাষাদি-বিষয়ে ৩৫৩; নষ্ট-

প্রণয় উক্তির প্রসঙ্গে ৩৭০—

৩৭১; উজ্জ্বল প্রসঙ্গে ৩৭৩

—৩৭৪; ক্রয় বিক্রয়ে মূল্য

নির্ধারণ বিষয়ে ৩৭২—

৩৭৫; ভূতা প্রসঙ্গে ৩৮০;

বণিক-সম্বন্ধ কোম্পানী-গঠন

ও ভূতা-সম্বন্ধ বিষয়ে ৩৮১;

শুদ্ধ বিষয়ে ৪০০; চিকিৎ-

সকের দণ্ড বিষয়ে ৪০৮

যীতশ্রুত—শ্রীকৃষ্ণের সহিত

ভাটার সাদৃশ্য তত্ত্ব ১৮—

১৯; যীতশ্রুতের পাপভার

গ্রহণের দৃষ্টান্ত প্রাচীন

মিশরে পরিদৃষ্ট ১৮—১৯;

ঋণকারীর নিষ্পাতন সম্বন্ধে

ভাটার উক্তি ৩৫৮

যুদ্ধভূময় ৩৯১

যোগ—জৈনমতে ৫৫, ১৪০

যোগহত্র—অহিংসা বিষয়ে ৯২

যোগাচার ২১০, ২২১

যোগ-ব্যবসায়—প্রাচীন ভারতে

৩৩৭; কোম্পানী গঠন

দ্রষ্টব্য।

ম্যাগনটিক ৫৬

ম্যান—রাণী ভাটার রাজত্বকালে

স্বদের হার ৩৪৭—৩৪৮

ম্যানিমিজম ৬১

র।

রক ১২৭

রথ ৩২১—৩২২

রথনেমী ১৯৩

রথধাক ৩২১

রমণী—তৎসম্বন্ধে জৈন শাস্ত্রের

উক্তি ১২১, ১৫৪; ভাটার

নরকের হেতু ইত্যাদি ১৩৯,

১৪০; বিজ্ঞার বশবিনী

১৩২; ভাটারের প্রতি

আসক্তি পরিহার বিষয়ে

উপদেশ ১৪৯

রয়েল—ভারতের চিকিৎসা-

বিজ্ঞান বিষয়ে ৪০১

রস—ভাষাতে বীতশ্রুতা ১৮৯,

১৯১

রসনোদ্রয়—ভাষার সার্থকতার

বিষয় ১৪৯

রাইস (টিউটস) — জৈনধর্ম

সংক্রান্ত আলোচনায় ৬৫

রাজকীয় ঋণ ৩৫৯—৩৬০

রাজদ্রোহ—তৎসংক্রান্ত-প্রাচীন

বিধি ২২৪

রাজপথ (মার্গ) প্রাচীন ভারতে

৩৮৬—৩৯৫

রাজপ্রাণধি ৩১০

রাজ সভা—রাজ অট্টালিকা

প্রভৃতির বর্ণনা ১২৯—১৩২

রাজার খাজ ও ঔষধ পরীক্ষার

ব্যবস্থা ৪০৫, ৪০৭

রাজীমতী ১২২—১২৩

রাজ্য—আদর্শ লক্ষণ ২৭২;

স্বরক্ষার বিধান ৩৮৮

রাণী বাধা ১১৪

রিউকাস—সুদ গ্রহণ প্রসঙ্গে

৩৫৫

রিজ ডেভিডস্ — চন্দ্রশেখর

বংশ সম্বন্ধে ২৬৪

রিফরমেশন ৩৪৭

রিভলিউশন ৩৬০

রিস্টাইগ ৩৬০

রূপরা (রূপরা) —লোকসংখ্যা

২৮৩; জাতীয় ঋণ ৩৬০

রূপ—ভাষাতে বীতশ্রুতা ১৯০

রেণা ১২৪

রেবতী ১০৮

রোম—সুদ গ্রহণাদির প্রসঙ্গে

৩৪৫—৩৪৬, ৩৫৮—৩৫৯;

চিকিৎসা-বিজ্ঞার ঋণী ৪০১

রোহিণ্ড (শুক) ৬২—৬৩

রোপ্যপরীক্ষা ৪১৮

ল ।

লক্ষ্মীকৃতি ৪৭
লক্ষ্মী-স্মৃতি ৪৭
লক্ষা—চুক্তি বিষয়ে ৩২০
ললিতাবস্তর—বুদ্ধদেবের সং-
সার দর্শন বিষয়ে ১৪ ;
প্রাচীন গাথা বিষয়ে ৩৮ ;
উহার রচনা-কাল বিষয়ে
৩৯

লভার্ভি ৩৪৮
লাসেন — জৈনধর্ম সংক্রান্ত
আলোচনায় ৬৩ ; বৌদ্ধ-
ধর্ম হইতে জৈনধর্মের উৎ-
পত্তি বিষয়ে ১১০

লিউম্যান—জৈনধর্ম সংক্রান্ত
আলোচনায় ৬৪

লিচ্ছবীগণ— ৩২, ৩৩, ১০৮
১১১—১১২,

লিপি—অষ্টাদশ ১১৩

লিভনিয়া—সুদের হার বিষয়ে
৩৪৮

লিভাইট ৩৫৭

লুক—জৈনশাস্ত্রোক্ত বণিকের
গ্রন্থ ১৫৮

লেক্স পিটোলিয়া ৩৫৮

লে'ভটিকাস—ঋণ-সম্বন্ধে ৩৫৭

লেসিনিয়াস ৩৫৯

লোকগণন—আধুনিক পদ্ধতি
২৭৪—২৭৬ ; প্রাচীন পদ্ধতি
২৭৭ — ২৮০ ; পৃথিবীর
বিভিন্ন দেশে লোক-গণনা
পদ্ধতি ২৮১—২৮৩

ল ।

লক্ষরাজ ৪৯, ২৪৯

লক্ষ্মীবান—তাহার মূল লক্ষ্য
ও বেদান্ত-ব্যাখ্যার সে মতের
খণ্ডন ২৩২—২৩৩

লক্ষদেব ৯৬, ৯৭ ; ইন্দ্রদেব
ঐষ্টব্য ।

লক্ষরাজ্য — বেদান্ত-ব্যাখ্যায়
জৈন মত খণ্ডন উপলক্ষে
২৩৪—২৩৮, ২৪১

লক্ষরূপকর্ম্যভিগ্রহ ২৮৮

লটকার ২৬২

লব-বাবচ্ছেন (পোষ্টমার্টেন)

প্রথা—প্রাচীন ভারতের
২৮৮, ৪০৯

লক্ষ—তাহাতে বীতস্পৃহা ১৯০

লযাস্ত ১২৪

লযাস্তব ৪২, ৪৯, ৫০

লজ ৩০

লপা—জৈনগণের ১২১—১২৬

লপ্টিয়া (স্ক'দিল) ১২৭

লপ্তাচার্য্য ৫৭

লপ্তা ১৭৪

লপ্তিনাথ ১ ৬

লপ্তিনেনিক ১২৬

লপসক (সারঙ্গ) ৩৯৮

লপ্ত—কোটিয়া মতে ৪৩৭

লপ্তার্থী—তাহার লক্ষণ ১৫২

লপ্তভূতি ৪৩, ১২৭

লপ্তাজত ৪-৬

লপ্ত—রক্ষা সংক্রান্ত আইন ২৮৮

লপ্তলনাথ ১১৬

লপ্তা ৪৫, ৪৬

লপ্তশিষ্ট্রচন্দ্রকর্ম ২৮৮

লপ্তদান ১১১

লপ্ত ১১৫

লপ্ত—জলপথে তাহা গ্রহণ

ব্যবস্থা ৩৯৮—৪০০

লপ্তাধ্যক্ষ ২৬০ ৩৮২—৩, ৩৯৮

লপ্তপাদি ১০৭

লপ্তবতী ১০১

লপ্তাচার্য্য ৪৯, ৫১

লপ্তপ্রজ্ঞা—তাহার সার্থকতা
১৪৯

লপ্তপ্রণ—ভীতাদেব ধর্মাদি, ১০০,
১৪৩, ১৭৭, ১৮৭ ; ভিক্ষু,

নিগ্রহ, হাবের প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।

লপ্তপ্রণ-বেলগোণা ৬০

লপ্তপ্রণ—ধর্ম প্রতিষ্ঠায় ৯ ;
নিয়তি ধর্মের ক্ষুতি ১৩ ;
তাহার প্রভাব বীতস্পৃহে ১৮
—১৯ ; তাহার ও মহা-
বীরের জন্মের সাদৃশ্য ৩৫

লপ্তপ্রণ ১২৫

লপ্তপ্রণ ১১৫

লপ্তপ্রণ (শীর্ষস্থি সিরিড্টি) ১২৫

লপ্তপ্রণগবত—জৈন শাস্ত্রোক্ত

ঋষভ-দেবের গ্রন্থে ৯৩,

১১৭—১২১ ; তাহার বর্ণ-

নায় জৈন-শাস্ত্রের সাদৃশ্য

১২১—১২২ ; কোটিয়া

গ্রন্থ ২৫৪

লপ্তপ্রণবলী ৪৮, ৪৯

লপ্তপ্রণ—রাজা ২৫০ ; উপভাসে

১৭৯—১৮২

লপ্তপ্রণশনাথ ১ ৬

লপ্তপ্রণ—সম্রাটের উৎপত্তি

২৪৬—২৪৭ ; মহাবীরের

জন্ম-উপাখ্যান সম্বন্ধে ৩৪ ;

বিবিধ গ্রন্থে ৩৯, ৪০,

৪২, ৪৮, ৫৯, ৬৩ ৬৭, ৭৮

য ।

লপ্তপ্রণ—সুদের হার বিষয়ে ৩৪৮

লপ্তপ্রণ—রাজবংশের ক্ষমতা ৩৬০

স ।

সংগ্রহণ ২৮৯, ৩৯০

সংবর (সম্বর) ৭৮, ৯২, ২২৪

সংযাতীর্ণ্য ৩৯৬

সংযানপথ ৩৯৬

সংসারী জীব ৮৪, ৮৫

সংহিতা শাস্ত্র—সাক্ষি প্রকরণে

২৯৬—২৯৮ ; সাধারণ

ব্যবহার বিষয়ে ৩০৪, ৩০৪ ;

আধ-বিষয়ে ৩২৯ ; ঋণদান

গ্রন্থে ৩৪০ ; দায় সম্বন্ধে

৩৫১ ; সত্য-গঠন প্রভৃতি

বিবিধ বিষয়ে ৩৭৯—৩৮২ ;	সম্প্রতি স্থির ৫২	সার্কটিক ৩২০
পণ্যস্বত্ব ৪০৯ ; মনু, বিষ্ণু,	সম্প্রতি ১২৪	সালে ৩০২
সাক্ষ্যবাক্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।	সম্ভবনাথ ১১৬	সাহস—২৮৮ ; ত্রিবিধ—প্রথম,
সকাম ও নিষ্কাম—সমানার্থ-	সম্ভূত ৩৯, ১৬৬—১৬৭	মধ্যম ও উত্তম ৩৬৯, ৩০৮,
বোধক ২৪৪	সম্ভূতবিজয় ১২৪	৩৭৪, ৪০৮
সংগর ১৭৪—১৭৫	সম্ভূতি ৪২	সিংহ ১২৭
সম্ভব—বণিকগণের ও ভৃত্য-	সম্ভূত-সমুখান—যৌথ কারবার	সিংহগিরি জাতিস্বর ১২৪
গণের ৩৬৮, ৩৭৬—৩৮২	২৮৮, ৩১১, ৩৭৬, ৩৭৭,	সি-উ-কি—উদয়ন রাজ্য বিষয়ে
সম্ভবপালিত ১২৭	৩৭৯, ৩৮১ ; বণিক সম্ভব,	মন্তব্য ২৭১
সম্ভব ৫২, ৬০	কোম্পানী-গঠন দ্রষ্টব্য ।	সিদ্ধজীব ৮৪, ৮৫
সম্ভব (বেলজিগুস্ত) ৫৬—৫৮	সম্মুখিম ৮৮—৮৯	সিদ্ধবাজনৈমর্মানবপ্রকাশনম্ ২৮৮
রাজা ১৭৩—১৭৪	সম্যক—লাভের উপায় ৭১—	সিদ্ধসেন ৪৯
সং—তৎ-স্বরূপ ২৪০—২৪১	৭৫	সিদ্ধান্ত—শাস্ত্র ৩৮, ৪১, ৫২
সত্যপাঠ—প্রাচীন ও আধুনিক	সর্পদংশন—চিকিৎসার বিষয়	সিদ্ধার্থ—মহাবীরের পিতার
প্রণা ২৯৯—৩০০	৪০২	বুদ্ধের নাম ৩৫, ৯৯—১০১,
সনৎকুমার ১৭৫	সর্বাধিকরণরক্ষণম্ ২৮৮	১১০, ১১২, ১২৯, ১৩১
সন্ধিকর্ম ৩৯১	সহদেবী ১৭৫	সিদ্ধি ৩০৪
সন্ধিপাল—বৈদেশিক দূতসিদ্ধা-	সাংখ্য (সাংখ্য)—জৈন মতে	সিহ ৩৩
র্থের রাজ্যে ১৩৮	৫৫ ; তৎসাদৃশ্যে ৬১ ;—	সীতাধাক ৪১৪—৪১৫
সন্ন্যাসী ২৬—২৯, ৩৫ ; জৈন	মতের মূল তত্ত্ব ও বেদান্ত	সীমাক ৪৪
মতে ১৩৬—১৩৭ ; শিক্,	হুজে সে মত খণ্ডন ১৯৬	সুইডেন—রণে কারাদণ্ড লোপ
নিগ্রহ, প্রশম প্রভৃতি দ্রষ্টব্য	—২০৫	বিষয়ে ৩৬১
সপ্তপদার্থ ৫৫	সাক্ষী—তৎসংক্রান্ত প্রাচীন	সুং-উং—মোরীয় নগর সম্বন্ধে
সপ্তভঙ্গী স্থার (নয়) ৫৭, ৫৮	কালের বিধি ৩১০—৩১৮,	মন্তব্য ২৭০
৭৯, ২২৪—২২৭	৩১৮, ৩২০, ৩২২—৩২৪ ;	সুধ—ঐহিক ও অনন্ত ১৫৭
সর্কারসিদ্ধি ১০৮	—ব্যবস্থা ২৯৫ ; বিবিধ	সুধ—গ্রহণ, মনু মতে ৩৪০ ;
সমস্তম্ভ ৫১	প্রসঙ্গে ৩৭৯	নারদ, বলিষ্ঠ, বাজবাক্য
সময়স্থানপাকর্ম ২৮৮	সাক্ষ্য—তৎপ্রদানে অনধিকারী	প্রভৃতির মতে ৩৪১—৩৪২ ;
সমাদি ১৪১	(ময়ুর মতে) ২৯৬ ; তাহার	পাশ্চাত্য প্রণা ৩৪৪—
সমাহর্তা ১৭৭—২৭৮	প্রকার ৩২২—৩৫২	৩৪৯
সমিতি ৭৩, ৮২, ৮৩, ১০৫	সাধারণ-তত্ত্ব ১২১	সুদর্শনা ১০০—১০১
সমুদ্রগুপ্ত ২৭২	সামন্তপ্রণা ১২১	সুধর্ম্মনাচার্য্য ১২৬ (স্বামী)
সমুদ্রবিজয় ১৭৫	সামাধিকার ২৮৮	সুধর্ম্মস্বামী ৪২, ৫০ ; আচার্য্য
সম্পালিত ১২৭	সারিপুত্র ৫৮	তাহার পুত্রের মনু ৯০ ;

আর্থা ১২৩—১২৪; আচার্য্য	৫৪; প্রাচীন চন্দ ৩৮;	স্থানিক ২৭৭
১৩১	জীগণ সম্বন্ধে ১২১—১২২;	স্থানীয় ২৮৯, ৩৯০
অনন্দা ১১৫, ২৬৫	বন্ধন ও ছেদন বিষয়ে ১২৪	স্থিরশুশ্রূ ১২৭
অনুত ১৫১	স্মৃতি—উাহাদের পরিচয় ৫৮—	স্থূলভূত ৪২, ৪৪, ৪৯, ১২৪
অপার্ব্য (অপার্ব্য) ১০০—১০১,	৪৯; প্রথাত স্মৃতিগণ	স্পর্শ—তাঁহাতে বীতস্পৃহা ১২১
১১৬	(তালিকা) ৫১—৫২	স্পর্শেন্দ্রিয়—তাঁহার সার্থকতা
অপ্রতিবুদ্ধ ৪৯, ১২৬; কাক-	সেন্সর ২৮১	১৪৯
ন্দক ১২৪	সেন্সাস ২৭৪, ১৮১—২৮২	স্পুনার—পাটলিপুত্রনগরে জোয়-
অবর্ণ—উহার আকর ও পরীক্ষা	লোক-গণনা দ্রষ্টব্য।	ওরাষ্ট্রীয়ান সম্বন্ধ বিষয়
৪১৭	সেলিউকাস নিকাটর ২৭৬	সম্পর্কে ২৪৫
অবিনিমাত ১১৬	সোমতিলক স্মৃতি ৫২	স্পেন—জাতীয় ঋণ ৩১৯—৩৬০
অব্রত ১১৫	সোমদত্ত ১২৫	স্বামিসম্বন্ধ ২৮৮
অভদ্রা ১০১, ১১৭	সোলন—এথেন্সে লোক-গণনা	স্বামিবাক্য — প্রাচীন কালের
অমতিনিম ১১৬	পদ্ধতি প্রবর্তনার ২৮১;	সমন-প্রথা ৩০৪
অনলস ১০৮	অদগ্রহণ প্রসঙ্গে ৩৪৫,	স্বাধীন—জৈন-শাস্ত্রের প্রদান
অলা—অদ পদক্ষে ৩৪৫	৩৫৮—৩৫৯	তত্ত্ব ৫৭—৫৮, ৭৭—৭৯,
অশ্রুত-সংহিতা — ভারতবর্ষে	সোত্রাস্তিক ২১০, ২১৬	২২৫—২২৬; স্বাদ্বেদ-এবং
চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে	সোম্য ১১৫	নৈকস্মিরসম্ভবৎ—যেদাস্ত
৪০৩—৪০৪	স্টেলিও—লোকগণনার ২৮২;	স্বত্রে সামন্ত-সামন বিষয়ে
অসম-ভূঃসম ৯৫—৯৬	অদ গ্রহণ প্রসঙ্গে ৩৪৭	২৪১—২৪২
অস্থিত ৯৯, ১২৬, (কৌতুক)	জীগণ—জৈন শাস্ত্র মতে পরি-	
১২৪	কর্তব্য ১২১, ১৪০; সাক্ষা	
অসুখী (অসুখী) ৪৯, ১২৪	দানে ৩২০; দাত্তবিজ্ঞা-	
—১২৬	শিক্ষায় ৪০৪; দোতাকার্য্য	
স্বত্র ৪১	৪১৩	
স্বত্রকৃত্য—উহার সংক্ষিপ্ত	স্ববিয়—পদগণনা ৩৯; তাঁহা-	
পরিচয় ৪৫; নিগ্রহ ও	দেয় তালিকা কল্পস্বত্রে	
কর্ম্ম সম্বন্ধে ৩৩—৩৪; মহা-	৪৭; তাঁহাদের বৃত্তান্ত ১২৩	
বীরের জীবন বিষয়ে ৯৪—	—১২৮	
৯৮; ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন	স্থলপণ ৩৭৭, ৩৯১, ৩৯৫,	
মত খণ্ডন বিষয়ে ৫৪—৫;	রাজগণ দ্রষ্টব্য।	
বেদান্ত বিষয়ে ৫৫; উহার	স্বাবর সম্পত্তি — ক্রয়-বিক্রয়	
অমুবাদ প্রসঙ্গে ৬৩; দেহ-	বিধান ৩৬৪, ৩৭৬; বাস্ত	
নাণে সকলই শেষ বিষয়ে	দ্রষ্টব্য	
		হরিকেশ ১১৬
		হরিগণমেঘী ২৬, ৯৮
		হরিসেন ১৮৪—১৮৫
		হস্তী—তাঁহাদের পালন, দ্ব্যত-
		করণ, শিক্ষাদান প্রভৃতি
		৪২২—৪৫৬; দ্ব্যত ক্রিয়ণ
		প্রণালী ৪৩০—৪৩৪;
		পরীক্ষা ও স্বাক্ষর-বিধান
		৪৩৪—৪৩৬
		হস্তীন ১২৭
		হস্তিপাল ১০৭

হস্তাশাস্ত্র ৪২৩, ৪৩৩—৪৩৬ ;	গৃহ-ব্যবস্থা ৪৩৫ ; হস্তীর	ঐক্য ১৬ ; সর্ব-ধর্ম মূল
উঁহার কর্তব্য ৪৩২ ; উঁহার	স্বাধারক্ষা এবং শরীর-	২৪ ; ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ক্রটব্য ।
অধীনস্থ কর্মচারীগণের	পালন সম্বন্ধে বিবিধ ব্যবস্থা	হিলত্রাট—অর্থশাস্ত্রের রচনা-
কর্তব্যের বিষয় ৪৩২—	৪৩৬	বিষয়ে ২৫
৪৩৩ ; হস্তি সংগ্রহ বিষয়ে	হাষ্টার—ভারতের চিকিৎসা-	ছয়েন-সাং—মোরীর নগর সম্বন্ধে
উঁহার ব্যবস্থা ৪৩৩ ; হস্তীর	বিজ্ঞান বিষয়ে ৪০১	অভিমত ২৭০
শিক্ষাদান এবং বিভাগাদি	হারুণ-অল-রসিদ— হিন্দু-ভিবক	হেমচন্দ্র—খ্রিঃ ৫১ ; জৈনগ্রন্থকার
ব্যবস্থার উঁহার কৃতিত্বের	প্রসঙ্গে ৪০১—৪০২ ; উঁহার	৫২ ; চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে ২৭৯ ;
পরিচয় ৪৩৩ ; হস্তিপট্টিকা	রোগ-নিবারণে হিন্দু ভিবকের	নন্দবংশের উচ্ছিন্ন সম্বন্ধে ২৫৪
এবং তাতাদের স্বাস্থ্য দি	কৃতিত্ব ৪০২	হোরাস—যৌথুটের আদর্শ
বিধানের উঁহার ব্যবস্থা ৩৩৪	হিন্দুধর্ম—উচ্চা বৌদ্ধ ও জৈন	১৮—১৯
—৪৩৫ ; তৎকর্তৃক হস্তীর	ধর্মের মূল ১০ ; তিন ধর্মের	হোরগ—জৈনধর্মগ্রন্থ উচ্ছারে
আহাৰ্য্য বিধান ৪৩৫ ; হস্তীর	সম্বন্ধ ১১ ; আচার-অমুঠানে	৬৪—৬৫

নিবেদন



“পৃথিবীর ইতিহাস” বর্ষ খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিবরণ সংবলিত। আমরা প্রথমেই অনুমান করিয়াছিলাম, অনূন দশ খণ্ডে ভারতবর্ষের বিবরণ সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইব। এখনও সেই সিদ্ধান্তই অক্ষুণ্ণ রহিল। এই বর্ষ খণ্ডেও ভারত-বর্ষের বিবরণী প্রকাশিত হইল। আর চারি খণ্ডে ভারতবর্ষের ইতিহাস শেষ করিব।

এই গ্রন্থ প্রকাশ-পক্ষে বাহাদুর নিকট হইতে পুঁগি-পত্রের ও পুস্তকাদির সাহায্য পাটয়াছি, তাঁহাদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এ বিষয়ে আমাদের একজন প্রধান সাহায্যকারী—শ্রীযুক্ত পুরাণচাঁদ নাহার, এম-এ-বি-এল, মহোদয়। জৈনধর্মসংক্রান্ত তত্ত্বাপা গ্রন্থ-সমূহ তিনি উঁহার পাঠালয় হইতে আমাদের নিকট পাঠ করিবার জন্ত প্রদান করিয়াছেন ; এবং জৈন-স্বাপত্য-সংক্রান্ত পাঁচ খানি ‘হাকটোন্ ব্লক’ আমাদের নিকট ছাপাইতে দিয়াছেন। উঁহার এবং বিধ সাহায্যের জন্ত আমরা উঁহার নিকট চিরঞ্চী রত্নিলাম। আমাদের আর একজন প্রধান সাহায্যদাতা—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয়শ্রীমতী পণ্ডিত ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাবূষণ এম-এ পি-এটচ-ডি মহাশয়। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরী-হইতে তিনি মূল ‘অর্থশাস্ত্র’ প্রত্নিত গ্রন্থ আমাদের ব্যবহারের জন্ত প্রদান করায় আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। উঁহার সাহায্য-স্বর্ণ ও অপরিশোধনীয়। আর অপর বাহাদুর গ্রন্থ-পত্রের সাহায্য লইয়াছি, তাঁহাদিগের নিকটও আমরা চিরঞ্চী আছি।

